"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।"

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ

২৩শ বর্ষ ।

(১৩২৭ মাঘ হইতে ১৩২৮ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৹ আড়াই টাকা ।

সূচী।

(উদ্বোধন ২৩শ বর্ষ—মাঘ ১৩২৭—পৌষ ১৩২৮)

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা

নববর্ষ।

ভারতীয় সনাতন সাধনার বহুধাবিভক্ত মত বৈচিত্র্যে ও সাধনা-বৈচিত্র্যের দ্বন্দ্বসংঘর্ষে জাতির ম্রিয়মান স্বধর্ম্মের আদর্শ যখন হীনপ্রভ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহাশঙ্কটের সময় শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই মহাযজ্ঞের মহাভাগ ঋত্বিক্ স্বামী বিবেকানন্দ,—"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—এই বেদবানী উচ্চারণ করিয়া 'উদ্বোধনের' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন—সে আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বের কথা! ভারতের তথা জগতের সর্ব্বপ্রকার সাধনা ও মতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে রক্ষা করিয়া এক উদারতম প্রশস্ততম মহাদর্শকে মানব-জাতির সম্মুখে স্থাপন করিবার এই সুমহান্ প্রয়াসের জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বিবেকানন্দ 'উদ্বোধনের' প্রস্তাবনায় বলিয়াছিলেন—

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ!"

বাহ্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত ভারতের জরাজীর্ণ স্থবিরত্বের আবরণখানি ভেদ করিয়া বিবেকানন্দের ধ্যানস্তব্ধ অধ্যাত্ম দৃষ্টি তাহার ভিতরের রূপটী দেখিয়াছিল, তাই ভাবানন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি ভারতবর্ষ যুবাবস্থ!" তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ভারতের অন্তর্নিহিত এই যৌবনশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়াছে, ইহার জাগরণ আসন্ন। তরুণ যৌবনের এই দুর্নিবার গতিবেগ যদি অদম্য কর্ম্মচাঞ্চল্যকে ধারণ করিতে না পারিয়া বিকৃতপন্থায় আত্মঘাতী অভিসারে যাত্রা করে, তাহা হইলে এই নব অভ্যুদয়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।—তাই জাতির এই প্রস্ফুরিত শক্তিপ্রবাহকে

তিনি সেবাধর্ম্মের বিশুষ্কপ্রায় সনাতন খাতে প্রবাহিত করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অপরিহার্য্য নেতৃত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চাহিয়াছিলেন এক সহস্র ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক—যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উত্তেজনা-শূন্য হইয়া জাতির এই বলদর্পিত জাগরণের উশৃঙ্খল ও উদ্দামবেগকে সংযত ও সংহত করিয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিবেন।

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনায়' জাতীয়-জীবন-সমস্যার কথা প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য।"

* * * *

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নিস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া, সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।"

এই নিরহঙ্কৃত কর্ত্তব্যের সাধনায় ব্রতী হইয়া 'উদ্বোধন' আজ ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। যতই দিন গিয়াছে, সমস্যা ততই জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছে। চারিদিকে বিভিন্নপ্রকার ভাব ও আদর্শের কর্কশ বাদানুবাদ ও বিতণ্ডা—অথচ আমরা দেখিতেছি, লেখনী ও জিহ্বা প্রকৃত কর্ম্মকে পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে! বহ্বাড়ম্বরের এই প্রাচুর্য্যের দিনে আমরা সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি স্বামীজির উপরিধৃত বাক্যের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি; তাঁহারা অগ্রসর হউন—ভাব

বিপর্য্যয়ে বিভ্রান্ত না হইয়া জাতি যাহাতে দৃঢ়পদে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন; তাহা হইলেই "উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য" সফল হইবে।

নববর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই 'উদ্বোধন' এই পুরাতন কথা নূতন করিয়া শুনাইতে চায়—কেননা, পুরাতন ছাড়া আর কিছু নূতন পাইবার উপায় নাই! যে দিন ভারতীয় সাধক ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া অদ্বৈতানুভূতিরূপ মহাতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই নূতন শেষ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার কবিগুরুও তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু,
কোন দিন কোন গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।"

—তাই নূতনের আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলে চারিপাশে অন্ধকার গাঢ়তর হইবে মাত্র। বৃথা সন্দেহের জঞ্জাল ও চিন্তার জটিলতা আনিয়া জাতীয়-জীবন-সমস্যাকে ভারাক্রান্ত করিয়াও কোন লাভ নাই। কেননা, সাদা চোখেই দেখিতে পাইতেছি, একটা জাতি ক্ষুধার জ্বালায় মরণোন্মুখ! কোটী কোটী মানুষ তাহাদের কঙ্কালসার অস্তিত্ব লইয়া, দৈন্যের দায়ে, পেটের জ্বালায় পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে;—অভাবের পীড়নে জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে! খাইতে না পাইলে মানুষ বাঁচে না—সর্ব্বাপেক্ষা সহজবোধ্য এই সত্যটী বুঝিতে হইলে কোন তর্কযুক্তির আবশ্যক হয় না!

এক্ষণে প্রতীকার কি? সার্ব্বজনীন ধ্বংসের এই মহাশ্মশানে কোন্ বীরহৃদয় সাধক সৃষ্টি-ক্রীড়ায় নিযুক্ত? কে আছ বাঙ্গালায় দুঃখব্রত সাধক! জাতির এই মহাদুর্দ্দিনে একবার দরিদ্র, অজ্ঞ, উৎপীড়িত, পতিত সকলকে ভাই বলিয়া আশ্বাসবাণী শুনাইবে? দুঃখের জন্যই দুঃখভোগ মানুষকে দীন হীন কাপুরুষ করিয়া ফেলে—কিন্তু যেখানে দুঃখ ত্যাগের অটল-নির্ভর কাঠিন্যের পাষাণ বেদীর উপর দাঁড়াইতে পারে, সেইখানেই দুঃখের যা কিছু মহিমা, যা কিছু

সার্থকতা! অতএব এই দেশব্যাপী দুঃখের পদতলে আত্মসুখলিপ্সা বলি দিয়া প্রমান করিতে হইবে—বাঙ্গালীর লক্ষ্য মহৎ, তাই দুঃখও মহৎ!

জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাত হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কথাই 'উদ্বোধন' নানাভাবে বলিয়া আসিতেছে। 'সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট কোটী কোটী নরনারীর' পক্ষ সমর্থন করিয়া 'উদ্বোধন' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। দেশের নানা ভাব-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও শ্রীভগবানের কৃপায় এ পর্য্যন্ত 'উদ্বোধন' লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। দেশের ও দশের সেবায় এই অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের বার্ত্তা লইয়া উদ্বোধন নববর্ষে পদার্পণ করিল;—সমভিব্যাহার সহায়—নিঃস্বার্থ সেবা; ভরসা—শ্রীভগবানের করুণাকর সম্পাত!—তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!!

ওঁ সহনাববতু সহনৌভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনা বধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ॥

"শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। * * আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। * * শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবে না।"

"এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়! কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর,—এইত সবে আরম্ভ!"

"আমাদের সর্ব্বদাই জানা উচিত যে পরোপকার করিতে যাওয়া এক মহা সৌভাগ্যের কার্য্য। * * যে প্রতিগ্রহ করে সে ধন্য হয় না—দাতাই ধন্য হয়।"

"সমুদয়ই ঈশ্বরে সমর্পণ কর।"

"এই সংসার-রূপ অগ্নিময় তপ্তকটাহে—যেখানে কর্ত্তব্যরূপ অনল সকলকে ঝল্সাইয়া ফেলিতেছে—তথায় এই ঈশ্বরার্পণ-রূপ অমৃত-পাত্র পান করিয়া সুখী হও।"

আমরা ও আমাদের ধর্ম্ম।

(পথিক)

সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, উৎসবে ব্যসনে, মানুষের যখন যাহা ঘটে তৎসমুদয়ই সর্ব্বগ্রাসী কালের বিপুল আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায়। মানুষ আবার হাসে কাঁদে নাচে গায়, জগৎটা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে। সবই যায়, সুখের দিন যাইয়া দুঃখের দিন, আবার দুঃখের দিন কাটিয়া সুখের দিন আসে। কালের অচিন্ত্য প্রভাবে লক্ষপতিও পথের ভিখারী হয়, আবার চিরদুঃখিতের কাতর নয়নেও সুখের চঞ্চল হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু মানুষের এই সমস্ত অবস্থা বিপর্য্যয় কালের যবনিকার অন্তরালে অপসৃত হইলেও উহারা তাহার হৃদয়ফলকে অভিজ্ঞতার যে সুগভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া যায় তাহা লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া যাহার 'আক্কেল' হয়, সংসারে সেই মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। কিন্তু দেখিয়া বা ঠেকিয়াও যাহার শিক্ষা হয় না, নিজের বা পরের অতীত ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারাও যে নিজের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না—স্রোতের তৃণের মত জগতের বিচিত্র ঘটনাস্রোত দ্বারা তাড়িত হইয়া জড়ের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াই যে সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে 'মানুষ' বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় মাত্র। কারণ, যে বিচার শক্তি বলে মানুষ ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আর কিছুই নহে—অতীত ও বর্ত্তমান দশটা ঘটনা দেখিয়া-শুনিয়া তাহার তত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক কার্য্য-কারণ সহায়ে তাহাদের অন্তর্নিহিত মূল তথ্যটি আবিষ্কার করিয়া তদবলম্বনে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করা। সেই মূল সত্য অবলম্বনে জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই মানুষ ক্রমে মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

আমাদিগের নিজের ও জগতের অন্যান্য জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে আমরা যে মূল তথ্য

আবিষ্কার করিতে পারি, তাহার সহায়ে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে—আর যাহা কিছু হইবার আগে আমাদিগকে হইতে হইবে 'মানুষ'! ব্যষ্টিকে অবলম্বন করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব জাতির ভিতর গড়িয়া না উঠিলে আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবার নহে। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মুর্থ, উচ্চ নীচ, পুরুষ স্ত্রী, সকলকেই আজ যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের জন্য নীরব সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। স্বার্থপরতার গভীর তিমিরজালে যাহার হৃদয়কন্দর চির-আচ্ছাদিত—প্রেম, সমপ্রাণতা ও একাত্মবোধের অমৃতবারি সিঞ্চনে যাহার দেহ-মন পবিত্র হয় নাই—দেশের, দশের বা জগতের কল্যাণ সাধন করিবার কথা তাহার পক্ষে একটা কথার কথা মাত্র। তাই আগেই আমাদিগকে হইতে হইবে 'মানুষ'!

অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মনুষ্যত্বের উচ্চতম ধারণা আবার সম্পূর্ণ অন্যরূপ! ভোগ-সুখের চূড়ান্ত পারিপাট্য, দৃশ্য প্রপঞ্চের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণপটুতা, উচ্চ দার্শনিক চিন্তার চমৎকারিত্ব, অথবা ক্ষমতার লোকভয়ঙ্কর দৃপ্ত আস্ফালন—কিছুই এদেশে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও কখন পারিবে না। আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে, স্মরণাতীত কাল হইতে, সর্ব্বভূতে সেই এক পরমতত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভব লাভ করিয়া সর্ব্বভূতে আত্মবোধ করতঃ সকল প্রকার অবস্থা-বৈচিত্র্যের ভিতর প্রশান্ত সাগরের মত অক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থান করাই মনুষত্বের চরম আদর্শ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মুকুটমণিস্বরূপ গীতাশাস্ত্রে সর্ব্বত্র মনুষত্বের এই সর্ব্বোচ্চ আদর্শটিকে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিয়া সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করতঃ নানা ভাবে তাহা লাভ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন :—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ (১৩।২৮, ২৯)

অতএব কায়মনোবাক্যে এই অধ্যাত্মদৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে তেজস্বী, বীর্য্যবান্, নিঃস্বার্থ ও উদারস্বভাব হইতে হইবে। ইহাই আমাদের ধর্ম্মের মূল সূত্র; এই সমদর্শিতার উপরই আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই চরম মনুষ্যত্ব—এই মনুষ্যত্বের উপর ভর করিয়াই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে।

এইরূপ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিলে যে ভাল হয়—তাহা যে আমরা একটু একটু না বুঝিতেছি এমন নহে; কিন্তু সর্ব্বত্র সেই একই সমস্যা, একই প্রশ্ন— 'ধর্ম্মকর্ম্ম করি কখন? পেটের চিন্তা, কন্যাদায়, রোগ, মহামারী প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরগণ যে সর্ব্বদাই ঘিরিয়া রহিয়াছে! এমতাবস্থায় কি আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা চলে?—কে আজ এ বিষম সমস্যার সমাধান করিবে? কে বলিয়া দিবে—উদরান্নের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মীলে, কলে, আফিসে, আদালতে, কারখানায়, আড়তে, ঘুরিয়া বেড়াইব—অথবা পুত্র-কন্যা-স্বজন-বান্ধবের রোগক্লিষ্ট, অনশনকাতর, ক্ষীণ কণ্ঠের অস্ফুট আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া মহাযোগীর মত যোগাসনে বসিয়া যাইব? কে আছ বলিয়া দাও—এবার প্রাণ বাঁচাই, কি ধর্ম্মে মন দেই?' আধ্যাত্মবাদী স্বদেশ প্রেমিক গম্ভীরভাবে বলিলেন—'আত্মস্থ হইয়া, অর্থাৎ কি না, আত্মার প্রেরণায় কর্ম্ম করিয়া যাও।'—'কিন্তু এখন যে সম্পূর্ণ 'উদরস্থ' হইয়া পড়িয়াছি! আত্মার প্রেরণা কাহাকে বলে তাহা ত বুঝি না, উদরের প্রেরণাই বিশেষ করিয়া বোধ করিতেছি—আত্মস্থ হই কেমন করিয়া?' জড়বাদী স্বদেশ-হিতৈষী স্পষ্টভাবে আদেশ করিলেন—'ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই দেশটা রসাতলে যাইতে বসিয়াছে; ধর্ম্ম-কর্ম্ম চুলায় যাক্, যেমন করিয়া পার অবস্থার উন্নতি কর; চাষ কর, কারখানা কর, বাণিজ্য কর—ধর্ম্মের বন্ধন, সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেল, সভা-সমিতি, আন্দোলনের চূড়ান্ত কর, তবেই বাঁচিবে।'—'ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সে ত অনেক-দিনই আপনা হইতেই চুলোয় গিয়াছে;—দোল গিয়াছে, দুর্গোৎসব গিয়াছে, দান গিয়াছে, ব্রত গিয়াছে, হিন্দুয়ানীর একটু শেষ সম্বল যা' ছিল

গৃহদেবতার সামান্য নিত্য পূজা—তাহাও গিয়াছে! ভগ্ন দেউল পুনঃ-সংস্কার করিবার ও নিত্য চাল-কলা যোগাইবার অর্থাভাবে, অগত্যা গৃহদেবতাকেও মা গঙ্গার বক্ষে মহাসমাধিতে মগ্ন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি! ব্রাহ্মণের ছেলে, পুত্র-পরিজনের কাতর ক্রন্দনের প্রভাতি সুরের করুণ মূর্চ্ছনা কানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ভোর না হইতেই উদরান্নের চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িতে হয়; গায়ত্রী জপটাও হইয়া উঠে না—আর পেটের চিন্তায় বিশ্বাসও পালাইয়াছে!—তার পর চিন্তাক্লিষ্ট, অনশন-কাতর ভগ্ন-শীর্ণ দেহ রাত্রিতে জীর্ণ কন্থায় লুটাইয়া পড়ে ও দুঃস্বপ্নের দারুণ বিভীষিকায় রাত্রি কাটিয়া যায়। আর সমাজের বন্ধন!—আমি সমাজের কে যে আমি ছিন্ন করিতে চাহিলেই তাহা ছিন্ন হইবে? গরীবের আর্ত্তনাদ সমাজের কাণে পৌঁছায় কৈ? তারপর কাজকর্ম্মের কথা—তারও চেষ্টার বিরাম নাই; চাষের জমীর চেষ্টায় জমীদারের পাইকের গলাধাক্কা খাইয়া আসিয়াছি, চাকুরির চেষ্টায় আফিসে, দপ্তরে অথবা বড়লোক ব্যবসায়ীর দ্বারে ঘুরিয়া লাভ হইয়াছে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, আবার কখনও বা বঞ্চনা! ব্যবসায় করিবারই বা মূলধন কোথায়? গরীবের দিকে মুখ তুলিয়া চায় এমন ধনী মহাজন একটিও দেশে নাই। সভা সমিতিতেও কখনও কখনও যোগদান করিয়াছি; প্রসিদ্ধ প্রায় সকল নেতারই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি—উদরেন্দ্রিয় (দার্শনিক, মার্জ্জনা করিবেন, উদরকে ইন্দ্রিয় বলিয়া ফেলিলাম!) কিন্তু তাহাতে কুপিতই হইয়াছেন! নেতাদের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করিয়া উদরান্নের একটা সংস্থান করিয়া লওয়া যায় কিনা সে চেষ্টাও যে না করিয়াছি এমন নহে—কিন্তু তাঁহারা দেশের কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, আমার দুঃখের কথা শুনিবার তাঁহাদের অবসর কোথায়?'

এই ত হইল দেশের অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ! এমতাবস্থায়, ধর্ম্মকে অবলম্বন না করিলে আমাদের উন্নতি অসম্ভব—এ কথা মনে বুঝিলেও কার্য্যতঃ তাহার অনুষ্ঠান যে কতদূর সম্ভব, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তবে যদি এমন কোনও ধর্ম্ম থাকে—যাহা ক্ষুধার্ত্তের দারুণ জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতে সহায় হয়, যাহা

দীনের প্রতি ধনীর সহানুভূতি সঞ্চার করিতে পারে, যাহা দুর্ব্বলের প্রতি সমাজের উৎপীড়ন নিবারণ করিয়া সমাজকে যথার্থ মনুষ্যত্ব গঠনের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়; যদি এমন ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়—যাহা নিরাশায় দগ্ধহৃদয়, রোগ-শোক-দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত, উপেক্ষা অত্যাচারে প্রপীড়িত ও মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্য প্রসারিত-বাহু কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ে আশা, উৎসাহ, সাহস ও বলের সঞ্চার করিতে পারে, তবে তাহারই সন্ধান আজ দেশবাসীকে বলিয়া দিতে হইবে—তাহারই সাধনায় দেশবাসীকে উৎসাহিত করিতে হইবে —তাহাতেই সিদ্ধিলাভের সাহায্যার্থ বক্ষ পাতিয়া দিতে হইবে। অবশ্যই এ কথা যেন এখানে কেহ মনে না করেন যে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইতে আমরা এক পদও বিচলিত হইব। আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উদ্দেশ্যকে খর্ব্ব করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টায়, প্রায়ই উদ্দেশ্যকে গৌণ আর উপায়কেই মুখ্যভাবে গ্রহণ করার দোষ আসিয়া পড়ে। তাহা দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। আমরা যাহা হইতে চাই তাহা আমাদিগকে হইতেই হইবে,—তবে যে সকল বাধাবিঘ্ন তাহা হইবার পথে অন্তরায় জন্মাইতেছে, তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া উদ্দেশ্যলাভ সহজসাধ্য করিয়া লইবার জন্য, এমন ভাবে উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে—যাহাতে উদ্দেশ্যও পঙ্গু না হইয়া পড়ে অথচ বিঘ্নও দূরীভূত হয়। সে উপায় উপায়ই নহে—যাহা বিঘ্নসমূহকে গণনা না করিয়াই উদ্দেশ্যলাভে প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে উভয়দিক্ যথাযথ বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই নীতিশাস্ত্রে—উপায় প্রয়োগের কৌশল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, যদি এমন কোনও উদ্দেশ্য-সম্মত উপায় থাকে—যাহা আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিয়া আমাদিগকে যথার্থ কল্যাণের দিকে চালিত করিতে পারে—তবে তাহারই অনুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মানুষের যখন দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়, তখন ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হইয়া প্রথমেই সে হারায় তাহার আত্মবিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে

তাহার দুর্দ্দশাও গভীর হইতে গভীরতর হইয়া, মানুষের ভগ্ন আকারটি মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, তাহাকে দুর্ব্বলতার একটি জীবন্ত বিগ্রহরূপে পরিণত করিয়া দেয়। কিন্তু অদৃষ্টবিপর্য্যয়ের সূত্রপাতেই যাঁহারা হৃদয়ের বল হারাইয়া বসেন না, সামান্য বর্থ্যতায়ই যাঁহাদের অদম্য উৎসাহ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না—সুখ দুঃখ জোয়ার-ভাটার মত কখনও আসে কখনও যায়, ইহাই যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—মোটকথা এই জীবনটাকে বাহিরের কতকগুলি ঘটনার একটা বিশৃঙ্খল সমবায় বলিয়া মনে না করিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এইগুলি ছাড়াও তাঁহাদের একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে—সুখদুঃখ ব্যাপারটা উহারই উপর আবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র—তাঁহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা সহসা দুর্দ্দশাতে পতিত হয়, প্রথমেই তাহারা এতটা ব্যাকুল হইয়া পড়ে যে, তাহাদের মন দুঃখের চিন্তাতেই সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া যায়। কল্পনার সহায়ে দুঃখের একটা দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া ক্রমাগত তাহারই চিন্তায় তাহারা এমন একটা আড়ষ্ট জড়ভাব প্রাপ্ত হয় যে, দুঃখের পারে যাইবার কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবন করা ত দূরের কথা—কেহ উপায় বলিয়া দিলেও যথাযথরূপে তাহার অনুষ্ঠান করা তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া পড়ে। বসিয়া বসিয়া দুশ্চিন্তা ও 'হায় হায়' করা ব্যতীত আর যে কোনও উপায় থাকিতে পারে—একথা তাঁহাদের দুর্ব্বল মন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এইরূপ দুশ্চিন্তায় ক্রমাগতই তাহারা শক্তিক্ষয় করিতে থাকে, আর সেই দুর্ব্বলতার ছিদ্র পাইয়া দুঃখ-দৈন্যের অগণন অনুচরগণ একে একে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহার রক্তপানে উন্মত্ত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। দুর্দ্দশার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুশ্চিন্তাগুলিই ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়,—আর যে ক্ষীণ আশাটুকু লইয়া মানুষ একটু নড়াচড়া করে, তাহাও আর পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—মানুষ ক্রমাগত গভীরভাবে যেরূপ চিন্তা করিতে থাকে বাস্তবও সেই আকার ধরিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

বস্তুতঃ, আমরা যাহাকে বাস্তব আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি তাহা চিন্তা-শক্তিরই অভিব্যক্ত-অবস্থামাত্র। মানুষ চিন্তা করিল—'আমি আকাশে উড়িব';—ক্রমশঃ সেই ভাসা-ভাসা চিন্তাটি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি মনেরই অনুচর মাত্র—মনের সেই সাগ্রহ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিশাল ব্যোমযানের সৃষ্টি করিয়া লইল। এইরূপে সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বাস্তবের আকার ধারণ করিয়া থাকে। দুঃখের চিন্তাও তদ্রূপ। বালক হয়ত চিন্তা করিল—'এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।'-ক্রমশঃ চিন্তাটি গভীরতর হইয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল—পাঠ্য-পুস্তক দর্শনমাত্রেই সেই চিন্তার উদ্দীপনা হইয়া তাহার পাঠের প্রযত্ন শিথিল করিয়া দিতে লাগিল; যদি বা সে পুস্তক খুলিয়া বসিল, তথাপি মন স্থির করিতে পারিল না—তাহার পাঠ তৈয়ার হইল না; ফলে, যেমন চিন্তা কাজেও তেমনি হইল। আবার একজনের চিন্তা-শক্তি অপরের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে, বর্ত্তমান সম্মোহন-বিদ্যা প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। সুতরাং একজনের গভীর চিন্তা তাহার পারিপার্শ্বিক জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহাকে যে অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া তুলিতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যাহা হউক, দুঃখদৈন্যকে 'আগম ও অপায়শীল' জানিয়া আমরা যদি তাহার চিন্তায় এতটা বিচলিত না হই, তবে দুঃখ-দৈন্যও আমাদের নিকট ততটা ভীষণ আকারে উপস্থিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, দুশ্চিন্তা দ্বারা বাস্তব অবস্থার কোন প্রতিকার না হইয়া বরং অনিষ্টের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রিয় পুত্রের পীড়া হইল—জননীর হৃদয়ে অমনি কত অমঙ্গলের আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইল; তিনি হয়ত তাহাতে এতটা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে পুত্রের শুশ্রূষাদি করা ত দূরের কথা—নানা প্রকারে তিনি পুত্রের যথাযথ চিকিৎসা-শুশ্রূষাদির বিঘ্নোৎপাদনই করিতে লাগিলেন।—আর সুস্থ

ভাবে পুত্রের অমঙ্গল চিন্তায় তন্ময় হইয়া, অজ্ঞাতসারে তিনি সেই অনিশ্চিত অমঙ্গলটিকেই মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ক্রমাগত দুঃখের চিন্তা দ্বারা আমরা দুঃখের কোনও প্রতিকার না করিয়া উহাকে আরো গভীরতর করিয়া তুলি।

এই দুর্ব্বলতাই আমাদের জাতীয় অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নানা প্রকার বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থাই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটিয়াছিল বলিয়াই নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, বাহিরের অবস্থাই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে, অথবা আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি বলিয়াই বাহিরের অবস্থা প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি এবং দুর্ব্বল হইয়াছি বলিয়াই নানারূপে বিড়ম্বিত হইতেছি। এই দুর্ব্বলতার প্রতিকার আমাদিগকে করিতেই হইবে। অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইলে প্রথমেই লইয়া আসিতে হইবে সেই ওজঃ—যাহার অভাবেই জাতি ও ব্যক্তির ক্রমশঃ অধঃপতন ঘটিতেছে।

পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মানুষের ভিতর যখনই যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাহির হইতে আসে না—উহা তাহার ভিতরেই ছিল। বিশেষ বিশেষ বংশে জন্ম, বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর অবস্থান ও বিশেষ প্রকার শিক্ষা দ্বারা এই সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। সেই অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে যে যত স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারে, সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করা তাহার পক্ষে ততটা সহজসাধ্য হয়। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বংশ বা বিভিন্ন ব্যক্তি সেই শক্তিটিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া নানা প্রকার শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বুদ্ধ ভূতানুকম্পারূপে, শঙ্কর জ্ঞান রূপে,

শ্রীচৈতন্য প্রেমরূপে উহাকে অনুভব করিয়াছিলেন ; আবার ঐ শক্তিকেই নেপোলিয়ান সমরকুশলতারূপে ও কালিদাস কবিত্বশক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমাদের বৈদিক ঋষিগণ স্মরণাতীত কাল হইতেই এ সত্য অবগত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা ধনার্থীকে ঐশ্বর্য্যরূপে, বীর্য্যার্থীকে বীর্য্যরূপে, জ্ঞানার্থীকে জ্ঞানরূপে এবং মোক্ষার্থীকে মোক্ষরূপে সেই শক্তিকেই অবগত হইতে উপদেশ করিয়াছেন। আমাদের জীবনে আজ অভাব হইয়াছে শক্তির—নানা প্রকার অবস্থাচক্রের দারুণ নিষ্পেষণে আজ আমরা আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা আমাদিগকে হীন, দুর্ব্বল, পদদলিত, লাঞ্ছিত, পথের কাঙ্গাল ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারিতেছি না; আর ভাবিবই বা কেমন করিয়া,—বাহিরের দিকে তাকাইলে আপনাকে স্বাধীন, মুক্ত, বীর্য্যবান্ বলিয়া ভাবাটা যেন দারুণ উপহাস বলিয়া মনে হয়! যাহার পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, খাইতে-শুইতে-বসিতে যাহাকে পরের মুখ তাকাইয়া চলিতে হয়, তাহাকে স্বাধীন, মুক্ত অথবা বীর্য্যবান্ বলিয়া চিন্তা করিতে বলাটা কি তীব্র বিদ্রূপ নহে?—কিন্তু তা বলিয়া কি আমরা চিরদিনই এমনি করিয়া নিজেদের হীন দুর্ব্বল ভাবিয়া ক্রমাগতই দুর্ব্বল হইয়া যাইব? আমাদের আশে পাশে, ভিতরে বাহিরে, এমন কি কিছুই নাই—যাহার দিকে তাকাইলে আমরা এ দুর্দ্দিনেও একটু বল ভরসা পাইতে পারি? আমাদের ধর্ম্ম উপনিষদ্‌মুখে দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন—'নিশ্চয় আছে, বল ভরসার জন্য তুমি বৃথা বাহিরে অনুসন্ধান করিতেছ; সমস্ত বলের আধার, সমগ্র আনন্দ ও সুখের একায়তন-স্বরূপ এক নিত্য, অবিনাশী, হ্রাসবৃদ্ধিহীন বস্তু তোমার ভিতরেই সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন—তাঁহার সন্ধান না পাইয়াই তুমি দুর্ব্বল, পরমুখাপেক্ষী হইয়াছ। আপাততঃ যদিও তাঁহাকে ধরিতে বুঝিতে পারা তোমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে,—তথাপি বিশ্বাস কর তিনি আছেন। বৃথা তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে না, তিনি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য; সুতরাং শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও—কালে তুমি অবশ্যই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিবে; তখন তোমার সকল সংশয় ছিন্ন

হইয়া যাইবে। শ্রদ্ধার সহিত সাধন কর। প্রথমটা নিরন্তর তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে থাক, শ্রবণ করিতে করিতে তোমার হৃদয় মন পূর্ণ হইয়া যা'ক; তাহার পর মনে মনে তাঁহার চিন্তা কর—সকল কার্য্যে, সকল ভাবে, তাহাকে মনে রাখিতে চেষ্টা কর; অতঃপর তিনি তোমার সবটা অধিকার করিয়া ফেলিবেন। তখন দেখিবে—তুমিই তিনি, তিনিই তুমি—তাঁহাকে না জানাতেই তোমার দুঃখ দুর্দ্দশা। অতএব এখন হইতেই বিশ্বাস কর—তুমিই সেই আত্মা। সকল অবস্থায়, সকল কার্য্যে, সেই আত্মার মহিমায় মহিমান্বিত থাকিতে চেষ্টা কর—তাঁহার বলে বলীয়ান্, তাঁহার আনন্দে আনন্দিত হও। বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। বৃথা কেন শোকদুঃখের চিন্তায় আত্মার মহিমা খর্ব্ব করিতেছ? দুঃখ দৈন্য আজ আসিয়াছে, কালই চলিয়া যাইবে—তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকিবে। জগতের ঘটনার সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া ফেলাতেই তুমি পূর্ণতা হারাইয়া দুর্ব্বার বাসনা দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছ;—বাসনার উন্মাদনায় তুমি সত্যকে দূরে সরাইয়া ছায়াকে ধরিয়া বৃথা সংসার-ভয়ে ভীত হইতেছ!'

বেদান্ত প্রদর্শিত এই মহান্ সত্য অবলম্বন করা ব্যতীত আমাদের বীর্য্যবান্ হইবার অন্য পথ নাই। আর উহা অবলম্বন করা যে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে, তাহাও সহজেই প্রমাণিত করা যাইতে পারে। যদি 'স্বর্গে দেবতা আছেন' অথবা 'তেঁতুল গাছে ভূত আছে', এইরূপ শত শত ধারণা, কোনওরূপ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অপেক্ষা না করিয়া শুধু শুনিয়া শুনিয়াই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারে—তবে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়া অসম্ভব হইবে কেন? আর যেটি যার অন্তর্নিহিত ভাব, কার্য্যতঃ তাহারই প্রকাশ সর্ব্বত্র হইয়া থাকে; সুতরাং যদি আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হই—তবে আমাদের প্রত্যেকটি কার্য্যে তাহাই প্রকাশিত হইয়া উত্তরোত্তর যে আমাদিগকে বীর্য্যবান্, সমদর্শী ও একপ্রাণ করিয়া তুলিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ, এই আত্মবিশ্বাসই কর্ম্মের কৌশল—উহাই

কর্ম্মযোগের সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি। যদি নির্লিপ্ত, সুখ-দুঃখের অতীত, সর্ব্বশক্তিমান্ একটা কিছু—উহাকে পরমাত্মা, ঈশ্বর, আল্লা বা গড্, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন—আমাদের ভিতর না থাকে, এবং উহাতে যদি আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়া যায়, তবে 'আমি কর্ম্ম করিব অথচ সুখদুঃখ, লাভালাভ আমাকে স্পর্শ করিবে না'—এইরূপ একটা ধারণা লইয়া কর্ম্ম করা অসম্ভব দাঁড়ায়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনের নিকট কর্ম্মযোগের উপদেশে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও আজ সর্ব্বপ্রথমে এই মহান্ আত্মতত্ত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করিতে হইবে—অন্যথা আমাদের সকল চেষ্টা হীন স্বার্থানুসন্ধান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদের কারণ হইয়া দুঃখেতেই পর্য্যবসিত হইবে। আর ক্ষুদ্র, নশ্বর বস্তুতে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার দরুণ নিজকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া সামান্য অবস্থা বিপর্য্যয়ে দিশেহারা হইয়া পড়াই যাহার স্বভাব, সুখদুঃখের সামান্য ঘাতপ্রতিঘাতে যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, একটু সামান্য স্বার্থের হানিতে যাহার বুদ্ধি পর্য্যাকুল হইয়া পড়ে—মহান্ কর্ম্মযোগ অবলম্বনের সে সম্পূর্ণ অনধিকারী। সুতরাং এই আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়া ব্যতীত যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের আর উপায়ান্তর নাই।

অনেকে আবার বেদান্তের এই আত্মতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিবা মাত্র শিহরিয়া উঠেন! তাঁহারা বলেন—দুর্ব্বল জীব আমরা, একগাছি তৃণ নাড়িবার শক্তিও নাই আমাদের, আমরা যদি নিজকে সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্য নির্ব্বিকার বলিয়া মনে করি—এক কথায় পরমেশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসি—যাহা নিতান্ত মিথ্যা কথা—তবে দুর্নিবার অভিমান, দাম্ভিকতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা আসিয়া আমাদের পতনের পথই পরিষ্কার করিবে।

একদিক্ হইতে বিচার করিলে আপত্তিটি খুব সারবান। যতক্ষণ আমরা দেহ মন অথবা তাহাদের সমষ্টিতে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ততক্ষণ আমরা দুর্ব্বল জন্মমরণশীল মর্ত্ত্য জীব ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারি না। এই আমিটাকে সর্ব্বশক্তিমান্ অথবা নিত্য নির্ব্বিকার মনে করাটা নিতান্তই

মিথ্যা কথা ; এইরূপ মিথ্যাকে আশ্রয় করিলে অধঃপাতে যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব এমতাবস্থায় 'আমি দাস তিনি প্রভু', 'তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র'—এইরূপ একটা ভাব অবলম্বনে দাস যেমন প্রভুর শক্তিতে নিজকে শক্তিমান্ মনে করে, সেইরূপ ভাবে সকল কার্য্যে তাঁরই শক্তির মনন করাই অনেকের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইতে পারে সন্দেহ নাই। মোট কথা, আমাদের অন্তরের অন্তরে যে শক্তি সর্ব্বদা বিরাজিতা থাকিয়া সকল অবস্থাতে আমাদিগকে চালিত করিতেছেন, তাঁহাকেই—পরমেশ্বর, আত্মা, আল্লা, গড় যে কোনও নামেই হউক না কেন—সর্ব্বদা সকল কার্য্যে মনন করিতে হইবে। সেই একই শক্তিকে অপরদিক্ দিয়া বিচার করিয়া বেদান্ত বলিতেছেন—'এই তুচ্ছ জন্মমরণশীল দেহটাকে আত্মবুদ্ধি করিয়াই তুমি সংসার দুঃখে পতিত হইয়াছে, তোমার ভিতরে যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পরমতত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছেন তাঁহাতেই আত্মবুদ্ধি অর্পণ কর, সর্ব্বদা আত্মভাবে তাহাকেই ভাবনা কর, দেখিবে, তুমিই তিনি!' বস্তুতঃ, দেহেন্দ্রিয়াদি নশ্বর পদার্থকে নিত্য, অবিনশ্বর বা শক্তিমান্ বলিয়া ভাবনা করিতে বেদান্ত শাস্ত্র কখনই উপদেশ প্রদান করেন নাই। সুতরাং, শুদ্ধ আত্মায় আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে চেষ্টা করিলে, তাহাতে কোন প্রকার অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না।

কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, বেদান্তকে অবলম্বন করিলেই ত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে—ইহাতে আর দুর্দ্দশার প্রতিকার হইল কৈ? এ যেন গলা কাটিয়া ফোঁড়া আরাম করিবার ব্যবস্থা! আর যদিই বা ধরিয়া লওয়া যায় যে সন্ন্যাসী হওয়াই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তথাপি সহসা আমাদিগকে তাহা করিতে বলিলেই কি তাহা করা যাইবে?

বাস্তবিকই বেদান্তের আত্মতত্ত্ব এমনই বস্তু—যাহার উপলব্ধিতে মানুষকে সন্ন্যাসী করিয়া তবে ছাড়ে! কারণ 'রাগ-দ্বেষকে' সমূলে উৎপাটিত না করিয়া আত্মজ্ঞান কখনই নিরস্ত হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'যিনি আকাঙ্ক্ষাও করেন না, দ্বেষও করেন না—তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী।'

সুতরাং আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী অকপট সাধককে রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত সন্ন্যাসী অবশ্যই হইতে হইবে; কিন্তু রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত হওয়া যে হাত-পা' গুটাইয়া বসিয়া থাকা নহে এ কথা আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আত্মস্থ হইয়া কর্ম্ম করা তখনই সম্ভবপর হয়, যখন সেই পরমতত্ত্বকে সর্ব্বত্র অবস্থিত জানিয়া মানুষ রাগ-দ্বেষের অতীত হয়; এইরূপ আত্মস্থ ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ না করিয়াও সন্ন্যাসী। আর এই আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে যে আমাদিগকে সব ছাড়িয়া বনবাসী হইতেই হইবে, এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ একদেশী। উহার চরম পরিণতি যেখানেই হউক না কেন, প্রারম্ভ যে সকল অবস্থাতেই হইতে পারে এবং ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই উত্তরোত্তর উচ্চ উচ্চ ভাব উপলব্ধি করিয়া যে মানুষ ক্রমশঃ চরম সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইতে পারে—তাহা না বুঝিতে পারিয়াই আমরা 'ব্যবহারিক চেষ্টা' ও 'ধর্ম্মের সাধন' এই দুইয়ের ভিতর একটা কাল্পনিক প্রভেদের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। শিক্ষা-দীক্ষার দোষে আজ আমরা এমন একটা অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে, শিক্ষালাভ-কালে অথবা ন্যায়তঃ জীবিকা-অর্জ্জনের সময়ে আমরা কিছুতেই ভাবিতে পারি না যে, আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টায়, ধর্ম্মের সাধন হওয়া ত দূরের কথা, ধর্ম্মের সহিত তাহাদের কোনওরূপ সংশ্রব পর্য্যন্ত আছে। এইরূপ ধারণা লইয়া আমরা সারা জীবন যাহা করি, তাহা কার্য্যতঃ ধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ ধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থিত থাকায় বার্দ্ধক্যে যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অসম্ভব, হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ, ধর্ম্ম যে কি বস্তু—উহা যে গোটাকতক প্রাণহীন অনুষ্ঠানের ভিতরই আবদ্ধ নহে—তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই দুরন্ত কাল আসিয়া শিয়রে দণ্ডায়মান হয়। এইরূপেই ধর্ম্মের কতকগুলি খোসা-ভুষি ছাড়া বাকি সবটুকু, বালক যুবক বৃদ্ধ সকলের নিকট হইতেই চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আজ আমরা নিস্তেজ, শ্রীহীন, পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্মজীবন ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে কোনও

বাঁধাবাঁধি সীমা নির্দ্দেশ আছে কিনা, আর থাকিলেও তাহা কোথায় —সে বিষয় বিচার সহকারে বুঝিয়া আমাদিগকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

সংসারের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই প্রকারের কাজ বিভিন্ন ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবাবলম্বনে অনুষ্ঠান করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল লাভ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে এক ছড়া মালা গাঁথার কথা ধরা যাক্। একজন মালা গাঁথিতেছে—তাহার প্রণয়পাত্রকে উপহার দিয়া তাহার মনোরঞ্জনের জন্য, অপর একজন—তাহার ইষ্টদেবতা মদনমোহনকে সাজইবার জন্য। মালাগাঁথা কাজ উভয়েরই সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু উভয়ের মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—প্রথম ব্যক্তির হৃদয় আশা-নিরাশার কত প্রবল দ্বন্দ্বে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অগণন ঘাত প্রতিঘাতে, প্রণয় ও অভিমানের কতই না বিপুল আলোড়নে সতত আলোড়িত হইতেছে। উত্তেজনার চাঞ্চল্যে মন তাহার সততই অস্থির, ভাল করিয়া গাঁথিতে চাহিলেও মালাগাঁথা যেন কিছুতেই ভাল করিয়া হইয়া উঠিতেছে না। পক্ষান্তরে ভগবচ্চিন্তায় দ্বিতীয় ব্যক্তির চিত্ত ধীরস্থির ও আনন্দময়,—তথায় নিজের জন্য চাহিবার কিছুই নাই, সুতরাং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষম ঝঞ্ঝাবাতে তাহা আন্দোলিত হয় না; তাহার চিত্ত শুদ্ধ অচঞ্চল, সুতরাং কার্য্যে অনবধানতা বা বিশৃঙ্খলতার ভাব তাহাতে নাই। তাহার কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে—আবার হৃদয়েও শান্তি ও প্রসাদ সতত বিরাজিত রহিয়াছে। এইরূপে একটা উচ্চ ভাবাবলম্বনে জীবনের প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিলে কাজ ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়-ই—অধিকন্তু জীবনের প্রত্যেকটি চেষ্টাই শ্রেয়ের সাধনরূপে পরিণত হইয়া যায়। বস্তুতঃ, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক চেষ্টার ভিতর যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তাহা ভাবে;—বাহিরের দিক হইতে উভয়ের ভিতর কোনও স্থির সীমা নির্দ্দেশক কিছু খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। এই উচ্চ ভাবটাকে হারাইয়াই আমরা ব্যবহারিকের সঙ্গে অধ্যাত্মের কোনই সামঞ্জস্যের সন্ধান লাভ না পাইয়া একদেশিতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বৃথা-

তর্কে লোকের মনে ক্ষতিকর সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ ভাবে ব্যবহারিক চেষ্টা করিয়া থাকি তাহার মূলে রহিয়াছে একটা অসম্পূর্ণতা জনিত দুর্ব্বলতার ভাব—মানযশ, খ্যাতি প্রতিপত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া সেই ক্ষুদ্র জীবন-টাকে ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা। এই জন্য যখনই আমরা জাগতিক কোনও লাভের চেষ্টায় কার্য্য করিয়া থাকি, তখনই ভিতরে ভিতরে একটা বিষম দুর্ব্বলতা অনুভব না করিয়াই পারি না। কিন্তু চিত্তের দুর্ব্বলতা-সম্পাদক এই সকল ক্ষুদ্রভাব ছাড়িয়া, বলকারক একটা বিশাল উদার উচ্চভাবের প্রেরণায়ও যে সকল প্রকার ব্যবহারিক চেষ্টা সম্ভবপর হয়—ভাগ্যদোষে সে কথা আজ আমাদের ধারণারও বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, সমাজে দুর্ব্বলতামূলক নানা প্রকার ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ ভাবসমূহ প্রবেশ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারের নাগপাশ-রূপে পরিণত করিয়াছে। আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি যে, আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে যে মায়াময় সংসার পরিত্যাগের কথা আছে, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে—এই হীন দুর্ব্বলতামূলক স্বার্থ-দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব অবলম্বন করা। গীতা স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন :—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতো সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (১৮।৪৫)

আবার বলিতেছেন,—

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ (১৮।৪৬)

নিজ নিজ আশ্রম ও বর্ণবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ;—কিন্তু সাধারণ স্বার্থ-দৃষ্টিতে করিলে চলিবে না। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য" অর্থাৎ, ভগবানের অর্চ্চনা-বুদ্ধিতে করিলেই তাহা সিদ্ধিলাভের কারণ হইবে। শ্রীভগবান্ অন্যত্র বলিতেছেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।" (১০।২০) 'আমিই সকল জীবের হৃদয়স্থিত আত্মা'। পুনরায় বলিতেছেন—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো। মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ" ইত্যাদি (১৫।১৫)—'সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই

আত্মারূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে, আবার আমাকে না জানাতেই অজ্ঞান মোহ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়'। অতএব সেই আত্মরূপী পরমতত্ত্বকে জাগরিত করাই শ্রীভগবানের অর্চ্চনা। অর্চ্চনা বলিতে শুধু বাহ্য পূজা বুঝায় না—বাহিরের অনুষ্ঠানের সহায়ে হৃদয়ে সেই আত্মরূপী ভগবানকে স্পষ্ট অনুভব করাই যথার্থ ভগবৎসেবা; উহাই যথার্থ আত্মজ্ঞানের সাধন। সুতরাং এই সাধন অবলম্বনের নিমিত্ত যে আমাদিগকে বনবাসী হইতেই হইবে—এ ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত। বেদান্তের আত্মতত্ত্বের ইহাই বিশেষত্ব যে, উহা কোনও প্রকার অনুষ্ঠানকেই মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করে না—বরঞ্চ সকল কার্য্যে একটা উচ্চ ভাবের সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

যাহা হউক, এবার আমরা মূল প্রস্তাবের উপসংহার করি। আমরা দেখিলাম যে, একমাত্র বেদান্তের এই উদার আত্মতত্ত্বে আস্থাস্থাপন করিয়াই আমরা অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। ভয় ও দুর্ব্বলতাই আমাদিগকে মনুষ্যত্ব-হীন করিয়াছে। নির্ভীকতাই সকল পুণ্য, সকল কল্যাণ ও সকল অভ্যুদয়ের জনক—আর ভয়ই সকল পাপ, সকল অমঙ্গল ও সকল অধঃপতনের কারণ। ভয় হইতেই স্বার্থপরতা জন্মে,—'এইটুকু গেলেই আমার সব গেল' এইরূপ একটা 'হারাই হারাই' ভয়েই মানুষ হীন স্বার্থকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্রতাই সমাজ ও ব্যক্তিকে সহানুভূতি-বিহীন ও অত্যাচারী করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রতাকে দূর করিতে হইলে লইয়া আসিতে হইবে বিশালতা ও বীর্য্যবত্তা। উহাদের সন্ধান করিতে হইবে আত্মায়—বাহিরে অনুসন্ধান করিলে আমাদিগকে নিরাশই হইতে হইবে। সেই আত্মার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমাদিগকে বীরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব যদি প্রাণভয়ে ভীত, নিরাশায় শুষ্কপ্রাণ, দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় ও দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত, দেশের কোটি কোটি নরনারীকে যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জগতের হিতসাধনে ব্রতী হইতে হয়—যদি সমাজের বিশৃঙ্খলতা,

সংকীর্ণতা ও স্বার্থদৃষ্টি অপসারিত করিয়া তাহাকে ব্যক্তির, দেশের ও জগতের কল্যাণ-সাধনের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া গঠন করিতে হয়, তবে আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে সেই ধর্ম্ম—যাহার ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মারূপে সতত সমভাবে বিরাজিত—উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, জড় চেতন, স্ত্রী পুরুষ, আত্মীয় পর, সবই যাহার একটি পবিত্র মন্দির—সকল কার্য্যে, সকল চেষ্টায় তাঁহাকে প্রকাশিত করাই যাহার অনুষ্ঠান। এই ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই আজ জাতীয়, সামাজিক, পারিবারক ও অন্যান্য সকল প্রকার ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে;—এক কথায় এই ধর্ম্মের সহায়েই জগতে এক অখণ্ড শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এস ভাই, আমরা উহারই সাধনায় অগ্রসর হই!—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্ত- অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়িসন্তু, তে ময়িসন্তু।*

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

---

* আমার সমস্ত বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয় সমূহ বীর্য্য লাভ করুক; উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউন; আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার সর্ব্বদা অপ্রত্যাখ্যান বিদ্যমান থাকুক। আর আত্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-কথিত ধর্ম্ম সমূহ প্রকাশিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কথাপ্রসঙ্গে

(১)

'Fame is the last infirmity of the noble mind'—সাধু হৃদয়ের শেষ অন্তরায় যশ। কাম-কাঞ্চনের ঝড় ঝাপটা সহ্য করিয়া শেষে যশাবর্ত্তে পড়িয়া বহু সাধককে হাবুডুবু খাইতে হয়। সাধনার পূর্ব্বক্ষণে চিত্তসাগরের কোন্ অগাধ জলে নীরবে একটি যশোবুদ্‌বুদ্ লুক্কাইত থাকে; কিন্তু হঠাৎ সিদ্ধির সন্ধিক্ষণে এক অজানা শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া জলস্তম্ভাকারে উহা নিজ পরাক্রম দেখায় এবং সাধকের জীবনতরীখানিকে মোহের বিপথ স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

*　　　　*　　　　*

প্রতি নবযুগ তরঙ্গের শীর্ষদেশে এক মহাপুরুষ বর্ত্তমান থাকেন। তাঁহারই বাণী নানা রঙ্গে ভঙ্গে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত জগৎ ছাইয়া ফেলে এবং নানা ছন্দে-বন্ধে, নানা ভাবে ভাষায়, নানা আবর্ত্তের সৃষ্টি করে। সেই অতি-মানবের বাণী এতই শক্তিমান এবং তাহার গতি এতই সূক্ষ্ম যে অজ্ঞাতসারেই হউক আর জ্ঞাতসারেই হউক মানব তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং কর্ম্মে তাহা প্রতিপন্ন করে। নবযুগের Leader বা নায়ক তাঁহারাই—অপরে কর্ম্মী বা worker মাত্র। সেই দেব-মানবের আবির্ভাবের পর যিনি যত বড়ই Idea বা ভাব বিতরণ করুন, উহা সেই শক্তিমান বাণীর প্রতিধ্বনি এবং যিনি যত বড়ই সৎকর্ম্ম করুন সকলই সেই অবতারের mission এর সম্পূর্ণতা (fulfilment)। যাহার চক্ষু আছে সে দেখে, যাহার কর্ণ আছে সে শুনে এবং সেই অবতার-লীলার সহচর হইয়া তাঁহার কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে,—বৃথা দ্বেষ মদিরা পান করিয়া অযথা প্রলাপ বকে না, বা একবার অহঙ্কারের বশে সে আদেশ অমান্য হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, পুনরায় আত্মহত্যার প্রয়াসী হয় না। প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস ইহার প্রমান।

যখন কর্ম্মীরা যুগনায়কের ভাব গ্রহণ করিয়া দেশ এবং দশের সেবায় প্রবৃত্ত হয় তখন মহামায়াও তাহাকে পরীক্ষার দ্বারা নিজ ভিত্তিতে দৃঢ় করিবার জন্য নানা ঐশ্বর্য্য প্রেরণ করেন এবং যদি কর্ম্মীর মনে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভোগবাসনা লুক্কায়িত থাকে তাহা তখন সেই ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া কর্ম্মীকে মুগ্ধ করে। সে নিজকে তখন একটা 'কেউ-কেটা' মনে করে না—সে মহাপুরুষের বাণীকে নিজের বাণী বলিয়া ঘোষিত করে, কিম্বা তাহা বিকৃত করিয়া নিজ ভাব-মন্দিরের নারায়ণের নিমিত্ত গন্ধপুষ্প সংগ্রহ না করিয়া, আবর্জ্জনা স্তূপ সঞ্চয় করে।

* * *

সাধককে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সাধনসঙ্ঘ হইতে ভূতাপসরণের নিমিত্ত মহামায়া অত্যাচার, অবিচার, অপমান প্রভৃতি নানা বিভীষিকা আনয়ন করেন এবং সেই কুলোর বাতাসে হুজুক-প্রিয়তা, তরল-চিত্ততা অসরল-শ্রদ্ধাহীনতা সকলের অপসারণ করেন, কিম্বা স্বপ্নের মত নানা মনোহর রূপ-রস-শব্দ ভূষিত গন্ধর্ব্বপুরীর কুহেলিকা দর্শন করাইয়া সাধকের আসন টলাইবার চেষ্টা করেন—দেখেন ভক্ত হৃদয়ের গভীরতা কত দূর।

* * *

হাউই শন্ শন্ রবে আকাশে উঠিতে থাকে এবং নয়ন মুগ্ধকর লাল নীল নানা প্রকারের তারা কাটিতে কাটিতে ভূতলের প্রদীপকে বলে "তোর আলো বড় মিট্‌মিটে, তোর স্থান অতি নিম্নে।" কিন্তু সে নয়নমন মুগ্ধকর তারাবাজি ক্ষণিকের মধ্যে হাওয়ায় বিলীন হইয়া যায় এবং ভূতলের প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ মানবের হিতসাধনে তার জীবনের শেষ তৈলটুকু নিঃশেষে ব্যয়িত করে। তেম্নি শ্রীভগবানের পার্থিব লীলার নিত্যসহচরেরা কখন অসংযত রজঃকে অবলম্বন করিয়া সমাজে, জাতিতে বা ব্যক্তির হৃদয়ে ক্ষণিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে জগৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাঁহারা অনন্তশক্তি শ্রীভগবানের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করায় তাঁহাদের

কর্ম্মক্ষমতাও অনন্ত ও সত্ত্বসংযমিত। যুগ যুগ বাহিনী নদীর ন্যায় তাঁহাদের কর্ম্মগতি দুর্লক্ষ্য এবং অতি নীরবে, সকলের অজ্ঞাতসারে বৃহৎ পর্ব্বতচূড়া, প্রশস্ত ভূখণ্ডকেও নিজের অঙ্গে মিশাইয়া লয়।

* * *

সৈনিকেরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয় তখন বিজয় গর্ব্বে তাহাদের কে পড়িয়া রহিল, কে আহত হইল, কে খুব বাহাদুরী দেখাইল, শত্রু বা মিত্র পক্ষের কাগজে ভাল কি মন্দ কে কি বলিল তা তাহাদের শুনিবার বা পিছনে তাকাইয়া দেখিবার অবসর থাকে না—তখন কেবল—আগাও—আগাও। তেম্নি নবযুগ-নায়কের সকলদেশের কর্ম্মীরা যখন নব ভাব তরঙ্গে জগৎ ছাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের মধ্যে কে পড়িল বা উঠিল, দেশ ভাল কি মন্দ বলিল তাহা তাহাদের শুনিবার বা পিছনে তাকাইয়া দেখিবার অবসর থাকে না—কেবল মেঘমন্দ্রে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়—Work and Expansion—কর্ম্ম এবং বিস্তার। আর যাহাদের ভাঙন ধরে যাহারা দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য তাহারা কেবল উঁকিঝুঁকি মারে আর দেখে কে কি বলে, কে কি করে এবং গালি গালাজ ও অত্যাচারের দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। ফলে চিন্তা ও শক্তির অপব্যবহার করিয়া মস্তিষ্ক একটা উত্তেজনার কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া পড়ে এবং সেই উত্তেজনায় পড়িয়া বহু নবীন তরল শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন একটা বোঝা হইয়া পড়ে।

* * *

এই যুগসন্ধিক্ষণে খৃষ্টের সেই মহতীবাণী আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—'Beware of false prophets'—মিথ্যা অবতার হইতে সতর্ক হও। 'For many shall come in my name, saying I am Christ.' সকল যুগেই কাশীরাজ-বাসুদেব, দেবদত্ত প্রভৃতি Pretender-রা দেখা দিয়াছে। খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যের সময়ও ইঁহারা কম প্রভাব দেখান নাই। মিথ্যা অবতার মানিয়া বিদ্বেষ গণ্ডির সৃষ্টি করিয়া জগতে সংঘর্ষের মাত্রা বাড়ান অপেক্ষা অবতার না মানা

ভুল। কিন্তু প্রকৃত অবতার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না—তাঁহারা ভবিষ্যতের তিন যুগের ছবি দেখিতে পান।

* * *

History repeats itself—একবার যাহা ঘটে প্রবাহাকারে আবার তাহা ঘটিবে, তবে অপর ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতিকে কেন্দ্র করিয়া। কেবল বর্ত্তমান ইতিহাসে ইহা সত্য নহে, সমষ্টি সৃষ্টি চক্র সম্বন্ধে তাহাই, কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ'।

(২)

প্রশ্ন হইয়াছে সন্ন্যাসী নারী বিদ্বেষী কি না?—হিন্দুধর্ম্মের প্রতি চতুরাশ্রমীর সহিত নারী সমাজের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ। তন্মধ্যে নারী জাতির সহিত ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীর অটুট মাতৃসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে যাহারা তৃপ্ত ও বিভোর তাহাদিগের বিরুদ্ধে লেখনী বা বাক্য সাহায্যে সন্ন্যাসীর নারী-বিদ্বেষের অছিলায় যাহারা সন্ন্যাস আশ্রমের বিরুদ্ধে crusade ঘোষণা করেন—তখন তাহাদের হাসিয়া চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর বুদ্ধিমানের কার্য্য কি হইতে পারে? যদি কোনও পঙ্‌ক্তির স্বল্প ভোজন-তৃপ্তকে পঙ্‌ক্তি-শুদ্ধ লোক কিছুতেই না বুঝিয়া বলে 'তুমি আমাদের প্রতি দ্বেষ করিয়া খাইলে না কেন?'—তখন সে কি করিবে? চীৎকার করিয়া প্রমাণ করিতে যাইবে যে সে তৃপ্ত হইয়াছে—কিম্বা একটু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকিবে?

* * *

দুর্ভাগ্য ক্রমে এই প্রকার চুপ করিয়া থাকাটা অনেকে 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সকলে এই প্রকার অভিযোগ সমর্থন করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা চাহেন সন্ন্যাসীদের একটা কথা শুনিতে। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—'তোমাদের চুপ করিয়া থাকা স্বভাব—তবে আবার লেখনীর তাড়না কেন?'—আমরা সেই কথাই বলিতেছি।

যদি কখনও কেহ ভ্রমবশতঃ—যাহাদের সহিত নারীজাতির ত্রিকালে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ—অন্ততঃ যাহারা এরূপ কল্পনা বা প্রতিজ্ঞাও করে—তাহাদের সেই ভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মাতৃসমাজের অত্যুজ্জ্বল প্রভা মলিন করিতে বসেন, তখন সেই মাতৃ সমাজেরই কর্ত্তব্য সে ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া। কিন্তু যখন তাঁহাদের লেখনী বা বাক্য নীরব রহিয়া যায় তখন প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্য সে ভ্রম নির্দ্দেশ করা। কিন্তু তাঁহারাও যখন নীরব রহেন তখন ভারতীয় মাতৃসমাজের আদর্শমণি রক্ষার নিমিত্ত সেই পুত্রদেরই প্রতিবাদ করিয়া বলিতে হয় সন্ন্যাসীর 'নারীবিদ্বেষ' অযথা, সম্পূর্ণ ভিত্তি হীন।—কারণ অপরাশ্রমীদের সহিত নারী সমাজের যেমন একটা না একটা সম্বন্ধ আছে তেমনি এই চতুর্থ আশ্রমীদের যে নারীতে মাতৃজ্ঞান ইহাও একটা সম্বন্ধ। সন্ন্যাসী সকল সম্বন্ধ নির্ম্মম ভাবে ছেদন করিতে পারে, কিন্তু গর্ভধারিণীর সহিত সম্বন্ধ ছিঁড়িতে পারে না—যেমন, তথাকথিত 'নীরস বেদান্তী' শঙ্কর, 'উৎকট বৈরাগী' চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণও গর্ভধারিণীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।—তাই বলি পুত্রের মাতার প্রতি দ্বেষ সম্ভব নহে।

* * *

এখন দেখা যাউক নারীজাতির প্রতি কে প্রথম অবিচার করিয়াছেন এবং কাহার অনুশাসন সন্ন্যাসিকুল মানিয়া আসিতেছে। প্রথম অনুশাসক মনু মহারাজ, দ্বিতীয় বশিষ্ঠদেব এবং তৃতীয় শ্রীবেদব্যাস। গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় সন্ন্যাসীরা বশিষ্ঠ ব্যাসের শিষ্য। প্রথমোক্ত স্মৃতিকার স্ত্রীজাতি বিশ্বাসের পাত্রী নহে স্থির করিয়াছেন, আবার পূজা করিতেও বলিয়াছেন এবং স্ত্রীপুরুষের অবাধ-সন্মিলনের দোষ উল্লেখও করিয়াছেন। দ্বিতীয় শাস্ত্রকার দৃষ্টি-সৃষ্টি-বাদী 'দুনিয়া তিনো কালমে নেহি হ্যায়'—ব্রহ্মদৃষ্টি ত্যাগ করিলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ই ভুয়া ছায়াবাজী। তাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া সংসার করিতে বলিয়াছেন। তৃতীয় মহর্ষি বেদব্যাস যাঁহার প্রস্থানত্রয়ের অনুশাসন সন্ন্যাসিমহলে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তিনি তাঁহার

ব্রহ্মসূত্রে সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠা এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর স্ত্রী-গ্রহণ প্রায়শ্চিত্তেরও অনুপযুক্ত স্থির করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-চরিত্রে তিনি যেরূপে অযথা কালিমা লেপন করিয়াছেন, এরূপ আর কোনও শাস্ত্রকার করেন নাই। অথচ তাঁহারই মহাকাব্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শনারী চরিত্রের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন।

* * *

এক্ষণে কৌতুক এই যে, এই প্রধান স্মার্ত্তত্রয়ই গৃহস্থ—পুত্রের পিতা। কিন্তু যিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী শ্রীশুক, তিনি বলিতেছেন 'তেজীয়সাং ন দোষায়'—তেজীয়ান ব্রহ্মজ্ঞ যাঁহারা তাঁহাদের সব শোভনীয়। শঙ্কর পার্শ্বে গৌরী, বশিষ্ঠ পার্শ্বে অরুন্ধতী, রামকৃষ্ণ পার্শ্বে সারদা দেবী গৌরবের। সন্ন্যাসীর আদিগুরু শ্রীশঙ্কর কালকূটের সাগর পান করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসী যদি একবিন্দু হাইড্রোসাইনিক অ্যাসিড খান তাহা হইলে আত্মঘাতী হইবেন। সেই হেতু সাধারণ ঋষি এবং সন্ন্যাসীকুলের জন্য শ্রীশুকের দ্বিতীয় অনুশাসনই প্রযুজ্য—'স্ত্রীনাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্'—অন্যথা মাতৃ-সম্মানের হানি সম্ভব।

* * *

এই নারী সমাজের সহিত যাহাদের মাতৃ সম্বন্ধ সেই সাধক সন্ন্যাসী-শিষ্যগণকে সাবধান করিবার নিমিত্তই শঙ্কর বলিয়াছেন—'দ্বারং কিমেকন্নরকস্য—নারী'। মাতৃত্বে স্ত্রীত্বের আরোপ নরক স্বরূপ। কিন্তু Printing এর কৃপায় শাস্ত্রের অবাধ প্রচলন এবং সদ্‌গুরুর অভাবে অধিকারীবাদের প্রতি তাচ্ছিল্য—এই দুই কারণে দ্বিতীয় আশ্রমীরা ঐ কথা নিজেদের উপর টানিয়া লইয়া শঙ্করের অযথা নিন্দা করিতেছেন। বৌদ্ধযুগের পতনকালে স্ত্রীপুরুষের অবাধ সম্মিলনের ব্যভিচার দর্শন করিয়া এবং অমরক রাজার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া—নারীতে শুদ্ধজ্ঞান রহিত হইলে মোহের কি ভীষণ শৃঙ্খল—তাহা উপলব্ধি করিয়া, তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—'কা শৃঙ্খলা—প্রাণভৃতাং হি নারী'। তাঁহার যদি নারী-সামান্যে ঐ অভিযোগ হইত তাহা হইলে তিনি উভয়ভারতীকে মণ্ডন-যুদ্ধে মধ্যস্থা করিতেন না বা নিজ গর্ভধারিণীর জন্য এত চিন্তিত হইতেন না।

এ ছাড়া আর একটা দিকও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—সত্যদর্শনেচ্ছু পুরুষের পক্ষে স্ত্রীতে মোহ যেমন বন্ধনের কারণ তেমন স্ত্রীর পক্ষেও পুরুষের মোহ একই বন্ধনের কারণ। শাস্ত্রকারগণ এবং আচার্য্যগণ সাধকপুরুষের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন—ঠিক সেই কথাই যে সাধিকার জন্যও প্রযুজ্য নহে একথা কে বলিল?—কেবল রকম ফের করিয়া বুঝিতে হইবে মাত্র।

* * *

দেশ বিদেশের এতগুলি মহাপুরুষ—যাঁহারা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কার্য্যের দ্বারা উন্নত এবং বাণীর দ্বারা জগতের সন্তাপ দূর করিয়া গেলেন—তাঁহারা কি নারী জাতিকে সত্যই ঘৃণা করিতেন? আমাদের কিন্তু মনে হয় ঘৃণা করিতেন না—পূজাই করিতেন! যে অবস্থা লাভ করিলে সাধক দেখিতে পান সকল নারীমূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীজগদম্বা বিরাজিতা আছেন—সে অবস্থা লাভ করিয়া কি কোন সাধক মাকে 'মধুরভাবে' দেখিতে সক্ষম হইতে পারেন? অথবা যাঁহারা সে কথা মানিয়া থাকেন তাঁহাদেরই কি উচিত মন-মুখ দুই করে কাজ করা?

* * *

মহাপুরুষ এবং সন্ন্যাসিগণের নিকট স্ত্রীজাতির শোভা মাতৃ মূর্ত্তিতে। সে মাতৃমূর্ত্তিকে যিনি ভোগের বস্তু বলিয়া ব্যবহার করিবেন—তাহার পক্ষে যে সেই নারী নরকের দ্বারস্বরূপ হইবেন তাতে আর বিচিত্র কি?

* * *

স্ত্রীত্বের মোহে বন্ধন এবং মাতৃত্বের জ্ঞানে মুক্তি—এই সত্যটা মহাপুরুষগণ অনুভূতির দ্বারা বুঝিয়াছিলেন—তাই তাঁহারা বলিতে পারিয়াছেন—'স্ত্রীয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু'—"যাদেবি সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা। নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

* * *

সন্ন্যাসিগণ নারীজাতির সহিত কোন কথা বলিতে হইলেই অগ্রে 'মা' সম্বোধন করিয়া পরে যাহা বক্তব্য বলিয়া থাকেন। 'মা' এই একটী মাত্র

সম্পর্ক সন্ন্যাসিগণের সহিত নারীজাতির বর্ত্তমান। সন্ন্যাসিগণ নারী-জাতির আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিয়া আসিতেছেন—

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ॥

আমরাও বলি—মাতৃজাতি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও, আমাদের আশীর্ব্বাদ কর—তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমরা তোমাদের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হইতে পারিব!—তোমাদের শুভাশীষ কখন বিফল হইবার নহে।

শিক্ষা-মন্দির।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

নানা অভিজ্ঞতার ফলে বর্ত্তমানে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বুঝিয়াছেন, অশিক্ষারূপ ব্যাধি বাঙ্গালা দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার একমাত্র কারণ। উহাই আমাদের দেহের এবং বুদ্ধির বিলোপ সাধন করিতেছে। দেশ যে স্বদেহের ব্যাধির নির্ণয় করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাহার সকল মুখপত্রে ব্যাধির তাড়নায় আর্ত্তনাদ। ব্যাধির নিরাকরণের নিমিত্ত দেশ চেষ্টাও আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাধির যন্ত্রণা স্বরূপ দারিদ্র্যদোষ দূরীভূত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্ম মিশন, বঙ্গীয়-হীত-সাধন মণ্ডলী প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্ঘ হাঁসপাতাল, ঔষধালয়, দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য কেন্দ্র, দুই চারিটী নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়া জাতীয় ব্যাধির উপশম করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বিষ যখন রক্তের সহিত মিশিয়া সমগ্র দেহ যন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে তখন তাহার পরিণাম স্বরূপ দুই একটি ক্ষততে বাহ্য প্রলেপ দানে যেমন অন্তর্ব্যাধির কিছুমাত্র উপশম হয় না সেইরূপ অস্মদ্দেশীয় সেবক মণ্ডলীদের

সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়া যাইতেছে। ক্ষততে প্রলেপ দান করিয়া কি হইবে যদি রক্ত পরিশোধিত না হয়?

এক্ষণে রক্ত পরিশোধিত করিতে হইলে শিক্ষারূপ ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এবং তাহার নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষা বিস্তার কল্পে অসংখ্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। বলিতে পার, শিক্ষার যথেষ্ট সরঞ্জাম ত রহিয়াছে—কলিকাতার বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ, স্কুল, পাঠশালা; টোলের অভাব কি? আমরা বলি ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছ বটে কিন্তু উহাতে রোগীর অস্বাভাবিক বিকার আরও বাড়িয়া গিয়াছে—ব্যবস্থা পত্রের পরিবর্ত্তন না করিলে বিকার আরও বাড়িয়া যাইবে কমিবে না। 'যার ধাতে যা সয়' তাহাকে সেইরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার বর্ত্তমানে যতটুকু শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে তাহা লোক-সংখ্যার তুলনায় সম্পূর্ণ অপর্য্যাপ্ত। যাঁহারা বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন কি অন্ধকার দেশকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশ হইতে আনিত দুই চারিটী সহরের আলো সে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে—মাত্র দুই এক স্থলে সেকেলে আধ্যাত্মিক প্রদীপ ইতস্ততঃ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

নিজস্ব বলিয়া আর কিছুই নাই—'নূতন'কে বরণ করিতে গিয়া আমরা স্বদেশে একেবারে বিদেশী হইয়া পড়িয়াছি। জাতীয় ও ব্যক্তিগত শক্তি বিকাশের চিরন্তন বিধি—বাহ্য অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করিয়া আভ্যন্তরিণ স্বাভাবিক শক্তির পুষ্টি সাধন। আমরা বাহ্য অভিজ্ঞতাকে সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমাদের যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম যাহা আমাদের প্রাণ তাহাকে নিঃশেষে অস্বীকার করিয়া নিজেদের সমাধি নিজেরাই খনন করিতে বসিয়াছি! বিদ্যালয়ে অজ্ঞানতমঃ-নিবারিণী বীণাপাণি দেবীর প্রতিষ্ঠা না করিয়া কুবেরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছি! আমরা বালকগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করি অর্থ ও কাম লাভের উপায় শিক্ষার নিমিত্ত। পুত্র যদি ধর্ম্ম এবং মোক্ষের দিকে মতিমান্ হয়, পিতা বলেন 'ছেলে আমার ব'য়ে গেল।' কিন্তু আমরা যে হিন্দু, ভগবান্ যে

আমাদের লক্ষ্য, বিদ্যা—ভক্তি জ্ঞান লাভের উপায়,—একথা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনীশ্বর-বিদ্যা' আমাদিগকে একেবারে ভুলাইয়া দিয়া ভোগকেই চরম লক্ষ্য বুঝাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে আপামর-জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া-গিয়াছে—আমাদের জাতীয় তরণী ছিদ্র হইয়া গিয়াছে, আমরা ডুবিতে বসিয়াছি দেখিয়া। ওঠ, জাগো ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিয়া সকল শক্তি সমবায়ে আমাদের জাতীয়তাকে রক্ষা কর। এই রক্ষাকল্পে, অনেকে বলিতেছেন—দেশে রাজনীতির চর্চ্চা খুব চলুক—ইউরোপ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বেদের মত ঘরে ঘরে গঠিত হউক—ম্যাট্‌সিনী, গ্যারীবল্‌ডি, ওয়াসিংটন প্রভৃতি দেশ-প্রাণদের চরিত্র আমাদের আদর্শ হউক ;—প্রাচ্য সভ্যতাকে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে তখন ইহা ত প্রতিপন্নই হইয়াছে যে উহা সময়ের অনুপযুক্ত—বহু সহস্র বৎসরের মমি (mummy) পাশ্চাত্য সূর্য্যালোক লাগিয়াই জাগিয়া উঠিয়াছে! কাজেই উহাকে এখন কবরে নিহিত করাই কর্ত্তব্য—তবে অতীতের ইতিহাস বলিয়া দুই চারিটী ফুল ছুড়িয়া সম্মান প্রদর্শন করা উচিত! নূতন করিয়া সমাজ গড়িতে হইবে—অতীতের সকল কুসংস্কার চুর-মার করিয়া ভাঙ্গিয়া অবিকল পাশ্চাত্যানুকরণে নূতন বনিয়াদ খনন করিতে হইবে! যেমন কাম্যকূপ প্রভৃতিতে দেহত্যাগ, গঙ্গাসাগরে পুত্রকন্যা বিসর্জ্জন, সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে, সেইরূপ বিধবার অবিবাহ, শিশুবিবাহ, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, সন্ন্যাস প্রভৃতি বর্ব্বর পুরাতন প্রথা উঠাইয়া দেও—আর সর্ব্বাপেক্ষা দেশের যে মহা অন্তরায় 'ভারতীয় ধর্ম্ম' উহাকে একেবারে পুঁথি-পুরোহিত, ঢাকি-ঢুলি সমেত ভারত মহাসাগরের অতল জলে বিসর্জ্জন কর এবং যদি প্রকৃত ধর্ম্ম, দর্শন এবং কাব্যের আলোচনা করিতে চাও, তাহা হইলে Emerson, Hegel, Browningএর আলোচনা কর! এমন সাজান ফুলের বাগান ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে এক-আধটি বন্য পুষ্প সঞ্চয়ের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন কি?—মৃত সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার আলোচনা দ্বারা

পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক স্বদেশে আনিয়া স্বদেশ হিতৈষীতার পরাকাষ্ঠা দেখাও!

অপরে বলেন—দেশ রক্ষা করিতে হইলে দেশের আর্থিক সমস্যার উন্নতি করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের বেদ-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া কল কারখানায় দেশ ছাইয়া ফেল—বাণিজ্য লক্ষ্মীকে অধ্যবসায়ের দ্বারা বরণ কর। আর্থিক সমস্যার উন্নতি হইলেই মানব নিশ্চিন্ত মনে সমাজতন্ত্রের চিন্তা করিতে পারিবে। আমাদের দেশে যে পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বিদ্যমান আছে, উহা একেবারে ফেলিয়া দিলে চলিবে না—উহার ভিতর হইতে ভারত এবং ভারতেতর বহু দেশের ইতিহাসের আবিষ্কার হইতে পারে এবং উহাদের ভিতর কিছু কিছু কাব্যরসও আছে। পুরাতন স্থপতি, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতি বিদ্যার যেরূপ প্রদর্শনী (museum) করিয়া রাখা হইয়াছে, শাস্ত্রগুলিও সেইরূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আর ধর্ম্ম জিনিষটা একেবারে বর্ত্তমানে ত্যাগ করিলে চলিবে না। যদিও উহা একটা মস্ত 'ফক্কিকারী', তথাপি উহারই আবরণে আমাদিগকে এক্ষণে রাজনীতি প্রভৃতি দেশহিতকর সকল বিষয়ই চালাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নব বিজ্ঞানের সত্য সকল দেশবাসীকে শুনাইতে হইবে—তাহা হইলে কিছুকালের মধ্যেই আমূল সকল কুসংস্কার নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

অপর পক্ষ বলেন—আমাদের দেশের ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, এমনি কি প্রত্যেক খুটিনাটি ব্যাপারটি পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে। কারণ, বহুকালের অভিজ্ঞতা ফলে ভারতবর্ষ সেগুলি লাভ করিয়াছে। স্বদেশীয় দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যকলার আলোচনা করিয়া তাহারই উন্নতি সাধনে প্রচেষ্ট হইতে হইবে। বিদেশের কোনও বস্তুরই আমাদের প্রয়োজন নাই। চিরকালই ত ভারতবর্ষ নিজ সভ্যতায় সমগ্র মানব-সমাজকে পরিচালিত করিয়াছে, তখন ইদানীং অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? ভারতে ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব্বে আমরা যখন আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া বাঁচিয়াছিলাম, তখন এখনও বাঁচিতে পারি। বিদেশীয় কলকারখানা প্রভৃতি বিজ্ঞানের পরিণতি কি ভীষণ

তাহা ত হাতে নাতেই দেখা যাইতেছে। আমরা তখন মোটা ভাত মোটা কাঁপড় সংস্থান করিয়া ধর্ম্মালোচনা দ্বারা যে শান্তিতে বর্ত্তমান ছিলাম সে শান্তি অপর কোন্ দেশে কে কবে ভোগ করিয়াছে! নশ্বর জগতের জন্য প্রাণপণে খাটিয়া কি হইবে! ইন্দ্রিয় সুখ যতই উৎকৃষ্ট হউক, উহা ক্ষণিক। যে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া কত শত সংসার-তপ্ত মানব ভূমানন্দ লাভ করিতেছে—বাক্যবাগীশ, তোমাদের কথা শুনিয়া আমরা উহা ত্যাগ করিতে অসমর্থ। সে স্বদেশী আমরা গ্রহণ করিব না যাহার প্রাণ বিদেশ-পর-তন্ত্র; স্বদেশী বক্তৃতা দিয়া বিদেশী ট্যাকসীতে চড়িয়া দরিদ্রের হস্ত পদ ভগ্ন করিয়া বায়ু সেবনের নিমিত্ত পথে ভ্রমণ করিতে আমারা লজ্জা বোধ করি। অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশের নেতা সাজিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। তোমরা নিজেদের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছ ভাবিয়া দেখ দেখি! ভারত মাতার তোমরা সকল সন্তান যখনই একত্রিত হও তখন তোমাদের এমন একটিও স্বদেশীয় ভাষা নাই যাহার দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মনোভাব বিদেশীয় ভাষার সাহায্য ব্যতীত প্রকাশ করিতে পার। আজ যদি সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতে তাহা হইলে তোমরা যখন সকল ভাইয়েরা একত্রিত হইতে তখন পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিতে। আমরা জানি এমন লোকও আছেন যাহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন ইংরাজী ভাষায়—নচেৎ তাঁহাদের মনোভাব যথাযথ ভাবে স্ফূর্ত্তি হয় না। আবার স্বদেশীয় দর্শনবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কতকগুলি আধুনিক ভোগপরতন্ত্র বাক-যুক্তিসম্পন্ন বিদেশীয় মতবাদ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত ভাষার আবরণে এক জাল ধর্ম্মের বিক্রয় করিয়া বহু যশ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছেন। বল দেখি ইঁহারা স্বদেশের উন্নতি সাধক—না স্বধর্ম্ম ত্যাগী, জনসাধারণকে বিপথে পরিচালনকারী দেশ-দ্রোহী বিশ্বাস ঘাতক!

গোঁড়ামী হৃদয়ের সংকীর্ণতার পরিচায়ক বটে কিন্তু তাহাদের একটি নিজস্ব দাঁড়াইবার স্থান আছে, যেথান হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে এবং যে ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া যাহা হউক একটা কিছু জাতীয়তার

গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। যথোপযুক্ত দরজা জানালা না থাকায় স্বাস্থ্যকর বহির্বায়ু সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ বটে কিন্তু তাহাদের একটা মাথা গুঁজিবার স্থান আছে। ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতি বা অবনতি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে অপেক্ষা করে। মানব যখন আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখনই পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খাদ্যের দ্বারা নিজ ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির বা জাতির আত্মবিশ্বাস নাই সে ব্যক্তির বা জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে কি প্রকারে—মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য—আবহের সংঘর্ষে তাহাকে প্রস্তর কাষ্ঠের ন্যায় হাওয়ায় বিলীন হইয়া যাইতেই হইবে। আত্মবিশ্বাসই ব্যক্তির প্রাণ। ব্যক্তিগত আত্মশক্তির বিকাশে জাতিগত শক্তির স্ফূরণ হয়। কিন্তু বহির্দেশ হইতে যদি স্বাস্থ্যকর খাদ্য সংগ্রহ না করিয়া প্রাণ দেহের পুষ্টি সাধন না করা যায় তাহা হইলে প্রাণের উৎক্রামণ অবসম্ভাবী। সকল শক্তিই আত্মাতে নিহিত কিন্তু সেই শক্তিসাধনা পূর্ণ করিতে হইলে তাহার আরম্ভ বহিঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া। দেবতা প্রস্তরাভ্যন্তরে নিহিত—দেবতাকে মূর্ত্ত করিতে হইলে যন্ত্রের প্রয়োজন। যেমন স্বর্ণের স্বার্থকতা কুণ্ডলাদিতে তেম্নি আত্মার স্বার্থকতা তাঁহার অনন্ত মহিমার বিকাশে। সমাধি বা সিদ্ধি অর্থে জড়ত্ব নহে শক্তির পূর্ণত্ব—মুগ্ধ ভারতী, শান্ত শূন্যে পরদা চড়াইয়া নেতির ঝঙ্কারে সেই অসীমের সাম তুলিতে গিয়া স্বীয় বীণার কোমল তন্ত্রী ছিন্ন করিয়া মূক-বৎ অবস্থান করিতেছেন। বিদ্যা সেখানে স্তব্ধ বটে কিন্তু পূর্ণত্বকে বিকাশ করিবার তিনিই প্রথম শিক্ষয়িত্রী। সেই হেতু প্রথম কর্ত্তব্য—প্রতি পল্লীহৃদয়ে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—যেখানকার আদি শিক্ষা হইবে আত্মার মহিমা—যাহাকে লাভ করিয়া পিতা পুত্রকে বলিতে পারিবেন—অভিঃ! অমর করিবার জন্য মাতা স্তন্য দুগ্ধের সহিত শিশুকে পান করাইবেন বেদ-নিঃসৃত অমৃত—নিত্যোঽসি, বুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি! অধোবদন শিষ্যকে কহিবেন গুরু 'ক্লৈব্যমাস্মগম' ক্লীবত্ব ত্যাগ কর—বৎস, ইহা তোমার সাজে না—তুমি যে অমৃতের পুত্র! তুমি যে অবিনাশী!

বিদ্যা যে পূর্ণতাকে উপদেশ করে ধর্ম্ম তাহাকে দেবতারূপে মূর্ত্ত করিয়া তুলে। সেই হেতু বিদ্যা মন্দিরের পার্শ্বে ধর্ম্ম মন্দিরের প্রয়োজন। ধর্ম্ম-দেবতা তাঁহার যমনিয়ম, ত্যাগতপস্যা, পূজাহোম, জপ-ধ্যানের মধ্য দিয়া বিদ্যার অভিধেয় বস্তুকে অনুভব করিতে শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষার ফলে প্রাচীন ভারতে বশিষ্ঠ, রাম এবং ভীষ্মের ন্যায় চরিত্র প্রকটিত হইয়া ভারতভূমি পবিত্র হইয়াছে। আবার এই ধর্ম্মদেবতা তাঁহার বিধি নিষেধের মধ্যদিয়া স্ত্রীচরিত্রে ত্যাগের আদর্শ এরূপ অদ্ভুত রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে সাবিত্রী এবং সীতার ন্যায় চরিত্র জগতের অপর কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম দেবতাকে ইহাই প্রমাণকরিতে হইবে বেদাদি শাস্ত্র কেবল কথার কথা নয়— অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা শ্রীভগবানের বিচিত্রময়ী অপূর্ব্ব লীলা ও নিত্যাবস্থা পঞ্চেন্দ্রিয় অগ্রাহ্য জগতে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহারই সংগ্রহ মাত্র। বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যে যাঁহারা কেবলমাত্র ইতিহাস এবং কাব্যের অনুসন্ধান করেন সেই পল্লবগ্রাহীরা সেই কামধুকার নিকট তাহাই প্রাপ্ত হন কিন্তু উহাতেই উহার মর্য্যাদা নহে। সম্মুখে চন্দন বৃক্ষ দেখিয়া তৃপ্ত হইলে চলিবে না, শাস্ত্রীয় সাধন মার্গ অবলম্বন করিয়া 'এগিয়ে' পড়িতে হইবে এবং সেই ধর্ম্ম জীবনে যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরকাদি নানা রত্নের খনি দেখিয়া পথিক মুগ্ধ হইবেন।

ধর্ম্মই হিন্দুর প্রাণ পাখী। যতদিন পর্য্যন্ত কোন ব্যাধি এই প্রাণ পাখীর সন্ধান না পাইবে ততদিন এজাতির সর্ব্বনাশ করিবার সকল প্রচেষ্টাই বৃথা। অল্পদিনের পরাধীনতায় বা অত্যাচারে ছোট বড় কত জাতি কর্পূরের মত উপিয়া গেল—কিন্তু 'এ জাতটা ম'ল না কেন'! সহস্র বৎসর ধরিয়া ত চেষ্টা করা হইয়াছে—পশু বলের দ্বারা, সমাজে ব্যভিচার সৃষ্টি করিয়া, কৌশলে দেশকে দরিদ্র করিয়া প্রভৃতি নানা ভাবে নানা চেষ্টা দ্বারাও হিন্দু জাতির প্রাণ যায় না কেন? কারণ আমরা সব ছাড়িয়াছি, সব ভুলিয়াছি কিন্তু প্রাণপাখীটাকে আমরা এখনও ছাড়ি নাই। কিন্তু বহিঃশক্তির প্রবল আঘাতে রক্তহীন

দেহের শিথিল মুষ্টি হইতে প্রাণ পাখী প্রায় উড়িয়া যাইবার দাখিল—ষাট কোটী হিন্দু সন্তান ধীরে বিশ কোটীতে পর্য্যবসিত। এমন সময় দেবতা প্রসন্ন হইলেন—দেবমানব রূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মকে নিজেই রক্ষা করিলেন নিজ জীবনে পরিস্ফুট করিয়া। দেখাইলেন ধর্ম্ম একটা ফক্কিকারী নয়—উহার প্রতিবর্ণ সত্য—উহার প্রত্যেক দেবতা সত্য—উহার প্রত্যেক ভাব সত্য—অসত্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তা সেই চালবাজ, মতলবীর ধর্ম্ম প্রচার। ধর্ম্মের আবরণে ভোগ এ ত্যাগ-ভূমি ভারতবর্ষে চলিবে না—ফাঁকি নিজেকে দেওয়া যায়, পাড়াপর্শীকে দেওয়া যায়, সমাজকে দেওয়া যায়, সমগ্র মানুষকে দেওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে দেওয়া যায় না—তিনি ধরিয়া ফেলিবেন। মন্দির, বিহার, চার্চ্চ, ক্যাথিড্রল তৈয়ারি কর ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি উহা ত্যাগের ভিত্তিতে নির্ম্মিত না হয় তাহা হইলে দেবতার আবির্ভাব উহাতে হইবে না—উহার ধ্বংস অনিবার্য্য। দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া দেবতার নামে নিজেদের ভোগসৌধ নির্ম্মাণ যখনই করিবে তখনই তাহা চূর্ণ করিয়া দিতে এ্যাটীলা, মামুদ, কাইজার, প্রভৃতির আবির্ভাব হইবে। ত্যাগের মধ্যে পুনরায় শ্রীভগবান্ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশিত করিবেন বলিয়া—ভোগের আবর্জ্জনা পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য সে সকল পশু শক্তি তাঁহার প্রেরণা, বুঝিতে হইবে।

মানব মনে ত্যাগ ও ভোগের লড়াই চির কালই চলিয়াছে। এ সংগ্রাম প্রবাহকারে নিত্য। মনুষ্য বহু অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছে—ভোগের ফল 'অল্প' এবং ত্যাগের ফল 'ভূমা'। সে যুদ্ধে ত্যাগের জয়ে মানবের পরম শান্তি নির্ভর করে, কিন্তু ভোগ-নাগ তাহার সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া বহুবার মনুষ্য সমাজকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। মহামোহ তাঁহার চার্ব্বাক গুরুর ভোগমন্ত্র বলে বহুবার ধর্ম্মরাজকে পরাভূত করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবারই জ্ঞান সিন্ধু হইতে মায়া মিহিকার সকল কুহেলিকা ভেদ পূর্ব্বক বৈরাগ্য চন্দ্র উদিত হইয়া ভক্তি কৌমুদী দ্বারা মুক্তির দুর্গম পথ আলোকিত করিয়াছে। ভোগবাদ নানাযুগে নানা ভাবে ভক্তি-জ্ঞান প্রাণ বেদান্ত ধর্ম্মকে কলুষিত করিয়াছে। একবার

অতি প্রাচীন কালে নাস্তিকবাদীদের আদি পুরুষ তাঁহার ভোগ-পরতন্ত্র প্রত্যক্ষ যুক্তির সাহায্যে বেদ—'ভণ্ড, ধূর্ত্ত নিশাচর কর্ত্তৃক প্রচারিত' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি ভোগ ছলের সকল আবরণ ত্যাগ করিয়া 'সুখদুঃখময় সংসার হইতে, কাঁটা ত্যাগ করিয়া গোলাপ চয়নের ন্যায় সুখ চয়ন' করিতে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে যতদিন জীবন ধারণ করিতে হইবে ততদিন সুখেই কাটান কর্ত্তব্য—'ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করা উচিৎ'। কিন্তু যখন এই নিরাবরণ ভোগবাদ ভারতীয় ঋষিরা যুক্তি সহায়ে নির্ম্মূল করেন তখন উহা পূর্ব্বমীমাংসার আবরণে 'সহধর্ম্মিণী' এবং 'সোম'কে উপলক্ষ করিয়া স্বর্গে অপ্সরাদি অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয় ভোগাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্যাগ ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার উপক্রম করিয়াছিল। পরন্তু বেদ-ব্রাহ্মণে যে ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত আছে, উহা সাধারণ অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সকলকে নিয়মিত করিবার জন্য। শিশুকে যেমন মিষ্টের মধ্য দিয়া তিক্ত ঔষধ সেবন করান হয় সেইরূপ নানা বিধি-নিষেধের দ্বারা সংযমিত আপাতপ্রতীয়মান ভোগ প্রচার করা হইয়াছিল। উহা বিস্মৃত হইয়া যখন ভোগই ভারতের আদর্শে পরিণত হইবার উপক্রম হয়, তখনই শ্রীব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহা নিরাশ পূর্ব্বক বেদান্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্যাগকেই আদর্শ করিয়া যান। পুনরায় যখন এই ত্যাগ ধর্ম্ম শিথিল হইয়া আসিল তখন শ্রীবুদ্ধ উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কাল দুরতিক্রমনীয়! কালে শ্রীভগবান্ বুদ্ধের অতি-ত্যাগধর্ম্মও মানবের ভোগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভোগরাজ তন্ত্রের পঞ্চ 'ম'-কারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ত্যাগের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সমাজে নানা অকথ্য ব্যভিচারের সৃষ্টি করিল। ইত্যবসরে অন্তঃসারশূন্য ভারতভূমি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যখন মৃত্যুচিন্তা করিতেছিল—তখন ভারতমাতা তাঁহার শ্রীশঙ্করাদি অষ্টাদশ আচার্য্যকে প্রসব করিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য, নানকাদি অতি-মানবেরা জন্মগ্রহণ করিয়া অর্দ্ধমৃত দেশকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

কিন্তু ভারতের এই যুগ যুগ ব্যাপী সাধনা অন্ত পণ্ড হইতে বসিয়াছে! ভোগরাজ ইন্দ্রানুচর বসন্ত আজ সুযোগ বুঝিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতারূপে

ভারতের মঠ, মন্দির, আশ্রম ভাঙ্গিয়া অসুর-ভোগ্য বিলাস-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কাকলীপ্রিয় বসন্ত-সখা মনোভব ভারতীয় ছন্দগীতির মধ্যে প্রতিষ্ঠ হইয়া নিজ কুসুমধনু সিঞ্জন পূর্ব্বক পঞ্চশরে যোগী হৃদয় পুনঃপুনঃ বিদ্ধ করিতেছে—কখন বা কোন্ অজানা দেবসুখের গন্ধর্ব্বনগরী সৃষ্টি করিয়া এই বিরাট যোগীর সিদ্ধ আসন টলাইবার চেষ্টায় উৎফুল্ল হইয়াছে! কিন্তু যোগ-বিঘ্নকারী হে দেবতা-অসুর এখনও সতর্ক হও! যোগীর চক্ষু উন্মিলীত হইতেছে দেখিয়া ভাবিতেছ তোমাদের লীলাবিলাস যোগীর চিত্ত নির্ব্বাণ-পদবী হইতে চ্যুত করিয়া বাস্তব জগতে নামাইয়া আনিতেছে—তোমার সৃষ্ট ইন্দ্রজাল পুরীতে প্রবেশের নিমিত্ত বা তোমার মোহিনী সঙ্গীত উপভোগের নিমিত্ত; না—উহা তোমাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া মহাশ্মশানে তাণ্ডব নৃত্য করিবার জন্য; চাহিয়া দেখ চক্ষে কি সর্ব্ব-বিধ্বংসী অনলের প্রলয় সমাবেশ—উহা তোমার অজানা দেশের হীরক-পুষ্পিত, চির-কৌমুদী-উদ্ভাসিত বিলাসের গন্ধর্ব্ব নগরী পলকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিবে।" ভিখারী সব ত তোমাদের দিয়াছে—তাহার কুবের-ভাণ্ডার সব ত তোমরা লুটিয়াছ! নিজে উপবাসী হইয়া তোমাদের খাওয়াইতেছে—আরে 'ভাবের ঘরের চোর'! শেষে তুমি তাহার ধর্ম্ম কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ!

কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন—বীজাঙ্কুরের ন্যায় ত্যাগ ও ভোগের অভ্যুত্থান ও পতন যখন অনিবার্য্য, তখন কোনটী যথার্থ তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? উত্তরে আমরা বলি—ভোগ ইহকালের বা পরকালের ক্ষণিক সুখ উৎপাদন করিতে পারে সত্য, পরন্তু উহা ত্রিতাপের জনয়িতা। স্বাস্থ্য ও ব্যাধির ক্রম শরীরে যথার্থ বটে, কিন্তু মানবের স্বতঃচেষ্টাই শরীরের ব্যাধি অপসারিত করা। শরীরে ব্যাধি অনিবার্য্য বলিয়া কেহ স্বাস্থ্যকে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ নহে। অমৃতত্বে বা চরমসুখে আমাদের জন্মগত সত্ব আছে কারণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উহা উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং আমাদিগকেই উহার সত্বাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। যেমন কোনও দুষ্ট ব্যক্তি ভোগার্হ জ্ঞানে পণ্ডিতের পুস্তক পেটিকা অপলাভ করে, কিন্তু পেটিকা ভগ্ন করিয়া দুর্বিজ্ঞেয় গ্রন্থরাশি

দেখিয়া হতাশ হয় এবং পরে উহা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া নষ্ট করে, সেইরূপ আধুনিক ভোগবিলাস আমাদের বহুকালের রত্নপেটিকা অপলাভ করিয়া ভগ্ন কমত উহার মধ্যস্থ ত্যাগ, অপবর্গ প্রভৃতি বহুমূল্য মণি অব্যবহার্য্য জ্ঞানে নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছিল। এক্ষণে আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—সেই রত্নপেটিকা যাহা ইদানীং এক অতিমানব উদ্ধার করিয়াছেন—যিনি সকল ধর্ম্মের অবতার তাহাকেই প্রতি পল্লীর ধর্ম্ম-মন্দিরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া—বিদ্যা-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম সাধনা শিক্ষা।

যেমন ধর্ম্মমন্দিরের এক পার্শ্বে পরা-বিদ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে সেইরূপ অপর পার্শ্বে অপরা-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। যেমন কারুকার্য্য অট্টালিকার শোভা সম্পাদন করে, প্রাচীর আবার সেই সুন্দর প্রসাদকে রক্ষা করে—সেইরূপ অপরা-বিজ্ঞান ধর্ম্মও বিদ্যার শোভা সম্পাদন এবং রক্ষা করে। আবার যেমন উদ্যানে আগাছা জন্মিলে তাহা নিড়াইয়া দিতে হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম বিদ্যোদানে কুসংস্কার, কুপ্রথারূপ আগাছা জন্মিলে তাহা বিজ্ঞান-নিড়ানি দ্বারাই উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে। আর আধুনিক বিজ্ঞান-কুশলীদের প্রধান কর্ত্তব্য—ভারতেতর দেশসমূহহইতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আনয়ন করিয়া কৃষি, শীল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিয়া ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায় স্বরূপ এই বিরাট দেহের পুষ্টিসাধন। দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য ছুঁচ, সুতা, কাপড়, কাগজ, পেন্‌সিল, সেলাইয়ের কল, টাইপ রাইটার হইতে আরম্ভ করিয়া টেলিফোঁ, টেলিগ্রাম, রেলওয়ে, ষ্টীমার, মোটর, ট্রাম, তারহীন বর্ত্তাবহ, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি বিজ্ঞানের আধুনিক চরম পরিণাম সকল দেশে প্রস্তুত ও প্রচলনের জন্য লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানসেবীদের জীবনের একমাত্র ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রত পালন করিতে হইবে সহরের বৈদ্যুতিক আলোকে বসিয়া নয়, অন্ধকারময়ী পল্লীর নিভৃতকুঞ্জে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া। পল্লীতেই ভারতের প্রাণ—সভা, সমিতি, হাঁসপাতাল, কলেজ, স্কুল, মঠ, মন্দির যাহা খুলিতে চাও তাহা পল্লীতেই খুলিতে হইবে; তাহা হইলেই অনভিজ্ঞ পাড়াগেঁয়েরা তোমাদের

উচ্চ চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া তোমাদের সমকক্ষ ও সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।

অনেকেই ভয় পান, যদি পাশ্চাত্য অপরা-বিজ্ঞান আমাদের ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিত্তি শীথিল করিয়া উহার ধ্বংস সাধন করে। আমরা বলি ভয় পাইবার কিছুই নাই—যাহা সত্য তাহা অবিনাশী, তাহার প্রকটন অবশ্যম্ভাবী; আর যাহা অসত্য, জীর্ণ তাহা নষ্ট হইলে ক্ষতি কি? অসত্য স্থলে যদি নব সত্যের প্রকাশ ঘটে, জীর্ণের স্থলে যদি নূতন আসে তাহাতে ভয়ের কোনও কারন নাই। শ্রীভগবান্ ভারতীয় এবং ভারতেতর প্রদেশের সকল মন্দিরের বহুকালের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ভস্ম করিবার জন্য পাশ্চাত্য রজঃবহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছেন। এই প্রলয়ানল জগতের সকল অব্যবহার্য্য আবর্জ্জনা ভস্ম করিয়া সত্যস্বর্ণকে আরও উজ্জ্বল করিয়া প্রকটিত করিবে। এক্ষণে আমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য এই যে প্রতি পল্লীতে ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের পার্শ্বে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া অধিষ্ঠাতৃর নিকট আমরা মহিমাকে লাভ করিব। যে জাতি সমগ্র দেশটাকে একটা বিরাট মঠে পরিণত করিতে চায় সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য, আবার যে জাতি সমগ্র দেশটাকে একটা বিপুল দুর্গে পরিণত করিতে চায় সে জাতিরও ধ্বংস অনিবার্য্য। সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্যা ও জড়বিজ্ঞানের নিয়মণ আমাদিগকে করিতে হইবে ধর্ম্ম-মন্দিরে। জড় সমুদ্র মন্থন করিয়া নানা ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায় সত্য, কিন্তু উহা হইতে যে কালকূট উত্থিত হইবে তাহাকে লীলায় কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য যে তপস্যার প্রয়োজন তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। পুনশ্চ গরল প্রাণ সংহার করে বটে, কিন্তু উপযুক্ত অনুপান সংযোগে সুধার সমতুল কার্য্যকরী হয়।

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।)

(১)

মনুষ্যত্ব কি ?

যদি প্রশ্ন করা যায় পশু হইতে মানবের বিশেষত্ব কি, তবে সহজ উত্তর এই যে হিতাহিত বিবেচনায় ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে। কিন্তু প্রশ্নটি জটিল—উত্তরও বিশদ হয় নাই। অনেক স্থলে দেখা যায় মানুষ যেখানে বিবেচনা করিয়া হিত অপেক্ষা অহিতেরই পক্ষপাতী হয়, নিম্নস্থ প্রাণী সেখানে স্বাভাবিক সংস্কারে হিত-পথই গ্রহণ করে। ধর্ম্ম-বুদ্ধি বলিতেও অনেক সময় ভয় ও দুর্ব্বলতা-প্রসূত সংস্কারই বুঝায়—স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় বুঝায়, অথবা কতকগুলি বিধি-নিষেধের অনুসরণ বুঝায়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম এই সংজ্ঞা মানুষ নানা সময়ে নানা অর্থে ব্যবহার করে।

দেশভেদে ও কালভেদেও ধর্ম্ম নানা দেশে অবস্থানুযায়ী নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে ; কিন্তু এক ভাবে বিচার করিলে মানুষ মাত্রই সমধর্ম্মী—সকল মানবের একই আদর্শ। মানুষ যদি নিজেকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করে তবে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, জগতে মানবের একই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আছে—তাহা মনুষ্যত্ব বা আধ্যাত্মিকতা।

প্রত্যেক মানবের জীবনই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী বিভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; একদিক্ দিয়া সে জড়ধর্ম্মী, অপরদিক্ দিয়া সে প্রাণধর্ম্মী। ক্ষুধা তৃষ্ণা, আরামের আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুভীতি এইগুলি জড় ধর্ম্মের লক্ষণ, এবং যে মহত্তর ভাবের ক্রম বিকাশে মানব এই জড়ধর্ম্মগুলি তুচ্ছ করিতে পারে তাহাই মানবের প্রাণধর্ম্ম—মনুষ্যত্ব বা আধ্যাত্মিকতা।

মানুষের বিকাশের নিম্নাবস্থায় সে নিম্নতর প্রাণীর ন্যায় প্রাকৃতিক

জড়জগতের আদর্শগুলিই গ্রহণ করে। যতক্ষণ না সে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আস্বাদ লাভ করে, ততক্ষণ সে অপর প্রাণী শ্রেণীরই অন্তর্গত একটী প্রাণী মাত্র—তবে কিঞ্চিৎ উন্নততর প্রাণী। যেমন কীট পতঙ্গ হইতে মেরুদণ্ডী জীব উন্নততর, এরূপ স্থলে সেই হিসাবেই মানব অন্য প্রাণী অপেক্ষা উন্নততর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখচেষ্টা অন্য প্রাণীতে যেরূপ মানবেও সেইরূপ; তবে বুদ্ধির ধারা মার্জ্জিত হইয়া কিঞ্চিৎ সংস্কৃতরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। অন্য জীব অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ মানব—যাহা তাহার পক্ষে সুবিধা, যাহাতে সুখের পথে অবাধে চলিতে পারা যায়—যাহাতে অসুবিধা ও কষ্টের হাত এড়াইতে পারা যায়—তাহার প্রচলিত নীতিগুলি সেই প্রণালীতে গড়িয়া লয়। তাহার সামাজিক নিয়ম—লোকানুমোদিত সহজ পথে আত্মস্বার্থের স্রোতের অনুকূলে নৌকা বহিয়া যাওয়া; জড়জগৎ অথবা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণতঃ তাহাকে ইহার উপরে লইয়া যায় না।

সেইজন্য মানবের সাধারণ জীবনে ও আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক প্রভেদ। এ প্রভেদ পরিণামের প্রভেদ নহে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুর প্রভেদ। সাধারণ জীবনের একটা সীমা আছে,—তাহার উন্নতি সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। যেমন, যন্ত্রও বিজ্ঞানবলে সংশোধিত হইয়া উন্নত হইতে উন্নততর হইতেছে তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা অনেকগুণে বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাপি সে যন্ত্রই রহিয়া যাইতেছে। কিন্তু মানবে জড়ত্বও আছে, আবার ব্রহ্মত্বও আছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটী অংশে মানবজীবন গঠিত—একটী তাহার যান্ত্রিক জীবন, আর একটী স্বাধীন জীবন। একদিক্ দিয়া জড়শক্তি তাহাকে গতানুগতিক জীবন যাত্রার পথে পরিচালিত করিতেছে, অপরদিক্ দিয়া মানবে মনুষ্যত্বরূপে প্রকাশিত এক চৈতন্যময়ী শক্তি জড়শক্তির দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মশক্তিতে আপনাকে ক্রমশঃ পূর্ণতর স্বাধীনতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা—দর্শন শাস্ত্রের এই সমস্যা অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমরা এই মুহূর্ত্তে যাহা করিতেছি,

তাহা নিজের ইচ্ছায় করিতেছি অথবা ইহা আমাদিগকে করিতে হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল, আমরা কেবল যন্ত্রবৎ যথাযথ তাহাই করিয়া আসিতেছি—এ সমস্যা বোধ করি তর্কের দ্বারা মীমাংসিত হইবার নহে। যদি হইত তাহা হইলে ইহা লইয়া দর্শন শাস্ত্রে এত তর্ক, বিতর্ক থাকিত না। তবে সহজ ভাবে এটুকু বুঝা যায়—আমাদের প্রত্যেক কার্য্য বা ইচ্ছা যদি পৃথক করিয়া বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহার মধ্যে স্বাধীনতার চিহ্ন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে সময়ে যে কার্য্য করি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তাহা এমন ভাবে নির্ভর করে যে, তাহার মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান আবার পূর্ব্বের কার্য্য ও অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ ব্যক্তিই জীবনে এমন কোন কার্য্যের উল্লেখ করিতে পারিবেন না—যে কার্য্যের সম্বন্ধে তিনি বলিতে পারেন আমি ইহা স্বাধীন ভাবে করিয়াছি। কিন্তু এরূপ অংশতঃ বিচার না করিয়া সমগ্র জীবনটী অখণ্ডভাবে বিচার করিয়া দেখিলে—দেশ-কাল ও নিমিত্তের উপরেই কার্য্যের দায়িত্বের ভার দিয়া মানব সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। তাহার বাহিরের কার্য্য-পরম্পরা হেতু-পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া যান্ত্রিক ভাবে চলিয়া যায় বটে, কিন্তু এই কার্য্য-শৃঙ্খলের মূলে সম্ভবতঃ তাহার কতকটা স্বাধীনতা আছে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তীব্র অনুতাপ মানব মনে ক্ষণে ক্ষণে এই ভাব প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে—'এরূপ না করিয়া আমি অন্যরূপও করিতে পারিতাম'। স্বাধীন ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব না থাকিলে মানব মনে ঐরূপ ভাবের ছায়াপাত হইতে পারিত না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় ব্যক্তিগত বিশেষত্বে একটী আদর্শ গঠন করিয়া কার্য্যে তাহা প্রকাশ করে। এই আদর্শগঠন ও চরিত্র সম্বন্ধে নিজের নিকটে সে দায়ী। ঘটনাবলীর সংশ্রয়ে ও সাময়িক অবস্থানুসারে যদিও চরিত্র মাত্রই পরিস্ফুট হয়, তথাপিও যখন আমরা নিজের চরিত্র ও আদর্শ নিজে স্বতন্ত্র ভাবে গঠন করিতেছি তখন তাহাতে কিছু না কিছু স্বাধীনতা আছেই। একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার

সঙ্ঘাতে চালিত দুইজন ব্যক্তির কার্য্য প্রণালীতে যখন ঐক্য দেখা যায় না—তখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইতেই হয়। এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের দ্বারাই—মানবের যে মনুষ্যত্ব বা স্বাধীনতা বলিয়া একটী বিশেষ অধিকার আছে—তাহা প্রকাশ পায়।

আধ্যাত্মিকতা কি? এক কথায় ইহার উত্তর—যে মহান্ ভাব শত সহস্র তুচ্ছতার উর্দ্ধে মানবকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে—তাহাই মনুষ্যত্ব বা আধ্যাত্মিকতা। দেশ-কাল-নিমিত্ত পরিচালিত যান্ত্রিক জীবনের অতিরিক্ত সীমাহীন অনন্ত জীবনের নব নব রূপবৈচিত্র্যে আধ্যাত্মিকতাই প্রকাশ-স্বরূপ। যেমন সূর্য্য হইতে বিচিত্র বর্ণে আলোক কণা বিচ্ছুরিত হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিকতা হইতে ভক্তি, প্রেম, বীর্য্য, দয়া ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণের ন্যায় নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশ পাইতেছে. এবং সেই বৈচিত্র্যের প্রত্যেক স্পন্দনই নব নব ভাবে নূতন করিয়া জগতকে জানাইতেছে—মানুষ মানুষ—মনুষ্যত্বই তাহার প্রাণধর্ম্ম, জড়ের দাসত্ব কেবল বহিরাবরণ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দের মানসী-নারী।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী।)

শিরোনামা দেখিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিতে পারেন—সুতরাং একটা স্পষ্টতার প্রয়োজন বুঝিয়া প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি, স্বামীজির মনে নারীত্বের যে আদর্শ পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহাকেই তাঁহার মানসী নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। এই সন্ন্যাস-কেশরীর স্ত্রীজাতি বিষয়ক মনস্তত্ব মধ্যে, শুদ্ধ নিষ্পাপ অনাবিল ত্যাগীর জীবনের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ও সম্বন্ধের প্রসার কতটা তাহা লক্ষিত হইবে।

অতীতের অনুশাসন-বাক্যাবলীর মধ্যে আত্মনির্দ্দেশ লাভ করিতে সচেষ্ট হইলে বিংশ শতাব্দীর জাগরণোদ্দীপ্ত নারীর মন স্বতঃই দিশেহারা হইয়া পড়ে। নিন্দা ও স্তুতি, ভরসা ও অভিসম্পাত পাশাপাশি এমন ভাবে সাজান আছে যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা ইহার মীমাংসা সত্যই কঠিন। গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হয়—আমাদের পুরোবর্ত্তিনীরা সীতা দয়মন্তী মূর্ত্তিতে তোমাদের জীবন তরুতে মালতী চামেলী যূথিকা ফুটাইয়া গেলেন তবুও তোমাদের মন পরিপূর্ণ হইল না, তবুও তাহা যথেষ্ট হইল না যে আমাদের ভাগ্য সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তোমরা করিয়া ফেল! সকল সত্বেও তোমরা সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত করিয়া আসিতেছ! পৃথিবীর অপরাপর প্রান্তে আমাদের ভগিনীরা আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই উদ্যোগী হইয়া করাইয়া লইয়াছেন। আত্মিক উৎকর্ষে দৃষ্টি আকর্ষনের পরিবর্ত্তে বাহিক শক্তির সহায়ের অপর পন্থাটাই তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন—সেটা কি তবে গুণ? তোমাদের কাছে তাহাই কি যথাযোগ্য ব্যবস্থা?

কিন্তু পরিতাপ অরণ্যে রোদন। বরং শ্রেয়ঃ ও চোরাবালির দিকে না যাওয়া।

যখন বর্ত্তমানে এমন সব আধিকারিক পুরুষের আবির্ভাব দেখিতেছি যাঁহারা অতীতেরই সমস্ত মহিমাকে জীবনে প্রকাশ দিতে পারিতেছেন, তখন আর জীর্ণ পত্রাবলীর মধ্যে অন্বেষণ কেন? আমরা তাঁহাদেরই মনোমধ্যে আত্মনির্দ্দেশ লাভ করিব—বিশ্বাস করিব আমাদিগের জন্য নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

ওগো! ঢাকিয়া ফেল অতীতের সেই সকল সুললিত সুবিন্যস্ত বাক্যবলী গ্রথিত ছন্দঃবল্লরী—যাহা আমাদের এই দেহটা যে মদনের অধিরোহন পীঠ তাহারই বর্ণনায় কবিত্বের অমরকীর্ত্তি যাচ্ঞা করিয়াছে। ক্ষণিকের জন্য একটু নিবৃত্ত কর সেই সকল বিধি-ব্যবস্থা দাতাদের বাক্যাবলী—যাহাদের মন লোলুপ আগ্রহে আমাদের দাসত্ব আর অধীনতার লৌহনিগড় কল্পনাতেই বিভোর হইয়া জীবনের চতুর্দ্দিকে তাহার

মায়াজাল রচনা করিয়াছে—আর কোনও দিক দিয়াই আমাদের কথা চিন্তা করে নাই, আমাদের আর কোনও ধর্ম্ম দিতে সম্মত হয় নাই।*

আর কি সত্যের সিংহ গর্জ্জন আমাদের কাণের কাছে কেহ স্তব্ধ করিতে পারে যে মানুষের মধ্যকার মানুষ এই দেহটা নহে;—দেহ তাহারই প্রান্তবিলম্বী একটী ছায়া যেটাকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি আপনার রঙ্গময়ী বর্ণবিচিত্র প্রকট করিতেছে। দেহাতীত অথচ দেহারূঢ় এক পরম সত্বাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। সেখানে নারী নাই, নর নাই, কাম-মোহের অস্তিত্ব নাই।—সে সকলের অবস্থান এই প্রকৃতি মধ্যে।

এখন যে আমরা দেখিতেছি বিশ্ববিধানচ্যুত কৃত্রিম বিধিব্যবস্থাই মানবের অবলম্বন, যে আবহাওয়ায় জীবন-উদ্যানে ছত্রক জন্মিতে পারে, মহীরুহ জন্মে না—তাহারই দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। ইহা কত দিনের সৃষ্টি কেমন করিয়া বলিব?—বুঝিতেছি আমাদের অবলম্বন-স্থান বিলুপ্ত। আমাদের পথও কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, আমাদের আশা "নলিনীদলগত-জলমিব", ভরসাও তদ্বৎ।

অতীত লেখমালায় যখন ভূমিকম্প বিদীর্ণা বসুন্ধরার মৃত্তিকা রাশির মত তত্ত্বে ও স্বার্থে বিশৃঙ্খলতা ও বিপর্য্যস্ততার মধ্যে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত তখন সে ভগ্নস্তূপ মধ্যে অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হইতে দোষ কি?—অতীতের সমস্ত মহিমা যাঁহাদের চরিত্রে প্রকট তাঁহাদের মনই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, আমরা তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ বর্ত্তিনী হইব, এ কথার এখনও পুনরুক্তি করিতেছি।

অর্থাৎ বলিতেছি জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আমরা এই নর জীবনেরই যে অন্তর্নিহিত শিবত্ব তন্নির্দ্দেশানুযায়ী স্থির করিব, দশসহস্র বৎসরের প্রাচীনত্বের মোহে বিস্মৃত হইব না। জানি যাহা আমাদের যোগ্য

* কিন্তু অতীতের ভারতীয় ছন্দ-বল্লরী নারীজাতির কেবল দৈহিক মাধুরী বর্ণনায় আবদ্ধ ছিল না।—উহা তাহার দেবীত্ব ও মাতৃত্বের আরাধনায় মুক্ত হইয়াছিল এবং আধুনাও হইতেছে।—উঃ সঃ।

তাহার বিধান আমাদের মধ্যেই থাকিবে, যদি কোনও জাগ্রতশক্তি আমাদের মাথার উপর নিয়ন্তারূপে সত্যই অবস্থান করে—সে যদি চালাইবার হয় চালাইবেই।

স্বামিজী অথবা ঠাকুরের মধ্যে জীবনের উপরকার সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব মুছিয়া গিয়া, সকল মানুষের অন্তর দেবতা যে জীবন রচনা করিতেছেন, যে জীবন বৃহতের, যে জীবন অনন্তের, তাহারই উদ্বোধন ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ স্পষ্ট কথায়, উপরের সেই শক্তি তাঁহাদের মধ্যে সেই সব মীমাংসা যুগের সত্য নিজস্ব করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যাহার সন্ধানে অতীতের চোরাবালিতে পড়িয়া আমরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি।

ঠাকুরের সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ স্থগিত রাখিলাম,—তিনি ত একটা মূর্ত্তি নহেন, তিনি সমস্ত মূর্ত্তি—সমস্ত ভাবের মধ্যে আত্মা কেমন করিয়া সামঞ্জস্য আনে তাহারই নিদর্শন। তিনি মানুষ নহেন, মানুষের ভিতরের সত্যটা।

কিন্তু বিবেকানন্দ যে তাহাই,—এ কথা বলিতে পারি না। সেখানে আত্মজ্ঞানের গভীরতায় আত্মস্বাতন্ত্র্য ডুবিয়া দিশেহারা হয় নাই—নিষ্কাম অনাশক্তির মধ্যেও কর্ম্মোত্তেজনা অব্যাহত ছিল। আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, চেষ্টা ছিল, মনও ছিল। ঠাকুর মানুষের আদর্শ—বিবেকানন্দ আদর্শ মানুষ। অর্থাৎ মানুষ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য যাহাকে লক্ষ্য করিবে ঠাকুর তাহাই, আর মানুষ যেমনটা হইলে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে বিবেকানন্দ তাহাই।

তিনি সন্ন্যাসী, কিন্তু চাহিয়া দেখ এই সন্ন্যাসীর ভিতরটায়—সেখানে জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা, স্বর্গ মর্ত্ত আলোড়ন করিয়া কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের উত্তেজনা,—এই সংসারের এই সাংসারিক জীবেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। অন্তরে সেই নিস্তব্ধতা সেই শান্তি, সেই ক্ষান্তি, যাহাকে পাইলে মানুষ নির্জ্জন গিরিগুহায় আপনাকে সমাহিত করিয়া অনন্ত কালের জন্য জগতের কথা বিস্মৃত হয়, আর বাহিরে তীব্র বিদ্যুৎশিখার মত দেশব্যাপী জড়তা আবিলতার মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া বেড়াইবার প্রয়াস।

ইহার হেতু কোনও অহংকার নহে, কোনও প্রতিজ্ঞা বিশেষ নহে কোনও অভিসন্ধিও নহে।—ইহার হেতু তাঁহার আপনারই অন্তর্গূঢ় সিদ্ধস্বভাব।

ভক্তেরা নাম দিয়াছে সন্ন্যাস-কেশরী কিন্তু অতবড় কেশর পরিশোভিত নামের মধ্যদিয়া এই আধিকারিক পুরুষকে চিনিবার সুবিধা হয় কিনা জানি না। আমি এক কথায় তাঁহাকে চিনিতে চাই,—তিনি বৈরাগী। এ জগতে তিনি আত্মস্বভাব প্রতিবিম্ব দর্শন দুর্লভ দেখিলেন, তাই মিলনের আশায় উৰ্দ্ধমুখী হোমাগ্নি শিখার মত আপনাকে অনন্তের পানে মেলিয়া ধরিলেন। (God-consciousness) ভাগবৎ-উদ্দীপনা যে কি সে জ্ঞান ব্যতিরেকে এ কথা মানুষে ত বুঝে না। মুক্ত-আত্মা ভিন্ন সকলের বুঝা সাধ্যায়ত্ব নহে। কেমন করিয়া যে তিনি জগতেরই থাকিয়া জগতের সঙ্গে, জাগতিক সম্পর্কে মিশিলেন না, কেবল মলয়ার উচ্ছ্বসিত হিল্লোলের মত প্রান্ত হইতে প্রান্তাবধি পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়া গেলেন, এক কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের অবিরত চেষ্টায়,—এইরূপ জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা হইতে পারে, জগৎ যেন এক বহুকালের অযত্ন-পরিত্যক্ত জীর্ণতরু, যে আসে সে ইহার শাখা পত্র ছিন্ন করে—ক্রমবিরল উৎপাদিকা শক্তি-সম্ভূত ফলাস্বাদ উপভোগে তৎপর হয়—অচিরেই যে তাহার যথাযোগ্য পরিচর্য্যার আবশ্যক ভ্রমেও তাহা মনোমধ্যে স্থান দেয় না। তিনি সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া একাকী আপন মনে ইহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে তাঁহার মত করিয়া দেখিতে শিখিলে উপলব্ধি হইবে,—তাঁহার জ্যোতিঃর তুলনায় এত বড় বৈভব-বৈচিত্রশালী জগতের সম্পদ্-ছটা কত তুচ্ছ—কত তুচ্ছ! জগতের এই বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ অস্থির প্রকৃতির প্রবাহ মাত্র। ইহার মধ্যে কিছুই নাই—সমস্তই নিশার স্বপ্ন সদৃশ! সত্য সে কথা। কিন্তু কেন সত্য?—সত্য এই জন্য যে ইহাদের মধ্যে প্রাণের চিরস্থায়ী তৃপ্তি কোথায়? তা যদি না পাইলাম তবে ইহাদের নির্ভর করিব কেমন করিয়া? মত্ত আশার উৎফুল্লতায় সাধের উদ্যান সাজাইয়া আবার আমিই ত পরদিন স্বহস্তে তাহাতে আগুণ ধরাইতে পারি। তৃপ্তি

পাইব ভরসায় যাহাকে রচিয়াছি তৃপ্তি দিতে অক্ষম হইলে সে তখন আমার কে ?

আপনার দিক হইতে প্রাণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত তৃপ্তি আর জগতের অতৃপ্তি দূর করিবার জন্য ততোধিক অতৃপ্তি· ইহাই স্বামিজীর বস্তুতন্ত্র। তিনি জগতের চঞ্চলত্ব বুঝিয়াছিলেন,—এখানে শান্তির আশা করেন নাই—ইহাই বৈরাগীর বৈরাগ্য। আবার এই অশান্তির মরুপ্রান্তরে শান্তির প্রাবৃট্ মেঘ সম্ভারে আপন আবেগে ফুলিয়া উঠিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার বন্ধন।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়

লভিব মুক্তির স্বাদ—

সে স্বাদ কি স্বাদ তাহা তিনি জানিতেন। জানিতেন 'বৈরাগ্য সাধনের' মুক্তি মুক্তি নিঃসন্দেহ, কিন্তু চরম মুক্তি নহে। বন্ধনের ভয়ও বন্ধন। সে ভয় অতিক্রম করিয়া মুক্তির আরও সুদূর বিরত পরিধিমধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়া তাহাই চরম মুক্তি।

এই মুক্তি নারীর সংসর্গে সঙ্কুচিত হইবার নয়,—সান্নিধ্যে ভীত হইবার নয়। ভয় বরং অপরদিক হইতে। নারী উপলক্ষ্য করিয়া যে বন্ধন,—নারীর প্রতি আসক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে মোহ, সে সমস্তই এই মুক্তির সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হইবার কথা। সংসার তাহার কামিনী কুহক রক্ষা করিবার জন্য এইখানে সন্ন্যাসকে প্রতারিত করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ন্যাস অপরিপক্ক। সন্ন্যাসের প্রকৃত অবস্থা আসিলে সন্ন্যাসী তখন সমস্ত কথাই বুঝিতে পারেন। নামই যখন থাকে না তখন সুনাম আর কুনাম কি! তথাপি এমনি একটা কল্পিত আবেশ সংসারের বিধান মানাইয়া লয়। কিন্তু যে মুক্ত সে যদি সকল বিধানের মূল বিধানকে একৈক শরণ না করিল তবে তাহার মুক্তি তখনও সময় ও সাধন সাপেক্ষ।

নারী হইতে বিবেকানন্দ চিরকাল স্বতন্ত্র, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্যের একটা বিশিষ্ট রূপ আছে,—একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে। সে কাহারও অনুকরণ নহে—আপনার তপস্যা হইতে অভ্যুত্থিত। নারীর সহিত যে তিনি আপনার

ভাগ্য জড়িত করেন নাই, সংসারের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারেন নাই—তাহারই ফলস্বরূপ। সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত ছিলেন—নারী হইতে মুক্তি তাহারই পরিণাম।

—নারীকে নারী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যখন মুমুক্ষুত্বের যুক্তি হয়, তখন বুঝিতে হইবে মুমুক্ষুত্বের মধ্যে ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছে। সে শীঘ্রই অপর একটা কিছু রূপান্তর ধরিবে। তাহাকে প্রত্যাখ্যান কর, পরিত্যাগ কর, তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে চলিয়া যাও, যদি দেখ সে তাহার বিকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। সত্যই ত এমন করিয়া জড় মনের বোঝাবহন পুরুষ ত আপনার জাতিগত স্বভাব করিয়া লইতে পারে নাই। এমন স্বচ্ছন্দে দুইহাত বাড়াইয়া, আষ্টে পিষ্টে গলায় মোহের ফাঁস পরিয়া, নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার মনে পুরুষের জাতিটাত বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহার আপনার গুণেই স্নেহ তাহাকে সংসার সৃষ্টির বার আনা উপাদান রূপে কাজে লাগাইয়াছে।

ত্যাগ করিতে হইবে এই সংসার, যাহার ভাব, ভঙ্গী, দৃষ্টির প্রসার, ভগবান লাভের অন্তরায়। বস্তুতঃ আমরা এইদুই জাতি পরস্পর কেহই কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারি না। এ এক বিচিত্র রসায়ন। উভয় স্বভাবের সংমিশ্রণেই পরিপূর্ণ মনুষ্য স্বভাব গড়িয়া উঠিবার।

এ কথা অনেক প্রবন্ধে অনেকবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, জগতে যেখানে যখনই নবসৃষ্টি হইয়াছে, এই মিলনের ফলেই হইয়াছে। দেহে প্রাণে মনে আত্মায় সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বরূপে পরিপূর্ণভাবে যে মিলন তাহাই এই উভয় জাতির প্রকৃত মিলন। ঊর্দ্ধমুখেই হউক আর নিম্ন মুখেই হউক মিলন একদেশ মুখী হইয়া একটা কেন্দ্রে ঝুঁকিয়া পড়িলেই প্রলয়ের সূত্রপাত।*

---

* আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এক আত্মশক্তিরই ক্রমবিকাশ বা সঙ্কোচের অভিনয়। মানবত্ব সেই ক্রমবিকাশের উর্দ্ধগতি বিশেষ। এমন কেহ দাবী করিতে পারেন না যে মনুষ্য সমাজের—যেখানে সাধারণতঃ সর্ব্বাবয়ব মিলনের ফলে নব সমাজ বা জাতির উদ্ভব হইতেছে—প্রতি নর নারীকেই তাহার উর্দ্ধগতির স্রোত নিরোধ করিয়া সাধারণ সর্ব্বাবয়ব মিলনে যোগ দিয়া আত্মার ক্রমবিকাশকে স্থিতিশীল করিয়া ফেলিতে

জীবনের প্রথম আশ্রমকেই শেষ পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া মনুষ্য মানুষ হিসাবে জীবনের কোনও সার্থকতা লাভ করে না। জীবনের মধ্যদিয়া ভগবচ্ছক্তির প্রকাশে সে জগতকে একটা সার্থকতা আনিয়া দেয়। এরূপ প্রলয়ের সূত্রপাতে এমনি সার্থকতা জগতের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার অভাবে প্রলয় মহাপ্রলয়ের রূপ ধারণ করে। বিবেকানন্দের জীবনটা সত্য। তাঁহার আবির্ভাবের একটা উপলক্ষ্য সত্যই উদ্ভূত হইতেছিল সে স্পষ্টই বুঝিতেছি। আজিও যাঁহারা তাঁহার জীবনটাকে দেহের ধ্বংশে সমাপ্ত হইতে না দিয়া তাঁহারই সেই ইচ্ছাশক্তির প্রবাহমুখে আত্ম সমর্পণ করিবেন, তাঁহার সত্যটা যাঁহাদের মধ্য দিয়া ক্রমঃপ্রকাশিত রূপে জগতের সম্মুখে পরিস্ফুট হইবে, তাঁহাদেরও জীবন ব্যর্থ হইবার নহে। সে উপলক্ষ্য এখনও বিদ্যমান।

উপলক্ষ্যটা সবদিক দিয়া বুঝান এক প্রবন্ধের কলেবরে অসম্ভব চেষ্টা। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই উপলক্ষ্যের একটা দিক্ বুঝান। তাহারই আমি প্রয়াস পাইতেছি। দেখাইতেছি এই সন্ন্যাস কেশরীর জীবনের ব্রতেরই একটা অঙ্গ ছিল মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করা। তিনি তদনুষ্ঠিত অপর সকল চেষ্টার অনুপাতে সম্মান করিয়াই এই

হইবে। কারণ মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব বর্ত্তমান তাহার রাজ্য ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া যখন নর-নারী মনোরাজ্যের খুব উচ্চস্তরে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের তীব্র চিন্তার ফলে দেহেতে আত্মবুদ্ধির বিলোপ হইতে থাকে ; এবং যখন তাহারা মনো-রাজ্যও অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে তখন তাহারা রক্তমাংসের খাঁচাটা দেখিয়া হাস্য করে। নরনারী যখন পশু-রাজ্যে ভ্রমণ করে তখনই তাহার দৈহিক মিলন সম্পূর্ণ হয় এবং কিঞ্চিৎ ভাবের মিলনও ঘটে, কিন্তু যখন তাহারা তদুর্দ্ধে মনোরাজ্যে বিচরণ করে তখন তাহাদের ভাবের মিলন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু দৈহিক সকল বিষয়ই কমিয়া যায় ; পরে যখন তাহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহাদের আত্মার মিলন ঘটে :—তখন হয় তাহাদের নরত্ব বা নারীত্বের জ্ঞান, বা জাগতিক সকল ভাব, এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করে, আর না হয় সকল দেহ দেবতা-বিগ্রহে, সকল ভাব ঈশ্বরীয় লীলায়, বা সকল আত্মবুদ্ধি বিশ্বাত্মবোধে পরিসমাপ্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে।—উঃ সঃ।

চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন সুতরাং কেহই বলিতে পারে না যে তিনি সেই শ্রেণীর সন্ন্যাসী যাহারা নারীমুখ দর্শন পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন।

নারীর দুর্দ্দশা অধোগতির সর্ব্বপ্রধান কারণ নারী ও নরের সর্ব্বতোমুখী মিলনের অভাব। মিলন নিম্নমুখী হইয়া দেহের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছে। তাই তদুপযুক্ত মনস্তত্ত্ব পুরুষানুক্রমে অনুসৃত হইয়া সংস্কারটাই আজ তদ্ভিন্ন অপর কিছু নহে। তদ্ভাব পুষ্ট শাস্ত্র—তাহার কথা আর উল্লেখের প্রয়োজন কি? এই মিথ্যার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মত সত্যবীরই সংগ্রামে দাঁড়াইতে পারেন, যাহার সঙ্গে মিথ্যার এতটুকুও লাগিয়া আছে তাহার দ্বারাও সম্ভব নহে। তাঁহার মত পরিপূর্ণ বিরুদ্ধতী, বর্ত্তমান মিলনকে মিলন বলিয়া বাহিরেও যেমন অস্বীকার, অন্তরেও তেমনি তাহার সমস্ত প্রয়োজন মুছিয়া ফেলা,—এ ভগবানের নিজের হাতের কাজ মানুষের নিজের সৌখীন খেয়াল নহে।

এই একদেশ-দর্শী মিলনকে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ সর্ব্বতোমুখী করিয়া তুলিবার জন্য যেমন পরিশ্রমে তিনি পথের সন্ধান করিয়াছেন তেমনি উৎসাহের সহিত আঘাতও করিয়াছেন সেই মনোবৃত্তিকে যাহা এই ভ্রমকে ধরিয়া আছে। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহার জীবনটা তাই বর্ত্তমান অবস্থার নারীর উপর রূঢ়তায় পরিপূর্ণ। তাঁহার ব্যঙ্গোক্তির কষাঘাত হিতৈষণার প্রবল অনুযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তিনি ধ্যানলোকে সন্ধান পাইয়াছিলেন গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, সেই সাবিত্রী সুভদ্রার স্তিমিত অগ্নিরাশি ইহাদের বক্ষ হইতে নির্ব্বাপিত হয় নাই, উপরের ভস্মস্তূপাবরণ উন্মোচিত করিতে পারিলে আপন তপস্যায় ইহারা আপনার পথ করিয়া লইবে। ইহাদের অন্তরের মধ্যে যে অন্তর্গূঢ় মৌন শক্তি আছে, তাহা ব্রহ্মাণ্ড টলাইয়া দিতে পারে।

কিন্তু সে শক্তি আজ সমাজ চাহে না—সমগ্র ভূমণ্ডলকে কম্পিত করিতে সমর্থ এই প্রজ্বলিতরূপে—পুরুষ আজ তাহাদের চাহে না। ক্ষীণকণ্ঠে মুখে বলে নারীর মাতৃরূপ আমাদের আদর্শ, আর সেই সম্মোহনাস্ত্রে স্তম্ভিত নারীকে টানিয়া লয় আপনাদের বিলাস শয্যায়! মা! মাতৃরূপে বাঙ্গালী যদি নারীত্বের সিংহাসন-পীঠে বসাইতে চাহে, তবে ঘরে ঘরে

মায়ের এই ছদ্মবেশ কেন?—জীর্ণা শীর্ণা অকাল বার্দ্ধক্যে ব্যাধিতা মুক্ত-দেহা লোলাঙ্গী জীর্ণ চীরেকসম্বলা হইত—মা?

এখনও মাতৃনাম সম্মোহন আনে, সে একটা ভাগ্যের ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনা। ইহারা কি "সেই মা—যে মায়ের স্নেহ ক্রোড়ে, স্তন্যরসে মানুষ হইয়া গিয়াছেন—ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী! সে আজ, স্বপ্ন! যে রক্তমাংস পুষ্ট হইয়া সেই দেবসম জ্যোতির্ম্ময় ঋষিগণ বেদাদি দুর্লভ গ্রন্থ সকল রচনা দ্বারা পৃথিবীতে অমর মনের চির সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন, সে রক্তমাংস কি আজিকার মাতার অঙ্গে আছে? থাকিলে এই পরদাস জাতি তাহাদিগকে কাম কলুষিত নেত্রে দেখিতে পারে? (কিন্তু নিন্দায় লজ্জা দেওয়া বৃথা, সে চেতনা থাকিলে এতদিন ভাবান্তর যুগান্তর উপস্থিত করিত।) আর লজ্জা অধিক কি পাইবে? বিবেকানন্দের মত আজন্ম ব্রহ্মচারী (যাঁহার পবিত্র জীবনস্পর্শে কত পথচ্যুত জীবন লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছে) মাতৃত্বকে (এই বর্ত্তমান শঠতার মুখে উচ্চারিত মাতৃত্ব) ব্যঙ্গ করিয়া বলেন Manufacturing machine! (তবুও নারীর চেতনা কোথায়?) যে স্বর্গচ্যুত স্নেহামৃত কণা অণাহার শীর্ণ, অজ্ঞানান্ধ কৃষক শ্রমজীবীতেও নারায়ণের অস্তিত্ব জাগ্রত দেখিয়া গিয়াছে, সেখানে সে পদপ্রান্তেও বর্ত্তমান অবস্থার হিন্দুনারী স্থান পায় নাই *—এতেও যদি না পায়, আরো কিসে লজ্জা পাইবে? এতেও যদি মাতৃত্ব আপন বিকৃতরূপ পরিহার করিবার আহ্বানের কষাঘাতস্পর্শ অনুভব করিতে না পারে, কিসে পারিবে?"†

কিসে যে পারিবে সে তপস্যায়—বিবেকানন্দ তাহার পথ নির্দ্দেশ, দিয়া গিয়াছেন। সে ঠিক তাঁহারই আত্মপ্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিবার

---

* চরণে স্থান পাওয়া ত অতি হীন কথা—স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীজগন্মাতার রক্তমাংসের প্রতীকের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। দরিদ্রে যেমন নারায়ণ-জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ ছিল, নারীতেও তাঁহার মাতৃজ্ঞান সর্ব্বদা অটুট ছিল। মাতৃসমাজের দুঃখে নরপশুদের কষাঘাত এবং তাহাদের ব্যবহার জ্ঞাপন করিবার জন্যই তিনি manufacturing machine শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।—উঃ, সঃ।

† অন্তঃপুর ও ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ। শ্রাবণ ১৩২৭

মত মেয়ে গড়িবার পথ। গঠন আরম্ভ হউক—বাংলার ঘরে ঘরে তেমনি সব মনস্বিনী কুল অবতীর্ণা হইয়া জননী, জায়া, দুহিতা পদ গৌরবিত করিয়া দাঁড়ান। মহামুক্তির পরপার হইতেও বিবেকানন্দের মত আত্মা লক্ষ লক্ষ আধারে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে এক মহা অমৃত সিন্ধুতে ভাসাইয়া দিতে আসিবেন। মনুষ্য স্বভাবের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে—সেইদিন হইতেই জগতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। তখন আর নরের দুঃখ থাকিবে না, নারীর দুর্দ্দশা থাকিবে না। জগতের এই জীবন সংগ্রাম এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত স্বর্গরাজ্যের আচার ব্যবহাররূপ পরিগ্রহ করিবে। তখন চক্ষে দেখিব ধর্ম্মের গ্লানির অবসানের যুগ।

বিবেকানন্দের মানস-কমল নারীসমস্যার সমাধানে যে সত্য কিরণ স্পর্শে ফুটিয়াছিল, তাহারই রশ্মিরেখায় বাঙ্গালার আকাশ পরিপূর্ণ করিতে চাই।—বাঙ্গালী প্রস্তুত কি?

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

আঁটপুর (হুগলি জেলা) *

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮।

(১)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

প্রিয় ম,—

মাষ্টার মহাশয়, আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে।

আপনার নরেন্দ্রনাথ।

* এই স্থান স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। স্বামীজি ও তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

পুঃ—যে উপদেশামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করিবে, কোন ব্যক্তিকে যখন তাহার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকিতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং আমি যে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাই না কেন—তাহাতেই আশ্চর্য্য হই ।

(২)

(বেলগামের ভূতপূর্ব্ব ফরেষ্ট-অফিসার শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত ।)

মাড়গাও,

১৮৯৩ ।

কল্যাণবরেষু,

আপনার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম । আমি এ স্থানে নিরাপদে পৌঁছি ও তদনন্তর পঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করিতে যাই—অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছি । গোকর্ণ, মহাবলেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিবার ইচ্ছা এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম । কল্য প্রাতঃকালের ট্রেনে ধারবাড় যাত্রা করিব । যষ্টি আমি লইয়া আসিয়াছি । ডাক্তার যুগড়েকরের মিত্র আমায় অতিশয় যত্ন করিয়াছেন । ভাটেসাহেব ও অন্যান্য সকল মহাশয়কে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইবেন । ঈশ্বর আপনার ও আপনার পত্নীর সকল কল্যাণ করুন । পঞ্জেম সহর বড় পরিষ্কার । এখানকার খ্রীষ্টিয়ানেরা অনেকেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে । হিন্দুরা প্রায় সকলেই মূর্খ । ইতি—সচ্চিদানন্দ ।*

---

* আমেরিকা-যাত্রার কিছু পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা-যাত্রা পর্য্যন্ত স্বামীজি সচ্চিদানন্দ নামে নিজেকে পরিচিত করিতেন ।

ধর্ম্ম পথ।*

(শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়)

বিশ্বের বিচিত্রতা নানারূপে নানাভাবে ফুটে উঠে সেই এক অনির্ব্বচনীয়া অনাদি সত্ত্বার অস্ফুট আভাস দিচ্ছে। শিল্প-সাহিত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিদ্যা-বিজ্ঞানে, ভাবে ভাষায়, মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ক'রে ক্রমন্নোতির স্তরে উঠছে। হৃদয়ের বিস্তৃতি ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার আদর্শ গড়ে নিচ্ছে; নীতির সুনিয়মে সমাজ সভ্যতার আলোক দেখতে পাচ্ছে। আবার প্রতিভায় মনীষায় এই মানুষ সমাজ-সঙ্ঘ পরিচালিত করছে। যিনি নীতির নিয়ন্তা, সভ্যতার সন্তান, সমাজের পরিচালক,—তাঁকেই আমরা মহাপুরুষ বলি।

ঐহিক ভোগসুখই যে জীবনের ঈপ্সিত বস্তু তা বোধ হয় কেউ একবাক্যে স্বীকার করেন না। কারণ, আহার বিহার ও নিদ্রার দ্বারাই জীবনের সদ্ব্যবহার হয় না। অতি নিম্নস্তরের জীবের লক্ষণের সঙ্গে মানব প্রকৃতির সমতা কখনই প্রার্থনীয় নয়, তাহলে সে জীবনের মূল্য যে পশুত্বের সমান হবে। মানুষ অর্থ চায় তার দৈহিক সুখের জন্য নিশ্চয়, কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন ছাড়াও সে এমন কিছু চায়, যাতে সে অন্তরের তৃপ্তি ও প্রাণের শান্তি পেতে পারে। দৈহিক সুখের জন্য যেমন কর্ম্মের অভাব নেই আবার অন্তরের প্রেরণার তরে তার ব্যাকুলতাও সীমাহীন। এই যে অন্তরের প্রেরণা, চিত্তের এতটা অশান্তির অবস্থা, যা নাকি ভোগ সুখের পরও থাকে এঁকেই বলি ধর্ম্মলাভের অজ্ঞেয় আকাঙ্ক্ষা—এই খানেই মনুষ্যত্বের উন্মেষ।

---

* বিবেকানন্দ সমিতির ৩১শে অক্টোবর ১৯২০, আলোচনা সভায় পঠিত।

ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও মতবাদ ভারতবর্ষে অভাব নেই। এ যে শুধু আজকাল তা নয়, অতি প্রাচীন যুগেও ছিল। বৈদিক কর্ম্মবাদীদের সঙ্গে জ্ঞানবাদীদেরও বিরোধ ছিল—যখন বৌদ্ধ মুসলমান অথবা খৃষ্টধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করে নি। কিন্তু আধুনিক কালে অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পর এদেশে কতকগুলি অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। যেমন আর্য্য ও ব্রাহ্ম সমাজ, রাধাস্বামী সম্প্রদায় ও থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়। মতবাদ ভিন্ন হলেও এরা মূলতঃ এক,—সকলেই এক অতি উচ্চ উচ্চতর, নির্ঝরিণী হইতে ভাবরাশি সংগ্রহ ক'রে সম্পূর্ণ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট লক্ষনাক্রান্ত মতবাদের মধ্য দিয়ে জগৎ রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এই সকল মতবাদের মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন। কারণ, প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম বা দার্শনিক সম্প্রদায়, অপর সম্প্রদায়ের ভ্রম প্রদর্শনে ও নিজমত স্থাপনে একবিন্দু কম উৎসাহী নন। অতি বিরল, কোন মহাত্মা বা মহাপুরুষ উদারভাবাপন্ন হতে পারেন কিন্তু কি আধুনিক কি প্রাচীন সকল সম্প্রদায়ই কম বেশি সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচারিত আর্য্যসমাজ বেদের সংহিতা ভাগের উপর তাঁর ব্যাখ্যার সাহায্যে স্থাপিত। ব্রাহ্মসমাজ উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়াও, প্রধানতঃ মানবের স্বাধীন যুক্তির উপর নির্ভর ক'রে, রাজা রামমোহন রায় প্রচার করে গেছেন। রাধাস্বামীর উপদিষ্ট সাধনাবলির উপর রাধাস্বামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কতিপয় আলৌকিক শক্তি সম্পন্ন 'মহাত্মার' এক সঙ্ঘ আছে; যোগাদি সাধন দ্বারা জগতের সমুদয় ধর্ম্মের সারমর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, এই থিওসফিষ্টদের মত। কিন্তু এই সকলের মধ্যে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্ম-সাধনা ও সর্ব্বমতের মধ্যে 'যত মত ততপথ' রূপ এক সনাতন সত্যের অনুভূতি—এই স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত রামকৃষ্ণ মিশন।

বুদ্ধ আবির্ভাবে ধর্ম্মরাজ্যে একটা যুগান্তর এসেছিল। তারপর বেদ ব্যাখ্যাতা শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব এঁরা নানা প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা একটা বিরোধের সৃষ্টি করেছেন। তারপর মুসলমান খৃষ্টান আর্য্যদের

প্রচারের ফলে হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার ভিতর অনেক অবান্তব শাখার উৎপত্তি হয়েছে আরোও বা কত হবে। ধর্ম্ম সমন্বয়ের বার্ত্তা আজ যে শুধু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এনেছেন তা নয়, অতি প্রাচীন বৈদিকযুগেও জলদগম্ভীর ধ্বনিতে তপোবনের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত একদিন আলোড়িত হয়েছিল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

আজকাল শিক্ষিত সত্যানুসন্ধিৎসুর নব্যযুবক যে এই নানা মতামতের মধ্যে পড়ে, হামাগুড়ি খাবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয়ের যন্ত্র কি? এখন কোন্ সম্প্রদায়ের আশ্রয় বিধেয় তাও চিন্তার বস্তু। যুক্তিবাদ দিয়ে ধর্ম্মের প্রমাণ মাপ্‌ব, না বৈজ্ঞানিকের মত অজ্ঞেয়বাদী হব, না প্রাচীন বা আধুনিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করব? এইখানে ধর্ম্মের প্রমানের প্রশ্ন আসে।

বেদান্ত আমাদের যুক্তি, আপ্তবাক্য ও স্বানুভব এই তিন প্রমানের দ্বারা ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে আদেশ করেছেন। তার মধ্যে স্বানুভবই শ্রেষ্ঠ ও সন্দেহ শূন্য।* কিন্তু অন্য প্রমাণগুলিও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। সকলেরই কিছু একমত হওয়া সম্ভব নয়, ইহাই প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বিচিত্রতা। অনেকে বলেন, বিশ্বাস কর, বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। ভাল, কি বিশ্বাস করব—আর কা'কে বিশ্বাস করব? তিনি অমনি বোধ হয় নিজ প্রিয় মতগুলি প্রচার করতে সুরু করবেন, অথবা শাস্ত্র বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বা মহাপুরুষ বিশেষের মতের বিশ্বাসের উপদেশ দেবেন। কেন যে তাঁর কথামত উক্ত মহাপুরুষকে বিশ্বাস ক'রব আর অন্যকে বিশ্বাস ক'রব না, এ কথার উত্তরে তিনি গভীর উপেক্ষা ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই করবেন না। অথবা সৌভাগ্য ক্রমে হয়ত তাঁর নিজ বিশ্বাসের অনুযায়ী কতকগুলি যুক্তিতর্ক এনে হাজির করবেন। তবে কি যুক্তিতর্কের দ্বারা

* ইহা লেখকের মত; বেদান্ত মতে আপ্তবাক্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, কারণ স্বানুভব বা সাধারণ-প্রত্যক্ষে অপরের সহিত বিরোধ সম্ভব। তবে যদি চরমানুভূতি হয়—সেখানে কোনও গোল নাই।—উঃ সঃ

এ রহস্যের মীমাংসা হবে? যুক্তি মীমাংসা দ্বারা তুমি একরূপ সিদ্ধান্ত করলে আমার সিদ্ধান্ত অন্যরূপ হল। শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব, নীলকণ্ঠ, বল্লভ ইত্যাদি প্রতিভা সম্পন্ন মহাপুরুষগণ যাঁরা বেদান্তের ভাষ্য করেছেন—তাঁরা কিরকমে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন? কেউ কেউ (?) বলেন তাঁদের তিনটি মত—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—একটি আর একটির সোপান মাত্র। আমি যদি জিজ্ঞাস করি, কি উপায়ে জানেন?—যুক্তি বলে? কিন্তু যুক্তিদ্বারা পরকাল, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্বের সঠিক মীমাংসা হয় না। তখন কি আপ্তবাক্য গ্রহণ করব?—এখন আপ্ত কে?—কি প্রকারে বা নির্ণয় করা সম্ভব? বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক—কে আপ্ত? আবার প্রাচীন মহাপুরুষগণের বাক্যের মধ্যেই অনেক বিরোধ দেখছি। এক বেদের মধ্যেই কত ঋষি কত মত দিচ্ছেন।

পূর্ব্বে বলেছি জ্ঞানের উন্মেষের দ্বারা মানুষ উন্নতির পথে চলেছে। ধর্ম্মলাভের বিশাল রাজপথ পত্রিকাপ্রবন্ধে, উপদেশবক্তৃতায় যথেষ্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু অনেক ঠেকে তারপর এক পরদা উঠতে হয়। চরিত্রের উন্নতি একটা কথার কথা নয়। তাই মনে হয় অকপট নির্ভীক হৃদয়ে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা অতি আবশ্যক। অতীত সত্যানুসন্ধিৎসুগণের উপদেশগুলি ধীরভাবে শ্রদ্ধা সহকারে আলোচনা করা দরকার (?) তাঁদের উপদেশের মধ্যে ভেদাভেদ থাকলেও সেখানে সমন্বয়ের সূত্রটি আছে সেই খানে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে চিন্তা করতে হবে। বৃথা মতামতের বিচারে সময় ও শক্তি ক্ষেপ না করে তত্ত্বের যথার্থ অর্থবোধের জন্য যত্নবান হতে হবে!

অনেকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে সত্যনির্ণয়ের যথেষ্ট ও একমাত্র সহায়ক মনে করেন। আবার কেউ বা ভাব বা মনোবৃত্তি বিশেষকে তদ্রূপ ভাবেন। ভাববিহীন জীবন নীরস হয়ে যায়, আবার ভাবের প্রবলতা এসে ক্রমে ক্রমে উন্মত্ততার সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার?—সে যে একটা কথার কথা মাত্র। বিচারবাদী যেমন ভাবকে দুর্ব্বলতা ভাবেন আবার

অপর পক্ষও তেমনি তাঁদের হৃদয়ের শুষ্কতা চিন্তা ক'রে দুঃখিত হন। কিন্তু দেখা যায় কোন যুক্তিবাদী কোনও একটি ভাবের প্রভাব হতে একেবারে মুক্ত নন। ফলতঃ যখন যুক্তিবাদী দুর্ব্বল ভাবকে পরিহার করে অসীম উদ্যমে সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হন, আবার যখন ভাবুক ভাবপ্রবণতার ক্রমশঃ বিশুদ্ধি সাধন দ্বারা অগ্রসর হন, তখন তাঁরা চরমে একই স্থানে একই লক্ষ্যে উপনীত হন। এই দুই পথ শাস্ত্রোক্ত—জ্ঞান ও ভক্তি মার্গ। জ্ঞানীর যেমন বুদ্ধি বিচার ও চিত্তের নির্ম্মলতা দরকার, আবার ভক্তেরও তেমনি মহাপুরুষ বাক্যে অব্যভিচারী ভক্তি ও নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয়।* এখানে মনে রাখতে হবে সামাজিকতার নীতি আমাদের যথেষ্ট বটে কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যে আসতে হলে ব্যবহারিক রীতি-রাজ্যের বাইরে যেতে হবে। যেখানে শব্দ নিয়ে বিচার নাই, বিশ্বাস অবিশ্বাসে লড়াই নাই, জ্ঞানী ভক্তে ঠেসাঠেসি নাই—সেই পারামার্থিক রাজ্যে। এই খানে পৌছানই জীবনের উদ্দেশ্য—এইখানেই মনুষ্যত্বের পরিণতি।

পূর্ব্বে যে স্বানুভূতির কথা বলেছি তাতেই ধর্ম্মের মুখ্য প্রমাণ নিজ আচরণে পাওয়া যায়। কোন প্রকার মতের বিশ্বাস না নিয়ে মনঃশক্তির একাগ্রতার দ্বারা সেই তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। বৈজ্ঞানিক সম্রাট সার অলিভার লজ বলেছেন যে Laboratory experiment আর Observation ছাড়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের অন্য পথ থাকাও সম্ভব। সে পথ আর কিছুই নয় ভারতের আর্য্যঋষি প্রচারিত রাজযোগ। মহানাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীরও ধর্ম্মরাজ্যে সত্যানুসন্ধানের কোন বাধা নাই। আচার্য্য বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ পাঠে দেখা যায় কেহ বিচার বিশ্বাস বা যৌগিক ক্রিয়ানুষ্ঠান না করেও যদি যথার্থ নিস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করবার চেষ্টা করেন পরে তাঁরও অহং নাশের ফলে সেই পরমপদ লাভ হয়।

* দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদানুযায়ী এ কথা অনেকটা ঠিক বটে, কিন্তু শঙ্করাদি অপরাপর আচার্য্যেরা জ্ঞান ও ভক্তি উভয় মার্গেই আপ্তবাক্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং উভয়েরই চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন।—উঃ সঃ

আমি বলতে চাই কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা কল্যাণকর নয়—সে ভাবটি সেই সম্প্রদায়ের মৃত্যু স্বরূপ। সত্য উপলব্ধির অনন্ত পথ রয়েছে—প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে বেছে নিতে দেও। যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছও ততক্ষণ কেউ কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। কারণ তখনও তুমি তোমার সাধনার মূল্য পাও নাই আর আমারও বিরুদ্ধ মতের দাম জান না। তাই বলি, এস সকলে সৎসাহস ও উচ্চাশা বুকে নিয়ে, সাধনায় ব্রতী হই, সত্যের আলোক একদিন নিশ্চয়ই আসবে। তখন আমরা সকলেই ধন্য হব।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিককে লিখিত পত্রাংশ।)

শ্রীমান সুরেন্দ্র,

মাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারাণী এঁদের কথা শুনেছো। মা যে এঁদের চেয়েও কত উচুতে, উঠে বসে আছেন! ঐশ্বর্য্যের লেশ নেই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য্য ছিল; তাঁর ভাবাবেশ, সমাধি, এসব আমরা জ'ন্মে দেখেছি—কত লোকে দেখেছে! কিন্তু মার?—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি!—জয় মা!! জয় মা!!! জয় মহাশক্তিময়ী মা!!!! দেখচো না—কত লোক সব ছুটে আস্‌ছে! যে বিষ নিজেরা হজম কর্ত্তে পাচ্ছিনে—সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন!—অনন্ত শক্তি—অপার করুণা!! জয় মা!!!—আমাদের কথা কি বল্‌ছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এ'টী কর্ত্তে দেখিনি! তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন! কেশব সেনকে বলেছিলেন—"কেশব, তুমি যেমন তেমন গরু গোয়ালে ঢোকাও—তাইতে এত গণ্ডগোল বাধে।" ঠাকুর কত পরখ করে নিতেন। স্বামিজীকেই কত ক'রে দেখেছিলেন! চোখ মুখ, হাত, পা— * * * প্রস্রাবের ধার কোন্ দিকে পড়ে তা পর্য্যন্ত। কত রকম পরীক্ষাই জান্‌তেন! এত ক'রে দেখে ভেবে

তিনি কাউকে স্থান দিতেন। দেখেছি, কেউ হয়ত কিছু খাবার নিয়ে ঠাকুরের ঘরের পানে আস্‌ছে; দূর থেকেই ঠাকুর বল্‌ছেন—"দেখলুম খাবার তো নয়, যেন খানিকটে ময়লা নিয়ে আস্‌ছে!" বিষয়ীর গন্ধ সইতে পার্‌তেন না। আর এখানে—মা'র এখানে কি দেখ্‌ছি?—অদ্ভুত! অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন—সকলের দ্রব্য খাচ্চেন,—আর সব হজম হয়ে যাচ্চে!—মা! মা!! জয় মা!!!

তোমরা দেখ্‌তে এলে?—রাজরাজেশ্বরী, সাধ ক'রে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়্‌ছেন—এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্য্যন্ত নিজে পরিষ্কার করছেন! ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছিল, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ তৈরীর জন্য—আর মা, জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট কচ্ছেন, গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য্য—অপরিসীম করুণা—সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমান-রাহিত্য!! দেখ, চিন্তা কর, বোঝ; মা'র ছেলে তোমরা—ঠিক ঠিক মা'র ছেলে হতে হবে—তবে তো। নৈলে কেবল মাকে দর্শন করে এলুম, কি একটু প্রসাদ খেলুম—এতে কি আর হবে? "তদ্ভাবভাবিত"—এ যদি না হ'ল, কি আর তবে হ'ল? ভোগতৃষ্ণার পরিণাম দেখ্‌চো ত? ঐ যে রেগে উঠে দাউ দাউ হাউ হাউ রোলে জ্বলে উঠ্‌ছে,—ছারখার করে দিচ্ছে। মায়ের ছেলে তোমরা—দেখে শেখো। ওসব আশায় ছাই ফেলে দেও। কি কঠোর দায়িত্ব তোমাদের! ভোগের পরিণাম দেখে সমস্ত জগৎ এইবার যোগের দিকে ফিরে দাঁড়াচ্চে। কে তাদের পথ দেখাবে?—এই কায তোমাদের সম্মুখে! স্পর্শমণি স্পর্শ ক'রে তোমরা ত সব সোনা হয়ে গেছ! এইবার অন্য সকলকে সোনা কর্ত্তে হবে। তা'রি যোগ্যতা লাভের চেষ্টা কর। মায়ের যথার্থ ছেলে হয়ে উঠ। মনে রেখো—সুখে দৈন্যে, সম্পদে বিপদে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, যুদ্ধে বিগ্রহে—সর্ব্ব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা!—অপার করুণা!!—সেই অপার করুণা!!! জয় মা! জয় মা!!

* * * *

ইতি।—

শুভানুধ্যায়ী—প্রেমানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। বিবেকানন্দ সোসাইটীর আয়োজনে বিগত ৬মাসের মধ্যে (জুন হইতে—নবেম্বর ১৩২০) ২১টী সাধারণ ধর্ম্ম সভা প্রতি শনিবারে কলেজ স্কোয়ারে বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটী গৃহে হইয়াছিল। পণ্ডিত শরৎকুমার ঘোষ (বরিশাল), পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ, রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বেলুড় মঠের স্বামী বাসুদেবানন্দ (মনুষ্য জীবনে বৈদিক ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা), ক্ষীরোদকুমার গাঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, ক্রমান্বয়ে এই অধিবেশনে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ও পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয়ের 'বেদান্ত ও বেদান্তের' ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রায় প্রতি অধিবেশনে বক্তৃতার পূর্ব্বে ধর্ম্মসঙ্গীত হইয়াছিল।

২। এই ৬মাসে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লিতে ৬টী আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছে। এইগুলিতে শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, পূর্ণানন্দ, বাসুদেবানন্দ, প্রভৃতি সন্ন্যাসী মহোদয়গণ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী অনন্তচৈতন্য লিখিত "কঃ পন্থাঃ" (উদ্বোধনে পরে প্রকাশিত), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত এক প্রবন্ধ স্বামী পূর্ণানন্দ লিখিত "নবযুগ ও তাহার কর্ম্মপ্রণালী", পথিক লিখিত "জাতীয় জীবনে বেদান্ত" (পরে উদ্বোধনে প্রকাশিত) শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত "জীবনের পথে" ও স্বামী বাসুদেবানন্দ লিখিত "শিক্ষা-মন্দির" (এই মাসে উদ্বোধনে প্রকাশিত) প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ পঠিত হয়। সভাপতি মহোদয়গণ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুগণের প্রশ্নমীমাংসা করেন ও সদস্যগণ কর্তৃক স্বামীজির গ্রন্থাদি হইতে পাঠ আবৃত্তি ও ধর্ম্ম সঙ্গীতাদি গীত হইয়া যথারীতি কিঞ্চিৎ প্রসাদ বিতরণ হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

৩। সোসাইটী গৃহে সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলিতে প্রথমে প্রতি রবিবারে স্বামী আত্মবোধানন্দ পরে প্রতি বুধবারে স্বামী পূর্ণানন্দ "জ্ঞানযোগ" ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রতি শুক্রবার স্বামীজির বক্তৃতা-

বলীর অংশবিশেষ পঠিত হইয়া থাকে। গত ৬মাসে এইভাবে যতটা সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়, এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ বৈকালে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পঠিত হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ গ্রামের স্থানীয় কয়েক জন উদ্যোগী যুবকের উৎসাহ ও উদ্যমে বিগত কয়েক মাস যাবৎ আর্ত্ত, দুঃস্থ জনগণের সেবাকল্পে একটী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় সাধারণের সহানুভূতি ও তত্ত্বাবধানে ইহা অচিরে একটী উপযোগী কর্ম্মসঙ্ঘে পরিণত হইয়া লোককল্যাণসাধনে যত্নপর হউক—আমাদের এই প্রার্থনা।

আগামী ১৭ই মাঘ, ইংরাজী ৩০শে জানুয়ারী রবিবার, শুক্লা সপ্তমী (জন্ম তিথি) বেলুড় মঠে যুগাচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজির জন্মোৎসব হইবে। দরিদ্র নারায়ণের সেবাই এই উৎসবের বিশেষ অঙ্গ।

পুরীজেলার অন্তঃপাতী ভুবনেশ্বর, কানাস, গারিসাগোদা, জেনাপুর প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষ কেন্দ্র সকল বন্ধ করা হইয়াছে; কারণ ঐ সকল স্থানে ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে ও লোকে মজুরী পাইতেছে এবং চাউলের দরও অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তমলুকে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, সেখানে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান বিশেষ প্রয়োজন, আগামী চৈত্র মাসে কৃষকদের বীজ ধান্য দিতে পারিলে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হয়। মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনের একটী অত্যুজ্জ্বল রবি—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—গত ১৭ই পৌষ, শনিবার রাত্রিকালে নভচ্যুত হইয়া পড়িল। ইঁহার সরলতা, হৃদয়বত্তা ও সর্ব্বোপরি সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় আর কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হয় না। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন ও তদীয় সন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।
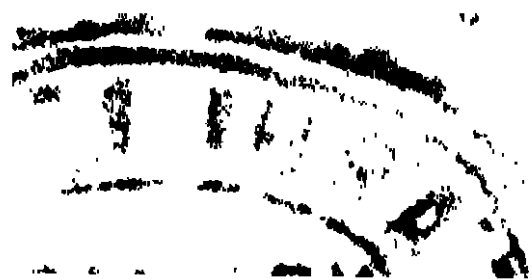
কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

বিষপানে জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু অনুপান যুক্ত হইলে বিকার-ঘোর আরোগ্য হয়।—বর্ত্তমান সভ্যতার (civilisation) দোষ গুণও উহার তুল্যভাবাপন্ন। অসংযমীর নিকট নবীন সভ্যতা মৃত্যু স্বরূপ, আর সংযমীর নিকট উহা স্বর্গের সকল সুখ সম্পদ প্রকাশ করিয়া ধরাকে অমরা নগরীতে পরিণত করিবার যুগ যুগ ব্যাপী মানবের আমরণ চেষ্টাকে সার্থক করে।

* * * *

ঔজ্জ্বল্য ও অন্ধকারে এ জগৎ-চিত্র অঙ্কিত। অতীতে একবার সাগর মন্থন করিয়া দেবতা-অসুর অমৃতকে লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু সর্ব্বনাশক হলাহলও উঠিয়াছিল। তাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে লাভ করিয়াও অসংযমী বলিয়া সে হলাহলের প্রকোপ সহকরা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কিন্তু প্রেমিক তপস্বী শিব ষড়ৈশ্বর্য্যরূপিণী দুর্গা যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী সংযমী বলিয়া লীলায় সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করিলেন। বর্ত্তমান যুগে পুনরায় জড় সমুদ্রমন্থন করিয়া আমরা বহু সম্পদ-বিলাস লাভ করিয়াছি সত্য কিন্তু তৎসঙ্গে যে হলাহল উত্থিত হইয়া জগৎকে জর্জ্জরিত করিতে বসিয়াছে, তাহার সেই জ্বালাময়ী প্রকোপ শীতল করিবার নিমিত্ত সে প্রেমিক সন্ন্যাসী কে?

* * * *

অতীতের মন্থন রজ্জু ছিল ভোগ-নাগ, বর্ত্তমানে হইয়াছে ভোগ বাসনা। ভোগনাগের ছিল সহস্র শির কিন্তু ভোগ বাসনার আছে কোটী শির। মন্থন দণ্ড ছিল সুমেরু, বর্ত্তমানে হইয়াছে অপরা

বিজ্ঞান—মথিত হইয়াছিল সমুদ্র, এবার হইয়াছে সমগ্র জড়-কারণ, উঠিয়াছিল লক্ষ্মী, সুধা, বারুণী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা—এবারও উঠিয়াছে বাণিজ্য-লক্ষ্মী, বিজ্ঞান-সুধা, মোহ-বারুণী, যান্ত্রিক-অশ্ব গজ—দেবতা পান করিল সুধা, অসুর পান করিল বারুণী, কিন্তু হলাহল স্থলে যে দারুণ হিংসা উত্থিত হইয়াছে যাহার প্রকোপে বিশ্ব যে জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহাকে গণ্ডুষ মাত্রে ধারণকারী সর্ব্বত্যাগী রুদ্র ভগবান কে?

* * * *

যে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা আজ মোক্ষদায়িনী—যদি রুদ্র জটাকলাপে সে অসহ্য বেগ সংযত না হইত তবে এ জগৎ তিনি রসাতলে বিলীন করিয়া দিতেন। আবার যে সেই জ্ঞান-গঙ্গা মহাঘোররোলে সমগ্র জগৎ ছাইয়া এক মহা প্রলয়ের ধ্বংস ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সংযত করিয়া জীবমোক্ষের-কারণ-ভূতা করিবার নিমিত্ত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল চন্দ্রশেখরের তপোদীপ্ত গভীর জটাজলদ জাল কোথায়?

* * * *

আবার কে সেই ভগীরথ ত্যাগের দীপ্ত বহ্নির মধ্যে নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষ এবং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনায় শিবারাধনা দ্বারা তাঁহার জটা পুঞ্জে পথহারা জ্ঞানগঙ্গাকে তপোলোক হইতে এই মর্ত্ত্যে মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন?

* * * *

কে ঐ নরলোকের দেবতা যাঁহার ভালতটে কোটি দামিনী-লাঞ্ছিত তপোলেখা! দৃষ্টি ঊর্দ্ধে—অতি ঊর্দ্ধে মনের পরপারে অতীত আগামী হীন কোন এক অরূপ-রূপ-সাগরে নিমগ্ন!—যে সাগর হইতে কত যুগের কত মহাপ্রাণ নিজ তপঃ কিরণের দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন কত কলুষনাশিণী বিচিত্রভাব লহরীর বারি কণা। কিন্তু একি রুদ্র তপোজ্যোতিঃ!—যাহা তপোলোক হইতে আকর্ষণ করিতেছে, কাহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, সকল কল্পের, সকল যুগের, সকল ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে সেই জ্ঞান-গঙ্গা আচণ্ডালকে পবিত্র কৃতার্থ

করিবার জন্য। কে ঐ মহাযোগী! দেবতার দেবতা! যিনি লীলায় জীর্ণ করিলেন হিংসা হলাহল, শাসন করিলেন কটাক্ষে মন্মথ, ধারণ করিয়াছেন অঙ্গে ষড়ৈশ্বর্য্যরূপিণী মহাশক্তি, তনুচ্ছেদ করিয়া যোগাইতেছেন লক্ষ্মী যাঁহার পূজায় অর্ঘ্য-কমল—কাহার ঐ শিবচক্ষু!

* * * *

আবার কে ঐ হাস্যানন, 'স্তিমিত চিৎসিন্ধু ভেদ' করিয়া 'কোটী সূর্য্য গলান' অঙ্গ হইতে প্রেমের জ্যোতিকণা বিচ্ছুরিত করিতে করিতে মহাব্যোমের প্রতি কম্পনের তরঙ্গে তরঙ্গে অবরোহন করিতেছেন—জীব দুঃখহারী কঠোর তপস্যার নিমিত্ত? কে ঐ নবীন সন্ন্যাসী 'ত্যাগের অগ্নিকুণ্ডে' আহুতি দিতেছেন নিজের দেহ-মন-প্রাণ, 'স্বার্থ মলিনতা' জীব কল্যাণকামী হইয়া! কাহার তীব্র সাধনায় আশুতোষ আজ তুষ্ট, বিক্রীত! কে ঐ জলদ মন্দ্রে আহ্বান করিতেছে বরদা-ব্রহ্মযোনি জ্ঞান-গঙ্গাকে কাহার ব্যাকুল আহ্বানে শিব-সীমন্তিনী রুদ্র-জটারণ্য প্লাবিত করিয়া 'যত মত তত পথ' দিয়া ধীরে ধরায় শুভাগমন করিতেছেন? শুন ঐ তরুণ তপস্বীর বিশ্বালোড়নকারী গভীর শঙ্খ ধ্বনি—অভিঃ! অভিঃ! উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!

* * * *

কে আছ নাস্তিক আস্তিক, কে আছ জ্ঞানী অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, হিন্দু অহিন্দু, এস এস এই নব জ্ঞান-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ধন্যমানি। সর্ব্বসন্তাপহারিণীর প্রেম সলিলে স্নান করিয়া এস আমরা সকল স্বার্থ হিংসা ধুইয়া ফেলি। এই কলুষনাশে প্রত্যক্ষ হইবেন সেই সহস্র-শীর্য পুরুষ—এস প্রতি জীব পদে আমাদের সকল দান সমর্পণ করিয়া তাঁহার মূর্ত্ত উপাসনার সমাপ্ত করি। ওঁ শান্তিঃ॥

(২)

যিনি মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি সচ্চিদানন্দরূপিণী—যার করুণার কণামাত্র লাভ করিয়া নারী মূর্ত্তি এত করুণাময়ী, মহিমাময়ী—তাঁহাকে প্রণাম করি। মা আমাদের নিত্য ও লীলা উভয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা। নিত্য মূর্ত্তিতে গুণ একীভূত,

আর লীলায় গুণ বিকশিত। বিদ্যুদাধারে যে শক্তি নিহিত তাহা লোক চক্ষুর অগোচর—পরন্তু দীপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইলেই উহা আমাদের আলোক। সেইরূপ অপার করুণা, অসীম ধৈর্য্য, অখণ্ড প্রেম, অনন্ত জ্ঞান স্বরূপিণী, চির ক্ষমাশীলা, চির কল্যাণময়ী যে শাশ্বতী জননী সর্ব্বভূতে বিরাজমানা—নারীমূর্ত্তি তাঁহারই লীলা বিগ্রহ !!

* * * *

ঐ সনাতনসত্য ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বসিয়াই ভারতে জীবন্ত প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা। ভারতেতর প্রদেশে সে উপাসনা বর্ত্তমান বটে কিন্তু সে পূজা কেবল যৌবনের, সে স্তুতি কেবল রূপের। অস্মদ্দেশে কিন্তু নারীকে জগদম্বার মূর্ত্ত বিগ্রহ জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করাই 'শাশ্বতী কামনা' ছিল—যাহার অভাবে আজ আমরা শ্রীহীন। জাতীয় ভাবাদর্শের বিচ্যুতিতে জননী ক্রীতদাসী হইলেন। আর এই বিচ্যুতির হেতু সনাতন শাস্ত্রের অবমাননায় দেশাচার কুলাচারের প্রাধান্য এবং তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ মদিরা পানে উন্মত্ততা।

* * * *

কিন্তু শক্তিমান পুরুষেরা যাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য বলিয়া থাকেন সাধারণে সে কথা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণে অক্ষম হইলেও একেবারে কখনও অস্বীকার করিতে পারে নাই—এবারও পারিবে না। ইদানীং এর মহাশক্তির সাধক পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও জীব কল্যাণকামী হইয়া প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতা—এ সৃষ্টি তাঁহারই লীলামহিমা—যে লীলায় নারী তাঁহারই মূর্ত্ত প্রতিমা।

* * * *

হে ভারতী—পূত হৃদয়ে অবহিত চিত্তে ধারণা কর—তোমার স্বরূপ মাতৃত্বে—এ মূর্ত্তিতে তোমার যে শোভা, এ মূর্ত্তিতে তোমার যে বিকাশ তাহা তোমার অপর মূর্ত্তির সহিত তুলনার অযোগ্য—কারণ তোমরাই জগৎকে প্রসব করিতেছ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

C/o বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র
খয়রাতাবাদ, হায়দরাবাদ
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার বন্ধু সেই যুবক গ্রাজুয়েটটী ষ্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন —একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এসেছিলেন। এখন আমি ঐ বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীর কাছেই রয়েছি—কাল তোমার যুবক বন্ধুটীর কাছে গিয়ে কিছু দিন থাকবো—তারপর এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখা হয়ে গেলে—কয়েক দিনের মধ্যেই মান্দ্রাজে ফিরছি। কারণ, আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমায় জানাচ্ছি যে, আমি এখন আর রাজপুতানায় ফিরে যেতে পার্ব্বো না—এখানে এখন থেকেই ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে—জানি না রাজপুতানায় আরও কি ভয়ানক গরমই হবে, আর আমি গরম আদপে সহ্য করতে পারি না। সুতরাং এরপর আমাকে, ব্যাঙ্গালোরে আবার যেতে হবে, তারপর উতকামন্দে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাব। গরমে আমার মাথার ঘিটা যেন ফুটতে থাকে।

সুতরাং আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল আর এই জন্যেই আমি গোড়াতেই মান্দ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলুম। তা করতে পার্লে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্যে আর্য্যা-বর্ত্তের কোন রাজাকে ধর্‌বার যথেষ্ট সময় হাতে পেতুম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথমতঃ, এই গরমে আমি ঘুরে রাজা-রাজড়াকে ধর্‌বার চেষ্টা করতে পারব না—আমি তা করতে গেলে মারা যাব, দ্বিতীয়তঃ, আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছেই ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং

আমার মতলব ছিল আমার বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোক্‌কে ধরা আর মান্দ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুণ আমার সব আশাভরসা চুরমার হয়ে গেছে—এখন আমি অতি দুঃখের সহিত ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলুম—ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হোক্। এ আমারই প্রাক্তন—অপর কারও দোষ নাই। তবে তুমি এক রকম নিশ্চিতই জেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই, দুই একদিনের জন্য মান্দ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে ব্যাঙ্গালোরে যাব আর তথা হ'তে উতকামন্দে যাব—দেখা যাক্ যদি মহারাজ আমায় পাঠায়। 'যদি' বল্‌ছি, তার কারণ, আমি —র অঙ্গীকারবাক্যে বড় নিশ্চিত ভরসা রাখি না। তারা ত আর রাজপুত নয়—আর রাজপুত বরং প্রাণ দেবে, কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। যাইহক্, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—অভিজ্ঞতাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

"স্বর্গে যেরূপ মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, কারণ, অনন্ত-কালের জন্য তোমারই মহিমা জগতে ঘোষিত হচ্ছে এবং সবই তোমারই রাজত্ব।"

তোমাদের সকলে আমার শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি—

তোমার

সচ্চিদানন্দ।

(৫)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

খেতড়ি, রাজপুতানা,

২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৩।

প্রিয় ডাক্তার,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি আপনার প্রীতির জন্য আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। বালাজি বেচারার পুত্রের দেহত্যাগ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলাম। "প্রভুই দিয়া থাকেন আবার প্রভুই গ্রহণ করেন—প্রভুর নাম ধন্য হউক।" আমরা কেবল জানি, কিছুই নষ্ট হয় না বা হইতে পারে না। আমাদিগকে সম্পূর্ণ

শান্তভাবে তাঁহার নিকট হইতে যাহাই আসুক না কেন, মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। সেনানী যদি তাঁহার অধীনস্থ সেনাকে কামানের মুখে যাইতে বলেন, তাহার তাহাতে অভিযোগ করিবার বা ঐ আদেশ পালন করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিবার অধিকার নাই। বালাজিকে প্রভু এই শোকে সান্ত্বনা দান করুণ আর এই শোক যেন তাহাকে সেই পরমকরুণাময়ী জননীর বক্ষের নিকট হইতে নিকটতর দেশে লইয়া যায়।

মান্দ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার যো নাই, কারণ, আমি পূর্ব্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিবেন, রাজা অথবা আমার গুরুভাইগণের আমার সংকল্পে বাধা দিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজাজীর আমার প্রতি ত অগাধ ভালবাসা।

একটা কথা—চেটির উত্তরটী ঠিক হয় নাই। আমি বেশ ভাল আছি। দু এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বোম্বাই রওনা হইতেছি।

সেই সর্ব্বশুভবিধাতা আপনাদের সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুণ, ইহাই সচ্চিদানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা।

পুঃ—আমি জগমোহনকে আপনার নমস্কার জানাইয়াছি। তিনিও আমাকে আপনাকে তাঁহার প্রতিনমস্কার জানাইতে বলিতেছেন।

প্রহেলিকা।

(বিমলানন্দ)

গেছিনু চাঁদের ঘরে
দেখাতে এ মুখের বাহার।
সবে দেখে তারি মুখ
কেহ নাহি দেখিল আমার।
অরুণ উদয় দেখে ফিরে এনু আপনার ঘরে।
সকলে পাগল হ'ল আমার এ চাঁদ মুখ হেরে।

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

(১)

আজকাল এক ঢংয়ের সমালোচক সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েচেন তাঁরা মাঝে মাঝে আপ্ত-বাক্য উদ্ধৃত করে নিজের মত দৃঢ় করেন কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখা যায় অপর আপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করে পূর্ব্ব মহাপুরুষের বাক্যাবলীর দফা রফা করেন। তাঁহারা বুদ্ধের বচন তুলে শঙ্করের মত খণ্ডন কচ্চেন, আবার শঙ্করের মত তুলে দ্বৈতবাদীদের নিরাশ কচ্চেন, আবার বিবেকানন্দের মত তুলে শঙ্করকে একটা বাতুল প্রমাণ কচ্চেন, খনও বা বিবেকানন্দের সব কথাগুলির দিকে দৃষ্টি না করেই, প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তাঁকেই নিরাশ করে বসছেন। স্বদেশীয় হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ গড়ে তুলবেন ব'লেই আবার তৎক্ষণাৎ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত—যা তাঁদের হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত খেলা কচ্চে—তাই দিয়ে একেবারে হিন্দুধর্ম্মের মুণ্ডপাত করতে দ্বিধা বোধ করেন না। ফলে পাঠককে একটা মস্ত গোলোক ধাঁধার মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। এখন অপরাপর মহাপুরুষের মতামত ছেড়ে দিয়ে বিবেকানন্দের মতামত নিয়ে যদি কাহারও জীবনাদর্শ গড়ে তোলবার ইচ্ছা হয় (অবশ্য যাঁহারা নিজ বুদ্ধি এবং কল্পনাবলে একটা স্বাধীন জীবন গড়ে তুল্‌বার ইচ্ছা করেন—যাঁরা ক,খ পর্য্যন্ত কারুর কাছে শিখ্‌তে অ-প্রস্তুত তাঁদের জন্য নয়) তাহলে উক্ত মহাপুরুষের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে সমগ্র মতামত উদ্ধৃত করে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আজকাল প্রবল একটা স্রোত বইছে—সেটা রজোগুণের। এই রজো-

* উদ্ধৃত অংশগুলি ভারতে বিবেকানন্দ—কলম্বোয় স্বামীজির বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

গুণ আমাদের দেশে খুব দরকার তা স্বামীজিও বলে গিয়েছেন—যা আমরা অন্যস্থলে দেখাব, কিন্তু সেটা যে সত্ত্ব-সংযত সেটার দিকে কারও নজর নেই। 'নিরীহ হিন্দু' কথাটী সময়ে সময়ে তিরস্কার বাক্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে"; কিন্তু যদি কোন তিরস্কার বাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে, তবে তাহা উহাতেই আছে।" হিন্দু 'নিরীহ' কেন?—না তাহার কর্ম্মশীলতা তমোমুক্ত রজের ব্যভিচারের দ্বারা দুষ্ট হয় নি বলে। সে "রক্তরঞ্জিত না করিয়া, লক্ষ লক্ষ নর নারীর অজস্র রুধিরস্রোত না বহাইয়া" ভারতে বা ভারতেতর প্রদেশে "নূতন ভাব প্রদান করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই।" বর্ত্তমান দেশনায়ক মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক মতামত ভাল হ'ক আর মন্দই হ'ক, সে সম্বন্ধে অভিমত না প্রকাশ ক'রে আমরা স্পষ্টস্বরে বল্‌তে পারি যে তাঁর Non-violence (পশুবলের অপ্রয়োগ) ঠিক হিন্দুচিতই হ'য়েছে। কেন না "সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভাবের পর ভাবতরঙ্গ, ভারত হইতে প্রসূত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটীই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্ব্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা জয় করি নাই—সেই শুভ কর্ম্মফলেই আমরা এখনও জীবিত।" পক্ষান্তরে "অপরাপর অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে; মহাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক স্বল্পকাল মাত্র পরপীড়াকলুষিত জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে।" পাশ্চাত্য ঘোর রজসম্পন্ন বিদ্যুদাধার থেকে হিন্দু-সমাজের ওপর ঘন ঘন অশনি নিক্ষেপ দর্শনে যাঁরা ব্যথিত তাঁদের জানা উচিৎ "সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধান সকল এখনও বর্ত্তমান; সনাতনকল্প, শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই সকল আচার এখানে এখনও বর্ত্তমান। যতই দিন যাইতেছে, যতই দুঃখ দুর্ব্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে তাহাতে এই একমাত্র ফল হইতেছে যে, সেইগুলি আরও দৃঢ়, আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে।" ধর্ম্মই সদাচারের

বিধান কর্ত্তা, ধর্ম্মই রজের নিয়ামক সত্ত্ব। সেই ধর্ম্ম অপর দেশে— "এই সব নানা কার্য্যের ভিতর এবং ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে—সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, একটু আধটু ধর্ম্ম-কর্ম্মও করা আছে। এখানে এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমস্ত চেষ্টা ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য"—ভারত এর শেষ পরিচয় দিয়েছে নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মধ্য দিয়ে যে ধর্ম্ম একটা কথার জটাপটি বাধান নয়; রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের মত Practical এবং demonstrative। ইহকাল-ভোগ-সর্ব্বস্ব মতবাদ—গায়ে খোস পাঁচড়ার মত ত্যাগ-অঙ্গ ভারতেও মাঝে মাঝে আবির্ভাব হয় বটে—তবে খুব অল্পকালের জন্য। সেই জঘন্য ব্যাধিটা ভারত অঙ্গে যে ব্যাপ্ত হ'তে পারে না সে একটা কারণে—তা দোষই হ'ক—আর গুণই হ'ক—সেটা হচ্চে পুনর্জ্জন্মে আস্থা। ক্রূর-মিথ্যা-কৌশলীকে জব্দ করবার জন্য আমরা চুরি, ডাকাতি, হত্যা, জাল, কুৎসা, চক্রান্ত প্রভৃতি জঘন্য সকল উপায় অবলম্বন ক'রতে পারি, তার দ্বারা প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করা যায় বটে, কিন্তু তাকে জয় করা হয় না। এই সত্য ভারত বহু অভিজ্ঞতার ফলে লাভ করেছে। আর এই অভিজ্ঞতার মূলে আছে কর্ম্মফল। "আমরা হিন্দু; আমরা বলি অনন্ত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলে মানুষের জীবন একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ, অনন্ত অতীতকালের ধর্ম্মসমষ্টিই বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ পায় আর আমরা বর্ত্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে।" আর ইহকাল সর্ব্বস্ব, দেহটাকে যারা ভোগের আয়তন মাত্র মনে করে, যেন তেন প্রকারেণ—ইন্দ্রিয়-গুলির সুখ হলেই ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হল—যাদের জীবনাদর্শ—তারাই পেশী-বল অবলম্বন করে তাদের রাজা 'পশুর' জয় ঘোষণা করে। তাই বলি "রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে। কখন ছিল না আর জানিয়া রাখ কখন হইবেও না।" তবে কি আমরা চিরকালই দাস-সুলভ পরশ্রী-কাতরতা স্ত্রীসুলভ কলহপরায়ণতা, নিষ্কর্ম্মার মত কুৎসা-প্রীতি নিয়ে Dog in the manger

হয়ে থাক্‌ব—নিজেরাও কিছু কর্‌ব না কিম্বা অপরকে কিছু কর্‌তে দেখ্‌লে তার কাছা ধরে টেনে নাবাব—আর সেইটে একটা মস্ত গৌরবের মনে করে শূন্য জালার মত ঢং ঢং করে বেজে—সকলের নিকট জাহির ক'রব, কিম্বা উত্তেজনারবশে উন্মত্তের মত যা, তা করে সাধারণের কৌতুক ভাজন হ'ব?—বাস্তবিক কি আমাদের কিছু করবার নেই কিম্বা একটা কোনও জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নেই?

"আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যাধারে রক্ষা করা এবং যখনি সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনি এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব বা ইংরাজেরা তাঁহাদের অজেয় বাহিনী যোগে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই সকল নূতন পথের মধ্যদিয়া জগতের বিভিন্ন জাতির শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে।" "যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের অন্যান্য জাতির সম্মিলন ঘটাইয়াছে, চিরস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ভারতের যখনই স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করিয়াছে, যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফল স্বরূপ সমগ্র জগতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে।"

আবার আমাদের তারই পুনঃ সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যখনই কোনও বিজাতীয় ভাব এই বিরাট অজগরকে আক্রমণ করে তখনই ইহা তা'কে তার অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করে এবং নিজ ধর্ম্ম-লালা দিয়ে সিক্ত করে পরে একেবারে উদরসাৎ করে এবং যত বড়ই বিজাতীয় পদার্থ হ'ক, তাকে একেবারে হজম করে নিজের রক্ত মাংসের সহিত মিশিয়ে নেয়—সেই বিজাতীয় ভাবটা তখন তার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।"

"আমরা কখন বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরাজি ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাহা দ্বারা জগতের

নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে, যদি ইংরাজি ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যদ্দ্বারা মানব জাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা এই,—fascination (সম্মোহনী শক্তি) হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে; বরং ঠিক তাহার বিপরিত। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা ভারতীয় আচার ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু যদি তাহারা অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা করে মনোযোগ সহকারে ভারতীয় গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার ব্যবহারের মূলীভূত মহান্ তত্ত্বসমূহের সহিত সবিশেষ পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে, শত করা নিরনব্বই জন ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্য্যে ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোক লোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ উষাকালীন ধীর শিশির সম্পাতের ন্যায় এই শান্ত সহিষ্ণু সর্ব্বংসহ ধর্ম্মপ্রাণ জাতি চিন্তা জগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।"

এই প্রাচীন প্রথার পুনরভিনয় প্রবল বেগে আরম্ভ হয়েছে। "আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে প্রাচীন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্ম্মবিশ্বাস সমূহের ভিত্তি পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় মানব জাতিকে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবী করিয়া থাকেন, তাহা শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছে, আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবল মুষলাঘাতে প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কার সমূহকে ভঙ্গুর কাচপাত্রের ন্যায় গুঁড়াইয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম কেবল অজ্ঞদিগের হস্তে এবং জ্ঞানিগণ ধর্ম্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" এই ভাঙ্গাচোরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই এক অতি-মানব, সকল সাধনার মধ্যদিয়ে এক অতিউচ্চ অতিমহান সত্যে দাঁড়িয়ে জগতকে নূতন করে গড়বার জন্য কোটী জীমূত মন্দ্রে "মানুষের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব, জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত

নহে, পূর্ব্বাবস্থিত কোন কিছুর বিকাশ মাত্র, এতদ্বিষয়ক মতবাদ, যুগপ্রবাহ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত নিয়মাবলী এবং এতদ্বিধ অন্যান্য তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত সার্ব্বজনীন বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচার কচ্চেন।"

বেদান্তের সকল তত্ত্ব এক বিরাট সত্যের উপর দণ্ডায়মান "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—"যত মত তত পথ"—এই সত্য হিন্দুর প্রতি রক্তবিন্দুতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই শক্তিরই বলে ভারত তাহার ক্রোড়ে জৈন, বৌদ্ধ, পারসীক, মুসলমানদের স্থান দিয়েছে এবং বর্ত্তমানে খ্রীষ্ট ধর্ম্মও সেই শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাচ্ছে। এখানেই, এখানেই কেবল হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টানদের মসুজিদ্ গির্জ্জা গড়ে আর এই শান্তির হাওয়ায় বাস ক'রে মুসলমানও শিখেছে কি ক'রে তাদের হিন্দুর মন্দির গড়্‌তে হয়। এরই নাম পরধর্ম্মে সহানুভূতি বা Toleration. Toleration মানে দ্বেষরাহিত্য—অপর ধর্ম্মকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে মাপ্ করা নয়, তাদের জন্য প্রাণপণ করা। যেখানে এর অভাব সেখানে বুঝিতে হবে হিন্দুত্বের অভাব। হিন্দুর কায গড়া, যেখানে ভাঙ্গা সেখানে বুঝতে হ'বে হিন্দুত্বের অভাব। এখনও "অন্যান্য দেশের মহা মহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাক সিঁট্‌কাইয়া আমাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন। আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি; তাহারা স্থির হইয়া কখন এটি ভাবে না যে, তাহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কার সকল বর্ত্তমান। এখনও সর্ব্বত্র এই ভাব,—এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই ঘোর সঙ্কীর্ণতা! তাহার নিজের যাহা আছে, তাহাই জগতে মহা মূল্যবান্ সামগ্রী! অর্থোপাসনাই তাহার মতে জীবনের একমাত্র সদ্ব্যবহার! তাহার যাহা আছে, তাহাই যথার্থ উপার্জ্জনের বস্তু, আর সকল কিছুই নহে! যদি সে মৃত্তিকায় কোন অসার বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, তবে আরসব ফেলিয়া দিয়া তাহাকেই ভাল বলিতে হইবে! জগতে শিক্ষার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র জগতের এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক জগতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন—জগতে এখনও সভ্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি, এখনও কোথায়ও সভ্যতার আরম্ভ

মাত্র হয় নাই, এক্ষণে মনুষ্যজাতির শতকরা ৯৯.৯ জন অল্প বিস্তর অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে তোমরা অনেক বড় বড় কথা পড়িতে পার, পরধর্ম্মে বিদ্বেষ রাহিত্য ও এতদ্বিধ উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, জগতে এই ভাবগুলির বাস্তব সত্তা বড় কম; শতকরা নিরানব্বই জন, এসকল বিষয় মনেও স্থান দেয় না।"

চিন্তারাশির মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ চিরকালই বর্ত্তমান থাকবে। সব বৌদ্ধ, সব খৃষ্টান, সব মুসলমান বা সব নাস্তিক এ কোন কালেও হবে না—ভেদ চিরকালই থাকবে; কারণ বৈচিত্র্যই জগতের সত্তা, বৈচিত্র্যই জগতের প্রাণ। যখন বৈচিত্র্য থাকেনা তখন জগতও থাকে না—ইহা ব্যষ্টি মানবের অতীন্দ্রিয় অবস্থার অনুভূতি। কিন্তু যখন সমষ্টি জগতও উহা অনুভব করবে তখন জগৎ ছায়াবাজির মত মহাশূন্যে নিভে যাবে। কিন্তু বৈচিত্র্য থাকলেই যে আমাদিগকে পরস্পর ঘৃণা কত্তে হ'বে, দ্বেষ কত্তে হ'বে, হাতিয়ার চালাতে হবে এর কোনও সার্থকতা নেই। এখন জগতের এই সন্ধিক্ষণে আমাদিগকে শেখাতে হবে শিখতে হবে, ধর্ম্মরাজ্যের শিশু-জগৎকে মঙ্গলময় পরশিবের মহিম্ন স্তোত্র,—

ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাং
নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

—বেদ সাংখ্য পাতঞ্জল, বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান—সকল ধর্ম্ম নদী রুচি ভেদে সরল কুটিল নানা পথগামী হয়ে সেই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে সমাপ্ত হ'বে।

বদরীর পথে শঙ্কর।

(২)

(শ্রীমতী)

নূতন স্থানে আসিলে সেই স্থানের ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গ সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সন্ন্যাসীর দল লোকমুখে অতীতের বহু ইতিহাস শুনিতে লাগিলেন। কান্যকুব্জ নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রাচীনকালের সেই ব্রহ্মদত্ত রাজার কথা শুনিলেন। ক্রমে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে শঙ্কর বৈদিকধর্ম্মের দুরবস্থার কথা শুনিলেন। ব্রাহ্মণগণ বহু সময়ে বিচারে জয়ী হইলেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যের কারণ রাজ সাহায্য। আর তাহা পরলোকগত হর্ষবর্দ্ধনের সময়ই ঘটিয়াছে। ইহার কারণ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণগণ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "মহাত্মন্! গৌড় দেশের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র বর্দ্ধন হর্ষবর্দ্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে কৌশলে হত্যা করেন। হর্ষবর্দ্ধন তাহাতে বিচলিত হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধা করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় করেন আর তদবধি বৌদ্ধগণের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ দেখুন গঙ্গাতীরে শত হস্ত উচ্চ সহস্র সহস্র স্তুপ হর্ষবর্দ্ধনের নির্ম্মিত। ঐ দেখুন বিংশ হস্ত উচ্চ ধাতুনির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি হর্ষবর্দ্ধনের কীর্ত্তি। ঐ যে সূর্য্যদেবের মন্দির ঐ যে মহেশ্বরের মন্দির উহাদের প্রতি রাজার কোন যত্ন ছিল না। রাজা অসামান্য দাতা হইলেও অধিকদান বৌদ্ধগণই পাইত। আজ যদিও তিনি পরলোকগত কিন্তু এখন যে কে রাজা তাহার স্থিরতা নাই। কুমারিল স্বামীর নিকট বৌদ্ধগণের ভীষণ পরাজয় হইয়াছে পরে কি হইবে জানি না।" এইরূপ নানা কথা শুনিতে শুনিতে কয়েক দিন অতীত হইল। সনন্দন প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকের অনুসন্ধান করিয়া কয়েকখানি সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর শঙ্কর কান্য-কুব্জ ত্যাগ করিলেন।

এই স্থান হইতে কয়েকদিন গমনের পর শঙ্কর গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী মনোরম নগরী মধ্যে আসিলেন। তথায় সর্ব্বত্র 'বাঁধা ঘাট ও দেব-মন্দির বিরাজ মান। শঙ্কর লোকমুখে শুনিলেন ইহার নাম 'শূকর-ক্ষেত্র' (?)। নৃসিংহদেব এই স্থানে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন এবং তদবধি উহার এই নাম হইয়াছে। নচেৎ পূর্ব্বে ইহা 'উকল-ক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থান হইতে মথুরা বৃন্দাবন যাওয়া যায়। পুণ্যার্থিগণ মথুরা বৃন্দাবন হইয়া এই স্থানে আসিয়া গঙ্গাস্নান করেন। ভগীরথ গঙ্গা আনিবার জন্য এই স্থানে এক গুহামধ্যে দুশ্চর তপস্যা করেন। শঙ্কর সে গুহা দেখিলেন। এখানে সীতারামের মূর্ত্তি দর্শনের পর নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন! সনন্দন নৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন ইহা কেহই জানিতেন না। নৃসিংহদেব দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। প্রাণের আবেগ নিবৃত্তির জন্য তিনি স্বীয় অভীষ্টদেবের উদ্দেশে একটী স্তব রচনার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া করজোড়ে বলিলেন "ভগবন্! আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত কোন স্তোত্ররত্নদ্বারা ভগবানের স্তুতি করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার জন্য একটী স্তব রচনা করিয়া দিলেই আমার এ বাসনা পূর্ণ হয়।" শঙ্কর সনন্দনের বাসনা বুঝিয়া প্রসন্নচিত্তে নিম্নলিখিত স্তবটী রচনা করিয়া দিলেন।

"তৎ প্রভুজীবপ্রিয়মিচ্ছসিচেন্নরহরি পূজাং কুরু সততম্
প্রতিবিম্বালংকৃতি ধৃতি কুশলো বিম্বালংকৃতিমাতনুতে।
চেতোভৃঙ্গভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদ সরসিজ মকরন্দম্ ॥১
শুক্তৌরজত প্রতিমা জাতা কটকাদ্যর্থ সমর্থাচেৎ,
দুঃখময়ী তে সংসৃতিরেষা নির্বৃত্তিদানে নিপুণাস্যাৎ।
চেতোভৃঙ্গভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজ মকরন্দম্ ॥ ২
আকৃতি সাম্যাচ্ছাল্মলি কুসুমেস্থলনলিনত্ব ভ্রমমকরোঃ
গন্ধরসাবিহ কিমু বিদ্যেতে বিফলং ভ্রাম্যসি ভৃশবিরসেঽস্মিন্।

চেতোভৃঙ্গ ভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং,
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজ মকরন্দম্ ॥৩
স্রক্‌চন্দনবনিতাদীন্ বিষয়ান সুখদান্ মত্বা তত্র বিহরসে,
গন্ধফলী সদৃশ ননু তেঽমী ভোগানন্তর দুঃখকৃতঃ স্যুঃ।
চেতোভৃঙ্গ ভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজ মকরন্দম্ ॥৪
তবহিতমেকং বচনং বক্ষে শৃণুসুখ কামো যদি সততং।
স্বপ্নেদৃষ্টং সকলং হি মৃন্ম জাগ্রতি চ স্মর তদ্বদিতি।
চেতোভৃঙ্গ ভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং,
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজ মকরন্দম্ ॥৫

সনন্দন মনের সাধে স্তবটী পাঠ করিয়া ভগবানের পূজা করিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সনন্দনের সহিত যোগদান করিলেন। এইরূপে শূকর-ক্ষেত্রে (?) কয়েকদিন অবস্থিতির পর শঙ্কর সশিষ্য উত্তরাভিমুখে চলিলেন। (এই স্থানটীর বর্ত্তমান নাম সোরণ)

এই স্থান হইতে কয়েকদিন পথ চলিয়া শঙ্কর হস্তিনাপুরের নিকট আসিলেন। দেখিলেন হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। মধ্যে মধ্যে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সেই অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। ইহার অনতিদূরে আসিয়া শঙ্কর সেই কণ্বমুনির আশ্রম দেখিলেন এবং তৎপরে পুরাণ-প্রসিদ্ধ বেনরাজার রাজধানী দেখিলেন। (এস্থানটীর বর্ত্তমান নাম বিজনৌর) অনন্তর এখানকার দর্শনীয় বিষয়গুলি দেখিয়া শঙ্কর এইবার হরিদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কয়েকদিন পথ চলিয়া মায়াপুর নামক সেই দক্ষরাজার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের শোভা অতুলনীয়। উত্তর দিকে বিরাটকায় নগাধিরাজ হিমালয়। দক্ষিণে দিগন্তস্পর্শী শস্য শ্যামল সমতল ক্ষেত্র। অসীমতায় উভয়ই অতুলনীয়। কেহই অপর অপেক্ষা হীন নহে। পতিতপাবনী ভাগীরথী দেবী পর্ব্বত রাজরূপ অবরোহণীর সাহায্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছেন। নগরমধ্যে এই সন্ন্যাসী দলের সমাগমে নগরবাসীর দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট করিল। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া

অনেকেই ইঁহাদের সঙ্গ লইল। পরিচয়ে সন্ন্যাসিদলকে বৈদিক পথাবলম্বী জানিয়া জৈন বৌদ্ধগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগকে দেবালয়ে স্থান দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শঙ্কর কিন্তু গঙ্গাতীরে একবৃক্ষ মূল অবলম্বন করিলেন। গঙ্গার শীতল বায়ু স্পর্শে সন্ন্যাসী-দিগের পথশ্রান্তি অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সকলে এখানে গঙ্গাস্নান করিয়া দেবদর্শনে বহির্গত হইলেন। তীর্থগুরুগণ সন্ন্যাসীদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাদিগকে প্রথম দক্ষেশ্বর শিব সমীপে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন এই স্থানটী দক্ষরাজার গৃহ ছিল, এই স্থানেই দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন; পরে নিজ ভ্রমদূর হইলে দক্ষরাজ এই শিব প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক পূজা করিয়া ছিলেন। এই শিবের যে ব্যক্তি পূজা করেন তিনি আর অশিব (অমঙ্গল) প্রাপ্ত হন না। তাহার একটু দক্ষিণকোণে অবস্থিত সতীকুণ্ড প্রদর্শন করাইয়া পাণ্ডাগণ সন্ন্যাসীদিগকে বলিলেন "মহাত্মাগণ! এই স্থানে সতী দেহত্যাগ করেন, যে স্ত্রীলোক সাত রবিবার এই কুণ্ডে স্নান করিবেন তিনি সতীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন।" এই কথা বলিয়া পাণ্ডাগণ অনতিদূরে শৈলোপরি রক্ষিত শিবের ত্রিশূল তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করাইলেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহারা কুশাবর্ত্তের ঘাট, নারায়ণ শিলা, ব্রহ্মকুণ্ড, গঙ্গাদেবী, বিষ্ণুপদচিহ্ন, বিদুরের তপস্যাস্থান, ভীমের স্বর্গারোহণ কালে গদা ত্যাগের স্থান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, সকলে গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষমূলে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু যিনি ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহার কি কিছুর অভাব ঘটে? হরিদ্বারবাসী ব্রাহ্মণেরা সন্ন্যাসিবৃন্দের ভগবন্নির্ভর ভাব বুঝিয়া ইতিমধ্যেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। বাস্তবিক, এরূপ সাধু সেবা করিয়া কে না ধন্য হইতে চাহে? একজন ধনী ব্রাহ্মণ গললগ্নীকৃতবাস হইয়া সন্ন্যাসীদিগের সমীপে আসিয়া সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। সুতরাং এদিন এইভাবেই অতিবাহিত হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(২)

কর্ম্মের পথ।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই জগতের দাসত্বরূপ বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া মহান্ মানব যে সাধনায় আত্মোপলব্ধি লাভ করিতে পারে তাহার নাম কর্ম্ম-তপস্যা।

কর্ম্মের কথা লইয়া একটা সমস্যা চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচ্য দর্শনের মতে কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন, আবার কর্ম্মই, বন্ধন মুক্তির অস্ত্র, ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ভেলা স্বরূপ। কর্ম্ম সম্বন্ধে যে যথেষ্ট মতভেদ আছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকাম, নিষ্কাম, বিষয়ী, ত্যাগী, ভক্ত, জ্ঞানী, নানা মত নানা পথ।

গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।

কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য এ বিষয়ের বিচারে মনিষিগণও বিমোহিত হন। গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়েই এই ভগবদুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা অর্জ্জুনের তুল্য মনিষীও যখন কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচারে বিমোহিত হইয়াছেন, তখন আর অন্যের সম্বন্ধে কথা কি!

কিন্তু তথাপি ভগবান্ গীতায় কর্ম্মকেই সংসার সমুদ্র উত্তরণের উপায় বলিয়াছেন। গীতার একটী মাত্র অধ্যায়ের নাম 'কর্ম্মযোগ' হইলেও সমস্ত গীতাখানি যেন সেই একই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে—জড়ত্ব মোচনে মানবত্বে উপনীত হইলে কর্ম্ম ভিন্ন পথ নাই। জ্ঞান চাও—কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ কর; ভক্তি চাও,—কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিকে সঞ্জীবিত কর; প্রেম চাও,—

কর্ম্ম দ্বারা প্রেমকে বিকশিত কর।* হে বীরহৃদয়, দৌর্ব্বল্য জনিত ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হও, জীবন যুদ্ধে জড়ত্বের বন্ধন ক্ষয় কর, মনুষ্যত্বের জয়শ্রী লাভ কর, আপন প্রয়াসে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হও।

ইতিহাসও এই কথা পরোক্ষে প্রচার করিতেছেন। গীতা শ্রীভগবানের উপদেশ ইতিহাস সেই উপদেশের উদাহরণ স্বরূপ। এইজন্য ইতিহাসও গীতার ন্যায় আমাদের নিত্য প্রণম্য। জগতে লোকশিক্ষার জন্য যত যত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার হইয়াছে ইতিহাসেরও যে সেই সকলের সমশ্রেণীতে আসন তাহাতে আর ভুল নাই। যখন আমরা ইতিহাসের স্রোতে মনের নৌকা ভাসাইয়া যাত্রা করি তখন শত শত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিলয় শত শত জাতির জাতীয় উত্থান পতন—নানা বিচিত্র ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলিত মানব সমাজের বহুবিধ পরিবর্ত্তনের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বাহিরের রাজ্য হইতে আমরা আর এক রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করি। সে রাজ্য মানুষের অন্তরের রাজ্য সেখানে কেবল অবিশ্রান্ত মনুষ্যত্বের সাধনা চলিয়াছে। ইতিহাস অধ্যয়নে মনে হয়, জগৎ যেন এক মহাসমুদ্র; শৌর্য্য ভীরুতা, ত্যাগ, স্বার্থপরতা, স্নেহ প্রেম করুণা, দারুণ নৃসংশতা এ সমস্তই সেই এক মহাসমুদ্রের তরঙ্গের উত্থান পতন। সেই উত্থান পতনের তরঙ্গাভিঘাতে, অনন্তযাত্রায় মহামানব তাহার মনুষ্যত্ব নৌকার হাল দৃঢ় করিয়া ধরিয়া আছে। মানুষ জন্মে কেন? মনুষ্যত্ব লাভ করিতে। মরে কেন? তাহাও মনুষ্যত্ব লাভের প্রয়োজনে। ইতিহাস এই চিরন্তন সত্য চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছে।

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদ বলে "আগে জড় পরে জীব সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে জীব জড়কে শাসন করিবে। জড়াপ্রকৃতি জীবের

* জ্ঞান ও প্রেম কর্ম্ম সাধ্য নয় কারণ যাহা সাধ্য তাহা নশ্বর। জ্ঞান ও প্রেম স্বয়ং বিকাশ—কর্ম্ম উহার আবরণ সরাইয়া দিতে পারে, উহা উৎপন্ন করিতে পারে না। গীতার তাৎপর্য্য কর্ম্মে নয়—কর্ম্ম ত্যাগে।
—উঃ সঃ।

অধিকার ও জীব তাহার প্রভু হইবে। বৃক্ষাদি উদ্ভিদ জড় না হইলেও নিষ্কর্ম্মক পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমবিকশিত হইল। পিপীলিকা মৌমাছি প্রভৃতি কীট পতঙ্গ সহজাতবুদ্ধির আশ্রয়ে প্রকৃতির অঙ্কে লালিত হইতে থাকিল ইহাদের সসীম উন্নতি শীঘ্রই চরম সীমায় উপস্থিত হইল; কিন্তু সমেরু (Vertibrate) জীবের উন্নতি কর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়া "মনুষ্যত্ব" নামক এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল যে যেখানে আর সীমার কোন পরিমাপ রহিল না। মৌমাছির আত্মত্যাগে, পিপীলিকার অদ্ভুত কর্ত্তব্য পালনে কখনও ত্রুটী হয় না, তাহারা প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট সহজ পথ ধরিয়া অনায়াসে জীবনের পথে চলিয়া যায়। কিন্তু মানুষ—প্রতিক্ষণে পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে যাইতেছে; কর্ত্তব্য ভুলিয়া অকর্ত্তব্য করিতেছে, নিজের জীবনের পথ নিজ কর্ম্মফলে ক্রমশঃ জটিল ও দুঃখময় করিয়া তুলিতেছে—এবং ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে সে কীট পতঙ্গ নয়, সে মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরু আর দেয়ালই থাকে। মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কয় আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।" মানুষ সাধারণত প্রকৃতির ক্রীড়া পুত্তলী; দুর্দ্দম প্রবৃত্তির ইঙ্গিত অনুসারে সে জীবনের পথে ছুটিয়াছে গুরুভার বাহ্যাবস্থার নিষ্পেষণ তাহাকে যন্ত্রবৎ যথানির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য করিতেছে। অতীতের কর্ম্মসূত্র তাহার বর্ত্তমানকে নিয়মিত করিতেছে কিন্তু তথাপি মানুষ—মানুষ। প্রবল নিয়তির অনুশাসনে মানব জীবন ভাসিয়া যায় বলিয়াই মানুষ যে স্বাধীন, স্বাধীনতাই যে তাহার ধর্ম্ম তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষকারের অর্থ প্রারব্ধ লঙ্ঘন। প্রারব্ধ না থাকিলে পুরুষকারের কোন অর্থই থাকিত না। জড় জগতের সহস্র বন্ধন অজড় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশের আয়োজন স্বরূপ। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যা প্রকৃর্তে জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

জ্ঞানবান্‌গণও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করেন। প্রাণীসমূহ

প্রকৃতির অনুসরণ করে অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কে করিবে?" অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেই প্রকৃতির দাস। যতদিন তাহাদের সুখ দুঃখের অনুভূতি বিকশিত হয় নাই, ততদিন সহজাত সংস্কারে তাহার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে এবং সুখ দুঃখের অনুভূতি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব অনুরূপ প্রকৃতির নির্দ্দেশে দুঃখ পরিহারে অথচ সুখের অভিলাষে ধাবিত হইতেছে। বুদ্ধি-সম্বল জ্ঞানী-অজ্ঞানী বিদ্বান-মূর্খ সকলেরই একপথে গতি এবং ইহাই মানবের সাধারণ জীবন। স্বভাব অর্থ দাসত্ব, মানব যখন স্বভাবের সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধ করে তখন সেই স্বভাবকে কিরূপেই বা অতিক্রম করিবে?

কিন্তু মানুষ হার মানে নাই। মনুষ্যত্বের বীজ অবিনাশী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

ভোগসুখ তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, সুবর্ণ রাশির চাপেও সে ধ্বংস হয় না, সম্মানের মাদকতার স্রোতেও তাহা ভাসিয়া যায় না। জগতে যত কিছু ভোগ সুখ সম্ভব নৃপতি শুদ্ধোধন তাঁহার কুমারের জন্য তাহা আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সুখ-বিলাসের কুসুম-শয্যাতেই সহসা কুমারের মনে বিষাদের উদয় হইল। এই বিষাদ যোগেই গীতার প্রারম্ভ।

(ক্রমশঃ)

মুক্তির খেয়াল।

(বিমলানন্দ)

পড়ে থাকি মৃত্তিকায় সূতা বাঁধা আকাশেতে উড়ি।
যেই সূতা কেটে যায় পুনরায় মাটিতেই পড়ি॥
বন্ধন দিয়েছে মোরে জোর করে আকাশেতে তুলে।
আগে আমি বুঝি নাই মুক্তি আছে বন্ধনের মূলে॥

সেবা।

(বিশোক)

লোকের অভাব দেখলেই তা দূর কর্‌বার যে একটা প্রবৃত্তি, সেটা মানুষের ভিতরেই থাকে, সে ভাবের উদয় করতে বাইরে কিছু খুঁজতে যেতে হয় না। এই প্রবৃত্তিটিকে চল্‌তি কথায় দয়া ব'লে থাকে এবং সেই দুঃখ নিবারণ করতে মানুষ যে উপায় অবলম্বন করে তাকেই সেবা বলে সকলে জানে।

মানুষ স্বভাবতঃই সমাজবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে চায়। হয়ত কোন স্মরণাতীত কালে মানুষ একলা বাস করত, কিন্তু বর্ত্তমানে সমগ্র মনুষ্য জাতির মানসিক অবস্থা একটু পর্য্যালোচনা করলে জানতে পারা যায় যে, একলা বাস করা মানুষের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তবে কি মানুষ কখনও একলা বাস করে না, না করতে পারে না? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ—কোন নিয়মই পর্য্যাপ্ত নয়, সব নিয়মেই ব্যতিক্রম আছে বা থাকে। কবে মানুষ একলা বাস করত বা একেবারেই করত না, কিংবা কতদিন তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করবেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। মোটের উপর আমরা দেখ্‌তে পাই যে যেদিন থেকে মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে সুরু করলে, সেইদিন থেকে সে পরস্পরের অভাব বোধ করতে লাগল, এবং তার মনে এই ভাব উঠল যে, তার ভাইএর অভাব দূর করা যায় কি না? সকল মানুষই কিছু সকল বিষয়ে সবল ছিল না, কারও হয়ত দেহটা রুগ্ন—মনটা খুব দৃঢ়, আবার কারও হয়ত মনটা তত সবল না হলেও দেহটা বেস মজবুত ছিল। এখন গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে থাকার দরুন একটা সুবিধা হ'ল যে এক ভাই অন্য ভাইএর অভাব বুঝ্‌তে পাল্লে এবং সেই অভাব দূর করার ইচ্ছে একের মনে উঠল। এমনি করে সেই স্মরাণাতীত আদিমকালে মানুষের ভেতরে যে দয়া ছিল তাই মূর্ত্ত হয়ে উঠল এবং সেই অভাব দূর করতে সেবারও

প্রবর্ত্তন হ'ল। রকমারী সেবা—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি। প্রথমতঃ অভাবের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না—কারণ তখন মানুষ জাতের ছেলেবেলা (একথাটা ধরে নেওয়া গেল, কারণ কবে যে মানুষের সৃজন হয়েছে বা মানুষ বরাবর আছে, এ মস্ত গবেষণার বিষয়)। যেমন আমাদের ছেলেবেলায় অভাব খুব কম থাকে—তেমনি মানুষ-জাতের ছেলেবেলায় যে তাদের অভাবের ফর্দ্দ আজকের তুলনায় ঢের কম ছিল, একথা বেশ বড় গলা করে যদি বলা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই নানা তর্ক উঠবে না, এবং এ বিষয়ে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি।

আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের পিতামহদের দেখেছেন এবং তাঁদের দিনের কথা যদি কারও মনে থাকে বা অপরের কাছ থেকে শোনা থাকে, তা হ'লে তার সঙ্গে যদি নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের তালিকাটি মিলিয়ে দেখেন, তাহ'লে স্পষ্টই দেখবেন, যে আজ তাঁদের অভাবের ফর্দ্দে অনেক গুলি অঙ্ক বেড়ে গিয়েছে।

কেন যে এই অভাব বাড়ল, বা অভাব বাড়া উচিৎ কি অনুচিৎ—স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, দেশের পক্ষে কল্যাণকর কিনা কিংবা ব্যক্তি হিসাবে অভাবে কি সুবিধা বা অসুবিধা হয় তা আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বাইরে। আমাদের আলোচনার বিষয় যা অভাব দেখতে পাচ্ছি তা দূর করার কোন উপায় আছে কিনা এবং থাক্‌লে সে উপায়গুলি কতটা সমীচীন ও কার্য্যকরী।

উপায় আছে একটিমাত্র—সেবা।

আমরা এখন যা আলোচনা করব তা আমাদের দেশের অভাবগুলি এক একটি নিয়ে এবং তার উপায় সেবা দ্বারা হয় কিনা এবং আমাদের আলোচনার ফল নিয়ে অন্যান্য সমস্ত দেশগুলির বিষয় মাপকাটিতে মেপে নেওয়া যেতে পারে কি না।

এখন দেখা যাক্ সেবা কথাটা আমাদের দেশের সাধারণে কি অর্থে ব্যবহার করে? লোকে সেবা বলতে প্রথমে বোঝে রোগীর সেবা করা, তারপর বড় জোর সাধু অথিতি বা পূজ্য ব্যক্তির পরিচর্য্যা করা; তবে ভারতের কোন কোন প্রদেশে সেবা ভোজনের অর্থে ব্যবহৃত হয় শোনা

গিয়াছে; এ ছাড়া সেবা বহু রকমের হতে পারে সে সব বিষয় আলোচনা পরে হবে—এবারকার মত সেবার প্রধান অর্থ বা সাধারণ অর্থ 'রোগীর সেবা' করা এই ভাবটাই আমরা নিলাম। আমাদের দেশে আজকাল অনেক হাঁসপাতাল হচ্ছে বা আছে, সরকারী ও বে সরকারী যেখানে বিনা অর্থে রোগীদের সেবা করা হয়। কিন্তু তা পর্য্যাপ্ত নয়, তাই দেশে নূতন নূতন, হাঁসপাতাল এবং কোথাও কোথাও দেশী লোকে সেবাশ্রম খুলেছে। উদ্দেশ্য যাতে পীড়িতের চিকিৎসা যথাযথ হয়, এবং যথাসম্ভব পীড়িতদের না ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সরকারী বা বে-সরকারী হাঁসপাতালে কিরূপ চিকিৎসা ও সেবা হয় সে সম্বন্ধে যদি কাউকে সত্য মতামত প্রকাশ করতে অনুরোধ করা হয়, তা হলে অপ্রিয় আলোচনার হাত থেকে এড়াবার জন্যে তাঁরাও প্রসঙ্গ তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন—থাক্। আমরাও সেই পথই নিলাম। এতে সত্য গোপনের পাপ ও নীতি-শাস্ত্রের অপমান কল্লাম। কিন্তু নিরুপায়।—

সাধারণতঃ যাঁরা সেবা ধর্ম্ম গ্রহণ করেন—অর্থাৎ যাঁরা আজীবন বা দীর্ঘ কিছুকাল ধরে সেবা করব এই ব্রত নেন—তাঁরা সকলেই গোপনে কাজ আরম্ভ করেন দেখা গিয়েছে। আর এই ভারতবর্ষে যেখানে আতুরের সেবা একটা কর্ত্তব্য ছিল সেখানে তাঁদের গোপনে কাজ করতে হয়! কেন? লোকে সহানুভূতি ত' করেই না, উপরন্তু ঘৃণা করে, কুকুর বেড়ালের অধম দেখে, তাঁদের বলে যে এরা সর্ব্বনাশের পথে গিয়েছে, মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কেননা এরা রোগী ঘাঁটে, মূত্র বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, অতি ঘৃণিত নীচ বৃত্তি! হায় হায়! দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা! অথচ এমন একদিন ছিল—যেদিন এই ভারতবর্ষে—সন্ন্যাসীর কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ লোকের হিত করাই তাঁর একমাত্র কর্ম্ম—প্রত্যেক গৃহস্থ অপরের সেবা না করাকে—বিশেষতঃ সেই অপর যদি আতুর হয়—তার সেবা না করাকে মহা অমঙ্গল ও অকল্যাণের কাজ বলে মনে করত।

যাঁরা সেবা করতে প্রথমে সুরু করেন, তাঁরা একাধিক হলে, বেশ সুবিধার সহিত মিলে মিশে কাজ করেন; কিন্তু যদি একলাই হন তাতেই বা ক্ষতি কি?—একলা কাজ করবেন তিনি। মহাপ্রাণকর্ম্মী সঙ্গীর

অপেক্ষায় বসে থাকেন না, তিনি কাজ সুরু করলেই অনেক গুণগ্রাহী কর্ম্মী এসে জোটে।

এখন একটা দরকারী কথা এর সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে। সেবা কি ভাবে চলবে? অনেকে হয়ত ভাব্‌বেন যে 'ভাবে আবার কি রকম?' সেবা ত 'সেবা'ই তার আবার 'ভাবটাব' কি? আর ঐ সব ভাবের কথায় তোমরা সমস্ত কাজ নষ্ট কর, কাজের আবার ভাব কি রকম; কিন্তু ভাব আছে—কাজ আর কিছুই নয় ভাবেরই ঘন মূর্ত্তি—আর কাজের সঙ্গে—সেবার সঙ্গে যদি ভাবের অনৈক্য হয় তা হলে সেবা কাজ চলে না। মূলতঃ তিনটে ভাব নিয়ে সেবা চলতে পারে। প্রথমতঃ দয়ার ভাবে—দ্বিতীয়তঃ উপাসনার ভাবে—তৃতীয়তঃ আত্ম ভাবে। এখন দেখা যাক কোনটা বেশী কার্য্যকরী।

সাধারণ লোকের অপরের দুঃখ দেখলে তা মেটাবার ভাব দয়া থেকে উঠে। রাম দুঃখী এবং পীড়িত, তার কেউ নেই যে তাকে দেখে, বা তার শুশ্রূষা করে; শ্যামের অর্থ ও সামর্থ আছে—সে রামের দুঃখ দেখে অনুকম্পা পরবশ হয়ে তাহার সাহায্য করতে উদ্যত হল—যতটা তার দেবার অভিরুচি হল, যতটা তার সমাজ ও পদমর্য্যাদা ও অন্যান্য জিনিষ করতে বল্লে। এই সমাজের ও পদমর্য্যাদাদির কথা তুল্‌লাম এই জন্যে যে প্রায়ই দেখা যায় যে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁরা পদস্থ ও ধনী ব্যক্তি হন। সুতরাং তাঁদের পদমর্য্যাদা—মান এবং লোকের কথায় বেশ একটু খেয়াল রাখ্‌তে হয়। অবশ্য তাঁরা অনেকের দুঃখ মেটান্, অনেকের সেবা করেন একথা খুব সত্যি কিন্তু একটা জিনিষ যা তাঁদের সেবাটাকে সুচারু ও পরিপূর্ণ করেনা তা হচ্ছে তাঁরা যা করেন তার বেশীর ভাগই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয় না। হয়ত কেউ শুন্‌লেন অমুক জাগায় খুব মহামারী হচ্ছে—খবরের কাগজ পড়ে ও অন্যান্য সূত্রে জান্‌তে পারলেন, পীড়িতদের কিঞ্চিৎ অবস্থা, কেউ কেউ ফুরসৎ করে মহামারীর স্থান, সেখানকার পীড়িতদের অবস্থাও দেখে এলেন, কিন্তু সেখানে তিনি নিজে থেকে ব্যবস্থা করতে পারলেন না অর্থ ও কিছু লোক সাহায্য করে তিনি চলে এলেন। তাতে ফল হল এই যে, তাঁর দয়ায় সবটা কাজে এলোনা। কারণ নিজে

নিজে না দেখ্‌লে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না, অনেক সময় গভীর ত্রুটি থেকে যায়। দয়ার ভাবে এই ত্রুটি সেবাকে অনেক সময় সুচারু করে না, এবং দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে মোটেই কার্য্যকরী হয় না। কারণ দয়ার ভাবে একটা মস্ত দোষ যে, সর্ব্বদা দাতা ও গৃহীতার মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান সৃজন করে। আজ উদ্দেশ্য বিহীন দয়া করতেও ত কই আজ পর্য্যন্ত কাউকে দেখলাম না, তবে অনেকে বলেন যে, ওই না দেখাটা যুগের দোষ—কিন্তু যুগের দোষ হলেও নিছক সত্যি কথা।

নিজের হাতে কোন কাজ না করলে যেমন সেটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, তেমনি আবার কাজের শেষে আনন্দও পাওয়া যায় না। আর আনন্দই হ'ল আসল জিনিষ। দয়া থেকে উদ্ভূত সেবাকাজে যে আনন্দ পাওয়া যায় না একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হবে, কিন্তু সে আনন্দও পর্য্যাপ্ত নয়। দয়ার ভাবে সেবা বিশেষ কার্য্যকরী না হলেও ওর খুব দরকার আছে কারণ ওটা প্রাথমিক।

এই যে এত প্রাথমিক জিনিষ দয়া—অপরের দুঃখ দেখে তা দূর করবার একটা সৎভাবের উদয়, তাও আজকাল আমাদের দেশে বিরল হয়ে পড়ছে। অথচ আমরা শুন্‌ছি দেশের উন্নতি হচ্ছে। যে দেশের লোকে একলা খেতে পারত না—সে দেশের লোক অপরের বিপদ দেখ্‌লে নিজের বাড়ীর কথা—সুবিধা অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে পীড়িতকে সেবা করে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিত—পীড়িতের জাতি ধর্ম্ম, স্ত্রী পুরুষ কিছু ভেদ ছিল না—পীড়িত হলেই হল—তাকে সেবা করাই ধর্ম্ম ছিল সেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থা জেনে শুনেও যাঁরা জান্‌তে চান্‌না তাঁদের আজ আমি বলছি, আজ যে তুমি রোগী দেখ্‌লে দশহাত দূরে সরে যাও—পাগল দেখ্‌লে পুলিশে দেও, যে ভাই তোমার জন্যে খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলছে তার দিকে না তাকিয়ে তারই উপার্জ্জন তারই রক্ত—সেই রক্ত মাথান টাকা নিয়ে ফূর্ত্তি করছ, আর ভাবছ তুমি ত নিজে বেশ সুখে আছ, তাতে জগতের যাই হোক না কেন? সুখে তুমি কিছুতেই থাক্‌তে পার না, ভগবানের রাজ্যে এত অবিচার হয় না। যে করুণ দৃষ্টি আজ তুমি উপেক্ষা করছ—যে অশ্রুজল তুমি ঘৃণা করছ—যে আর্ত্তনাদ তুমি সঙ্গীত দিয়ে

ঢাকবার প্রয়াস করছ—যে বুভুক্ষু—তুমি নিজে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে অন্ন খাচ্ছ বলে একবার ফিরেও দেখ্‌লে না, তারা তোমায় কিছুতেই শান্তি দেবেনা, একদিন আসবে যেদিন তোমার অন্তরাত্মা তা সহ্য কর্ত্তে পারবেন না, তিনি ব্যথিত পীড়িতের দুঃখে কেঁদে উঠবেন—সেইদিন তোমার হয়ত সামর্থ্য কমে যাবে, অর্থের অনটন হবে, তখন তুমি 'কি করেছি' বলে সারাজগতে হায় হায় করে বেড়াবে। তাই বল্‌ছি, হে ধনি, আজ সময় আছে, আজই তুমি দেবব্রত লও, সেবা করে ধন্য হও ফূর্ত্তিকে আর শান্তিকে এক বলে ভুল করো না। ফূর্ত্তির অবসাদ সঙ্গে সঙ্গে, আর শান্তি নিত্য, অক্ষয়।

(ক্রমশঃ)

উদ্দেশে।

(ললিত)

আসিয়াছ দীনবেশে দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে,
করিবারে বিদ্যাগর্ব্ব আদর্শ জীবনে খর্ব্ব,
হে মহিমময়!
পঞ্জিকায় আছে লেখা বিশ আড়া জল,
নিঙাড়িলে নাহি মিলে কিছু।
পুঁথিগত বিদ্যা যাহা তথা ফলপ্রদ তাহা,
অভিমানী ফিরে যায় পিছু।
কি তপস্যা—কি সাধনা—কি সে আত্মজয়,
আচরিয়া দেখায়েছ হইয়া সদয়।
জগতের পাপ-তাপ, করি দেহ পণ
ব্যাধিরূপে করিলে হে কণ্ঠের ভূষণ!
এই রোগ-জীর্ণ দেহে তবু স্নিগ্ধ তব স্নেহে!
দীন আমি কিবা ক'ব করুণ-কাহিনী তব!

গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া। *

(শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্, বি।)

আমাদের দেশে গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া হইলে প্রায়ই গর্ভিনীর অকাল মৃত্যু বা শিশুর অপমৃত্যু হইয়া থাকে। এজন্য আমাদের সকলেরই এসম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

উৎপত্তি।

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে ম্যালেরিয়া একপ্রকার বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আনুবীক্ষণ পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে ইহা এক-প্রকার জীবাণুর কার্য্য। শুধু ম্যালেরিয়া নয় আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রায় সকল রোগই জীবাণু সম্ভূত,—যথা কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে কলেরার সময় জল ফুটাইয়া খাইলে ঐ রোগ হয় না—কারণ ঐ সব জীবাণু মরিয়া যায়। এই জীবাণু আমাদের দেশে এক প্রকার মশা আছে যাহাকে এনোফিলিশ বলে তাহাদের দংশন হইতেই মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

এই ম্যালেরিয়ার বীজাণু সম্বন্ধে পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথমে ইটালি দেশে হয় তৎপরে ক্রমে অন্যান্য স্থানেও পরীক্ষিত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া-কীট-বহনকারী-মশা সাধারণতঃ জলাস্থানে বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন পুষ্করিণী পানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ দ্বারা আবৃত থাকে তথায় ইহাদের জন্মিবার প্রধান স্থান। এই সব পুষ্করিণীর পাড়ের দিকে ইহারা ডিম পাড়ে। ভাঙ্গা কলসী বা হাড়ি প্রভৃতিতে জল কিছুদিন জমিয়া থাকিলে সেখানেও মশা জন্মাইয়া থাকে। গরুর বিচালি-খাইবার-ডাবা প্রত্যহ পরিস্কার না করিলে ঐ রক্ষিত পচা জলেও মশা জন্মায়।

প্রতিবিধান।

(ক) এই জন্য যাহাতে আমরা এই সকল মশার দংশন হইতে

* কৃষ্ণনগর—"শিশু-মৃত্যু-নিবারণী" সভায় পঠিত।

পরিত্রাণ পাইতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের দেখা উচিত যে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যেন ভাঙা চূরা অব্যবহার্য্য মৃৎপাত্রাদি পড়িয়া না থাকে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে। বাড়ীর নিকটে পুরাতন জঙ্গলাবৃত পুষ্করিণী থাকিলে তাহা পরিষ্কার করাইয়া লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ গাছপালা যতদূর পরিষ্কার রাখা সম্ভব সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। খুব সামান্য খরচে এই মশা মারিতে হইলে কিছু কেরোসিন তৈল ঐ সকল জলাস্থানে ছিটাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।"

(খ) মশারি টাঙাইয়া শুইলে ইহাদের হাত হইতে কতকটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

(গ) কুইনাইন্ সপ্তাহে ১০ গ্রেণ করিয়া দু'বার খাওয়া উচিৎ—বিশেষতঃ বর্ষাকালে।

এই জীবাণু কি প্রকারে আমাদের শরীরে মশকদংশনের সহিত প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার ক্রিয়ায় কিরূপ জ্বরের প্রকাশ ঘটে তাহাও আমাদের সামান্যভাবে জানিয়া রাখা উচিত।

এই শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া যখন কোনও সুস্থকায় ব্যক্তিকে দংশন করে তখন ঐ সুস্থ ব্যক্তির রক্ত শোষণ কালে ম্যালেরিয়ার বীজ তাহার শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় এবং ঐ বীজ রক্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনা আপনিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বেশী পরিমাণ বীজ রক্তে জমিয়া গেলেই জ্বর প্রকাশ পায়। এই রোগ মানুষের শরীর যে একেবারে ধ্বংস করিয়া দেয় ইহার পরিচয় কৃষ্ণনগরবাসীগণকে বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে না।

গর্ভাবস্থায় এই রোগ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ :—

(১) মা সুস্থ ও সবল না হইলে ছেলে কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। দেখা যায় যে গর্ভাবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই প্রসব সমাপ্ত না হইলে প্রসূতির জ্বর ত্যাগ হয় না। আবার অনেকলোকের ধারণা যে গর্ভাবস্থায় কুইনাইন না দেওয়াই উচিত। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রায়ই গর্ভিনীকে কুইনাই দেওয়া হয় না। ফলে রোজই অল্প অল্প জ্বর দেখা দেয় এবং গর্ভিণী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতে থাকে।

অনেক সময় এমন দুর্ব্বল হইয়া যায় যে প্রসব করিবার পর্য্যন্তও ক্ষমতা লোপ পায়। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে উপযুক্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থায় কুইনাইন সেবনে কোন গর্ভিণীর কখনও কোনও কুফল হইতে পারে না। পরন্তু এইভাবে ভুগিয়া ভুগিয়া অনেক গর্ভিণী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন বা প্রত্যহ খুব বেশী জ্বর হইলে গর্ভপাত পর্য্যন্ত সম্ভব। প্রত্যেকের জানা উচিত যে মাতা বা শিশুর পক্ষে প্রবল জ্বরের উত্তাপই ক্ষতি করে—কুইনাইন নহে। কারণ জ্বর বৃদ্ধির সহিত জরায়ু মধ্যস্থ যে তরল পদার্থ যাহাতে ভ্রূণের অবস্থিতি তাহা উত্তপ্ত হয়। উহা অধিক উত্তপ্ত হইলেই ছেলের পক্ষে হানিকর হয় এবং অত্যধিক জ্বরে গর্ভপাত হইতে পারে। কুইনাইন কখন খারাপ করে না—যদি উহা ঠিক ভাবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা সময় মত ব্যবস্থিত হয়—বরঞ্চ ইহাতে এই প্রবল জ্বর শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

(২) গর্ভাবস্থায় মাতার শরীরে অধিক পরিমাণে রক্তের আবশ্যক। এই জন্য এই সময় প্রসূতির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। কারণ গর্ভাবস্থায় তাহাকে নিজের শরীর পালন ছাড়া আর একটী শিশুর পুষ্টিসাধন করিতে হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া আমাদের শরীরের রক্তবীজ নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া রোগী রক্তহীন হইয়া পড়ে। গর্ভাবস্থায় যখন অধিক রক্তের প্রয়োজন সেই সময় ঐ বিষ আরও রক্তহীন করিয়া দেয়। বিশেষতঃ যদি কুইনাইন না খাইয়া অনেকদিন ধরিয়া রোগিণী ভুগিতে থাকে লাভে হয় এই পীড়িতা প্রসবের পূর্ব্বে রক্তহীন হওয়ায় ফুলিয়া পড়ে। যদি সময়মত চিকিৎসা হয় তবে ঐরূপ হইতে পারে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এখানেও সেই কুইনাইন সম্বন্ধে কুসংস্কার নানাপ্রকার দুঃখের কারণ সৃজন করে।

(৩) গর্ভাবস্থায় বেশীদিন এই রোগে ভুগিলে মাতা স্বাস্থ্যহীনা হইয়া পড়েন। ফলে শিশু উপযুক্ত পুষ্টি অভাবে স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে পারে না এবং ক্রমশঃই মাতার দুর্ব্বলতার সহিত শিশুও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রসবের পর দেখা যায় যে একটী ক্ষীণাঙ্গ শিশু ভূমিষ্ঠ

হইয়া বাঙ্গালায় জড়তার ভার বৃদ্ধি করিয়াছে। মাতা ম্যালেরিয়ায় বেশীদিন ভুগিলে—বিশেষতঃ কুইনাইন খাওয়া অভ্যাস না থাকিলে—দেখা যায় যে এই সদ্যজাত শিশুর পেটেও প্লীহা হইয়াছে। কখনও কি আশা করা যায় যে এই সব প্লীহাগ্রস্ত শিশু অধিকদিন জীবিত থাকিয়া দেশের ও দশের উপকারে আসিবে? দেশের এই শারীরিক অধঃপতনের দিনে প্রত্যেক মায়ের প্রধান কর্ত্তব্য যাহাতে এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত এবং ক্ষীণাঙ্গ শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়।

(৪) বেশীদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিলে স্বাস্থ্যহীনতা ও উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে প্রায়ই মাতার প্রসবের পরে স্তনে দুগ্ধ থাকে না। ফলে সুস্থকায় শিশু জন্মাইলেও (যদিও সে আশা খুব কম) উপযুক্ত স্তন্য দুগ্ধ অভাবে শিশুর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয় এবং কোন রকমে শিশু ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেও ricket (রিকেট্) প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে শিশুর পক্ষে মাতৃ দুগ্ধ ছাড়া অন্য কোন দুগ্ধ বা পেটেণ্ট খাদ্যাদি বিষবৎ। দুঃখের বিষয় এই যে কোন কোন মাতা—অবশ্য বড়লোকের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আলোকিতা হইয়া আয়া প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন এবং শিশুকে স্তন দিতে আপত্তি করেন—তাঁহাদের জানা উচিত যে ইহার ফলে শিশুর মৃত্যু বা ক্ষীণ-জীবী হওয়ার পথ প্রসারিত করিতেছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ঃ—

কুইনাইন কখনও গর্ভাবস্থায় মাতার বা শিশুর কোন ক্ষতি করে না যদি সময় মত এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা দেওয়া হয়।

২। ম্যালেরিয়া জ্বর হইলেই প্রথম হইতে ভালভাবে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা গর্ভিণীর চিকিৎসা করান উচিত। তাহা হইলে প্রসবের সময় বা পরে আক্ষেপের কোনও কারণ থাকে না।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় জানান যাইতেছে যে সূতিকাগার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। কারণ, স্যাঁতসেতে, বদ্ধবায়ু, অন্ধকার, ম্যালেরিয়া-বিষবাহী মশকের আবাসভূমি। আরও জানা উচিত যে শিশুদের পক্ষে ম্যালেরিয়া

বিষ বিশেষ মারাত্মক কারণ ঐ বিষ উহাদের শরীরে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পরিব্যাপ্ত হয়। অনেকেরই ধারণা শিশুদের পক্ষে কুইনাইন ক্ষতিকর—তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

ম্যালেরিয়াগ্রস্থা গর্ভিনীর প্রসবের সময় শিক্ষিতা দাই বিশেষ দরকার। কারণ স্বাস্থ্য খারাপ থাকার দরুণ ইঁহারা শীঘ্রই সুতিকা জ্বরে আক্রান্ত হন। গৃহিনীদের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা বেশ করিয়া দেখিয়া লন, ধাইরা যেন প্রসব করানর পূর্ব্বে কারবলিক সাবান দিয়া গরম জলে তাদের হাত ধুইয়া লয়। সম্প্রতি একটী রোগিনীর অবস্থা উল্লেখযোগ্য। এই রোগিনী উপরিউক্ত সামান্য ক্রটীর জন্য অর্থাৎ ধাত্রী হাত না ধুইয়া জরায়ুর মধ্যে হাত দেওয়ায় টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। উহাকে এখানকার সিভিল সার্জ্জন সাহেব ও আমি উভয়েই দেখিয়াছি—পাঁচ পয়সা বাঁচাইতে গিয়া লক্ষ টাকারও অধিক দামী প্রাণটী খোওয়াইতে হইয়াছে! *

শেষে বক্তব্য এই যে যদিও আমরা জানি, দারিদ্র্যই ম্যালেরিয়ার একটী প্রধান কারণ—দরিদ্র হইলেই গর্ভিনীর যা দরকার তাহা অপেক্ষা কম খাইতে হয়, উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও বিশ্রামের সুযোগ পায় না এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য পায় না—তবুও গর্ভাবস্থায় কুইনাইন বর্জ্জন, কোষ্টবদ্ধ রাখা, যথেষ্ট বিশ্রাম না দেওয়া প্রভৃতি কুসংস্কার ত্যাগ করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

বদ্ধ জ্বর বা কুইনাইন আটকানো জ্বর।

লোকের ধারণা যে কুইনাইন খাইলে জ্বর চাপা থাকে। অর্থাৎ কিছুদিন পরে উহা পুনঃ প্রকাশ হয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে আমরা

* প্রশ্ন হইতে পারে—সাবান প্রভৃতির ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল না, তখন লোকে সুস্থ থাকিত কি করিয়া? উত্তর—(১) দেশকালের পরিবর্ত্তনে আমরা সহরবাসী হইয়া পড়িয়াছি। (২) রেল জাহাজের মধ্য দিয়া নানা দেশের ব্যাধি আমাদের দেশে প্রসারলাভ করিতেছে। (৩) সহরের ঘনসন্নিবেশ এবং নাগরিক জীবনের সাধারণ নিয়মাবলীর অনভিজ্ঞতায় মল মূত্র, নিষ্ঠিবনের ইতস্ততঃ বিক্ষেপ—এই তিনটী কারণের অভাবহেতু পূর্ব্বের লোক সবল সুস্থ থাকিত।

প্রায়ই ২।৪ দিন কুইনাইন সেবন করিয়া ছাড়িয়া দিই। আমাদের রক্তে যে বীজাণু থাকে—এক এক শরীরে এক লক্ষ বা ততোধিক; তাহা অল্প পরিমাণ কুইনাইনে মরে না।—ফলে কিছু থাকিয়া যায়। ১০।১৫ দিন পরে উহা বাড়িতে বাড়িতে পূর্ব্ব সংখ্যা প্রাপ্ত হইলেই জ্বর দেখা দেয়। কিছুদিন ধরিয়া কুইনাইন খাইলে উহা হয় না। তবে খারাপ বীজাণু হইলে আলাদা কথা।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেই বাসনাত্রয় অর্থাৎ লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা অবিবেকীদিগের নিকট 'উপাদেয়' বা গ্রহণীয় বলিয়া প্রতীয়মান্ হইলেও, বিবিদিষু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের অন্তরায় বলিয়া এবং বিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার বিরোধী বলিয়া বিবেকী ব্যক্তির নিকট হেয়।

এই হেতু স্মৃতিশাস্ত্রে (সূতসংহিতা, যজ্ঞবৈভবখণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৪ অধ্যায়)—

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে ॥*

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা বশতঃ লোকের যথোপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না।

আর যে দম্ভ দর্প প্রভৃতিরূপ আসুর সম্পদ্‌স্বরূপ মানস বাসনা আছে

* টীকা—চৈত্র সংখ্যায় ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাহা নরকের কারণ বলিয়া, তাহার মলিনতা সর্ব্বজনবিদিত। অতএব যে কোন উপায়ে এই চারিপ্রকার বাসনার বিনাশ সম্পাদন করিতে হইবে।

বাসনার বিনাশ সম্পাদন যেরূপ আবশ্যক, মনের বিনাশও সেইরূপ আবশ্যক। বেদমার্গাবলম্বী বক্তিগণ (বৈদান্তিকগণ) তার্কিকদিগের ন্যায় মনকে একটি নিত্য ও অণুপরিমাণ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহা হইলে মনের বিনাশ সম্পাদন দুঃসাধ্য হইত বটে। তবে মন কি প্রকার বস্তু ? মন সাবয়ব অনিত্য বস্তু, সর্ব্বদা জতু স্বর্ণ প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় বহুবিধ পরিণামের যোগ্য। বাজসনেয়িগণ (বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১।৫।৩) মনের লক্ষণ ও মনের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ এইরূপে পাঠ করিয়া থাকেন :—

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রী র্ধী-র্ভী-রিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি—

কাম—স্ত্রী প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধাভিলাষ, সঙ্কল্প—ইহা নীল ইহা শুক্ল ইত্যাদি প্রকারের বিশেষ বিশেষ নিশ্চয় ; বিচিকিৎসা—সংশয় জ্ঞান, শ্রদ্ধা —অদৃষ্ট বিষয়ে আস্তিক্য বুদ্ধি ; অশ্রদ্ধা—তদ্বিপরীতবুদ্ধি ; ধৃতিঃ—ধারণ অর্থাৎ দেহাদি অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে উত্তম্ভন করা অর্থাৎ চাগাইয়া তোলা ; অধৃতিঃ—তাহার বিপরীত ; হ্রীঃ—লজ্জা , ধীঃ—প্রজ্ঞা ; ভীঃ—ভয় ইত্যাদি সকল মনই ; কেননা, এইগুলি বৃত্তি হইলেও বৃত্তিমান মন হইতে ভিন্ন নহে। ইহা মনের লক্ষণ। ঘটাদি যেরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ কামাদি বৃত্তি ক্রমে উৎপন্ন হইয়া সাক্ষিপ্রত্যক্ষ হইয়া অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এই সকল বৃত্তির যাহা উপাদান, তাহাই মন ; ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

"অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শ মন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেষ পশ্যতি মনসা শৃণোতি" ইতি (বৃহদা ১।৫।৩)

আমি অন্যত্রমনা বা অন্যমনস্ক হইয়া ছিলাম, এই হেতু দেখি নাই ; আমি অন্যমনস্ক হইয়া ছিলাম অতএব শুনি নাই। যেহেতু লোকে (আত্ম-সাক্ষিক) মনের দ্বারাই দেখিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শ্রবণ করিয়া থাকে। ইহাই মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ চক্ষুর নিকটবর্ত্তী এবং পূর্ণ দৃষ্টির

বিষয়ীভূত ঘট এবং কর্ণের সন্নিকৃষ্ট উচ্চৈঃস্বরে পঠিত বেদ, যে বস্তু সংযোগ না থাকিলে প্রতীত হয় না এবং যাহার সংযোগ থাকিলে প্রতীত হয়, সর্ব্ববিধ উপলব্ধির সাধারণ কারণ বলিয়া সেইরূপ একটি পদার্থ মন—অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। "তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি"—(বৃহদা ১।৫।৩)

মন বলিয়া একটি বস্তু আছে বলিয়াছি; কাহাকেও তাহার চক্ষুর অগোচরে স্পর্শ করিলে সে মনের দ্বারা জানিতে পারে।—ইহা (উক্ত শ্রুতিবাক্যের) এক উদাহরণ। যেহেতু (শ্রুত্যুক্ত) লক্ষণ ও প্রমাণ দ্বারা মন বলিয়া একটি বস্তু আছে ইহা সিদ্ধ হইল, সেই হেতু তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে এইরূপে উদাহরণ দিলেই হইবে। দেবদত্তকে কেহ পৃষ্ঠভাগে (অর্থাৎ তাহার দৃষ্টির অগোচরে) স্পর্শ করিলে দেবদত্ত বিশেষরূপে জানিতে পারে—ইহা হস্তস্পর্শ, ইহা অঙ্গুলিস্পর্শ ইত্যাদি। যেহেতু সেস্থলে দৃষ্টি চলে না (অর্থাৎ চক্ষু হস্তস্পর্শ দেখিতে পায় না) এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের সামর্থ্য কেবল মৃদুতা ও কঠিনতা উপলব্ধি করা পর্য্যন্ত (তদধিক আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না), সেইহেতু পারিশিষ্যের নিয়ম দ্বারা (Law of Elimination) ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মন বলিয়া সেই বস্তুটিই সেই হস্তস্পর্শ অঙ্গুলিস্পর্শ-রূপ বিশেষ জ্ঞানের কারণ। মনন করে বলিয়া তাহাকে মন এবং চিন্তন * করে বলিয়া তাহাকে চিত্ত বলে। সেই চিত্ত সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণময়; কেননা, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ যাহারা যথাক্রমে সত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য তাহারা সেইমনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকাশ প্রভৃতি যে (সত্বাদি) গুণের কার্য্য তাহা ভগবদ্গীতার (চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ২২শ্লোকে) গুণাতীত লক্ষণ হইতে জানা যায়। কেন না—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।"

সত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ। রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি এবং তমো গুণের কার্য্য মোহ হে অর্জ্জুন, ইত্যাদি।

---

* চিন্তন শব্দে অনুসন্ধান, প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতি ও অনুভববৃত্তি বুঝাইতে পারে।

সাংখ্যশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

প্রকাশ প্রবৃত্তিমোহা নিয়মার্থাঃ।* সাংখ্যকারিকা (১২,)

সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, রজোগুণ দুঃখস্বরূপ এবং তমোগুণ মোহস্বরূপ। স্বত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজোগুণের প্রয়োজন প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের প্রয়োজন নিয়মন, নিরোধ বা অনিয়ত গতির প্রতিরোধ।

এস্থলে প্রকাশ শব্দের অর্থ শুভ্রোজ্জ্বল রূপ নহে কিন্তু জ্ঞান; কেননা, ভগবদ্‌গীতায় কথিত হইয়াছে—

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসোলোভ এবচ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেবচ॥ (গীতা—১৪।১৭)

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে, আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে।

জ্ঞানের ন্যায় সুখও সত্ত্বগুণের কার্য্য—তাহাও কথিত হইয়াছে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মনি ভারত।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ (গীতা—১৪।৯)

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখের সহিত সংশ্লোষিত করে—অর্থাৎ, দুঃখ শোকাদির কারণ উপস্থিত থাকিলেও দেহীকে সুখাভিমুখ করে। রজোগুণ, সুখাদির কারণ উপস্থিত থাকিলেও দেহীকে কর্ম্মের সহিত যোজিত করে, এবং তমোগুণ, মহতের সঙ্গ হইতে সঞ্জাত জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের উপদেশ সম্বন্ধে অনবধানতায় যোজিত করে এবং আলস্যাদিতেও সংযোজিত করে।

উক্ত গুণত্রয় সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে; তন্মধ্যে কোন সময়ে কোনটি প্রবল হয় এবং অপর দুইটি তদ্দ্বারা অভিভূত হয়। তাহাই গীতায় (১৪।১০) কথিত হইয়াছে:—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বংরজস্তথা॥

হে ভারত, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব যেমন প্রবল

* সাংখ্যকারিকার পাঠ (১২ সংখ্যক)। কিন্তু—প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তি ...াঃ। তদনুসারেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

হয়, তেমনি আবার রজোগুণ সত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে এবং তমোগুণ সত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে।

"বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে *"

সাগরের তরঙ্গসমূহ যেমন পরস্পর বাধ্যবাধকভাবাপন্ন, গুণত্রয়ও সেইরূপ, অর্থাৎ "ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের আবির্ভাবের হেতু, পরস্পরই পরস্পরের নিত্যসঙ্গী" †।

তন্মধ্যে তমোগুণের উদ্ভব বা প্রাবল্য হইলে আসুর সম্পদের উদয় হয়; রজোগুণের উদ্ভব হইলে লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা এই বাসনাত্রয় উদিত হয়; সত্বগুণের প্রবলতা হইলে দৈবীসম্পৎ উৎপন্ন হয়। এই অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ইতি (গীতা ১৪।১১)

এই ভোগায়তন শরীরে শ্রোত্রাদি সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে যখন শব্দাদি নিজ নিজ বিষয়ের আবরণ-বিরোধী পরিণামবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন, এবং (সময়ান্তরে, সুখাদি চিহ্নের দ্বারাও) বুঝিতে হইবে যে সত্বগুণ প্রবল হইয়াছে।

যদিও অন্তঃকরণ সত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণের দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি সত্বগুণই মনের মুখ্য উপাদানকারণ। আর রজঃ ও তমঃ এই দুইটি গুণ সেই সত্বগুণের উপষ্টম্ভক। যে উপকরণ উপাদানের সহকারীরূপে থাকে তাহাকে উপষ্টম্ভক বলে ‡।

* অচ্যুতরায় বলেন, এই শ্লোকার্দ্ধ "বৃহদ্ বাশিষ্ঠ বচন"; কিন্তু বাশিষ্ঠ রামায়ণে এই বচনটি এযাবৎ আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

† "অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ"—সাংখ্যকারিকা, ১২,।

‡ গ্রন্থকার সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংখ্যাকারিকা হইতে এই উপষ্টম্ভক শব্দটি সংগ্রহ করিয়াছেন; তথায় আছে—"সত্ব লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ"—ইহা এইরূপে বুঝান হইয়াছে—

এই হেতু যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানীর রজঃ তমোগুণ অপনীত হইলে মনের স্বভাবগত সত্বই অবশিষ্ট থাকে। ইহাই বুঝাইবার জন্য কথিত হইয়াছে—

"জ্ঞস্য চিত্তমচিত্তং স্যাজ্‌জ্ঞচিত্তং সত্বমুচ্যতে"—জ্ঞানীর চিত্ত চিত্তই নহে, জ্ঞানীর চিত্তকে সত্ব বলে এবং সেই সত্বগুণ চাঞ্চল্যের হেতু যে রজোগুণ, তদ্বর্জ্জিত হওয়াতে, (সর্ব্বদাই) একাগ্র এবং যে তমোগুণ ভ্রান্তিকল্পিত অনাত্মস্বরূপ স্থূল পদার্থাকারের হেতু, তাহা তাহাতে না থাকাতে সেই সত্ব সূক্ষ্ম। এই হেতু সেই সত্বগুণ আত্মদর্শনের যোগ্য।

"সত্ব লঘুতাপ্রযুক্ত কার্য্যতৎপরতাযুক্ত হইলেও, স্বয়ং ক্রিয়াহীন; যেমন বড় বড় এঞ্জিন, চালাইয়া দেও খুব চলিবে, কিন্তু না চালাইলে একেবারে জড়। রজোগুণ স্বয়ং ক্রিয়াশীল এবং প্রবর্ত্তক অর্থাৎ চালক; রজোগুণের চালনে সত্বগুণ পরিচালিত হয়, তখন তাহার কার্য্যতৎপরতা প্রকাশ পায়। কিন্তু এই দুইগুণ জগতে শৃঙ্খলা রাখিতে অসমর্থ;—ক্রিয়াশীল চালক রজোগুণ এবং কার্য্যতৎপর সত্বগুণ উভয়ে মিলিত হইলে সত্বগুণের সকল কার্য্য একেবারেই হইয়া পড়িতে পারে। মনে কর—অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন সত্বগুণের কার্য্য, কিন্তু এই উর্দ্ধজ্বলনের সীমা হয় কেন? দুই হাত দশ হাত পর্য্যন্ত অগ্নি শিখা উর্দ্ধে উত্থিত হয়। কিন্তু অনন্ত আকাশের উন্মুক্তমার্গে অসীম উর্দ্ধজ্বলন না হয় কেন? এই না হওয়ার জন্যই তমোগুণের প্রয়োজন; গুরুত্বযুক্ত তমোগুণ ঐ দুইগুণের কার্য্যকে নিয়মিত করে। গুরুত্ব কার্য্যতৎপরতার প্রতিবন্ধক, উর্দ্ধগমনের প্রতিবন্ধক। তমোগুণের বাধা বশতঃই উর্দ্ধজ্বলন অসীম হয় নাই। সত্বরজগুণের সকল কার্য্য সম্বন্ধেই তমোগুণের এইরূপ বাধা আছে জানিবে। সত্ব বা রজঃ প্রবল হইলে তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্যই কতকটা উর্দ্ধজ্বলন হয়, নতুবা তাহাও হইত না। এদিকে নিষ্ক্রিয় তমোগুণের কার্য্য হইবার পূর্ব্বে রজোগুণ তাহার সহায় হয়। রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়াই তমোগুণ স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম হয়"—পঞ্চাননতর্করত্ন সম্পাদিত সাংখ্য দর্শন, ১০২ পৃষ্ঠা।

গোকুল তনয়া দেবী ঠাকুরানী দাসী।*

(শ্রীম—)

কে গো সতি! কাঁদিছ নীরবে
লয়ে শিশুপুত্র শ্রীমধুসূদন!
ক্রন্দনের রোল চারিদিকে হায়
উঠিছে, কাঁদে তব পুত্র কন্যাগণ,
পিতৃহারা আজ তারা, না মানে প্রবোধ!
শ্রীগৌরঙ্গ অন্তরঙ্গ, কর্ণপুর পিতা—
সাধু-শিবানন্দ-কুলোদ্ভবা,
স্নেহময়ী মাতা তব
গোকুল-গৃহিনী সতি,
কাঞ্চন পল্লীর গঙ্গাকুলে অনুমৃতা—
যবে ভ্রাতা তব শ্রীগুরু প্রসাদ
কর্ম্মস্থলে প্রবাসে পিতার
ঈশ্বর-প্রাপ্তি আনিল বারতা।
হায়! স্মরিয়া সে সব বিবরণ,
অনুরূপা কন্যা তুমি দেবি,
তাই কি ভাবিছ বারবার
পতি-সহ-মরণের কথা!
ভাবিছ কি (আর) স্নেহময় শ্রীগোকুলচন্দ্র
সহমৃতা পতি, পিতা তব যিনি,
প্রেমে মাতুয়ারা ভাই রামপ্রসাদ মুখে,
কভু তব সঙ্গে—বালিকা তখন তুমি,

---

* প্রাপ্তি অনুমান, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ। ৺মধুর জন্ম ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয় কাঞ্চন পল্লীতে।—কথামৃতের লেখক।

কভু শুনিতেন কীর্ত্তনের মধুর লহরী,
যাহে, ব্রহ্মময়ী শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী
প্রত্যক্ষা হ'তেন ভক্ত হৃদি পদ্মাসনে।
কেঁদো না কেঁদো না সতি,
অতি সুকুমার তব মধু,
আর কিছুদিন তারে করহ পালন।
হে সাধ্বি! রামকুমার ঘরণি,—
ভয় নাই—তব গুণে আজ
অমৃতের অধিকারী পতি তব।
এবে নারায়ণরূপে সেবো গো তনয়ে
গৌরীভাবে পালহ তনয়া।
প্রসাদ ব্রহ্মময়ী সুত, স্নেহ দৃষ্টি তাঁর
পড়েছে, শৈশবকালে তোমার উপর,
তবে কেন সতি ত্যজিবে এ দেহ
সাধনের জন্য যাহা পেয়েছ ধরায়!
দুর্লভ এ মনুষ্যজনম—
অনিত্য জানিয়া এ সংসার
লহ ব্রহ্মচারিনীর ব্রত সনাতন,
পতি তব শ্রীপতির ছায়ারূপ
ভজ শ্রীপতিরে যতদিন রহে প্রাণ
যাঁর তত্ত্ব মাতৃভাবে করেন প্রসাদ।
পরম পবিত্র বংশ—বংশধরগণ *
তব করিবে দর্শন রাতুলচরণ
শ্রীনাথের, যখন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে
ধরাধামে আসিবেন নারায়ণ
জগন্মাতা শক্তি সঙ্গে মা আমার,

---

* শুরু প্রসাদের প্রপৌত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত ৺রাধানাথ রায় প্রভৃতি।

ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে—
দূরিতে জীবের দুঃখ।
সার্থক হইবে তব প্রত্যহ অর্চ্চনা
মহাদেবী জগজ্জননীরে,
যবে অপরাহ্নে গৃহকার্য্য সব সারিবার পরে,
স্নান করি পবিত্র জাহ্নবী জলে তুমি,
পূতবারি-পূর্ণ-কুম্ভ-কক্ষে,
বাটী ফিরিবার পথে,
অষ্টধাতু মাতা জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে
নীরবে পূজিতে মার অভয়চরণ,
প্রেম ভক্তিভরে জপিতে মায়ের নাম।
হে দেবি! তব বংশে হবে শ্রীহরি দর্শন।
ধন্য পুত্র তব শ্রীমধুসূদন, *
হৃদয়ে যাঁহার প্রবাহিবে ইষ্ট ধ্যান,
হাস্যমুখ, বাল্যভাব, মুখে দুর্গা নাম;
আসিবেন পুত্রবধূ লক্ষ্মী স্বরূপিনী
বিদ্যারূপা সরলা মাতা স্নেহের পুত্তলী,
সর্ব্বংসহা জন্মিবে নন্দন শ্রীরামকৃষ্ণ দাস—
তস্য-অনুদাস,
সার্থক জনম যার হবে
করিয়া শ্রীহরি পাদপদ্ম-দরশন।

---

* ভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন, সম্পর্কে গোকুলের পিসাতো ভাই তখন কাঞ্চন পল্লীগ্রামে (কাঁচড়া পাড়ায়) ছিলেন ; পরে হালিসহরে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।

নবীনের কথা।

(শ্রীসত্যন্দ্রনাথ মজুমদার)

তর্কে বহুদূর—তত্রাচ তর্ক করিতে হয়। তরুণ মনের নবজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা ক্ষুধিতশার্দ্দুলের মত জীবন ও জগতের রহস্য চিরিয়া চিরিয়া দেখিতে চাহে, উপলব্ধি করিতে চাহে। জানিতে চাহে কোন্ সার্ব্বজনীন আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মানুষ তাহার ধর্ম্ম-নীতি সমাজ-নীতি গড়িয়াছে। মানুষের সমষ্টিহিসাবেই হউক আর ব্যষ্টিহিসাবেই হউক—প্রত্যেকটী কার্য্য ও চিন্তা আদর্শের অনুকূল-ভাবে ব্যক্ত হইতেছে কি না? যদি ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধ ও প্রতিবিধান কল্পে কোন্ পন্থায় অগ্রসর হইলে সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। এই স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম ইচ্ছা শক্তিকে প্রাচীনপন্থিগণ. অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া অনেক সময় করুণা বিমিশ্র ধিক্কার প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে খেলার তাসের মত মানুষ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে একই নিয়মে কতকগুলি নিয়ম ও অনুষ্ঠানের ছাদানুবর্ত্তন করিবে—প্রশ্ন করিবে না, বিচার করিবে না। যদি ঈশ্ব-রেচ্ছায় ইহা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বা সত্যযুগ (তাঁহাদের বর্ণিত) নামিয়া আসিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরূপ হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না বরং ইহাই দেখা যায়—ভালমন্দ বিচারের প্রাচীন মাপকাঠিটার প্রতি আমরা ক্রমেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠিতেছি। ইহাতে প্রাচীন ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূকুটী প্রদর্শন করেন, নবীন বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখনই তর্ক উঠে। যুক্তি ফুরাইয়া আসিলেও প্রাচীন পশ্চাৎপদ হন না। বিশ্বাসের পুরাতন ঝুলিটা বাহির করিয়া একেবারে বিশকোটী মানুষকে তাহার মধ্যে পুরিবার বন্দোবস্ত করেন। এই ঝুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে আপত্তি প্রকাশ করার অর্থ—নাস্তিক, শাস্ত্রে অবিশ্বাসী ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাচীনের মতে, জীবনে কোন সমস্যাই আর আসিতে পারে না; সব 'জলবৎ তরলং' রূপে প্রাচীন কালেরই মীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে। কতযুগ যুগান্তর গভীর গবেষণার ফলে যে নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন—মানুষের পক্ষে উহাই যথেষ্ট, সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া কি বলিতে হইবে কাঁহাদের প্রণাম করিতে হইবে, কোন্ পা অগ্রে মৃত্তিকায় স্থাপন করিতে হইবে—এইরূপে শৌচ, স্নান, আহার ইত্যাদি বাঁধা নিয়ম রহিয়াছে। এগুলি ঠিক ঠিক পালন করিয়া গেলেই হইল আবার সমস্যা কি?

দুঃখের বিষয় তবুও তর্ক উঠে। নবীন বলেন, সমগ্র জাতিটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমভাবে ঐরূপ জীবন বংশপরম্পরা যাপন করিয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, তবে যদি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বুকে পাষাণ, পিঠে গণ্ডারের চর্ম্ম বাঁধিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক খুঁটিনাটী মানিয়া চলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও মানব জাতির ইতিহাসে সেটা খুব বড় কথা নয়। মানুষের মধ্যে রুচির বৈচিত্র্য ও মতের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশেই বর্ত্তমান ছিল, আছে ও থাকিবে। কতকগুলি সার্ব্বজনীন স্বার্থের খাতিরে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবন বহুদিন হইল যাপন করিতেছে, সত্য কিন্তু বহুবর্ষেও চিন্তায় ও কর্ম্মে মানুষ সকলেই সমান হইয়া উঠিতে পারে নাই হইবেও না। তাই একটানা আদর্শে মানবজাতি চলিতে পারে না। যুগে যুগে জাতীয় স্বার্থ ও আদর্শ কত বিচিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈদিক যুগের সমাজ যে সমস্ত নিয়মে শাসিত হইত তাহার কতকগুলি আধুনিক মানব বর্ব্বরতা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে—গ্রহণ করিতেও রাজী নহে। এই নবযুগের অতীতপ্রায় প্রথম প্রচারেই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে ইহার পরিণাম সম্বন্ধে প্রাচীনের যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও তরুণের নাই। সে দেখিতেছে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলি যদি অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবী সমাজ বিপ্লবে বাঙ্গালীর জাতীয় সভ্যতা বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

বড় বড় সমস্যা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে দেখা দিয়াছিল, বাঙ্গালী

তাহার মীমাংসাও করিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নহে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচণ্ড বন্যা ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের উপপ্লাবনে যখন বাঙ্গালী সমাজ থর থর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল তখন অসাধারণ মনীষী রঘুনন্দন দণ্ডায়মান হইয়া সে সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। প্রাচীন স্মৃতির ব্যবস্থা কতক গ্রহণ কতক পরিহার করিয়া তিনি নব্যস্মৃতি প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধান দেওয়াটাই বড় কথা নয়, কেমন করিয়া সে বিধান সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটা মাথা পাতিয়া লইয়াছিল সেইটাই আজকার দিনে বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয়।

তর্ক ছাড়িয়া বিশ্বাস করিলেই যদি মিলিবার অধিক সুবিধা হয় তাহা হইলে এ ঘটনা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি কি? একবার বাঙ্গালী যে উপায়ে সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল সেই উপায়েই বর্ত্তমান সঙ্কটের মীমাংসা করিতে হইবে, ইহাই নবীনের নিবেদন। নবীন প্রাচীনকে ত্যাগও করিতে চাহে না অস্বীকারও করে না বরং প্রাচীন যদি অগ্রসর হন তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞতার সহিত পশ্চাতে চলিতে রাজী আছে। কিন্তু প্রাচীন যদি নিশ্চিন্তে অচল হইয়াই থাকেন মনুষ্যত্বের বিনিময়ে প্রাচীন তত্বটাকেই সকলের চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া শ্রদ্ধা সম্মানের দাবী করেন তাহা হইলে নিরুপায় নবীন তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিবেই। প্রাচীন তাহাকে উদ্ধত আত্মাভিমানী বলিতে পারেন কিন্তু তিনি একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবেন এ যুগ প্রয়োজনের তাড়না ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল নহে।

ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল বলিয়াই আজ অতি বড় মহামহোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও সদুপদেশ জাতি মানিয়া লইতে চায় না। সে পাণ্ডিত্য চায় না, যুক্তি বিচার চায় না, শাস্ত্রের গূঢ়ার্থের মীমাংসা সে প্রচুর শুনিয়াছে—সে চায় তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন! সে চায় মানুষ ও মনুষ্যত্ব!

অবিচারে অত্যাচারে তাই আজ বাঙ্গালার লাঞ্ছিত গণবিগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছেন। মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল মন্দিরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবীন পূজারী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত! যদি পার তবে এসো প্রাচীন তুমিও

এসো, ভক্তি বিনম্র চিত্তে—অর্ঘ্য হস্তে লইয়া—জাতি তোমাদিগকে মাথায় তুলিয়া লইবে। যদি না পার তবে অনর্থক কূটতর্ক তুলিয়া এ মহাপূজায় বিঘ্ন ঘটাইও না। একজনের কাজ আজ দশজন করিবে, দশজনের দায় একজন মাথা পাতিয়া লইবে—এ মহাব্রতে যে আসিবে সেই ধন্য, সে যে ভগবানের ডাক শুনিয়াছে। ভগবান যাহাদিগকে ডাক দিয়াছেন, তাহারা বাঁধন ছিঁড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবেই—হে প্রাচীন এ দুর্নিবার গতিরোধ করা তোমার অসাধ্য। বহুদিন পর বাঙ্গালী আজ একটা আদর্শের সন্ধান পাইয়াছে। এই আদর্শকে জাতীয় জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইলে। যে শক্তি যে অধ্যবসায় যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন; নবীন তাহা বুঝিয়া লইতে চায়! যদি শক্তি সামর্থ্যে কুলায় তাহা হইলে সে অদ্যই কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইবে। না কুলাইলে নীরবে শক্তি সাধনা করিবে। আত্ম দৌর্ব্বল্যের উপর, দম্ভের গিলটী করিয়া সে আর আদর্শকে ব্যঙ্গ করিবে না। সে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে পরমুখাপেক্ষী হইবার জন্য নহে; সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ কৌশলে কার্য্যকে অধিকতর তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য!

হাসিও না প্রাচীন—এ ক্ষণিকের খেলা নহে। নবীন জানে যে গুরুদায়ীত্ব ভার সে স্কন্ধে লইয়া মরণের মধ্যদিয়া অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছে। জাতি নষ্ট হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন বিধান দিতেছেন সমুদ্র যাত্রা নিবেধ। নবীন জাতিকে রক্ষা করিবার জন্যই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া বৃহস্পতিপুত্র কচের মত দৈত্যপুরে যাইতেছে, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার জন্য। কোমরে ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া শূন্য উদরে সে আর সনাতন আচার নিয়মের বড়াই করিতে চায় না। সে, শক্তিমান পুরুষ সিংহের মত পর্য্যাপ্ত ভোগায়োজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া বসিতে চায়। "ত্যাগে-নৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।" নবীন জানে যে তাহার অব্যাহত নিষ্ঠাকে তর্কে নহে কার্য্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। নব জীবন বিকাশের গভীর আনন্দে সে সবখানা বাঙ্গালাকে বুকদিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য সেবা উন্মুখ বরবাহু বিস্তার করিয়াছে।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

এরিষ্টটল।

(গ্রীকদর্শন)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা দেখিয়াছি একটী হেতু বাক্যের (middle term) সাহায্যে অনুমান কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়; নিগমনমূলক যুক্তিপ্রণালীর (Deductive method) হেতু-বাক্যটীই অবলম্বন স্বরূপ। এই হেতু-বাক্যের সহিত অন্য অবয়বের মোটামুটী তিন রকমের সম্বন্ধ হইতে পারে উদাহরণ সাহায্যে সেইটী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

১। মানুষ মর, রাম মানুষ, সুতরাং রাম মর, এস্থলে দেখা যাইতেছে "মানুষ" "রাম" অপেক্ষা অধিক ব্যাপক এবং 'মর' অপেক্ষা কম ব্যাপক অর্থাৎ হেতু-বাক্য (middle term) 'মানুষ' মধ্যস্থানীয়।

২। বিনয় একটী সদ্‌গুণ, ভীরুতা একটী সদ্‌গুণ নয়, সুতরাং ভীরুতা ও বিনয় একই নয়—এস্থলে হেতুবাক্য "সদ্‌গুণ" "বিনয়" ও "ভীরুতা" অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থাৎ হেতুবাক্য সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক।

৩। স্বর্ণ উজ্জ্বল, স্বর্ণ ধাতু, সুতরাং কোন কোন ধাতু উজ্জ্বল। এস্থলে হেতুবাক্য "স্বর্ণ" "উজ্জ্বল" ও "ধাতু" উভয়—পদার্থ অপেক্ষা অব্যাপক অর্থাৎ হেতু বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা অব্যাপক। এরিষ্টটল বলেন প্রথম প্রণালীই একমাত্র বিশুদ্ধ ব্যাপক-বাক্যে (Universal proposition) সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ। দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বনে কেবলমাত্র ব্যতিরেক (Negative) সিদ্ধান্ত করা চলে—যেহেতু বিনয় একটী সদ্‌গুণ, ভীরুতা একটী সদ্‌গুণ, এই দুই বাক্য হইতে অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

তৃতীয় প্রণালী অবলম্বনে কেবলমাত্র অব্যাপক (Particular) সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে প্রথম প্রণালীই আমাদের অবলম্বনীয়।

এই তিনটী উপায় অবলম্বনে যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু প্রথমটী একমাত্র Universal Proposition বা ব্যাপক বাক্য সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম। এরিষ্টটল বলেন কোন সিদ্ধান্ত সৎ কিনা সেটী পরীক্ষা করিতে হইলে যুক্তি প্রণালীর অবয়ব অর্থাৎ সাধ্যাবয়ব, পক্ষাবয়ব দুটীকে প্রথম প্রণালীর সাধ্যাবয়ব ও পক্ষাবয়বের আকারে আনয়ন করিতে হইবে এবং প্রথম প্রণালী অবলম্বনে সেইটীর সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইবে। আবর্ত্তন অবলম্বনে অন্য প্রণালীর অন্তর্গত বাক্যগুলিকে প্রথম প্রণালীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। কিম্বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রণালী অবলম্বনে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি সেইটীর বিপরীত সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রথম বাক্য বা সাধ্যাবয়বের বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, ইহা দেখাইতে হইবে। মনে কর সকল ক হয় খ, সকল ক হয় গ, সুতরাং কতক্ খ হয় গ, কখ যদি কতক্ খ, গ না হয়, তবে কোন খ, গ নয়। এখন দাঁড়াইল কোন খ, গ নয়, সকল ক হয় খ, সুতরাং কোন ক, গ নয়—কিন্তু এটী হইতেই পারে না কারণ সকল ক হয় গ, এইটী গোড়ায় আছে।

ন্যায় শাস্ত্র কেবলমাত্র নিগমনমূলক যুক্তি প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না—ব্যক্তি নিরূপণ প্রণালী Inductive method ইহার অপরতম আলোচ্য বিষয়। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি—নিগমনমূলক যুক্তি প্রণালী Deductive method অবলম্বনে একটী ব্যাপক বাক্য হইতে অব্যাপক বাক্যের সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। ব্যক্তি নিরূপণ প্রণালী অবলম্বনে আমরা অব্যাপক বাক্য হইতে ব্যাপকতর বাক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হই। বিশেষ বিশেষ পদার্থের মধ্যে সাধারণ সত্তা কি? সাধারণ কোন নিয়মের তাহারা অধীন কি না, তাহাদের সাধারণ গুণ কি? ইত্যাদি আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্য। এরিষ্টটল এই Inductive method বা ব্যক্তি নিরূপণ প্রণালীর সবিশেষ পরিচয় দেন নাই, তবে তিনি বলেন পর্য্যাবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা এই ব্যাপ্তি নির্ণয় সম্ভব এবং সহ পরিবর্ত্তন প্রণালী Method of concometant variation কে এই ব্যাপ্তি নির্ণয়ের একটী প্রকৃষ্ট পন্থা

বলিয়া উল্লেখ করেন। এই বিষয়ে আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে —এই ব্যাপ্তি নিরূপন ব্যাপারটী প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভর করে।

অব্যক্তন্যায় (Enthymeme) ও উদাহরণ Examples বস্তুতঃ Deductive method নিগমন মূলক অনুমান প্রণালী বা Inductive method ব্যাপ্তি নিরূপন প্রণালীর অন্তর্ভূত। অব্যক্ত ন্যায় ন্যায় অবয়বের কোন একটী অবয়ব উহ্য বা অব্যক্ত থাকে এবং উদাহরণ সাহায্যে কোন একটী বিশেষ বাক্য হইতে অপর একটী বিশেষ বাক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মানুষ মর, সুতরাং রাম ও মরিবে, ইহা অব্যক্ত ন্যায়ের একটী দৃষ্টান্ত এখানে রাম ও মানুষ, এই পক্ষ অব্যক্ত আছে।

থিবিস (Thebes) এবং ফেসিস (Phocis) প্রতিবেশী বিষয়ে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ অশুভ সুতরাং এথেন্স (Athens) ও থিবিসের (Thebes) মধ্যে যুদ্ধ ও অশুভ জনক* হইবে যেহেতু তাহারাও প্রতিবেশী। ইহা (Aristotle) এরিষ্টটল মতে (Examples) উদাহরণের দৃষ্টান্ত বিশেষ। তিনি বলেন প্রথম দৃষ্টান্ত হইতে আমরা ধরিয়া লই—প্রতিবেশীর মধ্যে যুদ্ধ মাত্রেই অশুভ জনক।

বুঝা গেল আমরা যাহা কিছু জানি বা সিদ্ধান্ত করি তৎ সমস্তই পূর্ব্বোক্ত দুই প্রণালী অবলম্বনে হইয়া থাকে। কোন প্রণালী অবলম্বনে আমাদের কি জ্ঞান লাভ হয় সেটী বিচার করিলে দেখা যায়, কারণ দেখিয়া কার্য্য অনুমান করাই Deductive method বা নিগমন মুলক যুক্তি প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। এবং কার্য্য দেখিয়া কারণ অন্বেষণ করাই Inductive method ব্যাপ্তি নিরূপণ প্রণালীর উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ কার্য্য ছাড়িয়া কারণ নাই, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য ঘটিতে পারে না সুতরাং একই পদার্থকে দুইদিক হইতে দেখা যায় এবং এই দুইটী প্রণালীই সেই উদ্দেশ্য সাধন করে।

* এইস্থলে প্রমান (Proof) বলিতে এরিষ্টটল কি বুঝাইয়াছেন দেখা যাউক। ব্যাপক বাক্য হইতে অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক বাক্য অনুমান করায় কোন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

মানুষ মাত্রেই মর এই ব্যাপক বাক্য জানা থাকিলে যদুও মর এই সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ হইবেই হইবে ; যেহেতু মানুষ এমন একটী ব্যাপক বাক্য যাহার মধ্যে যদুকে অবশ্য থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে অব্যাপক বাক্য হইতে ব্যাপক বাক্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটি তত সহজ নহে। যেখানে যেখানে ধূম সেইখানে সেইখানে বহ্নি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম ধূম থাকিলেই বহ্নি আছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে যাহা দেখি সেটী অব্যাপক বাক্যের অন্তর্গত তাহা হইতে ব্যাপক বাক্য সিদ্ধান্ত করিলাম। কিন্তু সদ্য নির্ব্বাপিত বহ্নি হইতে ধূম উদ্গীরণ দেখিয়া অথবা পর্ব্বতের সানুদেশে বহ্নি থাকায় পর্ব্বতের চূড়ায় ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া তত্তৎস্থলে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা ভ্রান্ত হইবে। তাই এরিষ্টটল বলেন অনুমান বা নিগমন মূলক যুক্তি প্রণালী Deductive method অবলম্বনে যাহা সিদ্ধান্ত হয় তাহাই প্রমাণিত (Proved) হইয়াছে বলা হয়। এই প্রণালীই মূলে অর্থাৎ প্রথম পক্ষ বা সাধ্যাবয়বের (major premise) সত্যতা প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয় হওয়াচাই—সে কথা মনে রাখা দরকার। প্লেটোর ভাব পদার্থের সেই মূল প্রতিজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব পদার্থ বলিতে কি বুঝায় সে কথার পুনরুল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন তবে সেটী যে একটী সাধারণ গুণ "Common quality" বা abstraction নয় এটী ভুলিলে চলিবে না। আর এক কথা যদু মরে, এ কথা বলি কেন ? না মানুষ মাত্রেই মরে বলিয়া। অন্য কথায় ব্যাপক পদার্থই কারণ (Cause) আবার এই কারণকে জানিলেই ন্যায়াবয়বের জন্য-বাক্য বা হেতু-বাক্য (Middle term) ও জানা হয়। মানুষ মর, যদু মানুষ, সুতরাং যদু মর।

এই অনুমানের প্রথম বাক্য অর্থাৎ সাধ্যাবয়ব মানুষ মর এইটী জানা থাকিলেই যদু মর, সিদ্ধান্ত করা যায় কারণ হেতু বাক্য যদু মানুষ, এইটী প্রথমটীর অন্তর্ভূত।

সাধারণতঃ দেখা যায় কোন বাক্য একটী বিশেষ্য এবং বিশেষণের পরিচয় দেয়। একটীকে আমাদের ন্যায়ের ভাষায় দ্রব্য ও অপটী গুণ

আখ্যা দেওয়া চলে। অপর দার্শনিক ভাষায় একটীকে বস্তু অপরটীকে শক্তি বলা হয়। এরিষ্টটলের মতে বস্তুর সহিত তৎ শক্তির যথার্থ সম্বন্ধ বা কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় ন্যায় শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়—একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

প্রত্যক্ষ অনুভবে আমরা ব্যষ্টির পরিচয় পাই জাগতিক ব্যাপারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি। বিজ্ঞানের কার্য্য এই ব্যষ্টির মূলে যে সমষ্টি আছে, এই বহুর অন্তরালে যে এক বর্ত্তমান, বহু যে একেরই প্রকাশ বা বিকাশ মাত্র সেই এক বা মূলকারণের অনুসন্ধান করা। এই মূল কারণের অন্বেষণ করা ব্যাপারটী ন্যায়ের ভাষায় নিগমন মূলক যুক্তি প্রণালীর হেতু বাক্য নিরূপন রূপ কার্য্যটীর সহিত অভিন্ন মনে করা চলিতে পারে। মানুষ মর, এই বাক্যটি সিদ্ধান্ত করিতে হইলে মরত্ব "মানুষ" এর বিশেষ ধর্ম্মই ইহাই প্রমান করিতে হইবে। ইহাই ন্যায়ের প্রতিপাদ্য সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ। Definition বলিতে কি বুঝি সে কথা সক্রেটীস প্রথম ব্যক্ত করিয়া যান। তাঁরমতে সত্যজ্ঞান লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিপূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় এরিষ্টটলও তাহাই বলিতে চান। যুক্তি প্রণালীর উদ্দেশ্য কি? বিজ্ঞানের প্রয়োজন কেন? এই সকল কথা বিচার করিলে বেশ বুঝা যায় সক্রেটীস যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া যান এরিষ্টটল সেইটীকে প্রণালীবদ্ধ ন্যায়াবয়বের আকারে (syllogism) গঠিত করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিলেন।—কোন পদার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই পদার্থের বাস্তবিক স্বরূপ পরিচয় জানিতে হইবে। কোন পদার্থকে সাধারণ ভাবে বুঝা এক কথা এবং বিজ্ঞানের চক্ষে দেখা অন্য কথা। সাধারণের জন্য পদার্থের সাধারণ ভাবকে বুঝাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে সুতরাং এরিষ্টটল সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ব্যাপার বলিতে কেবল মাত্র স্বরূপ পরিচয়ের কথাই বুঝান নাই; অবশ্য সেটী যে মূল উদ্দেশ্য নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। আর এক কথা সাধারণ লোকের যে সকল ধারণা (Opinion) আছে সেইগুলিকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়াই সত্যজ্ঞান (Truth) লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং প্রথমে ধারণার পরিচয় আবশ্যক। এস্থলে একটী

কথা মনে রাখিতে হইবে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ব্যাপারটী Abstraction মাত্র নহে।

এরিষ্টটল বিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন সেই কথার আলোচনায় অতঃপর অগ্রসর হওয়া যাউক। রাম বা মনুষ্য বলিতে কি বুঝি সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। রাম বলিতে কোন একটী বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝায়। মনুষ্য বলিতে চৈতন্য বিশিষ্ট বা জ্ঞান সম্পন্ন জীবকে বুঝায়। সাধারণ ইহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। এই যে সাধারণ জ্ঞান, ইহার নাম ধারণা। রাম বলিতে সাধারণ একটী বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হইতে পারে। সে কোন্ জাতির অন্তর্গত এবং সেই জাতির অন্তর্গত অপর বিশেষ হইতে তার পার্থক্য কোথায়, সেইটুকু জানিলেই তবে রাম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সত্য হইবে। বিশেষ পদার্থ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল সেই প্রণালী অবলম্বনে আমাদের বিজ্ঞানের পথে চলিতে হইবে। সুতরাং ফলে দাড়াইল বিজ্ঞানের (১) আলোচ্য বিষয় একটী থাকা চাই (২) সেই আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম কি সেটী নির্ণয় করিতে হইবে (৩) ও জ্ঞান লাভের বা সত্য লাভের মূল উপায় বা পন্থা কোনটী সেটীও স্থির করিতে হইবে। শেষের কথাটী একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। অবশ্য এ কথাটী পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে তবে এস্থলে উহার প্রয়োজনীয়তা কোথায় সেইটাই আলোচ্য। ক হয় খ, অথবা খ নয়, এই দুইটী বাক্যের একটী বাক্য অবশ্য সত্য হইবে, দুইটীই সত্য হইতে পারে না, বা দুইটীই মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা যুক্তির একটী মৌলিক নিয়ম; শুধু যুক্তির মৌলিক নিয়ম বলি কেন এরিষ্টটলের মতে সত্য লাভের পন্থা। এইরূপ মূল কয়েকটী নিয়মের উপর বিজ্ঞানের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এরিষ্টটল প্রয়াসী ছিলেন। এই নিয়মের বলেই সত্যলাভ সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে এরিষ্টটল একটী কথা বিশেষ ভাবে জানাইয়াছেন যে বিজ্ঞান এক নহে, বহু; যেমন জ্যামিতি, রসায়ন, দর্শন, পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি এবং সকল বিজ্ঞানের সাধারণ মূল ভিত্তি ছাড়া প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি নিয়ম

আছে এবং কোন বিশেষ এক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেটী ভিত্তি স্থানীয় অপর বিজ্ঞান সম্বন্ধে সেটী তাহা নাও হইতে পারে। অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষ যে নিয়ম আছে জ্যামিতি বিজ্ঞান সে নিয়ম মত নাও হইতে পারে। বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই বিশেষ বিশেষ শাখা বিজ্ঞানের মূলে যে সত্য আছে তাহাই নির্ণয় করা—বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচনা ইহার গৌণ উদ্দেশ্য।

সক্রেটিস বলেন সংজ্ঞা নির্দেশ করাই সত্য জ্ঞান লাভের প্রধান পন্থা, যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে সেই কার্য্য সুসিদ্ধ হয় এবং বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিও এই যুক্তি প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই মূল সত্যের অনুসন্ধান করা সুতরাং ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি ন্যায়-শাস্ত্রের সহিত তত্ত্ব নির্ণয়ের কোনও প্রভেদ নাই।

প্লেটো বলেন বিশেষ বিশেষ শাখাবিজ্ঞানের যে সকল বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে তাহারা একটী মূল নিয়মেরই অন্তর্গত। প্লেটোর সহিত এ বিষয়ে এরিষ্টটল একমত ছিলেন না এবং তিনি এরূপ কথা সিদ্ধান্ত করিতে কোনও প্রয়াস পান নাই। এরিষ্টটল জ্ঞান বলিতে কি বুঝিতেন সে কথা আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

দেখা গিয়াছে ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, পক্ষান্তরে আমাদের "চৈতন্য" শক্তির মর্য্যাদা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর মত আলোচনা করিলে মনে হয় বাহ্য পদার্থ আমাদের চৈতন্য শক্তির উপর একান্ত অধীন—তাহাদের সত্তা আমাদের উপর নির্ভর করে বলিলেও চলে। এরিষ্টটল এই মতে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে পারেন নাই, তিনি বলেন প্লেটোর যদি উহাই মত হয় তবে সেটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে উহাদের স্বাধীন সত্তা আছে এ কথাও তিনি স্বীকার করিতেন না এবং যাঁহারা সে মত প্রকাশ করিতেন তাহাদের ভ্রান্ত মনে করিতেন। তিনি বলেন "জ্ঞান" লাভ বলিতে অবক্ত্য অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া বুঝায়। ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানলাভের প্রথম কার্য্যটী সম্পন্ন হয় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, স্মৃতি সেই অনুভূতিকে অভিজ্ঞতার নিকট উপস্থিত করে,

অভিজ্ঞতা তাহাকে বিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া দেয়, বিজ্ঞান তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করে—জ্ঞানলাভ হয়। এই প্রণালীর একদেশে ইন্দ্রিয় অনুভূতি অপর প্রান্তে জ্ঞানলাভে চৈতন্যের প্রকাশ। বুঝা গেল, তিনি দুইটীরই আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন, তাই কোনটীকে ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। পরন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ তাহার গ্রন্থ বিশেষের বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে বিজ্ঞানবাদী বা জড়বাদী বলিয়া সাব্যস্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্টা নিরর্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক নয়।

শিক্ষাদান প্রণালী।

(উদ্ধৃত।)

"আমেরিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রণালী * * * অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত পাঠের 'অবৃত্তি' (Recitation) শুনিয়াই সময় কাটাইয়া দেন। তিনি নিজে পাঠ শোনা ব্যতীত, অতি সামান্য কাজই করিয়া থাকেন। অবশ্য এই যে "আবৃত্তি" তাহা তোতাপাখীর ন্যায় পুথিগত ভাষার পুনরাবৃত্তি নয়। ছাত্র গৃহে যে কায করিয়াছে, বিদ্যালয়ে নিজের ভাষায় শিক্ষকের নিকট বর্ণনা করে। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দেন, ছাত্র সে সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া পরদিন বিদ্যালয়ে উপনীত হয়। শিক্ষক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সেই সেই পুস্তকে ছাত্র যে যে নূতন কথা শিখিয়াছে, তাহা আদায় করেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রতি ছাত্রকে সরল, সহজ ও অনর্গল (fluent and clear language) ভাষায় প্রদান করিতে হয়। এরূপ প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে, ক্লাসের অপরাপর ছাত্রগণ তাহাদের সহাধ্যায়ীদিগের সহিত পাঠের বিষয় ও আবৃত্তির প্রণালী সম্বন্ধে

সমালোচনার করে। বন্ধুভাবে সমপাঠীর ভ্রম প্রদর্শণ ও ভ্রম সংশোধন এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। এইরূপে যখন দুইজনে বাদানুবাদ চলিতে থাকে, তখন শিক্ষক বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদিগকে ঠিক পথে চালিত করেন। এবং তর্ক বিতর্ক কালে বাদানুবাদের ভদ্রোচিত রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোনরূপ অন্যায় আচরণ না করে, শিক্ষক সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যে প্রশ্নের সদুত্তর কোন ছাত্রই দিতে পারে না, শিক্ষক সেই স্থানেই শুধু নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি ছাত্রদের পাঠালোচনা ব্যাপারে আর কোনরূপ সাহায্য করেন না।"

* * *

"এই শিক্ষার গুণেই তাহারা নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নে পতিত হইয়াও আত্মশক্তিতে সন্দিহান হয় না। এই শিক্ষার গুণেই তাহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করুক না কেন, যে কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা অবতীর্ণ হউক না কেন, স্বকীয় যত্ন ও চেষ্টার বলে অচিরেই সাফল্য লাভ করে। ইহাই আমেরিকার শিক্ষকদের অভিমত।"

* * *

"শিক্ষক যেখানে বক্তা, ছাত্র শুধু শ্রোতা। শিক্ষক যেখানে দাতা ছাত্র শুধু গৃহীতা, সেখানে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। সেখানে শিক্ষক ছাত্রের 'অন্ধের যষ্টি'; শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না; সে সর্ব্বদাই নিজকে অক্ষম ও দুর্ব্বল মনে করে এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে।"

* * *

আবার, আমাদের দেশের কলেজ সমূহে কোন কোন অধ্যাপক বিপরীত পথ অবলম্বন করেন। তাঁহারা অন্যভাবে তাঁহাদের শক্তির অপব্যবহার করেন। তাঁহারা কখনও ছাত্রকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সময় নষ্ট করেন না; মা সরস্বতী যেন তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে আশ্রয় লন, আর তাঁহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বকিয়া যান। কখনও কখনও বা ছাত্রদের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া তাঁহারা নোট্স্ (Notes) বলিয়া

যান, আর ছাত্রগণ সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় মহার্ণব তরণের একমাত্র ভেলা মনে করিয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। এখানেই শেষ নয়। কোনও সহানুভূতিপূর্ণ অধ্যাপক ছাত্রগণের শ্রমলাঘবার্থ (কিঞ্চিৎ অর্থলাভের প্রত্যাশা যে তাঁহাদের না আছে তাও নয়) পরীক্ষা কালে পাঠ্য পুস্তক হইতে যতপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে, সকলেরই উত্তর লিখিয়া স্বল্প মূল্যে অর্থ পুস্তক বাহির করেন। এই রূপে যে তাঁহারা কত যুবকের মাথা খাইতেছেন, ছাত্র-বন্ধুগণ তাহা একবারও ভাবেন না। শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর হীন কার্য্য কি হইতে পারে?—

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি-টি।

(—ভারতবর্ষ পৌষ ১৩২৭)

সমালোচনা।

বিশেপাগ্লোর চিঠি। (সৎসঙ্গী—অগ্রহায়ণ ১৩২৭)। চিঠি খানি নিরপেক্ষ, তাই আমরা ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বেদান্তে একটি সত্য আছে তাহা দুই ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে—একটী আত্মস্বরূপবোধ ক'রে নিশ্চেষ্ট হওয়া, আর একটী আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চেষ্ট হওয়া। এই দুইটি ভাবকে উপলক্ষ ক'রে ইদানীংএর কর্ম্মীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'রে থাকেন যে এইরূপ ভাব দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হ'লে দেশ একেবারে জড় হ'য়ে যা'বে। লেখক তাঁ'দের একটি বেশ জবাব দিয়েছেন।

"ঐ অদৃশ্য শক্তি প্রচণ্ডবেগে নৃত্য ক'রতে ক'রতে লীলার ছলে জগৎ সংসারে নিজেকে প্রকাশিত ক'রেছেন। তুমি, আমি, কেষ্ট, বিষ্টু সকলেই ঐ শক্তির লীলার কেন্দ্র মাত্র। অজ্ঞাতসারে সকলেই ঐ শক্তির স্রোতে গা ভাসিয়েই চ'লছে। কিন্তু ভাই, শক্তিরূপী ঐ

ঠাকুরটি এমনি কূটবুদ্ধি যে নির্ব্বিবাদে কাউকেই গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে দিচ্ছে না ; প্রতিপদেই নাকে মুখে জল ঢুকিয়ে বেশ ঝটাপটি করিয়ে নিচ্ছে। সুখের তরঙ্গশীর্ষে উঠিয়ে আবার পরক্ষণেই দুঃখের ঘূর্ণীপাকে চুবন খাওয়াচ্চে।" যদিও—"কবিতার ছন্দে গা-ভাসানোটা শোনায় ভালই, বসন্তের হাওয়ায় গা-টা আপনি বেশ সটান ভেসেই যায় বটে, কিন্তু গন্ধময় বাস্তবের মধ্যে যখন কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে ; তখন বড়'কষ্টেই ভাসে।"

লেখক যে শক্তিটির কথা বলেছেন—তিনি যখন স্থির হ'ন তখন তাঁ'র ব্রহ্ম আখ্যা হয় এবং সাধকেরা নেতি নেতি করে তাঁহাকে বলেন সোঽহং, সোঽহং এবং আত্মস্বরূপ বোধ করেন ; আর যখন সেই শক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, এক হয়ে বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন তখন সাধকেরা নাহং, নাহং করে সেই আদ্যাশক্তি 'তুহুঁ'র পরিচয় পেয়ে আত্ম-সমর্পণ করেন।

তা'র পর পূর্ব্বপক্ষী প্রশ্ন করেছেন "তবে কি তুমি ব'লতে চাও যে ত্যাগের মধ্যেই শান্তি আছে।" উত্তরে লেখক বলেচেন, "সুখ আর দুঃখের ঢেউগুলো কাটিয়ে সাধক চলে শান্তির পথে বটে, কিন্তু শান্তি লাভটা ঘটে উঠা অত সুলভ নয়। আমরা ব'লেছি অশান্তি থেকে শান্তিতে, অল্প থেকে ভূমাতে, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে মৃত্যু থেকে অমৃত ; এই সবে গা ভাসিয়ে দিতে শিখ্‌ছি বটে। আর এই রকমে জ্ঞাতসারে আত্মসমর্পণ মন্ত্ররূপের প্রথম সুরে এবং কিঞ্চিদ্দূর পর্য্যন্ত আমাদের মনকে নিশ্চয় ত্যাগমুখী রাখ্‌তে হবে।"—আমরা কিন্তু মনটাকে আরও কিছুদূর ত্যাগমুখী হ'য়ে এগিয়ে যেতে বলি—সেটা 'বুড়ী না ছোঁয়া পর্য্যন্ত'—কিম্বা 'পরেশ পাথর ছুঁলে ঘটি যখন সোনা হয়ে যায়, তখন আর তা মা'জতে হয় না।'

পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় বলেছেন "ত্যাগটা এ যুগের ধর্ম্ম নয় ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষ এখন নিজ ব্রহ্মস্বরূপ বুঝ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে ইত্যাদি। এ যুগে সকলেই অবতার, সকলেই ভগবান। ভোগানন্দে ডুবে থাকবার জন্যই পরমাত্মার এই সৃষ্টি রচনা ; তাই এ যুগের মানুষ তুরীয়ে অবস্থিত

হ'য়ে, ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে ব্রহ্মানন্দ ও কামিনীকাঞ্চন সম্ভোগানন্দ একযোগে উপভোগ ক'রে পূর্ণ বৃন্দাবন লীলাকে ধরায় প্রচারিত ক'রবে। এমন দিনে আপনার ত্যাগের কথা শোনবার মানুষ কই ?" ইহার উত্তরটি বড় চমৎকার "নবযুগের মহাবির্ভাব বার্ত্তা আর পূর্ণযোগ ও তুরীয়ের বার্ত্তা ঢাক যোগে ঘোষিত হ'চ্চে ব'লেই আমরা হুজুগে পড়ে কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে পারছি না যে, সকল কামনাকে জয় বা দগ্ধ কর্‌বার পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীভগবানে অর্পণ কর্‌বার পূর্ব্বে" বিষয় "* * স্থধার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ভোগের কিছুমাত্র আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে।"

লেখক বলেন "ত্যাগের অনুশীলনের জন্যে আমরা মঠের ভিতরে পলায়নের বিরোধী"—এ কথাটা লেখকের পক্ষে খাটতে পারে, কিন্তু সকলকেই স্ব-ভাব ত্যাগ করে ঐ কথায় সায় দিতে হবে, এ কথা নিশ্চয়ই লেখকও মানেন না, কারণ তাহ'লে অপরের ব্যক্তিগত ভাব এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। আর "এই গৃহস্থাশ্রমটাকেই মঠ ক'রে তু'লতে হবে" একথাটাও যেমন ঠিক, মুক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করা যায় না "আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত" লেখকের এ কথাটাও তেম্নি ঠিক। "বিষয়কে পরিহার ক'রে কৌপীণ এঁটে মঠে বা জঙ্গলে গেলেই বাসনা রাশি আমাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হয় না" যেমন সত্য কথা, "আত্মসমর্পণ ক'রলাম, বল্লেই অমনি মুক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করবার আদেশ পাওয়া যায় না" এটাও তেম্নি যথার্থ সত্য। কিন্তু সিদ্ধপুরুষেরা যদি প্রবর্ত্তক সাধকের নিমিত্ত

অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ
কুণপমিব স্থনারীং ত্যক্তুকামো বিরাগী।
বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্,
জয়তি পরমহংসো মুক্তি ভাবং সমেতি ॥ ৯ ॥

এই সত্য না প্রকাশ করে, সিদ্ধির পর যে অবস্থা হয়

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গং বারি সমস্তবারি-নিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।

" * বাচঃ প্রাকৃত সংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্ব্বাবস্থিতিরস্ত বস্তু বিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥১০
(ধন্যাষ্টক—শ্রীশঙ্করকৃত)

এই অপূর্ব্ব অবস্থার কথাই যদি কেবল প্রকাশ করতে থাকেন, তাহা হলে সাধারণের যা হ'বে তা লেখকের ভাষায় ব'লতে গেলে ব'লতে হয় "সিদ্ধির উপায়রূপে ত্যাগের আশ্রয় না নিয়ে, যদি আমরা বলি 'এই সৃষ্টিটা ব্রহ্মেরই আত্ম বিস্তারের ফল, ব্রহ্মের সহিত বিষয়ের একান্ত বিরোধী কোন সম্বন্ধ নেই', আর এই বলে" অসতের "ভেতর ব্রহ্মের যে আত্মবিস্তার, সেটাকে ত্যাগ না করে ভোগ করতে অগ্রসর হই", তাহ'লে দুঃখকষ্টরূপ "আত্মবিস্তারের উপলব্ধি"ও ঘন ঘন হ'তে থাকবে।

ভারতে এখন ভোগবাদটাকে প্রচার করবার একটা উপযোগিতা আছে বলে "কৃষ্ণ বুদ্ধাদি রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকল অবতার ও মহাপুরুষগণের মুণ্ডুপাত করে" ত্যাগের বিরুদ্ধে অভিমান করাতেই কর্ম্ম যোগীদের বিশ্বাত্ম বোধটা কিরূপ তা লেখক ধরে ফেলেছেন। "প্রতিপক্ষের সমালোচনার ভাষা একটু কঠিন হয়েই থাকে চতুর প্রচারক তাতে অধীর হয় না।" কিন্তু দুঃখের বিষয়চতুর প্রচারক এতই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন যে শেষে আস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা সকলসম্প্রদায়কে ছুড়ে মারতে কসুর করেন নি। "তন্ননিয়ে তর্ক-বিচার করতে গিয়ে কেবল লুপ্ত বিদ্বেষ বৃত্তিকে জাগ্রত করা হয় মাত্র" তা বেশ জাগ্রতও হয়েছে, সহরের লোকেও নানা কথা বলছে, যা লিখ্‌লে বিদ্বেষের অগ্নিকুণ্ডগুলিতে ঘৃতাহুতি হ'বে মাত্র। কিন্তু সেই সব জঘন্য ময়লা গুলো একটা একটা দল বেঁধে পরস্পরের প্রতি যদি আমরা নিক্ষেপ কর্ত্তে আরম্ভ করি তা হলেই সমষ্টি সাধনার সিদ্ধি একেবারে হাতে হাতে ফলবে—সাম্য, মৈত্রীর ধ্বজা আকাশে ফৎ ফৎ করে উড়বে।

পত্রের শেষাশেষী পূর্ব্ব পক্ষী আবার প্রশ্ন করেছেন, "এই সৃষ্টি লীলার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ, এই কথাটার মধ্যে কি কোন সত্যই নেই?" লেখক উত্তর দিয়েছেন "দ্বান্দ্বাতীত গুণরহিত অবস্থাটাকে উপলব্ধি করে আবার এই দ্বন্দ্বান্বিতা গুণময়ী সৃষ্টি লীলার মধ্যে

যখন ফিরে আসা যায় তখন এই সৃষ্টির প্রত্যেক রসটি ব্রহ্মানন্দেরই রস বলে অনুভূত হয়। চরম সিদ্ধির পরের অবস্থাটা আর হাতে খড়ির অবস্থা এই দুটোকে একযোগে তাল পাকালে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাকে সাধনা বলে না. তার নাম আধ্যাত্মিক dyspepsia।" এ কথাটা যে খাঁটী সত্য এবং শাস্ত্র সঙ্গত তা পূর্ব্বে আমরা শ্রীশঙ্কর বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি।

কাব্য ও কল্পনা—(সবুজ পত্র, কার্ত্তিক, ১৩২৭)। লেখক বলচেন "বুদ্ধি কেবল জীবনের পরিধিটুকুর মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সে জীবনের আলোচনা করে, ভাষ্য করে, কখনও কখনও জীবনকে প্রকাশ করে।" কিন্তু বুদ্ধি বাক্য মনের অতীত সত্তার পরিচয় কিছু জানে—তাকে প্রকাশ করাটা বুদ্ধিরও যেমন দুঃসাধ্য মনের অপর বৃত্তিরও তাহাই। "গণ্ডীর বাহিরে কিন্তু কখনো সে সীতার মত পা দেয় না—সীতাহরণও হয় না, রামায়ণও রচিত হয় না। কল্পনা কিন্তু বুদ্ধির মত ভীরু নয়।" কিন্তু ভ্রান্তিময়ী—যে ভুলের জন্য তা'কে আজীবন সীতার মত অশ্রুপাত করতে হয়। ভুল না করলে রামায়ণ লেখা হ'বে না এর জন্য সকলকেই ভুল করতে হ'বে এ কথার কি সার্থকতা আছে? তবে যদি বলা যায় "মরণকে সে মধুর করে এবং মরণাধিক যাহা তাহাকে মধুরতর করিয়া তোলে। * * স্বর্গকে সে ভালবাসে, কিন্তু নরককে সে ভয় করে না"—বুদ্ধিবাদী বলেন যদি একথা বল তা হলে তোমার সঙ্গে মিতালী হ'ল কারণ বুদ্ধিরও চরম পরিণতি উহাই—তোমার একদিক দিয়ে আমার আর একদিক্ দিয়ে। তুমি যেমন "সীমার মধ্যে খেলা করতে করতে * সীমাহীনের রাজ্যে গিয়া" পড় আমিও ঠিক তাই। তবে তুমি যেমন "নীল আকাশের মধ্যে * আপনাকে" হারিয়ে ফেল আমি কিন্তু আরও একটু বড় হয়ে অমন সুন্দর আকাশ নিজের মনের মধ্যে রেখে দেই, আর ঐ যে "নীল 'চোখের কাছে আত্মহারা" হয়ে পড় আমি কিন্তু তোমার ভাব দেখে একটু গোলে পড়ি।

"মর্ত্ত্যের সহিত স্বর্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সংসারকে ছাড়াইয়া যায় বলিয়া স্বর্গকে কখনো কখনো সুদূর বলিয়া

মনে হয়।" এই "স্বর্গটী" কি সুখ-সৌন্দর্য্য স্মৃতি না ভূমার নামান্তর? যদি সুখ-সৌন্দর্য্য স্মৃতি হয় তবে তা এই সংসারারণ্যের ঘনান্ধকারে ক্ষণিক দীপ লেখা; আর যদি উহা ভূমা হয় অর্থাৎ "সাধারণ লোক সংসারের লোক। সে কেবল বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া রাখে। পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে ক্ষণিকের সহিতই তাহার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিচয় ঘটিতে থাকে। শাশ্বতের সাক্ষাৎ পাইবার অবসর তাহার নাই। এই বহির্জগতের অন্তরে এবং বাহিরে কিন্তু আর এক জগৎ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় নেত্র যাহার উন্মীলত হইয়াছে সেই কেবল এই লোকের সন্ধান পাইয়াছে।" ইহার সহিত বুদ্ধিজীবীর নিগমনের বিরোধ কোথায়? "দেশকালের অতীত বলিয়া এই জগতের জরা নাই" তাহা হ'লে "জগৎ" শব্দটী বদলাইতে হয় কারণ "জগৎ" মানেই "পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তন" অর্থাৎ গমনশীল। "এই মানস লোকে বিচরণ করেন বলিয়া মর্ত্তের মানুষ হইয়াও কবি অমর।" উপনিষদে 'কবি' ঠিক এই অর্থে ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু ইদানীং কবিদের বড় একটা তৃতীয় চক্ষু দেখা যায় না। "সংসার" যখন "নশ্বর" তখন—"স্বর্গ" নিশ্চয়ই "অনশ্বর" অরূপ নির্ব্বান সাগর—কারণ "নশ্বর" বলিতে আমরা "পরিবর্ত্তনশীল" বুঝি যা "সংসার"। কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয় তবে "পুরুষের হৃদয়ের শাশ্বতী কামনা" কি করিয়া "কবির কল্পনার ভিতর দিয়া কাব্যের আকাশ পথে উর্ব্বশীরূপে আবির্ভূতা হইল"—এক বিশেষ সীমার পরিখায়? "শাশ্বতী কামনা" ত সকল সীমার মধ্যেই অসীমকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে?

মোহমুদ্গরঃ—শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ, M. R. A. S., (London) সম্পাদিত। মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত মোহমুদ্গর এবং তাহার অন্বয়, বাঙ্গলা টীকা ভাবার্থ এবং পদ্যানুবাদ আছে। ইহাতে আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভোগ-পরতন্ত্র সাহিত্যের দিনে মোহের মুদ্গরস্বরূপ এইরূপ পুস্তিকা হিন্দুর ঘরে ঘরে থাকা প্রয়োজন।

সশিষ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ M. R. A. S., (London) বিরচিত। ইহাতে অতি সংক্ষেপে দক্ষিণেশ্বরের বর্ণনা, গুরুশিষ্যের জীবনী, সাধনা, সিদ্ধি, উপদেশ ও কীর্ত্তি গীতি লিখিত হইয়াছে। একখানি "কাল্পনিক চিত্রও আছে। এইরূপ পুস্তিকার যতই প্রচলন হইবে ততই নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষীর ভাব কম পড়িবে।

এক সত্যে হিন্দু মুসলমান—পূরা সাচ্চা কামেল পীরের কৃপালব্ধ এই পুস্তিকা কোরাণাদির সার সংগ্রহ। ভারতের এই যুগসন্ধি ক্ষণে এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট উপযোগীতা আছে। গ্রন্থের একটী বাণী আমরা ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—"ধর্ম্মের মূলভিত্তি লইয়াই ছিল একমাত্র বিরোধ। মুসলমানেরা জানিতেন হিন্দুরা একেশ্বরবাদী নহেন, হিন্দুরা পৌত্তলিক, বহু দেবদেবীর উপাসক। আধুনিক মহর্ষিবৃন্দের মুখে বেদান্ত তত্ত্বের যে গম্ভীর হৃদয়স্পর্শী ঝঙ্কার উঠিয়াছে, সে ঝঙ্কারে নিদ্রিত জাগরিত হইতেছে এবং জাগরিত উত্থিত হইতেছে, আবার উত্থিত আচার্য্য সন্নিধানে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছে, সেই বেদান্ত তত্ত্বকুশল বহু হিন্দু আচার্য্য বাহু সম্প্রসারিত করিয়া মুসলমান ভাই সকলকে আলিঙ্গন করিতে সমুদ্যত; হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পক্ষে এই এক মহাসুযোগ।" সঙ্কলয়িতা মহম্মদ খলিলর রহমান।

বাঙ্গালীর ব্যবসাদারী—অধ্যাপক শ্রীপার্থসারথি মিশ্র, এম, এ প্রণীত—সরল শুদ্ধ ভাষায় লেখক আমাদের জাতীয় অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা সকল পচনোন্মুখ অংশ সকল খুলিয়া দেখাইয়াছেন। যাতির ধর্ম্ম কাটা গড়া নয়—সমাজের উন্নতি এই যাতি-ধর্ম্মকেও অপেক্ষা মাঝে মাঝে করে। কিন্তু লেখক যেমন মক্ষিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তীর্থ, সন্ন্যাস, গার্হস্থ্য, ছাত্র সমাজ ও মাতৃ সমাজের সকলব্রণগুলির অনুসন্ধান করিয়াছেন সেইরূপ যদি মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া (যদিও বেলুড় মঠ, রামমোহন রায় প্রমুখ দুই চারিটী বড় ফুলের উল্লেখ করিয়াছেন) আমাদের জাতীয় উদ্যান হইতে জনসাধারণের মধ্যে যে ত্যাগ তিতিক্ষার কুসুম সকল ফুটিয়া আছে তাহার অনুসন্ধান

করিয়া দেখাইতেন তাহা হইলে পুস্তিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আজ দেড় শত বৎসর ধরিয়া সমাজ সমালোচকদের গালাগালি খাইয়া আসিতেছে—তাহাকে খাওয়াইবার জন্য কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দিলেই বোধ হয় এক্ষণে ভাল, নচেৎ জনসাধারণে বুঝিয়া বসিবে সমালোচনাটাও একটা বাঙ্গালীর ব্যবসাদারী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২৯ ফাল্গুন, সন ১৩২৭ ইংরাজী ১৩ মার্চ্চ ১৯২১ রবিবার (তিথিপূজা শুক্লা দ্বিতীয়া ২৭ ফাল্গুন) বেলুড়মঠে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ-দেবের ষষ্ঠাশীতিতম জন্মোৎসব হইবে। সকল ভক্ত একত্রিত হইয়া পার্থিব ভাগবতী লীলার সমৃদ্ধি করিবেন।

পূর্ব্বানুরূপ এবারও যথানিয়মে রামকৃষ্ণমিশন গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের তীর্থ-মেলনীতে ওলাউঠা রোগীর সেবা, শিশু বা নারী পথ হারাইলে অনুসন্ধান করিয়া নিজ নিজ আবাসে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং ওলাউঠা রোগীদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় মেলার অবসানে ডায়মণ্ড-হারবার সরকারী হাঁসপাতালে রাখিয়া আসা হয়।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর (San Francisco) বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী প্রকাশানন্দজির কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আশ্বাস্বিত। কালিফোর্ণীয়ার অন্তর্গত সেণ্ট এন্‌টয়নি (St. Antoine) নামক স্থানে শান্তি-আশ্রম নামক কেন্দ্রে গত জুনমাসে বহু ছাত্র এবং ছাত্রীর সমাবেশ হয়। তিনি তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে রামকৃষ্ণ জীবনী, বিবেকচূড়ামণি, গুরুগীতা এবং উপনিষদ শিক্ষাদান এবং ধ্যান ধারণার অভ্যাসও করাইয়াছিলেন।

বোষ্টন নগরীর (Boston) বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ গত জুনমাসে সিনসিনেটি (Cincinnati) নামক স্থানে 'বেদান্ত' 'আধ্যাত্মিক উৎসর্গ' 'মৃত্যুরপর জীবন,' 'একত্ব ও বিশ্ব-জনীনত্ব' প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিয়া বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদ[illegible]ঞ্জন করেন।

ভ্রম সংশোধন।

মাঘের উদ্বোধনে ২৬ পৃঃ ১৩ পংক্তি 'তথাকথিত' শব্দের পর 'শূন্যবাদী-বুদ্ধ' এবং ১৪ পংক্তিতে 'রামকৃষ্ণ' শব্দের পূর্ব্বে 'কামকাঞ্চ ত্যাগী' বসিবে। ৩১ পৃঃ ৯ পংক্তিতে 'গঠিত' স্থলে 'পঠিত' এবং ১৩ পংক্তিতে 'জাগিয়া উঠিয়াছে", স্থলে 'জরিয়া গিয়াছে' বসিবে। ৩৫ পৃঃ ২০ পংক্তি 'ব্যাধি' স্থলে 'ব্যাধ' হইবে। ৬৪ পৃঃ ৯ পংক্তি 'শুক্লা' স্থলে 'কৃষ্ণা' এবং ১৯ পংক্তি 'রবি' স্থলে 'তারকা' ও 'নভঃ' স্থলে 'কক্ষ' হইবে।

"এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে।"

"অন্ন—অন্ন! যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

"ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুর পাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন।"

"আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতালাভের জন্য সভা সমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়।"—বিবেকানন্দ।
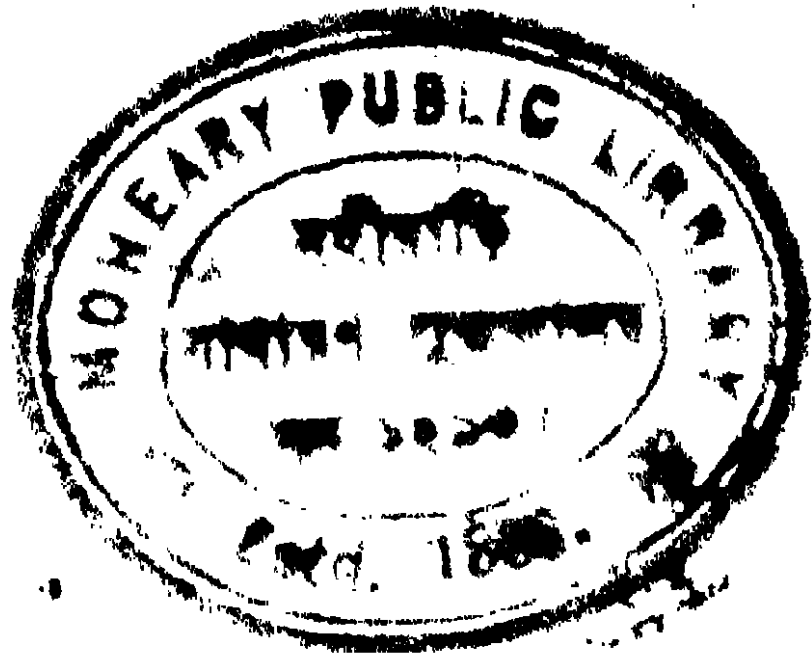
চৈত্র, ২৩শ বর্ষ।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

উপরে অনন্ত নীলাকাশ—সোনালী রঙের কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে সূর্য্যদেব পশ্চিমাচলে ঢলিয়া পড়িতেছেন, রথের রক্ত ঝালোরের সিন্দুর আভায় তখনও দিক সকল মৃদু উজ্জ্বল—মধ্যাহ্নের সে প্রখরতা আর নাই—কেবল যেন একবার বিশ্রামের পূর্ব্বে করুণানয়নে দেখিয়া লইতেছেন, সারাদিন যে উত্তাপ দান করিয়াছেন তাহাতে জীবের কিছুকালের জন্য চলিবে কিনা। সহসা দূরে অতি দূরে সবুজ পৃথিবী ও নীলাকাশের সঙ্গম রেখায় কোন এক দুরন্ত অসুরের মসীবর্ণ কেশজালের প্রান্তভাগ দৃষ্ট হয়। তখনও পশ্চিমে দেবতার অঙ্গরাগে বিচিত্র যক্ষপুরী অস্পষ্ট তুলিত হইয়া রহিয়াছে—যাহার দিকে তাকাইয়া জীব দ্যুলোকের বিরহ চিন্তায় চিত্তকে উধাও করিয়া দেয়। অসুর যেন উঁকি মারিয়া দেখে 'ওটা আবার কি।' সে তখন গভীর গর্জ্জনে মেঘের বন্যায় অঙ্গ ভাসাইয়া ছুটিয়া আসে। অট্ট হাস্যে বিজলী খেলাইয়া ধ্বংসের নিমিত্ত সেই যক্ষপুরী গাড় অন্ধকারের অগাধ জলে ডুবাইয়া দেয়। পরে স্বর্ণপুরীর ধ্বংস ক্রীড়ার সমাপ্তির কঠোর পরিশ্রমে তার অঙ্গে জলের ধারা বহিতে থাকে, আবার কাহার মধুর অনীল বীজনে সে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

* * *

ধীরে বাতাসে জোনাকি খেলিয়া বেড়ায়, আনন্দে শিশু ধরিতে চায়। আবার আকাশে একটির পর একটি করিয়া তারা ফুটিতে থাকে—লোকের দেখিয়া কত আনন্দ। শিশু ভাবে ঐ তারাটীর

মত এত উজ্জ্বল আর কোনও তারা বুঝি ফুটিবে না। কিন্তু সেই অনন্ত আকাশে আরও শত তারকা ফুটিয়া শিশু হৃদয়ের চিত্ত সরোবরে ঝিকমিক্ করিয়া আনন্দের কণায় ভরিয়া দেয়। ক্রমে যখন চন্দ্রমা আসিয়া আকাশ রঙ্গমঞ্চে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত আসনে উপবেসন করিয়া জীবলোকে সুধা বিতরণ করেন তখন জীব তাঁহার স্তুতি করে 'ওগো সোম, তুমি আমাদের রাজা!' কিন্তু প্রভাত বায়ু বহিয়া আনে এক মহাবার্ত্তা, মৃদু স্পর্শে সকলের কানে কহিয়া যায় 'রাজার রাজা ঐ পূর্ব্ব-দিকে আসে! ঐ দেখ তার অঙ্গ রাগে উষার আনন নব রাগে রঞ্জিয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ মাথার কিরীট কি উজ্জ্বল! কি জ্যোতির্ম্ময়! ঐ শুন তারকামণ্ডলীর স্তুতি 'হে সবিতা, তুমি আমাদের নিয়ামক, তোমার বিশ্রামে আমরা প্রহরী, চন্দ্র তোমার আলোকের প্রতিনিধি, এক্ষণে তুমি নিজেই প্রাণ ও আলোক জীব লোকে আশীষ ধারার ন্যায় বর্ষণ কর, আমরা অন্তর্হিত হই।'

* * *

প্রতি যুগ প্রভাতের প্রারম্ভে উদিত হন এক ঈশ্বর-কল্প-অতি মানব—যাঁহার জ্ঞান কিরীটের উজ্জ্বল প্রভায় জগতের সকল অন্ধকার, সকল জড়তা দূর হইয়া আসে জীবলোকে পবিত্র প্রাণের স্পন্দন। যাঁহার আরক্তিম প্রেমময় আননের অঙ্গরাগে চৈতন্য ও দীপ্ত করে সমগ্র বিশ্ব হৃদয়ের ভাব রাজ্যের দেব মন্দিরের বিগ্রহ—যাঁহার নিশ্বাস প্রবাহিত করুণাবায় মানবের কানে কহিয়া বেড়ায় সেই ধর্ম্ম সম্রাটের আগমনের সুসমাচার। মানব তখন পরস্পর বলাবলি করে "The kingdom of heaven is at hand"—স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। "Prepare ye the way of the Lord, make his path, straight"—রাস্তা পরিষ্কার কর, তাঁহার আসিবার পথ সুগম কর। তখন অন্তর রাজ্যের লোকেরা ভাব সৌধে বাসর রচনা করিয়া প্রভুর আগমন প্রতিক্ষা করে আর বাহ্য জগতের লোকেরা পথ, ঘাট, বাগান মন্দিরের সকল আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য সকল জীর্ণ, সকল পুরাতন, সকল মিথ্যা, সকল কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া

চূরমার করিয়া ফেলে। কিন্তু বিচারহীন বাহ্য প্রাণী জানে না যে তাহারা গড়িতে অপারগ। তাহারা কেবল ভাঙ্গিয়াছে—তা যেমন খারাপও ভাঙ্গিয়াছে, ভালও ভাঙ্গিয়াছে। ভাবিয়াছিল আরও চমৎকার করিয়া গড়িবে কিন্তু এখন ভাঙ্গা চূরার দৈন্য নিস্ফলতার মধ্যে কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবসাদে নিদ্রিত হওয়া ছাড়া তাহার আর কি আছে?

* * *

ধীরে সেই ধর্ম্ম সূর্য্য আকাশ পথে আরোহণ করিতে থাকেন, তাঁহার প্রাণপ্রদ আলোক স্পর্শে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটিয়া উঠে। তখন সকল ভক্ত একত্রে তাঁহার পূজার নিমিত্ত সেই পদ্মের মালা গাথে—ইহাই নব যুগ-সঙ্ঘের আরম্ভ। ভক্ত তখন ডাকিয়া বলে 'কে আছ কোথায়, পূজার সময় উপস্থিত; দেবতা প্রসন্ন! তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজ স্বরূপ অবগত হও, মহিমাময় হও।' তখন নিদ্রিত চক্ষু মেলে আর প্রেমালোক তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুপ্ত বিগ্রহে চৈতন্য আনে। সেও তখন মধ্যাহ্ন গগনের ধর্ম্মজ্যোতির উপাসনায় তাহার তনু মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ধন্য হয়—আর সকল ভক্ত সঙ্ঘ স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া সেই মূর্ত্ত দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট লীলায় ব্রতী হয়। লীলাধার নবীন মানুষ, নবীন সঙ্ঘ, নবীন সমাজ, নবীন জাতি, নবীন বিশ্ব গড়িয়া তুলে এবং সেই দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে, প্রতি সঙ্ঘের বিগ্রহে, প্রতি সমাজের সংযমে, প্রতি জাতির আদর্শে, বিরাট বিশ্বের আত্ম স্বরূপে।

* * *

বহু শত বর্ষব্যাপি সে বিপুল লীলার গতি রঙ্গ ভঙ্গীর বিশ্রাম ছলে ক্রীড়া-সহায় সকল ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া, ধর্ম্মারুণ উদয়াচলে উপস্থিত হন এবং রাখিয়া যান এক সুদৃশ্য যক্ষপুরী—যাহাতে থাকে বহু শোভমান মঠমন্দির, উদ্যানবিদ্যালয়, বীথিকাবিপণি কেবল আলোছায়ায় আঁকা ছবির মত। সে সব পরিচালিত হয়

যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় গৃহস্থ সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ শূদ্রের দ্বারা। মনে হয় যেন একটা পুঁতুলের সমাজ একটা প্রাণহীন জাতি যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত—সমগ্র মঠ মন্দির পণ্যবীথিকায় নূতনত্বের সাড়া শব্দও নাই। মানুষের বাক্যগুলিও যেন কলের গানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি মাত্র—যাহা বলে তাহার অর্থ বুঝে না জানে না। প্রাণ-দেবতাও যেন শ্রীভগবানের সেই অবতার লীলার সমাপ্তির সহিত মহাপ্রস্থান করিয়া বসেন, কেবল রাখিয়া যান যন্ত্রবৎ খাওয়া পরার মত শক্তিটুকু। কিন্তু সে দৈন্যের মধ্যেও নির্গত হয় পতিতের দীর্ঘনিশ্বাস, জাগিয়া উঠে সেই প্রাণহীন যক্ষপুরী দর্শনে এক অতীতের দেব স্মৃতি।

* * *

ধর্ম্মরাজের অপ্রতিহত প্রতাপে হৃদয়ের পশুটা এতদিন চুপ করিয়া থাকে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টচক্রের ভাগ্যবতী লীলার পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত সুযোগ বুঝিয়া ভীম হুহুংকারে সে অসুর গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া সকল বিশ্বে অজ্ঞান অন্ধকার ঢালিয়া দেয়—সে সুদৃশ্য যক্ষপুরীও হাওয়ায় বিলীন হইয়া যায়। ঐন্দ্রজালিকের মত নানা মূর্ত্তি ধরিয়া জাতিতে, সমাজে, ব্যক্তিত্বে সে মহা বিপ্লবের প্রলয় ইন্ধন স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেয়। পরস্পরের আঘাতে অঙ্গে শনিত ধারা প্রবল বেগে বহিতে থাকে আর প্রজ্জ্বলিত ইন্ধনে মঠ মন্দির সমাজ জাতি পুড়িয়া ভস্মস্তূপে অবসান হয়। শেষে ধ্বংশের কঠোর শ্রমের অবসাদে নির্জ্জীব হইয়া নিজেই ঢলিয়া পড়ে।

* * *

সহসা ধরিত্রীর শ্মশান বক্ষে শ্রীভগবানের করুণা নিশ্বাস শীতান্তে মলয়ার মত বহিয়া বহিয়া জড় দেহে জীবন সঞ্চার করে—কি এক যাদুবলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্থি, কঙ্কাল যোড়া লাগে—আকাশ নির্ম্মল পবিত্র হয়—ধীরে কত খদ্যোতপ্রায় সৎলোক, নক্ষত্রের মত একটীর পর একটী করিয়া কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের জ্ঞান বিচ্ছুরিত দেহের প্রেম কণায় তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়া শিশু-মানব বলিতে থাকে 'এমনটী আর

বুঝি হইবে না।' কিন্তু তেমন শত শত শ্রীভগবানের অগ্রদূত আসিয়া নানা বিপ্লব দুষ্ট সমাজে, জাতিতে আবির্ভূত হইয়া শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। ক্রমে সনাতন আদিত্যের আলোকের প্রতিনিধি স্বরূপ চন্দ্রকল্প এক অতি-মানব জগৎ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম কৌমুদীতে জগৎ উদ্ভাসিত করেন। তৎপ্রদত্ত সুধাপানে এক সমাজ অপর সমাজে মিশিয়া যায়, এক জাতি বিজাতির গায় ঢলিয়া পড়িয়া বলে, 'তুমি আমার ভাই।' সে গুণ জ্যোতিতে স্তব্ধ ও মুগ্ধ মানব ঈশ্বরের 'ইতি'-স্তোত্র পাঠ করে 'হে ঈশ্বর পুত্র, হে স্বর্গীয় দূত তোমার ভাব একমাত্র সত্য, তোমার বাণী একমাত্র সত্য, অপর সকল মিথ্যা, আর কেহ তোমার মত আসে নাই—আসিবে না—তুমিই একমাত্র আমাদের রাজা।'

* * *

—আবার এই যুগ সন্ধিক্ষণে শুন বিশ্ববাসী প্রভাত বায়ুর মত পবিত্র নির্ম্মল ভাগবতী করুণাবাতাসের অলক্ষিত বাণী! ঐ শুন প্রেমোজ্জ্বল নবীনা উষার গোলাপীওষ্ঠ ঘোষিত মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি 'রাজার রাজা এই পূর্ব্বদিকে উদিত! ঐ দেখ কি জ্ঞানোজ্জ্বল কিরীট! যাহার জ্যোতিতে ম্লান সকলতারা, চন্দ্র! ঐ শুন তাঁহাদের স্তুতি "তোমার বিশ্রামে আমরা ধর্ম্ম রাজ্যের প্রহরী—তোমার উদয়ে আমাদের সকল ভাব, সকল অনুভূতি, সকল বাণী সার্থক—আমরা তোমার লীলার সহচর।' ওঠ জড় প্রাণ, জাগ নিদ্রালস, ভক্তি বিনম্র হৃদয়ে দর্শন কর ঐ অখিল ভাবানুভূতি-ঘন মূর্ত্ত-নারায়ণ ধর্ম্মসম্রাট! জাগ্রত কর, চৈতন্য কর স্বীয় হৃদয় মন্দিরের আত্ম-বিগ্রহ।

(২)

জগতের উন্নতি স্রোত যখন বহিতে থাকে তখন দেখা যায় সকলেই আপন আপন চরকায় তেল দিতে ব্যস্ত—কে কি করিতেছে—কে কি বলিতেছে—তাহা দেখিবার, ভাবিবার সময় পর্য্যন্ত তখন হয় না। সে যে ভাবাশ্রয় করিয়া কাজে লাগিয়াছে তাহাকে সর্ব্বাংশে সুন্দর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকে—তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, লক্ষ্য স্থির, ভাষা সংযত।

* * *

অবনতির সময় মানুষ কার্য্যতৎপর না হইয়া বাক্ চতুর হইয়া থাকে, নিজের চরকায় তেল না দিয়া অপরকে তাহার চরকায় তেল দিবার উপদেশ করে—নিজে কি ভাবে জীবন কাটাইতেছে না দেখিয়া, অপরের দোষানুদর্শনেই ব্যস্ত—অপরের কার্য্য প্রণালী না ভাবিয়া, বুঝিয়া অবিবেচকের মত যা তা একটা মতামত প্রকাশ করে, আর নিজে যাহা বলিয়া, করিয়া থাকে—তাহার আদর্শ হয় সে নিজেই—প্রাচীন অভিজ্ঞতা এবং সত্যগুলিকে বিচার না করিয়া বলে 'ও সব পুরাতন ফেলিয়া দেও'—অর্থাৎ যাহা তাহাদের চিন্তা গণ্ডীর বাহিরে, যাহার সম্বন্ধে কখনও সে ভাবে নাই বা নিজ চরিত্রের বিরোধী বলিয়া ভাবিতে পারে না—সে সব হেয়, মন্দ, ঘৃণিত—ইহার নাম অনধিকার চর্চ্চা।

* * *

হিন্দুর শাস্ত্র বেদ। আবার বেদানুকূল নানা যুগের উপযোগী নানা শাস্ত্র ভক্তজ্ঞানী মহাপুরুষেরা নিরপেক্ষ ভাবে জীব-কল্যানকামী হইয়া রচিয়া গিয়াছেন—যাহার দৃঢ় ভিত্তির উপর এই হিন্দু সমাজের বিপুল প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত—বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক বহু উপপ্লাবনে ও বিপ্লবে যাহা অটুট। যত দিন পর্য্যন্ত কোনও জাতি বা সমাজ ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীবন যাত্রোপায় না দেখাইতে পারিতেছেন ততদিন হিন্দু তাহা গ্রহণ করিবে না। মনে কর যদি কোনও শিশুমস্তিষ্ক তথা-কথিত-হিন্দু ইউরোপীয় অতি-সাম্যবাদীদের দোহাই দিয়া বলে 'এই যে হিন্দুসমাজের ব্রহ্মচর্য্য এবং বিবাহ, অত্যন্ত crude এবং archaic অর্থাৎ বড় সেকেলে, ঐ সব দূর করিয়া দেওয়া হউক, তখন কোনও হিন্দু, যাহারা ইউরোপীয় শান্তি, সভ্যতা এবং স্বাধীনতার ফলাফল প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন,—উহা কি গ্রহণ করিতে পারেন ?

* * *

এই চতুরাশ্রম সম্পন্ন বিরাট হিন্দু জাতির প্রতি-আশ্রমীদের একটা করিয়া আদর্শ ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন যদি কোনও আশ্রমী—ধরিয়া লওয়া যাক কোনও সন্ন্যাসী—নিজ আদর্শ ত্যাগ করিয়া

ধ্যান ধারণা ছাড়িয়া, ভেদবুদ্ধি বিরহিত হইয়া জীবের সেবা ছাড়িয়া, নারীতে মাতৃবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, বিলাসী হইয়া, গৃহস্থের ন্যায় দার পরিগ্রহ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন,—রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলেন—স্বীয় বিষয় ত্যাগ করিয়া গৃহস্থের সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন, কে কি বলিল না বলিল, শুনিয়া বিচলিত হন সে ক্ষেত্রে তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা হইতেছে বুঝিতে হইবে—এবং তাঁহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ সাধুসঙ্ঘই করিয়া থাকেন ও করিবেন।

আবার যদি কোনও গৃহস্থ সদুপায়ে জীবকার্জ্জন না করেন, মাতৃবৎ পরদারকে দেখিতে না পারেন, সত্যে নিষ্ঠা রাখিয়া বিষয় পরিচালন করিতে না পারেন—পিতা মাতার সেবা না করেন—একান্নবর্ত্তী পরিবারের সকলকে সমান দেখিতে না পারেন—বিপন্ন এবং আশ্রিতকে রক্ষা না করিতে পারেন—সর্ব্বোপরি মানবের জন্মগত দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বজায় না রাখিতে পারেন—সে জন্য যে ধিক্কার তাঁহারই প্রাপ্য। এ সকল ত্যাগ করিয়া যদি কোনও গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে 'জ্ঞান বাতাইতে' যান তখন বাঙ্গালা দেশের একটী চলতি প্রবাদ মনে পড়ে "চালুনী বলেন ধুচুনীকে, তুমি বড় ভাই ছ্যাঁদা।" "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" প্রভৃতি ভিক্ষু বাক্য গৃহস্থকে জোর করিয়া শুনান যেমন সন্ন্যাসীর অনধিকার চর্চ্চা, তেমনি 'টাকা রোজকার কর, 'কামিনী ত্যাগ করা উচিৎ নয়,' 'বিজাতির বিরুদ্ধে অভিযান কর' প্রভৃতি সন্ন্যাসীর প্রতি উপদেশ গৃহস্থের তেমনি অনধিকার চর্চ্চা।

*　　　*　　　*

এই গুণ কর্ম্মানুযায়ী আশ্রম বিভাগ বেদশাসন। এই সমাজসত্ত্ব যাঁহারা মানিতে অনিচ্ছুক—সেই—বেদাবজ্ঞাকারীদের সমাজ হিন্দুবলিতে কুণ্ঠিত। সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য সম্বন্ধে নিজ নিজ মন গড়া আদর্শ ভারতবর্ষে চলিবে না—বেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাচীনকাল হইতে ইদানীং পর্য্যন্ত বেদ-বিজ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ ব্যবস্থা দিতেছেন সেইরূপে চলিতে হইবে,

কারণ যাঁহারা চক্ষুষ্মান তাঁহারাই পথ দেখাইতে পারেন—পথ দেখান অন্ধের কার্য্য নহে।

* *

আশ্রমের শাসন মানিতে হয় আদর্শে পৌঁছছিবার জন্য। কোন আশ্রমের সকল ব্যক্তিই আদর্শ হইতে পারে না। সকল আশ্রমেই মেকি আছে। যেমন ব্রাহ্মণ পুলিস, পাচক দেখিয়া ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ বুঝা যায় না, সেইরূপ ধনি-পুষ্পের চতুঃপার্শ্বস্থ মধুকর সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্ন্যাসের আদর্শ বুঝা যায় না। তাহা হইলে পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা যেমন এক নিশ্বাসে ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বলিয়া থাকেন 'ইহারা অর্দ্ধ সভ্য' সেইরূপ নিগমন সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতি আশ্রমস্থ কোনও ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী হয় তাহাতে সেই আশ্রমের আদর্শের হানি হয় না দোষ সেই ব্যক্তির। আদর্শই আমাদের লক্ষ্য—ঝগড়া বিবাদ নহে। যদি কোনও ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীর দোষ দেখাইয়া একখানি পুস্তক লেখা যায় তবে অপর বর্ণ বা আশ্রমের দোষ দেখাইয়া দশখানি পুস্তক লেখা যায়। অতএব বুদ্ধিমানেরা ঝগড়া বিবাদ স্থগিত রাখিয়া Example is better than precepts এই সরল নীতি অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ চরিত্রের উন্নতি বিধান করিবেন।

* * *

সন্ন্যাসী ভুঁই ফোঁড় নহে। সন্ন্যাসীর পিতামাতা গৃহস্থ। সন্ন্যাসীর আদর্শে পৌঁছিবার প্রধান সহায় পিতা মাতার বিলাস-হীনতা, পবিত্র চরিত্র ও ধর্ম্মভাব। আবার সন্ন্যাসী যখন সকল বর্ণের এবং আশ্রমের গুরুর আসন দাবী করেন তখন প্রকৃত ত্যাগ ও সংযম তাঁহাদের দেহে, কর্ম্মে এবং চিন্তায় না দেখিলে সমাজ চুপ করিয়া থাকিবে না। কোন আদর্শই হেয় নহে—সকলেরই আদর্শ সমাপ্ত হইয়াছে চরম ত্যাগে। তবে কাহার কোন্ 'ভেকে হরি' মিলিবে তাহার যখন স্থিরতা নাই তখন সকল আদর্শই সমাজচক্ষে ধারণ করা বর্ত্তমান সাহিত্যের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

অবতরণ।

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।)

আঁধারের অসীম সাগর। নিস্পন্দ! নিষ্কম্প! মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের জমাট আলিঙ্গনকে বিচ্ছিন্ন করে কাহার সাধ্য? চাঞ্চল্যহীন নিরালা অন্ধপুরীতে কে জানে কে আছে?—জীবিতের সাড়া নাই, গতির ধ্বনি নাই, সব যেন মরণ-কাঠির সংস্পর্শে সুপ্তির মোহে আচ্ছন্ন!

হঠাৎ একটি আলোক-গোলক ফুটিয়া উঠিল। তারপর আর একটি; তারপর আরো একটি। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র আলোক-মণ্ডলে অন্ধপুরী পরিব্যাপ্ত হইল। বিক্ষিপ্ত আলোক বহুযুগ সঞ্চিত আঁধারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। আঁধার পালাইল,—রাঙ্গিয়া উঠিল নবালোকের নবীন অনুরাগ।

নামিল ছন্দের ধারা গতি-ধ্বনির সামঞ্জস্যপ্রসূত। পুলক ঝঙ্কারে কম্পিত হইল আলোর ছন্দ, শব্দের সঙ্ঘাতে বাজিয়া উঠিল জীবনের ধ্বনি, অব্যাহত ছুটীল বিশ্বের গতি,—আলোর পিছনে আলোর নর্ত্তন, বিশ্বকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া বিশ্বের উল্লম্ফন।

বীজ উপ্ত হইল—অঙ্কুরে বৃক্ষ পল্লবিত হইল সবুজ সজ্জায়, মুকুলিত হইল রেশমী শোভায়। তারপর ফুল ফুটিল। সহস্র বৃক্ষের শীর্ষদেশে দুলিয়া দুলিয়া শোভন পুষ্পের রূপ-গৌরব নাচিয়া উঠিল। জগতে ফুলের হাট বসিল। জগৎ-পৃষ্ঠোপরি সুবিশাল মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব ব্যাপিয়া পুষ্পোদ্যানের অশেষ সীমা পরিব্যাপ্ত হইল। সমীরণ ছুটিল হিল্লোলিত তরঙ্গে সেই পুষ্প-বীথিকা আন্দোলিত করিয়া,—পুষ্পের সুরভি নিশ্বাসে মন্দির পরিপূরিত করিয়া।

জগৎ ব্যাপিয়া একটা আবেশময় মাধুর্য্যের ললিত তরঙ্গ অপ্রতিহত ছুটীতে লাগিল। পিতা সন্তানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যাও বৎসগণ! নিম্ন জগতের মাধুর্য্য-মণ্ডিত আবাস তোমাদের খেলা ঘর। সেখানে যাইয়া তোমাদের ছেলে-খেলা সমাপ্ত কর। ঐ যে পুষ্পোদ্যান

পরিবেষ্টিত, সেই মন্দিরে নিত্য নূতন পুষ্প চয়ন করিয়া তোমাদের প্রাণের অর্ঘ্য প্রদান করিও। জানিও, পুষ্পের সৌরভের মাঝেই এই মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা; আর এই পুষ্পার্ঘ্য প্রদানেই তোমাদের ছেলেখেলার সার্থকতা। সাবধান, মন্দিরকে সতত সৌরভ-সমাকুল রাখিতে ভুলিও না; তাহা হইলে তোমাদের খেলাঘর ডাইনী আসিয়া অধিকার করিবে,—তোমাদের বাল-প্রাণের আনন্দ-নির্ঝরগুলি বিশুষ্ক হইয়া যাইবে।"

পিতৃ আদেশ যথাযথ পালিত হইল। পুষ্পোদ্যান পরিবেষ্টিত মন্দির-অঙ্গন শিশু কণ্ঠের চপল হাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। পুষ্পের চয়ন হইল। রাশি রাশি পুষ্পে অনুবৃত হইয়া মন্দির-তল নানা বর্ণ সমাবিষ্ট কুসুম-শয্যায় পরিণত হইল; রাশীকৃত ফুলের সৌরভে বায়ু ভারাক্রান্ত হইল; এমনি চলিল প্রতিনিয়ত বাল-প্রাণের পুষ্পার্ঘ্য। পুষ্পের সুষমালিপ্ত মন্দির সৌরভ-স্নাত হইয়া ভাবাবেশে তন্ময় যোগীর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল।

বহু যুগ অতীত হইল। পুষ্পোদ্যানময় ভ্রমরের রঙ্গীন পাখার নর্ত্তন সন্তানগণকে মুগ্ধ করিল। তাহারা ছুটিয়া চলিল ভ্রমরের রঙ্গিমার পিছনে পিছনে, পুষ্পোদ্যানের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত ভ্রমের বিধৃতির ব্যর্থ চেষ্টায়; ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে ক্লান্তি যখন দেহকে আচ্ছন্ন করিল তখন তাহারা মন্দিরাঙ্গনে নিরানন্দের ছায়াতলে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, তাহাদের অনুপস্থিতির ফাঁক দিয়া ডাইনী আসিয়া মন্দির অধিকার করিয়াছে; সুতরাং সেখানে তাহাদের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু এই মন্দিরে যে যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে;—ইহার সহিত যে তাহাদের প্রাণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। চোখ ফাটিয়া কান্না আসিল; কিন্তু উপায় ত আর নাই। অর্ঘ্যের ডালা সজ্জিত করিবার জন্য উদ্যানে বহির্গত হইয়া দেখিল পুষ্প সব ঝরিয়া পড়িয়াছে, গাছগুলি ম্রিয়মাণ। সমস্ত উদ্যান ব্যাপিয়া আগাছার আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়াছে।—অর্ঘ্যের ডালা মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। পুষ্পোদ্যানের হাস্যময় মাধুর্য্য শ্মশানের ভীতিসমাকুল দৃশ্যে পরিণত হইল। শ্মশানের এই নীরসতার মাঝে সন্তান প্রাণের আনন্দ-নির্ঝরগুলি বিশুষ্ক হইয়া গেল। সন্তানগণের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে করুণ রোদন-ধ্বনি

বহির্গত হইয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিল। আলোককে অন্তরাল করিয়া আঁধার ঘনীভূত হইল, সেই আঁধারের বক্ষে সজাগ থাকিল শুধু সন্তান প্রাণের করুণ কাতর আর্ত্তনাদের ক্ষীণ ধ্বনি।

সহসা উষার কনক-হাস্যের আভায় জগৎ রঞ্জিত করিয়া আলোর মূর্ত্ত বিগ্রহের মত কে এক নূতন সন্তান পুষ্পোদ্যানের আবর্জ্জনা-স্তূপের মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। আঁধারের পক্ষ ধরিয়া ডাইনী পালাইল। সন্তানের দীপ্তির, আলোকচ্ছটায় উদ্যানের আবর্জ্জনা-স্তূপ ভস্মীভূত হইল। আলোর নর্ত্তনের কম্পনে দুলিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সহস্র পুষ্প উদ্যান সমীরকে সৌরভ সমাকুল করিয়া। তারপর মন্দির পূর্ণ করিয়া রাশি রাশি পুষ্পের অর্ঘ্য নিবেদিত হইতে লাগিল ;—মন্দির-বায়ু সৌরভ ভারাক্রান্ত হইল। সন্তানগণ এই নব সন্তানের অনুকরণে বহুযুগ পর নব উষার সঙ্গে সঙ্গে নবীন প্রাণের নূতন অর্ঘ্য প্রদান করিল। তাহাদের এই অর্ঘ্য দানের ফাঁক দিয়া রাশিকৃত পুষ্পের অন্তরালে নব সন্তান উজ্জ্বল হইল।—কেহই বুঝিল না কে এ, নবালোকের রঙ্গীন রথে অবতীর্ণ হইয়া আঁধার দূর করিল, মন্দির মুক্ত করিল, পুষ্পোদ্যানের মলিনতাকে সজীবতায় পরিবর্ত্তিত করিল!

আবার কুসুমের হাস্য-রঞ্জিত হইয়া সন্তানের ছেলেখেলা চলিতে লাগিল। অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে পূর্ণ হইয়া মন্দির-তল কোমল কুসুমের সজীবতায়, হাস্যে, বর্ণে, সৌরভে, আবেশময় ফুলশয্যায় পরিণত হইল।—সন্তান-প্রাণের আনন্দ-উৎসগুলি লহরে, লহরে ফেনিল হইয়া উঠিল।

হেমন্তের শেষ তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া জগৎ তখন শীতের প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কি এক অস্বচ্ছন্দতার স্রোত সন্তান-প্রাণের পরতে পরতে নাচিয়া চলিল! শীতের কুহেলিকায় উদ্যান আচ্ছন্ন হইল, মন্দির পরিব্যাপ্ত হইল, সন্তানের ছেলেখেলা আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে ডাইনীর তাণ্ডব অট্টহাস্য গর্জ্জিয়া উঠিল,—কুহেলিকার অন্তরালে মন্দির বিলুপ্তপ্রায় হইল। শীতের দংশনে পুষ্পোদ্যান বিশীর্ণ হইল, ফুল পাতা ঝরিয়া পড়িল। শীতের শৈত্য-স্রোতের মাঝে সন্তান-প্রাণ আড়ষ্ট রহিল যতক্ষণ ততক্ষণ কুয়াসা গাঢ় হইতে লাগিল।

শেষে সেই গাঢ় কুয়াসা ভেদ করিয়া সন্তান-প্রাণের চাঞ্চল্য পিতার চরণ স্পর্শ করিল কি না কে জানে ?

শীতের কুয়াসা ভেদ করিয়া আবার আলোকরশ্মি ফুটিয়া উঠিল। আবার সেই আলোক-মূর্ত্তি উদ্যান-কুহেলিকার মাঝে দাঁড়াইয়া বলিল, "সন্তানগণ ! শীতের বর্ম্মে আত্মগোপন করিয়া নবযুগ আসিয়া তোমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছে ; তাই তোমাদের উদ্যানের বহু পুরাতন পুষ্পের অর্ঘ্য ব্যর্থ করিয়া কুয়াসা মন্দির আচ্ছাদিত করিয়াছে—উদ্যান-বৃক্ষ নিচয় ম্রিয়মাণ হইয়াছে—কুহেলীর ফাঁকে ফাঁকে ডাইনী রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। উদ্যানের পুরাণো গাছগুলি বিনষ্ট করিয়া শীতের দৌরাত্ম্যসহ নবীন পুষ্পবৃক্ষে উদ্যান ব্যাপ্ত করিতে হইবে। তোমাদের পুরাণো উদ্যানে নবীন পুষ্প চয়ন করিয়া পুরাণো মন্দিরে প্রাণের অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে।"

দেখিতে দেখিতে মন্দির কুয়াসামুক্ত হইয়া নবীন আলোয় হাসিয়া উঠিল, আলোকিত পুষ্পোদ্যানে পুরাতন বিশীর্ণ বৃক্ষের সমাধি-ভূমিতে নবীন পুষ্পবৃক্ষনিচয় নূতন পুষ্পরাজি দোলাইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইল।

আলোক-রথ ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল। সন্তানের শতেক কণ্ঠ এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"হে আলোর মূর্ত্ত বিগ্রহ! বল তুমি কে ;—বার বার আমাদের খেলাঘরে আসিয়া আমাদের নিরানন্দ ক্রন্দনকে হাস্যের চাপল্যে নিমজ্জিত করিতেছ, পুষ্পোদ্যানের বিশীর্ণতাকে বাসন্তী ফুল-সজ্জায় সজ্জিত করিতেছ, বাল-ভীতি ডাইনীকে বিতাড়িত করিতেছ, আঁধারের মস্তকে তুলিকাঘাত করিয়া আলোর অভিব্যঞ্জনকে আঁকিয়া দিতেছ ? কে তুমি হে আলোর দুলাল, আমাদের খেলাঘরের পুনঃ পুনঃ জীর্ণের সংস্কারক ?"

আলোক-রথ শূন্যে নীমিলিত হইল। মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে, উদ্যানের প্রতি পত্র প্রতি পুষ্প হইতে, হাস্যময় আলোর স্রোত হইতে, সমীরের প্রতি স্তর হইতে, আলো-বাতাসের স্পন্দন-সম্ভূত বিদ্যুৎতরঙ্গের প্রতি কম্পন হইতে এক সঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিল—

—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"—

স্তম্ভিত সন্তানগণ, এইবার চিনিল কে এ, আলোর জ্যোতির্ম্ময় রথে যাহার আনাগোনা। এ যে তাহাদের বহুযুগের অদর্শনে বিস্মৃতপ্রায় পিতা—এ যে জগৎপিতা! সন্তানের বেশে—বালকের বেশে—বালকের খেলাঘরে এ যে পিতার অবতরণ—খেলাঘরের ধূলিমলিনতাকে বিদূরিত করিবার জন্য,—খেলাঘরের দৈন্যকে গৌরবময় করিবার জন্য।

আবেগময় সন্তান-প্রাণ বলিয়া উঠিল,—'হে পিতঃ! তোমার উপদেশবিস্মৃত—আমরা ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া শুষ্ক প্রাণে দণ্ডায়মান ছিলাম; তুমিই বার বার আমাদের ধূলাখেলার মাঝে আবির্ভূত হইয়া আমাদের ভিতর জীবনের সরলতা আনয়ন করিয়াছ—নবযুগের নবীনতা প্রতিফলিত করিয়াছ,—জীবনময় আমাদের বাল-প্রাণের সহর্ষ আনন্দকে মরণময় ক্রন্দনের বিষাদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আজ তোমাকে চিনিয়াছি। এই নবযুগের প্রভাতে উন্মুক্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান হইয়া, হে পিতঃ! তোমার পদে কোটী কোটী প্রণিপাত।

'জগদীশ্বর! জগতের যুগবিপর্য্যয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে শৃঙ্খলার আসন বিস্তার করিতে এ যে তোমারি অবতরণ! যতবার জগতে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছে, যতবার ধর্ম্ম ভ্রান্তিময় কুসংস্কারের লৌহজালে আবদ্ধ হইয়াছে, তত বারই তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়াছ।—সমস্ত জটিলতার উদর হইতে শাশ্বত সনাতন সত্যকে মুক্ত করিয়াছ।—মানবের জীবন-উদ্যানে ভোগ-ভ্রমর প্রবিষ্ট হইল। বিবেক-কুসুমকে উপেক্ষা করিয়া মানব ভোগ-ভ্রমরের পশ্চাতে ধাবিত হইল—ভোগের সুদৃঢ় নিগড়ে শৃঙ্খলিত হইল। ভোগ-ভ্রমরের রঙ্গীন পাখার বাহ্য রমণীয়তার পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া মানবের মনে অশান্তির, অস্বচ্ছন্দতার আগুন জলিয়া উঠিল—অভাবের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও তাহার মন কেবলি নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতে লাগিল, আর তাহা পূরণের জন্য অশান্তভাবে কেবলি ছুটাছুটী করিতে লাগিল। ভ্রমর ধৃত হইল না,—অভাব সমাপ্ত করিয়া ভোগের পরিণতি আবিষ্কৃত হইল না; তাই মানব সাফল্যহীনতার লজ্জার উপহাস মস্তকে বহিয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ভোগের পশ্চাদ্ধাবনের এই সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ধর্ম্ম-মন্দিরে

জীবন-উদ্যানের উর্ব্বরতায় লালিত বিবেক-পুষ্পের অর্ঘ্য প্রদত্ত হয় নাই। তাই মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে মরণের অন্ধ ছায়া ঘনাইয়া আসিল,—পাপ-ডাইনীর বিকট অট্টহাস্যে মন্দির প্রকম্পিত হইতে লাগিল,—জীবন-উদ্যানে মরণ-আগাছার আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইল। ধর্ম্মের সঞ্জীবতাকে পাপের মলিনতা আসিয়া গ্রাস করিল।—মানবের বাহিরে ভিতরে অশান্তির, অস্বচ্ছন্দতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই অশান্তিকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিতে মানবের মন ব্যাকুল হইল—তাহার মনে প্রবল ইচ্ছার বান ডাকিল। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির হস্ত ধরিয়া, হে জগৎপতি! তুমি মানবের ঘরে মানবশিশু বেশে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া নির্জ্জীব পাপকে জীবনের সজীবতার অন্তরাল করিলে, ভোগের নিগড় হইতে মানবকে মুক্ত করিলে, ধর্ম্মকে জীবনময় করিয়া মরণের সহস্র জড় অভিনয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিলে।

'সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই জগতের গতি চিরপ্রবহমান।' জগৎ অবিরাম পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে একদিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হইল যে তখন পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনকে বরণ না করিলে জীবন ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। শীতের শৈত্য ও কুয়াসার অত্যাচারে পুষ্পোদ্যান যেমন বিশীর্ণ হইয়া যায় তেমনি নবযুগের দ্বার দেশে আসিয়া মানবের জীবনও পঙ্গু হইয়া গেল। জীবনের স্তরে স্তরে মরণের ছায়া বিন্যস্ত হইল। জীবন যাহার পঙ্গু, ধর্ম্মও তাহার আড়ষ্ট; সুতরাং ধর্ম্ম-মন্দিরও অধর্ম্মের বা তথাকথিত ধর্ম্মের অশেষ জালে আচ্ছন্ন হইল। পুরাতনের অন্ধ অনুশীলনে জীবন আরও ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, ধর্ম্ম আরও জটিল হইতে লাগিল; সুতরাং মানব নবযুগের অনুমোদিত নূতন পন্থা উদ্ভাবনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই চাঞ্চল্যের বক্ষে আরোহণ করিয়া, হে জগদীশ্বর! তুমি মানববেশে আবার মানবের ভিতর অবতীর্ণ হইলে। শীতের প্রকোপ হইতে উদ্যানকে রক্ষা করিতে গিয়া গ্রীষ্মোপযোগী গাছগুলিকে বিনষ্ট করিয়া শীতের শৈত্যানু-মোদিত বৃক্ষে বাগান পরিশোভিত করিলে—পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া নবযুগের নবীন পদ্ধতিতে জীবন গড়িয়া তুলিলে, ধর্ম্মের জীর্ণ সংস্কার করিলে। আবার জীবনের সঞ্জীবতায়, ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে মানব মহীয়ান্

হইয়া উঠিল; নবযুগের নবীন কর্ম্মস্রোত জগৎ প্লাবিত করিয়া ধাবিত হইল।

'নবযুগ আসিয়াছে। নবযুগের নবীন মন্ত্র মানব-মনে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনকে বরণ করিবার সময় উপস্থিত। নবযুগের বার্ত্তাবাহী, হে ভগবান্! নবযুগের কর্ম্মনিয়ামক হে জগদীশ্বর! পুরাতনের সমস্ত আবর্জ্জনাকে ভস্মীভূত করিয়া নূতনের সজীব বৃক্ষে জীবন-উদ্যান পরিশোভিত কর। যাহা পুরাতন, যাহা মিথ্যা, যাহা জটিল, যাহা ভ্রান্ত তাহা দূরে পলায়ন করুক;—জাগিয়া উঠুক যাহা চির নূতন, যাহা সত্য, যাহা সরল, যাহা শাশ্বত। আত্মার গ্লানি আজ দূরীভূত হউক; সত্য, শিব এবং সুন্দরের অভিব্যঞ্জন আত্মাতে প্রতিফলিত হউক। —মানবত্বের বিশাল গৌরব গগন স্পর্শ করুক।'

এই নবযুগের প্রারম্ভে এক ভাবের সন্ধ্যা, অন্য ভাবের উষা; এক ভাবের আদি, অন্য ভাবের অন্ত; এক দিকে বোধন, অন্য দিকে বিসর্জ্জন; এক দিকে ভাঙ্গিবার পালা, অন্য দিকে গঠন সুরু। এই ভাঙ্গাগড়ার প্রবল সংঘর্ষের সঙ্ঘাতেই মানব-জীবন সচল হইবে, মানব-জীবন সজীব হইবে, মানব-জীবন বিকশিত হইবে। এই ভাঙ্গা-গড়ার মাঝেই তরঙ্গায়িত জীবনের প্রতি তরঙ্গের লীলাচাতুর্য্য ও ঘাত-প্রতিঘাতের অবিরাম ক্রীড়া চলিবে। ঐ পুরাতন যুগ কান্নার বোঝা বক্ষে চাপিয়া কালের আকাশে অস্ত যাইতেছে, আর ঐ হাসির হৈম কিরণে রঞ্জিত হইয়া নবযুগ উদিত হইতেছে। এক দিকে হাসি, অন্য দিকে ক্রন্দন। এই হাসি-কান্নার সুরের গানেই হে নবযুগের মহাপুরুষ! জগৎ তোমায় বরণ করিয়া লইবে। কাঁদিবে মরণময় ভ্রান্ত পুরাতনের আবর্জ্জনা রাশি, হাসিবে সজীব সরস নূতনের শাশ্বত সত্যের আলোকরাশি। হে যুগাবতার! আজ হাসি-কান্নার সন্ধিস্থলে তোমার বরণডালা সজ্জিত হইয়াছে। একদিকে পুরাতনের ক্রন্দন, অন্য দিকে নূতনের গৌরবময় হাস্য। বিসর্জ্জনের মাঝেই বোধনের বাঁশি ধ্বনিয়া উঠিয়াছে; মরণের পাশেই জীবনের বাণী গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে,—ক্রন্দনের বক্ষ হইতেই হাস্যময় বোধনের সুর উত্থিত হইয়াছে। নবযুগের কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের প্রবল নর্ত্তনে জলধি

উদ্বেলিত, জগৎ শিহরিত; তারি পাশে পুরাতনের সুকরুণ বিসর্জ্জন-বিলাপ!—

—করুণ-রোদন-ধ্বনিত-সর্ব্ব,
শিহরিছে ধরা, বিশাল গর্ব্ব
শূন্যে তুলিছে শির;
অশ্রু-কণিকা-সিক্ত-পরাণ—
গাহিছে উচ্চে বন্দনা গান,
ধ্বনিত জলধি স্থির!!—

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

(২)

আমরা 'হিন্দু'। 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে 'সিন্ধু' থেকে। সিন্দু-নদের পূর্ব্বপারে যে আর্য্যেরা বাস কত্তেন প্রাচীন পারসীকেরা তাঁদের হিন্দু বল্‌তেন—কারণ তাঁরা 'স' এর স্থলে 'হ' উচ্চারণ কত্তেন। জেন্দাবেস্তা নামক তাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে 'স্বরস্বতী' নদীর স্থলে 'হরথতী' দেখা যায়। ইদানীং পূর্ব্ববঙ্গেও 'স' স্থলে 'হ' এর প্রয়োগ দেখা যায়। সেই হেতু আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় নাম বিদেশী এবং উচ্চারণ বৈকল্য হইতে উৎপত্তি। আমাদের প্রকৃত জাতীয় নাম হওয়া দরকার 'বৈদিক' বা 'বৈদান্তিক'। কারণ 'হিন্দু' বল্‌তে যাদের বোঝায় তাদের সকলেই এই 'বেদ' নামক অক্ষর জ্ঞানরাশি সম্পন্ন পুস্তককে মানে; কিন্তু হিন্দু শব্দের শব্দগত মানে ধর্‌লে শুধু হিন্দুদের বুঝায় না খৃষ্টান, পার্সী, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলকেই বুঝায়। সেই হেতু ভারতবাসীর জাতীয় নাম হিন্দু হইতে পারে কিন্তু ভারত প্রসূত এই বিরাট ধর্ম্মের নাম বৈদিক

* উদ্ধৃত অংশগুলি ভারতে বিবেকানন্দ—জাফনায় বক্তৃতা—বেদান্ত হইতে

বা বৈদান্তিক হওয়াই প্রয়োজন। "জগতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্ম্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা অন্য কোন অতি প্রাকৃত পুরুষ বিশেষের বাক্য সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি। পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদিগের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

প্রত্যেক ধর্ম্ম কোনও না কোনও অতিমানবের ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি কোনও ক্রমে সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যায় তাহ'লেই সেই ধর্ম্ম-মন্দির একেবারে ভূমিস্মাৎ—যেমন খৃষ্ট ধর্ম্ম। যেই প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদেরা খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম, Neo-Platonism প্রভৃতি মতবাদ হ'তে নির্দ্দেশ করলেন, তখনই সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মনে একটা মস্ত সন্দেহের ছায়া ঘনান্ধকারের মত ছেয়ে ফেল্‌লে এবং শ্রীভগবানের অবতার খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও মহা সন্দিহান হয়ে উঠল এবং নবীন জড় বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপটা একটা নাস্তিকদের মস্ত দুর্গ হ'য়ে উঠল। কিন্তু আমাদের ভারতীয় ধর্ম্ম সে রকম নয়।

"বেদ নামক শব্দরাশি পুরুষ মুখ নিঃসৃত নহে। উহার সন তারিখ এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কখনও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। আর আমাদের হিন্দুদের মতে, বেদ অনাদি অনন্ত। একটি বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বর নামক ব্যক্তির অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়; হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃ প্রমাণ; কারণ, বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনই লিখিত হয় নাই, উহা কখনই সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। বেদ অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি (বিদ্‌ ধাতুর অর্থ জানা)। বেদান্ত নামক জ্ঞানরাশি ঋষি নামধেয় পুরুষ সমূহের দ্বারা আবিষ্কৃত।

ঋষির অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন অথবা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টা মাত্র, ঐ ভাবরাশি, অনন্তকাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল। ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্ত্তা।"

এই বেদ দু ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে আর্য্যদের আজীবন নিত্য, নৈমিত্তিক, স্বর্গ-পুত্র বিত্তদায়ক যজ্ঞ প্রণালী, সামাজিক জীবনের বিধি নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে। আর জ্ঞানকাণ্ডে আছে, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, দয়া, নিত্য, লীলা. ঈশ্বর, আত্মা ব্রহ্ম, পুনর্জন্ম, ক্রমবিকাশ, ক্রমসঙ্কোচ, সমন্বয় প্রভৃতি চিরন্তন সত্যসকল, যাহা সকল যুগ বিপর্য্যয়ের মধ্যে অটুট ভাবে বর্ত্তমান। পৃথিবীতে যে সব বড় বড় ধর্ম্মমত আবিষ্কৃত হয়েছে তা সব এই জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্তের সার্ব্বজনীন মহাসত্য সকলকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। আজকাল যে নবীন জড়বিজ্ঞান যা সকল ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত কচ্চে সেও এই বেদান্ত ধর্ম্মেরই মূল সত্যগুলি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা কচ্চে। পক্ষান্তরে অপর ধর্ম্মসকলের স্থায়িত্ব এবং প্রাণ এই বেদান্তেই নিহিত। জেন্দাবেস্তা, পুরাণ, স্মৃতি, ত্রিপিটক, বাইবেল, তন্ত্র, কোরাণ, প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র বাঁচতে পারে যদি তারা নিজেদের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক বেদান্তের আলোতে আলোকিত করে।

কর্ম্মকাণ্ড চিরকালই পরিবর্ত্তিত হবে। বেদের সময়কার বিধি নিষেধ আচার ব্যবহার তৎপরবর্ত্তী যুগে বদ্‌লে গিয়েছিল। তার প্রমাণ মন্বাদি কুড়ি খানি স্মৃতি সংহিতা। প্রত্যেক সংহিতা খানির বিধি নিষেধ অপরের বিরোধী। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাদ্বয়ের মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয় তাও আবার বিভিন্নাংশ বিভিন্ন দেশে প্রতাপশালী। ইদানীংকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন জীমূতবাহনাদিরা নিজেদের প্রবর্ত্তিত বিধি নিষেধ দৃঢ় করবার জন্য সে সকল শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত

করেছেন তার বিরোধী শাস্ত্র বাক্য সকলও উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্ত বা উপনিষদ্ আবিষ্কৃত সত্যসকল চির কালই সমানভাবে জগতের সকল চিন্তাশীল মস্তিষ্ক অধিকার করে নিজ মহিমায় উজ্জ্বল রয়েছে। তাই "বেদান্তের পরই স্মৃতির (ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি) প্রামাণ্য। এগুলিও ঋষিলিখিত গ্রন্থ, কিন্তু এগুলির প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। কারণ, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের শাস্ত্র যেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে বিশেষ বিশেষ ঋষিমুনি এই সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই অর্থে অন্যান্য ধর্ম্মের শাস্ত্র সমূহের প্রামাণ্য যেরূপ স্মৃতির প্রামাণ্যও তদ্রূপ, তবে স্মৃতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোন অংশ যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার কোন প্রামাণ্য থাকিবে না। আবার এই সকল স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি, সত্যযুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিতে আবার অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশকাল পাত্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।" পুরাকালেও যেমন দেশ নায়ক ব্রাহ্মণেরা দেশকাল পাত্রানুযায়ী স্মৃতি রচনা করে এই বিরাট হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা সাধন করেছেন এ যুগেও যদি তাঁরা তাঁদের পিতৃ পুরুষদের মত কৃতিত্ব না দেখাতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে মুমূর্ষু জীবের প্রতি যেমন শকুনি উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে সেইরূপ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সর্ব্বনাশ অতি নিকটেই এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের মৃত্যু প্রতীক্ষা করচে।

দেশনায়ক ব্রাহ্মণেরা অধিকারবাদকে উপলক্ষ করে শাস্ত্রের মহৎ তত্ত্ব সকল লুকিয়ে রেখে দেশে ছড়ালেন যত স্ত্রীআচার, কুলাচার আর দেশাচার। ফলে হয়ে উঠল এই দেশটা একটা মস্ত কুসংস্কারীদের ডিপো। মহিমোজ্জ্বল-আত্মবাদীদের দেশে তথাকথিত কতকগুলি ধর্ম্ম ধ্বজীর সৃষ্টি হ'ল যাঁরা নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য ধর্ম্মজ্ঞান বিরোহিত পশুপ্রায় এক বিরাট শূদ্র সমাজের সৃজন করে রাখ্‌লেন—

যে কর্ম্মের ফল ভোগ আমরা হাজার বছর ধরে করচি। সন্ন্যাসী যত বড়ই দোষী হউক না কেন তারাই পুনঃ পুনঃ কুসংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে ধর্ম্মের বন্যা এনে সকল দীন হীন নিম্ন হৃদয় ধুয়ে পবিত্র করবার চেষ্টা করেছে। প্রমাণ—বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, কবির প্রভৃতি। আবার বর্ত্তমান যুগের প্রেমিক সন্ন্যাসী আপামর সাধারণে বিতরণ করচেন বেদের সেই মহতী বানী যে "জীবাত্মা সকল অনাদি অনন্ত—তাহারা স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক আত্মার সর্ব্ববিধ শক্তি, আনন্দ, পবিত্রতা, সর্ব্বব্যাপীতা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব রহিয়াছে।" সকল দৈন্য, নিষ্ফলতা প্রসূত হিংসা দ্বেষ দূর করে নিরুৎসাহী হতাশ হৃদয়ে প্রীতির আসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বল্‌চেন "এই গুরুতর তত্ত্বটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আত্মায় আত্মায় ভেদ নাই—কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার ও ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে—স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন ভেদ নাই, সে আমার ভ্রাতা, তাহারও যে আত্মা, আমারও তাহাই। ভারত এই মহত্তম তত্ত্ব জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছে। অন্যান্য দেশে সমগ্র মানবের ভ্রাতৃভাব তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া থাকে—ভারতে উহা সর্ব্ব প্রাণীর ভ্রাতৃভাব এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি, ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ পর্য্যন্ত আমার ভাই—তাহারা আমার দেহস্বরূপ। 'এবং তু পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্' ইত্যাদি। এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই প্রভুকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে উপাসনা করেন। সেই কারণেই ভারতে তির্য্যগ্‌জাতি ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্ত্তমান; সকল বস্তু সম্বন্ধেই, সকল বিষয়েই ঐ দয়ার ভাব। আত্মার সমুদয় শক্তি বর্ত্তমান, এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলন ভূমি।"

আর আজকাল যে একটা সাম্যের ঝড় উঠেছে যা সমাজের মধ্যে বড় বলে কোন জিনিষ রাখ্‌তে চায় না—সব ভেঙে চূরমার করে ফেলে একটা সমভূম সমাজের সৃষ্টি করতে চায়। এই অতি-সাম্য বাদীদের ভাঙবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে কিন্তু গড়বার ক্ষমতা নেই। কারণ সমাজ সৌধ নির্ম্মাণ করতে হ'লে যে প্রীতির মসলার প্রয়োজন

তার সন্ধান তাঁরা জানেন না—মেরে কেটে ইট কাট জোগাড় হ'তে পারে। বিভিন্ন জাতি বা ব্যক্তিকে অস্ত্রবলে এক করা যেতে পারে কিন্তু গড়বার মসলা যে প্রেমনীতির প্রয়োজন তার আকর কোথায় সেদিকে কারু নজর নেই। তাই আচার্য্য বিশ্বকে আহ্বান করে বলে দিচ্চেন "নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদই সর্ব্বপ্রকার নীতি বিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—মনুষ্য জাতিকে আত্মতুল্য ভালবাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতর জাতিতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, প্রাণী নির্ব্বিশেষে সকলকেই আত্মতুল্য প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আবার প্রাণীবর্গকে আত্মতুল্য ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে একমাত্র সমর্থ। যখন, তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ড স্বরূপ জানিলে, তখনই তুমি জানিতে পারিলে, অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল।"

বহু বর্ষের দাসত্বের ফলে আমরা অতি হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছি, কোন একটা মহৎ কায করতে গেলেই আমাদের সামনে একটা ভীতি এসে দাঁড়ায় আর নানা বিভীষিকার সৃষ্টি করে কর্ত্তব্যের পথ থেকে পালাবার যুক্তি দেয়। সকল কার্য্যের প্রথমেই এসে দাঁড়ায় মৃত্যুভয় আর এর কারণ হচ্চে বেদান্ত প্রতিপাদিত আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। বেদান্ত বলেন "ভয়? কার ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তু মাত্র।" বেদান্ত প্রতিপাদিত এই আত্মবিচার এই আত্মধ্যান অভ্যাস করলে আসবে সেই সকল মহত্ত্বের মূলীভূত মহাশক্তি মহাবীর্য্য। যদি আমরা বসে বসে নিজেদের অপদার্থ, হতভাগা, দুর্ব্বল, পাপী, অপবিত্র বলে ভাবি তাহ'লে আমরা তাই হয়ে যাব। "অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু আপনাকে তেজস্বী, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়।" যে শাস্ত্র বা ব্যক্তি অপরকে পাপী, ছোট, অস্পৃশ্য বলে সেই দেহাত্মবাদী শাস্ত্র বা গুরু প্রকৃত-পক্ষে অন্তর্যামী আত্মাকেই গালাগালি করচে বুঝতে হ'বে—সেই দেহাভি-

মানী নাস্তিকদের কথা শোনবার আমাদের আর এখন অবসর নেই। আমাদের এখন প্রথম কর্ত্তব্য আচার্য্যের এই সত্য উপদেশ প্রতিপালন করা "অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্ব্বলতা, কোনরূপ অনুষ্ঠানপদ্ধতি শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক; সাহসী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বংসহ হউক।" এই সকল গুণ সম্পন্ন হ'তে হ'লে আমাদের বেদান্তকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'বে কারণ কেবল বেদান্ত নামধেয় একমাত্র শাস্ত্রেই মহিমাময় আত্মার জয় উচ্চারণ করা হয়েছে। "বেদান্তেই কেবল সেই মহান্ তত্ত্ব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।"

আর একটা ব্যাপার নিয়ে ধর্ম্মরাজ্যে বরাবর লাঠালাঠি চলে আসচে কেষ্ট বড় না কালী বড়, সগুণ উপাসনা বড় না নির্গুণ উপাসনা বড়, প্রতীকের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিৎ কি ভাবের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু বেদান্ত বল্‌চেন "ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। * * * বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধনা প্রণালীর প্রয়োজন।" ইষ্ট নিষ্ঠা মানে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী পথে দৃঢ় থাকা আর অপর পথগুলোকে বিভিন্ন রাস্তা মনে করে শ্রদ্ধা করা। Tolerationএর দোহাই দিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা নয়। যাঁরা মনে করেন যে তাঁদের মতটাই সব—আর সব জাহান্নামে যাক—তাঁরা Iconoclastsদের (কালাপাহাড়) রূপান্তর মাত্র। "যদি কখন পৃথিবীর সর্ব্বলোক এক ধর্ম্ম মতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তা শক্তি ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব একেবারে বিনষ্ট হইবে। ভেদই আমাদের জীবন যাত্রার মূলমন্ত্র। সম্পূর্ণরূপে ভেদ চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। * * * যাহারা ঈশ্বরলাভোদ্দেশে বিভিন্নপথাবলম্বী ভ্রাতাদিগের বিনাশ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথা বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন। তাহাদের প্রেমের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অপরে অন্য পথের অনুসরণ করিতেছে সে ইহা সহ্য করিতে পারে না, সে আবার

প্রেমের কথা বলে ! যদি ইহাই প্রেম হয়, তবে আর দ্বেষ কি ?" আমরা এতকাল জান্‌তাম না যে একই ভগবান্ বাণী এবং চরিত্রের দ্বারা উন্নত করবার জন্য যুগভেদে, দেশভেদে আধারভেদে নানা অবতার হয়ে নানা ধর্ম্ম দান করচেন। কোন একটি ধর্ম্মকে গালাগালি দেওয়া মানে ঈশ্বর কর্ম্মকে গালি দেওয়া। "যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবাদ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি ঈশ্বর পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ। তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশঃ পশুপদবীতে উপনীত হইতেছ।"

হিন্দু যতবড়ই অত্যাচারী হ'ক না কেন সে সদর্পে বল্‌তে পারে যে সে কখনও বিষ, অস্ত্র, আগুন দিয়ে পরাজিত জাতির সর্ব্বনাশ করে নি। সে শূদ্রকে নিম্ন স্তরে স্থান দিতে পারে ঘৃণা করতে পারে কিন্তু তাদের কখনও জগৎ হতে মুছে ফেলে নি। "আমাদের ধর্ম্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কোলে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলি ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট আপাততঃ বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।" কিন্তু কালকের শিশু তুমি হঠাৎ একটা চক্‌মকে বাড়ি দেখে এসে যদি বল, পুরীর মন্দির ভেঙে দেও—ও পুরনো ও সেকেলে, নতূন করে ঐ চক্‌মকে বাড়িটার মত করে গড়—তখন কি তাই শুন্‌তে হ'বে না। হেঁসে বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে কোলে করে নেবেন। সমাজ সংস্কারকদের উপদেশ শুনে স্বামীজি বলেছেন "এক্ষণে আমার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি ঐগুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির কোনটীর বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে। * * * তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া থাকিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও, ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন। বুদ্বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি,

বুদ্বুদের ন্যায় লয়। অগ্রে আমাদের ন্যায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর। প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্ত্তন কর, যাহাদের শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। তখন তোমাদের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় হইবে, কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা বালক মাত্র।"

এখন এমন একটা সময় এসেছে যে কেবল বক্তৃতা দিলে বা শুনলে চলবে না। ছোট স্কুলের ছেলে, তোতাপাখী, প্রতিধ্বনি, গ্রামোফন, এরাও ত যা শোনে বা পায় তারই প্রতিশব্দ করে। এতে ফল কি? স্বামীজি বল্‌চেন "আমি এক্ষণে বর্ত্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন কয়েকটা কথা তোমাদিগকে বলিব। মহাভারতকার বেদব্যাসের জয় হউক, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। অন্যান্য যুগে যে সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা এখন আর চলিবে না।" কিন্তু আচার্য্য ব্যাসের দান-ধর্ম্মের প্রাণ ছিল দাতা ও গৃহীতায়, আর আচার্য্য বিবেকানন্দের দানধর্ম্ম বিশ্বদেবের পূজায় সমাপ্ত, এর প্রাণ হচ্চে সেব্য ও সেবক। কারণ দেহাভিমানী সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পরমাত্মার সেবা করতে হ'বে অন্নদানের দ্বারা, প্রাণদানের দ্বারা, বিদ্যা দানের দ্বারা এবং ধর্ম্ম দানের দ্বারা। আচার্য্য আর এক মহান্ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করেছেন, "যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তারত্নগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ সকল তত্ত্ব আবার শুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে, তাহা নহে, সমগ্র জগতে উহা ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের এক শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।" আর আমাদের সকল কর্ত্তব্য পথে মহা অন্তরায় যা তাও নির্দ্দেশ করচেন "সর্ব্বোপরি আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হায়, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইতেছি! আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের হিংসা করিতেছি। অমুক আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন হইল—আমি কেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলাম না—অহরহ আমাদের এই চিন্তা। এমন কি, ধর্ম্মকর্ম্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের

অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষার দাস হইয়াছি! ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে কোন প্রবল পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষ্যাপরায়ণতা। সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহ প্রস্তুত নহে। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্ব্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হইতে পারিবে।"

যোগমায়া।

(শ্রীসাহাজি)

শঙ্কর আর বুদ্ধের মতে, রাক্ষসী এই মায়া।
গ্রাস করেছেন হায় রে! একা, নিখিল জগৎ কায়া॥
শঙ্কর মতে সাধনা করিনু, বুদ্ধের নিনু দীক্ষা।
নিত্য বাসনা মায়ারে এড়াতে, কৃচ্ছ্র করিনু শিক্ষা॥
সাধনা-শেষে একি দেখি আজ, হয়ে গেছি আমি নিঃস্ব।
খেলা-ঘরে যে বন্ধ আছিল, আজি সে জুড়েছে বিশ্ব॥
এড়াতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছি, বেড়াপাকে আজি বন্ধ।
যা ছিল মায়া, আমারি মাঝে তা মা হয়ে ফুটেছে সদ্যঃ॥
খেলা-ঘরে যারা পুতুল আছিল, তারাই আজিকে পুত্র।
প্রসূতি নহি, তবুও জননী, একি রে মায়ার সূত্র?
দেবকী মোদের জননী বটে, মা যে মোদের যশোদা।
না বিয়িয়ে কানায়ের মা, হয়েছে কে করে কোথা?
বুঝিনু রে সখী, বুঝিনু আজি, মায়াই প্রেমের ভাষ্য।
ভূমাই স্বর্গ, ক্ষুদ্র!—শুধু, ভূমারি মোহন হাস্য॥
নিঃসংসার সন্ন্যাসী যে, সংসার তাঁরি বিশ্ব।
সংসারীর ঐ ক্ষুদ্র গৃহে, রাজাই বটে গো নিঃস্ব॥
ত্যাগই সখীরে, পরম ভোগ, মুক্তি পরম বন্ধ।
কে বলে মায়া? যোগমায়া এ যে, তুচ্ছ মায়ারি ধন্ধ॥

দেশের কথা।

(১)

বস্ত্রবয়নশিল্প।*

যদি কেহ এই বস্ত্র-সঙ্কটের সময় বস্ত্র বয়নের সংকল্প করিয়া বয়ন শিল্পালয় স্থাপন করেন অথবা কোন ব্যক্তি বস্ত্র বয়ন করেন, তাহা হইলে এই কয়েকটী বিষয় জানিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে কতকটা সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়; কেননা গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকে বয়ন শিল্পকার্য্য প্রথম হইতে অসুবিধা দেখিয়া উক্ত কার্য্য করিতে অগ্রসর হন নাই। আবার কেহ বা কার্য্য আরম্ভ করিয়া অনেক রকম অসুবিধা দেখিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। যদি কেহ সেইরূপ অসুবিধায় পড়িয়া হিতকর প্রধান শিল্প এবং বর্ত্তমান সময়ে লাভ জনক বস্ত্র বয়ন কার্য্য করিতে অমনোযোগী হন অথবা কার্য্য আরম্ভ করিয়া হতাশ হইয়া পড়েন সেই আশঙ্কায় কয়েকটী কথা লিখিতেছি।

১। তাঁত—আমরা প্রায় দ্বাদশবর্ষ কাল উক্ত বয়ন শিল্পকার্য্য করিয়া যে কয়েক প্রকার তাঁত ব্যবহার করিয়াছি এবং ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি তন্মধ্যে ঠকঠকি (ফ্লাই সাটেল) তাঁতই হস্ত চালিত তাঁতের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা জনক বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই তাঁতের মূল্য অন্যান্য তাঁতের মূল্য অপেক্ষা কম। তাঁতের কোন অংশ খারাপ হইয়া গেলে গ্রাম্য মিস্ত্রী দ্বারা মেরামত হয়, এমন কি যন্ত্রাদি থাকিলে বস্ত্র বয়নকারী নিজেই মেরামত করিয়া লইতে পারেন।

এই তাঁতে কম পরিশ্রমে ১০নং মোটা সুতা হইতে ৮০নং সরু সুতার কাপড় পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি; এবং গড়পড়তায় অপেক্ষাকৃত

---

* স্বামী কেশবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন বয়ন বিদ্যালয় কোয়ালপাড়া, কতুলপুর পোঃ বাঁকুড়া।

বেশী কাপড়ও আদায় হয়; সুতরাং পারিশ্রমিকও বেশী পাওয়া যায়। হুগলি জেলায় শ্রীরামপুর, মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা প্রভৃতি অপরাপর অনেক স্থানেই এই তাঁত খরিদ করিতে পাওয়া যায়। মূল্য সাজ সরঞ্জাম ও ফ্রেম সহ আন্দাজ ২৫।৩০৲ টাকা। শানা (Reed) "ব" (Helads.), চর্কা, চর্কী ও টানা কাড়ার যন্ত্রাদি পৃথক মূল্য দিয়া খরিদ করিতে হয়।

এই তাঁত হস্ত পদ দ্বারা চালিত হয় বলিয়া অনেকেই শুধু হস্ত দ্বারা চালিত উন্নত প্রকারের বেশী দামের তাঁত ব্যবহার করা সুবিধাজনক মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। মাকু চালান ও ঝাঁপ টেপা হস্ত ও পদ দ্বারা হয় এই উভয় কার্য্য শুধু হস্ত দ্বারা সমাধা করিতে হইলে পরিশ্রম বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। বেশী চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে যদিও কোন দিন উহাতে ঠক্‌ঠকি তাঁতের অপেক্ষা কিছু বেশী কাপড় আদায় হয় কিন্তু সেইরূপ পরিশ্রমে শুধু হস্তদ্বারা চালিত তাঁত প্রতি-দিন চালান বড় কষ্টকর। আবার একটু কলকব্জা খারাপ হইলে তাঁতখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কেননা নাগরিক অভিজ্ঞ মিস্ত্রী ব্যতীত উন্নত প্রকারের তাঁত মেরামত হয় না। এজন্য বেশী দামী তাঁত দেখিতে ও শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু কাপড় আদায়ের পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে তাঁত চালাইতে হইলে ঠক্‌ঠকি তাঁতই বিশেষ উপযোগী।

২। শিক্ষক—বস্ত্র বয়ন করা বেশী কঠিন কার্য্য নহে; তবে সুতার পাট, টানা প্রস্তুত, টানা গুটান, সানা কিংবা "ব" গাঁথার একটু ইতর বিশেষ হইলে বস্ত্র বয়ন করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই কার্য্যগুলি ঠিক ভাবে হইলে যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এজন্য গোড়ার কার্য্যগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। এই কার্য্যগুলি শিক্ষা সহজেই হয়। ছয়মাস কাল কোন বয়ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে অথবা একটি শিক্ষক রাখিয়া ছয় মাস কাল মনোযোগ সহ শিক্ষা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে লোকসানের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীরামপুর, বাঁকুড়া, পাবনা প্রভৃতি

বয়ন বিদ্যালয়ে বয়ন শিক্ষার্থীগণকে অবস্থা বিশেষে মাসিক বৃত্তি দিয়া বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত বয়ন বিদ্যালয় হইতে অনেক শিক্ষকও বাহির হইতেছেন শুনিতেছি।

৩। সুতার পাট—তাঁতের কার্য্য লাভজনক ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইলেও টানা, সুতার পাট অর্থাৎ সুতায় বিট দিয়া লাটায়ে গুটান বিষম ব্যাপার বলিয়া অনেকে বয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং অধিকাংশ বয়ন শিল্পালয়ে কোরা পাকান সুতার জামার ছিট প্রস্তুত হইয়া থাকে, পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করিতে চেষ্টা করেন না। এই সুতার পাট পরিধেয় বস্ত্র বয়নের সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান কার্য্য। ইহাতে বিশেষ অভ্যস্ত না থাকায় আমাদিগকে বিষম মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। এজন্য আমরা সুতা গুটাইবার লাটাইকে চরকা কলের সাহায্যে চালাইয়া সুতার পাটের সুবিধা করিয়া লইয়াছি। এই চরকা কলের সাহায্যে সুতা গুটান খুব সহজে সত্বর সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা যে কোন ব্যক্তি সুতার পাট করিতে পারিবে। সুতরাং এই কল ব্যবহার করিলে সুতার পাটের জন্য আদৌ চিন্তা করিতে হইবে না। তাহার পর লাটায়ের সুতা শুকাইয়া ছোট চর্কীতে চাপাইয়া টানা প্রস্তুত করা যায়, অথবা উহা হইতে নলী প্রস্তুত করিয়াও টানা দেওয়া হয়।

৪। "ব"—বস্ত্র বয়নের জন্য আমাদিগকে আর একটি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। টানা সুতা বার নরাজে গুটাই-বার পর বয়ন সময়ে ঝাঁপ তুলিবার যে "ব" (Healds) তন্তুবায়গণ সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত করিয়া থাকে সেই "ব" ভালরূপ প্রস্তুত হইলে কাপড়ও ভাল হয়; নচেৎ এত কাপড় খারাপ হয় যে বিক্রয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য আমাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আমরা অনন্যোপায় হইয়া বাঁধা "ব" যাহা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে ও শ্রীরামপুর উইভিং স্কুলে ব্যবহৃত হয় সেই "ব" বোম্বের গ্রীভস্ কটন কোংর দোকান হইতে আনিয়া ব্যবহার করিতেছিলাম। উপস্থিত নিজেরাই উক্ত বাঁধা "ব" প্রস্তুত করিয়া লইতেছি। বাঁধা "ব"

ব্যবহার করিলে কাপড় খুব সুন্দর হয়। অতএব বাঁধা "ব" ব্যবহার করাই উচিত।

৫। মাকু—ঠক্‌ঠকি তাঁতে সাধারণতঃ চক্রযুক্ত মাকু ব্যবহার হইয়া থাকে। চক্রযুক্ত মাকুতে প্রথম বেশ সুবিধা হয় বটে, কিন্তু চাকা কোন রকম খারাপ হইয়া গেলে তাঁত বন্ধ হইয়া যায়। মিস্ত্রী ব্যতীত ঐ চাকা মেরামত হয় না। এজন্য চক্রহীন মাকুই ব্যবহার করা উচিত। এই মাকুর মূল্যও সুলভ এবং কোন অংশ সহজে খারাপ হইবার আশঙ্কা নাই। আমরা উভয় প্রকার মাকুই ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে চক্রহীন মাকুই কার্য্যোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এজন্য উক্ত জে, গ্রীভস্ কোংর চক্রহীন মাকু ব্যবহার করিতেছি।

৬। সুতা—কেহ কেহ তাঁতের কার্য্য আরম্ভ করিয়াই ৪০।৫০নং সরু সুতার কাপড় বুনিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা প্রায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে ১২ কি ১৬নং মোটা সুতার কাপড় বয়ন করিয়া ২।৪ মাস অভ্যাস করিলে পর ২০।৩০নং সুতার কাপড় প্রস্তুত করিতে কোন কষ্টই হইবে না। উহা আবার কিছুদিন অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ ৪০।৫০নং সরু সুতার কাপড় বুনিতে পারা যায়।

৭। তাঁতের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—তাঁতের কার্য্য চালাইবার জন্য অনেকগুলি জিনিষ পত্রের আবশ্যক; সেই সকল জিনিষ পত্র সকল সময়ে সকল স্থানে পাওয়া যায় নাই। এজন্য বস্ত্র বয়ন কার্য্যের বড় ক্ষতি হয়। যদি তাঁতের কার্য্য সম্বন্ধে কাহারও কোন পরামর্শ লইবার আবশ্যক হয়, উক্ত কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি পাইবার ঠিকানা জানিবার প্রয়োজন হয় কিংবা সুতা প্রস্তুত করিবার জন্য চরকার এবং তুলা চাষের জন্য ক্ষেত কাপাসের বীজের আবশ্যক হয় তাহা হইলে ডাক টিকিট সহ লেখকের ঠিকানায় পত্র লিখিলে যথা সম্ভব পরামর্শাদি দিবার চেষ্টা করা হয়।

(২)

শিশুর অপমৃত্যু।*

এই বাঙ্গালাদেশে তথা ভারতবর্ষে শিশুর মৃত্যু বা অপমৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃই এত ভীষণ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে যে মনে হয় অচিরে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বুঝি বা লোপ পাইবে। একদিকে যেমন ম্যালেরিয়া, ইনফুলেঞ্জা, দরিদ্রতার দরুণ অনশন প্রভৃতি কারণ, মনুষ্য শক্তি শনৈঃ শনৈঃ হ্রাস করিতেছে, অন্যদিকে তেমনই শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এক বাঙ্গালাদেশে তিন লক্ষ শিশু এক বৎসরে হওয়ার পূর্ব্বেই মারা যায়—ইহার মধ্যে দুই লক্ষ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার একমাসের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। একবারও কি মনে হয় না যে এই ভাবে শিশু ক্ষয় হইতে থাকিলে এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন আমাদের নাম মাডাগাস্কার দ্বীপের ডাডোদের মত জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে। যে কোন গ্রামে যাও দেখিতে পাইবে শিশু সংখ্যা কিরূপে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। যেথানে আগে হয় তো দুই শত শিশু ছিল এখন পঞ্চাশটীও আছে কি না সন্দেহ! আবার যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের জীবন্মৃত অবস্থা অর্থাৎ কতকগুলি প্রাণহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, প্লীহাযকৃৎ ভারগ্রস্থ পুত্তল মাত্র।

যাহাতে এই সকল সন্তানের জীবন রক্ষা হয় ও ভবিষ্যতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে সে বিষয় চেষ্টা সমগ্র জাতিরই কর্ত্তব্য; কারণ শিশুর উপরেই জাতীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। উপায় নারায়ণ বলিলে চলিবে না। ভগবান তো আছেনই কিন্তু আমাদের পুরুষকারটা কি একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হইবে? এই যে সেদিন দেখিলাম ইংলণ্ডবাসীরা যত্ন ও উদ্যমসহকারে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের বর্দ্ধিত শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা কমাইয়া ফেলিল। মানুষে যাহা পারিয়াছে মানুষ তাহা পারিবে না কেন? আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি একটু

* কৃষ্ণনগর শিশু মৃত্যু নিবারণী সভায় ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় Municipal Chairman এর বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত।

চেষ্টা করিয়া জাগাইয়া তুলিলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। তবে একটা কথা আছে ইংলণ্ডবাসীরা ধনী আর আমরা গরীব—কিন্তু তাহা হইলেও চেষ্টা করিলে অনেকটা আমরা সফলকাম হইতে পারি। আর দুঃখের বিষয় শিশুর অকাল মৃত্যু আমাদের দীর্ঘকালের কুসংস্কার এবং সময়ের সহিত চলিতে না জানায় এত প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী উল্লেখ করা যাইতে পারে,—যথা পেঁচো পেঁচি পাওয়া, কাটা নাড়ীতে অপরিষ্কার মাটী দিয়া প্রলেপ দেওয়া ইত্যাদি।

কারণ :—

১। "গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া" শীর্ষক পূর্ব্ব প্রবন্ধে এবিষয় কিছু কিছু বলা হইয়াছে—

২। উপযুক্ত সুতিকাগারের অভাব। প্রায়ই দেখা যায় যে বাটীর নিকৃষ্ট ঘরটী এই জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘরটীর বায়ু বদ্ধ অনাচ্ছাদিত এবং অপরিষ্কার থাকে। নন্দদুলাল, ভাবী বংশধর, জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা-স্থল সন্তানগণের শুভাগমনের জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থা!!! ফলে অনেক প্রসূতি ও প্রসূত ঠাণ্ডা লাগিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পিতা পুত্রের অন্নপ্রাসনের সময় অর্থাৎ ছয়মাস পরেই চারি পাঁচ শত টাকা অনায়াসেই খরচ করেন তিনিও কিন্তু আতুড় ঘরটী সন্তান প্রসবের উপযুক্ত করিবার জন্য কুড়িটী টাকা খরচ করিতেও কুণ্ঠিত। শীতকালেও গর্ভিণী কিম্বা সদ্যজাত সন্তানের জন্য উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি দিতেও আমরা নারাজ। আমাদের মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত যে ঠাণ্ডা লাগিয়া সন্তান বা মাতার অসুখ করিলে ডাক্তারকে আমরা শতেক টাকা দিতে পারি কিন্তু একটী ছয় সাত টাকা দামের লেপ তাহাদের দিতে আমরা প্রস্তুত নয়। ইংরাজিতে যাহাকে বলে Penny wise Pound foolish আমরাও কি তাই নই? পিতা হয়তো পৌষ মাসে রাত্রিতে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন কিন্তু তাহার একমাত্র আদরিনী কন্যার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে এক ছিন্ন কাঁথা ও এক ছিন্ন কম্বল। যাদের "ক্ষণেক না হেরিলে দেখি অন্ধকার" সেই পুত্র বা পৌত্রের গায়ে হয়তো একটীও

জামা নাই। মানুষের কুসংস্কার ভালবাসাকেও এরূপ, বিবেকহীন করিতে পারে, এ বড় আশ্চর্য্য! ছুৎমার্গীদের মতে কুড়ি দিন কিংবা একমাস পরে মাতা ও সন্তান অন্য ব্যবহৃত লেপ গায় দিলে ক্ষতি হয় না কিন্তু তাহাদের জানা উচিৎ যে প্রসবের পরেই মাতা ও সন্তানের পক্ষে উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও বিশ্রামের প্রয়োজন; আতুড় ঘরটী প্রশস্ত অন্ধকার বিহীন, নির্ম্মল পবন সঞ্চালনের উপযোগী, ধূমবিহীন হওয়া উচিৎ। অথচ সন্তান বা মাতার কোন প্রকারে ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয়ও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য—বিশেষতঃ শীত ও বর্ষা কালে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও খটখটে হওয়া উচিত। ঘরে কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় জিনিষ না থাকাই ভাল।

৩। কতকগুলি কুসংস্কার (ক) পেঁচো পাচি পাওয়া, গায়ে হাওয়া লাগা ইহা একপ্রকার রোগ—ভূত বা অপদেবতার খেলা নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সকল প্রকার রোগই কীটাণু বা জীবাণু সমুদ্ভূত এই পেঁচো পাঁচি বা ধনুষ্টঙ্কার রোগেরও কারণ একপ্রকার জীবাণু। গর্ভিণীর এইরূপ শতকরা নব্বইটী রোগ অপরিষ্কার ভোঁতা কাঁচি বা চেচাড়ী দিয়া নাড়ী কাটা হইতে দেখা দেয়। নাড়ী কাটার কাঁচিখানি ধারাল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিৎ।

ঐ কাঁচিখানি এবং সূতা যাহা দিয়া নাড়ি কাটার পর বাঁধা হয় প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলেই অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ধরিয়া গরম জলে ফুটাইয়া লওয়া উচিত।

কাটা নাড়িতে মাটী কিংবা অন্য কোন অপরিষ্কার দ্রব্য লাগান মোটেই উচিৎ নয়। এত আয়াস সাধ্য রোগে প্রতি বৎসরে যে কত শিশুর অকাল মৃত্যু হয় বলা যায় না।

অনেকে তর্কের ছলে বলেন যে পূর্ব্বেও ত চেচাড়িদিয়া নাড়ী কাটা হইত তাহারা বাঁচিত কেমন করিয়া। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আগেকার মত সুস্থ সবলকায় কয়টী গর্ভিণী আজ কাল এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়? তখনও দেশে ম্যালেরিয়া প্রভুর এত হাঁক ডাক ছিল না, এত অন্নাভাব ছিল না। বাঙ্গালী রমণীর জীবনি শক্তি যে

ক্রমশই অন্নাভাবে, রোগে, শোকে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কাজেই রোগের প্রাবল্য বর্দ্ধিত হইতেছে।

(খ) শিক্ষিতা ধাত্রীর নিয়োগ—সন্তান প্রসব করা আজকাল বাঙ্গালি রমণীদের পক্ষে একরূপ বিপদের কথা হইয়াছে। বাংলাদেশে পঁচিশ হাজার হইতে ত্রিশ হাজার গর্ভিণী প্রতি বৎসর সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। লজ্জার কথা এই যে এমন রোগে তাঁহারা মারা যান যে আমরা চেষ্টা করিলে অনেকটা কমাইতে পারি। এই হতভাগ্য রমণীদিগের মৃত্যুর প্রধান কারণ "আতুড় জ্বর"। অশিক্ষিতা ধাত্রীরাই এই মৃত্যুর কিঙ্করী স্বরূপা। তাহাদের হাত হইতে এই রোগের বীজ প্রসূতির শরীরে প্রবেশ করে। সুতরাং প্রত্যেক গৃহিণীর দেখা উচিত যে ধাত্রী প্রসব করানর পূর্ব্বে তাহার হাত-কারবলিক সাবান ও গরম জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া লয় কিনা। পাঁচ পয়সা খরচ করিলে আখেরে একটী প্রাণহানির সম্ভাবনা কমিয়া যায়। মাতার ও সন্তানের ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। ময়লা কাপড় চোপোড়ে এই রোগের বীজাণু থাকে। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

(বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

এলাহাবাদ।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

শ্রীচরণেষু,

গুপ্ত * আসিবার সময় একটা শ্লিপ ফেলিয়া আসিয়াছিল এবং পরদিবসে একখানি যোগেনের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ

* শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত বা স্বামী সদানন্দ। স্বামীজির প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য।

এলাহাবাদ যাত্রা করি। পরদিবস পৌছিয়া দেখিলাম, যোগেন + সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। পানিবসন্ত (দুই একটী ইচ্ছা ও ছিল) হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু অতি সাধু ব্যক্তি এবং তাঁহাদের একটী সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা অতি ভক্ত ও সাধুসেবাপরায়ণ। ইঁহাদের বড় জিদ—আমি এস্থানে মাঘমাস থাকি, আমি কিন্তু কাশী চলিলাম। গো—মা, যো—মা এখানে 'কল্পবাস' করিবেন, নিরঞ্জন ‡ ও বোধ হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে জানি না। আপনি কেমন আছেন ?

ঈশ্বরের নিকট সপরিবারে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুলসীরাম চুনীবাবু প্রভৃতিকে আমার নমস্কার দিবেন।

কিমধিকমিতি

দাস নরেন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

(বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

এলাহাবাদ।

৫ জানুয়ারি, ১৮৯০।

নমস্কার নিবেদনঞ্চ,

মহাশয়ের পত্রে আপনার পীড়ার সমাচার জ্ঞাত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বৈদ্যনাথ change (পরিবর্ত্তন) সম্বন্ধে আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার সার কথা এই যে, আপনার ন্যায় দুর্ব্বল অথচ অত্যন্ত নরম শরীর লোকের অর্থব্যয় অধিক না করিলে উক্তস্থানে চলা অসম্ভব। যদি পরিবর্ত্তনই আপনার বিধি হয় এবং যদি কেবল সস্তা খুঁজিতে এবং গয়ং গচ্ছ করিতে করিতে এতদিন বিলম্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। * *

বৈদ্যনাথ হাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, কিন্তু জল ভাল নহে, পেট

+ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ৺স্বামী যোগানন্দ।

‡ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ৺স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

বড় খারাপ, ব'রে—আমার প্রত্যহ অম্বল হইত। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে এক পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না bearing (বিনা মাশুলে প্রেরিত) দেখিয়া the devil takes it * করিয়াছেন? আমি বলি chage (পরিবর্ত্তন) করিতে হয় ত শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না। —আপনার একটী স্বভাব এই যে, ক্রমাগত 'বামুনের গরু" খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এজগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না— আত্মানং সততং রক্ষয়েৎ। Lord have mercy (ভগবৎকৃপায়ই সব হয়) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান তাহাকেই দয়া করেন)। আপনি খালি টাকা বাঁচাতে যদি চান, Lord (ভগবান্) কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (পরিবর্ত্তন) করাইবেন? যদি এতই Lordএর উপর নির্ভর করেন, ডাক্তার ডাকিবেন না। * * * যদি আপনার Suit না করে (আপনার সহ্য না হয়) কাশী যাইবেন—আমিও এতদিনে যাইতাম, এখানকার বাবুরা ছাড়িতে চাহে না, দেখি কি হয়।

* * * *

কিন্তু পুনর্ব্বার, বলি, chageএ (বায়ুপরিবর্ত্তনে) যদি যাওয়া হয়, কৃপণতার জন্য ইতস্ততঃ করিবেন না। তাহা হইলে তাহার নাম আত্ম-ঘাত। আত্মঘাতীর গতি ভগবান্ও করিতে পারেন না। তুলসী বাবু প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কারাদি দিবেন।

ইতি

নরেন্দ্রনাথ।

---

* 'যা শত্রু পরে পরে।' ভাবার্থ—গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছেন।

বিবেকানন্দ স্মরণে।

(গান)

(শ্রীঅলিন মুখোপাধ্যায়)

উষার ললাম ললাট ভেদিয়া, উদিল যে জ্যোতিঃ উজলি বঙ্গ,
হেরিয়া যাঁহার বিমল কিরণ, মাগিল অমর লভিতে সঙ্গ ;
অতীত পুণ্য ভারত গরিমা, জাগাল কত না আয়াস ভরে,
জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম্মের নীতি, প্রচারি মানবে কল্যাণ তরে।
বন্দিল যাঁরে প্রাচ্য-প্রতীচ্য, অভিনব কত প্রীতির ছন্দে,
ভারতীর প্রিয়, ভারত-ভাস্কর, আচার্য্য ঋষি বিবেকানন্দে।
উষার ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোরাস)

(২)

তরুণ-তাপস, সংযত-চেতা, ব্রহ্মচর্য্য মহিমা দীপ্ত,
ললাটে শোভিছে বিজয়-তিলক, সিদ্ধ-গুরু-কৃপা প্রদত্ত ;
নেহারি যাঁহার দুর্ব্বার তেজ, বিপুল উদ্যম, ইষ্ট-নিষ্ঠা,
বিশ্ব-জননী আপনি দিলেন খুলিয়া বিশ্ব-গ্রন্থ পৃষ্ঠা।
এ নব-যুগের নবীন-সাধক, স্বদেশ-সেবা যাঁহার মন্ত্র,
ভারত-আকাশে আলো করা, সেই, বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র।
উষার ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোরাস)

(৩)

বিশ্ব প্রেমে হইয়া মুগ্ধ, ভাসায়ে দিল বসুন্ধরা,
পাইল অগণ্য নর-নারী যাঁর করুণা-আশীষ অমিয়ভরা ;
বিশ্ব-কল্যাণ সাধনা হলেও, স্বদেশ সেবা যাঁহার ব্রত,
জীবনের শেষ নিশ্বাসটুকু ছিলেন দেশের কাজেতে রত।
সৌম্যমূর্ত্তী, দীপ্ত-আনন, সুনীল-শীতল-নীরদ সান্দ্র,
শক্তির সাধক, নিষ্কাম ত্যাগী, বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র ॥
উষার ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোরাস)

(৪)

ধর্ম্মে যাঁহার অটল আস্থা, ছিল না কখন সংসারাশক্তি,
বিষয় বাসনা ছিল না কখন, চাহেনি নির্ব্বান অথবা মুক্তি !
নবীন-ভারতে, নব-যুগ-ঋষি, নব-মন্ত্র জপি সাধিল শক্তি,
ভারতী আপনি দিয়াছেন যাঁরে, অটল বিশ্বাস-অচলা ভক্তি।
মঠ-মন্দির, জীব-সেবাশ্রম, যাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা-কেন্দ্র;
ভারতের ঋষি, বঙ্গনভোমণি—বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র।
উষার ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোরাস)

(৫)

ভারতের কর্ম্ম, কর্ম্মের তরে, প্রেমের প্রেরণা ভাবের চক্ষে,
জ্ঞান-ভক্তি লভে' কর্ম্মের ভিতর, ত্যাগ যাহার মহান লক্ষ্যে।
সাধিয়া জীবনে, প্রচারি আচারে, নাশি অবসাদ জড়তা ভ্রান্তি,
আচারি দেখান জীবন আদর্শ, ত্যাগই বিতরে বিমল ক্লান্তি।
ধরি কৌমার্য্য গৈরিকবাস—হৃদয়ে জাগ্রত ঐক্য মন্ত্র,
ভোগী যোগী ত্যাগী কর্ম্মের সাধক, বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র।
উষার ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোরাস)

(৬)

নয়নে ক্ষরিছে করুণাধারা, কণ্ঠে উঠিছে অভয় গীতি,
দ্বেষভেদ হীন, ব্রহ্মবাদী ঋষি, শ্বাস প্রশ্বাসে বহিছে প্রীতি ;
'উত্তিষ্ঠত' আহ্বানে করি প্রবুদ্ধ করিল সারাটা দেশ,
উদ্বোধিল আত্ম-শক্তি ধরিয়া মহান ত্যাগীর বেশ।
গাহিছে বিশ্ব, যাঁহার মহিমা, তৃপ্ত শুনিয়া শ্রবণরন্ধ্র,
ভারতীর প্রিয়, বঙ্গনভোমণি, বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র ॥
উষার ললাম ললাট ভেদিয়া, উদিল যে জ্যোতিঃ উজলি বঙ্গ,
যাঁহার বিমল কিরণ নিরখি মাগিল অমর লভিতে সঙ্গ ॥

বিবেকানন্দ স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে

রেঙ্গুনে পঠিত।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

১। আজ বিবেকানন্দ স্বামীর জন্মতিথি আমাদের অন্তরে জাগ্রত করিয়া দিতেছে—এক মহামানবের জন্ম ও সার্থক জীবনের পুণ্যস্মৃতি। স্বামীজীর স্থূল জড়মূর্ত্তি আমাদের চাক্ষুষ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বহুদিন অপসৃত হইলেও, তাঁহার ভাবমূর্ত্তি আমাদের মানস দৃষ্টির সম্মুখে সততই বিরাজমান রহিয়াছে। তাহারই নিকট আজ আমরা নূতন করিয়া ভক্তিবিমিশ্র শ্রদ্ধার সহিত মস্তক অবনত করিতেছি।

২। উনিশ বৎসর স্বামীজি দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কোটী কোটী নরনারীর অন্তরে আজ তাঁহার অমর আত্মার রশ্মিপাত দেখিতেছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমরা নূতন করিয়া তাঁহাকে বুঝিতেছি জানিতেছি, গ্রহণ করিতেছি। নূতন করিয়া তাঁকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছি। অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া না যাইয়া, তিনি আমাদের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করিয়া আমাদের সম্মুখে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পথপ্রদর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। কে এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী? কে এই অলোকসামান্য অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ-সিংহ? কে এই মহামানব যাঁহার নামের ডাকে আজ আমরা একত্রিত হইতে বাধ্য হইতেছি? তাঁহার জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ কি? তাঁহার প্রতি আকর্ষণের কারণ কি? কেনই বা আমরা আজ তাঁহার স্মৃতির পূজা করিতেছি? কেনই বা তাঁহার স্মৃতি ধারণ করিয়া আছি?

৩। স্বামীজির জীবন কথা বহু প্রবন্ধে-নিবন্ধে বহু গুরুগম্ভীর গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বজনবিদিত সাধারণে সুপরিচিত সেই অফুরন্ত কথার আজ পুনরাবৃত্তির আবশ্যক নাই। বৈচিত্র্যবহুল ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে কেমন করিয়া এই বিরাট জীবনের অভিব্যক্তি

হইয়াছে, তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও আজ কোন আবশ্যকতা দেখি না। আমাদের স্মৃতিকে জীবন্ত করিয়া ধরিয়া, বুদ্ধি ও কল্পনার সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, আজ শুধু ইহাই বলিতে চাই যে বিবেকানন্দ স্বামী ভারতবর্ষের আর ভারতবর্ষ বিবেকানন্দ স্বামীর। সম্প্রদায় প্লাবিত ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের মূক হৃদয়ের ভাষা, মৌন জ্ঞানের বাণী, অতীত সাধনার যথার্থ প্রতিনিধি, ভবিষ্যতের সিদ্ধির অগ্রদূত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহির্জগতের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে, দৈন্য ও দারিদ্র্যের প্রপীড়নে, বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবল আক্রমণে, ভারতের অন্তরআত্মা শৃঙ্খলিত হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছিল। বিবেকানন্দ তাহারই পুনরুত্থান ব্রতের পুরোহিত—অবাধ মুক্তির বীর সেনানী।

৪। স্বামীজি ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া দেখেন নাই। কোন সঙ্কীর্ণ মত বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, ভারতবর্ষকে কাটিয়া ছাটিয়া পঙ্গু করিয়া লন নাই। বৈদিক ভারত, পৌরাণিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত, তান্ত্রিক ভারত—ভারতের অবতার বাদ, গুরুপূজা দেবদেবী পূজা শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি, সকলই তিনি পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়া ছিলেন সকলেরই যথার্থ সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে দেশে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং", সে দেশ স্বাধীন চিন্তার দেশ। সে দেশে একটা বিশিষ্ট মতবাদ বা কোন সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ঠ সকলের উপর চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। সে দেশে প্রত্যেক মতবাদের, প্রত্যেক সাধন পদ্ধতির তুল্যরূপ সার্থকতা রহিয়াছে। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন মানব হৃদয়ের অনন্ত রকমের অভাব আছে। অনন্ত ঘটে অনন্ত কেন্দ্র অনন্ত রকমের দৃষ্টি রহিয়াছে। আর তাহা পূর্ণ করিবার তাহা তৃপ্ত করিবারও অনন্ত রকমের পথ অনন্ত রকম সাধন পদ্ধতি থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষে এইরূপ বহু পথ বহু রকমের সাধন পদ্ধতি আবিষ্কৃত, স্বীকৃত ও সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। আর এই সকল বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ, জাতীয় জীবনের ঐশ্বর্য্যেরই পরিচায়ক। জাতীয়

ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত মণিমাণিক্যের মত শোভা সৌন্দর্য্যও আবশ্যক হইলে ব্যবহারের বস্তু।

৫। সংস্কৃত ভারতের এই উদার শিক্ষার আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়া স্বামীজি ভারতীয় জীবন প্রণালীর মধ্যে এক অসীম সমন্বয়ের আদর্শ পাইয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা মতের গণ্ডি ও প্রাদেশিকতা ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মানস দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল এক অখণ্ড ভারত—সম্প্রদায়পূর্ণ ভারতের এক অসাম্প্রদায়িক রূপ—বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের এক মহান ঐক্যের ছবি, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে পরিব্যপ্ত ভারবর্ষের একটা অনবচ্ছিন্ন জীবন ধারা। তিনি আসিয়াছিলেন এই জীবনধারার অর্থ ও উদ্দেশ্য দেখাইয়া দিতে বর্ত্তমান জগতে তাহার আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে বলিয়া, তিনি নিজকে প্রচার করিতে কিংবা নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা বুদ্ধি-কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সঙ্কীর্ণ মতবাদ প্রচার করিতে আসেন নাই। বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে আমরা বিবেকানন্দকে দেখিতে পাই না। সেখানে স্পষ্ট দেখিতে পাই ভারতবর্ষের একখানি সুবৃহৎ ভাষ্য ভারতের সাধনা ও সিদ্ধির একখানি বিশাল বিশ্বকোষ।

৬। এই বিশ্বকোষের মধ্যে দেখিতে পাই আমাদেরই জীবনের অর্থ আমাদেরই অন্তরাত্মার বাণী। আমাদেরই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অস্ফুট ধ্বনির পরিস্ফুট প্রতিধ্বনি। আমাদেরই হৃদয়কন্দরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত তাহারই রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কার। আজ দেখি স্বামীজির জীবন আমাদেরই অব্যক্ত জীবনের ব্যক্ত রূপ। আমাদেরই প্রচ্ছন্ন ভাবরাশি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদেরই সম্মুখে উপস্থিত। তাই স্বামিজীর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্বামীজি আমাদের এত আপনার জন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তাই পরস্পরের মধ্যে এরূপ প্রবল আকর্ষণ। স্বামীজির স্মৃতি পূজা করিয়া আজ আমাদেরই অন্তরাত্মার পূজা করিতেছি।

৭। যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহাপুরুষদিগের জীবনের ভিতর দিয়া যে আদর্শের

বিকাশ করিয়া দিতেছেন, স্বামীজি সেই ভারতের দেব আদর্শেরই পুরোহিত। তিনটী বিরাট জীবনের ভাব সংমিশ্রণে তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন ভগবান বুদ্ধ তাঁহার বিশাল হৃদয় ও কর্ম্মপ্রেরণা লইয়া। অপরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন বেদমূর্ত্তি ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তের ভৈরবগর্জ্জন লইয়া। এই উভয় প্রান্ত বিধৃত হইয়াছে, বর্ত্তমানযুগের আচার্য্য দেব-মানব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেবজীবনের মধ্যে। স্বামীজি আমাদের সম্মুখে যে জীবনাদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার সম্যক পরিচয় লইবার দিন এখনও বহুদূরে অবস্থিত। মনে হয় বর্ত্তমান জগতের দুঃস্বপ্নময় জীবন যখন অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে, বর্ত্তমানের ভীষণ জীবনসংগ্রাম যখন ইতিহাসের ক্রোড়ে চিরতরে নিদ্রিত হইয়া পড়িবে, ভবিষ্যতের মানব তখন কল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাইবে সেই গভীর অন্ধকার আলোকিত করিয়া দুইটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শূন্য আকাশে ভাসিতেছে।

৮। বিবেকানন্দ কত বড়, তাঁর সাধনা কত গভীর, তাঁর দৃষ্টি কত উদার, তাঁর বিশ্বতোমুখী প্রতিভা কত উজ্জ্বল, আজ তাহার পরিমাণ লইব না। আমাদের ক্ষুদ্র ঘট দ্বারা ভারত মহাসাগরে কত জল আছে তাহা পরিমাণ করিবার বৃথা প্রয়াস করিব না। তাঁহার জীবনের সার্ব্বভৌমিকদিকের স্তুতিও আজ বিশেষ করিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব না। শিক্ষা ও রুচি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নরনারী ভিন্ন ভিন্ন মত গঠন করিয়া লইবেন। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমাদের যতটুকু আবশ্যক, জাতীয় জীবনে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত প্রয়োজন, শুধু সেইটুকুই আজ বিশেষ করিয়া দেখিব ও সামর্থানুসারে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব। কারণ, বিচার বিতর্কের দিন, শুধু আলোচনা ও সমালোচনার দিন, বহুকাল গত হইয়া গিয়াছে। এখন আর বিকল্প ও অনুকল্পের অবসর নাই। আজিকার কথা—স্বামীজির আদর্শ ও উপদেশ স্বীকার করা, গ্রহণ করা, কর্ম্মজগতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হওয়া।

৯। বুদ্ধদেব একদিন বহুজন সুখায়, বহুজন-হিতায়, ধর্ম্মচক্র

প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষে যুগান্তর আনিয়া ছিলেন।' শঙ্করাচার্য্য একদিন বেদান্তের ভৈরব গর্জ্জনে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিকাশে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমানযুগে স্বামীজি নূতন কর্ম্মযোগের প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতে নবজীবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। আমাদের উৎসাহ ও কর্ম্মচঞ্চল নবজীবনের পুরোহিত এই বীর সন্ন্যাসী সংসারকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই। মুক্তির ঝুলি লইয়া দূরে পলায়ন করেন নাই। তিনি সন্ন্যাসীকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন সংসারের মধ্যে। জ্ঞানকে লইয়া আসিয়াছেন কর্ম্মের মধ্যে, প্রেমকে লইয়া আসিয়াছেন সংসারের শোক তাপ ও দুঃখের মধ্যে। বোধিসত্ত্বের মত মুক্তি কামনাকে তুচ্ছ করিয়া সংসারের রোগশোক, দুঃখদৈন্যের বিপদ আপদের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, করুণ কাতরকণ্ঠে এই প্রেমিক সন্ন্যাসীই বলিয়াছিলেন—যতদিন সকলের মুক্তি না হয় ততদিন আমি মুক্তি চাই না। লোক-সেবার জন্য আমায় সহস্রবারও জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহা আমি করিব। এইখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে বর্ত্তমান ভারতের সেবাধর্ম্ম—ভবিষ্যৎ ভারতের সিদ্ধির প্রথম সোপান। এইখানেই আমরা পরিচয় পাই কি করিয়া এই যুগধর্ম্মের পুরোহিত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া রান্নাঘরের রসায়ণপর্য্যন্ত মানবীয় সকল কর্ম্মের সঙ্গে সহানুভূতি স্থাপন করিয়া নিজকে অখণ্ড ভাবে ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। এই সেবাধর্ম্মেই তিনি জাতীয় জীবনের মুক্তিপথ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

১০। স্বামীজি স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন একটা তামসিক ভাবের কুজ্ঝটীকা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তিকে অসার করিয়া রাখিয়াছে। রজোগুণের প্রবলাঘাৎ ভিন্ন কর্ম্মের কঠোর ব্রত ভিন্ন, আমাদের মুক্তির পথ নাই। তিনি অভ্রান্ত ভাষায় বলিয়াছেন—"দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, লাখো লাখো লোক ওঁকার-জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' কচ্ছে, এবং পাচ্ছে ঘোঁড়ার ডিম্। তার মানে বুঝ্‌তে হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? সুখ দুঃখের পরে ক্রিয়াহীন

শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায়, শক্তির অভাবে ক্রীয়াহীন, মহা তামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে মচ্ছি—একথার জবাব দাও, নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। সত্ত্ব প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়—শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়। সে শান্তি মহাবীর্য্যের পিতা। সে মহাপুরুষের ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ সর্ব্বলোক পূজ্য"।

১১। "আর ঐযে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে ঢোক গিলে গিলে কথা কয় সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি, দেশশুদ্ধ পড়ে কতই হরি বল্‌ছি, ভগবান্‌কে ডাক্‌ছি। ভগবান্ শুন্‌ছেন্‌ই না আজ হাজার বৎসর। শুন্‌বেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না। তা ভগবান্!" তবে উপায় কি? জাতীয় জীবনে সার্থকতা লাভের পথ কি? ঐ তমোগুণের ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার পথ কোথায়? স্বামীজি উত্তর দিতেছেন—"এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্‌বাক্য শোনা—ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ" "তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব"—মহা উৎসাহে অর্থ উপার্জ্জন কর, স্ত্রীপরিবার দশ জনকে প্রতিপালন কর, দশটা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও আবার মোক্ষ!"

১২। জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল অবস্থায়, জীবন সংগ্রামে সচেষ্ট সাধনার প্রারম্ভে স্বামীজির উপদেশের সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি। চতুর্দ্দিকেই জাতি চৈতন্যের জাগরণের প্রাথমিক কোলাহল শোনা যাইতেছে। এই সময় স্বামীজির উপদেশগুলি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়া ছিলেন ভারতশক্তির বিকাশ হইবে সমাজের নিম্নস্তরের ভিতর দিয়া। ভারতের স্বজাতি নিন্দিত বিজাতি বিজিত ছোট জাতের মধ্যে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারীতা সকলের আজ শুভ নিঃস্বার্থতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া তিনি যথার্থই শ্রদ্ধাবিনম্র হৃদয়ে বলিয়াছেন—"হে ভারতের চিরপদদলিত

শ্রমজীবী! তোমাদের প্রণাম করি।" উচ্চস্তরের মধ্যে প্রাণহীন অসারতা দেখিয়া বলিয়াছেন "স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, ভবিষ্যতে তোমরা শূন্য। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনিওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারে। আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত মুখটী চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার পূর্ব্বপুরুষের রত্নপেটীকা তোমার মাণিকের আংটী, ফেলে দাও এদের মধ্যে। আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কানখাড়া রেখো। তোমার যেই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধনধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে।"

১৩। আজ মনে হচ্ছে, স্বামীজির যত আশা ভরসা উৎসাহ, যত কর্ম্মযোগ, সেবাধর্ম্ম, দরিদ্রনারায়ণ পূজা তাহা ভারতের এই দীনদরিদ্র মূক লোক সমূহের জন্য। তাহাদেরই জন্য তাঁর কর্ম্ম গ্রহণ—দেশবিদেশে পরিভ্রমণ, মঠ গঠন, সংঘ স্থাপন ইত্যাদি। ইহাই তাঁহার প্রাণের কথা তাঁহার সকল কথার উপর, সকল বিদ্যা, সকল সিদ্ধির উপর। তাঁহার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ভাষার শ্রেষ্ঠ বাণী ইহাদেরই জন্য ঢালিয়া দিয়াছেন। আজ তাঁহার বিশ্বব্যাপী গৌরবচ্ছটা দেখিয়া ভাবের উচ্ছাসে যেন আমরা এই আসল কথাটী ভুলিয়া না যাই। আজ এই স্মৃতির উৎসব যদি আমাদের প্রাণে ভারতের দুঃখদৈন্য পীড়িত সাধারণ প্রজার প্রাণের ব্যথা না জাগাইয়া তোলে, অন্তঃসারশূন্যশিক্ষা ও সভ্যতার বৃথা অভিমানের

আস্ফালনকে দলিত করিয়া সাধারণ প্রজার সঙ্গে আমাদের ঐক্যবোধ না জন্মাইয়া দেয়, তবে বৃথাই এই উৎসবের আয়োজন ব্যর্থ এই স্মৃতির আবাহন। যদি স্বামীজির নামে কিছু করিতে হয় তবে আজ ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে হইবে যে ভারতবর্ষের সাধারণ জনসংঘের সেবাই করণীয়।

১৪। স্বামীজির বীর হৃদয়ে কোনরূপ দুর্ব্বলতার স্থান ছিল না। তাঁহার সম্মুখে বাঁধাবিঘ্ন পর্ব্বত প্রমাণ হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৃপ্ত পুরুষকার ও সবল বাহু হেলায় তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়াছিল। কোনরূপ সুখস্বপ্নের কল্পনায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন সংসারে দুঃখ রহিয়াছে। সেই দুঃখের সঙ্গে সংগ্রামই তাঁর সাধনা, জয়ে তাঁর সিদ্ধি। "রোগ শোক দারিদ্র্যযাতনা, সবভাবে তাঁরিই উপাসনা" "দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে, পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা"—ইহা তাঁহারই জীবন সংগ্রামের বীরবাণী। এই দুঃখকে বরণ করিয়াই আমাদিগকেও আজ তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই দুঃখকে বরণ করার উপরই আজ জাতীয় জীবনের গর্ব্ব নির্ভর করিতেছে। এই পবিত্র বিবেকের পুণ্যস্মৃতি সেই দুঃখকে ধারণ করিবার উপযুক্ত পুরুষকার ও পৌরষ গর্ব্ব, আমাদের অন্তরে জাগ্রত করিয়া দিতেছে।

১৫। আজ দুর্ব্বল ভক্তির বিফল অশ্রুপাত দ্বারা এই বীর-জীবনের স্মৃতির তর্পন চলিবে না। ধর্ম্মভাবের নামে আমাদের আত্মার দীনতা ও হীনতাকে প্রশ্রয় দিয়া আত্মপ্রতারণা করিলে চলিবে না। আজ আমরা চাই শরীরে দৈত্যের মত শক্তি, মনে অদম্য তেজ, হৃদয়ে অসীম প্রেম আর কর্ম্মে অক্লান্ত নৈপুণ্য। তবে আমরা এই বীর পূজার যোগ্য অধিকারী হইবে। এই মহামানব জীবনপাত করিয়া যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের, ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে কর্ম্মজীবনের দুঃখদৈন্যের সঙ্গে বীরত্বের বন্ধন দিয়াছেন—সেই সেতুবন্ধের উপর দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, শ্রীরামচন্দ্রের কপি

সৈন্যের মত, আমাদের আদর্শ ও জননী দত্ত জন্ম সত্যকে উদ্ধার করিতে। আজ দুর্ব্বল দেহ মন লইয়া পশ্চাতে পড়িয়া বৃথা ক্রন্দনে দিনপাত করিলে চলিবে না।

১৬। আজ তবে এই দেব আদর্শেরই পরিকল্পনায় স্বামীজির মহিমামণ্ডিত জীবনের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া আমাদের সকল পরানুবাদ পরাণুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, আমাদের দাসসুলভদুর্ব্বলতা ঘৃনিতজঘন্য নিষ্ঠুরতা বিস্মৃতির অতল জলে চিরতরে ডুবাইয়া দেই। আর এই মুহূর্ত্তেই মুক্ত হইয়া স্বামীজির বীর কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া জ্ঞানের ভাষায় বলি, "জীবমাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম" কর্ম্মের ভাষায় বলি, "আমার বিশ্বাস, আত্মার আদর্শ কর্ম্মে পরিণত করতে আমি জীবন ক্ষয় করব"; সেবার ভাষায় বলি "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" আর সর্ব্বোপরি দেশপ্রেমিকের ভাষায় বলি—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলি—ভারতবাসী আমার ভাই—ভারতবাসী আমার প্রাণ। ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা—আমার যৌবনের উপবন—আমার বার্দ্ধক্যের বারানসী। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

অশ্রুর আক্ষেপ।

(বিমলানন্দ)

বিশ্বের সকল দৃশ্য আয়ত্ব করিতে তুমি চাও।
বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখে পলকেতে পুলক লুকাও॥
তোমার আয়ত্ব থেকে সারা বিশ্ব লুকাতে না পারে।
কিন্তু আঁখি! পাশে আমি কখন কি দেখেছ আমারে?

মনুষ্যত্বের সাধনা।

কর্ম্মপথের পাথেয়।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

(৩)

অর্জ্জুনের ন্যায় মানবমাত্রেরই জীবনে রোগে, শোকে, বিপদে, বহুবার বিষাদ যোগের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। হয়তো বহুবার তাহা বিফলে চলিয়া যায়। কিন্তু সেই প্রতিবারের আঘাতই বন্ধন-প্রাচীর কিছু না কিছু ভগ্ন করিয়া যায়। সহসা কোন এক সময়ে সামান্য কারণে অথবা অকারণেই চকিতের মত মনে হয় "কেন এ জীবন? কি লইয়া আছি?" সুখ স্বপ্নের মধ্যে মুহূর্ত্তের জাগরণ প্রশ্ন আনে, "এ সকল কি কেবল প্রকৃতির ছলনা?" সেই মুহূর্ত্তের জাগরণেই বিদ্রোহী 'হৃদয়' পুষ্পমাল্যের অন্তরালে কঠিন লৌহ শৃঙ্খলের বন্ধন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। বুঝিতে পারে, সে প্রভু নয়, প্রবৃত্তিই তাহার প্রভু হইয়া তাহাকে শাসন করিতেছে, সে প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে পারিতেছে না। বুঝিতে পারে,—জগৎ কপটতাময়, জীবন দুঃসহ দুঃখপূর্ণ ভোগসুখের লালসা কেবল মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। জীবনধারণের দারুণ যন্ত্রণা, আপনার ও অপরের দুঃখ কষ্ট, বারবার তাহাকে আঘাত করিতে থাকে! তখন সে কতকটা বুঝিতে পারে যে ভাবে সে জীবনযাপন করিয়া আসিতেছে, তাহাই তাহার পক্ষে উন্নত জীবন নহে, দেশ প্রচলিত প্রথাই আদর্শ প্রথা নহে। বেদনার আঘাত সাবধান হইবারই সঙ্কেত জানাইতেছে, "এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়, ভুল পথে চলিয়াছ।"

গীতায় বিষাদ যোগের পর সাংখ্য যোগে পথ নির্দেশ আছে।

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

কর্ম্মের পথে চলিবার পাথেয়ের কিছু প্রয়োজন। সে দুঃখের সম্বলই হোক্ বা আনন্দের সম্বলই হোক্। কোন এক গভীরভাবের সহিত

অন্তরতম গভীর যোগের প্রয়োজন। সেই ভাবটীই যেন জীবনের কেন্দ্র হয়। অনন্ত যাত্রার পথে সেই ভাবটীই যেন পাথেয় হয়। "যোগঃ কর্ম্ম-সুকৌশলম্॥" এই যোগই কর্ম্মের সুকৌশল। কিন্তু কর্ম্মের পথে এই যোগরূপ সুকৌশল গ্রহণ করিতে হইলে কিছু ত্যাগও করিয়া আসিতে হইবে গীতা সেই ত্যাজ্য বিষয়টীকে "সঙ্গ" বলিয়াছেন, "সঙ্গ" শব্দের ভাবার্থে, আমরা স্বার্থ ফলকামনা বা আসক্তি যেকোন অর্থই গ্রহণ করিতে পারি, এবং সকল অর্থগুলির ভাব একই দাঁড়ায়।

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

—যোগস্থ হইতে হইলে "সঙ্গ" ত্যাগ করিতে হইবে, অথবা—যোগস্থ হইলে সঙ্গ আপনা হইতেই ত্যক্ত হইবে।—যে অর্থই হোক্ না কেন ভাবার্থে দুইই এক।

যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্।

জগতে যত কিছু দুঃসাধ্য সাধিত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার কতক পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক পরিচয় হয়তো আমরা জানি না দুর্লঙ্ঘ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাধা লঙ্ঘন করিয়া ভীরু এক দিনেই বীর হইয়া গেল, মদ্যপায়ীলম্পট এক দিনেই সাধু হইয়া গেল, ঘোর বিষয়াসক্ত একদিনেই সর্ব্বত্যাগী হইল এ দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নহে। বিলাসী কাউণ্ট টলষ্টয়,—যাঁহার জুতা পরাইয়া দিবার জন্য দশজন ভৃত্য থাকিত এক দিনেই তিনি মাঠে গিয়া নিজ হাতে লাঙ্গল ধরিলেন, বহুপুরুষ হইতে শোণিত ধারায় প্রবাহিত আভিজাত্যের অভিমান রূপ "সঙ্গ" এক মুহূর্ত্তেই চূর্ণ হইয়া গেল। রাজা লালাবাবু একদিনেই কৌপীনধারী সন্ন্যাসী হইয়া রাজার সম্পদ, চরম বিলাসিতা হইতে চরম দারিদ্র্য দুঃখকে বরণ করিয়া লইলেন। জন্মগত অভ্যাসের বন্ধন ত্যাগ করিবার জন্য দুটিদিনও তাঁহার সময়ের প্রয়োজন হইল না। ভবানীপুরে নফরচন্দ্র, আফিস ফেরত বাড়ী আসিতেছেন, পথে লোকের ভিড় দেখিয়া থামিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, কুলী ড্রেণে নামিয়া বিষাক্ত বাষ্পে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে উঠাইবার উপায় হইতেছে না, শুনিবামাত্র আফিসের পোষাক খুলিয়া "জয় গুরু" বলিয়া ড্রেণে নামিলেন, আর

উঠিলেন না। নফরচন্দ্রের এইরূপ ভাবে প্রাণদান লইয়া অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে। বুদ্ধিমান বলিবেন "এটী নির্ব্বোধের কায হইয়াছে। না ভাবিয়া চিন্তিয়া সহসা এরূপ অসম সাহসিকতা কেবল হঠকারিতা মাত্র। কুলী দূষিত বাষ্পে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে—ড্রেণে নামিবামাত্র সেই দশা হইতে পারে সে কথা ভাবিয়া দেখা কি উচিত ছিল না? বরং কিরূপে অন্য উপায়ে তাহাকে তোলা যায় তাহার একটা উপায় স্থির করিতেও তো পারিতে! আর তুমি নিজে দরিদ্র, তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে, সে সম্বন্ধে কি তোমার কোন দায়িত্ব নাই? তুমি যে না ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রাণটা দিয়া ফেলিলে তাহাতে কি তোমার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিল না?" বুদ্ধির এই সমস্ত যুক্তি শুনিতে খুব সুন্দর, কিন্তু ইহার উৎপত্তি চিত্ত দুর্ব্বলতা হইতে। ভয় নিমেষের মধ্যে দীর্ঘ যুক্তিজাল এমন ভাবে রচনা করিয়া তুলে, উপর হইতে যাহার কোন ছিদ্র দেখিতেই পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ এই অসাধ্য সাধন তাঁহাতেই সম্ভব যিনি কর্ম্মের সেই কৌশলটী অন্তরের গভীরতর সম্পদরূপে লাভ করিয়াছেন। লঘুভারের ন্যায়, দুর্ব্বহ দুঃখ দারিদ্র্যে ও বিপদের ভার বহন করা তাঁহারই সম্ভব, যিনি কর্ম্মের পথে যাত্রার প্রারম্ভে "সঙ্গের" বোঝাটী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সেই জন্য অন্যের পক্ষে যাহা কঠিন তাঁহার পক্ষে তাহা সহজ অন্যের পক্ষে অসম্ভবও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়।

এই যোগের কথাই—গীতায় বারবার আছে। "যোগ" ব্যাপারটী কি—নানা স্থানে নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে ফলকামী কৃপণ যোগী হইতে পারে না, মুক্ত হইতে হইলে "সঙ্গ" ত্যাগ করিতেই হবে।　　(ক্রমশঃ)

বদরীপথে শঙ্কর।

(শ্রীমতি—)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, চন্দ্রমা সহসা যেন শৈলশিখর বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং শঙ্করের প্রসন্ন বদনমণ্ডল দর্শনে কৈলাসনাথ প্রেমে আনন্দে অধীর হইলেন। ক্রমে তিনি সান্ধ্যসমীরণ সংক্ষুভিত গঙ্গাতরঙ্গ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কোটী রূপ ধারণ করিলেন এবং অনিমেষ নেত্রে শঙ্করের অঙ্গকান্তি দর্শনে রত হইলেন। হরিদ্বারবাসী সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণ সশিষ্য শঙ্করের চারিদিকে আসিয়া বসিল। সকলেই শঙ্করের শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া শান্তিলাভ করিল। জিজ্ঞাসু প্রশ্ন ভুলিয়া গেল প্রার্থিগণ সিদ্ধমনোরথ হইল।

এই ভাবে কতক্ষণ অতীত হইলে একজন তীর্থবাসী ত্যাগী ব্যক্তি শঙ্করকে বিনীতভাবে বলিলেন "মহাত্মন্! আমি বড় দুঃখী দারিদ্র্যবশতঃ সংসারধর্ম্ম কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারি নাই। পরিশেষে রোগশোক দুঃখকষ্টে অভিভূত হইয়া ভগবান দক্ষেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু হে ভগবন হৃদয়ে শান্তি পাইতেছি না।" শঙ্কর এই ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া তাহার অবস্থা অবগত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন "ব্রাহ্মণ! আপনার জন্য আমি একটী স্তব রচনা করিয়া দিতেছি, আপনি উহা পূজান্তে নিত্য পাঠ করিবেন। ভগবৎ কৃপায় হৃদয়ে শান্তি পাইবেন এবং দারিদ্র্য দূর হইবে।" এই বলিয়া শঙ্কর ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিম্নলিখিত স্তবটী লিখাইয়া দিলেন।

"হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতি ভয় সূদন মামনাথং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ১
হে পার্ব্বতী হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশ জাপ।
হে বামদেব ভবরুদ্র পিনাকপাণে, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ২

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র, লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৩
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপোহর লোকনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৪
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ, বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৫
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো, হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ॥
ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকপালমাল, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৬
কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণ প্রিয় মদাপহশক্তিনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৭
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৮
গৌরী বিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়, পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায়।
শর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।

ব্রাহ্মণ স্তবটী পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। এবং শঙ্করকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই ভাবে সাধু প্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্কর হরিদ্বারে কয়েকদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিত্যই দলে দলে লোক শঙ্করের উপদেশ শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। সকলেই শঙ্করের অমিয় ব্যবহারে ও অমূল্য উপদেশে পরম পরিতুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিত। শঙ্কর গৃহস্থগণকে পঞ্চমহা-যজ্ঞানুষ্ঠান, ও পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতে বলিতেন। ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিলে তাহাকে 'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা' জীব ব্রহ্ম ভিন্ন কেহ নহে এইরূপ উপদেশ দিতেন। শঙ্কর হৃদয়ে জয়ের বা বিবাদের বাসনা এখনও জন্মে নাই, সুতরাং যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিবাদ করিবার জন্য আসিতেন, তাঁহারা শঙ্করের সরল ও নিরভিমান ভাব দেখিয়া সে বাসনা পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে শঙ্করের আগমনে হরিদ্বারে বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে যেন একটা জাবন্ত ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কর্ম্মবাদী কুমারিলভট্ট ও প্রভাকর, নৈয়ায়িক উদ্যোতকর প্রভৃতি বৈদিক আচার্য্যগণ ইতিপূর্ব্বে

বৌদ্ধাদি বেদ বিরোধী ধর্ম্মমতের দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন। এক্ষণে শঙ্কর আগমনে তাঁহারা আরও যেন ম্লান হইয়া পড়িলেন। কুমারিল প্রভৃতি তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন, শঙ্কর কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মমতের মাধুর্য্য প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে নিস্প্রভ করিয়া ফেলিলেন।

একদিন একটী তীর্থবাসী বৃদ্ধব্রাহ্মণ শঙ্কর সমীপে আসিয়া বলিলেন "মহাত্মন্! আপনি ত দেখিতেছি অনেক লোককেই স্তব, স্তুতি, পূজা, যাগযজ্ঞ, করিবার উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু আপনারা ত কই কোনরূপ পূজাদি করেন না? আপনার উপদেশ আমি আজ কয়দিনই শুনিতেছি, এবং আপনার ক্রিয়াকলাপ দেখিতেছি, কিন্তু আপনার আচরণের সহিত আপনার উপদেশের এই অনৈক্য কেন? আপনি প্রসন্ন মনে আমার এই সংশয় দূর করুন। আমি জিজ্ঞাসু।

শঙ্কর বৃদ্ধের সরলতাপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া মনে মনে বড় আনন্দিত হইলেন এবং নানা তত্ত্ব কথার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কবিতাবলী তখনই মনে মনে রচনা করিয়া সহাস্যে তাঁহাকে বলিলেন, "হে বিপ্রবর! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি।

অানন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈক রূপিনী,
স্থিতে দ্বিতীয়া ভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে॥১
পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বধারস্য চাসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥২
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং রম্যস্যাভরণং কুতঃ॥৩
নির্লেপস্য কুতো গন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতো ধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা॥৪
নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ।
তাম্বুলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা॥৫
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনা বিধিঃ।
প্রদক্ষিণমনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ॥৬

অন্তর্ব্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথং মুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইদমেব পরাপূজা বিষ্ণোঃ সত্ত্ব স্বরূপিনী ॥৭
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবোদেব সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ ॥৮
তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥৯
যোগীদেহাভিমানী স্যাদ ভোগী কর্ম্মনি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষীচ তজ্জ্ঞে নাভিমানিতা ॥১০
কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পুরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥১১

ব্রাহ্মণ আচার্য্যের কবিতাগুলি শুনিয়া যুগপৎ শ্রদ্ধাভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সনন্দন প্রভৃতি শিষ্যগণ তখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণ তখন বুঝিলেন জ্ঞানীর শেষ অবস্থা কিরূপ আনন্দময় হয়। তিনি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া শঙ্কর চরণে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। কয়েকদিন বিশেষ চিন্তার পর ব্রাহ্মণ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিলেন।

হরিদ্বার সাধুগণের তপস্যাস্থান, এবং কেদারবদরী প্রভৃতি পার্ব্বত্য-তীর্থরাজের দ্বার স্বরূপ বলিয়া এস্থানে যেমন সাধু ও তীর্থ যাত্রীর সমাগম হয়, তদ্রূপ সাধুসেবা জন্য পুণ্যার্জ্জনাভিলাষী ধনবানগণের সমাগম হয়। গৃহস্থ ধনবান্ হইতে রাজন্য বর্গ পর্য্যন্ত সকলেই এস্থলে সর্ব্বরকমে সাধুসেবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। কেদার বদরী যাত্রীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অনেকেই শীতবস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার বিতরণে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই সন্ন্যাসীর দল বদরিকাশ্রমে যাইবেন যেমন প্রচার হইল অমনি কোথা হইতে ভূরি ভূরি শীতবস্ত্র, রজ্জু নির্ম্মিত পাদুকা, পার্ব্বত্য যষ্টি, প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং শঙ্করের শিষ্যদিগের জন্যও আর চিন্তার বিষয় কিছুই রহিল না। এদিকে যে সকল কেদার বদরী যাত্রী অনুকূল সঙ্গলাভের আশায় এখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা এই সন্ন্যাসীর দলকে পাইয়া ইঁহাদের

সঙ্গী হইবার বাসনা প্রকাশ করিল। যে সকল পাণ্ডা যাত্রীদিগকে লইয়া যায় তাহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সুতরাং বদরীর পথে এই সন্ন্যাসীর দলকে লোকবলের বা পথপ্রদর্শকের অভাব কিছুই অনুভব করিতে হইল না। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারেন তাঁহাদের সবই এইরূপ অনুকূল হয়। অতঃপর শুভদিনে আঁচার্য্য একটী বিপুল তীর্থ যাত্রিবাহিনীর অগ্রণীহইয়া বদরীকাশ্রমের উদ্দেশে প্রাতে হরিদ্বার ত্যাগ করিলেন।

সেবা।

(বিশোক)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেশের এই অবস্থায় যাঁরা অপরের রোগশয্যায় দুটো মিষ্টি কথাও বলেন তাঁদেরকে ভাল লোক ব'লতে হবে; আর যাঁরা পীড়িতকে আরাম কর্ব্বার জন্য অর্থ ও সামর্থ দেন তাঁরা ত' মহৎ লোকই। তাই ব'লছিলাম যে, দয়া প্রাথমিক হ'লেও ওর দরকার আছে।

এখন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উপাসনার ভাব নিয়ে রোগীদের সেবা করা। উপাসনা বল্'তে আমরা বুঝি, পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান, ভজন, সংকীর্ত্তন ইত্যাদি। 'রোগীদের সেবা কর্ত্তে হবে উপাসনার ভাব নিয়ে, এ যে বড় মুস্কিলের কথা হ'ল। আর একেত' রোগী নিয়ে থাকাই অসম্ভব, তাদের ঘৃণা না করে দয়া করে দুচার পয়সা দিলাম বড় জোর দু একবার দেখাশুনা কল্লাম, ব্যাস্। এর উপরে আবার উপাসনা কুপাসনা—যা আমাদের বাপ দাদারা কেউ শোনেনি পর্য্যন্ত তাই আমরা কর্ব্ব? এ যে নেহাত অসম্ভব ও পাগলামীর কথা।' এই হল সাধারণ লোকের মত। অসম্ভব কিছু নয়, তোমার বুদ্ধিকেই পর্য্যাপ্ত মনে করে তার বাহবা ভুকি

নিজে দিতে পার কিন্তু আসল কথা হচ্ছে লোকে তা স্বীকার কর্ত্তে রাজী নয়, এবং বুদ্ধির যে সীমা বা ইতি করা যায় না একথা মনীষীরা বলেন।

এই যে আর্ত্ত পীড়িত লোক তোমার চারিদিকে রয়েছে, এদের নারায়ণ বুদ্ধিতে সেবা কর্ত্তে হবে একথা জগৎকে প্রথম শুনালেন জগৎ-পূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ। সেই মহান্ আচার্য্যের কথা লোকে প্রথমতঃ বিশেষ বুঝতে পাল্লে না, কিন্তু তাঁর প্রাণময়ী ভাব দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে প'ড়ল। ক্রমশঃ সেই ভাব ঘন হ'য়ে মূর্ত্ত হল, কয়েকজন নিষ্কামকর্ম্মী তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কার্য্য সুরু কল্লে, আজ তাদের কার্য্য দেখ্‌লে চমৎকৃত হতে হয়।

এখন কথা হচ্ছে উপাসনা কল্লে কি হয়? উত্তর সকলেই জানেন ইষ্ট বা ভগবান লাভ, এবং অনেকে বলবেন যে উপাসনা ভক্তেরই কাজ। কিন্তু উপাসনা কর্ম্মীরও আছে, এবং কর্ম্মীও সেই উপাসনা দিয়েই তার ইষ্ট লাভ কর্ত্তে পারে ও করে। উপাসনার অর্থ হচ্ছে—ভগবানের নাম স্মরণ করা—তাঁর গুণকীর্ত্তন করা,—তাঁর ভজনা করা—তাঁর পূজা—তাঁর ধ্যান—তাঁর জপ—তাঁর সন্তোষ এক কথায় তাঁকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকা। ভক্ত এই সব যদি কর্ত্তে পারেন, তাহলে কর্ম্মীও এই সকল কর্ব্বেন তাঁর কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ইষ্টাকে নিয়ে দিনরাত থাক্‌তে পার্ব্বেন। কিন্তু লোকে বলে এ অসম্ভব। অসম্ভব কিছু নয়, ভক্তও কিছু একদিনে ঐ সব কর্ত্তে পারেননি, তাঁকেও আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে উঠতে হয়েছে। কর্ম্মীও তাই কর্ব্বেন। তবে এ ভাবটা যখন একেবারে অভিনব তখন অভ্যাস কর্ত্তে দেরী হতে পারে, আরও একটা কথা, পিতা পিতামহ তাঁরা এ কথাটা কেউই জান্‌তেন না, তাঁরা চিরকালই শুনে এসেছেন জ্ঞান ও ভক্তির রাস্তা দিয়েই ভগবান লাভ হয়—কর্ম্মের ভাবে বিশেষ সেবার ভাবেও সেই চরম সত্যস্বরূপ ভগবান লাভ হয় একথা তাঁদের কাছে একরকম অজ্ঞাত ছিল সেইজন্যে আমাদের জন্মগত একটা সংস্কারের দরুণ সেবার ভাবে ইষ্ট লাভ হয় একথা প্রথমতঃ ভেবেই উঠতে পারি না, তাই বলে 'অসম্ভব ও প্রলাপ' ইত্যাদি বলা ওসব বাজে কথা মাত্র।

কর্ম্মী তাঁর সকল কায কর্ব্বেন ঈশ্বরের দাস হ'য়ে—এই ভাবনা তিনি নিরন্তর কর্ব্বেন তবে একদিন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবেন তিনি সত্যসত্যই যা কিছু কর্চ্ছেন তা ভগবানেরই কাজ।

এই যে পীড়িত নারায়ণ, এদের দয়া তুমি করতে পারনা তোমার একমাত্র কার্য্য হচ্চে সেবা করা, উপাসনা করা এঁদের, তুমি ভাবের সহিত তাই করে যাও, এক দিন আস্‌বে যে দিন তোমার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার দূর হয়ে যাবে, তুমি শুদ্ধ স্বতঃ স্বরূপ হবে—যা তুমি ছিলে—যা তুমি জান্‌তে না—অজ্ঞান দিয়ে যা তুমি ঢেকে রেখেছিলে, সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম স্বরূপে তুমি উদ্ভাসিত হবে। আর মহান আচার্য্য ব'লছেন, যে ঠিক ঠিক ভাব নিয়ে সেবা করে তার সেদিন খুব নিকটে।

তবে গোড়াতেই কিছু সকলের সমস্ত পীড়িতকে নারায়ণ ভাবে সেবা করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। চেষ্টা কর্ত্তে হয় তাহ'লেই নারায়ণ ভাব আসে। প্রথম প্রথম অবশ্য মলমূত্রাদি পরিপূর্ণ, কুৎসিৎ রোগগ্রস্থ রোগীদের দেখ্‌লে তার দিকে অগ্রসর হওয়াই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায় বরং ফিরেই আস্‌তে ইচ্ছা হয়। তাই বলে কি ফিরে আসবে', না। সর্ব্বদা মনে রেখো সেই মহান আচার্য্যের বাণী—ভগবান তোমার দুয়ারে নানা মূর্ত্তিতে উপস্থিত—তোমাকে তাঁর সবকটা মূর্ত্তিই বরণ করে নিতে হবে। যেটা ভাল মূর্ত্তি সেইটাই পূজা কর্ব্ব অন্য গুলি দেখবোনা এ কথা যারা ভাবে বা বলে, তারা অতি নিম্নস্তরের সাধক—ঢের দেরী আছে তাদের ইষ্টলাভ হতে। তুমি তাঁর রুদ্র—মধুর, পীড়িত সুস্থ, দুঃখী সুখী সব মূর্ত্তিই বরণ করে নেবে তবেই ত' তাঁকে পুরোপুরি পাবে। ভগবান আমাদের কে? তিনি আমাদের ইষ্ট, তিনি আমাদের প্রেমাস্পদ প্রিয়তম অন্তরের অন্তরতম, আমাদের সবটুকু ত' তিনি—তিনি ছাড়া আর কি আছে। তবে আমরা বলি যে আমরা তোমাকে অনুভব কর্চ্ছি বটে কিন্তু দেখ্‌তে ত' পাচ্ছি না—তাই সেই অমূর্ত্ত চরাচরব্যাপী ভগবান মূর্ত্ত হয়ে তোমার সামনে হাজির। যোগীগণ যাঁর কোটি কোটি জন্ম তপস্যা করেও অন্ত পায় না তিনি আজ সান্ত হয়ে এসেছেন তোমার দ্বারে রোগীর বেসে আর্ত্তের বেসে—এসে ব'লছেন আমি এসেছি তুমি না

ডাক্‌তেই আমি এসেছি—তুমি কি তাঁকে ফেরাতে পার ? কখন না। তিনি নিজে এসেছেন এসে ব'লছেন আমার সেবা কর—কর সেবা তাঁর, ধন্য হয়ে যাও, শুভ মুহূর্ত্ত পরিত্যাগ ক'রো না। যে নিষ্ঠুর তাঁর পীড়িত মূর্ত্তি ঘৃণা করে সে যে তাঁর আনন্দ মূর্ত্তি ঠিক ঠিক ভাবে নিতে পারে এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেই কর্ম্মী—সেই ভক্ত—সেই উপাসক যে তাঁর কাজ—এই কথা জেনে সব কাজ করে।

পীড়িত নারায়ণের সেবায় এমন সব অনেক কাজ কর্ত্তে হয় যা সাধারণ উপাসনার দৃষ্টিতে বড় কষ্ট বোধ হয়। যেমন একজন রোগীর নিউমোনিয়া হয়েছে সে খেতে চাইলে আম। এক্ষেত্রে যিনি সেবক, তিনি কি কর্ব্বেন ? ভগবান আম খেতে চাচ্ছেন তা' যেখান থেকে পারি আম এনে খাওয়াই—তিনি ত' ভগবান, তাঁর কিছু লোকসান হবে না—এরূপ ধারনা সেবকরা কর্ব্বেন না নিশ্চয়। তাতে তাঁর উপাসনার ত্রুটি হবে। সত্য কথা ভগবানের আবার অসুখ বাড়বে একথা কিছুই নয়। কিন্তু রোগ ত' ভগবানের নয় তিনি মূর্ত্ত হয়ে যে পঞ্চভূতাত্মক দেহের মধ্যে আছেন তার—সেই পবিত্র ভগবানের মন্দির জীর্ণ হয়েছে তাকে মেরামত কর্ত্তে হবে। রোগী যদি কিছু অন্যায় করে—যদি অন্যায় রকম কিছু আবদার ক'রে বসে তা হ'লে সে আবদার মেটাতে হবে, সে ভগবানের মহৎ খেলায় ব'লে চরিতার্থ কর্ত্তে' হবে এমন ব্যবস্থা নয়। ব্যবস্থা হচ্ছে সেই অন্যায়ের প্রতীকার করা মা যশোদার মত। যাঁরা রোগীকে সাধারণ ভাবে দেখেন, আর যাঁরা রোগীকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করেন এই দুইয়ের মধ্যে প্রতীকারের তারতম্য হবে। শেষোক্ত ব্যক্তি অতি মৃদুভাবে মিষ্টিকথায় সেই অন্যায়ের প্রতীকার কর্ব্বেন। কারণ তিনি জানেন যে রূঢ় বা হট-কারী তিনি হতে পারেন না—কারণ রোগী তাঁর উপাস্য, তাঁর প্রিয়তম তাঁর অসম্মান, তাঁর কষ্ট তিনি হতে দিতে পারেন না।—

এখন আমরা যা ব'ললাম, তা একটু কঠিন হলেও, কার্য্যকরী এবং ঐ ভাবে সেবা নির্দ্দোষ হয়। যাঁরা সেবা কর্ব্বেন তাঁদের দুচার কথা ব'লে উপাসনার ভাবে সেবার বিষয় মোটামুটি এবার শেষ কর্ব্ব। কোন ভাব নিয়ে কাজ কর্ত্তে নেমে যদি সেই ভাবটা বরাবর বজায় না থাকে তা হ'লে

কাজ বড়ই নীরস ও অপ্রীতিকর হয় এবং বেশীর ভাগ কাজ মোটেই ভাল হয় না। তার উপর রোগীর সেবা উপাসনার ভাব নিয়ে একটু সন্তর্পনে, সাবধানে কর্ত্তে হয়। যাঁরা খুব উচ্চ অধিকারী তাঁরা গোড়া থেকেই সেবাকে উপাসনার ভাবে নিয়ে কাজে লেগে যান। কিন্তু যাঁরা নূতন ব্রতধারী তাঁদের সেবা ও উপাসনা দুটো পৃথক জিনিষ প্রথমতঃ মনে হলেও দুই কর্ত্তে হবে। রোগীর সেবা কর্ব্বার সময় খুব ভাব্‌বে ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং কর্ম্মে অবসর হ'লেই চিন্তা কর্ব্বে যে কতদূর তুমি এগিয়েছ। তোমার সেবায় ও উপাসনায় কোনটা পার্থক্য ঘটাচ্ছে, এই সব বিষয় ভাব্‌বে। এই হ'ল কর্ম্মীর ধ্যান। নূতন যাঁরা তাঁরা প্রত্যহ তাঁদের নিজ নিজ ইষ্ট চিন্তা কর্ব্বেন এবং কিয়ৎক্ষণ জপ ও ধ্যানাদিতে নিযুক্ত থাক্‌বেন, তাতে তাঁদের মন পবিত্র ও প্রফুল্ল থাক্‌বে এবং পবিত্র মনেই ভাবের ছাপ শীঘ্র ফুটে ওঠে। এমনি কর্ত্তে কর্ত্তে এমন একদিন আস্‌বে যেদিন আর তাঁর পৃথক ধ্যান ও জপ কর্ত্তে হবে না, যেদিন তিনি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবেন, প্রত্যেক রোগীর দেহ ভগবানের পবিত্র মন্দির এবং সেই মন্দিরে রয়েছেন যিনি—তিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি সেবকের নিজের ভেতরেও রয়েছেন।

তৃতীয় কথা—আত্মভাব থেকে সেবা করা। এটা খুব উচ্চ ভাবের কথা। জগতে যা কিছু দেখ্‌ছি, সবই আমি বা আমার, এই বুদ্ধি খুব উচ্চ হ'লেও এক পক্ষে খুব সহজ। এতে উপাসনা নেই। যেমন আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, তেমনি যেখানে যত আতুর পীড়িত আছে তারা সবাই আমার নিজের। আমার নিজের লোক পীড়িত হ'লে আমি যেমন উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত তাঁদের সেবা করি সেই রকম ভাবে অভেদ বুদ্ধিতে জগতের পীড়িতদের সেবা কর্ত্তে হবে। উপাসনার ভাব থেকে এটা আরও উচ্চ আরও নিকটতর ভাব। এবং সত্য কথা ব'লতে এইটাই নিকটতম ভাব। উপাসনায় আমি এবং আমার ইষ্ট দুজন পৃথক ব্যক্তি আর এ ভাবে এ ভেদ নাই, এ ভাবে আমি আমার সেবা কর্চ্ছি। রোগীর ডান হাতে ঘা হয়েছে কি ভাবে হবে? যেমন আমার হাতে ঘা হলে আমি নিজে তার

পরিচর্য্যা কর্ত্তাম, বা অপরে আমার করুক যে ভাবে আমি আশা কর্ত্তাম; সেই ভাবেই আমি নিজে রোগীর সেবা কর্ব্ব।—এই ভাব হ'ল আত্মভাব এই সেই সমভাব যে ভাবে কর্ম্ম ক'রতে ভগবান গীতামুখে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন।—এই ভাবে সেবা কল্লে তার মুক্তি অচিরেই হয় এবং সে সর্ব্বদা আনন্দময় শাশ্বতে অবস্থান করে।

ভগবান বুদ্ধ দেখলেন যে দেশশুদ্ধ লোক জরা ব্যাধি ও মরণগ্রস্থ। তাঁর বিরাট হৃদয় কেঁদে উঠল তাদের দুঃখে, তিনি দেখলেন যে তিনিই সব, তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পীড়িত। সেই মহান্ পুরুষ ব্যাধির ঔষধ অন্বেষণ কর্ত্তে স্ত্রী পুত্র রাজ্যধন সব পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ কল্লেন, কঠোর তপস্যা করে তিনি সর্ব্বব্যাধি হর অমৃতের সংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন। 'যে যেখানে আছ, শোন, আর্ত্ত পীড়িতের সেবা কর তোমার নির্ব্বাণ হবে' এই তাঁর উপদেশ। তিনি স্বার্থপরের মত নিজের মত নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হন নাই। তিনি সংবাদ নিলেন প্রথমে, কি করে জগতের শোক তাপ ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের মুক্তি হয়, সেই কথা তিনি দিগদিগন্তে প্রচার করে দিলেন।

আজ দেশবাসীর কাছে আমার প্রার্থনা, তোমরা যে যেখানে আছ, গৃহে কি অরণ্যে, পর্ব্বতে কি সমুদ্রতটে, গৃহী কি সন্ন্যাসী যে কেউ তোমরা আছ, তোমার নিজ আর্ত্ত, পীড়িত স্বরূপ আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সেবা প্রার্থী, তুমি তার সেবা কর—দয়া নয় সেবা—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে—মান যশঃ—খবরের কাগজে নাম বেরুবে রাজা-খেতাব মিল্‌বে—বা পরলোকে ১০০ কোটি বৎসর নানা ভোগ সুখে পরিবৃত থাকবে এ সব ফলের প্রত্যাশা ছেড়ে দিয়ে অনন্য চিত্তে সেবা করে যাও—তোমার হৃদয় প্রশস্ত হবে, চিত্ত নির্ম্মল হবে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ হবে।—হে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা দেশের বর্ত্তমান মহা সঙ্কটের দিনে একমাত্র উপায় হচ্ছে সেবা। তুমি দেশের প্রত্যেক মূর্ত্ত ভগবান, ক্রমশঃ দেশব্যাপী বিরাট ব্রহ্মের সেবা কর—দেশের প্রকৃত কল্যান হবে, আর যুগাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ তুমি লাভ করবে—তুমি ইষ্টলাভ করবে ও মুক্ত হয়ে যাবে।

সমালোচনা।

সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য—প্রথম খণ্ড— মূল্য দুই টাকা—শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ বা মধুকৈটভ বধ—শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত—৯৮।১নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা কলিকাতা। শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া যথার্থ সত্য নির্দ্দেশ করা ভাল, কিন্তু মহাপুরুষেরা যখন শাস্ত্রোক্ত দেবদেবী দর্শন করিয়া থাকেন তখন এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না যে কোন সত্য প্রকাশ করিবার জন্য রূপকচ্ছলে শাস্ত্রকারেরা পৌরাণিক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। শাস্ত্রে যে ঈশ্বরীয় লীলা যথাযথরূপে বর্ণিত আছে তাহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা ও বাস্তবতার সমন্বয় কোথায়—এইটী দেখানর নাম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—গ্রন্থকার ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত— তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। এই সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের শেষ আচার্য্য এবং ভক্তের জীবনী পাঠে মানবের স্বাধীন বৃত্তির বিকাশ ঘটিবে। কিন্তু প্রত্যেক জাতির একটা মর্ম্মস্থান আছে যেখানে ঘা দিতে গেলে অতি বড়, অতি মহৎকেও সে তুচ্ছ করে। পণ্ডিত শিবনাথ একস্থলে বলিয়াছেন "কিছুদিন হইতে একটী চিন্তা গুরুতররূপে হৃদয়কে অধিকার করিতেছে। আমি এতদিন individual ও Society সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা লিখিয়া বা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই individual এর জন্যই Society, individual আপনার পূর্ণ বিকাশ লাভ করুক, তার পর Society থাক্ আর না থাকুক। Individual গড়িতে গিয়া যদি Society ভাঙ্গিয়া যায়, কি করা যাইবে? * * * এই ভাবেই এতদিন উপদেশ দিয়া, ও কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, আধ্যাত্মিক জীবনরাজ্যেও এই individualismকে লইয়া গিয়াছি। আমার

ধর্ম্মবুদ্ধিই আমার চালক, শাস্ত্র গুরু কিছুই নয়।”—তাঁহার এই সাম্যবাদ সাধারণে প্রচার করায় সমাজ ভীত হইয়া গ্রহণ করিল না। তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার যেরূপ অবস্থা প্রতি ব্যক্তিরই সেইরূপ মানসিক স্বাধীন বৃত্তি সম্ভব। কিন্তু সে ভ্রম শীঘ্রই তাঁহার নিকট ধরা পড়ে। তিনি তাহার পর লিখিয়াছেন “কিন্তু এখন মনে হইতেছে, অতিরিক্ত individualism আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষেও ভাল নয়। কতকটা self discipline ও self suppression সে পক্ষে ভাল। এ জন্য সাধনাবস্থাতে গুরুর অধীন থাকিবার নিয়ম ভালই বোধ হয়।”—কিন্তু তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কারণ একেবারে গুরু ও শাস্ত্র অস্বীকার করায় তখন নবীন সমাজে ফাট ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর—শ্রীমলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত—বেঙ্গল বুক কোম্পানী ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা —মূল্য দুই টাকা মাত্র। আচার্য্য সম্বন্ধে বাঙ্গালায় প্রথিতনামা লেখকদের প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। “তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক তিনি সাহিত্যিক। কর্ম্মী রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্ম জীবনে অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সে বিশেষত্ব—তাঁহার দেশাত্মবোধ। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত ভাবের সুবর্ণে কোনও খাদ ছিল না।” এই রামেন্দ্র-কথা সাধারণের নিশ্চয়ই মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

শীতলি—কবিতার ছোট বই—শ্রীসাহাজী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মূল্য দুই আনা। আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিজয়-বাণী—(১ম সংখ্যা) শ্রীঅক্ষয়কুমার দাশ গুপ্ত। প্রকাশক শ্রীশান্তিভূষণ দাস গুপ্ত বি, এ ১৬৭নং রামকৃষ্ণপুর লেন,

শিবপুর হাওড়া মূল্য ছয় আনা। ইহাতে পরমভক্ত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেব-শর্ম্মার উপদেশ আছে।

কর্ম্মের পথে—স্বামী স্বরূপানন্দ—প্রকাশক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কল্পতরু-পাব্লিশিং—হাউস্। চাঁদপুর, ত্রিপুরা। মূল্য ছয় পয়সা। বর্ত্তমান জাতীয় তপস্যায় এই পুস্তিকা নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিৎ। "বিশ্বের' নেতৃত্ব যিনি গ্রহণ করিবেন তিনি তোমাদের আমাদের মতই মানুষ; শুধু আত্মোৎসর্গের প্রচণ্ড চেষ্টার মধ্য দিয়া তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেন।' * * * পতিতোদ্ধার যাহার জীবন ব্রত নয়, জন সেবার যূপকাষ্ঠে সকল স্বার্থকে যে বলি দেয় নাই, লাঞ্ছিতের বিষণ্ণ বয়ানে, নিরন্নের বিদগ্ধ জঠরে,—আহতের শোণিত স্রাবে নিজের অস্তিত্বকে যে জন সর্ব্বময় দেখে নাই, তাহাকে নেতা বলিয়া মানিব না।"—সন্ন্যাসীর ইহাই নেতৃত্বের আদর্শ।

বস্ত্র-যজ্ঞ—"চরকা আমার স্বামী সুত, চরকা আমার নাতি। চরকার দৌলতে আমার, দরজায় বাঁধা হাতী॥"—এ ছড়া আজ বাঙ্গালী ভুলিয়াছে বলিয়া এত দুর্দ্দশা। "There was a time, I believe, when the Charka was a familiar object in every household and I do not see why it should not be brought in the use again."—H. E. Lord Ronaldshay। এদেশে চরকার উপকারিতা লর্ড রোনাল্ডসে যথার্থই উপলব্ধি করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন। "বস্ত্র-সঙ্কট দিন দিনই ঘোরত হইয়া উঠিয়াছে। সূতাকাটা এবং চরকা ও তাঁতের প্রবর্ত্তন দ্বারা অবশ্য ইহার প্রতিকার হইবে। কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এই ভীষণ অভাব দূর করিবার জন্য" কি উপায় অবলম্বন করা উচিৎ তাহা এই পুস্তিকায় আছে। প্রণেতা শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মূল্য এক আনা। এজেণ্ট—কলিকাতা—এম্, ধর ৪৯।২ এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বাঁচিবার পথ—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মূল্য /১০। বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থোপযোগী কর্ম্মীশিক্ষক কর্ম্মীরজীবিকা এবং দেশ হইতে অজ্ঞানের জড়তা দূর করিবার জন্য আদর্শ পাঠশালা, গ্রাম, উপদেষ্টামণ্ডলী নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, এবং লাইব্রেরী সম্বন্ধে আলোচনা করা

হইয়াছে। "সহজে, অতি অল্প ব্যয়ে, সাধারণ শিক্ষার সুব্যবস্থা এই পুস্তিকাতে, সংক্ষেপে লেখা হইল। নীরব কর্ম্মিগণ এই প্রণালীতে কাজ করিলে, অল্প সময়ে, সামান্য খরচে ও সহজ চেষ্টায় লোকের অশেষ কল্যান হইবে। কর্ম্মিগণ কাজে অগ্রসর হউন, ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা" —লেখক।

কৃষি বিস্তার—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মূল্য ./০ আনা। "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার অৰ্দ্ধ চাষ-বাস। তার অৰ্দ্ধ চাকরী-পাশ, ভিক্ষায় নাই কোন আশ।" বাঙ্গালী তোমার কথা তুমিই বুঝ। এই পুস্তিকায় চাষবাস সম্বন্ধে বহু কথা আছে।

অন্তরালের কথা।

(বিমলানন্দ)

আমারে দেখেছ তুমি সর্ব্ব দোষে দূষিত দানব
আমারে দেখেছ তুমি সর্ব্ব গুণে ভূষিত মানব।
কিন্তু হায় অন্তরাল চিরকাল বলিছে তোমারে
আমারে দেখনি তুমি, ওহে অন্ধ! দেখেছ তোমারে

সংবাদ।

রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য ঔষধালয় বেলুড়। আমরা উক্ত দাতব্য ঔষধালয়ের ১৯২০ র বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৯১৩ সালে মাত্র ১০০০ রোগীর পরিচর্য্যা করা হয় কিন্তু ১৯২০ সালে ১২৫১৪ রোগীর পরিচর্য্যা করা হয়। তাহার মধ্যে ৩৮৭২ জন নূতন রোগী। বালী মিউনিসিপালিটী ১৯১৭ পর্য্যন্ত ১২০৲ টাকা করিয়া বাৎসরিক দান করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আশাকরি পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য ঐ টাকা দান করিয়া তাঁহাদের বদান্যতার পরিচয় দিবেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস এবং অপরাপর বহু কেমিষ্ট এবং কবিরাজদের এই সৎকার্য্যে সাহায্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মেসার্স বি, কে, পাল ইহার জন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ কারণ এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ ঔষধ তাঁহারা দান করিয়া থাকেন। ডাক্তার বিপিন বিহারী ঘোষ, জে, এন্ কাঞ্জিলাল, দুর্গাপদ ঘোষ, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিকিৎসালয়ের বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন।

গতবর্ষের (১৯১৯) টাকা মজুত ৩৩২৶১০ বর্ত্তমান বর্ষে (১৯২০) প্রাপ্ত ১৬৮।/০ মোট জমা ৫০০।৶১০ মোট খরচ (১৯২০) ১৬৭॥/০। যাঁহারা এই মহৎকার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা (১) প্রেসিডেণ্ট বেলুড় মঠ, হাওড়া (২) অথবা সেক্রেটারী উদ্বোধন অফিস বাগবাজারস্থ ভবনে অর্থাদি প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এবং শ্রীশ্রীস্বামীজির তিথি পূজোপলক্ষে ৩২ জন ব্রহ্মচর্য্য এবং ২৪ জন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। কন্যাকুমারী হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বহু নগরীতে ঐ উৎসব কার্য্য সমাধা হইয়াছে।
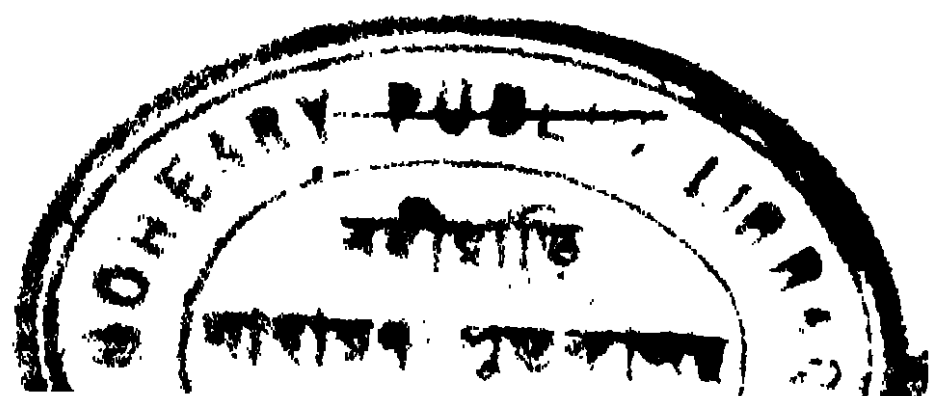
কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

পুষ্প বিকশিত হইয়া মানবের আনন্দবর্দ্ধন করে—প্রবল অনিল কম্পনে ছিন্ন হইয়া উহা ঝরিয়া পড়ে। স্বার্থক হয় সে বিকাশ ও সৌন্দর্য্য ভাগবতী মূর্ত্তির অঙ্গ ভূষণে। চঞ্চলা দেবী-লীলোদ্যানে সদ্যঃ জীবন্ত প্রস্ফুটিত কুসুম কুমারী। সে সৌন্দর্য্যে বিশ্ব পুলকিত হয়—মানবের কলুষ নিশ্বাসের বেগে ছিন্ন হইয়া ঝরিয়া পড়ে। স্বার্থক হয় সে পবিত্র সৌন্দর্য্য শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণে।

* * *

স্বর্ণ-ভূষণ মানবাসে মলিন হয়—অগ্নিস্পর্শে পুনরায় তাহার ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠে—স্বর্ণ খাঁটি হয়। বিলাস বাসরে নারীর অঙ্গে কি যেন একটা কালিমা, একটা আবরণ তাহার স্বভাব সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া দেয়—তপস্যার অগ্নিস্পর্শ সে সৌন্দর্য্যকে পুনরায় প্রকাশ দিয়া তাহাকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলে। অনলের কুসুম শিবেতে সর্ব্বস্ব অর্পণকারিণী গৌরী মূর্ত্তি কি অপূর্ব্ব! কি পবিত্র! কি মধুর!

* * *

চন্দন তরু মানবকে শীতল ছায়া দান করে—নিষ্ঠুর নিজ ভোগের জন্য তাহারে ছেদন করে কিন্তু তখনও সে নিঃস্বার্থভাবে সুগন্ধ বিতরণে কাতর হয় না। নারীর শীতল ক্রোড়ে এ বিশ্ব লালিত। ক্ষণিক ভোগের নিমিত্ত মানুষ তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়—তাহার দেহ মন, আত্মার স্বাধীনতা কাটিয়া—কিন্তু তখন তাহার নিঃস্বার্থ ত্যাগের সুবাস বাহির হয় তাহার মাতৃত্বের মধ্য দিয়া।

অমরার উর্ব্বশী মেনকার সৌন্দর্য্য মেলনী দর্শনে জাগিয়া উঠে অন্তরে পশুটা—সে হিংস্রক ভাঙ্গিয়া দেয় সেই আকাঙ্ক্ষা লালসায় গড়া ভোগ বিলাসের নন্দন কানন। আর তপঃক্ষেত্র কৈলাসে গণেশ-জননীর মাতৃ মূর্ত্তি পশুর হৃদয় শান্ত করে—পশুরাজ তাই মেষ শিশুর মত মায়ের পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

* * *

পদ্ম কুট্মলকে বিকাশের পূর্ব্বে পঙ্কে বাস করিতে হয়—কীট তাহাকে কাটিয়া ছিন্ন করিতে চায়—সলিল তাহাকে নিজের কক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া তাহার স্বাধীন বিকাশের অন্তরায় হয়। সেই কারা-মুক্তির সংঘর্ষে কত স্ফুটনোন্মুখ কলিকা তাহাদের বশীভূত হইয়া শ্রীহীন হয়। কিন্তু সেই সংঘর্ষই আবার ক্ষুদ্র কলিকার শক্তি বাড়ায় যে শক্তিতে সে জয়শ্রীর রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া পান্নাপত্র সখি সমভিব্যাহারে স্বাধীন ভাবে, মুক্ত বাতাসে ক্রীড়া করে। ভক্ত তখন যত্ন সহকারে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া শ্রীভগবানের, পায়ের আসন রচিয়া দেয়। সংসার মালিন্যের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় পবিত্র কুমারী। মানুষ তাহাকে নিজস্ব করিবার জন্য তাহার সকল স্বাধীনতা কাটিয়া নিজের গণ্ডীতে অবরোধ করিয়া রাখিয়া দিতে চায়। কিন্তু সেই কারামুক্তির সংঘর্ষে যে নারী সীতার ন্যায় অপূর্ব্ব ধৈর্য্যশালিনী, সাবিত্রীর মত মৃত্যুকে উপেক্ষা করে,—তখন উজ্জ্বল হয় সকল তুচ্ছতার মধ্যে বিশ্বের নিখিল মাধুর্য্য, পবিত্রতা, গৌরবের ব্রহ্মচারিণী সতী। ভক্ত তখন নিবেদন করে সেই পবিত্র কুমারী সর্ব্বভূতে মূর্ত্ত নারায়ণের সেবায়।

* * *

পাহাড় পর্ব্বতে, নদ নদীতে ধরিত্রীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে—কৃষ্ণ মেঘের চপলার চাঞ্চল্যে নীলিমার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। কিন্তু সার্থক হয় সে সৌন্দর্য্য যখন উথলিয়া পড়ে ধরিত্রীর অন্নদানের মধ্য দিয়া, নীলিমায় মেঘের বারি বর্ষণের ধারায়। পরমসুন্দরের জীবন্ত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে নারীর অঙ্গ-ছবিতে—কিন্তু সার্থক হয় সে

সৌন্দর্য্য-মাতৃত্বের গৌরবে—সন্তানের শুষ্ক জিহ্বায় হৃদয়ের করুণা ধারায় —জীবের পালনে—অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে।

(২)

যতদিন গাছ ছোট থাকে ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয় যেন গরু বা অপর, কিছুতে তার অনিষ্ট না করে। কিন্তু যদি চিরকাল ধরিয়া কঠিন বেড়ার নিগড়ে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে সে বৃক্ষের স্বাধীন বৰ্দ্ধিশীলতার নাশ হেতু তাহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। সেইরূপ মানবের শৈশব কালের জন্যই সমাজ এবং ধর্ম্মের আইন-কানুন দরকার কিন্তু যখন সে নিজের পায়ে হাঁটিতে, নিজের চক্ষে দেখিতে, নিজের মন দিয়া শিক্ষা করিতে চায় তখন আমার পক্ষে যাহা সহায় হইয়াছিল সেইটাকে সকল মানবের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একমাত্র উপায় এবং নিয়ম স্থির করিয়া বলপূর্ব্বক সকলের উপর চালাইতে যাওয়া অর্থে মানবের স্বাধীন বিকাশের অন্তরায় হওয়া।

প্রশ্ন হইতেছে—সকলেই যদি নিজের মতে চলে তাহা হইলে সমাজ চলিবে কি করিয়া? কিন্তু সমাজের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ব্যষ্টি মানবের সমষ্টি হইতেছে সমাজ। অতএব ব্যষ্টির মধ্যে প্রাণের ঘন স্পন্দন যত অধিক ও দ্রুত হইবে, সমষ্টি সমাজও ততই জাগ্রত এবং উন্নত হইবে। ব্যষ্টি যদি মুখ প্রক্ষালন হইতে বেদ পাঠ পর্য্যন্ত যন্ত্রের মত সম্পাদন করে সমাজও অচিরেই প্রাণ হীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হওয়ায় সম্মুখস্থিত নব ভাবোত্থানের সংঘর্ষে চূর্ণ হইয়া যায়।

* * *

দেবত্ব ও পূর্ণত্ব প্রতি মানবে বর্ত্তমান। তমের গাঢ় আবরণ উন্মোচন করিয়া মানবের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা অনন্ত শক্তিমান হওয়াই জীবন সংগ্রামের উদ্দেশ্য—তা নেতি নেতি বিচারের দ্বারাই হউক, পরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াই হউক, কোনও অমানব পুরুষে ভাল-বাসার দ্বারাই হউক, চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারাই হউক, কলা বা

জড় বিজ্ঞান সাহায্যেই হউক—যে কোন বিষয়ে তদগত চিত্ততা বা তন্ময়ত্ব যে কোনও ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন সেখানেই সর্ব্বভূতান্তর্যামী সত্য স্বরূপ ভগবান প্রকটিত হইয়াছেন দেখা যায়।

ভারতবর্ষে যেরূপে ধর্ম্মের স্বাধীনতা, ইউরোপে তেমনি সমাজের স্বাধীনতা। কিন্তু ইউরোপ বহু প্রচেষ্টার ফলে যে সমাজের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—যাহার বলে আজ সে এতবড় প্রতাপশালী, এত বড় উন্নত—সেই গূঢ়তত্ত্ব সে অদ্যাবধি কোন জাতির নিকট প্রকাশ করিতে চাহে না। সে জগৎকে দান করিতে চায় তাহার মাতুয়ার (dogmatic) ধর্ম্ম—যাহার দ্বারা সে জগতের সকল স্বাধীন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ নিরোধ করিয়া ফেলিবায় চেষ্টায় দৃঢ় সঙ্কল্প। আর ভারতীয় উচ্চবর্ণেরা তাহাদের, অপূর্ব্ব বিশ্বালোড়নকারী উদার, প্রেমস্বরূপ ধর্ম্ম কাহাকেও দিতে চাহে না, কেবল অপর জাতির সহিত নিজেদের একটা সংকীর্ণ বিস্তার হীন সমাজ কারার নির্দ্দেশ করিয়া বড়াই করিয়া আসিতেছে। সেই ধর্ম্ম দানের অভাবে জগতে আজ কোটি কোটি প্রাণী পশুর ন্যায় ভোগারণ্যে বিচারণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই ইউরোপীয় স্বাধীন সমাজ এবং ভারতীয় উদার ধর্ম্মের সমবায়ে বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন হইবে।

ইউরোপের প্রাণ-সম্পন্ন কর্ম্মী সমাজ জড়জগতে নব নব তথ্যের উন্মেষের দ্বারা দুরাতীক্রমনীয় সিন্ধু, আকাশকে আজ রাজপথে পরিণত করিয়াছে, বিজলীকে দাসীর কর্ম্মে নিযুক্তা রাখিয়াছে—কিন্তু ধর্ম্মহীন বলিয়া অতবড় শক্তি আজ তাহাকে দেবতা না করিয়া—করিয়াছে অসুর। পক্ষান্তরে ভারতে উদার ধর্ম্ম বহুবার ঘোষণা সত্ত্বেও, বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্ত্বেও বিস্তার হীন সমাজ তাহার প্রচারে অন্তরায় হইয়া সেই ধর্ম্মকে অকর্ম্মন্য ও অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছে যাহা আজ লোকসমক্ষে অতীতের বল্মীক স্তূপ বলিয়া প্রতীয়মান।

কিন্তু আজ পাশ্চাত্য তাহার সকল জড় সম্পদ লইয়া এই মহান বিরাট অত্যুদার ভারতীয় ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই দুই জলস্তম্ভের সংঘর্ষে যে এক বিশাল যুগ তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে, চাহিয়া দেখ মানব, তাহার শুভ্র শীর্ষে হাস্যানন মহাযোগী যুগাবতার রামকৃষ্ণ।

ভূমার সন্ধানে।

(পথিক)

একদা দেবর্ষি নারদ, আদি-ঋষি ব্রহ্মিষ্ঠ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় ও শ্রদ্ধা সহকারে কহিলেন, "ভগবন্, আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।" সনৎকুমার কহিলেন, "তুমি এযাবৎ যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা আমাকে বল, আমি তাহার পরবর্ত্তী বিষয় তোমাকে উপদেশ করিব।" নারদ বিনীত ভাবে কহিলেন, "আমি, চতুর্ব্বেদ ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদি শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রাজনীতি বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, ও নৃত্যগীতাদিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি; কিন্তু ভগবন্, আমি শুধু বাহ্য বিকারকেই অবগত হইয়াছি, উহাদের অন্তর্নিহিত অধিকারী আত্মাকে জানিতে পারি নাই। আপনার ন্যায় মহাত্মাদিগের মুখে শুনিয়াছি যে 'আত্মবিৎ' হইলেই শোকাতীত হওয়া যায়, সেই জন্যই বোধ হয়, এত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াও আমি দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই, আপনি কৃপাপূর্ব্বক দাসকে দুঃখের পারে যাইবার উপায় বলিয়া দিন।"

দেবর্ষি এই কথা বলিয়া নীরব হইলে পর, ভগবান্ সনৎকুমার, শিশুকে যেরূপভাবে ধীরে ধীরে এক সোপান হইতে সোপানান্তর অতিক্রম করাইয়া ছাদে লইয়া যাইতে হয়, সেইরূপ ভাবে প্রথমে স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিষয়ের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া, সর্ব্বশেষে মনবুদ্ধির অতীত, নির্ব্বিশেষ,

আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্ম তত্ত্ব উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে, কহিতে লাগিলেন।

"বৎস, তুমি এতাবৎকাল যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা শুধু সেই মূল বস্তুর "নাম" বা বাঙ্‌বিকার মাত্র—শুধু 'নাম' জানিলে বস্তুকে জানা যায় না, কিন্তু সেই নামকেই অবলম্বন করিয়া বস্তুর সন্ধান করিলে বস্তুও আত্মপ্রকাশ করে। যাহারা এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিয়া শুধু নামেতেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি না থাকিয়া, নামকে অবলম্বন করিয়া, অধিকারী ব্রহ্মেরই 'উপাসনা' করে অর্থাৎ সকল প্রাণীর হৃদয়ে সৎ স্বরূপে অবস্থিত চিদাত্মক, অহং প্রত্যয়ের বিষয় সেই ব্রহ্মকেই, এই সমস্ত বিদ্যার প্রকাশক রূপে চিন্তা করে, তাহারা ক্রমে, আত্মজ্ঞানের সোপান হইতে সোপানান্তর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে নির্ব্বিশেষ আত্মাকে অবগত হইয়া 'আত্মবিৎ' হয়। এইরূপে নিজেকে, 'নাম' বা নিখিল বিদ্যার আশ্রয়, বলিয়া চিন্তা করিবার ফলে নামের যাহা কিছু শক্তি বা কার্য্য তাহাও সাধকের অধিগত হয়।"

নারদ কহিলেন, "ভগবন্, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তাপ্রণালী আমাকে উপদেশ করুন"।

"বৎস, অতঃপর 'বাক্‌কে' আত্মা বলিয়া চিন্তা কর, বাক্‌ই নামের আশ্রয়, বাক্‌কে অবলম্বন করিয়াই নিখিলবিদ্যা ও যাবতীয় কলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাকের অভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না, সত্যমিথ্যা প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারিত না। বাক্‌কে আত্মারূপে অনুভব করিলে, বাকের ভিতর যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই সাধক লাভ করিয়া থাকে।"

এইরূপে নারদ তাঁহার মূল প্রষ্টব্য বিষয় পরমাত্মজ্ঞান, যাহা লাভ করিলে সকল দুঃখের অতীত হওয়া যায়—অবগত হইবার নিমিত্ত একটীর পর একটী করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণার বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিৎ বরিষ্ঠ সনৎকুমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্বের আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পর পর সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিতে উপদেশ করিয়া, প্রত্যেকটির ধারণার ফল পৃথক ভাবে বর্ণনা

করিলেন, যথা, উপাস্য তত্ত্বের সহিত একাত্মতা প্রাপ্তি, অর্থাৎ যাহা কিছু সেই সেই তত্ত্বের বিভূতি, অবাধে সাধকের ভিতরে তাহার প্রকাশ।

নাম ও বাক্‌কে আত্মভাবে উপাসনার উপদেশ করিয়া সনৎকুমার, যথাক্রমে মন, সংকল্প (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি), চিত্ত (বোধশক্তি), ধ্যান (একাগ্রতা), বিজ্ঞান (শাস্ত্রার্থ বিষয়ক শুদ্ধজ্ঞান), বল (মানসী প্রতিভা ও দৈহিক সামর্থ্য), অন্ন—কেননা অন্নই বলের প্রতিষ্ঠা, অন্নাভাবে সকল শক্তি নষ্ট হইয়া যায়—জল, তেজ, আকাশ স্মৃতিশক্তি—কেননা স্মরণ কর্ত্তার স্মৃতিশক্তি বিদ্যমান থাকিলেই আকাশাদি অর্থবান হয়,—আশা—কেননা অভিলাষানুযায়ীই স্মরণ হয়—ও প্রাণ বা মূল শক্তিকে (universal energy) "ইহাই আমি" এই ভাবে অবগত হইতে উপদেশ করিলেন।

অতঃপর এই প্রাণ বিজ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আদি ঋষি কহিতে লাগিলেন, "যেমন রথচক্রের শলাকা সমূহ চক্রনাভিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত থাকে, সেইরূপ সকলের মূলীভূত এই প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসমূহ অবস্থিত রহিয়াছে। নিখিল বিশ্ব, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। অধিক কি, প্রাণের দ্বারাই পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, গুরুর গুরুত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব; যাহাদিগকে জীবিতাবস্থায় বাক্যদ্বারা অবমাননা করিলেও নিন্দাভাজন হইতে হয় সেই পিতা মাতা প্রভৃতিকে প্রাণান্তে দগ্ধ করিলেও নিন্দার কাজ হয় না। অতএব প্রাণই সকলের অন্তর্নিহিত সার বস্তু, উহাকে আত্মভাবে অবগত হইতে পারিলে নিখিল জ্ঞানের অতীত অতিসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ হয়—সাধক "অতিবাদী" * হন।"

কিন্তু প্রাণাত্মবিদের এই অতিসূক্ষ্ম জ্ঞানও যে সর্ব্ববিশেষাতীত পরমাত্মজ্ঞান নহে, নারদকে তাহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সনৎকুমার কহিলেন, "যিনি এই প্রাণশক্তির ও মূলীভূত পরমার্থ সত্যকে অবগত

* নামাদ্যাশান্তমতীত্য বদন-শীলো ভবতি—শাঙ্কর ভাষ্য—
নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয় সমূহের অতীত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করাই তাহার স্বভাব হইয়া থাকে।

হইতে পারেন তিনিই সর্ব্ববিশেষাতীত জ্ঞানস্বরূপকে লাভ করিয়া "যথার্থ অতিবাদী" হন (সত্যেন অতিবদতি), সুতরাং সেই পরমার্থ সত্যই সর্ব্বথা জ্ঞেয়।

তৎশ্রবণে নারদ কহিলেন, "আমি সেই সর্ব্ববিশেষাতীত একমাত্র জ্ঞেয়স্বরূপ পরমার্থ তত্ত্বকে জানিয়া 'যথার্থ অতিবাদী' হইতে অভিলাষী; ভগবন্ আমাকে তাহাই উপদেশ করুন।"

সঃ কুঃ। যদি "যথার্থ অতিবাদী" হওয়াই তোমার অভিলাষ তবে সেই পরমার্থ তত্ত্বকে স্বরূপতঃ অবগত হও, কেননা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিয়া কোন বিষয়েই 'যথার্থ সত্যভাষণ' সম্ভবপর নহে।

নারদ। প্রভো, আমাকে সেই পরমার্থতত্ত্ব স্বরূপতঃ উপদেশ করুন।

সঃ কুঃ। জ্ঞেয় বিষয়ের অনুকূল বিচার বা 'মনন' না করিলে, কোন বিষয়ই যথার্থ অবগত হওয়া যায় না. সুতরাং তুমি "মননের" তত্ত্ব অবগত হও।

নারদ। আমাকে তদ্বিষয়েই উপদেশ প্রদান করুন।

সঃ কুঃ। যে বিষয়ে 'মনন' করিতে হইবে তাহাতে 'শ্রদ্ধা' বা আদর আনয়ন করিতে হয়, তদভাবে 'মনন' অসম্ভব, সুতরাং তুমি 'শ্রদ্ধার' সাধনা কর।

নারদ। ভগবন্, আমাকে 'শ্রদ্ধার' উপদেশ করুন।

সঃ কু। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত গুরুশুশ্রূষাদিতে 'নিষ্ঠা'যুক্ত না হইলে শ্রদ্ধার উদয় হয় না, সুতরাং শ্রদ্ধাশীল হইতে হইলে নিষ্ঠার বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন।

নারদ। প্রভো, নিষ্ঠার তত্ত্ব আমার নিকট বিবৃত করুন।

সঃ কু। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত নিষ্ঠাবান হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করা প্রয়োজন।

নারদ। আমাকে তাহাই উপদেশ করুন।

সঃ কু। ইন্দ্রিয় সুখের অতীত, অপার আনন্দ একটা কিছু আছে ইহা নিশ্চয় ধারণা না হইলে ইন্দ্রিয়-সংযম হইতেই পারে না; সুতরাং সেই বিষয়াতীত আনন্দকে নিশ্চয়রূপে ধারণা করিতে হইবে।

নারদ। আমি সেই অপার আনন্দকেই অবগত হইতে ইচ্ছুক।

সঃ কু। যাহা 'ভূমা' বা অসীম, তাহাই আনন্দ, যাহা সসীম তাহাতে সুখ নাই; তুমি 'ভূমাকে' অবগত হও।

নারদ। প্রভো, আমাকে তাহাই উপদেশ করুন।

সঃ কু। যেখানে দেখিবার, শুনিবার বা জানিবার আর কিছুই নাই—যে অবস্থায় সর্ব্বভেদাতীত জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মা নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহাই 'ভূমা'। পক্ষান্তরে যে অবস্থায়, দেখিবার, শুনিবার বা জানিবার অপর কিছু থাকে তাহা 'অল্প'—যাহা 'ভূমা' তাহাই অক্ষয় আর যাহা 'অল্প' তাহা বিনাশশীল।

নারদ। সেই 'ভূমা' কিসে প্রতিষ্ঠিত?

সঃ কুঃ। নিজের মহিমায়, অথবা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, মহিমাতেও নহে। তাহা অপর কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহা স্বপ্রতিষ্ঠিত। আগে পাশে, সম্মুখে পশ্চাতে, ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি, তিনিই 'আমি' সুতরাং আমিই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আত্মাকে এইরূপে অবগত হইতে পারিলেই আত্মারাম ও সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া যায়—অন্যথা অধীনতা ও জন্মমৃত্যুর দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। যিনি আত্মাকে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া অবগত হন্ তিনি আত্মাতেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মৃত্যু, শোক, দুঃখ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, পাইবার যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই আত্মা আবার এক হইয়াও বহুরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

অতঃপর সনৎকুমার সেই আত্মজ্ঞান প্রকাশের অন্তরঙ্গ সাধনের নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "রাগদ্বেষমুক্ত হইয়া বিষয় আহরণ করিলেই অন্তঃকরণ পবিত্র হয়, রাগদ্বেষবিমুক্ত পবিত্র অন্তঃকরণেই পরমতত্ত্ব উদ্ভাসিত থাকে, তৎপর সমস্ত বন্ধনের অবসান হয়,—'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ'।

এইরূপে ভগবান সনৎকুমার, রাগদ্বেষাদি দোষ মুক্ত নারদকে পরমার্থ-তত্ত্ব প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

আখ্যায়িকাছলে, সাধারণ বুদ্ধির অগোচর সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তত্ত্বসমূহ

সরল ভাবে বিবৃত করিবার চেষ্টা, একটি সনাতন প্রথা। সকল দেশের, সকল সময়ের, তত্ত্বদর্শী শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। আখ্যায়িকা বা রূপকগুলি সকল সময়েই দেশের ও সমাজের তদানীন্তন, আচার ব্যবহার অথবা সুপরিচিত বস্তু বা ঘটনা বিশেষকে অবলম্বন করিয়াই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদের সনাতন বেদশাস্ত্রেও আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই,—অপরিবর্ত্তনশীল চিরন্তন সত্যসমূহ, সমাজের তদানীন্তন আচার ব্যবহার, বস্তু বা ঘটনানুযায়ী আখ্যায়িকা বা রূপকের সাহায্যে সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে সমাজের বাহ্য আচার ব্যবহারগুলি যখন পরিবর্ত্তিত হইয়া বিস্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করিতে আরম্ভ করে, তখন পরবর্ত্তীয়দিগের পক্ষে, সেই সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় রূপক ও আখ্যায়িকার অন্তরাল হইতে চিরন্তন অবিনাশী সত্যগুলিকে আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে। তথাপি শ্রদ্ধার সহিত, একাগ্র-চিত্তে পাঠ চিন্তাদি করিলে অনেক সময়ে উহাদিগের অন্তরালে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সন্ধান পাইয়া পরমানন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

উপনিষৎ সমূহের মধ্যে 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ' একখানি অতিপ্রাচীন ও বহু আশ্চর্য্য তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। উহার সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আখ্যায়িকাটি, আচার্য্য শঙ্করের ভাব যথাসাধ্য গ্রহণ করিয়া, সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদের অন্তর্গত 'ভূমাধিকরণে' উহার তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে। যাহা হউক উল্লিখিত আখ্যায়িকার পশ্চাতে যে সকল চিরন্তন সুগভীর তত্ত্বসমূহ নিহিত রহিয়াছে আমরা অতিসংক্ষেপে তাহার দুই একটির সামান্য আলোচনা করিয়া তৎপ্রতি চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ, সাধারণ সাংসারিক জীবন ও অধ্যাত্ম জীবনের পার্থক্য কোথায় এবং সাধারণ ব্যবহারিক জীবনকে পরমার্থিকে পরিণত করিয়া কিরূপে ক্রমশঃ সকলের সাধারণ অভীষ্ট, হ্রাস বৃদ্ধিহীন, চিরন্তন আনন্দ বা 'ভূমাকে' লাভ করা যাইতে পারে, এই গুরুতর সমস্যার স্পষ্ট সমাধান উহাতে রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল প্রকার সফলতা, বল, বীর্য্য ও শক্তির মূল যে কোথায় তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, জীবনের চরম উদ্দেশ্য যে কি,—যাহা লাভ করিলে মানুষের আর কিছুই পাইবার থাকে না—এবং তাহা লাভ করিবার অন্তরঙ্গ সাধনই বা কি কি, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রথম, ব্যবহারিক ও পরমার্থিক জীবনের কথা। মানুষের ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃই বহির্মুখী, বাহিরের রূপরসাদি বিষয় হইতে জ্ঞান ও সুখ আহরণ করিয়া উহারা মানুষের অস্তিত্ব অটুট রাখিতে সতত‍ই চেষ্টিত। কিন্তু বাহ্য বিষয়কেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করিয়া, মানুষ যতদিন তাহাদিগকে লইয়াই নিজের স্বাভাবিক অভাবসমূহ—জ্ঞান সুখ ও অমৃতত্বের অভাব—পূর্ণ করিতে সচেষ্ট থাকে ততদিন সে কিছুতেই যথার্থ পূর্ণতার সন্ধান পাইতে পারে না। বাহ্য বিষয়ের সাহায্যে জ্ঞান সুখ ও অস্তিত্বের সামান্য বিকাশ সাধারণ বিচারে প্রতীত হইলেও উহারাই যে মানুষের আসল স্বরূপ, তাহার স্বতঃসিদ্ধ চিরন্তন অধিকার, এ কথা শাস্ত্র বা গুরুমুখে অবগত হইয়া মানুষ যখন হইতে, বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও, আপনার ভিতরে সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত, সেই চিদানন্দ স্বরূপের সন্ধান লইতে সচেষ্ট হয়, তখন হইতেই তাহার অধ্যাত্ম জীবনের সূত্রপাত হয়। মানুষের জীবনের প্রধান অবলম্বন, সুখান্বেষণ। যতদিন সুখ বস্তুটাকে সে বাহির হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে, ততদিন তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদা বিষয়েতেই নিবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। ততদিন আত্মা বা ঈশ্বরের তত্ত্ব তাহার মনে উদ্ভাসিত হওয়া অসম্ভব। বড় জোর ঈশ্বর বিষয়ে তাহার এরূপ একটা ধারণা হওয়া সম্ভব যে,—তিনি একজন খুব ধন-জন-শক্তি-সামর্থ্যবান পুরুষ, ঐ নীলাকাশের পশ্চাতে বা এমনই কোনও একটা স্থানে তাঁহার ঘর; খুসী হইলে তিনি সকলকে ধনজন ইত্যাদি দিতে পারেন। ঐরূপ ঈশ্বর ধারণা কাহারও কাহারও পক্ষে উপযোগী হইলেও, উহা যে বাস্তবিক অধ্যাত্ম জীবনের পরিচায়ক নহে তাঁহা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে মানুষ যখন বুঝিতে আরম্ভ করে, যে সুখ তাহার ভিতরে রহিয়াছে, বাহ্যবস্তুতে সে তাহা আরোপ করিয়া উপভোগ করিতেছে মাত্র, তখন সেই সুখটাকে ষোলআনা আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার দৃষ্টি প্রত্যাবৃত

হয় ভিতরের দিকে। সহস্র বিষয়ের মধ্য হইতেও সে সুখের সন্ধান করে, তাহার নিজের ভিতরে। এই দৃষ্টির প্রভেদই সাধারণ সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যবধান। একটীর দৃষ্টি সতত বিষয় মুখী, অপরটীর দৃষ্টি অন্তর্মুখী। একটি সংসার দুঃখের কারণ অপরটী নিত্যানন্দ লাভের হেতু।

কিন্তু সকলের পক্ষে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সেই আসল স্বরূপটীকে ধরিতে বুঝিতে পারা প্রথমেই সম্ভবপর হয় না। চিত্তবৃত্তিগুলি, তাহাদের চিরন্তন অভ্যাসের ফলে বাহ্য বস্তুকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে উৎসুক হয়। এইজন্য, মানুষের স্বভাবতঃ যে দিকে অনুরাগ, এমন একটা অনিষিদ্ধ বাহ্য বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই সে সহজে সেই অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণা অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়। যেমন, শিল্প বা কলা বিদ্যায় যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অনুরাগী, সে যদি, শিল্প বা কলাবিদ্যার চর্চ্চায়, বর্ত্তমানে সে যে জ্ঞান ও সুখ পাইতেছে তাহাকে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া, পূর্ণভাবে জ্ঞান ও সুখ আয়ত্ত করিতে অভিলাষী হয়, তবে সেই সেই বিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই তাহাকে আত্মবিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে। শিল্প বা কলা বিদ্যার চর্চ্চায় তাহার ভিতর হইতে যে শক্তির বিকাশ হইতেছে তাহাকে, বাহিরের একটা কিছু না ভাবিয়া, আত্মারই একটি বিকাশরূপে চিন্তা করিতে অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ আত্মার আরও শক্তি অনুভব করিবার স্বাভাবিক প্রেরণায় তাহার চিত্ত সহজেই অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ করিবে। তারপর যখন বুদ্ধি আর তাহাকে অধিক দূর লইয়া যাইতে পারিবে না, তখন বুদ্ধির উপর অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধক অন্বেষ্টব্য চিদানন্দ স্বরূপেতেই অবস্থিত হইবেন—উহাই ভূমা।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, সাধারণ ইন্দ্রিয় সুখের অতীত একটা অনাবিল আনন্দ আছে, এ কথাটি বিচার সহায়ে বুঝিয়া তাহাকেই লাভ করিবার নিমিত্ত যাহার অভিলাষ জন্মিয়াছে, অথচ সহসা ইন্দ্রিয় মনের অতীত রাজ্যে উপনীত হওয়া যিনি কষ্টকর বলিয়া বোধ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকারীর পক্ষেই অনিষিদ্ধ বিষয় অবলম্বন করিয়া আত্মানুশীলন সম্ভব পর হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ ভোগকেই

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাকেই লাভ করিবার জন্য যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে বিষয়কেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহারা ব্রহ্মচিন্তার সম্পূর্ণ অনধিকারী, তাহারা যদি বিষয়ের মধ্য দিয়া আত্মচিন্তার কথা বলে, তবে বুঝিতে হইবে তাহা উপাসনা নহে প্রতারণা।

(ক্রমশঃ)

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(৩)

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

আজ দেড়শত বৎসর ধরে হিন্দু শুনে আসছে, তা যেমন বিদেশীদের কাছ থেকে, তেমনি স্বদেশীদের কাছ থেকে—যে আমরা অতি হতভাগা কুসংস্কারী, যুগ যুগান্তর ধরে ত্যাগের কিম্ভূতকিমাকার বল্মীক স্তূপ নির্ম্মাণ করেছি—সেটাকে যেমন করে হ'ক ভেঙ্গে দিতে হবে। কিন্তু দূরবীক্ষণে focus না করলে যেমন আকাশের পর্য্যবেক্ষণ ঠিক হয় না সেই রকম প্রাচীন শাস্ত্র দূরবীক্ষণে চলবে না—ত্যাগের focus আগে ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নিতে হবে। যাকে অবলম্বন করে "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার দস্যুতা, জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, জগতের ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই"—সেই বর্ত্তমান সভ্যতার চশমা এঁটে ভারত গগন পর্য্যবেক্ষণ করতে গেলে কতকগুলো ভুয়ো কুসংস্কারের কুয়াসা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। তার কারণ এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির সাধারণ সংস্কারের যে কিরূপ মেরু ব্যবধান তা আচার্য্য একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। "অন্যান্য দেশের ভাল ভাল ও বড় লোকেরা কোন দস্যু ব্যারণ হইতে তাঁহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি

---

* উদ্ধৃত অংশগুলি পাম্বান, রামেশ্বর এবং রামনাদ বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

হইয়াছে এইরূপ বাহির করিতে পারিলে বড়ই প্রীতি অনুভব করেন। এই সকল ব্যারণ পার্ব্বত্য দুর্গে বাস করিত; সময়ে সময়ে বাহির হইয়া পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুটপাট করিত, এইরূপ দস্যু ব্যারণের সন্তান বলিয়া পরিচিত হওয়া পাশ্চাত্য দেশের বড় লোকদিগের বড় গৌরবের বিষয়। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আমাদিগকে পর্ব্বত গুহানিবাসী, ফলমূলাহারী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ঋষিমুনির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি।"

এই ত্যাগই হচ্চে এই জাতির মেরুদণ্ড। এটা ভেঙ্গে দিলে এ জাত মরে যাবে। এই ত্যাগ বিহীন হয়ে আমাদের শাস্ত্র পড়লে কিছুই বোঝা যাবে না। ভগবৎ কৃপায় যাদের ত্যাগ এসেছে তাদেরই আমাদের শাস্ত্রে অনুরাগ এসেছে। অনুরাগী ব্যক্তি শাস্ত্রের সকল উপাসনার সার দেখতে পান। "সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন, আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করেন, সে প্রবর্ত্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব বোধে সেবা করেন, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।" এখন বসে থাকবার দিন গেছে, মূর্ত্ত ভগবান যে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—এই 'বর্ত্তমানে'র উপাসনায় জীবন পাত করতে হবে। 'প্রভুর কিবা রূপ—কিবা গুণ' বলে বসে থাকা মানে জড়ত্ব। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পাপ স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা—কারণ এতে ছোট আমিটা বেড়ে যায়। যে মনে করে আমি আগে খাব, সকলের চাইতে বড়লোক হব, পৃথিবীর সম্রাট হব, যে মনে করে আমি সকলের আগে স্বর্গে যাব, তাকেই পড়ে থাকতে হয়। কারণ তিল তিল করে প্রতি নিঃশ্বেসের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে হয় তবে অহঙ্কার নাশ পায়—অহঙ্কারের একটু ফেঁসো থাকতে মুক্তির রাজ্যে, ভূমার রাজ্যে কাহারও প্রবেশঅধিকার নাই। ত্যাগের আদর্শ শ্রীবুদ্ধ দেখিয়ে

গেছেন যে. নির্ব্বানের জন্যও যেমন দেহ পাত করতে হবে আবার যদি দরকার হয় তখনি সামান্য ছাগ শিশুর জন্যও হাঁড়িকাঠে মাথা বাড়িয়ে দিতে হবে। যেটাকে সত্য বলে ধারণা হয়েছে তার কাছে সকল লোক মত, সমাজ, সঙ্ঘ আন্তরিকতার সহিত বলি দিতে হবে—অভিসম্পাৎ করতে করতে নয়—আশীর্ব্বাদ করতে করতে। স্বার্থ শূন্য ব্যক্তি বলেন আমার স্বর্গ আমার মুক্তি এখন তোলা থাক, আগে আমি সর্ব্বভূতে বিরাজমান প্রভুর সেবা করেনি—সে তখন সন্ন্যাসী হয়ে শত লাঞ্ছনার গেরুয়া পরিধান করে শত দারিদ্র্যের শছিন্ন কন্থার ভার বহন করে বেড়ায়। ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক বুঝতে হলে দেখতে হবে সেই মহাপুরুষ কতদূর নিঃস্বার্থ, কতদূর প্রেমিক, কতটা ত্যাগ তিনি করেছেন, কতটা বুকের রক্ত তিনি চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে ফেলেছেন। এ না দেখলে বুঝতে হবে সেই মহাপুরুষ পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মীয় আত্মারামের নিকট হতে অনেকদূর সরে দাঁড়িয়েছেন। "যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্ম্মিক, সেই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিক নিকটবর্ত্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি জগতে যত দেব মন্দির আছে, দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।"

কাল ধর্ম্মে এই ত্যাগের দেশে 'যদ্‌ভূমা তৎ সুখমে'র অর্থ হয়েছে অতি স্থূল ভোগ, সাধুতা মানে জড়ত্ব, মুক্তি মানে স্বার্থপরতা, ধর্ম্ম মানে—'রে চণ্ডাল দূরমপসর'। আর কৌতুক দেখ, এই দেশেই ভগবান আমাদের শেখাবার জন্য মানুষ হয়ে আসচেন, জীবের জন্য কেঁদে ধূলায় লুটাচ্ছেন, আচণ্ডালকে কোল দিচ্ছেন।—কেন? কারণ ঐ খানেই ভারতের, জগতের জীবনী শক্তি সুপ্ত। আমরা শুনব না—আমরা বধির, আমরা দেখব না—আমরা অন্ধ। কিন্তু যে কাল ধর্ম্মে আমরা নিজের কর্ম্মফলে জড়ত্ব লাভ করেছি সেই "সুদীর্ঘ রজন

প্রভাত প্রায় বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসান প্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগরিত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত সে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মরূপ হিমালয়ের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে। হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ু স্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থি মাংসে পর্য্যন্ত যেন প্রাণ সঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগরিত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, 'আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।" ভারত প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে "অজ্ঞানান্ধতা বশে অপর স্থানের মলিন প্রয়ঃপ্রণালীর জল পান না করিয়া তাহাদের স্বগৃহ সমীপবর্ত্তী অনন্তপ্রবাহিণী নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জল পান" না করিলে সে মরিবে—সে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে "রাজনীতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য্য হইলেও ধর্ম্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম্ম গেলেই যে ভারতের প্রাণও যাইবে"। দর্শন বল বিজ্ঞান বল, ধর্ম্ম বা নীতি-বিজ্ঞান বল, চরিত্রের তিতিক্ষা, কোমলতা, প্রেম যা কিছু বল সকলেরই আদর্শ দেখিয়েছে প্রথমে ভারত তার আজীবন ত্যাগের মধ্য দিয়ে—মরণকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে।

প্রত্যেক জাতীর একটা জীবনের সার্থকতা আছে। সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে সে সেইটেকে বজায় রাখতে চায়। এই বিশ্বব্যাপী এক ঐক্যতান বাদ্য চলেছে। প্রতি জাতির চিন্তার কম্পন ধারা থেকে এক বিশেষ বিশেষ সুর উঠে সে বাদ্যে মাধুর্য্য বৃদ্ধি করচে। সেই বিশেষ

বিশেষ সুর দিয়ে সেই সেই জাতির জীবনী শক্তি ফুটে বেরুচ্ছে। তাই "অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরাশি উপার্জ্জনের গৌরব, বাণিজ্য নীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতা লাভের অপূর্ব্ব সুখের কথা বলুক—হিন্দু এ সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না।" এখনও সকল তুচ্ছতা উপেক্ষার মধ্যে, সকল দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক নিগড়ের অসহ্য ব্যাভিচার অত্যাচারের মধ্যেও "আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও যে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যারূপ নির্ঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও প্রতিদিন নূতন ভাবে সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্দ্ধমৃত হীনদশাপন্ন পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে"। ভারত গগন নানা মতামতের সুরের কম্পন ধারায় উচ্ছ্বসিত ও কোনটা বেতালা কোনটা ঠিক ঠিক তাল মান লয়ে ঝঙ্কার দিয়ে জাতীয় জীবনে প্রাণস্পন্দনের পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু সকল রাগরাগিণীকে উপেক্ষা করে গর্জ্জে উঠছে ত্যাগমূর্ত্তি ভৈরব—'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'; গম্ভীর মন্দ্রে আহ্বান করছে, বিশ্ববাসীকে পশ্চাতে, দূরে, অতিদূরে সেই অনন্ত অপার ভাগবতী লীলার রাজ্যে—যে রাজ্য মহাপ্রাণ, মহাবীর মহামনীষিগণের অন্তর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—যাহার তুলনায় এ জগৎটা অতিস্থূল মৃত্তিকাস্তূপ মাত্র। ক্রমে দূরে আরও দূরে দূরতম রাজ্যে, অনন্ত কালও যেখানে প্রকৃতির রহস্যাবগুণ্ঠন মোচন করে উঁকি মারতে সাহস করে না সেই অবাঙ্‌মনসোগচরম্ লোকে। "তোমরা আমাদের জাতিকে উৎসাহ উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই বল না, তাহারা এক কাণ দিয়া শুনিবে, অপর কাণ দিয়া তাহা বাহির হইয়া যাইবে।" এখন এই মহান্ ধর্ম্ম আমাদের শিখতে হবে, শেখাতে হবে, আভিজাত্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অস্থি মজ্জা চর্ব্বণকারী দরিদ্র হীন নিম্ন সমাজকে—ছড়াতে হবে ভারতেতর প্রদেশে সে ধর্ম্ম আগুনের মত; যে পবিত্রানলে ভস্ম হবে সকল পুরাতন, জীর্ণ, মোহগ্রস্ত হিংসাভিমান।

কিন্তু বহির্জগতের কাছ থেকে আমাদেরও কিছু শেখবার আছে। বহুকালের জড়তা হেতু আমাদের ভাব মন্দিরে বহু কুসংস্কারের আগাছা জন্মেছে সেগুলোকে নির্মূল করবার জন্য পাশ্চাত্য অপরা বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা আমাদের প্রত্যেক কুটীরে কুটীরে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর ইদানীং যে নবযুগের মহাপুরুষ নিজ কঠোর তপস্যার বলে জগতের সমগ্র আধ্যাত্মিকতা একত্রিত করে এক বিরাট, উদার ধর্ম্মের বিদ্যুদাধার রচনা করেছেন, যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে অপর জড়প্রাণ ভাব সকলকে বিপর্য্যস্ত করে ফেলতে হবে, তার জন্য যে সঙ্ঘ গঠন তাও আমাদের শিখতে হবে পাশ্চাত্যদের কাছ থেকে। "কিরূপে দল গঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে কাযে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যদিগের নিকট ঐ সকল বিষয় কিছু কিছু শিখিতে হইবে।" কিন্তু সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ঐ যে পাশ্চাত্য অপরা বিজ্ঞান ও সঙ্ঘ গঠন প্রণালী যা আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়ে কতকটা উপকৃত হতে চাই—বড়ই ভোগমুখী। ও সাপ যেন আমাদের দংশন করে না বিষ ঢেলে দেয়। সেই জন্য তাকে গ্রহণ কর্ব্বার পূর্ব্বেই ত্যাগের মন্ত্র সাহায্যে তাকে বশ করে তার বিষ দাঁতটা আগে ভেঙ্গে দিতে হবে।

অনেকেই বলে থাকেন যে ঐ ত্যাগের মন্ত্র আউড়ে আউড়ে আমাদের দেশটা চির পদদলিত হয়ে রয়েছে ও থেকে যাবে। কিন্তু পাক্ষান্তরে বলা যেতে পারে এমন ঢের দেশ বা জাতি ছিল এবং আছে যারা ত্যাগের আদ্যাক্ষরটি পর্য্যন্ত শুনে নাই বা জানে না অথচ তারা এই জগৎ রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে পড়েছে বা আরম্ভ করেছে কেন? পৃথিবীর বহু আদিম জাতি ত্যাগ, ত্যাগ করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়নি ভোগ ভোগ করেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। গ্রীক্, রোম, কার্থেজ, ব্যাবিল, ইজিপ্ট ত্যাগ ত্যাগ করতে করতে মরেনি ভোগের অনুসন্ধান করতে গিয়েই মরেছে। আমাদের বোধ হয় যতক্ষণ যে জাতির মধ্যে ত্যাগের লেশমাত্র বর্ত্তমান

ততক্ষন তাদের আয়ু থাকে তারপর যখনই তারা ভোগ সর্ব্বস্ব হয় তখনই তাদের বিদায় নেবার সময় হয়। আর যাদের পাশ্চাত্য বর্ত্তমান ভোগ-বিলাস দেখে চোখ ঝলসে গেছে তাদের আমরা প্রার্থনা করি আর দু-দশ বৎসর অপেক্ষা করে দেখ ইহার ফলাফল কি? দু-চারশ বৎসরের ক্ষণিক ভোগসভ্যতার প্রাসাদ দেখে দশ হাজার বৎসরের অটুট ত্যাগ মন্দির ভেঙ্গে ফেলবার সঙ্কল্পটা কি যুক্তি যুক্ত "মনে রাখা উচিৎ,—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ভোগ সুখই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়জগৎই ভারতবাসীর ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে—তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমে তাহার স্থান নাই—ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ওসব মিথ্যা। ভ্রান্তি—ভ্রান্তি মাত্র—ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।"

কিন্তু কতকটা ভোগ না করলে ত্যাগের চরমাদর্শের প্রথম সোপানেও পা দেওয়া যায় না। শিশুকে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া বাতুলতা। কারণ সে জন্মাবধি সুখের সোনার স্বপন দেখচে—ইন্দ্রিয়ই তার সব। তাকে সংসারের অসারতা বোঝাতে হলে তাদের কিছু ভোগের সুবিধা করে দিতে হবে। একদল লোক ভোগকেই চরমাদর্শ বলে প্রচার করে, সমাজের ক্ষতি ছাড়া উপকার কিছুই কচ্চেন না তেমনি অপর দল জোর করে সন্ন্যাসের আদর্শ ছড়াচ্ছেন—এটাও একটা মস্ত ভুল। ফলে হচ্চে কি না গরিব ভারতের সাধারণ জনসমাজ জন্মাতে না জন্মাতেই সংসারটা অসার বুঝে জড় হয়ে বসে থাকতে আরম্ভ করেছে। তথাকথিত সমাজ নেতারা এখনও যদি একটু তাঁহাদের প্রভুত্বের হাত গুটিয়ে নেন, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের কঠিন বাঁধন একটু শিথিল করে দেন তাহলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হবে। "সেই ভ্রম এই—অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা প্রদান। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু

সকলের এক পথ নহে। তুমি যে সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমারও সেই প্রণালী হইতে পারে না। তোমরা সকলেই জান, সন্ন্যাসাশ্রমই হিন্দু জীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। যে না করে, সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। সংসারের সুখ সমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষ ভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার, তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে—আমরা জানি ইহাই হিন্দুর আদর্শ।"

যেমন সঙ্গীতে একটা প্রধান সুর থাকে যার অনুগত হয়ে অপরাপর সুর গুলো খেলা করে তেম্নি পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি সকল ব্যাপারই রাজনীতির অধীন আর ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞান ভোগ ঐশ্বর্য্য নাম যশ ধন দৌলত সব ধর্ম্মের অধীন। কোনটী সত্য তা ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে। তা সত্বেও অস্মদ্দেশীয় কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি পাশ্চাত্য সভ্যতার নকল জহরত কুড়াতে তাঁদের সকল প্রচেষ্টার প্রয়োগ এখনও করচেন আর সেই আলেয়ার অনুসন্ধানের জন্য এখনও দেশবাসীকে সাগ্রহে আহ্বান করচেন। যারা একেবারে গোঁড়া তাদের একটা মেরুদণ্ড আছে একটা দাঁড়াবার যায়গা আছে কিন্তু নকল-পন্থীদের—অন্তর বাহির সর্ব্বস্ব হীন একটা তাসের বাড়ী করে বাস করবার বাতুলতা মাত্র। যে স্রোতস্বিনী আজ দশ হাজার বৎসর ধরে বয়ে বয়ে কত অনুর্ব্বরা ভূমি সরস করেছে কত পিপাসিতকে তৃপ্ত করেছে তাকে ফিরিয়ে ফের হিমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জল্পনা একটা প্রলাপ মাত্র। "সুতরাং এইটী বেশ স্মরণ রাখবে, তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ সর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয়মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল, যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল—সুতরাং ফল দাঁড়াইল সম্পূর্ণ ধ্বংস।"

এক্ষণে আমাদের এই ধর্ম্মকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য কঠোর পরিশ্রম

করতে হবে। এই কঠোর তপস্যা হতে "প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের বংশধরগণের এই অভূত পূর্ব্ব অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি নিশ্চিত বলিতেছি তাঁহারা পরলোকে আপনাপন স্থান হইতে তাঁহাদের বংশধরগণকে এরূপ মহিমান্বিত, এরূপ মহত্বশালী দেখিয়া আপনাদিগকে মহা গৌরবান্বিত জ্ঞান করিবেন।" আর যিনি শৈবের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, কর্ম্মীর কর্ম্ম, বৌদ্ধের বুদ্ধ, জৈনের জিন, ঈশাহি ও য়াহুদীর আভে, মুসলমানের আল্লা, বৈদান্তিকের ব্রহ্ম, যে বিশ্বনাথ সকল ধর্ম্ম, সকল ভাব, সকল সম্প্রদায়ের প্রভু তাঁহার প্রকৃত মহিমা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই "ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। তাঁহাকে জাগাও, আর নূতন জাগরণে নব প্রাণে পূর্ব্বাপেক্ষা মহা গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে" তাঁহাকে জগন্নাথের অনন্ত সিংহাসনের পদতলে প্রতিষ্ঠা কর।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(ইংরাজীর অনুবাদ)*

প্রিয় ফকির,

একটী কথা তোমাকে বলি—উহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—আমার সহিত তোমাদের আর দেখা না হইতে পারে—নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্য্যন্ত রাখিও না। ধর্ম্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—

* এই পত্র ও পরের পত্রখানি এলাহাবাদ হইতে ৫ই জানুয়ারি তারিখে বলরাম বাবুকে লিখিত পত্রের সঙ্গে লিখিত হইয়াছিল।

মনে পর্য্যন্ত পাপ চিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। নিজে মানুষ হও আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও সাহসী নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই, ইহা ব্যতীত ধর্ম্মের আর কোন মতামত তোমাদের জন্য নহে। যেন কাপুরুষতা, পাপ, অসদাচরণ বা দুর্ব্বলতা একদম না থাকে বাকি আপনা আপনি আসিবে। রামকে কখনও থিয়েটার বা কোনরূপ চিত্তদৌর্ব্বল্যকারক আমোদ-প্রমোদে লইয়া যাইও না বা যাইতে দিও না।

তোমার—

নরেন্দ্রনাথ।

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

প্রিয় রাম ইত্যাদি—

বৎসগণ, মনে রাখিও, কাপুরুষ ও দুর্ব্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার চেষ্টা কর। ইতি—

তোমাদের—

নরেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

গাঁজিপুর

৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আমি এক্ষণে গাঁজিপুরে সতীশবাবুর নিকট রহিয়াছি। যে কয়েকটী স্থান দেখিয়া আসিয়াছি তন্মধ্যে এইটী স্বাস্থ্যকর। বৈদ্যনাথের জল বড় খারাপ, হজম হয় না। এলাহাবাদ অত্যন্ত ঘিঞ্জি—কাশীতে যে

কয়েকদিন ছিলাম দিনরাত জ্বর হইয়া থাকিত—এত ম্যালেরিয়া। গাজিপুরের. বিশেষতঃ আমি যে স্থানে থাকি, জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। পওহারি বাবার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজী বাঙ্গালার মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড় বড় ঘর chimney &c.—(চিমনি ইত্যাদি)। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতিমধ্যে বাবাজির সহিত দেখা হইল ত হইল—নহিলে এই পর্য্যন্ত। প্রমদাবাবুর বাগান সম্বন্ধে কাশী হইতে স্থির করিয়া লিখিব। কা— ভট্টাচার্য্য যদি একান্ত আসিতে চাহে ত আমি কাশীতে রবিবার যাইলে যেন আসে—না আসিলেই ভাল। কাশীতে দুই চারিদিন থাকিয়া শীঘ্রই হৃষীকেশ চলিতেছি—প্রমদা বাবুর সঙ্গে যাইলেও যাইতে পারি। আপনারা এবং তুলসীরাম সকলে আমার যথাযোগ্য নমস্কারাদি জানিবেন ও ফকির. রাম, কৃ—প্রভৃতিকে আমার আশীর্ব্বাদ।

দাস—নরেন্দ্র।

পুঃ—আমার মতে আপনি কিছুদিন গাজীপুরে আসিয়া থাকিলে বড় ভাল—এখানে সতীশ বাবুর বাঙ্গালা ঠিক করিয়া দিতে পারিব ও গগনচন্দ্র রায় নামক একটী বাবু—আফিম আফিসের head (বড় বাবু) তিনি যৎপরোনাস্তি ভদ্র, পরোপকারী ও social সামাজিক ও সৌজন্য পরায়ণ। ইঁহারা সব ঠিক করিয়া দিবেন। বাড়ী ভাড়া ১৫৲।২০৲ টাকা; চাউল মহার্ঘ্য, দুগ্ধ ১৬।২০ সের, আর সকল অত্যন্ত সস্তা আর ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে কোনও ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কিছু expensive —(বেশী পড়িবে) ৪০।৫০ টাকার উপর পড়িবে। কাশী বড় damned malarious (ভয়ানক ম্যালেরিয়া)।

প্রমদা বাবুর বাগানে কখনও থাকি নাই,—তিনি কাছ ছাড়া করিতে দেন না। বাগান অতি সুন্দর বটে, খুব furnished (সাজান গোজান) এবং বড় ও ফাঁকা। এবার যাইয়া থাকিয়া দেখিয়া মহাশয়কে লিখিব।

ইতি—নরেন্দ্র।

পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজির সাক্ষাৎ।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

রামবাবু (রামচন্দ্র দত্ত) স্বামিজীকে সঙ্গে ক'রে ঠাকুরের কাছে ল'য়ে গেছলেন। স্বামিজী ঠাকুরের কাছে যাবামাত্র—ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ভাব হ'লো। রামবাবু বল্লেন—'তোমায় দেখে ভাব হ'য়েছে'। এরপর ঠাকুর স্বামিজীর বাড়ী দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। বলতেন যে, ওকে আমার কাযের জন্য পৃথিবীতে টেনে এনেছি; ঐ একমাত্র ঠিক ঠিক জ্ঞানের অধিকারী। একদিন বুকে হাত দিবামাত্র স্বামিজী বেহুঁস হ'লেন। স্বামিজী চীৎকার ক'রে বল্লেন—'কর কি, কর কি, আমার বাপ্ মা আছে।' ঠাকুর বল্লেন, 'থাক্ থাক্ ঐ পাওয়ার ঠিক্ ঠিক অধিকারী। এর নিজের সংস্কার নয়; বাপ্ মার সংস্কার।'

একসভা লোক ঘরে ব'সে থাক্তো, বড় বড় লোক,—কেশব সেন প্রভৃতি; তাদের সাম্নে বলতেন, 'তোকে পেলে আমি কাউকে চাই না।'

ঠাকুর বল্তেন—'ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, কোনও খুঁত নাই। যেমন দেখ্তে, তেমনি গাহিতে, বাজাইতে, বল্তে-কইতে, বুঝ্তে বুঝাতে। মহা পবিত্র, ছোটকাল থেকে কখন মিছা কথা বলে নাই।'

ঠাকুর কারুর জন্য মা কালীর কাছে—ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাইতেন না। স্বামিজী বল্লেন,* 'আমি জানি তুমি টাকাকড়ির জন্য মা কালীর কাছে কিছু বল্বে না। কিন্তু ভীষ্মের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বাণ ধরতে হ'য়েছিল তেমনি আমার জন্য মা কালীর কাছে বলতে হবে। তোমাকে বলতুম না, কিন্তু কি করি, ভাই বোনের কষ্ট দেখ্তে পারি না।' ঠাকুর খুসী হ'য়ে বল্লেন—তুই কালীর ঘরে যা—

---

* যখন তাঁহাদের সাংসারিক কষ্ট হইয়াছিল।

যা ইচ্ছা তাই চাগে যা।' স্বামিজী কালীঘরে গেলেন, কিন্তু কেমন মন হ'য়ে গেল—স্বামিজী কাঁদ্‌তে লাগলেন, আর বল্‌তে লাগলেন—বিবেক বৈরাগ্য দাও। কাঁদতে কাঁদ্‌তে ফিরে এলেন। ঠাকুর বল্লেন—কি চেয়ে এলি। স্বামিজী—বিবেক বৈরাগ্য চাইলাম। ঠাকুর খুসী হ'য়ে বল্লেন—আমি জানি তোর দ্বারা টাকাকড়ি চাওয়া হবে না।

তারপর সকলের সামনে আনন্দ ক'রে বল্‌তেন দেখ, নরেনের ভাই বোন খেতে পায় না—তাও কালীর কাছে বিবেক বৈরাগ্য চেয়েছে। ওকালতী পড়্‌ছিলেন—ঠাকুর একদিন বল্লেন—দেখ, এতে তোর টাকাকড়ি, গাড়ীঘোড়া হবে কিন্তু ভগবান তো পাবি না। এই কথায় স্বামিজী ওকালতী ছেড়ে দিলেন।

স্বামিজীর প্রাণটা দিনরাত ভগবানের জন্য কাঁদ্‌তো। কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ত না—ঠাকুর বুঝ্‌তে পার্‌তেন। একদিন স্বামিজী খুব জোরে চিৎকার ক'রে কাঁদ্‌ছিলেন। ঠাকুর বুঝ্‌তে পাল্লেন—স্বামিজী কি জন্য কাঁদ্‌ছেন। স্বামিজীকে ডাকিয়ে বল্লেন,—তুই এই জন্য কাঁদ্‌ছিস্। স্বামিজী—হ্যাঁ। তখন ঠাকুর বল্লেন—তোকেই দিব। তুই আগে আমার জন্য খাট। তোর জন্য আমি এতদিন দুঃখ কল্লেম—তুই আমার জন্য দুঃখ কর। আমি যা খেটেছি তার তুই এক আনা খাট—তোকে গদি ক'রে দিব।

স্বামিজী একবার বুদ্ধগয়ায় পালিয়ে গেলেন। গুরুভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত হ'য়ে বলায়—ঠাকুর বল্লেন—কোথাও কিছু নেই; সব এইখানে। স্বামিজী দু'এক দিন পরে ফিরে এলেন।

ঠাকুরের অভাবের পর সকলে স্বামিজীকে বল্‌তেন—ঠাকুর আপনাকে এত বড় বলেছেন, আপনি কি বুঝলেন। স্বামিজী বল্লেন—তিনি বড় বলেছেন আমি সে কথা খুব মানি, কিন্তু আমি এখনত বুঝিনি। আমি আগে বুঝি, তারপর তোমাদের নিয়ে বুঝিয়ে দিব।

গুরুভাইরা সব বাড়ী ফিরে গিছ্‌লেন, স্বামিজী ধ'রে ধ'রে তাদের ফিরিয়ে এনে বল্লেন—তিনি তোদের ভালবাস্‌তেন কি সংসার করবার জন্য!

ব্রাহ্মসমাজে নাটক হ'য়েছিল; স্বামিজী শিব সেজেছিলেন। ঠাকুর ঐখানে ছিলেন। স্বামিজীকে ঐ বেশে নেবে আস্‌তে বল্লেন। স্বামিজী ইতস্ততঃ করছেন দেখে—কেশববাবু বল্লেন—উনি যখন বল্‌ছেন নেবে এসনা। ঠাকুর বল্লেন—দেখ কেশব, তোমার ১টা বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, এর ১৮টি শক্তি আছে। কেশববাবু খুব আনন্দ ক'রে বল্লেন—এতো ভাল কথা, আমিও তাই চাই; নরেন আমার চেয়ে ছোট কেন হবে। স্বামিজীকে খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কোন মানা করেন নাই। তাঁকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াতেন; আর বল্‌তেন—ওকে খাট্‌তে হবে। ঠাকুর স্বামিজীকে—তামাক সাজ্‌তে শৌচের জলাদি দিতে দিতেন না; বল্‌তেন—ওসব কায করবার অন্য লোক আছে। তিনি জান্‌তেন ওঁর দ্বারা বড় বড় কায হবে।

স্বামিজী রাতভোর ধ্যান জপ করিতেন। গান, বাজনায় গুরু-ভাইদের স্ফূর্ত্তি দিতেন। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে স্বামিজীর কাছে গানবাজনা শিখেছিলেন।

অমরনাথ যাত্রা কালে—চড়াই উঠার সময় লাটু মহারাজ স্বামিজীকে বল্লেন, 'আর যাব না।' স্বামিজী মন বুঝ্‌বার জন্য বল্লেন যে 'একে টাকা দিয়ে দে'। লাটু মহারাজ বল্লেন—বেশ, দিয়ে দাও।' তখন স্বামিজী বল্লেন—আমি তোর কি অনিষ্ট ক'রেছি, তুই যখন যা বলছিস্ তাইত করছি।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলে বল্‌তে লাগ্‌ল—ঠাকুর কি পাগলাপনা ক'রে গেলেন! স্বামিজীর কর্ম্মটা চিকাগোয় প্রকাশ পেলে, তখন লোকে বল্লে—ঠাকুরের কথাই ঠিক।

যখন স্বামিজী ভারতে ফিরে এলেন, তখন মিস্ সেভিয়র, গুড্‌উইন্ সাহেব, লাটু মহারাজ প্রভৃতি দেখা করতে গেলেন; মনে মনে ভাবছেন, স্বামিজীর গোটাকতক সাহেব শিষ্য হ'য়ে অহঙ্কার হ'য়েছে। স্বামিজী লাটু মহারাজের মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, হাত ধ'রে বল্লেন—"তুই আমার সেই লাটুভাই, আমি সেই নরেন।' তখন বুঝতে পারলাম স্বামিজীর মানুষ চেন্‌বার শক্তি হ'য়েছে।

স্বামিজী বল্লেন, 'আয় আমরা ব'সে খাই, তুই একপাশে ব'সে যা'; বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথা কচ্ছি, দেখ এরা কেমন হুজুগে'। খাওয়া দাওয়ার পর বল্লেন—দেখ্‌লি ঐ দেশের যত বাজে খবর নিলে, এত কায হ'লো, কার দোহাই দিয়ে হ'ল—তার খবর নিল না। ভাই, আশ্চর্য্য হচ্ছি, আমার দ্বারা এত বড় কায হ'বে আমি জান্‌তাম না।

বিলেত হ'তে আসার ২।৪ দিন পরেই বিলেতের পোষাক ছেড়ে সেই ২৲ টাকা দামের চাদর, ২৷৷• টাকা দামের জুতা ব্যবহার করতে লাগ্‌লেন। এত যে মান সব ছুড়ে ফেলে দিলেন।

স্বামিজীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামিজীর কাছে আস্‌লে আর কিছু না পারলে, দুটা গান শুনিয়ে স্ফূর্ত্তি দিতেন।

গুরু ভাইদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ঠাকুরের নীচেই। যা কিছু গুরু ভাইদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ওঁর দ্বারাই হ'য়েছে।

সকলেই বাড়ী ফিরে গিছলো স্বামিজী ধ'রে ধ'রে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

স্বামিজী আপনার ভাইদের চেয়ে গুরু ভাইদের ভালবাস্‌তেন ও বিশ্বাস করতেন।

অভেদানন্দকে যখন বল্লেন—তুই আমেরিকায় চল। অভেদানন্দ কাঁদতে লাগ্‌ল, আর বল্লে, 'একা কি ক'রে যাব'। স্বামিজী বল্লেন—আমি একা কি ক'রে গিছ্‌লাম। যাঁর মুখ দেখে আমি গিছলাম—তুইও তাঁর মুখ দেখে যা।

আল্‌মোরা পাহাড়ে স্বামিজীকে এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। স্বামিজী দৌড়ে গিয়ে তার হাতে ২৲ টাকা দিলেন। লাটু মহারাজ বল্লেন, 'ঐ লোককে কেন টাকা দিচ্ছ?'

স্বামিজী বল্লেন—ও আমায় অসময়ে ফল খাইয়েছিল; ২৲ টাকা কি বলছিস্ ওরে লেটো, অসময়ে উপকারের মূল্য নেই। *

---

* স্বামিজী পরিব্রাজক অবস্থায় আল্‌মোরা ভ্রমণ কালে আহার

কাঁকুড়গাছিতে স্বামিজী রামবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিছ্‌লেন। রামবাবু তখন পীড়িত। স্বামিজী অনেকের সাক্ষাতে জুতা এগিয়ে দিলেন। রামবাবু কেঁদে বল্লেন—বিলে, কর কি, কর কি? স্বামিজী উত্তরে বল্লেন—'রামদাদা! আমি তোমার সেই বিলে। তুমি যা উপকার করেছ, তা কি আমি ভুলে গেছি?' উভয়েই কাঁদ্‌তে লাগলেন।

মাতৃজাতির প্রতি।

(ব্রহ্মচারী নন্দদুলাল।)

সন্ন্যাসী ছাড়েনি তোমা ভাবি অতি হেয়
হে রমণী, ওগো মূর্ত্তিময়ি সতি!
সন্ন্যাসী এসেছে দূরে হে মহিমময়ি,
বুঝিতে মহিমা পদে লভিতে ভকতি॥
সন্ন্যাসী ভেবেছে তোমা ওগো মাতৃরূপা
জননী ব্যতীত তুমি নহ কিছু আর
ভুলিতে মা অন্যরূপ, দিতে ডুবাইয়া
তোমার করুণাহ্রদে যা কিছু তাহার॥
মায়াময় এ সংসারে থাকিলে জননী
তোমার জননীরূপ ভুলে যে মা যাই
তোমার করুণামূর্ত্তি করে দিশে হারা
অন্ধ আমি—অন্যভেবে তোমাপানে ধাই॥
ভুলে যাই শিশুকাল ভুলি মা কিশোর
প্রমত্ত যৌবন মোরে করে আত্মহারা

বিহীনে মৃতকল্প হইলে—ঐ ফকির কাঁকুড় খাওয়াইয়া স্বামিজীকে প্রাণদান করিয়াছিল।

পশু আমি পশুবৎ করি আচরণ
ভুলে যাই ও অনন্ত করুণার ধারা ॥
দশমাস দশদিন ধরেছ উদরে
বক্ষক্ষীরে পালিয়াছ অধম সন্তানে
চক্ষুষ্মান হৃদিবান সন্তান তোমার
সেই দয়া, সে কথাটী ভুলিবে কেমনে ॥
তাই যায় দূরে সরে ওগো মাতৃজাতি
যত তব আত্মভোলা সন্তানের দল
করিতে সংযত মন হৃদয়ে বাহিরে
তোমার অনন্তরূপ ভাবিতে কেবল ॥
তুমি তার ইষ্টমূর্ত্তি তোমা হীন ভাবা
সে যে তার চিরতরে পতন মরণ
দূর গিরি-গুহা মাঝে নিবিড় বিপিনে
সে যে হৃদে চির তোমা করে মা পূজন ॥
শিব বামে উমা তুমি রাম-বামে সীতা
নারায়ণ-পাশে তুমি কমলা সুন্দরী
তোমার জননীরূপ ধ্যান করে যোগী
ধন্য হয় চিত্ত পায়ে সমর্পণ করি ॥
তুমি মা বিমুখ হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ছার
ভগবান নাহি পারে রাখিতে কাহায়
অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীব কোথা ভেসে যাবে
জগতের কোন্ কোণে কোন অজানায় ॥
কাম-দগ্ধ কলুষিত নয়নে চাহিয়া
সন্ন্যাসী করেনি তব কভু অপমান
চিরদিন মাতৃ আখ্যা দিয়েছে তোমায়
চিরদিন মাতৃ ভাবে বাড়ায়েছে মান ॥
সন্ন্যাসী তোমারে কভু নারী নাহি ভাবে
তুমি দেবী চিরদিন জননী তাহার

নিশিদিন তারা তব কোলের বালক
নিশিদিন আশ্রিত মা, সতত তোমার ॥
তুমি তারে অন্নদানে পুষ্টকর দেবী
আশীর্ব্বাদে দাও আলো তাহার পথেতে
অন্তরে বাহিরে তুমি একমাত্র তার
সে কি তোমা কোনদিন পারে মা ছাড়িতে ॥
তব আশীর্ব্বাদ বিনা বৃথা মা সন্ন্যাস
তোমার করুণা বিনা আর কিছু নাই
এই ভিক্ষা দেহ দেবি, যেন প্রতিরূপে
তুমি বিরাজিত আছ দেখি মা সদাই ॥
যেন আমি গলে যাই যেন ডুবে যাই
তোমার করুণাহ্রদে চিরদিন তরে
সকল কামনা ত্যজি যেন মা সন্ন্যাসী,
তোমার চরণভিক্ষা নিশিদিন করে ॥
ওগো চির প্রীতিময়ি! ওগো নিরূপমা!
তোমার তুলনা মাগো ত্রিজগতে নাই
মহেশের চিন্তা তুমি দুরাকাঙ্ক্ষা মাগো
তব আশীর্ব্বাদ যেন চিরদিন পাই ॥

'মায়ার খেলা'

(শ্রীঅজ)

যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময় বন-বিষ্ণুপুরের বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে একথা বন-বিষ্ণুপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই শুনা যায়। তাঁহার প্রাচীন অট্টালিকার অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ এখন একরূপ অ-ব্যবহার্য্য হইয়া যাইলেও বর্ত্তমানে যে কয়টীতে তিনি বসবাস করেন সেগুলি বেশ শ্রীসম্পন্ন ও নানা পুরাতন আসবাবে পরিপূর্ণ। লোক মুখে শুনা যায় তাঁহার ভগ্ন-জমীদারীর বাৎসরিক আয় এখনও দশ হাজারের ন্যূন নহে। সংসারে তাঁহার নিজের বলিতে একটী বিধবা কন্যা ও তাহার একটী পুত্র সন্তান। ১৩০১ সালে বিষ্ণুপুরে যে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়—তাহার প্রবল আক্রমনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতী-সাধ্বী স্ত্রী-রমাসুন্দরী এবং তাঁহার হরকিশোর ও নন্দকিশোর, উপযুক্ত দুই পুত্র, তাঁহাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। সংসারে দাসদাসী পাঁচ সাত জন থাকিলেও বৃদ্ধ বয়সে সুখ, দুঃ-সুখের জন্য একজন আপনার জন কাছে থাকা সর্ব্বদাই প্রয়োজন, তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যা তারাসুন্দরী ও দৌহিত্রটীকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইয়া নিজের কাছেই রাখিয়া দিয়াছেন। এই দৌহিত্রই এখন তাঁহার ভবিষ্যতের একমাত্র আশা, নয়নের একমাত্র পুত্তলি, তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার নাম রাখিয়াছেন 'হারাধন'। তারাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল—একমাত্র পুত্রটীর নাম একটু দেখিয়া-শুনিয়া বাছিয়া-গুছিয়া রাখিবেন, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার নেহাত পীড়াপীড়িতে তাহা আর হইল না; ঐ সেকেলে 'হারাধন' নামেই অনিচ্ছাসত্বে মত দিতে হইল। রূপ থাকিলে নামে কিছু আসিয়া যায় না। হারাধনের দুখানি টানা চক্ষু, ফুলের পাপড়ির

মত পাতলা দুটী ওষ্ঠ, গোলাপি আভায় রঞ্জিত গণ্ডদেশ, সুগোল বাহুদ্বয়, দুধে আলতায় গোলা অঙ্গরাগ, সর্ব্বোপরি—বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় সুকোমল স্বরলহরী তাহাকে সকলেরই প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। হারাধনের বয়স যখন ছয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া সাতে পড়িল তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন শুভক্ষণে তাহাকে স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন; তারাসুন্দরীর শোক দুঃখময় জীবনের মধ্যে সেই দিন যেন কোন্ সুখ রাজ্যের একটুখানি অমৃত-শীতল হাওয়া ক্ষণিক তাঁহার প্রাণের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জমীদারী সংক্রান্ত কোন কর্ম্মের জন্য একদিন স্থানান্তরে যাইতে হইল। যাইবার সময় তিনি কন্যাকে বলিয়া গেলেন—"মা হারাকে বেশ সাবধানে রাখ্‌বি—আমি পাঁচ সাত দিন 'পরেই ফির্‌ছি।" পিতার যাইবার দুই তিন দিন পরে তারাসুন্দরী একদিন মধ্যাহ্ন আহারের পর 'কৃত্তিবাসি' রামায়ণখানা লইয়া কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে কিয়দংশ অনুচ্চস্বরে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—"দিদিমণি—নায়েববাবু রামসিং দারোয়ানের হাতে চিঠি পাঠিয়েছে—কর্ত্তার ভারি ব্যামো।" তারাসুন্দরী সর্পাহতের ন্যায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"সেকি, ঝি, কৈ চিঠি!" তারাসুন্দরী চিঠি খুলিয়া দেখিলেন—নায়েব বাবু লিখিতেছেন—"দিদিমণি, কর্ত্তার গতকল্য ভোর রাত্রি হইতে আট দশ বার ভেদবমি হইয়াছে। নাড়ী খুব ক্ষীণ। তিনি আপনাদিগকে দেখিতে চাহেন।" তারাসুন্দরী পুত্রকে লইয়া তৎক্ষণাৎ শকটারোহনে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পিতার শেষ আশা রক্ষা করিতে পারিলেন না। গ্রাম প্রবেশের পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলেন—পিতার শেষ চিহ্নটুকু চিতাবক্ষে ধূমায়িত হইয়া নীরব ভাষায় জগতের নশ্বরতা প্রতিপাদন করিতেছে।

পিতার কাল হইবার কয়েক বৎসর 'পরে ক্ষয়কাশে ভুগিয়া ভুগিয়া তারাসুন্দরীর জীবন প্রদীপ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। ডাক্তার কবিরাজগণ তাঁহার জীবনের আশা একরূপ ত্যাগ করিলেন। একদিন রাত্রে নিজের শেষ অবস্থা সন্নিকট বুঝিয়া তারাসুন্দরী মাথার

হাত রাখিয়া পুত্রের মুখ পানে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"বাবা, আমি চল্লাম, তুমি চিরজীবী হও, ধর্ম্মে মতি রেখ।"

কাল ধীরে ধীরে সকলই গ্রাস করে। মাতামহের মৃত্যু যাহা হারাধনের সুকোমল প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল তাহার যন্ত্রণা যেরূপ ধীরে ধীরে তাহার অন্তর হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল, প্রাণাধিক, প্রিয়তমা জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপা তাহার মাতার নিবিড় শোক ছায়াও তাহার হৃদয় হইতে সেইরূপ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। হারাধন কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। যৌবনের প্রবল জোয়ার আসিয়া তাহার ক্ষীণ শুষ্ক-প্রায় জীবন-প্রবাহ কানায় কানায় ভরাইয়া তুলিল। সে বুঝিল জগত শুদ্ধ দুঃখময় নহে,—বিচ্ছেদ, শোক, তাপ কেবলই এখানে রাজত্ব করে না—উহাদের কঠোর আচরণের মধ্যে আছে মাধুর্য্য, আছে মিলন আর মন্দাকিনীর ধারায় আছে সুখের অনন্ত প্রবাহ। তাহার মাতামহ ও মাতার মৃত্যুর পর যে গৃহ এতদিন শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ থাকিত—আজ তাহা অসংখ্য প্রিয়তম বন্ধুর দিবারাত্র গমনাগমনে সদা প্রফুল্ল, সদা হাস্যময়। হারাধন এখন অভিভাবক শূন্য, এক কথায়—স্বাধীন। তাহার এই উদ্বেলিত যৌবন প্রবাহের বেগ নিয়মিত করিতে পারে এমন চেষ্টা কাহারও নাই। দুইবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া সে লেখাপড়া ত্যাগ করিল। বিদ্যাশিক্ষা এতদিন তাহার অভীপ্সিত বস্তুর পূর্ণরূপ চরিতার্থতার বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ ছিল, এখন সে বাধাও বিদূরিত হইল। বৃদ্ধ নায়েব রামহরি ওরফে 'হাবলবাবু', হারাধনকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি সুযোগ পাইলেই হারাধনকে অনেক বুঝাইতেন—সংসার কর্ম্মে মনযোগী হইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতেন, কিন্তু হারাধন বলিত—"হাবলবাবু, জমীদারীর কাজ, অতি নীচ কাজ, উহা আপনিই দেখিবেন—কেবল মাসের প্রথমে আমায় খরচের টাকাটা দিলেই হইল।" রামহরি—অতি মনযোগের সহিত জমীদারীর সমস্ত কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি অতি বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাকে বড় চটিতে দেখা যাইত না—কিন্তু

হারাধনের প্রধান অন্তরঙ্গ, চতুর পরিতোষ রামহরিকে চটাইবার একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। রামহরি—কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন এবং তদনুযায়ী স্থূল উদর তাঁহার অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধন করিত। পরিতোষ তাঁহার উদরে হস্তার্পণ করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করিত—"কি হাবলবাবু কেমন আছেন?" তখন রামহরির ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। তাহার একটী কারণও ছিল। বৃদ্ধ নায়েবের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাহার উদরে হস্তার্পণ করার জন্য তাহার স্থূল শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। একদিন রামহরি বাহিরের দলানে বসিয়া নিবিষ্ট মনে জমীদারী সংক্রান্ত খাতাপত্র দেখিতেছেন। অন্যান্য কৰ্ম্মচারীগণও স্ব স্ব কৰ্ম্মে নিযুক্ত—এমন সময় পরিতোষ আসিয়া বৃদ্ধ নায়েববাবুর উদরে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হাবলবাবু, কেমন আছেন?" তদ্দৃষ্টে অন্যান্য কৰ্ম্মচারিগণ হো, হো, করিয়া হাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ নায়েব ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যারে পরিতোষ, তোর বাপ খুড়ো আমার তাঁবের চাকর, আর তুই কিনা যখন তখন আমার সঙ্গে রসিকতা করিস? আমি কি তোর এয়ার? হারার জন্য আমার মানইজ্জত সব গেল। আজ হতে যদি আমি তার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসি তবে আমার নাম রামহরি ঘোষ নয়।" এই বলিয়া বৃদ্ধ নায়েববাবু সেই স্থান চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইলেন। বৃদ্ধ নায়েবের যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীও চঞ্চলা হইলেন। বৃদ্ধ নায়েবের ভয়ে নিম্নস্থ কৰ্ম্মচারিগণ বড় কিছু করিতে পারিত না—এক্ষণে তাহারা নির্ভয়ে দিন দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ করিল। হারাধনের জমীদারী বাকি খাজনার দায়ে একে একে নিলামে উঠিতে লাগিল। হারাধনের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধেও সত্যমিথ্যা অনেক কথা লোকমুখে শুনা যাইত। পাড়ার একটী দরিদ্রা ব্রাহ্মণ বিধবা হারাধনের সংসারের সমস্ত কাজ কৰ্ম্ম ও পাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, তাঁহার সুন্দরী যুবতী কন্যা গিরিবালা বিধবা হইয়া শ্বশুরালয় পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক মাতৃ ভবনে আসিয়া বাস করিতেছিল। কেহ কেহ কাণা ঘুষা করিত তাহার উপর হারাধনের কু-দৃষ্টি পড়িয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় গিরিবালা গ্রামের বহিঃস্থিত দিঘী হইতে জল লইয়া ফিরিতেছে। তখন

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গোধূলির শেষ আলোকরশ্মির সহিত মিশ্রিত হইয়া এক নবরূপ তরঙ্গের সৃজন করিতেছিল। সে রূপে চাঞ্চল্য বা চিত্ত বিক্ষেপকর মাদকতা ছিল না—ছিল একটী ভাবের প্রেরণা যাহা সেই অপূর্ব্ব বিশ্বশিল্পীর অনুসন্ধানে চিরদিন মানব মনকে প্রবুদ্ধ করিয়া থাকে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় শাল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিজন পথ ধরিয়া গিরিবালা সংসারের সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে দেখিতে পাইল একটা অস্পষ্ট ছায়ার মত কি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে দেখিল উহা আর কেহ নহে—স্বয়ং হারাধন। হারাধনকে গিরিবালা ভাল করিয়া চিনিত। এই অসময়ে তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া গিরিবালার অন্তঃস্থল একটী অব্যক্ত ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিল। হারাধন মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিয়া গিরিবালার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। গিরিবালা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"হারাদাদা এ সময় কোথায় যাচ্ছেন? হারাধন বলিল—সে কথা এখন থাক, গিরি জান, আমি তোমার কে?

গিরিবালা বলিল, 'তা, আর জানিনা হারা দাদা, আপনার খেয়েই ত মা আমি বেঁচে আছি।'

হারা বিজড়িত কণ্ঠে—'না, গিরি, তুমি আমার—'

বলিতে বলিতে গিরিবালার বস্ত্রাঞ্চল ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। গিরিবালা ভয়ে পিছাইয়া গিয়া আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া বিপদের কাণ্ডারী শ্রী-মধুসূদনকে স্মরণ করিল।

অসহায়া—বিধবার করুণ প্রার্থনা শ্রীভগবানের কর্ণগোচর হইল। একটী জটাজুটধারী সন্ন্যাসী চকিতের মধ্যে আসিয়া হারাধনের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। হারাধন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'সন্ন্যাসী আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও,—ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের সম্মুখে দাঁড়াইলে প্রমাদ ঘটিবে।' সন্ন্যাসী শান্ত ভাবে উত্তর করিল, 'বাবা, তুমি শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখিতে হয়—তাহা কি তুমি জান না? বৎস, পাপের প্রেরণায় কি গর্হিত কার্য্য করিতে যাইতেছ; একবার ভাবিয়া দেখ।' হারাধন ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, 'তোমার নিকট

তত্ত্ব উপদেশ লইবার জন্য আমি আসি নাই। তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।' সন্ন্যাসী কোন উত্তর না করিয়া বিদ্যুতবেগে হস্ত-স্থিত শূল দ্বারা হারাধনের মস্তকে আঘাত পূর্ব্বক তাহাকে ভূপাতিত করিলেন। গিরিবালা তখন নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ দেখিয়া কৃতজ্ঞপূর্ণ-হৃদয়ে সন্ন্যাসীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা, তুমি আমার পিতা।' সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া উত্তর করিল, 'মা, আমি কে? শ্রীহরিই আজ এই নর-পিশাচের হস্ত হইতে তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।' কিয়ৎক্ষণ পরে হারাধন চৈতন্য প্রাপ্ত হইল, সে উঠিয়া দেখিল—গিরিবালা নাই, সন্ন্যাসীও নাই, কেবল বায়ু-তাড়িত শাল বৃক্ষগুলি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে প্রমথ দলের মত তাহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে।

* * * *

বন-বিষ্ণুপুরের চতুর্দ্দিকে যে শাল বন দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অসংখ্য সুগঠন দেব মন্দির দেব-দ্বিজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সাধু-সন্ন্যাসীগণের আশ্রয় স্বরূপে এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী উহাদের মধ্যে একটীতে বাস করিতেন। গিরিবালা সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া কখনও কখনও সুযোগ ও সুবিধা মত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। তাহার সংসার-তাপ-দগ্ধ হৃদয় অল্প সময়ের জন্যও সন্ন্যাসী মুখ নিঃসৃত ভগবদ্গুনানুকীর্ত্তন রূপ অমৃত-বারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। স্বামী-সুখবঞ্চিতা দরিদ্রা বালবিধবা গিরিবালা বুঝিয়াছিল সংসার কি, উহার সুখ কত ক্ষণ-ভঙ্গুর তাই সংসার যবনিকার অন্তরালে যে অমৃত নির্ঝরের সে এতদিন সন্ধান করিতেছিল ভগবৎ-কৃপায় সন্ন্যাসীর নিকট সে তাহা পাইয়াছে। তাই গিরিবালা সন্ন্যাসীকে প্রাণাধিক ভালবাসিত। সে ভালবাসার মধ্যে আবিলতা ছিল না—ছিল একটী শুদ্ধ প্রেমের বন্ধন, যাহা ক্ষীণ হইলেও শ্রীভগবানকে ভক্তের নিকট চিরতরে বাঁধিয়া রাখে। একদিন সন্ধ্যার পর গিরিবালা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে গিয়া উপনীতা হইল। সন্ন্যাসী রামায়ণ হইতে 'সীতাবর্জ্জন' উপাখ্যান পাঠ করিয়া তাহাকে

শুনাইতে লাগিলেন। এমন সময় কি একটা শব্দে তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল; তাঁহাদের মনে হইল যেন কুটীর দ্বার বাহির হইতে কে বন্ধ করিয়া দিল। গিরিবালা উঠিয়া গিয়া দেখিল যে বাস্তবিকই উহা বাহির হইতে বন্ধ। তখন সে আকুলিত হৃদয়ে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, এখন উপায়?' সন্ন্যাসী নিরুদ্বেগ অন্তরে প্রশান্ত বদনে উত্তর করিল,—"উপায় আর কি মা, 'চক্রের' চক্রী' শ্রীহরিকে স্মরণ কর, তিনিই একমাত্র উপায়।' কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কাটিবার পর ক্ষুদ্র গবাক্ষ দ্বার দিয়া সন্ন্যাসী ও গিরিবালা উভয়ে দেখিতে পাইল—বহুলোক কোলাহল করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। শুনিতে পাইল কে একজন বিকটস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছে। 'মণ্ডল মহাশয়, শয়তান ও শয়তানীটাকে পুড়াইয়া ফেলুন।' কণ্ঠস্বরে গিরিবালা বুঝিতে পারিল উহা আর কেহ নহে—স্বয়ং হারাধন। ক্ষিপ্তপ্রায় জনস্রোত দ্রুত গতিতে মন্দির বেষ্টন করিয়া ফেলিল। মণ্ডল মহাশয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন—সন্ন্যাসী প্রশান্ত-ভাবে উপবিষ্ট তাঁহার সৌম্য মুখমণ্ডল ক্ষিপ্তপ্রায় পল্লিবাসিগণের সকল প্রচেষ্টায় যেন উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। আর গিরিবালা—হত-ভাগিনী গললগ্ন-কৃতবাসে, যুক্ত করে উর্দ্ধনেত্রে দণ্ডায়মানা—তাহার প্রাণ-পক্ষী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া বহুক্ষণ যেন কোন অসীমের উদ্দেশ্যে উড়িয়া গিয়াছে। হারাধনও তাহার প্রধান অন্তরঙ্গ পরিতোষ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গিরিবালার দীর্ঘ কেশপাশ ধরিয়া এবং সন্ন্যাসীকে গললগ্নকৃতবাসে মন্দির হইতে বাহির করিল। তখন অসংখ্য উন্মত্ত পিশাচবৎ পল্লিবাসী তাহাদের উভয়কে আক্রমণ করিল। হারাধন, গিরিবালার আলুলায়িত কেশ পাশ আকর্ষণ করিয়া অতি নির্দ্দয়ের মত পাদুকাঘাত করিতে লাগিল এবং 'বক-ধার্ম্মিক' 'লম্পট' 'শয়তান' প্রভৃতি গালিবর্ষণের সহিত অবিরাম বারিধারার ন্যায় অজস্র মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাত সন্ন্যাসীর পবিত্র অঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। মণ্ডল মহাশয় কিঞ্চিৎ দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া সকলকে অতঃপর ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি

কয়েকজন প্রচীন ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন। 'আগামী কল্য হইতে গিরিবালা আজীবন জাতঃপতিত থাকিবে; এবং সন্ন্যাসীকে আদেশ করা হইল অদ্য রজনীতেই তাহাকে বন-বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। নিশার প্রভাতে তাহাকে এস্থানে দেখিতে পাইলে তাহার পক্ষে বিষম প্রমাদ উপস্থিত হইবে।' সন্ন্যাসী সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

(ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দ।*

(প্রসাদ)

জ্ঞানের আদর্শ তুমি মহান হইতে মহীয়ান,
ভক্তির আদর্শ তুমি মহাশক্তি বিগলিত প্রাণ।
নরের আদর্শ তুমি ধন্য এই বঙ্গভূমি,
তোমারে জঠরে দিয়ে স্থান॥
তুমি ছিলে তুমি রবে, তুমি আছ এই ভবে
বিশাল আকাশ শিরে নিত্য সূর্য্য তুমি ভাসমান!
জাগালে জাতির প্রাণ মোহ হ'ল অবসান,
বিবেক-আনন্দ স্বামী!—
অনন্তে ছুটুক তব গান॥

* গত ১লা মার্চ্চ স্বামীজির জন্মোপলক্ষে ষ্টার থিয়েটারে সাধারণ জনসভায় গীত।

নববর্ষ।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

কত আশা ও উদ্বেগ উল্লাস ও নৈরাশ্যে দ্রুতস্পন্দিত হৃদয় লইয়া আজ বাঙ্গলা দেশ বৈশাখের প্রথম প্রভাতে জাগিয়া উঠিল! বিষাদ-খিন্ন শঙ্কা-কাতর বাঙ্গালী জীবনের ভূম্যবলুণ্ঠিত মহিমা আজ না জানি কাহার দিব্য স্পর্শে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে—এসো নববর্ষ! তোমার উগ্র-উজ্জ্বল রৌদ্রালোকের পুলকবন্যা বাঙ্গালীর জীবন হইতে সমস্ত জড়ত্ব ও অপবাদের কালিমা ধৌত করিয়া ফেলুক!

এসো নববর্ষ, আমরা জাগিয়াছি। বাঙ্গালার পল্লী-প্রাঙ্গণের ধূলি-তলে বসিয়া তোমার আহ্বান অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। বিনম্র শ্রদ্ধায় প্রদত্ত বাঙ্গালী হৃদয়ের এ অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর। আজ আর আমরা পুরাতনের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনাস্তূপ স্কন্ধে বহিয়া লজ্জাবনত শিরে তোমার দুয়ারে কুণ্ঠিত করাঘাত করিতেছি না। আজ আমরা অতীতের পরি-তাপ স্মৃতির অসহায় দৌর্ব্বল্য বিস্মৃত হইয়া তোমার ভাণ্ডারে যা কিছু নূতন, যা কিছু মহান তাহাই অগৌরবে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এখন তুমি অকৃপণ করে তোমার ভাণ্ডার উন্মুক্ত কর, আমরা মনুষ্যত্বের সমান উত্তরাধীকারসূত্রে উহা লুটিয়া লইব।

* * * *

যতই দিন গিয়াছে বাঙ্গালীর জীবনসমস্যা ততই জটীল হইতে জটীলতর হইয়াছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন সমস্যার পর সমস্যায় বাঙ্গালী জীবনকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়াছে। এক কথায় একটা জাতির অদৃষ্টে যত রকম দুর্ভাগ্যের কল্পনা করা যাইতে পারে বাঙ্গালীর ভাগ্যে একে একে সবই ঘটিয়াছে। সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী আজ মরণের মুখে দাঁড়াইবা মাত্র যেন তাহার চমক ভাঙ্গিয়াছে সহসা এই পতিত জাতি (মরিব না) বলিয়া মরিয়া হইয়া ফিরিয়া

দাঁড়াইয়াছে! তন্দ্রাক্লান্ত অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে আর সে অসম্ভব সৌভাগ্যের সুখস্বপ্নের নেশায় অভিভূত থাকিতে লজ্জাবোধ করিতেছে—সে আজ পূর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে নিজের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে চাহে।

বাঙ্গালী জানে সে অক্ষম, দুর্ব্বল, দীন—তাহার অন্ন নাই বস্ত্র নাই। প্রত্যহ শূন্য উদর উভয় হস্তে চাপিয়া সে জীর্ণ মলিন শয্যায় পড়িয়া অদৃষ্টকে ধিকার দেয়। তাহার সন্তান বুভুক্ষু, নারী বিবস্ত্রা—এই পৃথিবীতে আজ তাহার মত অক্ষম কে? এই অক্ষমতার অভিশাপগ্রস্থ জীবন আজ এত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে যে ইহার একটা আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটাই বাঙ্গলাদেশ হইতে লুপ্ত হইবে। বোধ হয় বাঙ্গালার ভাগ্য বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ—তাই বাঙ্গালী জীবনের একটানা ক্রমাবনতির স্রোতে আজ জোয়ার আসিয়াছে! পরিস্ফীত ভাবোচ্ছ্বাসের নবসঙ্গীতে দিক মুখরিত করিয়া বাঙ্গালী-জীবন আজ উজান পথে আনাগোনা করিবে! এতদিনে বুঝিবা নবযুগ প্রবর্ত্তকের বাণী বাঙ্গালী-জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিতে চলিল—অন্ধগণ একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ!

* * * *

হে নববর্ষ, তোমার উজ্জ্বল প্রভাত আলোকে আজ জন্মালস বাঙ্গালীর সম্মুখে একি অভিনব সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! প্রকৃতির ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গনে যেখানে জগতের সমস্ত মনীষী মহাপুরুষ স্ব স্ব অক্লান্ত চেষ্টার ফল রাখিয়া গিয়াছেন, মনুষ্যত্বের সেই বিপুল কর্ম্মশালায় ভগবান যে বাঙ্গালীর জন্যও উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এতদিন বাঙ্গালী তাহা বুঝিতে পারে নাই কেন? প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে নবযুগ প্রবর্ত্তক আচার্য্য বিবেকানন্দ ভৈরবমন্দ্রে বাঙ্গালীকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন; সেদিন সে আহ্বান শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহার কেমন মতিভ্রম হইয়াছিল, সে পথ খুঁজিয়া পায় নাই। নানাপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া এই সুদীর্ঘকাল সে কাতর ব্যথায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়াছে।

যাক্ অতীতের কথা—দুর্দ্দিনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মাথার উপর যে

কোন অজ্ঞাত বজ্র উদ্যত করিয়া রাখুক না কেন, এসো বাঙ্গালী আজ তুমি নিস্তব্ধ জড়ত্বের সুপ্তিশয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ-কোটর হইতে নির্গত হও, নির্ভীক মস্তক উন্নত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর, নব-বর্ষের নূতনত্বকে সার্থক ও সফল করিয়া তোলো! বিনা চেষ্টায় অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যস্তূপ কল্পনা করিয়া লুব্ধ হইও না, স্বার্থান্ধ প্রতিদান প্রত্যাশার ছলনায় ক্ষুব্ধ হইও না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবৈষম্যে বিরক্তি-বিকৃত চিত্তে বিমুখ হইও না, আজ নববর্ষের প্রথম প্রভাতে নবযুগের দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্যকে দ্বিধা সঙ্কোচ ও নৈরাশ্য দিয়া খর্ব্ব ও খণ্ডিত করিও না—ইহাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ ও স্বীকার কর।

* * * *

পুরাতনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই যে আর একটী নববর্ষ আজ প্রাতঃসূর্য্য করে আমাদের সম্মুখে ঝলমল করিয়া উঠিল ইহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যকে ইহার পরম প্রয়োজনকে যেন আমরা নিবিড় ভাবে অনুভব করি। ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুমহান প্রয়াস বাঙ্গলাদেশের বক্ষেই প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই অসমাপ্ত কার্য্য পুনরায় নবউদ্যমে আরম্ভ করিবার জন্য বাঙ্গালীকে আজ ভগবান পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন, অতএব যে শ্রদ্ধায় যে নিষ্টায় যে আত্মবিসর্জ্জনে সেই মহান ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে তাহা যেন আজ উদ্যত ও প্রস্তুত করিয়া রাখি। বিঘ্নবহুল পথের সুদুর্গম বন্ধুরতা যেন আমাদের গতিবেগ প্রতিহত না করিতে পারে—অনাগত ভবিষ্যৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। মানুষের জন্মগত, জাতি-গত ও ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বৈচিত্র্য, মতবৈচিত্র্যকে খর্ব্ব বা ক্ষুণ্ণ না করিয়া আধ্যাত্মিকতার এক সার্ব্বজনীন ভিত্তির উপর হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈনের সমন্বয় সাধন। প্রত্যেক মানুষই স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব বিবেকানুমোদিত পন্থায় উন্নততর জীবন যাপনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইবে—এই আদর্শ বাঙ্গালাদেশ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাইয়াছিল—ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব বাণী। আর বাঙ্গালীর দ্বারাই এই কার্য্য আরব্ধ ও সুসম্পন্ন হইবে বিবেকানন্দ ইহা বিশ্বাস করিতেন।

তাই মহাপুরুষ বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এই কথাটুকু একান্ত বিনীত ভাবে নববর্ষের প্রথমেই বাঙ্গালীর হৃদয়ের দ্বারে বুদ্ধির দ্বারে নিবেদন করিতে চাই। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃত হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে শুধু তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। উত্তেজনাক্ষুব্ধ হৃদয়কে সংযত করিয়া যদি এই সাধনায় আমরা প্রবৃত্ত না হই তাহা হইলে নববর্ষের সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয় সুরাসুরের মিলিত মন্থনে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে আবার গরলও উঠিতে পারে! অতএব বাঙ্গালী আজ আত্মস্থ হও ক্ষুদ্র স্বার্থে ক্ষুদ্র দম্ভে ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যায় মজিয়া একটা জাতির অদৃষ্ট লইয়া আর নির্ল্লজ্জ কন্দুকক্রীড়া করিও না! স্বার্থান্ধ অল্পবিশ্বাসী ত্যাগের মহিমাময় গৈরিক দীপ্তিতে আজ ভারতের কল্যাণ-পথ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—প্রবৃত্তির চাপাল্য-বিভ্রান্ত হইয়া আর অসার ভোগবাদের প্রলাপ বকিও না। আজ বর্ষারম্ভের প্রথম প্রভাতে শুচিস্নাত বাঙ্গালী সাধক পুরাতন বর্ষের অক্ষমতার লজ্জা অপবাদের গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিয়া যদি অনুদ্ধত শৌর্য্য অবিচলিত রাখিয়া কর্ম্মেপ্রবৃত্ত হইতে পার, এবং "চালাকী দ্বারা কোন মহৎকার্য্য হয় না" বিবেকানন্দের এই অমূল্য উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা না হারাও তাহা হইলে এবারকার আয়োজন কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। আগামী বর্ষের প্রত্যেকটী দিনের তরুণ সূর্য্যালোক তোমাদের অবদানগুলিকে কল্যাণ স্পর্শে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

হৃদয়বান বাঙ্গালী যুবক যাহাদিগকে বিবেকানন্দ তাঁহার চিন্তাজগতের যৌবরাজ্য প্রদান করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন, তাহাদের উপর সহসা তো বিশ্বাস হারাইতে পারি না। তাই আজ আশামুগ্ধ হৃদয়ে বর্ষারম্ভকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া বলিতেছি হে নববর্ষের প্রভাত! তোমার আলোক অঙ্গুলির উজ্জ্বল ইঙ্গিত নব্য বাঙ্গালী সাধককে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করুক।

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(৫)

(শ্রীমতি সরলাবালা দাসী)

বর্ত্তমানের মোহ।

এই যে সঙ্গ বা আসক্তি বা স্বার্থানুসন্ধিৎসা কৃপণতা, ভাবিয়া দেখিলে, ইহা কেবল বর্ত্তমানের মোহ। বর্ত্তমানের মোহ, মহান্ মানবকে 'ক্ষুদ্রত্বের ভাবে বিভাবিত করে; মৃত্যু ভীতিরও ইহাই মূল-হেতু। মানুষ যদি বর্ত্তমানের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে তবে সে তাহার নিজের অন্তরের গভীরতা বুঝিতে পারে না, নিজের মহত্ব নিজেই উপলব্ধি করিতে পারে না। 'বর্ত্তমান সময় সাময়িক লোকের সঙ্গ ও তৎসম্বন্ধীয় ব্যবহারিক জ্ঞানেই যে সন্তুষ্ট, সে দূরদর্শন ক্ষমতা হারায়, ভাবরাজ্যে সে পল্লবগ্রাহী হয় মাত্র। যদি বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত,—যে মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতেছে, তাহাই জীবনের ভিত্তি হইত, তাহা হইলে জীবন অসার ও মৃত্যুতেই ইহার পরিসমাপ্তি হইত। কিন্তু ইতিহাস আমাদের জানায়, "এই যে বর্ত্তমান" ইহা অতীতের ফল স্বরূপ, অতীতে ইহার মূল রহিয়াছে। অতীত মৃত হয় নাই, বর্ত্তমানের মধ্যেই জীবিত রহিয়াছে, হয় তাহা ভার-স্বরূপ হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কল্পিত কার্য্যে বাধা দেয়, নতুবা আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে উত্তেজিত করে। হয় এই অতীত আমাদের উপর প্রভুত্ব করে, অথবা আমাদের উন্নত কর্ম্ম-সাধনে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে "প্রেরণা" স্বরূপ হয়। আর্য্যদর্শন প্রারব্ধ মানেন, আবার পুরুষার্থও স্বীকার করিয়াছেন, ইহার ভাবার্থ এই যে, অতীত বর্ত্তমানের মধ্যেই আছে কিন্তু আমরা বর্ত্তমানের কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে নিশ্চয় নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারি, এবং ভবিষ্যতের জন্য মহান কর্ম্মের বীজ বপন করিয়া যাইতে

পারি, পূর্ব্বাচরিত ভ্রম সংশোধন করিতে পারি, এবং অতীত মহত্ত্বের বীজ বর্ত্তমানের বারিসিঞ্চনে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিতে পারি।

ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা অনন্তকালের ক্ষণিক ও সনাতন এই উভয় রূপের পার্থক্য কতকটা বুঝিতে পারি। ইতিহাসের অনেক ঘটনা সেই যুগের সাময়িক অবস্থা চিন্তাপ্রাণালী প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, পরের যুগে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, নূতন যুগের আবির্ভাবে সমাজের অবস্থা, লোকসমূহের আচার ব্যবহার ও চিন্তা প্রণালী নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! কিন্তু সেই যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, যাহা সর্ব্বদেশের ইতিহাসে সর্ব্বকালে প্রাণ স্বরূপে বিরাজ করিতেছে। সনাতন সত্য এইরূপে দেশকালকে অতিক্রম করিয়া অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে একই সূত্রে বন্ধন করিতেছে।

বিপুলা পৃথিবীতে মানবজাতির মধ্যে বহু ধর্ম্মমত বর্ত্তমান আছে, নানা দেশে, নানা জাতিতে, নানা যুগে মহাপুরুষ বা অবতারগণ আবির্ভূত হইয়া মানব সমাজে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, সেই সকল ধর্ম্মের একমাত্র সারতথ্য, মৃত্যুকে অতিক্রম করা। যাজ্ঞবল্ককে, মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ভগবন্ ধনরত্ন পূর্ণা সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হয়, আমি কি তাহাতে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিব?" মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নে সমস্ত মানবজাতির অন্তরের ব্যাকুলতা ব্যক্ত হইয়াছে। অবসান ভীতি নিরন্তর মানবচিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সুখ যাইবে, সম্পদ যাইবে, মান যাইবে, প্রতিষ্ঠা যাইবে, প্রাণ যাইবে দিবা-রজনী এই ভয়। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া মানুষ ভয়ে লোকের উপাসনা করে, রাজার উপাসনা করে। এমন কি ভগবানেরও উপাসনা করে। মানব-বুদ্ধি বর্ত্তমান জগতের সীমার পার কল্পনা না করিতে পারিয়া ভয়ার্ত্তের অবলম্বন স্বরূপ ভগবান কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু ভয়ের কল্পনা হইতে সৃষ্ট ভগবানও দণ্ডদাতা রূপে কল্পিত হন। মৃত্যুর সিংহাসন পৃথিবীর নিম্নস্তরে অন্ধতামস গর্ভে নহে, মানব বুদ্ধিতেই অবসান ভীতিরূপে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে।

(৬)

মৃত্যু-বরণে মৃত্যু বারণ।

মানুষ জন্মগত সংস্কারে মৃত্যুভীতির উত্তরাধিকারী বাইবেল বলেন আদম ও হবা জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়া পাপ ও মৃত্যুর অধীন হইয়াছিল। এক কথায় ভয়ই মৃত্যু এবং ভয়ই পাপ। আর সে ভয়ের উৎপত্তি কোথায়, না জ্ঞানবৃক্ষের ফলে। যুগে যুগে অবতারগণ মৃত্যুভীতিপরায়ণ মানবগণকে নানাভাবে অমরত্বের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; নানা-ভাবে উদ্বোধিত করিয়া বলিয়াছেন "উঠ, জাগো, তোমার নিজ শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাত ও প্রাপ্ত হও।" কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্ব বোধ বুদ্ধিলভ্য নহে, কেননা বুদ্ধিতেই মৃত্যুরবীজ নিহিত রহিয়াছে। তবে কি যে সকল প্রাণীর বুদ্ধি বিকশিত হয় নাই তাহারাই অমরত্বের অধিকারী? তাহাও নহে। মৃত্যুভয়ের সহিত অপরিচয় অমরত্ব নহে, মৃত্যুভীতিকে অতিক্রম করাই অমরত্ব। চিন্তাশক্তি বুদ্ধি অথবা মনন করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মানুষ প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মনুষ্য নামের সার্থকতা তাহাতেই নহে, মনও তাহাকে আপন সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারে না, মনের সাহায্যেই মনের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে বলিয়াই মানব নামের সার্থকতা।

গীতা বলেন—

> "ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ।
> মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্যোবুদ্ধে পরতস্তু স।"

'ইন্দ্রিয়গণকে দেহাদি জড়পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই সেই আত্মা।' পরিণামবাদের সহিত গীতার এই উক্তিটী মিলাইয়া লইলেই দেখা যায়,—প্রথমে ইন্দ্রিয় বোধ হীন প্রাণী, ক্রমশঃ কর্ম্ম চেষ্টায় তাহাতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, ক্রমে মন পরে মন হইতে বুদ্ধি বিকশিত হইয়াছে, পরিণামবাদ এই পর্য্যন্তই বলিয়াছেন, "যোবুদ্ধে পরতস্তু সঃ" বলিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

উদ্দালক মুনির পুত্র নচিকেতা মৃত্যুর নিকট অমরত্বের তত্ব অবগত হইয়াছিলেন*। যীশু আদমের সন্তানগণকে এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন "যে কেহ আমার পশ্চাতে (অমরত্বের পথে) আসিবে, সে আপন ক্রুশ বহন করুক, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকেই অমৃতপদ বলিয়াছেন।

নচিকেতার উপাখ্যানে আমরা বিশেষ করিয়া তিনটী শিক্ষা পাই; প্রথম 'এই যে অন্তরে শ্রদ্ধার উদয় হইলে মানব আর মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকে না, যমপুরীতে গিয়া যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও তাহার ইতস্ততঃ ভাব হয় না। দ্বিতীয়, এই যে, সেই শ্রদ্ধাসম্পন্নবীর, যিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও সাহসী, তিনি মৃত্যুর দ্বারা নিগৃহীত না হইয়া বরং অর্চ্চিত হন, মৃত্যুই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া অমরত্বের মুকুট পরাইয়া দেয়। তৃতীয় শিক্ষা, এই অমৃতের তথ্য মৃত্যু হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, অথবা মৃত্যুতেই অমরত্ব, যেমন ক্ষুদ্রত্বের অবসান ও মহত্বের বিকাশ একই কথা।

এই যে অবসান বা মৃত্যু—এ কেবল দেহের সম্বন্ধে নহে, জড় সম্পর্কীয়, সর্ব্ববিষয়েই একথা খাটে। কৃপণের ধনসম্পদ বুকে লইয়া রজনীতে নিদ্রা নাই, কেহ বা সেই ধনরাশি ধূলিরাশির মত বিলাইয়া দিয়া পরম সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু সেই অনিত্য ধনরাশি বুকে ধরিয়া থাকিব অথচ নিত্যধনের অধিকারী হইব ইহাও কি সম্ভব! মহাপুরুষগণ সকল সময়ই ত্যাগের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ত্যাগ, কেবল ত্যাগ নহে, সামান্য কিছু ত্যাগ করিয়া অসামান্য কিছু গ্রহণ। ত্যাগ, যেমন নিম্নতর সোপান না ছাড়িলে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করা যায় না। (ক্রমশঃ)

---

* যে গুলি গৃহীতার কোন প্রয়োজনেই আসিবে না পিতাকে সেই-রূপ রুগ্না ও দুগ্ধহীনা গাভী দান করিতে দেখিয়া নচিকেতা দুঃখিত হইলেন, ও তাঁহার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি বিনীতভাবে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমাকে কাহাকে দান করিবেন? পিতা বারবার এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন "তোকে যমকে দান করিলাম।" নচিকেতা পিতৃবাক্য পালনের জন্য নির্ভয়ে প্রসন্ন মনে যমালয়ে গমন করিলেন, ও সেখানে ত্রিরাত্রি অবস্থানের পর মৃত্যুর দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তাঁহার নিকট অমরত্বের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

(শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত, বি, এ,)

(ধর্ম্ম)

বাংলা দেশের আব্-হাওয়ায় এম্নি একটা কি আছে যে, তাতে কেবল করুণ সুরটাই বেশী করে বেজে উঠে। ধর্ম্ম, সঙ্গীত, রাজনীতি, চিত্রকলা, নাটক, উপন্যাস—যে দিকেই তাকাও না কেন, দেখ্‌বে ঐ করুণ সুরটাই প্রধান সুর, আর যা' কিছু ওরই সঙ্গে মিশ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে মাত্র। কদাচিৎ এর রূপান্তর হয় না, বা নাই একথা বলা যায় না; কিন্তু সে এতই নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ যে, এ দেশে কখনো তার সার্ব্বজনীনত্ব লাভ করা ঘটিয়া উঠে নাই। একে ত এই; তার উপর আবার নূতন আম্‌দানীর দুঃখ-দারিদ্র্যের জ্বালা ওটাকে সময়ে সময়ে ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে একেবারে হাহাকারে তুলে দেয়। নানা রকমারি সংস্কারের মধ্যে এই দুঃখ-দারিদ্র্যও যেন দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই আর একটা জন্মগত সংস্কার হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে!

গাঁয়ে গাঁয়ে কীর্ত্তনের ধূম লেগেই আছে। উচ্চরোলে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত লম্ফন, কুর্দ্দন, ক্রন্দন, বা অশ্রুবর্ষণ,—এরও অভাব নাই। দেখে শুনে ঠাকুরের কথা মনে হ'ত—"হরিনামে অশ্রু আর পুলক, জ্ঞানীর লক্ষণ।" মনে হ'ত, তবে ত এরা সবাই জ্ঞানী, হরিনামে অশ্রুবর্ষণ!! কিন্তু বেশ করে খুঁজে দেখ, মজা দেখ্‌বে এই ঐ অশ্রুবর্ষণ হরিনামের সঙ্গে হচ্ছে সন্দেহ নাই—কিন্তু ওর পেছনে রয়েছে, হয়ত কারো দারিদ্র্য-জ্বালা, কারো পুত্র-বিয়োগ-জনিত অন্তর্দ্দাহ, অথবা এম্নি একটা কিছুর তীব্র যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা অন্তরঙ্গ হয়েই রয়েছে, কেবল সময় বুঝে কীর্ত্তনের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ওটা উপ্‌চে উঠ্‌ছে মাত্র। এম্নি করেই করুণ সুরটা সমস্ত দেশকে একেবারে অষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে।

এর ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। খাঁটি ভাবের পথিকও আছে। তা'রা কিন্তু একেবারে অধিকারশূন্য হয়ে কখনো কোন কাজে হাত দেয় না।

কীর্ত্তন খুব ভাল জিনিস সন্দেহ নাই; আর ভাল বলেই ত ওর জন্যে ভয়ও তেম্নি বেশী। আনাড়ির হাতে পড়ে জিনিসের সত্য লোপ হয় না বটে; কিন্তু কর্ম্ম-কর্ত্তার অকল্যাণ হয়, উন্নতির বিঘ্ন ঘটে।

তা' তুমি যতই না' বল, ঐ করুণ সুরটার মত মারাত্মক জিনিস কিন্তু আর একটা কোথাও দেখি নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-কর্ম্মে। ঐ সুরের আতিশয্যেই যত ভাব-প্রবণতা, যত উৎপেতে ভক্তির পথে ঝোক্। ভাব-ভক্তি কিছু খারাপ নয়; কিন্তু ঐ করুণ সুরের ভাঁওতায় পড়ে, ভাবুকতার ডানায় চড়ে, কত ভক্ত শেষকালে ডোবায় পড়ে গড়াগড়ি যান, তা' ভাব্‌তে গেলে আর কিছু না হোক্, লোকমাত্রেরই করুণার উদ্রেক হয়।

এই করুণ সুর আবার বহুরূপী। ধর্ম্মের খাঁটি দিক্‌টা দেখ্‌তে হ'লে, এই বহুরূপীর বিভিন্ন লীলাকে পাশা-পাশি রেখেই তাকে দেখ্‌তে হবে। যে জায়গায় যে জিনিসের যত বেশী আম্‌দানী হয়, সে জায়গায় আবার সে জিনিসের তত বেশী অপচয়ও ঘটে। আমাদের দেশ, ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্মেই এ দেশ "সকল দেশের সেরা।" কিন্তু দেশে এর যা অপচয়, তা বল্‌বার আগে একটা ভাব্‌বার কথা এই যে, ধর্ম্ম ত নিত্য পদার্থ, খাঁটি মাল, তাতে আবার অপচয়ের সম্ভাবনা হয় কেন? তবে কি নেওয়াটাই ভুল করে নেওয়া হয়?—তাই গোড়াতেই গলদ্ থেকে যায়?

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে নিয়ে বেশ একটু সর-গরম হয়েছে দেশ।—তা না হ'বে কেন? দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেশ গেল ভরে তাঁর নামে। কত মঠ হ'ল, মিশন হ'ল, পূজা, কত উৎসব। কেবল কি এই? স্বামীজী এলেন সব দেশ-বিদেশ জয় করে, সবাই নিলে ঠাকুরকে মাথা পেতে। বিদেশীরাও বল্লে, ভগবান্ রামকৃষ্ণের মতন আর একটী হ'তে নেই। কথাটা পৌঁছাল এসে দেশে। আর কি থাকা যায়? সাহেবরাও যে ভাল বল্‌ছে! তবে ঠাকুর অবশ্য ভালই হ'বেন। এস, আমরাও তবে সভা করেঁ, ঠাকুরের জয় জয়কার দিয়ে সব ভক্ত হই। আর কষ্টও ত তেমন কিছু নেই। স্বামীজীর সব বই বেরিয়েছে, ঠাকুরের কথাও এখন ঘরে ঘরে। অবসর মত দু'চারটা আওড়ে মুখস্থ করে নিলেই মোটামুটি চলনসই হয়। তারপর মাঝে

মাঝে. চাই কি, হ'ল একটা উৎসব, কিছু বক্তৃতা, কীর্ত্তন ; আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও কিছু পাওয়া গেল। আর এতে লাভও ত কম নয়। প্রশংসা, মান, একটু প্রতিষ্ঠা—এও পাওয়া যায়। কাঙ্গাল, গরীবের দেশে আর কত চাই বল ? তেজঃ, বীর্য্য, সাহস, আবার কি বলে, বিবেক, বৈরাগ্য—ও সব যদি শতকরা নিরানব্বুই জনেরই না থাক্‌লো, তবে কি শুধু আমাদেরই থাক্‌তে হবে ? ঐ একটু সেবা-ভক্তি ক'রে যা' পাচ্ছি, এই ত ঢের। আর লাগেও ভাল। তবে মাঝখানে স্বদেশীর আমলে রাজ-সরকার কেমন একটু ফ্যাসাদ্ বাধিয়েছিলেন। একটু আড়চোখে দেখ্‌তো। সেটাও ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। তবে আর কি ? বল যে যেখানে আছ,—জয় শ্রীগুরুজীকি জয় ! একি ভক্তি, না স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা ? এ যে কেবল ঠাকুরকে নিয়েই হচ্ছে, এমন নয়। সর্ব্বত্রই এই পোষাকী ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি চল্‌ছে। এতে অপচয় না হবে কেন ?

ঠাকুরের সমসাময়িক একটি ভক্ত কথা-প্রসঙ্গে একদিন তাঁর কথা বল্‌ছিলেন। কথাটা এই—কাশীপুরে ঠাকুরের দেহ যাবার কিছু পূর্ব্বে একদিন ভক্তেরা দেখ্‌লেন, ঠাকুর বিছানায় বসে কাঁদ্‌ছেন। কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্লেন, "দেখ, শ্রীকৃষ্ণ একদিন সত্য সত্যই কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলেছিলেন, আমি গোপীদের ঋণ কি দিয়ে শোধ কর্‌ব ? যখন আমি দ্বারকায় থাকি, তখন আমাকে চিন্তা করা খুব সোজা। কারণ তখন যে আমি রাজা—ঐশ্বর্য্যময়। কিন্তু যখন আমি বৃন্দাবনে ছিলেম্, আমার কিছুই ছিল না, তখনও যে গোপীরা আমায় সর্ব্বস্ব দিয়ে ভাল-বেসেছে, তাদের ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ কর্‌ব ? তাই ভাব্‌ছি, যখন দক্ষিণেশ্বরে থাক্‌তুম্, সেজোবাবুর মত বড় লোক পেছনে সেবার জন্যে ব্যাকুল, কত লোক কত মত্‌লব নিয়ে আসত, যে'ত। কিন্তু দেহের এখন এই হীনাবস্থা। কত লোক চলে গেল, তবুও তোমরা আমায় ত্যাগ্ করলে না ; [illegible] ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ কর্‌ব ?" ঠাকুর তবে কি চান ?

দেশে ধর্ম্ম [illegible] যে ভাবে চল্‌ছে, তাতে এর [illegible] করা

একটু কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তবে সংক্ষেপে কখনো একে "সখের ধর্ম্ম," কখনো বা "হুজুগে ধর্ম্ম" নাম দেওয়া যেতে পারে। 'সখের ধর্ম্ম' হল' প্রাচীনদের জন্যে, আর 'হুজুগে ধর্ম্ম' যুবকদের জন্যে। হুজুগের বয়সটা কেটে গেল, শেষে ঐ সখের একটু চাটনি নিয়ে থাকা আর কি। তখন যে তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকে, পরকালের কর্ম্মও ত চাই!! ঐ যে গায় "শমন এসে, ধর্‌বে কেশে, ভাঙ্গ্‌বেরে তোর জারিজুরি"।—ও শুনে যে প্রাণ আঁৎকে উঠে। বাবা! আর কথাও ত মিথ্যা নয়; চুল-দাড়িও যে পেকে এল! কে জানে হঠাৎ কখন কি হয়। তারপর আবার যখন মনে পড়ে জীবনের সব অতীত কাহিনী, তখন ত শরীরের রক্ত একেবারে জমাট বেঁধে যায়। তা' অবস্থা যেমন সঙ্গীন, ব্যবস্থারও তেম্নি সুবন্দোবস্ত আছে—আর সস্তাও বেশ। ভগবানের সাক্ষাৎ সনদপ্রাপ্ত কুলগুরুগণ ঘুরে ফিরে দেশের সর্ব্বত্রই আছেন। তাঁদের দয়ার কথা কি আর বল্‌ব—পতিত, কাঙ্গাল দেখ্‌লে তাঁরা' একেবারেই রইতে নারেন। না ডাক্‌তেই এসে হাজির। যা' হোক্, যথাবিধি দক্ষিণান্ত হওয়া গেল। গুরুদেবও শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদি করে, ভব-সাগর পারের সব রকম ব্যবস্থা করে, আঁট্-ঘাট বেঁধে দিয়ে গেলেন। ভেবে ভেবে প্রাণ বেরুচ্ছিল, এতদিনে যা' হোক্ ঠাঁই পাওয়া গেল! গুরু কর্ণধারই ত আছেন; আর ভয় কি? আর একি যে সে গুরু? শ্রী-পাট অমুক ধামের অমুক বংশাবতংস! কেন, তোমাদের মনে নাই? মন্ত্রদক্ষিণার দিন তোমাদের সকলকেই ত নিমন্ত্রণ দিয়েছিলুম!!!

খেই হারায়ে এম্নি করেই ধর্ম্মের সূতা এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আবার মজা এই, ভুল যে হচ্ছে, তা' চ'খে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও হুঁস্ নেই। ভুলকে ভুল বলে বোধ থাক্‌লে তবে সংশোধনের আশা থাকে। আর ভুলও হচ্ছে, অথচ বোধও নেই যে ভুল হচ্ছে; এ যে বড় কাহিল অবস্থা! তাই ত নূতন যুগ এ সব ভালবাসে না। নূতন যুগ বলে, "তোমাদেরও মামুলী ব্যবস্থা যতই ভাল হ'ক, তোমরা যখন সত্যকে ছেড়ে, মালের বদলে খোসা নিয়ে মারামারি করছ, তখন আমি

তোমাদের সঙ্গী হ'তে পারি না। না বুঝে যা তা একটা কিছু কর্ত্তে আমি একেবারেই নারাজ। তোমরা যে "বিশ্বাস কর" "বিশ্বাস কর" বলে চেঁচাও, ওর মানে আর কিছুই নয়, কেবল না বুঝে সুঝে কতকগুলি দেশাচারের বোঝা ঘাড়পেতে, মেনে নেওয়া। ওর নাম দুর্ব্বলতা, ফলে অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে অজ্ঞাতবাস! 'বেদ-বেদান্ত, পুরানাদি সবই আমি মানি, কিন্তু তোমাদের দিক্ দিয়ে নয়। শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলে মানি না, শাস্ত্রকে সত্যের বার্ত্তাবহ বলে বরণ করে নি'। সত্যের সঙ্গে অসত্যময় জীবনের আপোষ কখনো হয় না। হ'তে পারে না। এক একটা দেশের এক একটা করে জীবন-তন্ত্রী আছে। নানা দেশ ঘুরে এসে স্বামীজি ধর্ম্মকেই এ দেশের জীবন-তন্ত্রী বা জাতীয় মেরুদণ্ড বলে নির্দ্দেশ করেছেন। এটা বুঝাও যায় বেশ। জাতীয়তা, সামাজিকতা প্রভৃতি সবটাই দেখ্‌ছি ওই ধর্ম্মের উপরেই এ দেশে দাড়াতে চাচ্ছে। সেই ধর্ম্মই যদি ঢং সেজে স্বরূপটাকে একেবারে ঢেকে কিছুতেই ধরা না দিলে, তবে তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত চুলোয় গেল, ইহকালের কল্যাণের পথগুলিও যে বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং হে অতীত! তুমি "গতস্য স্বচনা নাস্তি" হয়ে তোমার আচারের পোট্‌লা-পুঁট্‌লী নিয়ে অতীতেই বিলীন হয়ে যাও, আমাকে শুধু সত্যটী নিয়ে নবীন কিরণে, নবীন আলোকে প্রকাশ হ'বার পথ ছেড়ে দাও। তোমার কুয়াসার ঝাপ্‌সা আমার, মোটেই ভাল লাগে না।" 'সখের ধর্ম্মের গুরু-ভক্তি কিছু কম নয়। লেগেই আছে মুখে—

"যদ্যাপি আমার গুরু শুড়ি বাড়ী যায়,
তথাপি আমারগুরু নিত্যানন্দ রায়।

কিন্তু ভায়া, তাই বলে যদি বছরে দু'বার করে গুরুদেব এসে বাড়ীতে আড্ডা পাতেন, আর উপযুক্ত প্রণামী দিয়ে মন্ত্র-দক্ষিণার সুদ টান্‌তে হয়, তবে আর কত বরদাস্ত হয়? বিশেষ আবার এই দুর্দ্দিনে?"

(ক্রমশঃ)

পথের কথা।

(শ্রীমতি সত্যবালা দেবী)

বৈশাখের খরজালায় পৃথিবী যেমন দহিয়া উঠিতেছে তেমনি এই যে দাহ এই যে তাপ, এই যে বাহিরে ও অন্তরে জ্বালা-যন্ত্রনা কৃচ্ছ্রতা মানবের আজ, এই সোণার ভারতব্যাপিয়া,—এ কেন? গ্রন্থে ত পাঠকরি আমার দেশ স্বর্গ ছিল। এই পদতলশায়ী মৃত্তিকা নাকি দেব ঋষির চরণ স্পর্শপূত! এই আলো এই আকাশ বাতাস ফুল-ফল হিল্লোলময়ী তটিনী বারি আমারি মত সমান আপনার করিয়া স্বয়ং ভগবানের নর কলেবর বিগ্রহ স্পর্শ করিয়া গিয়াছে! সত্য, একি সত্য? বিরাট বিস্ময়ে বিপর্য্যস্ত, প্রায় তাই স্তম্ভিত রোমাঞ্চিত নির্ব্বাক সপ্রশ্ন ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতেছি—সত্য, একি সত্য? অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাক্ষী পুরান, সাক্ষী ইতিহাস, সাক্ষী আমার জাতির অন্তর্য্যামী। অস্বীকার করিব, সে কথা লুকাইয়া লজ্জা লুকাইব, সে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। অধোমুখে বলিতেই হইবে আজ এখানে যেমনই অবস্থা দেখ আমাদের, যেমনই হেয়, যেমনই অপবিত্র, যেমনই দলিত ভূমিলীন দেখ—আমরা সেই। সেই বিরাটের অঙ্গ, এই দেহ প্রাণমন চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার সেই অনন্ত বিদ্যুৎশক্তি আধারের আধেয়—সেই আত্মার আবরক আবর্জ্জনা।

সেই আর এই! ওহোঃ! এ যদি নিষ্ঠুর সত্য না হইয়া স্বপ্ন হইত! দু ফোঁটা চোখের জল অপাঙ্গ কোনে মুছিয়া লইলেই দেখিতাম ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, আর সে হৃদয় শোণিত শোষী কালান্তক ছায়ার পিশাচ কিলিবিলি দৃষ্টির সম্মুখে নৃত্য করিতেছে না—কি পরিতৃপ্তি! কি নিশ্চিন্তি!

সেই যাহা ছিল। এই যাহা হইয়াছে! নরক বর্ণনা কেই বা নিখুঁত করিয়া রচিতে পারে? সাধই বা যায় কাহার?—এই আজিকার অবস্থার হুবহু চিত্র, এই বুকফাটা কথা, মুখ ফুটিয়া বলা এত' সমালোচনা

নহে বর্ণনা নহে সাহিত্যসৃষ্টি নহে। এযে অন্তর্গূঢ় সুপ্ত পাতাল শায়িতের উচ্ছ্বসিত শতধা প্রপাত! এযে অনিরুদ্ধ অন্তরাবেগের সর্ব্ববাধা উপচিয়া বহিরাগমন! এযে তৃতীয়ের অদম্য প্রেরণা যদি কেহ থাকে যাহার অন্তর বিষবাষ্পে ধূমায়িত উত্তাপ সংগ্রহ করিতেছে অগ্নিকণায় ঠিকরিয়া পড়িবার জন্য তাহাকে আমন্ত্রিতে এই প্রাণের জ্বলন্ত শিক্ষায় আপন প্রদীপ জ্বালিয়া লইবার জন্য। এখানে একটী দেউটী জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ওগো মঙ্গলকামী তোমার পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া লহ সাজাইয়া লহ। একটী কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে সকল অস্পষ্টতাকে ছাপাইয়া ক্ষীণতম স্বরে. সে কি বাণী ঘোষণা করে শুনিয়া লহ।

ওগো অৰ্দ্ধজাগা অৰ্দ্ধঘুমঘোরে তন্দ্রাকুল, তবে কি বুঝিতে কিছুই পার নাই তুমি? তবে কি শুনিতে পাও নাই তুমি,—আদেশ? এ ধর্ম্মভূমি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নহে—এ অমর জাতির সন্তান আপন মহিমা হারাইয়া চিরদিন নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে না। এই যে পতিত জীবনের নীথর অসাড়তার মধ্যেও সর্ব্বনিম্নস্তর ভেদ করিতে করিতে ধ্বনিয়া উঠিতেছে,—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

—শুনিতে কি পাও নাই তাহা? চারিদিকে ঝড়ের পূর্ব্বকার এই যে থমথমে স্তম্ভিত ভাব, দিকের আপ্রান্ত ছাপিয়া এই যে পুঞ্জীভূত রুদ্ধ হাহাকার ইহারই বক্ষ চিরিয়া জলদ নির্ঘোষে ভাগবত আদেশ ঘোষিত হইতেছে—জাগ। উত্তম পথ অবলম্বন কর।

কি সে পথ? যে পথ বহিয়া যুগে যুগে ভগবান আসিয়াছেন—সেই পথ। যে পথে চলিয়া দেবতায় মানবে আমার পিতৃযুগে লীলা করিয়া গিয়াছে সেই পথ। মোহের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলাস্তম্ভের নৃত্য সম্মুখে মগজ ঘুরিয়া গিয়া যে পথ দেখিতে পাইতেছ না, সেই পথ।

জলাশয় তীরে দাঁড়াইয়া মরিচীকাক্রান্ত যেমন শূন্য প্রেক্ষণে দূর দিগ্বলয় নিরীক্ষণ করে তেমনি করিয়াই যে পথে দাঁড়াইয়া পথের সন্ধানে পাগলাম করিতেছ সেই পথ।

যাহারা দুঃখটাকেই চেন, যাহারা বুদ্ধি দিয়া জগতের সকল তত্ত্ব

বিচারের দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাক, সেই তোমরা, বলত কোনজনে আজ আপনাকেই জানে? বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা সকল ধনে ধনী হইয়াও ঐ আপনার ক্রন্দিতা আঁখিকে তৃপ্ত করিতে পারে? মিলনাকাঙ্ক্ষায় দুরুদুরু বিকম্পিত বক্ষ মহাপ্রাণ আপন আমিকে প্রতিবেশীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে? বিকর্ষণ ধর্ম্মে বিশ্লিষ্ট খণ্ডিত হইয়া কেন পরস্পর আকর্ষণেরই অনিবার চেষ্টায় আপনাদের চারিদিকে উর্ণাতন্তুর মত বুদ্ধির জাল রচিয়া সকল সৌহার্দ্দের ফাঁকটুকু বন্ধ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যেন প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতেছে! একতার বিশাল বল হৃদয়ঙ্গম করাইতে বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলিতে পারে কিন্তু একতা স্থাপনের সত্যকার এতটুকু চেষ্টা পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা চলে না। বলত তোমরা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে কান্ত কবির পদাবলী পর্য্যন্ত নিঃশেষে পান করিয়াও হৃদয়ের প্রেমার্দ্র অনুভূতি আজ পর্য্যন্ত কেন কেহ কর্ম্মরূপে জগতে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না? প্রীতি সহানুভূতি ভ্রাতৃত্বের সাহিত্যিক বিশ্লেষণে জাতির চিন্তাভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বাস্তব জীবনে কোথায় প্রীতি? কৈ জন্মিল কে দশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল যাহার হৃদয়ের সম্পদ অফুরন্ত! যে ভালবাসিতে গিয়া দেউলিয়া হয় না। যাহার মাধুর্য্য তাপ লাগিলে মধুর মত বিষাইয়া উঠে না। সহানুভূতি? হাঁ অনুভববৃত্তি বড় তীক্ষ্ণ তোমাদের স্বীকার করি কিন্তু সেকি হৃদয়ের—না বুদ্ধির? বুদ্ধিদিয়া আমরা জাতির ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতীত সবই অনুভব করিতেছি, না যদি করিতাম তবে এত আন্দোলন আকিঞ্চনের ভাষা যোগাইত কোথা হইতে? হৃদয়দিয়া অনুভূতি যেখানে আছে সেখানে একজন সম্পন্ন থাকিতে অপরে ত অনাহারে মরে না। একজনের আত্মসম্মান থাকিলে আর একজন অপমানিত হয় না। সহানুভূতি সকলেই চায় সকলেই বুঝে অথচ জাতিটার একাংশ দারিদ্র্যের অতি ভীষণ প্রখরতায় অবসন্ন, অপরাংশ বিলাসের উৎকট আতিশয্যে জর্জ্জরিত পচিয়া উঠিতেছে, যেমন রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রজাতন্ত্র উদ্ভবের পূর্ব্বে ফরাসী দেশে হইয়াছিল। বলত এ কেন? ভ্রাতৃত্ব শব্দের ত্রিসীমা ছাড়াইয়া ত মিলন ও ঐক্যের

অর্থ-অপসারিত পুষ্প পল্লবলীন তীক্ষ্ণ কণ্টকের মত মূর্ত্তিপ্রকাশ করিয়াছে প্রতিযোগীতার স্পর্দ্ধায়।

যদিও জনার্দ্দন স্বয়ং ভাবগ্রাহী—তবুও, বোধ হয় বিশ্বের দুর্নিমিত্ত তালিকাকে সুরঞ্জিত করিতেই একটা অদ্ভুত ব্যাধি আছে, ভাবুকতাকে ঘৃণা! আবার একঘেয়ে ভাবুকতার গান গাহিয়া গেলেই আসর জমিবে না সে দিকটাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে দিকটা ব্যবহারের। কিন্তু প্রকৃত দৃষ্টির কাছে এ দিকটা দাঁড়ায় কি? এটা সেই দিক যে দিকে কুস্তির কসরতের মত চালের কসরতে মানুষ আপনার এমন অবস্থা বজায় রাখিতে পারে যে অবস্থায় একটা কৃচ্ছ্রতা আর একটা কৃচ্ছ্রতা স্বপ্নের উদ্যোগে ঢাকিয়া যায়। দেনা করিয়া দেনা মিটানর মত বড় তাড়ার সম্ভাবনা জগাইয়া ছোট তাড়া মিটান হয়। দম্ভ অভিমানের বিবর্ণের দলদলানিতে জ্বালা যন্ত্রনার সে এতটুকু ফোস্কার পীড়া লুকাইয়া পড়ে। হা অদৃষ্ট! লোক রুচিতে না হয় উল্লেখ করিলাম, ইহারও জয়গান করিতে হইবে!

তোমরা বিচার করিতে জান আমি অনুভব করিতে জানি। তোমরা বসিয়া বসিয়া বুদ্ধি খাটাইতে জান আমি বুদ্ধির মাথা খাইয়া আপনাকে মিশাইয়া ফেলিতে জানি। তোমাদের জানা আমার জানা তাই ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিতে হয়। বলিলে দোষ লইয়ো না যেটা জগতে ব্যবহারের দিক—সেটা আমার জ্ঞানে মনকে চোখ ঠারার দিক। আমার পথে আমি আপন মনে অমৃতের গান গাহিয়া চলি। সম্মুখে মন মুক্তকেশা ঘোরা অমানিশি, মাথার উপর রুদ্র বিষাণ ফুকারি গর্জ্জিত ঝটিকা, পার্শ্বে নিঃশব্দ বিজনতা—ইহাদের লইয়া আমি চলি। তোমাদের পথে তোমরা—কতলোক কত সমারোহ—কত সজ্জা। আমার মুখে অমৃতের গান, তোমাদের মুখে অস্ফুট কথা—"চেপে যাও চেপে যাও।" এইত ব্যবহারের পথ! আমার ক্ষমতার অতীত, আমার অব্যবহার্য্য।

পথ আলাদা—মানুষ এক। তোমরাও যা—আমিও তা। তাই এখনও পরস্পর তাকাতাকি—বিপরীত মুখী গতিতে এখনও ডাকাডাকি!

হয়ত বলিতে গিয়া বৃথা বাক্‌জাল সৃষ্টি করিতেছি আর—যতই বুঝাইতে চাই ততই তাহা দুর্ব্বোধ্য ততই শ্রুতিকটু হইয়া উঠিতেছে। তোমরা উন্মাদের অপভাষার প্রালাপটুকু ক্ষমা করিও। শুনিয়ো, তবু ওগো! শুনিয়ো! বলিবার সত্যই কিছু আছে। ঠিকমত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

কি এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে সেথাকার সোণার সূর্য্যালোকের রঙ মগজে চড়াইয়া ফেলিয়াছি তোমাদের এখানকার কিছু আর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সব ঝাপ্সা দেখাইতেছে। পথ অপথ প্রাচীর পারিখা একাকার হইয়া গিয়াছে। আমায় বুঝিয়া লহ তার পর তোমাদের সকল তত্ত্ব তোমাদের মত করিয়া আমায় বোঝাও। তোমাদের প্রকৃতিতে আমায় মিলাইয়া লহ। তৃষ্ণায় মৃত প্রায়ের যেমন দাহ-জ্বালা, আমারও তেমনি—সে যেমন সন্ধান করে জলের, আমিও তোমাদের কাছে সন্ধান করিতেছি অমনি একবিন্দু কিসের—কি তা জানি না। তোমরা আমায় বুঝিয়া লইয়া কি তাহা বুঝাইয়া দাও। আমার এই আমিকে মজাইয়া জমিয়া থাকা নেশা ঘুচাইয়া দাও। এই যে এই ক্ষুদ্র জীবন এক রহস্যময় ভঙ্গীতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া তোমাদের পথ হইতে দূরে দূরে সরিয়া গিয়া তোমাদের জীবন শৃঙ্খলার বাহিরে আর একটা অভিনব জীবন গঠনের নির্দ্দেশ দিতে চায়, কল্পনা দানবের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাও।

নতুবা হয়ত একদিন পথ-হারানর পথই তোমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। যাহাকে সে আপন ভগবানের আদেশ জ্ঞান করিতেছে তাহারই উচ্চধ্বনিতে তোমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত তোমাদের ভগবানের গাথা স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

সমালোচনা।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা—শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

(প্রবাসী—মাঘ, ১৩২৭)—

'দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা নিবিড় করে ধরিব হে।'
'কে ডাকেরে পিছন হতে, কে করে রে মানা?
ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।'

"(রবীন্দ্রনাথের মত) এমনই করিয়া আনন্দের বার্ত্তা জগতে বড় বেশী লোক প্রচার করেন নাই। এমনই করিয়া দুঃখ ভয় মৃত্যু অবসাদ তুচ্ছ করতঃ আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে শিক্ষা দিতে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে অধঃপতিত ভারতবর্ষে আর কেহ আবির্ভূত হন নাই।" লেখকের কথার প্রমাণ রূপে কবির কথার পার্শ্বে আমরা আচার্য্যের বাণী উপস্থাপিত করিতেছি—

'আগুয়ান, সিন্ধুরোল গান, অশ্রুজল পান, প্রাণপণ যাক কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এভব, ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহতে শ্যামা॥'

"বিবেকানন্দের সহিত আধ্যাত্মিক জগতে রবীন্দ্রনাথের যে শুধু এই খানেই মিল তাহা নহে। মানবের হিতসাধন দ্বারা ভগবল্লাভের যে পথ, বিবেকানন্দ তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বারংবার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথও এই প্রেমের পথ দিয়াই, এই কর্ম্মযোগে বিশ্বমানবের সহিত এক হইয়াই আনন্দময়ের দর্শনলাভ সম্ভব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার তুলনায় জপ তপ ধ্যান ধারণা দ্বারা মুক্তিলাভ-চেষ্টাও বাঞ্ছনীয় নহে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে' বাঁধা সবার কাছে।

রাখ রে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।
তিনি গেছেন যথায় মাটি ভেঙে করচে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটচে সেথায় পথ, খাটচে বারমাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পরে।"

লেখকের কথা আরও সার্থক হবে যদি ইহার পার্শ্বে আমরা স্বামিজীর মর্ম্মের কথা বসাইয়া দেই।

'ছাড় বিদ্যা জপ মন্ত্র বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল

* *

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

তারপর বোধ হয় ত্যাগ ধর্ম্মীদের একটু শ্লেষ করিবার নিমিত্ত লেখক যুক্তি দেখাইতেছেন "এই জন্যই ত অন্যত্র তিনি বলিতেছেন—'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' এখানে বৈরাগ্য অর্থে কবি নিশ্চয় ভীরুর জড়তা এবং দুর্ব্বলের স্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ত্যাগীরা যে বৈরাগ্য চায় কবিরও তাহাই আকাঙ্ক্ষা ছিল।

'ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়।
তবু জান মন তোমারে চায়।'
'বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে।'
'কত মায়ার বাঁশীর সুরে ডাকবে আমায় মিছে।'

কবির আকাঙ্ক্ষা 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ' যদি পূরণ হইয়া থাকে, যদি তিনি সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় অবস্থায় নিত্য মুক্তিকে অনুভব করিয়া পুনরায় সেই নিত্যকেই লীলার মধ্যে—সকল বন্ধনের মাঝে—এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের সত্ত্বারূপে—

'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার সকল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।'

যদি কেবলমাত্র মানসপটে না দেখিয়া—

'সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥'

—রূপ অপরোক্ষানুভূতি যথার্থরূপে করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি "রূপ রস গন্ধময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে বসিয়া" তৃতীয় নেত্রের দ্বারা ভূমা, বিভূকেই সর্ব্বভূতে দেখিয়াছেন। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় 'রেশম পশম, আসন বসন, স্বর্ণ রৌপ্য' ছাড়া আর কিছুই দেখাইতে পারে না—তাহারা 'পরম সম্পৎকে অন্তরাল' করিয়া দিয়া 'সকল সত্যের সত্য, অন্তরে বাহিরে, জ্ঞানে ধর্ম্মে কোথাও তাঁহাকে' দেখিতে দেয় না!

কিন্তু সকল সসীমের মধ্যে অসীমের প্রকাশকে দেখিতে হইলেই যে কোন বালিকার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে কিম্বা নারীরূপ এক বিশেষ সসীমতার মধ্য দিয়া ছাড়া প্রেমস্বরূপ ভগবানের সর্ব্বভূতে পরিচয় পাওয়ার অন্য উপায় নাই—আর তাহা না হইলে 'প্রকৃতি' নিশ্চয়ই 'পরিশোধ' লইবেন একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মানব যে কোনও সসীম প্রবাহিনীকে অবলম্বন করিয়া অসীম সমুদ্রে উপস্থিত হইতে পারে—কারণ সর্ব্বভূতান্তর্যামী ত সকল সসীমতার অন্তররূপে বর্ত্তমান। কই কোনও বালিকা ত স্বামীজির স্নেহ মাধুর্য্যের গুরু হইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিতে শিক্ষা দেয় নাই?

'দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তবরূপ সর্ব্ব ঘটে।'

কেন তাঁহার কর্ম্মে এবং শব্দের বর্ণে বর্ণে প্রেমের উৎস বহিয়া যাইতেছে ?

'শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাবার—
মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়ম, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান, ত্যাগ, ভোগ
বুদ্ধির বিভ্রম 'প্রেম' 'প্রেম,'—এইমাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
পশু পক্ষী, কীট অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।'

কই 'প্রকৃতি' ত তাঁহাকে 'পরিশোধ' দেন নাই। কবি বলিতেছেন 'সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধ ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুরই বাহিরে।' অনন্ত সব কিছুরই বাহিরে নয় বলিয়াই ত সন্ন্যাসীর ঈপ্সিত প্রকৃতির পরপারে বিশুদ্ধ নিত্য অবস্থা 'মিথ্যা শূন্যতা' নয়—সত্য, কারণ সেখানেও যে অনন্ত। কবি যেমন বুদ্ধি ও কল্পনাবৃত্তি সহায়ে সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করিয়া 'সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা' দূর করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ বিশুদ্ধ অসীমকেও যে সকল সসীমতা ত্যাগ করিয়া সম্ভোগ করা যায়, তাঁহার এ অবস্থা উপলব্ধির কোনও নিদর্শন আমরা পাই না। যাহা আমরা বিবেকানন্দে দেখিতে পাই,—

"একরূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশ হীন, সর্ব্ব হীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়॥"
* * * 'শূন্যে শূন্য মিলাইল
অবাঙ্মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার'॥

"রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য ভীষণ হইলেও মঙ্গলকর, তাঁহার তীব্র তালের আঘাতে মানুষের বক্ষ পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেলেও যে, তাহাতে সমস্ত সন্দেহ মন হইতে পলায়ন করে, লেখক কবির মর্ম্মের ছন্দ বিধৃতির দ্বারা দেখাইয়াছেন—

'নাচো যখন ভীষণ সাজে, তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে সন্দেহ বিহ্বল।

সেই প্রচণ্ড মনোহরে প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার দিক্ সে রসাতল ।'

আচার্য্যও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

'তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয় রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে ।'

(ইংরাজীর অনুবাদ)

দুঃখই মানুষের অন্তরের জিনিষটা জাগাইয়া তুলে । তাই কবি বলিতেছেন,

'এই করেছ ভালো, নিঠুর এই করেছ ভালো ;
এমনি করে' হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো ।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো ।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার—
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার ।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে' আমায় যত কালো ।'

যে সত্য কবির আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা আচার্য্য সেই সত্যই নিজ জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া ভাষায় তাহার প্রকাশ দিতেছেন—

'বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিণী
প্রজ্বলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে,
শূন্য ব্যোম পথে যথা উঠে প্রতিধ্বনি
মর্ম্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জ্জনে ।
প্লাবনের ধারা ঢালে যথা মহাঘন,
দামিনী দলকে তার হৃদি বিদারিয়া,
আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পন্দন,
মহদাত্মা উচ্চ তত্ত্ব দেয় প্রকাশিয়া ।' (ইংরাজীর অনুবাদ)

সংবাদ।

১। বেলুড় মঠে গত শ্রীস্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রায় ২৫০০০ হাজার ভক্তের সমাগম হয় এবং প্রায় ৭০০০ হাজার দরিদ্র নারায়ণ এবং ভদ্র নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসাদ গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজির সভাপতিত্বে একটি ধর্ম্মসভা আহূত হয়। তাহাতে ব্রহ্মচারী অখণ্ডচৈতন্য, ব্রহ্মচারী অনন্তচৈতন্য এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ আচার্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী পাঠ করেন। স্বদেশ-সেবক মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক এই দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন এবং উৎসবে যোগ দান করেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহাম্মদ আলি এবং অপরাপর দেশ নায়কেরা আগমন করেন। জন সাধারণের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধী হিন্দীতে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন "আচার্য্যের বাক্যাবলী তাঁহার জীবনে নূতন আলোক আনয়ন করিয়া নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তোমরাও এই পূণ্য দিবসে তাঁহার মন্দির হইতে নূতন ভাব ও আলোক লাভ করিয়া স্বদেশ সেবায় নিযুক্ত হও। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে অনেক অলীক কথা বহু দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার প্রতিবাদও করিয়াছি। হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু বোধ হয় অনেকে অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।

২। রামকৃষ্ণ-আশ্রম, বাসাভাঙ্গুডি, ব্যাঙ্গালোর সহরে স্বামীজির জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এন্‌, কেশব আএনগার এবং রাজা শম্ভুভূষণ কর্পূর, শ্রীনিবাস রাও আচার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পাঠ, আরত্রিক, হরিকথা যথানিয়মে সম্পাদিত হয়।

৩। বিগত ২৪শে মাঘ রবিবার ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণমঠে পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীমদ্‌ বিবেকানন্দ স্বামীজির উনষষ্ঠিতম জন্মমহোৎসব উপলক্ষে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ও স্বামীজির জীবন ও কার্য্যালোচনী এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তদুপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ ও সেবকগণ সহ অন্যূন

চারি সহস্র লোক পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলেন। সমগ্র মঠপ্রাঙ্গণে ঐ দিবস প্রায় দশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ণে সভায় ঢাকা ল' কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন এম, এ, ডি, এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকা মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী একটী কবিতা পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর তত্রত্য অপর একজন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ সিকদার এম, এ, এবং অধ্যাপক সুবিন্দুকুমার দাস এম, এ,—"বর্ত্তমানে ভারতীয় যুবকদের কর্ত্তব্য ও তৎপ্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান", "ভারতীয় জাতীয় জীবনে ধর্ম্মভিত্তি ও বেদান্তের কার্য্যকারিতা", এবং "অদ্বৈতবাদ ও ব্যবহারিক প্রমাণ" বিষয়ে বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনটী সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে দুইএকজন স্বামীজির জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিবার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমানযুগে স্বামীজি প্রচারিত উপনিষদের 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'ত্যাগ ও সেবা'রূপ আদর্শ অবলম্বনই যে জাতীয় কল্যাণের একমাত্র উপায় তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে সমাজ ও শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি সমস্যা সকলের সমাধান কল্পে জগতের অন্যান্য জাতি সকলের নিকট হইতে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি কিভাবে গ্রহণ করিলে আমরা যথার্থ জাতীয় কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারি তদ্বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হইলে কিছুক্ষণ নানাবিধ ধ্রুপদ সঙ্গীত বাদ্যাদি হইয়া ঐ দিবসের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।

৪। কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক বিগত ২৪শে মাঘ, ইংরাজি ৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় কলিকাতা ইউনি-ভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ৫৯তম জন্মোৎসব সভা আহূত হয়। এই সভায় সহস্রাধিক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাধুভক্ত ও ছাত্রবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন—সোসাইটীর অন্যতম সদস্য কলিকাতার সরিফ রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে অন্যতম সদস্য অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে কলিকাতা

হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যর জন, জি, উড্‌রফ্ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি বরণের পর 'উদ্বোধন' সম্পাদক স্বামী বাসুদেবানন্দ উপনিষদের বাণী পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন এই সময় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সহঃ সম্পাদক পণ্ডিত কালিপদ তর্কাচার্য্য প্রথমে একটী সুললিত সংস্কৃত বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করিয়া দুটী সংস্কৃত কবিতা পাঠ দ্বারা-শ্রীবিবেকানন্দ বন্দনা— ও সভাপতির সম্বর্দ্ধনা করেন। তৎপরে সোসাইটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৯২০ খৃঃ কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। এই বিবরণ শীঘ্রই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তদনন্তর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি, এ কর্তৃক দুটী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতায় শ্রীবিবেকানন্দের কীর্ত্তিমুখরিত স্তোত্র পঠিত হয়।

এই সময় সঙ্গীতাধ্যাপক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক 'কোটীকণ্ঠে গাহিছে তোমার মহিমা অপার' শীর্ষক ব্রহ্ম-বন্দনা গীত হইলে বক্তৃতাবলী আরম্ভ হয়। একে একে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দাশরথী সান্যাল, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ডাঃ এচ্, বি, মোরেনো ও কাপ্তেন জে, পিটাভেল মহাশয়গণ কর্ত্তৃক ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষায় নানাভাব হইতে স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ত্ব কীর্ত্তিত হয়। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীবিবেকানন্দের উচ্চ আদর্শ জীবন ও কার্য্যাবলীর কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে স্বামীজির অমূল্য গ্রন্থরাজি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে বলেন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থানুসরণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী সুললিত ইংরাজি বক্তৃতা করিয়া শ্রীবিবেকানন্দের মহনীয় জীবনের বর্ত্তমান উপযোগিতা বুঝাইয়া সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার উন্নত চরিত্র, ভারতপ্রেম ও ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ দিলে ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে।

দেখা যাইতেছে দেশে আন্দোলনের পর আন্দোলনের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, সমাজকে উন্নতির দিকে কিছু কিছু আগাইয়াও দিতেছে, কিন্তু স্থায়ী ভাবে ঐ সকল আন্দোলনের ভাব সমাজ চিত্তে দৃঢ়রূপে ধারণা আঁকিয়া দিতে পারিতেছে না। কোন্ অন্তরাল হইতে এক অলক্ষিত শক্তির তীব্র কম্পনধারা পুনঃ পুনঃ আসিয়া জড়প্রায় ভারত-ভারতীর সুপ্তহৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত দিয়া জাগরণের নব উষায় বহিয়া যাইতেছে—যেন নিজ শক্তি-ক্রীড়ার উপযুক্ত আধার না পাইয়া ব্যর্থতার রুদ্ধ নিশ্বাসে শূন্যে ফিরিয়া উচ্চ কণ্ঠে ব্যাকুল আহ্বান করিতেছে—উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! অভিঃ!

* * * *

ভারতের সকল তপস্যা, সকল আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রীভূত হইয়া এক মহান বিরাট বিদ্যুদাধার সৃষ্ট হইয়াছে। উপযুক্ত বহনকারী আধার ব্যতিরেকে ঐশী লীলা-ক্রীড়া ভারত-রঙ্গমঞ্চে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ত্যাগের অগ্নিশিখায় দগ্ধ কলুষহীন দুই চারিটী হৃদয় সেই বিরাট আধ্যাত্মিক বিদ্যুদাধার হইতে কিঞ্চিৎ শক্তি সংগ্রহ করিয়া বিপুল উৎসাহে এক জ্বালাময়ী ভাবধারা অসংখ্য নর নারীর উপর ঢালিয়া দিতেছেন—দুই চারিটী জীব তমোনিদ্রা পরিহার করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে, কিন্তু এই বিরাট কুম্ভকর্ণ একবার পাশ ফিরিয়া আবার যেমন সুখে নিদ্রা যাইতেছিল তেমনি সুখেই নিদ্রিত হইতেছে। ইহার কারণ কি?

* * *

কারণ—শক্তি-ক্রীড়ার উপযুক্ত আধারের অভাব। শিশু মানবের কোমল হৃদয়কে সত্যের আদর্শে ব্রহ্মচর্য্য অবিলাসীতার অগ্নিস্পর্শে গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী মাতার অভাবে ভারতীয় উদ্বোধনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। যে বিলাসীতার কোমল ক্রোড়ে লালিত, সত্যকে প্রাণপণ করিয়া ধরিয়া থাকিতে আশৈশব আদি শিক্ষয়িত্রী মাতার নিকট হইতে উৎসাহিত হয় নাই, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা বীর্য্যলাভ করে নাই, সে কি করিয়া দেশ নায়কদের হঠাৎ উত্তেজনায় নিজেকে পরার্থে সর্ব্বত্যাগী করিবে!

* * *

এই আকস্মিক উত্তেজনার ফলে হঠকারিতা বহু হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া তাহাদের ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, আর না হয় উত্তেজনার প্রতিক্রীয়া তাহাকে বিপরীত পথগামী করে, আর না হয় দেশ নায়কদের বক্তৃতা শ্রবণান্তর যথাবৎ পূর্ব্বজীবনের পুনরাবৃত্তি করিয়া বিলাস সুখের অনুসন্ধানে ধাবিত হয়।

* * *

মানবের শৈশবে জননী শিক্ষয়িত্রী, কৈশোরে পিতা শিক্ষক, যৌবনে মানব নিজের চক্ষে জগৎ দেখে ও শিক্ষা করে নিজেই। কিন্তু জননী শিশুহৃদয়ে যে চরিত্রাদর্শ দান করেন তাহাই মানবের ভবিষ্যৎ ভাব-প্রাসাদের ভিত্তি—তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মানব আগামী জীবনের গঠন-ক্রিয়া আরম্ভ করে। বহু অতীতের সংস্কার এবং বর্ত্তমানে জননীর আদর্শকে পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়, গ্রন্থ, বক্তৃতা, উপদেশ সাহায্যকারী মাত্র। মাতা পুরাণের মদালসার ন্যায় 'ত্বমসি নিরঞ্জন' বলিয়া দোলায় দোল দিতে দিতে ব্রহ্মজ্ঞ বা রাজর্ষি অলর্কের ন্যায় সন্তান সৃষ্টি করিতে পারেন, কিম্বা ইদানীংএর দ্বিতীয়ভাগের ভুবনের ন্যায় হতভাগার সৃষ্টি করিয়া ভূভার বৃদ্ধি করিতে পারেন—উভয়ই তাঁহার হস্তে।

* * *

জগদ্ধাত্রীদের এসকল বিষয় এক্ষণে প্রণিধান করার বিশেষ প্রয়োজন

হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত। বিলাসের জড়-কলুষ তপস্যার নির্ম্মলায় অনাবিল করিয়া বজ্র-কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং কুসুম-পেলব প্রীতির সমবায়ে নব-যুগের ভারত ভারতীর সৃষ্টি করুন—অন্তরালে দেবতারা, পূর্ব্বপুরুষেরা আনন্দযুক্ত হউন,—জগৎ ধন্য, কৃতার্থ হউক।

(২)

প্রকৃতির গতি-স্পন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে ক্রমবিকাশের আলোক আবার সে আলোক নিভিয়া যাইতেছে ক্রমসঙ্কোচের অন্ধকারে। ক্রম-বিকাশের ফলে জীব জগতের অভিব্যক্তি আর ইতরের ফল মহাপ্রলয়। অনাদিকাল হইতে এই সঙ্কোচ বিকাশের অনন্ত গতি-প্রবাহ চলিয়াছে অপ্রতিহতভাবে। এ কাল-চাঞ্চল্য রুদ্ধ করে, সাধ্য আছে কার!

*   *   *

সেইরূপ প্রবাহাকারে জাতীয় উত্থান পতনও অবশ্যম্ভাবী। এক নব ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক প্রতাপশালী জাতির অভ্যুদয় ঘটে, ধীরে আবার কোন যাদুবলে সেই ভাবধারা যাহাতে তাহার প্রাণ, সে ভুলিতে থাকে আর দেখিতে দেখিতে অধঃপতনের অন্ধকার আসিয়া সে জাতিকে ঢাকিয়া দেয়। যে জাতি তাহার সেই প্রাণ-শক্তিকে বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে তুলিতে সমর্থ আর না হয়—তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

*   *   *

বৈদিক কর্ম্মমার্গ হইতে প্রবুদ্ধ জ্ঞানমার্গে সমাপ্ত, আর্য্যভূমে যে শিক্ষা দীক্ষার পরিণতি ঘটে—যে উপলব্ধি সহায়ে ঋষিগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মানব জাতিকে অমর করিবার জন্য সঞ্জীবনীমন্ত্রে বিশ্বকে ধ্বনিত করিয়াছিলেন—সে শিক্ষা দীক্ষা, সে অনুভূতির ঝঙ্কার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইয়া আসিল সেথায় প্রাণহীন বাক্যের অসম্বদ্ধ প্রলাপ!

*   *   *

বাক্-সর্ব্বস্ব, কর্ম্মবিমুখ, উপলব্ধিহীন জাতি আত্মগোপন করিবার চেষ্টায় দুইটী পথ অবলম্বন করে—(১) পূর্ব্বপুরুষগণের গুণকীর্ত্তন (২)

পূর্ব্বব্যবস্থায় দোষালেপন। ভারতে এই দুই ভাবযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। প্রথম প্রকারের ব্যক্তিরা বাক্যের দ্বারা জাতীর নিকট নানাপ্রকার অপূর্ব্ব মতবাদ প্রচার করিতে এক অদ্ভুতজীবরূপে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের মস্তিষ্ক দেবতার ন্যায় উজ্জল, কিন্তু হস্ত ও হৃদয় নূতনত্ব শূন্য, আহার-বিহারের চেষ্টায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিরা কেবল পুরাতনের দোষানুসন্ধানে ব্যাপৃত—ধ্বংসই তাঁহাদের নীতি, গঠনশক্তি একেবারে শূন্য। দেবতা ও শাস্ত্রের অবমাননাকারী স্থূল-মস্তিষ্ক আসুর প্রকৃতিক কালাপাহাড়েরাই পুরাতন বিগ্রহ মন্দির চূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সমালোচনার লৌহদণ্ড হস্তে লইয়া ফিরিতেছেন।

* * *

স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের জন্য অন্নসংস্থান জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই তথ্য তাঁহারা অতি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছেন,—যে তথ্যে আদৌ নূতনত্ব নাই, যাহা পশুকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয় না। হাতে-নাতে কাজ করিতে অনিচ্ছুক এই দুই পক্ষের প্রথম পক্ষ গালি-গালাজ করেন না—কেবল মাঝে মাঝে মুরুব্বিয়ানার সুরে কর্ম্মীদের কর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন 'ভাল, ভাল'। আর দ্বিতীয় পক্ষ কুৎসা রটায়, গালি দেয়,—ক্রমে তাহাতে বিফলকাম হইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে বলে, 'আরে রাম কহো ভাই, ভিক্ষা করে যে কায সে আবার মহৎ কায। আর ঐ দরিদ্রের সেবা করে করে দেশটা একেবারে দরিদ্র হয়ে গেল।' কিন্তু শেষোক্ত যুক্তি শ্রবণ করিয়া এক শিশু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'যদি দরিদ্রের সেবা করে মানুষ দরিদ্র হয় তবে বাক্যরূপ মোসাইবীর দ্বারা ধনির সেবা করে মানুষ ধনি হয় না কন?' (সেবার দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আমরা এথানে স্থগিত রাখিলাম)।

* * *

এই সকল ব্যতিরেকে তৃতীয় পক্ষ আছেন তাঁহারা দৃঢ়, বলবান, মেধাবী, সচ্চরিত্র কর্ম্মীদের অর্থ সাহায্য করিয়া লোকহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করেন, যাহা তাঁহারা সংসারের গুরুভার হেতু নিজ নিজ কর্ম্ম ব্যপদেশে

নিবদ্ধ থাকায় ঐ সকল সৎকার্য্যে সময় ক্ষেপ করিতে পারেন না। এবম্প্রকার অর্থ এবং স্বার্থহীন কর্ম্ম সমবায়ে জগতে যে কত বড় বড় মহৎ কার্য্য সকল সুসম্পাদিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন। মহান্ সৎকার্য্য সকলের আরম্ভ নির্ভর করে দেশবাসীর সহৃদয়তা এবং বদান্যতার উপর, স্থায়ীত্ব নির্ভর করে কর্ম্মযোগীর অনলস নিষ্কাম কার্য্য-প্রবণতার উপর। প্রকৃত কর্ম্মী যাঁহারা তাঁহারা মুরুব্বি এবং হিংসুকদের 'ভাল ভাল এবং ছি ছি' এই উভয় ধ্বনির দিকে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় গন্তব্যে স্থিরলক্ষ্য থাকেন।

অনন্তের পথে।

(ধ্রুব।)

সসীম পিঞ্জর ভাঙ্গি ছুটিয়াছে মন-পক্ষী মোর।
উধাও অনন্ত পথে ছিঁড়িয়াছে করমের ডোর॥
নেতির ঝঙ্কারে তোলে অসীমের পুরাতন গান।
মুগ্ধ মৃত্যু প'ড়ে রয় মূর্ত্ত হয় ধীরে মহাপ্রাণ॥
দূরে, দূরে, চল মন সকল আমিত্ব ফেল মুছে।
স্তব্ধ হ'ক সর্গধারা পড়ে থাক স্বার্থে সান্ত পিছে॥
হের ওই গম্ভীর গগনে আঁধারে লুকায়ে আঁধিয়ার।
জলদ ঘূর্ণনে ছায় কেশজাল অনন্ত অমার॥
ঊর্দ্ধে তার পরপারে মহাকালী মহাকাল কোলে।
খেলে নিরন্তর আদিশক্তি লীলার কম্পন ছলে॥
কোটি গগনের রঙ্গমঞ্চ দোলায় ইচ্ছার বায়।
কোটি সূর্য্য আবর্ত্তিয়া তাহে পুলক নর্ত্তনে ধায়॥
ঊর্দ্ধে চল দহর আকাশে নিবৃত্তির স্বরাজ্য নগরে।
মিশাইয়া দেও আপনায় শান্ত স্থির নির্ব্বাণ সাগরে॥
অস্তি নাস্তি হীন যেথা জ্যোতিতে মগন জ্যোতি ধার॥
উচ্ছ্বাস তরঙ্গহীন স্তব্ধ প্রাণ বৈচিত্র্য উজার॥
অস্তি ভাতি প্রীতিপূর্ণ বিরাজিছে শূন্য রূপ হয়ে।
বিকাশে বিরজা আত্মা দ্বৈত-হিম জড়ত্বের লয়ে॥

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(৺ বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

C/o সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
গোরাবাজার, গাজিপুর।
ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার আপসোস পত্র পাইয়াছি। আমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিতেছি না, বাবাজির অনুরোধ এড়াইবার যো নাই। সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপসোস করিয়াছেন। কথা ঠিক বটে, অথচ নহে বটে। Ideal bliss (আদর্শ আনন্দ) এর দিকে চাহিতে গেলে একথা সত্য বটে, কিন্তু যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর। পরন্তু ঐ প্রকার কি হইল কি হইল অতি ভাল—উন্নতির আশাস্বরূপ—নহিলে কেহ উঠিতে পারে না। "পাগ্‌ড়ি বেঁধেই ভগবান্" যে দেখে, তাহার ঐখানেই খতম্। আপনার সর্ব্বদাই যে মনে পড়ে "কি হইল" আপনি ধন্য নিশ্চিত জানিবেন—আপনার মার নাই।

গিরীশবাবুর সহিত মাঠাকুরাণীকে আনিবার জন্য আপনার কি মতান্তর হইয়াছে—গিরীশবাবু লিখিয়াছেন—সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে আপনি অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি—কার্য্যসিদ্ধির প্রধান উপায় যে ধৈর্য্য—এ আপনি ঠিক বুঝেন, সে বিষয়ে চপলমতি আমরা আপনার নিকট বহু শিক্ষার উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কাশীতে আমি —র ঘাড় না ভাঙ্গা যায় এবিষয়ে একদিন বাদানুবাদছলে কহিয়াছিলাম। তৎসওয়ায় আর আমি কোনও খবর জানিনা এবং জানিতে ইচ্ছাও রাখি না। মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে,

সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কথা কহি?—কে যে বারণ করিয়াছিলাম, তাহা যদি দোষের হইয়া থাকে, তজ্জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সদ্বিবেচক—আপনাকে কি বলিব? কান দুটো, কিন্তু মুখ একটা; বিশেষতঃ আপনার মুখ বড় কড়া এবং ফস্ ফস্ করিয়া Large promises (বেশী বেশী অঙ্গীকারবাক্য) বাহির হয় না বলিয়া আমিও আপনার উপর অনেক সময়ে বিরক্ত হই, কিন্তু পরে বিচার করিয়া দেখি যে, আপনিই সদ্বিবেচনার কার্য্য করেন। "Slow but sure" (মন্দগতি, কিন্তু নিশ্চিতগামী)

"What is lost in power is gained in speed" (আপাততঃ যে পরিমাণ শক্তির অপচয় বোধ হয়, গতির পরিমাণে তাহা পুষাইয়া যায়। যাহাই হউক, সংসারে কথা লইয়াই কায। 'কথার ছাল ছাড়াইয়া (তাতে আপনার কৃপণতার, আবরণ এত ছড়াইয়া) অন্তর্দৃষ্টি সকলের হয় না এবং বহু সঙ্গ না করিলে কোনও ব্যক্তিকে বুঝা যায় না। ইহা মনে করিয়া এবং শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণীকে স্মরণ করিয়া* যদি আপনাকে কিছু কটুকাটব্য বলিয়া থাকে ক্ষমা করিবেন। ধর্ম্ম দলে নহে, হুজুকে নহে, ৺ গুরুদেবের এই সকল উপদেশ ভুলিয়া যান কেন? আপনার যা করিবার সাধ্য করুন, কিন্তু তাহার কি ব্যবহার হইল কি না হইল, ভাল মন্দ বিচার করার অধিকার আমাদের বোধ হয় নাই। দলের idea (ভাব) যতক্ষণ থাকিবে, পরমহংসের শিষ্যের উপর বিশেষত্ববোধ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইবে। * * আপনাকে অধিক কি লিখিব—এসকল সম্বন্ধে কোনও কথা আমাকে না লিখেন এই প্রার্থনা। গিরীশবাবু যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে এ সময়ে মাতাঠাকুরাণীর সেবায় তাঁহার বিশেষ শান্তিলাভ হইবে। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি বিচার করিব। আর ৺ গুরুদেব আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। আপনার বাটী ভিন্ন কোথাও অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না এবং

শুনিয়াছি, মাতাঠাকুরাণীও আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন—এই সকল মনে করিয়া আমাদের ন্যায় চপলমতি বালকদিগের (নিজ পুত্রের কৃত অপরাধের ন্যায়) সকল অপরাধ সহ্য ও ক্ষমা করিবেন—অধিক কি বলিব।

জন্মোৎসব কবে হইবে পত্রপাঠ লিখিবেন। আমার কোমরে একটা বেদনায় বড় অসুস্থ করিয়াছে। আর দিন কয়েক বাদে এস্থানে বড় শোভা হইবে—ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী গোলাপফুলের মাঠে ফুল ফুটিবে। সেই সময়ে সতীশ কতকগুলা তাজাফুল ও ডাল মহোৎসব উপলক্ষে পাঠাইবে বলিতেছে। যোগেন কোথায় কেমন আছে? বাবুরাম কেমন আছে? সা—কি এখন তেমনি চঞ্চলচিত্ত? গুপ্ত কি করিতেছে? তা—দাদা, গোপাল দাদা প্রভৃতিকে আমার প্রণাম। মাষ্টারের ভাইপো কতদূর পড়িল? রাম ও ফকির ও কৃ—কে আমার আশীর্ব্বাদাদি দিবেন। তাহারা পড়াশুনা কেমন করিতেছে? ভগবান্ করুন, আপনার ছেলে যেন মানুষ হয়—নামরদ না হয়। তুলসী বাবুকে আমার লক্ষ লক্ষ সাদর সম্ভাষণ দিবেন এবং এবারে একলা সা— ও নিজের খাটনি খাটিতে পারিবে কি না? চুনীবাবু কেমন আছেন?

মাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে বলিবেন, যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়—কিম্বা এশরীরে যদি তাহা অসম্ভব যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।

নিম্নে লিখিত কয়েক ছত্র গুপ্তকে দেখাইবেন,—

দাস

নরেন্দ্র।

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(৪)

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

মানবীয় সভ্যতা-স্রোতে জড় ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের তরঙ্গদ্বয় অব্যাহত গতিতে চলেছে। জড় তরঙ্গের নিবৃত্তির সঙ্গে যখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন মানব তার স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মকে উন্নত করে একদল অতি শক্তিসম্পন্ন আধিকারী পুরুষদের নিকট থেকে— যাঁরা স্বতপন্থা বলে নিজ নিজ জীবনে দৈহিক; মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার প্রকাশ দিয়ে যান। কিন্তু সন্তান-মর্য্যাদা গুণকে চিরকালই উপেক্ষা করে এসেছে। সেই মহাপুরুষদের, বংশগৌরবে, শিষ্য-সন্তানদের অক্ষমতা সত্ত্বেও মানব তার স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মকে নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদেরে পঙ্গু করে ফেলে—পুরোহিত বা সন্ন্যাসীর নিকট বিত্ত নিক্ষেপ করেই তারা ধর্ম্মের কর্ত্তব্য শেষ করতে চায়, নিজেদের খোলসা বোধ করে। ধর্ম্মটা যে সকলের নিজের জিনিষ, আত্মস্বরূপ ও শক্তি প্রকাশ করার নামই যে ধর্ম্ম, ধর্ম্মের রাজ্যে যে প্রতিনিধি প্রেরণ চলে না, একথা তাদের মনে না থাকায় "এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয়, যাহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়া দাবী করিয়া থাকে।" সাধারণের ধর্ম্ম বিষয়ে এই অগ্রাহ্যতাকে হেতু করে সেই ধর্ম্মসাধকেরা সমাজের মন-দেহ-আত্মায় দাসত্বের লৌহনিগড় রচনা ক'রে দিয়ে সমাজচিত্ত থেকে সকল নূতনত্ব, ভাব, উৎসাহ, আশা, আকাঙ্ক্ষা মুছে ফেলে এবং নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখে। সমাজ বা সঙ্ঘে দেখা যায়, যখনই আয়াস-মূল্য ধর্ম্মে এবং সর্ব্বাবয়ব জীবনের স্বাধীন বিকাশে অনিচ্ছুক স্বল্পতৃপ্ত জনসাধারণ অপরের হস্তে নিজেদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য তুলে দিয়েছে,

---

* উদ্ধৃত অংশগুলি পরমকুড়ি অভিনন্দনের উত্তর হইতে গৃহীত।

তখনই সেই সাধারণের প্রতিনিধিরা সমাজের বক্ষে চেপে বসে সমাজ ও সঙ্ঘকে শ্লথ করে ফেলেছে। "ক্রমশঃ এমন সময় আসে যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নহে, তাহার সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি অল্পসংখ্যক কয়েকটী ব্যক্তির একচেটিয়া হয়। এই অল্পসংখ্যক লোক সর্ব্বসাধারণের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে।" ধীরে যখন আভিজাত্য অত্যাচার সমাজ বক্ষে অসহ্য কঠিন অনুভব দেয় তখন প্রাচীন নিয়ম কারার লৌহ্অর্গল ভাঙ্গবার জন্য মন বিদ্রোহীর মত ছুটে এসে ভীষণ আঘাত করে—কেবল প্রাচীনে যেটুকু সত্য আছে সেই টুকুই থেকে যায়, আর যা জীর্ণ তা হয় একেবারে চূরমার।—এই বিদ্রোহী প্রচেষ্টার ফল জড়বাদ। মানুষ তখন তথাকথিত সমাজ এবং ধর্ম্ম নেতাদের ভিতর আধিকারী পুরুষদের তুল্য শক্তি, ত্যাগ এবং স্বাধীন বিকাশ দেখতে পায় না—তথা নিজেরাও তাহার অনুশীলন কখনও করেনি—ফলে দাঁড়ায় শাস্ত্র, গুরু, এবং নেতার চরিত্র ও বাক্য সম্বন্ধে ঘোরতর অবিশ্বাস! মানব তখন পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে ইন্দ্রিয় সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং সমাজের সকল প্রাচীন নিগড় ভেঙ্গে নূতন করে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সত্যের উপর সমাজ গড়বার নব নব পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়। অভিজাতকে ভাঙ্গবার জন্য সাম্য-মৈত্রীর ধ্বজা তুলে প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযান করে। ইহার ফলে দলিত, অভিশপ্ত গণশক্তি অভিজাতের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে জাগ্রত হয়। এই হিসাবে "জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে—উহা সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকার দুর করিয়া দিয়াছে—অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হস্তে যে অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল, এবং তাহারাও যাহার ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ অমূল্য রত্নের অর্দ্ধভাগ নষ্ট হইয়াছে, অপরার্দ্ধ এমন সকল লোকের হস্তে রহিয়াছে, যাহারা গরুর জাবপাত্রে শয়ান কুকুরের মত নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না।"

এই জড়বাদ তখন পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করে—ধরিত্রী তখন ধন-ধান্য

সৌভাগ্য-সম্পদে ভূষিত হইয়া উজ্জ্বল দেখায়। ধর্ম্ম হয় তখন সাহিত্য ও কিম্বদন্তীতে পর্য্যবসিত—শিক্ষা অর্থ তখন অন্নাগম ও সুখের উপায় স্বরূপ। কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মী চিরকালই চঞ্চলা—তাঁকে উপলক্ষ্য করেই মানব মনের হিংসা দ্বেষ প্রবলাকার ধারণ করে—"পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই যেন তখনকার যুগধর্ম্ম হইয়া পড়ে।" সকলেই তখন নিজের স্বার্থের কড়ির হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত—দয়া, ত্যাগ, প্রেম কেবল আভিধানিক শব্দ মাত্রেই থেকে যায়। তখন সেই প্রাচীনের সত্যটুকু যারা ধরে ছিল তাদের মধ্য দিয়ে ভোগ ও জড়বাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়ে এক প্রচণ্ড ঐশীশক্তিসম্পন্ন অতিমানবের আবির্ভাব ঘটে। মানবের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় সময় সময় সব জাতির মধ্যেই যেন একটা সংসারে বিরক্তি আসে। সেই সময় তাদের অবস্থা এমনি হয় যে তারা যে কোন মতলব করুক না কেন সবই যেন হাত, ফসকে পালায়—হতাশ দৈন্য এসে যেন সেই ভোগবাদের প্রত্যেক ভিত্তির পাথরগুলো আলগা করে দিয়ে যায়। তখন 'ক্রমশঃ জড়বাদের গভীর আবর্ত্তে মজ্জমান জগতের সাহায্যার্থ ধর্ম্ম অগ্রসর না হইলে, জগতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" এই যুগ সন্ধিক্ষণে সেই অতিমানবের পাদস্পর্শ জগৎকে ধন্য করে—তাঁহার অঙ্গ জ্যোতি স্পর্শ যন্ত্রে দেয় প্রাণের স্পন্দন, ভরিয়া দেয় বিশ্বকে আশা, উৎসাহ, ভাব অনুরাগের আলোক বন্যায়।

শত শত শতাব্দী ধরে পরীক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজ জড়বাদের শেষ পরিণতির উদাহরণ। "রাজনৈতিক শাসনসংসৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে, আর এক্ষণে ইউরোপ অশান্তি সাগরে ভাসিতেছে,—কি করিবে, কোথায় যাইবে, বুঝিতে পারিতেছে না।" সেখানে ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অত্যাচার অসহ্য পাষাণের মত সমাজ বক্ষে চেপে বসেছে। কূট বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জন কতক আজ শত শত নরনারীর জীবন মরণের ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসেছেন, তাঁরা যন্ত্রী আর লক্ষ লক্ষ জীব আজ তাঁদের হাতের যন্ত্র। এই জীব-যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক-শক্তি সহায়ে আজ তাঁরা জগতে রক্তের বন্যা আনয়ন করেছেন। ধর্ম্ম ও নীতি অন্ধ হয়ে ধূলিধূসরিত—"পাশ্চাত্য

মুষ্টিমেয় শাইলকের শাসনে পরিচালিত হইতেছে। তোমরা যে প্রণালী-বদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পর্লিয়ামেণ্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শুন, সেগুলি বাজে কথা মাত্র। পাশ্চাত্য প্রদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত। প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতগণের অত্যাচারে কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতেছে। উভয়কেই পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে।"

এর একটীর দ্বারাও জগতের কল্যাণ হবে না।' কারণ নিরপক্ষপাত ভগবান্ তাঁহার' শক্তির বৈচিত্র্য নানা জীবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন। এমন ঢের গুণ আছে যা নগণ্যে প্রকাশ পায় অধিক, বড় বড় মহাপুরুষে হয়ত যার একেবারে অভাব। কুলী মজুরে যে দৈহিক তিতিক্ষা, নীরব সহ্যগুণ দেখতে পাওয়া যায় তা শতকরা একজন বেদান্তীতেও দেখতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তুমি হয়ত রাজ্য শাসন করতে পার আমি জুতো শেলাই করতে পারি, তুমি দার্শনিক ব্যাখ্যা করতে পটু, আমি রাস্তা ঝাড়ু দিতে দক্ষ, আমি তোমায় ছেড়ে চলতে পারি না, তুমি আমায় ছেড়ে চলতে পার না। কেউ কারও মাথায় পা দিয়ে চলতে পারে না, ঘৃণা করতে পারে না, কারণ সেই একই আত্মা তাঁর সমাজ শক্তির বৈচিত্র্য প্রকট করচেন ব্যষ্টি মানবের মধ্য দিয়ে। সেই বিচিত্র শক্তিসকলের সমবায় যদি শ্রদ্ধা দিয়ে হয়, তবেই মানবের চির অভিলষিত নবীন সভ্যতার অভ্যুদয় হবে। শ্রদ্ধার মূল হচ্চে সর্ব্বভূতে প্রেমাস্পদ আত্মার অনুভূতি। আর তা না হলে যদি লাখো বৎসর ধরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মন্ত্র জপ করা যায়, সিদ্ধি সে মন্ত্রের ইষ্টকে প্রত্যক্ষ হতে দেবেন না —মন্ত্রের অর্থজ্ঞান হীন সাধকের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাই সে প্রচেষ্টার পরিণতি। এই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বীজের সাধ্য দেবতা হচ্চেন সর্ব্বভূতান্তর্যামী পরমাত্মা। এই দেবতার ধারণা যত দৃঢ় হবে ততই সিদ্ধি অগ্রসর হয়ে প্রীতির অঞ্জন মানব চক্ষে পরিয়ে দিয়ে প্রাণের প্রাণকে দেখিয়ে দেবেন। তখন সকল তুচ্ছ দৈন্য নষ্ট হয়ে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা স্বার্থক হবে। "যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী ৫০ বর্ষের

মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানব জাতিকে তরবারি বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। তোমরা দেখিবে, যে সকল স্থান হইতে পাশব বলে জগৎ শাসন এই ভাবের উদ্ভব, সেই স্থান গুলিতেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়, সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। জড় শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ যদি নিজের ভিত্তি সরাইয়া আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ স্থাপন না করে, তবে ৫০ বৎসরের মধ্যেই ইউরোপীয় সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্ম্মই ইউরোপকে রক্ষা করিবে।"

ভগবান্ ও জীবে, সাধু ও পাপীতে, রাজা ও প্রজাতে ব্যবধান করেছে অজ্ঞান প্রসূত শক্তির তারতম্যে। কিন্তু সকলেরই অন্তরতম দেবতা হচ্চেন সেই পরমাত্মীয় আত্মা। এখন 'অভীঃ' মন্ত্রে বীর্য্যবান হয়ে সকল কুসংস্কার দূরে ফেলে নিজ আত্মাতে এবং সর্ব্ব প্রাণীতে সেই মহাপ্রাণের ভাবনা জাগ্রত করে তাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হলে এ জগৎ আর এক রকম হয়ে আমাদের নিকট প্রকাশ হবে। তখন দুঃখ মরণ হবে অনন্ত সুখের তোরণ—ভগবান্ ও জীবের ঐশ্বর্য্যের ব্যবধান, সাধু ও পাপীতে ধর্ম্মের ব্যবধান, রাজা ও প্রজাতে সিংহাসনের ব্যবধান ঘুচে যাবে। সাম্য যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল দুর্ব্বলত্ব, পাপ, ভীতি এবং আভিজাত্যের কঠোর শৃঙ্খল থেকে মানব ও তার সমাজকে নিস্তার দেবে। তখনই মানব বুঝতে পারবে যে জীবনের উদ্দেশ্য স্বার্থ ভোগের জন্য নয়—ত্যাগের জন্য, পরমপুরুষের সেবার জন্য; মহত্ব দুর্ব্বলের উপর সবলের বল প্রকাশে নয়—তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতা ত্যাগ করে তাকে উপরে তুলে ধরা, তাকে ইহকালে সমাজ এবং পরকালে নরক-ভীতি থেকে মুক্ত করা। কারণ "ভয় হইতেই দুঃখ, ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে।" "বেদান্ত ভয়ে ধর্ম্ম করিতে বলে না। বেদান্ত বলে না যে শয়তান সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে তোমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে, যদি তুমি একবার পদস্খলিত হও, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।" এ সব গল্প কথা মাত্র। বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নেই। আমরা যেমন দেবত্বকে বিকাশ করে মুক্তি এবং

আনন্দের ভাগী হ'তে পারি, সেইরূপ শয়তানটাকেও আমরা নিজ মায়ায় সৃষ্টি করে প্রলোভনে মুগ্ধ হই। ধন্য সেই পরমব্রহ্ম মহিষী!

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু লক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥

বৈদিক ভারত।

(বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন।)

"No nation can vie with the Hindus in respect of the antiquity of their civilization and the antiquity of their religion."

Count Bjornstjerna.

ভারতবর্ষ বিশ্বপ্রকৃতির স্বর্গীয় সম্পদে বিভূষিত হইয়া সমগ্র জগতের প্রদর্শনাগার রূপে বিরাজিত। হিমাচলের রজতশুভ্র তুষার, পঞ্চ সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনার সুমনোহর কল কল তান, সুশোভিত শ্যামল প্রান্তর, সুকান্ত সমতল, উন্নত গিরিমালা, অপার জলধির উচ্ছ্বাস কল্লোল, নির্ম্মল সুহাসিনী উষা, কমনীয় দিনান্ত শোভা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সুষমা এদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক অনাবিল স্বপ্নময় ভাব ও স্মৃতিমাখা প্রেরণা ওতপ্রোত করিয়া রাখিয়াছে। সজীব ও সতেজ বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে বাস করিয়া ভারতীয় মন স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী হইয়া রহিয়াছে এবং ভোগোন্মত্ত অশান্ত ভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া চেতন, অচেতন, জড় ও উদ্ভিদ প্রভৃতির সহিত আপনাকে একীভাবে ব্যাপ্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস নিষ্পাপ, পবিত্র অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস,

রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি কৌশলময়ী নীতিজাল বিস্তারের কাহিণী নহে। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিতা সিষ্টার নিবেদিতা বলেন,—

"How great is India possessing within her boundaries very kind of beauty! She could not but be the home of a vast and complex civlisation."

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণ চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভারতবর্ষকে "Geographical Expression" বা ভৌগলিক সংজ্ঞামাত্রে পর্য্যবশিত করিয়াছেন। সত্য বটে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপ্রসূত বিবিধ প্রাদেশিক বিভাগ আমাদের নিকট এত অধিক বিসদৃশ মনে হয় যে ভারতবর্ষের ভৌগলিক অখণ্ড একত্ব (India as a Geographical unit) কল্পনায় আনয়ন করা সুদূর পরাহত হইয়া উঠে। কিন্তু স্থিরভাবে ভারত-সীমান্তস্থিত প্রতিবন্ধক গুলির অনুধ্যান করিলে দেশান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাকৃতিক বিভাগ সমূহ অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। বিরাট হিমাচল যে বিশিষ্ট প্রকারে সমগ্র এশিয়া হইতে এ দেশকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে তাহার সহিত দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথ বিভাগকারী বিন্ধ্যাচল তুলনার অযোগ্য, এবং ভারত-মহাসাগর ও আরব সাগর যেরূপ সমগ্র পৃথিবী হইতে এদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, দেশের বিভিন্ন নদনদী সেরূপ করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত মৌসুম বায়ুর প্রবাহ একই আবহাওয়ায় দেশকে প্রধানতঃ সুজলা ও কৃষিপ্রধান করিয়া প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের অনেকাংশে সমতা-বিধান করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় "Fundamental unity of India"য় বলেন,—

"The whole country was thus easily and naturally grasped by the national thought as a geographical unit, whose strength and fervour triumphed over physical difficulties of pre-mechanical ages in the way of having an ultimate knowledge of the different parts which were welded into a whole."

ার উদ্বোধন ও জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ লাভের নিমিত্ত একই মাতৃভূমিরূপ ভিত্তির সহিত বিশিষ্ট পরিচয় ও তৎপ্রতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম্ম সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মাতৃভূমির অখণ্ড ভৌগলিক বিগ্রহের পূজা করিতে শিখিয়াছিলেন—এবং আজ পর্য্যন্তও আমরা প্রত্যেক পূজা পার্ব্বণে ভিতরের গূঢ় অর্থ না জানিয়াও জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত ভাবে বলিয়া থাকি—"গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি স্বরস্বতী, নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।" ভারতের সর্ব্বত্র আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইবার পর এই ভাবটী সাধারণের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন ঋগ্বেদেও এই ভাবের সংক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে স্বরস্বতি
শুতুদ্রি স্তোসং সচতা পরুষ্ণ্যা
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে
শৃণুহ্যা সুষোময়া।"

অন্য নানাবিধ উপায়েও ভারতবর্ষের একত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান ছিল। অথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরিয় সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে রাজসূয় নামক যজ্ঞের বৈদিক প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই রাজসূয় যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভারতব্যাপী এক বিশিষ্ট ভাবের ঐক্য বন্ধন স্থাপিত হইত। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উদাহরণে আপনহারা না হইয়া সমদর্শীর মত আত্মস্থভাবে প্রাচীন অনুষ্ঠান গুলির আলোচনা করিলে উহাদিগের পশ্চাতে এক একটি মহান ভাব অনুভূত হয়। বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষকে ইণ্ডিয়া অথবা হিন্দ্ নামে অভিহিত করিলেও আর্য্যদের নিকট এ দেশ চিরকালই ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মহারাজ ভরতের উপাখ্যান আছে—তাঁহারই নামানুসারে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। বিভিন্ন চরিত্র ও গুণসমন্বিত কতকগুলি বিসদৃশ পদার্থে সামঞ্জস্য বিধায়ক কোনও বিশেষ চরিত্র বা গুণ না দেখিলে আমরা

তাহাদিগকে এক আখ্যায় অভিহিত করি না। সুতরাং এই ভারতবর্ষ নামের মধ্যে বহির্বৈচিত্র্যের সমতা বিধায়ক একত্ব বর্ত্তমান থাকা অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ আখ্যায় সামঞ্জস্যীকৃত একত্ব এক মহান্ সাধনা প্রসূত। মহারাজ ভরত বিরাট সাধনার প্রতিভূ-রূপে সমগ্র দেশ একীভূত করিয়াছিলেন। "Soul of India" নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন—"Bharata stood before the multitudinous peoples that inhabited in the territories that took his name as the representative of a great civilisation and culture. * * * Bharata was a Vedic personage." দেশের প্রাকৃতিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও যে এক মহান্ সাধনার ধারা সুদূর অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ভারত-ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা উহা বুঝিতে অকৃতকার্য্য হইব। বর্ত্তমান পতনাবস্থা দেখিয়া অতীতে বিশ্বাসহীন আমরা বৈচিত্র্যবহুল নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি, নানা আচার-ব্যবহার প্রভৃতির পশ্চাৎবর্ত্তী সাধনার চরম একত্ব অজ্ঞাত থাকিলেও সত্যানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ধীরে ধীরে এই ভাব-মন্দাকিনীধারা স্পর্শ করিতে পারিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ বলেন,—

"India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity far more profound than that produced either by geographical isolation or political suzereignty.

দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী প্রসূত অন্তর্ম্মুখিনতা, অভিনব সভ্যতা গঠনোপযোগী ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈসাদৃশ্যের সমতাবিধায়ক একই অনাবিল চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা দেশের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় অগ্রসর হইলাম। ভৌতিক উন্নতিকে সভ্যতার চরম আদর্শ ভাবিয়া আমরা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতায় সন্দিগ্ধ হইলেও, যথার্থ তত্ত্বদর্শী ও জ্ঞানলিপ্সু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের প্রাচীনতার গভীরতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। অধ্যাপক হিরেণ ম্যাক্স ডঙ্কার, জ্যাবর্ণস্‌জারণা, ম্যাক্সমূলর, উইলসন, মুইর, টড প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্গণ শতমুখে

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব, গাম্ভীর্য্য ও প্রসারের প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীনতার কাল নির্ণয়ে 'নানা মুনি নানা মত' প্রদান করিলেও অনেকেরই মতে ৫৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকযুগের সূচনা করে। কিন্তু আমাদের কিম্বদন্তি বা বৈদিকগ্রন্থাদি হইতে বৈদিক সভ্যতার কালনির্ণয়ের কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, এক একটি অসভ্যজাতি কালস্রোতের আবর্ত্তের সহিত বর্ব্বরোচিত আচরণ ও পাশবিকতা পরিহার পূর্ব্বক ধীরে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে আরম্ভ করে; কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ বাহির করিতে পারা যায় না যে আর্য্যগণ বর্ব্বরতা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত হইতেছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিনটি অবস্থায় বিভক্ত করা যায়—(১) শারীরিক (২) মানসিক ও (৩) আধ্যাত্মিক। সভ্যতায় প্রথমস্তরে মানব পাশবিক দৈহিক বলে বলীয়ান্, দ্বিতীয়স্তরে মানসিক ও বুদ্ধিজাত নানাপ্রকার উদ্ভাবন ও আবিষ্কার রত ও শেষ অবস্থায় জড়জগতের সীমাবহির্ভূত যথাথ মানব-স্বরূপ অনুভব ও বিশ্বরহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন পরায়ণ। বৈদিক সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়া আর্য্যসভ্যতার স্তর নির্ণয় করিতে গেলে স্পষ্ট বোধগম্য হয়—আর্য্যসভ্যতা তৃতীয় অবস্থায়ই উন্নীত হইয়া রহিয়াছে। কোন্ সুদূর অতীতের তমসাচ্ছন্ন যুগে আর্য্যসভ্যতা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়াছে তাহার চিহ্ন মাত্রেরও ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। জগৎ প্রহেলিকার পূর্ণ সত্যের সন্ধান পাইয়া তদনুযায়ী জাতীয়জীবন পরিচালিত করিলেই সভ্যতা পূর্ণ বিকশিত হয়। সুতরাং আর্য্যসভ্যতা কিম্বদন্তীর সুদূর অতীতযুগে পূর্ণবিকশিত হইয়াছিল—ইহা নিশ্চিত। হিন্দুসভ্যতার প্রাচীনতার নিকট অবনত মস্তক মিঃ হ্যালহেড্ বলেন—"To such antiquity the mosaic creation is but yesterday."

আর্য্যজাতির আদিতত্ত্ব ও আদিম নিবাস সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত নানাভাবে আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ

আর্য্য জাতির আদিম বাসভূমি সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণই ঋগ্বেদ সংহিতায় প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত কয়েকটি স্থান ও নদ নদীর অবস্থান মধ্য এসিয়ায় স্থির করিয়া এবং আর্য্য জাতির বর্ণ, ভাষা ও দেবদেবীর সহিত মধ্য এশিয়াবাসীর বর্ণ, ভাষা ও দেবদেবীর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া প্রতিপন্ন করেন—মধ্য এশিয়া, বা কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী কোনও ভূখণ্ড প্রাচীন আর্য্যনিবাস ছিল এবং নানা সংঘর্ষের তাড়নায় তাঁহারা ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বিতীয় একদল ঐতিহাসিক বেদোক্ত দীর্ঘকাল-ব্যাপী দিবারাত্রি ও শৈত্যাধিক্যের সহিত উত্তর মেরুর ছয়মাস-ব্যাপী দিবারাত্রির সাদৃশ্য দেখিয়া এবং জ্যোতির্গণনা দ্বারা উত্তর মেরু বহু অতীতে বাসযোগ্য ছিল প্রমাণ করিয়া প্রতিপন্ন করেন—আর্য্য জাতির আদিম বাসভূমি উত্তর মেরুতেই ছিল। আর্য্যগণের মেরুত্যাগ-বিবরণ তাঁহারা জেন্দা-বেস্তা নামক প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই মতের একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার লিখিত Orion এবং Artic home in the Vedas গ্রন্থদ্বয়ে তিনি এই মতের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় অপর দল জার্ম্মাণ ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্যানুভব করিয়া পোলাণ্ড বা স্কাণ্ডেনেভিয়াকে প্রাচীন আর্য্যনিবাস বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন।

মধ্য এশিয়ার প্রাকৃতিক অবস্থা এমনই যে এই ভূখণ্ড কোন সভ্যতার লীলা-নিকেতন হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই দৃষ্ট হয় যে বর্ব্বর, দুর্দ্ধর্ষ, রণদুর্ম্মদ নানাজাতি এই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অনেক দেশকে পাশবিকতায় পর্য্যুদস্ত ও ধ্বংস করিয়াছে। শক, হুন প্রভৃতি জাতি চিরকালই জগতের ভীতি উৎপাদন করিয়াছে। উপরন্তু বেদাদিগ্রন্থ হইতে এবং নানা দেশের প্রত্নতত্ত্বালোচনা দ্বারা বহু পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর অনেক স্থলে আর্য্য হিন্দুগণের যাতায়াত

ছিল। যাঁহাদের সভ্যতা ও সাধনা প্রাচীন জগতের দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, অভিজ্ঞতার প্রমাণের উপর তাঁহাদের আদিবাস নির্ণয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত নহে। এই বিষয় ক্রমশঃ বিশদ আলোচনা করিব। লোকমান্য তিলকের মতে—মেরুত্যাগের সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরে বৈদিক সূক্ত লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু বেদে তাঁহাদের যাতায়াত ও সুদীর্ঘ ভ্রমণের সুখ-দুঃখের কথা ঘুণাক্ষরেও বর্ণিত নাই। এমন কি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতীত হয় না যে অতীতে উত্তরমেরু সূর্য্য-রশ্মিতে উত্তপ্ত ও বাসোপযোগী ছিল। তৃতীয়তঃ স্কাণ্ডেনেভিয়া প্রভৃতি সমুদ্রসন্নিকটস্থ স্থান হইতে আর্য্যজাতি বিস্তৃতি লাভ করিলে তদ্দেশস্থ সামুদ্রিক জীবজন্তু ও মৎস্যাদির নামের সহিত বেদোক্ত শব্দ সমূহের সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত; কিন্তু সে প্রকার কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই তিনটি মতবাদের যৌক্তিকতায় সন্দিহান হইয়া অপর একদল ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে ভারতবর্ষকেই প্রাচীন আর্য্যনিবাস বলিয়া প্রমাণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী পৃথিবীর ইতিহাসে—ভারতবর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে স্বরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা সিন্ধু প্রভৃতি নদনদী সমূহের বারম্বার প্রয়োগ ও গান্ধার ও কীকট দেশের উল্লেখ দর্শনে বহু পণ্ডিত উত্তরে গান্ধার (আফগানিস্থান) ও উক্ত নদনদী সমূহের মধ্যবর্ত্তী কোন ভূখণ্ডকেই আদিম আর্য্যনিবাস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু ঋগ্বেদের দুই তিনটি শ্লোকের অর্থান্তর ঘটাইয়া উহার বিরুদ্ধ মতের পোষকতা করা হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন—দেবতা বিষ্ণুর আশ্রয়ে আর্য্যেরা ভারতভূমে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথে তিনটি স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রিধা নিদধে পদং"। তদ্ব্যতীত তাঁহারা 'প্রত্যেক' শব্দের অর্থ উত্তর মেরু, "কে ষ্টা নব শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়" শ্লোক দ্বারা কোনও উচ্চ ভূখণ্ড হইতে আর্য্যদের ক্রমাগমন ও যক্ষু, রুশম প্রভৃতি নদীকে মধ্য এশিয়ার অক্সাস (oxus) প্রভৃতি নদী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য "প্রত্নোক" শব্দের অর্থ স্বর্গভূমি করিয়াছেন, এবং শাকপুণি,

ঔর্ণনাভ প্রভৃতি প্রাচীন নিরুক্তকারগণ বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য, ও বিশ্রামস্থান-ত্রয়কে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনুবাদে পণ্ডিত মোক্ষমুলরও বিষ্ণুর অর্থ সূর্য্য করিয়াছেন—"The stepping of Vishnu is emblematic of the rising, the culminating and the setting oft he sun." "কে তোমরা দূর প্রদেশ হইতে একে একে আসিয়াছ?" উহা—মরুদ্গণের উদ্দেশ্যে লিখিত, কিন্তু এই মরুদ্গণই কি আর্য্যগণ?—উহার কোন প্রমাণ নাই। যক্ষু, রুশম প্রভৃতি শব্দসমন্বিত সমগ্র বাক্যটিদ্বারা প্রমাণিত হয়, আর্য্যগণ তদ্দেশে যাতায়াত ও যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন। মিঃ মুইর (Muir) সংস্কৃত ভাষার বহু অনুশীলন করিয়াছেন; তিনি বলেন—

"They could not have entered from the west because it is clear that the people who lived in that direction were descended from the very Aryans of India.........nor could the Aryan have entered India from the north or north-west beacuse we have no proof from history or philosophy that there existed any civilised nation with a language and religion resembling theirs which could have issued from either of those quarters at early that period and have created Indo-Aryan civilisation."

বৈদিক যুগের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে মিশর, আসিরীয়া, বাবিলন প্রভৃতির ন্যায় খনন দ্বারা কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এখনও ঘটিয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য ও সমতলের আর্দ্রতা কোন অতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। হেভেল সাহেব অনুমান করেন—রাজপুতনার বিশুষ্ক ভূমি খনন দ্বারা প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। সাক্ষাৎ প্রমাণের অভাববশতঃ বৈদিক সাহিত্যই পুরাতত্ত্ব আলোচনার একমাত্র অবলম্বন। বৈদিকযুগের ইতিহাস বৈদিকসাহিত্যেই নিহিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদীয় গাথা সমূহের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সাহিত্যিক প্রমাণ জগতের কোন জাতি দেখাইতে পারেন না। মোক্ষমুলর বলেন—

"They are the oldest books in the library of mankind." সমগ্র বেদ চারিভাগে বিভক্ত যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। কেহ কেহ অথর্ব্ববেদকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন, আবার কেহ কেহ—উহার যাদুমন্ত্র ও অদ্ভুত গাথাসমূহ আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদেরও পূর্ব্বে স্থান দিতে চাহেন। প্রত্যেক বেদ তিনখণ্ডে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ বা আরণ্যক। সংহিতা প্রাচীন ঋষিগণের প্রাকৃতিক নানা শক্তির প্রতি স্তবস্তুতিতে পূর্ণ। ব্রাহ্মণ সমূহে কোন্ গাথা কোন্ বিশেষ ক্রিয়ায় প্রশস্ত ও গীত হইবার যোগ্য তাহাই উল্লিখিত রহিয়াছে। উপনিষদ্ বা আরণ্যক এই জড় জগতের পশ্চাদ্বর্ত্তী সনাতন সত্যের আবিষ্কারে ব্যস্ত। এতদ্ভিন্ন তিনখানি সূত্রগ্রন্থ বেদাঙ্গ ও উপবেদ সমূহকেও বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির নিয়মাবলী, গৃহ্যসূত্রে পারিবারিক ধর্ম্মকর্ম্মের উপদেশ ও ধর্ম্মসূত্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয় কথিত হইয়াছে। মনুসংহিতার ভিত্তি বলিয়া ধর্ম্মসূত্র ঐতিহাসিকগণের নিকট পরিচিত। বেদাঙ্গসমূহ শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ এই কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত। উপবেদসমূহের চারিভাগ—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। ধনুর্ব্বেদ আখ্যাত বিজ্ঞান বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে বহুল প্রচলিত ছিল। কঠোর সংযম ও সাধনা দ্বারা প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মপালন নিমিত্ত উহা লাভ করিতেন। উহা আদৌ অবৈজ্ঞানিক বা অবিশ্বাসযোগ্য নহে। (এই বিষয় বিশেষ জানিতে হইলে—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত ভারতের সাধনা দ্রষ্টব্য)।

বৈদিক সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। কাব্য মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বিকশিত করিয়া দেয়। মানবীয় চিন্তা ও প্রেরণা—মানব মনের মূর্চ্ছনা চিরদিনই এক ; সুতরাং কাব্য জাতিগত, দেশগত বা ধর্ম্মগত সংস্কারের গণ্ডীবদ্ধ নহে। এই হেতু জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমরা বৈদিক সাহিত্য-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি। বৈদিক গাথাসমূহে আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাবই প্রবাহিত। এক ধর্ম্মনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, আত্মশ্রদ্ধাপরায়ণ, ভগবানে অগাধ বিশ্বাসশীল জাতির

বহুশতাব্দি ব্যাপী মনোভাব ও প্রেরণা এই গাথাসমূহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সমূহে "সরলতা, তেজস্বিতা ও সুদৃঢ় সত্যানুরাগের সহিত যেন একটি অপরিণত যুবার উদ্দামগতি ও উদ্যমশীলতার সুন্দর সুষমা সংমিশ্রিত রহিয়াছে। যদিও ভীতি প্রসূত নিসর্গের ভক্তি ও সুকৃত-দুষ্কৃতানুযায়ী দণ্ড-পুরস্কার বিধায়ক ঈশ্বরের অর্চ্চনা উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।" উপনিষদের রাজ্যে প্রবেশ করিলে আমরা ধীরে ধীরে জড় হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন্ অন্তররাজ্যে চলিয়া যাই—মন যেন এক অনাবিল শান্তভাবে লয় পাইতে চায়। কবির ভাষায় বলিতে হয়—"ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়—সব চাওয়া সব পাওয়া।" সোপেনহাওয়ার উপনিষদের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"It has been the solace of my life and it will be the solace after my death. উপনিষৎ ভয়লেশমাত্র শূন্য হইয়া সত্যের আহ্বানে রত—শান্তি ও শক্তিতে মহিয়ান্। বিখ্যাত কবিগণ সাধারণতঃ ব্যক্তের ভিতর দিয়াই অব্যক্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—অনন্তের মহান্ ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া ব্যক্ত জগতের সামগ্রীকে তুলনা ও অনুমানযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষৎ অনন্তের বার্ত্তা আনয়ন করিতেছেন—সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তজগতের তুলনা ও অনুমানকে পরিহার ও অস্বীকার করিয়া, উপনিষৎ সত্যকে অসম্পূর্ণ ব্যক্ততার সাহায্যে প্রকাশিত না করিয়া সেই শাশ্বত সৌন্দর্য্য—যাহার ক্ষীণ অস্ফুট রেখা মাত্র এই বিশ্ব প্রকৃতি তাঁহার সম্বন্ধে গাহিতেছেন—

"যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

(ক্রমশঃ)

ভূমার সন্ধানে।

(পথিক।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আলোচ্য আখ্যায়িকাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবর্ষি নারদ সমগ্র বৈদিক ও লৌকিক বিদ্যার অনুশীলন করিয়াও পরাশান্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। 'আত্মবিৎ' হইলেই যে পরাশান্তি অধিগত হয় এ কথা ঋষিমুখে শুনিয়া তিনি আত্মবিদ্যালাভে আকাঙ্ক্ষী হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আদিঋষি সনৎকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে প্রথমে তদধিগত বিদ্যাকেই ব্রহ্মভাবে চিন্তা করিতে উপদেশ করিলেন। এই খানেই অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রারম্ভ। ব্রহ্মদৃষ্টির অভাবেই নারদের অধিগত বিদ্যা ব্যবহারিক বিদ্যাতেই পর্য্যবসিত ছিল, সনৎকুমার ব্রহ্মদৃষ্টিতে সেই বিদ্যার অনুশীলন করিতে উপদেশ করিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করিলেন। নারদ ঋষি অপূর্ব্ব অধিকারী, তিনি শ্রবণ মাত্রই উপদেশ ধারণা করিয়া উচ্চ উচ্চ বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীজই ক্রমশঃ শাখা-পল্লবে প্রসারিত হইয়া সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, "মৃদিত কষায়" নারদ ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। নারদ ঋষি যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব সমূহের ধারণা করিতে লাগিলেন তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, তাঁহাকে একেবারেই সর্ব্বোপাধিরহিত পরমাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেও তিনি তাহা অনায়াসে ধারণা করিতে পারিতেন। কিন্তু শ্রুতির তাহা অভিপ্রেত নহে। সাধক সাধারণ ব্যবহারিক জীবনাবলম্বনে কিরূপে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে তাহা বিবৃত করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। সেই সত্যটি সহজে বোধগম্য করিবার নিমিত্তই আখ্যায়িকার অবতারণা।

আশঙ্কা হইতে পারে—ব্যবহারিক বিদ্যাকে, অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিণত করিবার জন্য যে "ব্রহ্মোপাসনার" উপদেশ হইল তাহার অর্থ কি?

বাহ্য বিদ্যাগুলি ত' কিছুতেই ব্রহ্ম হইতে পারে না, যদি হইত তবে বাহ্য-বিদ্যার চর্চ্চাতে ব্রহ্মবিৎ হওয়া যাইত ; তবে আর নারদের তাহা হইল না কেন ? যদি বলা হয়, নারদের তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল না বলিয়াই তিনি ব্রহ্মবিৎ হইতে পারেন নাই,—তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, যদি ব্যবহারিক বিদ্যাতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিলেই 'ব্রহ্মবিৎ' হওয়া যাইত তবে নারদকে পর পর এতগুলি উপদেশ প্রদত্ত হইল কেন ? 'নাম' বা বাহ্যবিদ্যাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া লইয়াই ত' তিনি নিরস্ত হইতে পারিতেন ; সুতরাং এ কথা নিশ্চয় যে "যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম" এরূপ একটা কথা শুনিয়া লইয়া বাহ্য বিষয়েই সবটা মন নিযুক্ত রাখিলে তাহাকেই অধ্যাত্মবিদ্যা বলা যাইতে পারে না, তাহাতে আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় একজন বৈজ্ঞানিক যদি বিজ্ঞান চর্চ্চার ভিতর দিয়া ব্রহ্মচিন্তা করিতে ইচ্ছুক হন, তবে একই সময়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও ব্রহ্মের চিন্তা কিরূপে সম্ভবপর হয় ?

উত্তরে বলা যাইতে পারে, এ কথা সত্য যে উপাসনাতে উপহিত ব্রহ্মের চিন্তারই প্রাধান্য। যেমন শালগ্রাম শিলায় যখন বিষ্ণু বুদ্ধিতে উপাসনার উপদেশ করা হয়, তখন ধ্যানের উপদেশ হয় শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী নারায়ণের ; শিলাটি সেই চিন্তার একটি অবলম্বন মাত্র, সেই শিলার সেবায় সাধক নারায়ণেরই সেবার চিন্তা করিবেন। বিজ্ঞা-নাদির চর্চ্চাও সেইরূপ আত্মচিন্তার প্রাধান্যে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। প্রত্যেক চেষ্টারই দুইটি দিক্ আছে, একটি কার্য্যকর্ত্তার নিজের দিক বা subjective side অপরটি তাহার কার্য্যের দিক বা objective side। নিজের দিক্ হইতে, যখনই যিনি যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন অথবা যে চিন্তাদি করিতেছেন তখনই তিনি নিজেকে সেই কার্য্য বা চিন্তা-শক্তিরূপে অনুভব করিয়া পরে বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। বস্তুতঃ বিশেষ বিশেষ এক একটা কার্য্য বা চিন্তার মূলে বিশেষ বিশেষ এক একটি 'আত্মানুভব,' জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ নিজেকে পূর্ব্বে অনুভব না করিয়া কোন চেষ্টাই করিতে পারে না অথবা কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারে

না। আমি যখন একটি প্রস্তর উত্তোলন করি তখন প্রথমে আমি নিজকে বলবানরূপে অনুভব করিয়া পরে ভার উত্তোলন ব্যাপারে সেই শক্তির প্রকাশ করিয়া থাকি। কবি যখন কাব্য প্রণয়ন করেন তখন তিনি নিজকে কবিত্ব শক্তিরূপে অনুভব করিয়া তবে ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন। এই প্রকারে সর্ব্বত্রই সকল চেষ্টা বা জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে এক একটি বিশিষ্ট আত্মানুভব। অভ্যাসের দ্বারা এই সকল স্বাভাবিক অস্পষ্ট আত্মানুভবগুলিকে স্পষ্টতর করিয়া সেই বিশেষ বিশেষ আত্মানুভব সকলকে অবলম্বন করতঃ নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই বৈদিক ব্রহ্মোপাসনার তাৎপর্য্য। নিজের দিকটা (subjective side) এইরূপে স্পষ্টতর ও উচ্চতর হইয়া উঠিলে তাহাতে বাহ্য চেষ্টার দিকটা (objective side) পঙ্গু না হইয়া বরং অধিকতর বীর্য্যবান হইয়া উঠিবে। শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন "তেনোভৌ কুরুতে, যশ্চ এতৎ এবং যশ্চ ন বেদ, নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ, যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।"* কারণ যে আত্মানুভব সকল ক্রিয়াশক্তির একমাত্র প্রেরক, তাহাকে যদি অনন্তশক্তির আধার ভাবিয়া স্পষ্টতর রূপে অনুভব করিতে শিক্ষা করা যায় তবে যে বাহ্য চেষ্টাও সমধিক কৃতিত্ব ও নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইরূপে আত্মচিন্তার অভ্যাস করিলে, বাহ্যতঃ যে কার্য্যটি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকেও আত্মশক্তিরই স্থূল বিকাশ রূপে স্পষ্ট অনুভব করিয়া সাধক বিকারের ভিতর দিয়াও অবিকারীকেই দেখিতে পাইবেন, এবং তাঁহার চিত্ত উত্তরোত্তর অন্তর্ম্মুখী হইতে থাকিবে। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত' (Practical Vedanta). বেদান্ত শাস্ত্রের এই সত্যটিকে লক্ষ্য করিয়াই স্বামিজী বলিতেছেন :—

* ভাবানুবাদ—যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং যে ব্যক্তি না জানিয়া করে, তাহারা উভয়েই বস্তুতঃ আত্মার শক্তিতেই কর্ম্ম করিয়া থাকে ; এই জানা ও না জানাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল প্রসব করে। আত্মার শক্তি অবগত হইয়া শ্রদ্ধা ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা সমধিক বীর্য্যবান হইয়া থাকে।

"These conceptions of the Vedanta must come out, must remain not only in the forests, not only in the cave, but they must come to work out at the Bar and the Bench, in the Pulpit, and in the Cottage of the poor man, with the fisher man that are catching fish, and with the students that are studying."*

বেদান্তোক্ত এই আত্মচিন্তাই ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের একমাত্র মিলনভূমি। সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপন করিয়া ধীরে ধীরে সাধনার সলিল সেচন দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টাই বেদান্তের উপসনা কাণ্ডের একমাত্র অভিপ্রায়।

দ্বিতীয়তঃ—জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, বলবীর্য্য ও অভ্যুদয় সাধনের কথা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানুষের ভিতর যখনই যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এক একটি বিশেষ বিশেষ আত্মানুভবের ফল। 'সকলের ভিতর সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপ আত্মা 'চিৎ'রূপে সর্ব্বদা সমভাবে বিদ্যমান আছেন, প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহারই প্রকাশ হইতেছে'—বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত বাক্যে যাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে এবং সেই স্বাভাবিক আত্মানুভবটিকে অভ্যাস দ্বারা যিনি স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তিনি যখন যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, নিজেকে সেইরূপ ভাবে অনুভব করিয়া, সেইরূপ শক্তি অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারেন। যিনি দৈহিক বলের অভিলাষী তিনি আত্মাকে বলরূপে উপাসনা করুন; এই প্রকার যিনি যে শক্তির অভিলাষী তিনি নিজেকে সেইরূপ ভাবে অনুভব করিতে অভ্যাস করুন। বাস্তবিক পক্ষে, মানুষ যখনই যে শক্তির অনুশীলন করে তখনই সে একটা বিশেষ ভাবে আত্মানুভবেরই চেষ্টা করিতেছে; সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান তাহার ভিতরেই অনুভূত হইতেছে বাহিরের দিকটা সেই অনুভবেরই প্রকাশ মাত্র। না জানিয়াও মানুষ সেই সর্ব্বশক্তিমান আত্মাকেই বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া শক্তির প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু

* "Vedanta in its application to Indian life": (Lectures from Colombo to Almora)

জানিয়া শুনিয়া সে যদি ভিতরে সেই শক্তিটিকে অনুভব করিতে প্রথম হইতেই সচেষ্ট থাকে তবে তাহার চেষ্টা আশুফলপ্রদ ও সমধিক বীর্য্যবান হইয়া থাকে। উপরে আমরা এ বিষয়ে শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। মহাবীর হনুমান অনন্ত বলবীর্য্য সম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রকে আপনার আত্মারূপে স্পষ্ট অনুভব করিতেন বলিয়াই তিনি অসাধ্য সাধন করিতেন। আত্ম-শক্তির নিকট অসাধ্য বলিয়া কোন কিছুই নাই, ইহাই বেদান্তের উপদেশ। আলোচ্য আখ্যায়িকার 'ফলশ্রুতি' গুলির কথা ভাবিয়া দেখিলে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অনন্তশক্তিসম্পন্ন আত্মাকে যিনি যে ভাবে অনুভব করিবেন তাহাতে সেই শক্তির বিকাশ অবশ্যই হইবে। শক্তি-প্রকাশের মূল আত্মপ্রত্যয়—বেদান্তের আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস। আমাদের আজ অভাব হইয়াছে শক্তির, কিন্তু বাহির হইতে তাহা আসিবে না, অভ্যাস দ্বারা ভিতর হইতেই তাহাকে বিকাশ করিতে হইবে। এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই স্বামিজী তার-স্বরে বলিতেছেন:—
"Therefore my friends, as one of your blood, as one that lives and dies with you, let me tell you that we want Strength, Strength, and every time Strength! And the Upanishads are the great mine of Strength. Therein lies Strength enough to invigorate the whole world; the whole world can be vivified, made strong, energised through them."

এবার তৃতীয় বা শেষ কথা—জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও তাহার সাধন।

জগতের সকলেই চাহিতেছে সুখ। কেন চাহিতেছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেককেই নির্ব্বাক্ হইতে হইবে। কৈ দুঃখ ত' কেহ চাহিতেছে না,—আর চাহিবেই বা কেমন করিয়া, দুঃখ বলিতে মানুষ সুখের অভাব ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারে না, সুখের তুলনায়ই দুঃখকে বুঝিয়া থাকে। সুখটা যেন তার নিজস্ব আর দুঃখটা যেন একটা আগন্তুক ভাব, সুতরাং দুঃখকে সে চাহিতেই পারে না। আর চাহিতেছে বলিয়া আপাততঃ যাহাকে মনে হয়, সেও কিন্তু দুঃখকে চাহে না; বস্তুতঃ অপরের নিকট যাহা দুঃখজনক, সে তাহারই ভিতর

অনুসন্ধান করিতেছে সুখ। সুখের ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ ধারণা-গুলির কথা ছাড়িয়া' দিয়া, মূল সুখানুসন্ধান ব্যাপারটার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা সকলেরই স্বাভাবিক—কোনওরূপ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে। মোট কথা, জন্মাবধি মানুষ স্বভাবতঃই ইহা বোধ করে যে, তাহার যেন কি একটা হারাইয়াছে, সেটা পাইলেই সে সুখী হইবে। সেই হারাণ ধনটিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়াই মানুষ জীবনের সারাটি পথ অতিবাহিত করিতেছে। সৃষ্টির যদি একটা আদি থাকে তবে সে দিন হইতেই বোধ হয় এই খোঁজাখুঁজি চলিয়াছে,—এই হারাণধনের সন্ধানেই যেন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেই হারাণ রতনের সন্ধান মানুষ পাইয়াছে কি? "পাইলাম" বলিয়া আজ যাহাকে আকড়াইয়া ধরিতেছে, কাল বুঝিতেছে সেটা ঠিক তার হারাণ ধনটি নয়। এইরূপে একটি ফেলিয়া আর একটি তুলিয়া অনাদিকাল ধরিয়া জগৎটা চলিয়াছে সেই হারাধনের সন্ধানে। উহাকে পূর্ণভাবে পাইয়া চিরদিনের তরে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে, এতটুকুও এদিক ওদিক হইতে না দিতে পারিলেই, বোধ হয় নিখিল বিশ্ব চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিত।

এই যে সুখের ধারণাটি, উহা যখন বাহির হইতে আসে নাই, মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিতরই যখন উহা স্বভাবসিদ্ধরূপে রহিয়াছে, তখন বাহিরে খুঁজিলে উহাকে পাওয়া যাইবে কি?—গলায় হার রাখিয়া, হারের সন্ধানে সারাগৃহ পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করাও যা, জগতের সুখের সন্ধানটাও বস্তুতঃ তদ্রূপ। রূপ-রসের বিপুল স্তূপ ত' মানুষ ওলট-পালট করিয়া দেখিতেছে, কিন্তু সেই সুখের স্থির সন্ধান পাইয়াছে কি? মাঝে মাঝে রূপরসের ভিতর দিয়া তার একটু অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া মানুষ এক একবার "পাইলাম" বলিয়া হাত বাড়াইতেছে সত্য, কিন্তু সেটা বাস্তবিক পাওয়া না লুকোচুরী?—সুখটা কিন্তু বাস্তবিক রহিয়াছে মানুষের ভিতরে। রূপ-রসের ভিতরে অনুসন্ধান করিতে করিতে, এক একবার তার অজ্ঞাতসারে মানুষ যেন ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে সুখের কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিতেছে বাহিরে। আর তার স্মৃতিটুকু লইয়া পাগল হইয়া ছুটিতেছে।

যে মুহূর্তে মানুষ সুখের অনুভব লাভ করে তখন তাহার মনোবৃত্তিগুলি বাহিরের দিক হইতে ভিতরে প্রবেশ করে, ক্ষণিকের জন্য তাহার বাহ্য বৃত্তিগুলি ভিতরের দিকে গুটাইয়া আসিয়া একটা স্থানে স্থির হয়, তখনই ভিতরের সুখস্বরূপ বিদ্যুতের মত চকিতে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অনভ্যস্ত চিত্তবৃত্তিগুলি সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, উহারা আবার বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, আর সেই সুখের অস্পষ্ট স্মৃতিটুকু লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে। বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট সন্তানকে সহসা কাছে পাইয়া, স্নেহময়ী জননী যে সুখ অনুভব করেন, সে সুখটা তিনি পান তাঁহার অন্তর হইতে। "এই যে আমার বাপ্" বলিতেই তাঁহার সমস্ত বহির্মুখী বৃত্তিপ্রবাহ এককালে স্থির হইয়া যায়, অমনি ভিতরের শাশ্বত সুখস্বরূপটি ছাই চাপা আগুনের মত যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তখন সম্মুখে অবস্থিত পুত্রের অস্তিত্বও তাঁহার অনুভব হয় না। অনুভব হয় শুধু একটা আনন্দের। কিন্তু নানাপ্রকার বৃত্তিপ্রবাহের পুনরুন্মেষে আবার তাহা ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন আনন্দ আর থাকে না, থাকে শুধু তার স্মৃতি। বেদ বলেন, পতি-পত্নীর দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে উভয়ের যে আনন্দ হয় তাহাও সেই আত্মানন্দেরই ক্ষণিক আংশিক স্ফুরণ মাত্র। সে সময়ে পতি পত্নীকে জানিতে পারে না, পত্নী পতিকে জানিতে পারে না; সমস্ত বাহ্য সংজ্ঞা বিলুপ্ত হওয়ায় তখন বুদ্ধিতে আত্মানন্দ প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। মোট কথা, মানুষ বিষয়-সঙ্গে যে আনন্দের আভাস মাত্র পাইয়া মনে করিতেছে, বিষয়-সংযোগে উহা 'উৎপন্ন' হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ ভিতরে সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত আত্মানন্দেরই এক একটি অস্পষ্ট বিকাশ মাত্র। শুষ্ক মৃতাস্থি চর্ব্বন করিতে করিতে, নিজের দন্তমূল হইতে বিগলিত রক্তের আস্বাদ পাইয়া, কুকুর যেমন মনে করে, রক্তের আস্বাদটা সে চর্ব্বিত হাড় হইতেই পাইতেছে, মানুষও সেইরূপ নিজের স্বরূপ হইতে প্রকাশিত সুখের সামান্য আভাস মাত্র পাইয়া, মনে করে, উহা বিষয় হইতেই আসিতেছে; আর পাগল হইয়া, সুখের আধার সেই পরমাত্মার দিকে পিছন ফিরিয়া সুখের আশায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। হায় রে! যাহার আভাস-

মাত্রে জগৎটাকে এম্নি ভাবে পাগল করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিলে যে কি হয় তাহা "বুঝে প্রাণ বুঝে যার" !!

সেই হ্রাস-বৃদ্ধিহীন পূর্ণ আনন্দকে পূর্ণভাবে লাভ করাই মানুষের উদ্দেশ্য। বুঝিয়া বা না বুঝিয়া সে তাহারই জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। যে ব্যক্তি একথা বুঝিয়া, বিষয়ের নেশা কাটাইয়া ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন, তিনিই মুমুক্ষু, ত্যাগী, বিবেকী ; আর না বুঝিয়া বাহিরটাকে লইয়াই যাহারা ব্যস্ত, তাহারা বদ্ধভোগী, ভ্রান্ত প্রাকৃত জীব—তাহাদের সকল চেষ্টাই প্রাকৃত চেষ্টা, অতএব পরিণামে দুঃখপ্রদ। উল্লিখিত আখ্যায়িকাতে, মানুষের স্বস্বরূপ সেই পূর্ণ আনন্দ বা "ভূমা"কে লাভ করিবার উপায়ই আখ্যায়িকাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। উপায়, বুদ্ধিকে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী করিতে অভ্যাস করা। তাহার জন্যই একটির পর একটি করিয়া সূক্ষ্মতর তত্ত্বাবলম্বন আত্ম-চিন্তা অভ্যাসের উপদেশ। জীবনের প্রত্যেক স্তরেই সেইরূপ উপাসনার প্রারম্ভ হইতে পারে, তাহাতে যে জীবনটা পঙ্গু না হইয়া সকল অঙ্গে পূর্ণ হইয়াই উঠিতে থাকে, ফল-শ্রুতির প্রসঙ্গে একথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্য বিষয়গুলিকেই সার বলিয়া ভাবিয়া তাহাদের দিকেই মুখ ফিরাইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই বিবেক অসিটিকে সর্ব্বদা সুশানিত ও কোষমুক্ত করিয়া রাখার আবশ্যকতা।

যাহা হউক, আখ্যায়িকাতে বর্ণিত উপাসনা-ক্রমে অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "ভূমা"কে অবগত হইতে হইলে প্রথমেই কি কি সাধনের প্রয়োজন আখ্যায়িকাতে সুস্পষ্টভাবে তাহা বিবৃত হইয়াছে। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"—হ্রাসবৃদ্ধিহীন, অপার অনন্ত, সমস্ত ভেদবুদ্ধির অতীত, আত্মানন্দই সুখ, বিষয় সুখ তুচ্ছ ও বিনশ্বর ; "অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং"—এ কথাটি জানিলে তবেই অন্তর্ম্মুখিনতা অভ্যাসের প্রবৃত্তি হইতে পারে। ইহাই নিত্যানিত্য বস্তুবিচার। একটা বড় কিছুর সন্ধান পাইলে, যাহা ক্ষুদ্র তাহাতে আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেগুলি স্বভাবতঃই নিবৃত্ত হইয়া যাইতে থাকে, তাহাই 'কৃতি' বা শমদমাদি সাধন। সেই আকাঙ্ক্ষিত বড় বস্তুটিকে লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিলেই মানুষ উপায়ের

অনুসন্ধানে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উপযুক্ত উপদেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তার পর নিষ্টার সহিত শুশ্রূষাদিতে রত থাকিলে ক্রমে উপদিষ্ট বিষয়ে শ্রদ্ধার উন্মেষ হইয়া উপদেশ দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। তখনই সকল চেষ্টার ভিতর উপদেশটিকে বজায় রাখিয়া সকল অবস্থায় তাহারই মননে ব্যাপৃত থাকা সম্ভবপর হয়। মননের দ্বারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। উপাসনা মননেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। মননই সকল প্রকার সিদ্ধির সাধারণ উপায়। এই মননকে আয়ত্ত করিবার জন্য উল্লিখিত ক্রমে সাধন অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লৌকিক ও পারমার্থিক সকল প্রকার সাধনাতেই এই ক্রমটি অনুস্যূত রহিয়াছে; কোন সাধনাতেই এই ক্রমের একটিও লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

এইরূপে, বৈদিক সাহিত্যের সামান্য সামান্য আখ্যায়িকা বা রূপকের অন্তরালে যে কত আশ্চর্য্য দেশকাল-নিরপেক্ষ সত্যসমূহ নিহিত রহিয়াছে, শ্রদ্ধাসহকারে তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। পাশ্চাত্য মনীষিকেও তাহার আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া বলিতে হইয়াছে "উপনিষদ্ সমূহ সনাতন সত্যরাজির অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ।" চর্চ্চা ও শ্রদ্ধার অভাবে আমরা তাহা হারাইয়া উপায়ের অনুসন্ধানে মূর্খের মত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। শ্রুতির ভাষায় বলিতে গেলে ক্ষোভের সহিত বলিতে হয় আমাদের অবস্থা হইয়াছে—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈবনীয়মানা যথান্ধাঃ"॥

আমাদের সনাতন বৈদিক সত্যসমূহই দেশের বর্ত্তমান সমস্যা—এমন কি জগতের যাবতীয় সমস্যার—সমাধান করিয়া দিতে সমর্থ। মন্ত্র আমাদের রহিয়াছে, আজ চাই শুধু, দেশকালের উপযুক্ত পদ্ধতিতে যজ্ঞস্থলে তাহার অব্যর্থ প্রয়োগ-কুশলতা, অমোঘবীর্য্য, শুদ্ধ নিষ্পাপ, নিরাকাঙ্ক্ষী ঋত্বিকের দল! দেশবাসী কি এ মহাযজ্ঞের উদ্‌যাপন করিয়া তাহার অমোঘ ফল হস্তগত করিতে আজও পশ্চাৎপদ থাকিবেন?

মায়ার খেলা।

(শ্রীঅজ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সবে সুপ্রভাত। পুরীর অসংখ্য মন্দির হইতে মঙ্গলারতির শঙ্খ ঘণ্টা ও নহবতের তরল তান, লয়, মূর্চ্ছনা ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ তুলিয়া এই সবে মাত্র থামিয়াছে। ফেনশীর্ষ তরঙ্গরাজি চুম্বিত সমুদ্রের বালুকা বেলায় দণ্ডায়মান অসংখ্য নরনারী নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছে সীমাহীন উলঙ্গ সিন্ধুর সেই রুদ্র-মধুর নৃত্য। বালার্ক-কিরণ-সম্পাতে স্বর্ণাভ নীল জলের তরঙ্গ তুলিয়া উদধিবর কত ভঙ্গিমায় ছুটিতে ছুটিতে হাসিতে হাসিতে বেলাভূমি চুম্বনে ফাটিয়া পড়িতেছে, মুক্তাফলক সদৃশ কত শত জলকণা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কত নব নব রূপতরঙ্গের সৃজন করিতেছে, জলকণাবাহী মৃদুল মলয়ানিলের সহিত সুর মিলাইয়া সিন্ধুরাজ মেঘমল্লার রাগিনীতে কেমন দিবা রজনী করুণাময় জগন্নাথের স্তব করিতেছে—ইহা দেখিতে দেখিতে অসংখ্য নরনারীর চির-চঞ্চল মন সুখদুঃখ সম্পর্ক শূন্য অতিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আনন্দৈকরসপরিপ্লাবিত এক অভিনব রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সময়ের জন্যও এই স্থূল জগৎ হইতে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। ঘননীল দিকচক্রবাল বেষ্টিত, [illegible] নৃত্যশীল উদধিবরের এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সুষমা দর্শনে সকল দর্শকই 'আপন-ভোলা' হইয়া যাইলেও ঐ অমার্জ্জিত দেহ, উন্মনা দৃষ্টি, ইতঃস্তত পরিভ্রমণশীল যুবককে দেখিয়া মনে হয়, কোন উপদেবতার সংস্পর্শে উহার হৃদয় এরূপ কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়া গিয়াছে যে প্রকৃতি দেবীর এই প্রাণমন বিমোহনকারী লীলা বৈচিত্র্যও তাহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই। কে এ যুবক, যাহার এই নব বিকসিত জীবন-কুসুম কোন্ ঊষর মরু তাপে বিদীর্ণ প্রায়, কে এ যুবক, যাহার সকল সুখ লালসা, সব খানি তরল হাস্য কোলাহল কোন্ এক অমানব পুরুষের তৃতীয় নয়ন বিচ্ছুরিত লেলীয়মান অগ্নিশিখা সম্পাতে পুড়িয়া ছাই হইয়া তাহার সমস্ত জীবনটাকে

কঠোর পরিহাসময় করিয়া তুলিয়াছে। তাহার দেহের প্রতি রোম-কূপে বক্ষের প্রতি পঞ্জরে হৃৎপিণ্ডের প্রতি কক্ষে ধমনীর প্রতি বিন্দুতে, যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার দগ্ধ যন্ত্রনায় সে যেন উন্মত্ত হইয়া সমুদ্রের এই দিগন্ত প্রসারিত বেলাভূমিতে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত ছুটাছুটি করিতেছে। তবুও কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, লক্ষ্য করিলেও কেহ তাহার উপর মনযোগ দেয় নাই—কেবল একটী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, যাঁহার শীর্ণ দেহ-পিঞ্জর তাঁহার জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্যের অভিনয়-কাল অতি সন্নিকট বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছিল, তিনি কৃপা পরবশ হইয়া এই বিশীর্ণ-বদন যুবকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ" ? যুবক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখের উপর দুটো ফ্যাল-ফ্যালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—"আমি মৃত্যু-যাত্রী, মৃত্যুর দেশ হইতে আসিতেছি মৃত্যুর দেশে যাইব বলিয়া।" সন্ন্যাসী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সে কোথায় যুবক ?" যুবক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল—ঐ নীল সিন্ধুর শীতল স্নেহময় ক্রোড়ে। মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী যুবকের হাত ধরিয়া অতি কাতর ভাবে বলিলেন,—"কেন বাবা জীবনে এরূপ হতাশ হইয়াছ ? আমার সহিত চল, আমি তোমার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিব।" যুবক সশঙ্ক কণ্ঠে উত্তর করিল—"কেন সাধু, এই পাপাত্মার ঘৃণিত শরীর স্পর্শ করিয়া তোমার এই পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিতেছ ?" সাধু প্রফুল্লহাস্য মুখে কহিলেন,—"কে পাপাত্মা বৎস, আমি দেখিতেছি তোমার মধ্যে যে সাক্ষাৎ জগন্নাথ বিরাজ করিতেছেন !" যুবক বলিল,"—না সাধু, যদি সাধ্য থাকিত তবে বুক চিরিয়া দেখাইতাম সেই পাপাত্মার ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি, দেখাইতাম হৃদয়ের স্তরে স্তরে কি গভীর ক্ষত করিয়া সে আমার সব শোণিত ধারাটুকু দিবা রাত্র শোষণ করিতেছে, দেখাইতাম কি বিভীষিকা মূর্ত্ত হইয়া আমার নয়ন সমক্ষে অবিরাম নৃত্য করিতেছে। সে কি এক-দিনের ? কত দিনের, কত রাশি রাশি পাপ জমাট বাঁধিয়া আমাকে অহর্নিশি দগ্ধ করিতেছে তাহা কি তুমি জান সাধু ? যাও, আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও—আমাকে নির্ব্বিঘ্নে মরিতে দাও। হে ভগবান্,

মরিয়াও কি আমায় শান্তি পাইতে দিবে না ?" সন্ন্যাসী আর থাকিতে পারিলেন না—গভীর সমবেদনায় নয়নাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে তিনি যুবককে বাহু:পাশে জড়াইয়া ধরিলেন।

* * *

এই যুবক আর কেহ নহে, ইনি যদু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্র ও তারাসুন্দরীর তনয়—আমাদের সেই হারাধন। চক্রান্ত করিয়া সন্ন্যাসী ও গিরিবালাকে অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত করিবার পর হইতে তাহার সকল সুখে ভাঙ্গন ধরিল। তাহার যথাসর্ব্বস্ব নিলাম হইয়া গিয়া সে সর্ব্বস্বান্ত হইল, বন্ধুগণও সকলেই একে একে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। অসংখ্য পাপাচারের অনুশোচনা-রূপ শত শত বৃশ্চিক দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া উন্মাদবৎ দেশ হইতে দেশান্তরে সেই নির্যাতিত সাধুর সন্ধানে ঘুরিয়া কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না—অবশেষে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে পূর্ব্বোক্ত সহৃদয় সাধুটী হারাধনকে চরণে স্থান দিলেন। জগন্নাথের অপার করুণায় ও সন্ন্যাসীর প্রেমপূর্ণ শিক্ষায় হারাধন শান্তিলাভ করিতে আরম্ভ করিল। সে দুই বেলা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে এবং নিয়মিত রূপে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার স্মরণ-মনন সমাপন করিয়া সমস্ত দিনই সাধুর সেবায় ব্যস্ত থাকে। এইরূপে ধীরে ধীরে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। সাধু বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না—বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হারাধনকে যে বলিয়াছিলেন,—"বাবা, আমি তোমার তাপদগ্ধ জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিব" তাহা সে অন্তরে অন্তরে অনেক পরিমাণে অনুভব করিয়াছে ;—কিন্তু সেই সাধু ও সেই সতীসাধ্বী গিরিবালার উপর অমানুষিক অত্যাচারের অনুতাপ তাহার প্রাণের মধ্যে যে রাবণের চিতা জ্বলিয়াছিল তাহা যে আর নির্ব্বাপিত হয় না। 'সাধু নিশ্চয় ক্ষমা করিবে, কিন্তু গিরিবালা ? গিরিবালা কি তৎকৃত সমস্ত অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া তাহার সকল অপরাধ, তাহার সকল পাপ মার্জ্জনা করিতে পারিবে ? যদি আমি তাহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—"গিরি, বোন্ আমার, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্, আমায় মরিয়া শান্তি লাভ করিতে দে" তবুও কি গিরিবালা আমায় ক্ষমা করিবে না ?'

যদি না করে—হারাধন সঙ্কল্প করিল তবে এ দুঃসহ পাপ জীবন রাখিয়া আর কাজ কি? তাহারই সম্মুখে সে এ পাপলীলার অবসান করিবে। হারাধন একদিন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—'বাবা, অনেক দিন বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, একবার বাড়ী যাইব।' সাধু সহাস্য বদনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"এস বাবা, জগন্নাথ তোমার মঙ্গল করুন।"

হারাধন দিবারাত্রি হাঁটিতে হাঁটিতে চলিয়াছে। তাহার অনভ্যস্ত পদ দুটী অতিরিক্ত শ্রমজন্য ফুলিয়া গিয়াছে। অনাবৃতদেহ—সমস্ত শীতাতপ সে অম্লান বদনে সহ্য করিতেছে। একদিন মধ্যাহ্নে হারাধন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। যখন পুনরায় সংজ্ঞা হইল তখন সে দেখিল সে বৃক্ষতলে নহে। একটী পরিত্যক্ত অট্টালিকায় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে এবং অনুভবে বুঝিতে পারিল কে যেন তাহার কপোল দেশে কোমল হস্ত বুলাইয়া তাহার সর্ব্ব শরীরের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শীতল করিয়া দিতেছে। হারাধন চক্ষু মেলিয়া চাহিল—দেখিল এযে তাহার মূর্ত্তিমতী জননী। তাহার পরলোকগতা জননীর সহিত দেহের বিশেষ কোন সৌসাদৃশ্য না থাকিলেও হারাধন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিল এযে তাঁহারই মত স্নেহময়ী। রোগশয্যায় শায়িত হারাধনের মনে পড়িল সেই বাল্যকালের কথা। সেই যখন একটী দুরন্ত বালক মারামারি ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া স্তিমিত সন্ধ্যাবেলায় জনীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িত, তখন তাঁহার স্নেহভরা নিবিড় চুম্বন রাশি স্বর্গের সকল সুখ মর্ত্ত্যে টানিয়া আনিয়া তাহার হাসিকান্নার অভিনয়ের সকল শোকভরা স্মৃতিটুকু যে চিরতরে তাহার মন হইতে মুছাইয়া দিত, মনে পড়িল কত দুঃখ রজনীর কথা—একটী বালক দুরন্ত রোগের তীব্র যাতনায় জর্জ্জরিত হইয়া যখন দীর্ঘ রজনী ব্যাপিয়া বিছানার উপর আর্ত্তনাদ করিত —তখন কে একটী মানবী না দেবী বিশুষ্ক বদনে, নিদ্রাহীন নয়নে, আলু থালু বেশে রাত্রির পর রাত্রি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অমৃত শীতল করস্পর্শে তাহার সকল দুঃখরাশি অপহরণ করিত। তবে এ কি

তাহাঁরই জননী?—সন্তানকে মৃত্যু শয্যায় দেখিয়া পরলোক হইতে নরলোকে নামিয়া আসিয়াছেন? হারাধন মনে বল আনিয়া অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'কে মা তুমি?' ধীরে উত্তর আসিল—"আমি তোমার মা।" যাহা হউক এই দেবীর অদ্ভুত সেবা ও যত্নে হারাধন শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিল। এই দেবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য একদিন সে তাহার নিকট গিয়া বলিল—"মা—তোমার সেবা-যত্নে আমি এবার প্রাণ পাইলাম—মা, আমার জীবনদায়িনী—বলিতে হইবে তুমি কে?" দেবী ধীরে নতমুখে উত্তর করিল—"আমি গিরিবালা।" হারাধনের সমস্ত শিরায় শিরায় তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল—তাহার দেহের সমস্ত রক্তস্রোত জমাট বাঁধিয়া বক্ষস্থলে তীব্রভাবে আঘাত করিতে লাগিল, হারাধন দুর্ব্বলতা সংযত করিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রাণদায়িনী বোন্, তুমি কিরূপে এখানে?" গিরিবালা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল—"সে অনেক কথা হারাদাদা, জাতিপাতিত হবার কয়েক মাস পর গৃহবাস অসহ্য হওয়ায় তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হই। জগন্নাথ দর্শন করিয়া পায় হাঁটিয়া কাশী যাইতেছিলাম—পথে এইখানে বাবা জগন্নাথ-দেবের কৃপায় হটাৎ সেই জটাধারী সন্ন্যাসীর দর্শন পাই। তিনি আমায় আদেশ করিলেন—"মা আর কাশী যাইবার প্রয়োজন নাই। এইখানেই থাক, যে সব যাত্রী পথ হাঁটিতে হাঁটিতে রাস্তায় অসুস্থ হইয়া পড়িবে তাহাদের তুমি কায়মনোবাক্যে সেবা শুশ্রূষা কর, আর অস্পৃশ্য বর্ণের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে, সুশিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মানুষ করে তুল; তা'হলে এখানে বসিয়াই তুমি শিব-দর্শনের ফল পাইবে"—হারাদাদা, সেই থেকে আমি এইখানেই আছি। হারাধন জিজ্ঞাসা করিল—"আমি এখানে আসিলাম কিরূপে?" গিরিবালা বলিল—"তুমি গ্রামের পার্শ্বে বৃক্ষতলে জ্বরবিকারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে—স্বামিজী তোমায় দেখিতে পান—তোমাকে তুলিয়া আমার নিকট শুশ্রূষার ভারার্পণ করিয়া যান।" হারাধন ধীরভাবে উত্তর করিল—"তিনি কোথায়" গিরিবালা উত্তর করিল—"নিকটেই

তাঁহার কুটীরে।" হারাধন নতজানু হইয়া করজোড়ে গিরিবালাকে বলিল—"বোন্ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমায় শাস্তি দে"—গিরিবালা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল—"সে কি হারাদাদা—তোমার আবার অপরাধ কি ? মা যে তোমার অপরাধ বহুদিন ক্ষমা করিয়াছেন।"

হারাধন সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হওয়ায় গিরিবালা তাহাকে নিকটস্থ কুটীরে লইয়া গেল, হারাধন সন্ন্যাসীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তার পর হারাধন অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে সন্ন্যাসীকে বলিল—"বাবা আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুণ, আমায় রক্ষা করুণ।" সাধু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—"বৎস, আমার কাছে ত তুমি কখনও কোন অপরাধ কর নাই।" হারাধন কাতরভাবে বলিল—"অনুতাপানলে আমার হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আমায় শান্তি দিন।" সাধু তাহার দিকে একবার সহানুভূতিপূর্ণ নয়নে চাহিয়া শান্তভাবে বলিলেন—"গিরিবালা যে কর্ম্ম করিতেছে তুমিও নিষ্কামভাবে জগজ্জননীর সেই কর্ম্ম কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান কর—বৎস, তাহা হইলেই প্রাণ পাইবে—শান্তি পাইবে!"

ইচ্ছা সৃষ্টি।

(আনন্দ চৈতন্য)

ইচ্ছা মাত্র একে একে হইল উদয় ;
প্রাণ মন, দেহ আর ইন্দ্রিয় নিচয়।
আকাশ, পবন, জ্যোতি উঠিল ফুটিয়া ;
কল কল রবে জল আসিল ছুটিয়া
দেখিতে দেখিতে কিবা পরম সুন্দর
হাঁসিতে লাগিল পৃথ্বী পূর্ণ কলেবর।

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

(৭)

"শ্রদ্ধা" শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

নচিকেতার৹ শ্রদ্ধার উদয় হইল।—উপরে লিখিত এই "শ্রদ্ধা" শব্দটীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। অনেক সময় সকল শব্দের অর্থ ঠিক্ ঠিক্ বুঝান যায় না, কিন্তু বুঝা যায়। গীতা যে কি ভাবকে 'যোগ' বলিয়াছেন এবং 'যুক্ত' অর্থেই বা'কি বুঝাইয়াছেন, তাহা যেমন মনের মধ্যে অনুভব করা যায়, কোন ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়া, তেমন ভাবে বুঝাইতে পারেন না। অতএব, আগে একবার যেমন বলা হইয়াছে—'যোগ' অর্থে কোন এক গভীরতম ভাবের সহিত অন্তরের একান্ত সংযোগ, শ্রদ্ধা সম্বন্ধেও সেইরূপ, ভাবেই মাত্র বলিতে পারি, যে, তাহা এমন এক ভাবময় অনুভূতি, যাহা তুচ্ছত্বের আবরণ হইতে তাহার প্রাণস্বরূপ মহান্ বস্তুটীই গ্রহণ করে। কর্ম্ম-জগতে সর্ব্বত্র এই ভাবময় অনুভূতিই প্রাণস্বরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, দয়া সেই অনুভূতির নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশের কতকগুলি সংজ্ঞা মাত্র। এই অনুভূতি যথায় প্রতিভারূপে দীপ্যমান, বুদ্ধি সেখানে স্তব্ধ; যেথানে কঠোর দুঃসাহসের অনল রূপে প্রদীপ্ত, বিবেচনা সেখানে মূক; প্রেমের দিব্য আলোকে যেথানে উজ্জ্বল, মৃত্যুর অন্ধকার সেখানে অন্তর্হিত। যেন তাহা কর্ম্মযজ্ঞের হোমাগ্নিরূপে কর্ম্মীকে আহ্বান করে "এস বীর আহুতি দাও, এই পবিত্র যজ্ঞাগ্নিতে জড়সম্পর্কীয় সুখ, সম্পদ, বাসনা যাহা কিছু অবিবেচনার আহুতি দাও, ক্ষুদ্র আমিত্বকে আহুতি দিয়া আত্ম বিসর্জ্জনে বৃহত্তর আমিত্বের নবজীবনে সঞ্জীবিত হও।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বিবেচনা ও অবিবেচনা প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি,—শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। এই দুঃসাহসের মধ্যে প্রবল অবিবেচনা আছে। যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া

তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। বিজ্ঞ মানুষের ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভঙ্গিয়া, পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিক নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলা ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দেয় ইহারাই।"

স্বল্প কথায় কি সম্পূর্ণ চিত্র! লক্ষ্মীছাড়া না হইলে আর কে সিন্ধুকের ভিতর হইতে লক্ষ্মীকে বাহিরে আনিয়া জগৎ শতদলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে? কৃপণের পক্ষে কি তাহা সম্ভব—জীবনকে যাহারা ছিন্নবস্ত্রের সহস্র সতর্কতার গ্রন্থিবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে যায়? অবিবেচক মৃত্যুবিলাসী ব্যতীত আর কে তাহাদের বাঁচিবার প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতে পারে?

ইতিহাস এই দুঃসাহসের সাক্ষী স্বরূপ। বুদ্ধিমান যেখানে অনায়াসে আপনাকে বাঁচাইয়া যাইতে পারে, দুঃসাহসী নিজের খেয়ালে কেন যে সেখানে নিজের মাথা মৃত্যুর সম্মুখে হাসিমুখে উপহার দেয়, ইহার রহস্য বলা বড় কঠিন। "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এই সত্য আবিষ্কারের ফলে গ্যালিলিও ধর্ম্মদ্রোহীর কারাগারে রুদ্ধ হইলেন। এক বৎসর কারাবাস ক্লেশ ভোগের পর পোপ যখন তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিলেন "যদি আপনি স্বীকার করেন যে পৃথিবী স্থির ভাবেই আছে, তবে অগ্নি-দাহের মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।" উত্তরে গ্যালিলিও গর্ব্বিতভাবে ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "হাঁ, এই পৃথিবী ঘুরিতেছে।"

শিখ সর্দ্দার তরুসিংহকে মোগল সম্রাট বলিলেন "তরুসিং, তোমার উপর আমার কোন শাস্তি দিতে ইচ্ছা নাই, কেবল এই আমার অনুরোধ যে, তোমার বেণীটী কাটিয়া দিয়া যাও।" তরুসিং হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বেশ, বেশ, তুমি যখন চাহিয়াছ তখন আরও কিছু বেশী দিব। কেবল বেণী কেন, মাথাটী শুদ্ধ দিতেছি।" তরুসিং অবশ্য পরিহাস করিয়া বলেন নাই, সত্য করিয়াই বলিয়াছেন। কোনরূপে মাথাটী রক্ষা করিয়া যে পরে তাহা কাযে লাগাইবেন এমন বিবেচনার কথা তাঁহার মাথায় উদয় হওয়া অসম্ভব, কেন না তাঁহার বিবেচকের মাথা হইতে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত।

এখানে দুটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, একটী অবিবেচনা আর একটী গর্ব্ব। দুয়েতেই যেন এক "থাতিরনাদারত ভাব" অর্থাৎ কোন কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না। দুঃসাহস, এই গর্ব্বেরই একটী অঙ্গ। এ গর্ব্ব—অহমিকাজাতদম্ভ নহে, কিম্বা সেই শ্রেণীস্থ কোন ক্ষুদ্রভাব নহে, অথচ ইহা গর্ব্ব। এ গর্ব্ব বাহিরের বিষয়-সমূহের অনুকূলতা-প্রতিকূলতার অপেক্ষা রাখে না, আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ, আপনাতেই আপনি গর্ব্বিত। পরম বিনয়ী সক্রেটিসও এই গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন, তাঁহার বিচারকালে তাঁহার "এথেনীয়গণের প্রতি" উক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্রান্সের ভূমিতে এই গর্ব্বের বীজ এক সময় নানাক্ষেত্রে নানাভাবে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কারিকর বার্নার্ড পলিসী কঠোর সাধনায় এনামেলের পুনরাবিষ্কার করেন। পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য ও রিক্ত-সম্বল হইয়াও পলিসী তাঁহার সাধনার পথ হইতে চ্যুত হন নাই। নিজে দরিদ্র, জমীমাপ প্রভৃতি সামান্য কার্য্য করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, এনামেল আবিষ্কার করিবার পরীক্ষাতেই তাহা ব্যয় হইয়া যাইত। ইহাতে তিনি দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিবারের অন্নবস্ত্রের কষ্টের জন্য স্ত্রীর নিকট সর্ব্বদা লাঞ্ছিত হইয়া এবং অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াও তাঁহার উদ্যমের নিবৃত্তি হয় নাই। একবার তিনি ছয়দিন ছয়রাত্রি ক্রমাগত চুল্লীর পার্শ্বে বসিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপিও দুর্ভাগ্যক্রমে এনামেল গলাইতে পারেন নাই। এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আবার কিছুদিন অতি কষ্টে নানা উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া কিছু টাকা জমাইলেন; কিন্তু সে সামান্য অর্থে কুলাইল না। শেষে এক বন্ধুর নিকট কিছু ধার পাইয়া সেই অর্থে আবার নূতন উপাদান সংগ্রহ করিলেন, এবং নবোৎসাহে পুনরায় পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্নি জ্বলিল, কিন্তু প্রবল তাপেও এনামেল গলিল না, কাঠ ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনন্যোপায় পলিসী ক্রমশঃ বাগানের বেড়া, দুয়ার, জানালা ও আসবাব পত্র ভাঙ্গিয়া আগুনে আহুতি দিতে লাগিলেন। ব্যাপার দেখিয়া পলিসী পাগল হইয়া গিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার স্ত্রী ও

সন্তানেরা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং প্রতিবাসীরা ছুটিয়া আসিল। অবশেষে অগ্নিদেব প্রসন্ন হইলেন, উত্তাপে উপাদান সমূহ গলিয়া এনামেল প্রস্তুত হইল। এই কর্ম্মযজ্ঞের কঠোর সাধক বৃদ্ধবয়সে তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় হেনরী কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। হেনরী স্বয়ং তাঁহার সহিত কারগারে গোপনে দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নূতন মত ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যখন বলিলেন—"পলিসী তুমি অতি সৎ এবং ৪৫ বৎসর আমার ও আমার জননীর অধীনে বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিয়াছ, এই জন্যই এই নূতন ধর্ম্মে আসক্তিরূপ তোমার যে গুরুতর অপরাধ তাহা আমরা এতদিন সহ্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন আমি তোমাকে তোমার শাস্তিদাতাদের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছি। আগামী কল্যের মধ্যে যদি তোমার মত পরিবর্ত্তন না কর তবে তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে।" তখন সেই কর্ম্মবীর বৃদ্ধ গর্ব্বের সহিত উত্তর দিলেন "মহাশয়, ভগবানের মহত্ত্ব প্রচারের জন্য জীবন বিসর্জ্জনে আমার দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। আপনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে, আপনি আমাকে কৃপা করেন, কিন্তু এখন আমিই আপনাকে কৃপার পাত্র মনে করিতেছি, যেহেতু আপনি বলিতেছেন 'আমি বাধ্য হইতেছি'। মহাশয় এই কথাটী ঠিক রাজার মত বলা হয় নাই। কি আপনি, কি সেই অভিজাত সম্প্রদায়, অথবা guiseএর দল—যাহারা আপনাকে বাধ্য করিতেছে,—আমার উপর কেহই এরূপ প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে না, কেন না কিরূপে মরিতে হয় তাহা আমি জানি।"

(৮)

বিষাদ-যোগ না আনন্দ-যোগ ?

যখন ইতিহাসে এই সব বীরচরিত পাঠ করি তখন আমাদের প্রাণে কেমন এক আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠে। দুর্গম পন্থা, দুঃসহ দুঃখ, দুর্ব্বহ ভার, ইহার সহিত আনন্দের কি যোগ! বিষাদের আঘাতে সুখস্বপ্ন ভঙ্গে যে জাগরণ, তাহার সহিত আনন্দের কি সম্বন্ধ? নিশ্চিন্ত [স্ব]জনের বাহুবন্ধন, আরামের কোমল শয্যা, লোক প্রতিষ্ঠা,

সম্পদ গৌরব, ইহার পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য, প্রিয়বিরহ, লোক গঞ্জনা, দুঃখময় জীবন, স্বেচ্ছায় কে কামনা করে? তবু মানব সকল সময়ই নিঃস্বার্থভাবের নিকট মস্তক নত করিয়াছে, স্বার্থপরতার নিকট করে নাই; মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, নীচত্বকে কখনও ভয়ের ঊর্দ্ধে অপর কোন সম্মান দিতে পারে নাই; যে দুষ্কৃত, সেও নিজের অন্যায় কখনও মনের সহিত অনুমোদন করিতে পারে নাই, অসীম সম্পদশালী সাংসারিক সর্ব্বসুখে সুখী ব্যক্তিও পরকল্যাণে সর্ব্বত্যাগীর প্রতি ঈর্ষাতুর নেত্রে চাহিয়াছে। নষ্টস্মৃতি ফিরিয়া পাইবার জন্য যেমন অহরহঃ ব্যাকুলতা জাগিতে থাকে, অথচ কিসের ব্যাকুলতা নিজে সে জানে না, সেইরূপ ধন মান-সম্পদে বেষ্টিত হইয়াও মানবের চিত্তের অতৃপ্তি দূর হয় না। তাই যদি কোন উপাখ্যানে শুনি, ইতিহাসে পাঠ করি বা ভাগ্যক্রমে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে কোন বীর এই সমুদায়ের নিবিড় বেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়াছেন, তাহা হইলে আমরাও যেন একটা পথ দেখিতে পাই। যে, সঞ্চয়ের জন্য আমরা চিরদিন প্রাণপাত করিয়া আসিয়াছি, তুচ্ছ লোষ্ট্রখণ্ডের মত একমুহূর্ত্তে তাহা দূরে নিক্ষেপ করি,—যেন আমরা এই সব বোঝা ফেলিয়া দিয়া ত্রাণ পাই। কৃপণ সর্ব্বস্ব বিলাইয়া, ভীরু বিপদে ঝাঁপ দিয়া যেন, যে ভার তাহাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া যায়।

চল, চল, আগে চল, আরও আগে আরও আগে।
না জানি কি মধুর ভাষা প্রাণের ভিতর হাসে।
না জানি কি আলো এক চোখের উপর ভাসে।
ভাষা সে মধুর ভাষা আমিও বুঝিনা ভাল।
আমি অন্ধ তবু কিন্তু আলো সে উজ্জ্বল আলো।
তাইত গো অবিরাম চলিয়াছি দিশাহারা।
তাইত গো হেথা হোথা ছুটেছি পাগল পারা।

শিশুর অকাল মৃত্যু।

(শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম, বি।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আরও কতকগুলি কারণ ও তাহার নিবারণের উপায় দেওয়া হইতেছে—

(৪) বাল্যবিবাহ—

স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলিয়াছেন যে "এ দেশের লোকে ১২ বৎসরের মেয়ে বিবাহ করে" ইত্যাদি। কথাটি খুবই ঠিক। আমাদের দেশে কৈবর্ত্ত, গরাইদের মধ্যে এবং অনেক নিম্নতর মুসলমানদের মধ্যে দেখিয়াছি যে সাত, আট বৎসরের মেয়েদেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আবার বার, তের বৎসরের বালিকাদের মা হইতে দেখা যায়। মা হওয়ায় যে কত দায়িত্ব তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এরূপ কচিবয়সে মা হইলে তাহারা সে দায়িত্ব বুঝিবে কোথা হইতে? এই সব কচি মেয়েদের খাওয়া পরা আর একজন দেখিলেই ভাল হয়, সেইস্থানে তাহাদের দ্বারা একটী শিশুর যত্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে মেয়েরা যত আমোদে থাকিতে পারে, যত ভাল খাইতে পায় এবং যত মানসিক চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পায় ততই তাহাদের দেহের এবং মনের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বয়সে ছেলের মা হইয়া ফলে এই হয় যে উপযুক্ত বিরাম ও আরাম না পাওয়ার দরুণ তাহারা অকালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। একটী ছেলে মানুষ করিতে যে কত মানসিক অশান্তি—রাত্রে উপযুক্ত ঘুম হয় না, ছেলের অসুখ হইলে কি কষ্টই পাইতে হয়—তাহা মা মাত্রেই অবগত আছেন। ফলে ছেলেটী উপযুক্ত যত্ন ও লালনপালনাদির অভাবে হয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না হয় ক্ষীণাঙ্গ হইয়া থাকে।

ডাক্তারী হিসাবে মা যত অপরিণত বয়স্কা হন ছেলেও সেই হিসাবে

অপুষ্ট হয় অর্থাৎ সতর, আঠার বৎসর বয়স্কা মা হইলে ছেলে যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বার, তের বৎসরের মেয়ে মা হইলে সন্তানের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সেরূপ হয় না। ফলে সে যে কোন রোগেই অতিশীঘ্র আক্রান্ত হয়, কারণ এই সব অপরিণত শিশুদের জীবনীশক্তি অতি অল্প। ভগবানের রাজত্বে প্রত্যেক জিনিষেরই একটী সময়াসময় আছে—। অল্প বয়স্কা মায়েদের স্তন প্রায়ই থাকে না—তাহাও এই অপরিণত শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

সুতরাং আমাদের সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য পুত্র কন্যাদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করা। আমার মতে অন্ততঃ ষোল বৎসরের আগে কোন কন্যারই মা হওয়া উচিত নহে।

(৫)　দেশে সর্ব্বসাধারণের ক্রমশঃ ধর্ম্মহীনতা—

এইটিই আমার মতে শিশুর অপমৃত্যুর প্রধান কারণ। যে ভারতবর্ষ এক সময়ে আধ্যাত্মিকতার চরম সীমায় উঠিয়াছিল আজ তার একি জড়তা! ইয়ুরোপের চাকচিক্যময়জড়বাদের সংঘর্ষে এবং তাহার অন্ধ অনুকরণের এই পরিণাম। আজ ইয়ুরোপবাসীদের মত আমরা মানুষকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করি তাহার বাহির দেখিয়া। ভিতরে যদি তাহার সমস্ত হৃদয় পঙ্কে কলুষিত হয় তাহা দেখি না। অথচ এক দিন ছিল যখন নগ্নপদ উত্তরীয় সম্বল ব্রাহ্মণকে আমরা ভক্তি করিতাম শুধু তাহার চরিত্র দেখিয়া। চরিত্র জিনিষটী—বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষাভিমানী আমরা—শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভের প্রধান সোপান ইহা জানি না। দোষ কাহারও নয় কারণ আজকাল আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে কতকগুলি নাস্তিক বা অধার্ম্মিক লোকেরই সৃষ্টি হইতেছে বই আর কিছুই নয়, আরও সৃষ্টি হইতেছে কতকগুলি ভিক্ষুকের দল। শিক্ষা পাইয়া, এম্, এ, এম, বি, পাশ করিয়া, এই লাভ হইতেছে যে আমরা নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক সময় লোকের চক্ষে বেশ ধূলি দিতে শিখিয়াছি, আর শিখিয়াছি তর্কের দ্বারা প্রমাণ করিতে, চরিত্র না থাকিলেও চলে। কিন্তু আমার মনে হয় যে ধর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্ম কখনও সম্ভব হয় না। দুঃখের বিষয়, এই

ধর্ম্মহীনতার বীজ আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্কুল ছেলেদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের একেবারে কলুষিত করিতেছে।

ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে রবিবারে রবিবারে একবার করিয়া গির্জ্জায় যাওয়ার প্রথা আছে। মুসলমানদের মধ্যেও শুক্রবার শুক্রবার মস্‌জিদে প্রার্থনার নিয়ম আছে। আর আমাদের ধর্ম্মশিক্ষার যে কি উপায় আছে জানি না। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম যাঁহাদের হাতে, বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ের পুরোহিতগণের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য এত অল্প যে তাঁহাদের কাছে কোন সৎশিক্ষা পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। বলিতে চাই না যে তাঁহাদের মধ্যে ভাল লোক নাই কিন্তু ক্রমশঃই তাহার সংখ্যা কমিয়া কমিয়া একেবারেই লোপ পাইতেছে, ইহার জন্য দায়ী আমরা এবং আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা। কারণ লোকে দুই বেলা, স্বচ্ছন্দচিত্তে পেট ভরিয়া না খাইতে পাইলে কেহই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে না। এই অভাবগ্রস্থ হইয়া অনেক পুরোহিতই নিজেদের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি ধর্ম্মসমিতির নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁরা যেন বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের এই অভাব মোচনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা যেন পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া সেবাধর্ম্মের সহিত এই জ্ঞানধর্ম্মের প্রচার করেন। তাহা হইলে দেশের একটী মহৎ উপকার করা হয়। আমার এসব অবান্তর কথা নয়, শিশুর অপমৃত্যুর সহিত ইহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম। কারণ এই চরিত্রহীনতার ফলে বর্ত্তমান সমাজে দুইটী ভয়ানক জঘন্য-ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

তাহা ছাড়া বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের মধ্যে আরও নানা প্রকার কুৎসিৎ ব্যবহার এবং অনৈসর্গিক প্রথার প্রচলন ফলে যে কত শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

(ক) সিফিলিস্—এই রোগ প্রথমতঃ পিতার হয়। ক্রমে পিতা হইতে এই বিষ মাতার শরীরে সঞ্চারিত হয়। এই রোগ এত

ভীষণ যে বিশেষ ভাবে চিকিৎসিত না হইলে পৌত্রাদিতেও প্রকাশ পায়। এই যে মৃতবৎসা রোগ যাহাতে ছেলে জন্মিয়াই মারা যায় অথবা প্রায়ই মৃত সন্তান প্রসব হয় তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই রোগ। এই রোগ মায়ের ও বাপের উভয়েরই হইলে কখনও সন্তান জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না—বিশেষতঃ তাহারা যদি উপযুক্ত ভাবে চিকিৎসিত না হয়। আরও দুঃখের বিষয়, প্রায়ই দেখা যায় যে লজ্জাবশতঃ রোগীরা, বিশেষতঃ মেয়েরা, রোগের প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হন না ; প্রায়ই হাতুড়ে বৈদ্য দিয়া চিকিৎসিত হন। ফলে আসলরোগ শরীরের ভিতরই থাকিয়া যায়। এই রোগে আক্রান্ত লোকদের সন্তানেরা মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ না হইলেও প্রায়ই ১০।১৫ দিনের মধ্যে গায়ে ক্ষত হইয়া বা অন্য প্রকারে মারা যায়। পিতা মাতার শরীরে এই বিষ অল্পভাবে সঞ্চারিত থাকিলেও বা তাঁহারা চিকিৎসিত হইলেও শিশুরা প্রায়ই ক্ষীণাঙ্গ হয় এবং তাহাদের জীবনীশক্তি কিছুই থাকে না। নিজের ক্ষণিক সুখের জন্য রোগ ক্রয় করিয়া আনিয়া অবলা স্ত্রীলোকদের চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যহীনা করিতে এবং সবল নিষ্পাপ শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ হইতে কি এই সব পুরুষ-পশুদের একটুকুও লজ্জা হয় না !

(খ) গণোরিয়া রোগও অতি ভয়ানক। সদ্যোজাত শিশুদের মধ্যে যাহারা অন্ধ হয় তাহাদের শতকরা ৮০টীর কারণ এই রোগ। জন্মিবার ২।১ দিন পরেই শিশুর চোক পিচটাইতে থাকে এবং শীঘ্র উপযুক্ত চিকিৎসা না করাইলে শিশুটী অন্ধ হইয়া যায়।

পরিতাপের বিষয়, এই রোগ দুইটী শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ধনী বা নির্দ্ধন সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। হায়রে আধুনিক সভ্যতা! যাহার ফলে মানুষকে পশু করে ও এতদায়িত্ব জ্ঞানহীন করে!! তোমার ক্ষণিক সুখের জন্য যে তোমার বংশলোপ হইতে বসিয়াছে, তোমার যে জাতিলোপ হইতে বসিয়াছে!!!

(৬) ব্রহ্মচর্য্যের অভাব :—

এই অভাব ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। সংযম জিনিষটা এখন একটা হাস্যস্থলে দাঁড়াইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অনশন, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ একদিকে স্বাস্থ্যহীন করিতেছে, অপর দিকে ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা ফলে সুস্থ সবলকায় মা প্রায়ই উপকথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতায় আমরা অত্যধিক হীনবীর্য্য এবং তাহার ফল আমাদের অপদার্থ শিশুর জনকত্ব। আমার বোধ হয় যত প্রকার স্নায়বিয় দুর্ব্বলতায় আমরা জর্জ্জরিত এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। প্রায়ই দেখা যায় আঠার, উনিশ বৎসরের যুবক খিটখিটে, অল্পেই রাগিয়া উঠে, মুখে সে স্বর্গীয় লাবণ্য নাই, কাজে উৎসাহ নাই, অনুসন্ধান করুন দেখিবেন দেহে তাঁহাদের আদৌ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা নাই। আমার কাছে এই সব রোগীরা আসিলে আমি বলি যে মনের যাতে উন্নতি হয় করুন, ঔষধের দরকার নাই। এরূপ ভাবে যে কত শত যুবক তাহাদের দেবতা দুর্লভ মন ও দেহ ঐ বিষাগ্নিতে আহুতি দিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অশ্লীলতার দোহাই দিয়া এই সব বিষয়ের আলোচনায় উদাসীন থাকিলে চলিবে না। এই সব ভগ্নস্বাস্থ্য যুবকেরা যে জাতির জনক সে জাতির শিশুরা যে ক্ষীণাঙ্গ বা ক্ষণজীবী হইবে তার আর আশ্চর্য্য কি!

দুঃখের বিষয়, শিক্ষিতদের মধ্যেও এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। শিক্ষাভিমানীদের জানা উচিত, তাঁহাদের উদাহরণ সাধারণে বিশেষতঃ অশিক্ষিতেরা—অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের দায়িত্ব কত বেশী! যে শিক্ষা মানুষকে ক্রমশঃই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে দূরে সরাইয়া দেয়—যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ হইতে শিখায় না, সে শিক্ষা যত শীঘ্রই দেশ হইতে লোপ পায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবের আর একটী কারণ এবং শিশুদের অকাল মৃত্যুরও অন্যতম কারণ আমাদের দেশে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রাচুর্য্য। মদ্য যে মানুষকে পিশাচ করে সে বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য। ডাক্তারী

হিসাবে মদ্যপায়ীদের সন্তানেরা কখনও স্বাস্থ্যবান হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে তাহারা দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বা নিরেট বোকা হয়; কারণ তাহাদের পিতার বা মাতার স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ প্রায়ই থাকে।

এই মাদক দ্রব্য ব্যবহারে দরিদ্র আমরা যে ক্রমশঃই দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইতেছি, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। যে পয়সা দিয়া হয়ত সদ্যজাত শিশুর কিম্বা তাহার মাতার আহারের সংস্থান হইত তাহাই অনায়াসে শিশুর পিতা শৌণ্ডিকালয়ে দিয়া আসিয়া থাকেন। ফলে গর্ভিণীর বা সদ্যজাত শিশুর উপযুক্ত খাদ্যাভাব প্রায়ই দেখা যায়। অবশ্য এ সব গরিবদের কথাই বলিতেছি। মহাত্মা গান্ধির কৃপায় আর কিছু না হোক এই আমাদের কৃষ্ণনগর সহরেই দেখিতেছি যে গরিবেরা মদের পয়সার বিনিময়ে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে। কত গরিবলোকদের গৃহিণীরা যে ছেলেদের দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন তাহা বলা যায় না।

(৭) দরিদ্রতা।

ইহাই শিশু-অপমৃত্যুর প্রধানতম কারণ। শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের আজ এ কি অবস্থা! সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম আজ অনশনে বা অর্দ্ধোপবাসে জীর্ণ, স্তব্ধ। যে কোন গ্রামে যাও, দেখিবে লোকের মুখে আর সে হাসি নাই—সকলেই যেন কি একটা ভয়ে আতঙ্কিত।

প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনীশক্তি বলিয়া একটী জিনিষ ডাক্তারী মতে আছে। দুই জন লোক একই ম্যালেরিয়াপূর্ণ জায়গায় একই ভাবে একই বাটীতে একই ঘরে বাস করে, এক রকম জিনিষই খায়, অথচ একজন হয়ত ম্যালেরিয়ায় খুবই ভুগিতেছে আর এক জনের কিছুই হইল না। কারণ এক জনের জীবনীশক্তি অর্থাৎ রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আর এক জনের অপেক্ষা অধিক। এই জীবনীশক্তি যে আমাদের দেশে ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহার প্রধান কারণ এই দরিদ্রতার দরুণ অনশন।

এই দরিদ্রতার দরুণ সদ্যজাত শিশু ও প্রসূতি উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য

পায় না, উপযুক্ত বিরাম বা পরিচ্ছদাদি পায় না, উপযুক্ত ডাক্তারের সাহায্যও পায় না। এই কৃষ্ণনগরে অনেক জায়গায় দেখিয়াছি যে, এক সের দুধ খাওয়াইতে বলিলে বলে—অত পয়সা কোথায় পাইব? যাহারা খাদ্য যোগাইতে অক্ষম তাদের কি ঔষধ দিয়া জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করা যায়? কখনই নয়। কুইনাইন খাওয়াইলে কি হইবে—যদি খাদ্য দ্বারা তাহাদের জীবনীশক্তি রাখিতে না পারা যায়!!

আক্ষেপের বিষয়, যে দুগ্ধ শিশুদের একমাত্র খাদ্য, আজকাল তাহাও এত মহার্ঘ হইয়াছে যে গরিবের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। প্রায়ই গরিবদের মধ্যে দেখা যায় যে ভাতের মাড়, সুজিসিদ্ধ প্রভৃতি দুই এক মাসের ছেলেদেরও খাওয়াইতেছে। ফলে Infantile Lever প্রভৃতি রোগ প্রায়ই এই সব ছেলেদের আক্রমণ করে এবং অকালে মৃত্যুমুখে আকর্ষণ করে।

যাহাতে দেশে ধন সংখ্যার বৃদ্ধি হয় প্রত্যেক লোকেরই সে দিকে দেখা উচিত। চেষ্টা ত কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে এখন শেষের উপায় —নারায়ণ!

অবাঙমনসোগোচরম্।

(আনন্দ চৈতন্য)

মন তাহা নাহি পারে করিতে মনন,
বাক্য তাহা নাহি পারে করিতে বর্ণন।
মনাতীত বাক্যাতীত চিন্তাতীত রূপ;
বিরাজিছে প্রতি হৃদে আনন্দ স্বরূপ।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই হেতু শ্রুতি আছে (কঠ ৩।১২)—

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। ইতি

সূক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত (কঠ, ৩।১০) প্রকারে উত্তরোত্তর সূক্ষ্মত্ববিচার দ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শনশীল, মহাবাক্যজনিত সূক্ষ্মপদার্থগ্রহণ-সমর্থ বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি দ্বারা এই 'আত্মাকে প্রত্যগ্‌রূপে (অর্থাৎ 'আমিই সেই' এইরূপে) সাক্ষাৎকার করা যায়। বায়ু দ্বারা যে প্রদীপ অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে তাহার সাহায্যে মণিমুক্তাদির লক্ষণসমূহ কখনই নির্দ্ধারণ করা যায় না এবং স্থূল খনিত্রের (খন্তা) দ্বারা সূচির ন্যায় সূক্ষ্মবস্ত্র সেলাই করাও সম্ভবপর নহে। অতএব এই প্রকার সত্ত্বগুণই যোগীদিগের হৃদয়ে তমোগুণযুক্ত রজোগুণের সাহায্যে বহুবিধ দ্বৈতবিষয়ক সঙ্কল্প করিয়া চেতয়মান হইয়া বা চিন্তনে নিযুক্ত হইয়া চিত্তরূপ ধারণ করে। তমোগুণের আধিক্য হইলে, সেই চিত্ত আসুরী সম্পদ্ সঞ্চয় করিয়া স্ফীত হয়। সেই কথাই বশিষ্ঠ কহিতেছেন :—

অনাত্মন্যাত্মভাবেন দেহভাবনয়া তথা।
পুত্রদারৈঃ কুটুম্বৈশ্চ চেতো গচ্ছতি পীনতাম্॥ *

(উপশম প্র, ৫০।৫৭)

অনাত্ম বিষয়ে আত্মভাবনাহেতু এবং 'দেহই আমি' এইরূপ চিন্তা হেতু এবং পুত্র, দারা ও কুটুম্বহেতু (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি মমতাবশতঃ) চিত্ত পীন (স্ফীত) ভাব ধারণ করে।

---

* মূলের পাঠ এইরূপ—"অনাত্মন্যাত্মভাবেন দেহমাত্রাস্থযানয়া, পুত্রদারকুটুম্বৈশ্চ চেতো গচ্ছতি পীনতাম্। (৫৭)

অহঙ্কার বিকারেণ মমতামললীলয়া* ।
ইদংমমেতিভাবেন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ ॥ (ঐ, ৫৮)

অহঙ্কারের বিকাশ এবং মমতারূপ মলে আসক্তিবশতঃ, 'এই শরীরই আমার আত্মা বা ভোগায়তন' এইরূপ ভাবনা দ্বারা চিত্ত স্ফীতভাব ধারণ করে।

আধিব্যাধি বিলাসেন সমাশ্বাসেন সংস্থতৌ।
হেয়াহেয় বিভাগেন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ † ॥ (ঐ, ৬০)

সংসারের রম্যতা ও চিরস্থায়িতাদি বিষয়ে বিশ্বাস, আধিব্যাধির বিলাস ভূমি ; ঐ বিশ্বাস এবং "ইহা হেয়, ইহা উপাদেয় এইরূপ বিভাগ-পূর্ব্বক নিশ্চয় বশতঃ চিত্ত স্ফীত ভাব ধারণ করে।

স্নেহেন ধনলোভেন লাভেন মণি যোষিতাম্।
'আপাত রমণীয়েন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ ॥" (ঐ, ৬১)

স্নেহ, ধনলোভ এবং আপাত-রমণীয় কামিনী-কাঞ্চনাদি প্রাপ্তি এই সমুদায় কারণে চিত্ত স্ফীতভাব ধারণ করে।

দুরাশা ক্ষীর পানেন ভোগানিল বলেন চ।
আস্থাদানেন চারেণ চিত্তাহিশ্যাতি পীনতাম্ ॥ (ঐ, ৬২)

চিত্তরূপ সর্প, দুরাশারূপ দুগ্ধপান, বিষয়রূপ বায়ুর ভক্ষণ, এবং এই জগতে আবাস গর্ত্ত সংগ্রহার্থ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দ্বারা (প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া তাহার গ্রহণের জন্য গমনাগমন প্রয়াস দ্বারা) চিত্ত স্ফীতভাব ধারণ করে।

শ্লোকস্থ 'আস্থা' শব্দে প্রপঞ্চে সত্যত্ববুদ্ধি বুঝিতে হইবে, তাহার 'আদান' অর্থে অঙ্গীকার বা গ্রহণ বুঝিতে হইবে ; তাহাই "চার" বা গমনাগমন ক্রিয়া—তদ্দ্বারা (এইরূপ অর্থ গ্রন্থকারের অনুমোদিত)।

অতএব যে বাসনা ও মনের বিনাশ সাধন করিতে হইবে তাহাদের স্বরূপ এইরূপে নিরূপিত হইল।

* মূলের পাঠ—"হেলয়া"।

† মূলের পাঠ—"সংস্থতেঃ" ও "হেয়াদেয় প্রযত্নেন"।

অনন্তর বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ যথাক্রমে নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে বাসনাক্ষয় কি প্রকার তাহা বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাস্ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ॥"

(স্থিতি প্রকরণ ৫৭।১৯.)

বাসনার বন্ধনকেই বন্ধন বলে, এবং বাসনাক্ষয়কেই মোক্ষ বলে। তুমি বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ প্রার্থীর ভাব অর্থাৎ মোক্ষকামনাও পরিত্যাগ কর।

মানসবাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়বাসনাঃ।
মৈত্র্যাদি ভাবনা নাম্নী গৃহাণামল বাসনাঃ॥ (ঐ, ২০)

প্রথমে "বিষয়-বাসনা" পরিত্যাগ করিয়া (পরে) "মানস-বাসনা" পরিত্যাগ কর এবং মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার ভাবনা নামক অমল বাসনা গ্রহণ কর।

তা অপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃ শান্তমোস্নেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ॥ (ঐ, ২১)

উক্ত মৈত্রী প্রভৃতি অমল বাসনা লইয়া বাহ্যতঃ ব্যবহার করিতে থাকিলেও, অন্তরে তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া হৃদয় হইতে সকল প্রকার আসক্তিকে একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র চিদ্বাসনা লইয়া থাক।

তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধি সমন্বিতাম্।
শেষে স্থির সমাধানো যেন ত্যজসি তং ত্যজ॥* (ঐ, ২২)

---

* উক্ত চারিটি শ্লোকের মূলের পাঠ এইরূপ :—

বন্ধোহি বাসনা বন্ধো মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাং ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ॥ ১৯
তামসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং তক্ত্বা বিষয়বাসিতাঃ।
মৈত্র্যাদি ভাবনা নাম্নীং গৃহাণামলবাসনাম্॥ ২০
তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃ শান্তসমস্নেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ॥ ২১
তামপাথ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধি সমন্বিতাম্।
শেষে স্থির সমাধানো যেন ত্যজসি তং ত্যজ॥ ২২

মন ও বুদ্ধির সহিত সেই চিদ্বাসনাকেও অন্তরে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাতে (অর্থাৎ কেবল চিন্মাত্রে) স্থির ভাবে (অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে) সমাহিত হইয়া, যাহার দ্বারা (অর্থাৎ যে অহঙ্কার দ্বারা) ত্যাগ করিতেছিলে তাহাকেও ত্যাগ কর। ইতি।

এস্থলে (দ্বিতীয় শ্লোকে) যে 'মানস বাসনা' শব্দের প্রয়োগ আছে তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তিনটি অর্থাৎ লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, ও দেহবাসনাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষয়বাসনা শব্দে দম্ভ, দর্প প্রভৃতি আসুরী সম্পদই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, মানস বাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং বিষয়বাসনা তদপেক্ষা তীব্র। কিম্বা বিষয় শব্দে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বুঝা যাইতে পারে। সেই সকল বিষয়কে যখন কামনা করা হইতেছে, সেই অবস্থায় যে যে

মূল ও টীকার অনুবাদ—

এখানে বন্ধ ও মোক্ষের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া, কি কি উপায় পরম্পরা দ্বারা বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন—'যে বাসনার দ্বারা আবদ্ধ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বদ্ধ, বাসনা ক্ষয়কেই মোক্ষ বলে। তুমি বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থিতাও ত্যাগ কর।' ১৯। সেই বাসনাক্ষয় বিষয়ে বৈরাগ্যের দৃঢ়তাই প্রথম সোপান; তাহাই বলিতেছেন—'বিষয়ভোগ দ্বারা চিত্তে নিহিত তমঃ-প্রধান বাসনাসমূহকে (অর্থাৎ যে সকল তামসিক বাসনা থাকিলে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মলাভ হয়, এবং সেই সঙ্গে যে সকল রাজসিক বাসনা থাকিলে, মনুষ্যাদি জন্মলাভ হয়, তাহাদিগকেও) প্রথমে পরিত্যাগ করিয়া, তুমি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারি প্রকার ভাবনার নির্ম্মল (চিত্তশুদ্ধি সম্পাদক) বাসনা গ্রহণ কর' (নিম্নে ব্যাখ্যাত ১।৩৩ সংখ্যক পাতঞ্জলসূত্র দ্রষ্টব্য)। ২০। অন্তরে কেবলমাত্র চিদ্ব্যতিরেকে মৈত্র্যাদিও নাই, ইহা বুঝিয়া—বাহিরে মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা দ্বারা ব্যবহার-পর হইয়াও, অন্তরে সমুদয় কর্ম্মচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র চৈতন্যেরই বাসনা পরায়ণ হও; অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র চিৎ—তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাস দ্বারা সেই সংস্কারকে দৃঢ় কর।২১। তাহার পর মন ও বুদ্ধির সহিত সেই চিন্মাত্র বাসনাও পরিত্যাগ করিয়া, পরিশিষ্ট একমাত্র আত্মতত্ত্বে স্থির সমাহিত হইয়া, যে অহঙ্কারের সাহায্যে এই সমস্ত ত্যাগ করিলে তাহাকেও ত্যাগ করিবে। ২২।

সংস্কার জন্মে তাহার নাম মানসবাসনা। আর যে অবস্থায় তাহাদের ভোগ চলিতেছে সেই অবস্থায় যে যে সংস্কার জন্মে তাহাদিগকে বিষয়-বাসনা বলে। এইরূপ অর্থ করিলে প্রথমোক্ত চারিটি বাসনা শেষোক্ত দুইটি বাসনার অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। কেননা, অন্তঃ (অর্থাৎ চিত্তগত) এবং বাহ্য (বহির্বিষয়গত) বাসনা ব্যতিরিক্ত, অপর কোন প্রকারের বাসনা ত হইতেই পারে না।* এস্থলে এক সংশয় উঠিতেছে :—আচ্ছা, বাসনার পরিত্যাগ কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? বাসনার ত মূর্ত্তি নাই যে ঝাঁটার দ্বারা রাশীকৃত করিয়া ধূলিতৃণের ন্যায় হস্তের দ্বারা উঠাইয়া তাহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিব! সেই সংশয় নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন :—এরূপ সংশয় উঠিতে পারে না। উপবাস ও জাগরণ বিষয়ে যেরূপ ত্যাগ উপপন্ন অর্থাৎ সম্ভবপর হয়, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। (শরীরের স্বভাবগত ভোজন ক্রিয়া ও নিদ্রা, মূর্ত্তিহীন হইলেও, তদ্বর্জ্জনরূপ উপবাস ও জাগরণের অনুষ্ঠান ত সকলেই করিয়া থাকে; এস্থলেও সেইরূপ হইবে।) "অদ্যস্থিত্বা নিরাহারঃ" ('আজ নিরাহার থাকিয়া) ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া সাবধান ভাবে থাকিলে যদি তাহা 'ত্যাগ' হয়, তবে এস্থলেও ত সেইরূপ ত্যাগের অনুষ্ঠানকে বাধা দিবার নিমিত্ত কেহ লাঠী হাতে করিয়া খাড়া নাই। কেননা, প্রৈষ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া সাবধান হইয়া থাকা ত অসাধ্য নয়। যাঁহাদিগের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার নাই, তাঁহাদের পক্ষে নিজের মাতৃভাষাতেই সঙ্কল্প হইতে পারে। যদি প্রথমোক্তস্থলে, অন্ন, ব্যঞ্জন স্থপ প্রভৃতি সম্পর্ক ত্যাগ করা চলে, তাহা হইলে এস্থলেও সুগন্ধিমালা চন্দন বনিতা প্রভৃতির সম্পর্ক ত্যাগ কেন না চলিবে? আর যদি বল, উক্তস্থলে ক্ষুধা নিদ্রা আলস্য প্রভৃতিকে ভুলাইবার জন্য পুরাণ শ্রবণ, দেবপূজা, নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতির দ্বারা চিত্তকে উপলালন করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলে এস্থলেও ত মৈত্রী প্রভৃতির দ্বারা সেইরূপ চিত্তের

---

* মুনিবর্য্য এই বিংশ শ্লোকের—মূলের উদ্ধৃত পাঠ না পাইয়াই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উপলালন করিবার ব্যবস্থা আছে। মৈত্রী প্রভৃতি, পতঞ্জলি ঋষি স্বকৃত যোগসূত্রে এইরূপ বুঝাইয়াছেন—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" ইতি। (পাতঞ্জল দর্শন, ১।৩৩)

সুখিতের প্রতি মৈত্রী (সৌহার্দ্দ), দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যাত্মার প্রতি মুদিতা (হর্ষ) এবং অপুণ্যাত্মার প্রতি উপেক্ষা (ঔদাসীন্য) ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় (এবং একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে)।

চিত্তকে রাগ, দ্বেষ, পুণ্য ও পাপই কলুষিত করিয়া থাকে। রাগ এবং দ্বেষও পতঞ্জলি ঋষি যোগসূত্রে এইরূপে বুঝাইয়াছেন—

"সুখানুশয়ী রাগঃ॥" "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ॥" (পাতঞ্জলসূত্র ২।৭—৮)। বুদ্ধির এক প্রকার বৃত্তি যাহা সুখ অনুভব করিলে তাহার প্রতি আসক্তি বশতঃ অত্যন্ত আকৃষ্ট হয় এবং 'আমার যেন এই সমস্ত সুখই হয়' (এইরূপ আকার ধারণ করে, তাহাকে "রাগ" বলে) এবং সেই সমস্ত সুখ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সুখ-সামগ্রীর (তদুপকরণের) অভাববশতঃ সম্পাদন করা অসাধ্য বলিয়া, সেই রাগ চিত্তকে কলুষিত করে। যখন কেহ সুখী লোকদিগকে দেখিলে, 'এই সুখিগণ সকলেই আমার (আত্মীয়)' এইরূপে মৈত্রী ভাবনা করে তখন সেই সুখ তাহার নিজেরই ঘটিয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সুখবিষয়ে তাহার রাগ (আসক্তি) নিবৃত্ত হয়। (যেমন কাহারও নিজের রাজ্য না থাকিলেও নিজের পুত্র প্রভৃতির রাজ্যকে স্বকীয় রাজ্য বলিয়া মনে করে সেইরূপ।) এবং রাগ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাপগমে শরৎকালীন নদীর ন্যায় চিত্ত প্রসন্ন (নির্ম্মল) হয়।

সেইরূপ, কোন প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি দুঃখের অনুশায়িনী হয়, অর্থাৎ 'এইরূপ দুঃখ যেন কোন প্রকারে আমার না ঘটে', (এইরূপ আকার ধারণ করে)—তাহার নাম দ্বেষ। সেই দ্বেষ শত্রু, ব্যাঘ্র প্রভৃতি থাকিতে কোনও প্রকারে নিবারণ করা যায় না। আর দুঃখের সকল হেতুকেই নির্ম্মূল করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই হেতু সেই দ্বেষ সর্ব্বদা হৃদয়কে দগ্ধ করে। 'দুঃখ আমার নিকট যেরূপ হেয়, অপর

সকলের নিকটেও সেইরূপ হেয়, তাহা যেন তাহাদিগের না ঘটে'— যখন এইরূপে দুঃখী জীবের প্রতি করুণা ভাবনা করা যায়, তখন বৈরাদি-দোষের নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। এই হেতু স্মৃতিশাস্ত্রে আছে :—

"প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা,

আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ। (মহাভারত)

আমার প্রাণ যেরূপ আমার নিকট প্রিয়, সর্ব্বজীবের প্রাণও তাহাদিগের নিকট সেইরূপ প্রিয়। বিচারশীল ব্যক্তিগণ এইরূপে আপনার সহিত তুলনা করিয়া জীবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। কি প্রকারে তাহা করিতে হয় সাধুগণ তাহা দেখাইতেছেন, যথা,—

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

এই সংসারে সকলেই সুখী হউক, সকলেই নীরোগ হউক, সকলেই নিজ নিজ শ্রেয়ঃ উপলব্ধি করুক, (এবং তদ্দ্বারা পুণ্যকর্ম্মে রত হউক), কেহ যেন দুঃখ না পায়।

কেননা দেখ, লোকে স্বভাবতঃ পুণ্যের অনুষ্ঠান করে না বটে কিন্তু পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কথিত আছে :—

পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।

ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥

লোকে পুণ্যফল পাইবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু পুণ্যানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করে না; এদিকে লোকে পাপের ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না বটে কিন্তু যত্নপূর্ব্বক পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আর সেই পুণ্যপাপ পশ্চাত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রুতি (তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী, ৯।১) সেইরূপ পশ্চাত্তাপকারীর বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন—

"কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি।" (তৈ, উ, ২।৯।১)

কি হেতু আমি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই? কি হেতু আমি পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কয়িয়াছিলাম?

যদি সেই ব্যক্তি পুণ্যবান্ লোকদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে, "মুদিতা" ভাবনা করে, তাহা হইলে, তাহাদের সেই পুণ্যের বাসনা

(সংস্কার) দেখিয়া নিজেও সাবধান হইয়া পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ পাপী লোকদিগের প্রতি "উপেক্ষা" ভাবনা করিয়া, নিজেও পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে।—এই কারণে পশ্চাত্তাপ না থাকায়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। সুখী লোকদিগকে দেখিয়া মৈত্রী ভাবনা করিলে যে কেবল আসক্তির নিবৃত্তি হয় তাহা নহে, কিন্তু অসূয়া এবং ঈর্ষাও নিবৃত্ত হয়। অপরের গুণ সহ্য করিতে না পারার নাম ঈর্ষা এবং অপরের গুণসমূহে দোষাবিষ্করণের নাম অসূয়া। যখন মৈত্রীবশতঃ অপরের সুখ নিজের বলিয়া অনুভূত হয়, তখন পরের গুণ দর্শন করিয়া কি প্রকারে তাহাতে অসূয়া প্রভৃতি জন্মিতে পারে? এই প্রকারে অপরাপর দোষেরও নিবৃত্তি ঘটিতে পারে, তাহা যথাযোগ্যরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। যে দ্বেষবশতঃ লোকে শত্রুবধাদিতে প্রবৃত্ত হয়, দুঃখীদিগের প্রতি করুণা ভাবনা করিলে সেই দ্বেষ যেমন তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ যে সুখাবস্থা ঘটিলে (তদ্বিরুদ্ধ) দুঃখাবস্থা আসিতেই পারে না, সেই সুখাবস্থা প্রাপ্ত হইলে (সাধারণতঃ) সুখী ভাব জনিত যে দর্প উৎপন্ন হয় তাহাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। (পূর্ব্বে আসুর সম্পদের বর্ণনাকালে অহঙ্কারের কথা বলিতে গিয়া সেই দর্পের বর্ণনা করা হইয়াছে।)

"ঈশ্বরোঽহং ভোগীসিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।"
"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।"

(গীতা ১৬।১৪-১৫)

আমি কর্ত্তা, আমি ভোগী, আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্ কুলীন—আমার তুল্য আর কে আছে?

(শঙ্কা)—আচ্ছা, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রতি মুদিতা ভাবনা করিলে তাহার ফলরূপে পুণ্যপ্রবৃত্তি জন্মে এই কথা বলা হইল। সেই পুণ্যপ্রবৃত্তি ত যোগীর উপযোগী নহে; কেননা পূর্ব্বেই সেই পুণ্যকে মলিন শাস্ত্রবাসনার অন্তর্ভূত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। যেহেতু কাম্য ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম, যাহা পুনর্জন্ম উৎপাদন করে, তাহাই মলিন বলিয়া বর্ণিত

হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে যোগাভ্যাস বশতঃ যে সকল পুণ্যকর্ম্ম (যোগাভ্যাস বশতঃ) অশুক্ল, অকৃষ্ণ * হইয়া যাওয়াতে যোগীদিগের পুনর্জন্ম উৎপাদন করে না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সেই কথা বলা হইয়াছে। কর্ম্মের এই অশুক্লাকৃষ্ণত্ব পতঞ্জলি নিম্নলিখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্" ।

(কৈবল্যপাদ, ৭ম সূ।)

যোগীদিগের চিত্তের ন্যায় যোগীদিগের কর্ম্মও অনন্যসাধারণ, এই কথাই উক্ত সূত্রে বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন ঃ—

তপঃস্বাধ্যায়শীল ব্যক্তিগণের শুক্লকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য এবং কেবল সুখপ্রদ। কেবল দুঃখপ্রদ কৃষ্ণকর্ম্ম দুরাত্ম-দিগের; সুখদুঃখ মিশ্রফলপ্রদ বহিঃসাধনসাধ্য শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম সোম-যাগাদিরত ব্যক্তিদিগের; কেননা—সোমযাগাদিতে (এক পক্ষে যেমন) ব্রীহি প্রভৃতির বিনাশ দ্বারা পিপীলিকাদির পরিপীড়ন করিতে হয়, (তেমনি অপর পক্ষে) দক্ষিণাপ্রদান প্রভৃতি পরানুগ্রহেরও সংযোগ রহিয়াছে। এই (শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ) ত্রিবিধ কর্ম্ম অযোগীদিগের। কিন্তু যোগিগণ বাহ্য সাধনসাধ্য-কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া, তাঁহাদের শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম নাই; তাঁহারা ক্ষীণক্লেশ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণকর্ম্ম নাই; এবং যোগজধর্ম্ম, ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরে অর্পিত হওয়ায় তাঁহাদের শুক্লকর্ম্মও নাই। এই হেতু যে অশুক্লাকৃষ্ণকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি বিবেকখ্যাতি উৎপাদন করিয়া কেবলমাত্র মোক্ষফল প্রদান করে সেই কর্ম্মই যোগীদিগের। (যোগমণিপ্রভাবৃত্তি)।

কাম্যকর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত বলিয়া শুক্ল; নিষিদ্ধ কর্ম্ম, কৃষ্ণ; মিশ্রকর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ। এই তিন প্রকার কর্ম্ম অপর অর্থাৎ যোগীভিন্ন ব্যক্তিগণের জন্যে। সেই তিন প্রকার কর্ম্ম তিন প্রকার জন্ম প্রদান করে। বিশ্ব-রূপাচার্য্য (সুরেশ্বরাচার্য্য) সেই কথা বলিতেছেন,—

---

* এস্থলে, আনন্দাশ্রমের উভয় সংস্করণেই পাঠের ভুল।

"শুভৈরাপ্নোতি দেবত্বং নিষিদ্ধৈর্নারকীং গতিম্।
উভাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং মানুষ্যং লভতেঽবশঃ ॥*

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ১।৪১)

শুভকর্ম্মের দ্বারা লোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, নিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা নারকী গতি লাভ করে, এবং পুণ্য ও পাপ এই উভয়ের দ্বারা জীব অবশ হইয়া (অর্থাৎ কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যার অধীন হইয়া) মনুষ্যের জন্ম লাভ করে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যোগ ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই, সেই হেতু অকৃষ্ণ (কর্ম্ম), এবং শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়া শুক্ল (কর্ম্ম)। তবে যোগকে অশুক্লাকৃষ্ণ কেন বলা হইল ?

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা ঘটিতে পারে না ; যেহেতু যোগ (যোগীর নিকট) অকাম্য (ফলাভিসন্ধিরহিত কর্ম্ম)। সেই অকাম্যতাকেই লক্ষ্য করিয়া (যোগকে) অশুক্ল বলা হইয়াছে। এই হেতু (সুখদুঃখমিশ্র-ফলপ্রদ সোমযাগাদি রূপ) শুক্লকৃষ্ণ পুণ্য প্রবৃত্তিকে, যোগী উপেক্ষা করিয়া থাকেন। † (ক্রমশঃ)

* নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি-টীকাকার জ্ঞানোত্তম বলেন—এই শ্লোকে গ্রন্থকার "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং জয়তি (নয়তি ?), পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্য-লোকম্" (উদান বায়ু জীবকে পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর পাপবশতঃ পাপলোক—নরকে—লইয়া যায়, এবং উভয় দ্বারা অর্থাৎ তুল্যবল পুণ্য ও পাপ দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায়)—প্রশ্ন উপ, ৩।৭—এই শ্রুতি বাক্যেরই অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন। অবশ—কামকর্ম্মাদি পরতন্ত্র।

† উদ্ধৃত "যোগমণি প্রভাবৃত্তি" দ্রষ্টব্য।

"মুক্তি, যা' আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থই—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সব রকম স্বাধীনতা।"

"যতদিন না এই ঈর্ষাদ্বেষ যায় ও নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শিক্ষা করে, ততদিন একটা সমাজসংহতি হোতেই পারে না।"—বিবেকানন্দ।

সমালোচনা।

সবুজ পত্র—উড়োচিঠি (মাঘ, ১৩২৭)। চিঠির লেখক বলিতে-ছেন, "কোন কোন বাঙ্গালীর মনে এমন একটা জিনিষের এমনি ভাবে আবির্ভাব হয়েছে যে, সেটাকে একটা রিপু বলা চলে। সে জিনিষটার নাম হচ্ছে বৈরাগ্য। এবং তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বল্‌লে দ্বিতীয় রিপুটি সহজেই অভিভূ্ত হন।"

কিন্তু বৈরাগ্যকে রিপুর আখ্যা দেওয়া হিন্দু হইয়া, সেটাও বুঝিতে হইবে ঐ দ্বিতীয় রিপু তথা পঞ্চম রিপু হইতেই প্রসূত—রিপুর অতীত হইয়া নিশ্চয়ই ওরূপ যুক্তি মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইতে পারে না। তাহার পর পর লেখক লিখিয়াছেন "দেখ, স্বামী বিবেকানন্দের একটী কথা আমার মনে বড় লেগে আছে। সে কথাটা হচ্ছে 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না।' এই কথাটা আমি খুব মানি, তবে ওর দু'টি পদ ছাড়া—ঐ যে ঐ "মহৎ কাজ"। ঐখানেই স্বামী বিবেকানন্দ exclusive হয়েছেন। আসলে মহৎই হোক ও অসৎই হোক, কোন কাজটাই চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। কেন না মহৎ কাজ ও অসৎ কাজ এ-দুটোতে প্রকৃতিগত কোন তফাৎ নেই।" কেন? 'একদা যখন বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়', তখন সেটা যে খুব মহৎ কাজ হয়েছিল এটা যে কোন স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত বাঙ্গালীর কাছ থেকে শুনতে পাবে। তবে লঙ্কাবাসীদের কাছে সেটা নিশ্চয়ই তেমন মহৎ বলে প্রতীয়মান হয় নি।" "সুতরাং বুঝতে পাচ্ছ যে, "মহৎ" ও "অসৎ" এ যে তফাৎ সেটা বস্তুগত বা বিষয়গত নয়, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থাৎ—সেটা objective ততটা নয় যতটা subjective." আমরা বলি, এই যে ভেদ জিনিষটা যাহা এই বিশ্বে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে, একেবারেই objective নয়, পুরো মাত্রায় subjective. পারমার্থিকের দিক হইতে যদি আমরা দৃষ্টি করি তাহা হইলে সেই এক অসীম সত্তারই লীলা-বিলাস সকল সসীমতার মধ্যে আমাদের মানসে উপলব্ধি হইয়া থাকে, নিন্দা বা বন্দনার বস্তু তখন থাকে না। কিন্তু যদি লেখক একটু নিম্ন ভূমিতে অবস্থান করিয়া এই ব্যবহারিক রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা

হইলেই দেখিবেন সেখানে মহত্বও আছে অসৎও আছে, গৌরবও আছে তুচ্ছতাও আছে—আর এই সকলের একটা standard বা মাপকাটিও মানুষ করিয়া লইয়াছে। তাহার যুক্তি এই—সকল জীবেতেই অনাদিকাল ধরিয়া দেবত্ব ও পূর্ণত্ব বর্ত্তমান—সসীমতা বা নাম-রূপ তাহার প্রকাশে বাধা দিতেছে। যে কর্ম্ম সেই দেবত্ব এবং পূর্ণত্ব বিকাশে সহায়ক তাহাই সৎ, আর যাহা তাহার উপর আরও অধিক আবরণ টানিয়া দেয় তাহাই অসৎ। আর সৎকর্ম্মের দার্শনিক লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর একটা সাধারণ লক্ষণ আছে সেটা হচ্চে 'greatest good of the greatest number'—'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'। যখন দেখা যায় দুই চারি জনের সুখের জন্য, ভোগের জন্য বহুকোটী লোক কষ্ট পাইতেছে তখন সেই দুই চারি জনের কৃত কার্য্য যত বড়ই বিরাট হউক না কেন, তাহাকে আমরা দেবত্ব বা পূর্ণত্ব বিধায়ক কার্য্য বলিতে পারি না—খুব বিপুল বলিয়া তাহাকে আসুর আখ্যায় খ্যাত করিতে পারা যায়। সৎকার্য্যের আর একটা নৈতিক লক্ষণ আছে। লেখক স্বামীজির কথার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া বহুযত্নে কলম পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু যদি আরও একটু যত্ন লইয়া তাহার পরের অংশ উদ্ধৃত করিতেন—তাহা হইলে মহৎ কার্য্যের যে নৈতিক লক্ষণ, যাহা তাহাকে অসৎ হইতে অবচ্ছেদ করে, সেইটী বুঝিতে পারিতেন। স্বামীজির কথার পরের অংশটী এই—"প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।" যেখানেই এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সত্যনিষ্ঠা এবং বীর্য্যের অভাব সেখানেই ভীতি ও কাপুরুষতা—সুতরাং সেখানেই 'চালাকী' জাল, চক্রান্ত, কুৎসা, হত্যা। এই বিভৎসতার সাহায্যে যত বড়ই প্রকাণ্ড কার্য্য সাধিত হউক না কেন তাহার সহিত আমরা বুদ্ধ, চৈতন্যের কার্য্যের সহিত ব্যবহারিক রাজ্যে এক করিয়া লইতে পারিব না।

তার পর লেখক বলচেন "লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যে heroর বীজ যেমন তাজা অবস্থায় আছে, ভাল মানুষের মধ্যে তেমন নেই। তাই আমার স্বামিজীর ঐ exclusiveness এ আপত্তি।" এখানে লেখক নিজেই

exclusive হয়ে পড়েছেন। স্বামীজি এ বিষয়ে যেরূপ উদার সেরূপ জগতে বোধ হয় আর একটী আসেন নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ ব লয়াছেন, hero থেকে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীছাড়া পর্য্যন্ত সেই 'সচ্চিদানন্দ' সমভাবে বর্ত্তমান—কেবল প্রকাশের তারতম্য। এই তারতম্য স্বীকার করে লেখকের কথাটা এক দিক দিয়ে সত্য হইতে পারে—যদি hero অর্থে অভিনয়ের hero ধরা যায় তাহা হইলে লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যে heroর বীজ খুব তাজা অবস্থায় থাকে—আর নয় ত যদি 'ভালমানুষ' অর্থে, ইংরাজীতে যা'কে simpleton বলে, ধরা যায়, তাহা হইলে ভালমানুষের অপেক্ষা লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যে heroর বীজ তাজা অবস্থায় আছে এ কথা সত্য। আর তাহা না হইলে ভালমানুষ বা মহৎ লোক, যেখানে শক্তির বিকাশ অধিক (Carlyle যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন) তাঁহারাই প্রকৃত Hero. Heroর ideal বা আদর্শ তাঁহারাই জগতে রাখিয়া যান।

লেখকের তারপরের অভিমত হইতেছে "দেশবাসীর সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করতে হবে এবং তাদের অন্তরাত্মার বস্তুর বিষয়ের ভোগের আনন্দকে সত্য করে তুলতে হবে তবেই তাদের কর্ম্ম-প্রেরণার সত্য প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে সেদিকে, আনন্দের ভিতর দিয়ে—কেননা অন্তরাত্মার যে সত্য সেই সত্য আচরণেই মানুষের আনন্দ। আর তবেই তা সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।" কথাটা আমাদের স্ববিরোধী বলিয়া বোধ হয়। হয় লেখকের আত্মা সদা নিরানন্দ তাই বিষয়ের ইন্দ্রিয় জনিত ভোগের দ্বারা আনন্দিত করিতে হইবে—আর তাহা যদি না হয়, তবে সদানন্দ আত্মাকে বিষয় ভোগের দ্বারা কিরূপে আনন্দিত করা যাইতে পারে? প্রদীপ জ্বালিয়া কি সূর্য্যকে আলোকিত করিতে হইবে? সে ত বাতুলতা। ইন্দ্রিয়-ভোগাদর্শ হইতে যে কর্ম্ম প্রেরণা সে ত পশু হইতে সকল জীবেই বর্ত্তমান। সকলেই বিষয় ভোগে রত হইয়া যদি বলিতে থাকে যে আত্মা তৃপ্ত হইতেছেন তাহা হইলে ত্যাগের স্থান হইবে কোথায়? আর ত্যাগ যতদিন জগতে থাকিবে ততদিন বৈরাগ্য জগতে থাকিবে। বৈরাগ্য বা ত্যাগ অর্থে—জড়ত্ব নহে। ত্যাগ বা বৈরাগ্যের অর্থ—স্বার্থ এবং

সসীমতাকে অতিক্রম করিয়া নিরবচ্ছিন্নরূপে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মীয় আত্মার মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত প্রকাশকে উপভোগ করিবার প্রচণ্ড কর্ম্ম প্রেরণা। এই ত্যাগের 'বিগ্রহ'ই জগতে থাকিয়া যায় এবং পূজিত হয় আর ভোগের 'সাকার রূপ' চিরকালই ধূলি ধূসরিত হইয়া শূন্যে বিলীন হয়—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য।

সংবাদ।

ক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে প্রসাদ বিতরণ এবং বক্তৃতাদি কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছে সংবাদ পাইয়াছি। স্থানাভাবে আমরা তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ মাত্র করিতেছি :—

১। কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে—রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় ইটালী, বক্তা স্বামী শর্ব্বানন্দ; বিবেকানন্দ সোসাইটি—বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশিত; সাধারণ সভা ষ্টার থিয়েটার—বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তা ছিলেন; রামকৃষ্ণ সমিতি, পার্শিবাগান; ঘুসুড়ী, হাওড়া, বক্তা—ব্রহ্মচারী অখণ্ড চৈতন্য; চেৎলা এবং ব্যাণ্টরা; ফতেপুর, গার্ডেন রিচ, বক্তা—স্বামী বাসুদেবানন্দ, ২। সম্বলপুর, বক্তা—ব্রহ্মচারী অখণ্ড চৈতন্য ৩। জামসেদপুর, বক্তা—ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য। ৪। বেতিলা—মাণিকগঞ্জ। ৫। ফরিদপুর, সভাপতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র, বক্তা—প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ ভিষগ্‌রত্ন। ৬। শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম—শ্রীহট্ট। ৭। বাসাভাঙ্গুডি, মহীশূর। ৮। রামকৃষ্ণসমিতি রেঙ্গুন, বারমা। ৯। বিবেকানন্দ আশ্রম, কউলালামপুর, মালয়উপদ্বীপ, সভাপতি ডাঃ পি, এন্ সেন, বক্তা—স্বামী বিদেহানন্দ, ডাঃ জে, পি, জোসি, মিঃ এস্, এস্ ভোরাই। ১০। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা ব্রাঞ্চ।

খ। বালি আর্য্যধর্ম্ম-রক্ষণী সভায় কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে স্বামী সর্ব্বানন্দ ও বাসুদেবানন্দ বক্তৃতা করেন।

গ। ৩১শে চৈত্র রামরাজাতলায় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রথম সভার অধিবেশনে পণ্ডিতপ্রবর বেদান্তবারিধি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

সময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজি যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন তাহা ফলোন্মুখী। পাশ্চাত্য অনেক কাল-লক্ষণবিৎ পণ্ডিতেরা ঠারে ঠোরে অনেক কথা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায়, ইউরোপীয় সমাজের বুকের উপর দাঁড়াইয়া এরূপ স্পষ্টস্বরে সত্য কথা আর কেহ বলেন নাই—যে ইউরোপ যদি তাহার সমাজনীতিকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না করায় তাহা হইলে তাহার ধ্বংস আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সুনিশ্চিৎ।

*　　*　　*

আগ্নেয়গিরির চূড়ার উপর নগর প্রতিষ্ঠা যেরূপ ভয়াবহ, ভোগশীর্ষে সমাজ সভ্যতার প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেরূপ সে নগরীর ধ্বংস আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই কল্পনা করিতে পারি, সেইরূপ ভোগান্তর্গত হিংসা দ্বেষের প্রচণ্ড বিস্ফারণে সে সমাজ সভ্যতার ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী।—ঘটিয়াছেও তাহাই। ভোগপরতন্ত্র ইউরোপীয় সমাজ আজ হিংসা দ্বেষের প্রচণ্ড স্ফুরণে ভীত, ত্রস্ত, চূর্ণ।

*　　*　　*

অপর দিকে 'সত্ত্বগুণের ধূয়া ধরিয়া' এই বিরাট ভারতবর্ষ আজ অতল জড় সমুদ্রে ডুবিতে বসিয়াছে। ত্যাগ ভিত্তি বেদান্ত যে দেশের ধর্ম্ম—তাহা মাত্র ব্যাখ্যা ও পুঁথিতে সমাপ্ত হইয়া জীবনে তাহার বাস্তবতা কোথায় ভারতভারতী তাহা বিস্মৃতির অগাধ জলে ডুবাইয়া উহা অতীতের

কঙ্কালরূপে প্রদর্শনীতে সুসজ্জিত করিবার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। ভোগ ও কর্ম্মতৃপ্ত মানবের চক্ষে যে নিবৃত্তির আলোক প্রতিফলিত হয়, সে আলোকরাজ্যের সিংহদ্বারে লেখা 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'—ভারতভারতী সেই মহাসত্যকে আকাঙ্ক্ষালালসা পরিপূর্ণ অথচ ভোগশূন্য নিজ জীবনে ধারণ করিয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ, ছিন্ন মেঘের ন্যায় জগদাকাশ হইতে বিলীন হইতে বসিয়াছেন।

* * *

তমঃ জীবকে জড়ত্বে পরিণত করে। রজোগুণ প্রাণের বিকাশ দেয় সত্য কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি সংঘর্ষে চূরমার হইয়া যায়। সত্ত্বই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশক। কিন্তু তমোগুণাবলম্বীকে সত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে রজের মধ্য দিয়া করা চাই। কেবল-রজঃ ধ্বংসের তোরণ, কিন্তু উহা যদি আধ্যাত্মিক সত্ত্ব সংযমিত হয় তবেই উহা জীবকে শুদ্ধ সত্ত্ব নগরীর সাত্ত্বিক প্রজা হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলে।

* * *

এই আধ্যাত্মিকতা কি?—সর্ব্বভূতান্তরযামী পরমাত্মাকে সকল কর্ম্মের ফল স্বরূপে, জ্ঞানের অভিধেয় স্বরূপে, প্রেমের বস্তু স্বরূপে সর্ব্বাগ্রে অনুমান—পরে উপলব্ধি। আমারই পরম প্রেমাস্পদ আত্মা সর্ব্বভূতে বিভূ হইয়া রহিয়াছেন এই জ্ঞান যদি আজ হইতে প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে এই জগৎ যাহা আমাদের নিকট দ্বৈত দৃষ্টি দোষে সয়তানের বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহা হইতে একটা আবরণ উঠিয়া গিয়া উজ্জ্বল দেবজগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইবে।—কেন? এই অদ্বৈত দৃষ্টিই সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধার হেতু, আবার শ্রদ্ধার পুষ্ট অবস্থা প্রীতি, এই প্রীতিই সকল সুখানন্দের বিধায়ক।

* * *

অনাদি অনন্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশ-প্রবাহের মানব এক বিশেষ তরঙ্গ। এই প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, যখন কোনও জীব-জাতি-বিশেষ তাহার বেষ্টনীকে অবলম্বন করিয়া কোনও নূতনত্বের বিকাশ দিতে না পারে—নিজেকে উন্নততর করিতে সক্ষম না হয় তথনই জীর্ণ হইয়া মাতৃ

ক্রোড়েই বিলীন হইয়া যায়। বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজও ঠিক এমন এক সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, হয় তাহাকে পুরাতন ত্যাগ করিয়া নূতনতর সমাজ গঠন করিতে হইবে, না হয় জীর্ণ হইয়া জগৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে।

* * *

বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজ দুইটী অতি পুরাতন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) জন্মগত স্বত্ব এবং (২) পাপ। জন্মগত স্বত্বকে অবলম্বন করিয়া জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, কুল, বা ব্যক্তিবিশেষ এতকাল জগৎ শাসন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকর্ত্তৃক কতকগুলি এমন নিয়ম সৃষ্ট হইয়াছে যাহা সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে, যদিও তাঁহারা নিজেদের জন্য বরাবর কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই নীতির এক উত্তম যুক্তিও আছে—ইহার দ্বারা বহু মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। যাহারা এই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন তাঁহারাই পাপী এবং সমাজের দণ্ডার্হ। ইহাই বর্ত্তমান সমাজের সেতু।

* * *

কিন্তু নব জড়বিজ্ঞান জন্মিবামাত্র অসুরের ন্যায় বলশালী হইয়া জন্মগত স্বাধিকারের মূলে ধ্বংসের কুঠার নিক্ষেপ করিল। সে দেখাইল রাজা প্রজা, ধার্ম্মিক পাপী, পণ্ডিত মূর্খ, প্রভু দাস সকলই এক প্রকৃতির পরিণাম—কেবল কিঞ্চিৎ অবস্থার তারতম্য। দুর্ব্বল অসুস্থকে যেমন সবল ঘৃণা করিতে পারে না বরং সেখানে যেমন সমধিক দয়া, শ্রদ্ধা এবং যত্নের প্রয়োজন সেইরূপ রাজা, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত বা প্রভু—প্রজা, পাপী, মূর্খ বা দাসকে তুচ্ছ না করিয়া অধিক দয়া, শ্রদ্ধা এবং যত্ন দেখাইতে বাধ্য। বিশেষ সুবিধা কেহই ভোগের অধিকারী নহেন—কারণ সকলেরই উত্থান প্রকৃতি হইতে লয় প্রকৃতিতেই।

* * *

আবার পাপের অসত্তা মানুষ ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছে; কারণ মানুষ 'মানুষ' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে নানা অভিজ্ঞতা ফলে। লোকে যাহাকে পাপ বলে, অধিকাংশ সময়ে সেই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ নিজ ব্যক্তিত্বের অধিকতর বিকাশ করিয়াছে দৃষ্ট হয়। 'চণ্ডাশোক'ই

পরে 'ধর্ম্মাশোক' হইতেছে। প্রবৃত্তিই নিবৃত্তি মার্গের পরিচায়ক। শিশুর হস্ত দগ্ধ হইলে সে আর অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। অতএব অসৎকে ঘৃণা করিবার কোনও যুক্তি নাই। তুমি অসৎ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া সৎকে উপলব্ধি করিতেছ, অপরে অসৎকে কর্ম্মের দ্বারা বুঝিতেছে পরে সেও তোমার পথ অবলম্বন করিবে। অসতের ফল দুঃখ, সতের ফল সুখ। এই দুঃখই আমাদের অন্তরের বস্তু জাগাইয়া তুলে—এই দুঃখই আমাদের গুরু, শ্রদ্ধার্হ।

* * *

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সাম্যের ভিত্তি ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করায় তাহার ফল পাশ্চাত্য জগতে এক মহাব্যভিচার সৃষ্টি করিয়াছে। মানবের জন্মগত সংস্কার—আত্মরক্ষা এবং সুখলাভেচ্ছা। বৈজ্ঞানিক সাম্য স্বাধীনতার ধারণা লাভ করিয়াও আধ্যাত্মিক একত্বকে না জানায় সে জগতে মৈত্রী লাভ করিতে পারে নাই। সে যেনতেনপ্রকারেণ নিজ ক্ষুদ্রআমিত্বকে ভোগৈশ্বর্য্যের দ্বারা পুষ্ট করিতে ব্যাপৃত। পরার্থে ত্যাগ সে ততটুকু করিতে প্রস্তুত, তাহার ব্যক্তিত্বের পুষ্টির সহিত যতটুকু সমাজ বা জাতির সম্বন্ধ নির্ভর করে। যেমন আমাদের পশু পালন। আমরা তাহাদের নিমিত্ত অর্থের ব্যয় করি নিজ ভোগের জন্য—অকর্ম্মণ্যের স্থান এ জগতে তাহাদের নিকট নাই।

* * *

কিন্তু সর্ব্বরক্ষণশীল বেদান্ত এই সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন 'মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা'। আত্মার রক্ষা করিতে হইবে তাহার সসীমত্ব ভাঙ্গিয়া, সর্ব্বভূতে তাঁহার দর্শন করিয়া। যখন এই মহতী কল্পনা উপলব্ধিতে পরিণত হয় তখন শত্রু বলিয়া আর কেহ থাকে না—জগতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। আমারই আত্মা যখন সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান তখন আত্মবোধে জগৎসেবার দ্বারা সুখলাভ করিতে হইবে—সে সুখের অন্তরায়, প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ থাকিবে না। জগতে জড়ের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার তারতম্য নাই। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই সেই এক আত্মার অভিব্যক্তি। আমি হয়ত একটি লহরী তুমি একটি প্রকাণ্ড

তরঙ্গ কিন্তু আমাদের উভয়েরই তলদেশে এক অপরিণামী সচ্চিদানন্দ সত্তা। আমরা কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিতে বা পাপী বলিতে পারি না—কেন না, সকলেরই অন্তরের অন্তরতম দেবতা আমার নিজেরই যথার্থ স্বরূপ। পাপ বল পূণ্য বল, ধর্ম্ম বল অধর্ম্ম বল সকলই সেই একই পরমাত্মার লীলা বৈচিত্র্য মাত্র, স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পথে বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র।

* * *

এই অদ্বৈত তত্ত্বই মানবের চক্ষে শ্রদ্ধার অঞ্জন পরাইয়া দিয়া হিংসা দ্বেষাবরণ-ভেদকারী অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন করিবে। মানুষ তখন বুঝিবে প্রভু সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। ত্যাগ ও প্রেমের উৎস স্বতঃ প্রসূত হইয়া হৃদয়ের সকল রূঢ়তা, বর্ব্বরতা লোপ করিয়া সরস করিবে। তখনই ভারত ইউরোপের নিকট শিক্ষা করিবে বহিঃ প্রকৃতিকে কি প্রকারে জয় করিতে হয়, আর ইউরোপ ভারতের নিকট শিক্ষা করিবে কি প্রকারে অন্তঃ প্রকৃতিকে জয় করিতে হয়। এই শিক্ষার আদান প্রদানে তথা-কথিত প্রাচ্য পাশ্চাত্য বুদ্ধি লোপ হইয়া যথার্থ ভ্রাতৃভাবের উপলব্ধি হইবে এবং উহাই আগত ভবিষ্যৎ মানবের আদর্শ সমাজ।

পড়ে থাক্।

(আনন্দ চৈতন্য)

শত শত প্রাণী ওই তুহারি মতন,
আসে যায় ঘোরে ফেরে কি দিবা রজনী ;
তুই মূর্খ কেন এত করিস্ বিলাপ,
কেন মুখে তোর এত অসম্বন্ধ বাণী ?
থাক্ পড়ে থাক্ ওরে ওই পথ চেয়ে ;
আসিবে আসিবে কালে আসিবে সে ধেয়ে

আহ্বান।

(স্বামী ভূমানন্দ)

"Instructed by misfortune be now united and prove to the World that one Spirit animates the Polish Nation."

—Napolean.

ভারতের ভাগ্যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। এসময় যদি ভারত ভারতী জগতের জাতি সঙ্ঘের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে না পারে—যদি নিজেদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইতে না পারে, সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতেরও যে দিবার মত অনেক মাল আছে দেখাইতে না পারে—তবে ভারতের মৃত্যু অনিবার্য্য।

ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় সকল অবস্থায়ই অভাবের তাড়নায় অধিকতর জর্জ্জরিত। তাহার ঘরে নাই বলিতে কিছুই নাই—যাহাও বা আছে তাহাও অভাবের তাড়নায় এবং আত্মরক্ষার উপায়ের অভাবে—নাম মাত্র মূল্যে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। পেটরায় অর্থ নাই, দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার শক্তিও নাই। তার উপর এত মতবাদের প্রচারে শিক্ষিত লোক বহুধা বিভক্ত হইয়াছেন—অশিক্ষিতগণ ক্ষুধার তাড়নায় প্রায় উন্মাদ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কে কার কথা শুনিবে—কেই বা কাকে এই বিঘোরে রক্ষা করিবে? এখন মত প্রতিষ্ঠার জন্য দলাদলি করিবার সময় আছে কি?

সম্মুখে বিশাল ভারতক্ষেত্র। কোটী কোটী নরনারী সে ক্ষেত্রে অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে—বিদ্যার অভাবে পশুপ্রায় বিচরণ করিতেছে, ধর্ম্মের অভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছে—ত্যাগের অভাবে প্রতিবাসীর অনশন ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়াও ক্লেশ বোধ করিতেছে না—নগ্নপ্রায় নরনারী দেখিয়া লজ্জা বোধ করিতেছে না—কত আর বলিব? কেহই কিছু করিতেছেন না—তাহারই মধ্যে যদি কেহ বা কিছু করিয়া থাকেন তাহা দেখে কার সাধ্য। চতুর্দ্দিকে যে ভীষণ কোলাহল উঠিয়াছে—

মাথা যার নাই সে এখন আছে বেশ, যার মাথা আছে তাহাতে তার ব্যথাও ধরিয়াছে ।

কার জন্য এত মতবাদের প্রচার? জনসাধারণের জন্য ত। জন-সাধারণ যদি আসন বসনের অভাবেই লোপাট হইয়া গেল তখন তোমার মতবাদ লইবে কে?

এই বিঘোরে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় আছে—মুখ বন্ধ করিয়া কাযে প্রবৃত্ত হওয়া। কায করিতে গেলেই তার দোষ গুণ ধরা পড়িবে—আর তখনই ভারতের কল্যাণের উপায় হইবে।

আমরা সেজন্য ভারতভারতীকে আহ্বান করিতেছি। এবং বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি—যিনি যে সমাজের, যে ধর্ম্মের, যে মতবাদের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকুন না কেন, তাহাই যে শ্রেষ্ঠ সমাজ বা ধর্ম্ম তাহা তিনি কাজে, জীবনে প্রমাণ করুণ।

সন্ন্যাসিগণ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়—' বলিয়া যে কথা প্রচার করিয়া থাকেন—এবার কার্য্যের দ্বারা বাক্যের সার্থকতা দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে রাখিবেন। জপ ধ্যান, পূজা পাঠ লইয়া যাহার সমস্ত দিন কাটে না—বাজে গল্পে এবং অলসে অবশিষ্ট সময় নষ্ট করা তাঁহার ভাল দেখায় কি? কেহ অদ্বৈতবাদী হইতে পারেন, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন, আবার কেহ কেহ দ্বৈতবাদীও হইতে পারেন—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ কত কি আছেন—চিত্তশুদ্ধির জন্যই হউক, সেবা বুদ্ধিতেই হউক, দয়ার নামেই হউক—দেখান দেখি আপনার ধর্ম্মমত কতটা উদার হইয়া কত বেশী লোকের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতে পারে? ভারতবাসীর অভাবের তাড়নায় বুদ্ধি বিভ্রম উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু জগতবাসী সকলেই সে তাড়না ভোগ করে না সুতরাং কথায় আমার সমাজ, আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিলেও সহজে তাহারা বিশ্বাস করিবে না। অথচ তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠা—সমকক্ষতা লাভ করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তারও নাই।

তেমনি গৃহিগণও নিজ মতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কার্য্যে পরিণত করিয়া

দেখান যে দ্বিতীয় আশ্রমে থাকিয়াও জগতে আদর্শ দেখাইতে পারা যায়।

কোন দেশেই সকলে সন্ন্যাসী হয় না, সকলে বাণিজ্য করে না, সকলের ক্ষাত্র বৃত্তি থাকে না। রুচি এবং সামর্থানুসারেই কর্ম্মের বিভাগ বর্ত্তমান। সে ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চ্চারূপ আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের সংবাদ রাখিতে যাইয়া বৃথা শক্তিক্ষয় করা কাহারও সঙ্গত নহে। বরং বিশ্বস্থ হৃদয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া লোকে আপন আপন রুচি এবং সামর্থানুসারে কর্ম্মে লাগিলে, দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন হইবে।

পর দোষ উন্মোচনের প্রচেষ্টাতে মানুষ নিজে 'হাল্‌কা' হইয়া পড়ে এবং অপরকেও 'হাল্‌কা' করিয়া ফেলে। হালকা বা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবে কি ?

"চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য" সাধন করা যায় না। "প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়ে" সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে —জাতিসঙ্ঘে আমাদের স্থান কোথায় হওয়া উচিত তাহা প্রত্যেক ভারত-ভারতীর ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কার্য্যের ফল না দেখিয়া কথায় বিশ্বাস করা মননশীল মানুষের ধর্ম্ম নহে, কর্ত্তব্যও নহে। যে কাজ করিয়া দেখাইতে না পারে—তার মতের পোষকতায় লোকের অভাব হয় না। বৃথা নাম, যশ, প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মপ্রতারণা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে মানুষকে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

ভারতে এখন তিনটী সমস্যা সমধিক বিদ্যমান (১) Co-operation (সহযোগীতা) (২) Non Co-operation (সহযোগীতা বর্জ্জন) আর (৩) ফকিরি বা (ত্যাগ)। যদি কেহ বলেন Co-operation ভাল। আমরা বলিব খুব ভাল কিন্তু আপনি Non Co-operetion মতটা ভুল প্রমাণ করিতে যাইয়া বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া পূর্ণ উদ্যমে কায করিয়া প্রমাণ করুণ Co-operationই ভাল। তেমনি Non-Co-operation সম্বন্ধেও সেই একই কথাই বলিতে হইবে। "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং।"

আর তুমি ফকির—সকল ত্যাগ করিয়াও ভোগের মোহ যদি না কাটাইতে পার তবে তোমার কথা কে শুনিবে? ত্যাগে যে অমৃতত্ব লাভ হয় কে জানিবে? যা তুমিই মান না—তা তুমি কেবল কথায় অপরকে মানাইবে? তোমার ত্যাগটা 'ঝঝ্ঝরে' হইবে তবে না লোকে দেখিবে। কোথায়ও কিছু নাই শুধু চিৎকার।

এক্ষণে আসুন সকলে, দেখান আপনাদের মতের মহিমা। বাদবিতণ্ডা পরচর্চা অনেক হইয়াছে—কিন্তু তাতে কাহারও পেট ভরে নাই। এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া যদি অভ্যাস বশতঃ বলিতে ইচ্ছা হয় তখন প্রত্যেক সম্প্রদায় যাঁহারা একটা মূল উদ্দেশ্য লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন তাহার বিষয় বলুন—বলুন শ্রীভগবানের নাম জয় যুক্ত হউক—ভারতের কল্যাণ হউক—ভারত ভারতী শান্তিতে থাকুক।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(স্বামী সদানন্দকে লিখিত।)

কল্যাণবরেষু,

বোধকরি—শারীরিক কুশলে আছ। আপনার জপতপ সাধন ভজন করিবে ও আপনাকে দাসানুদাস জানিয়া সকলের সেবা করিবে। তুমি যাঁহাদের কাছে আছ, আমি ত তাঁহাদের দাসানুদাস ও চরণরেণুর যোগ্য নহি—এই জানিয়া তাঁহাদের সেবা ও ভক্তি করিবে। ইঁহারা গালি দিলে বা খুন করিলেও ক্রুদ্ধ হইও না। কোন স্ত্রীসঙ্গে যাইও না—Hardy (কষ্টসহিষ্ণু) হইবার অল্প অল্প চেষ্টা করিবে এবং সইয়ে সইয়ে ক্রমে ভিক্ষা দ্বারা শরীর ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয়, সেই তোমার গুরু জানিবে। কর্ত্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়া বড় শক্ত। বিশেষতঃ তুমি শশীর কথা শুনিবে।

গুরুনিষ্ঠা ও অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ব্যতিরিক্ত কিছুই হইবে না—নিশ্চিত, নিশ্চিত জানিবে। Strict morality (খাঁটি নীতিপরায়ণতা) চাহি—একটুকু এদিক্ ওদিক্ হইলে সর্ব্বনাশ।

ইতি—

নরেন্দ্রনাথ।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

গাজিপুর।

১২ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

বলরাম বাবু,

Receipt (রসিদ) পাবামাত্র লোক পাঠাইয়া Fairlie place (ফেয়ালি প্লেস) রেলওয়ে গুদাম হইতে গোলাপ ফুল আনাইয়া শশীকে পাঠাইয়া—দিবেন। আনাইতে বা পাঠাইতে বিলম্ব না হয়।

বাবুরাম Allahabad (এলাহাবাদ) যাইতেছে শীঘ্র—আমি আর একযায়গা চলিলাম।

নরেন্দ্র

P. S. দেরী হলে সব খারাপ হইয়া যাইবে—নিশ্চিত জানিবেন।

নরেন্দ্র

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)।

গাজিপুর।

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র কল্য পাইয়াছি। সুরেশ বাবুর পীড়া অত্যন্ত কঠিন শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আপনারও পীড়া হইয়াছে, দুঃখের বিষয়। অহংবুদ্ধি যতদিন থাকে,

ততদিন চেষ্টার ত্রুটি হইলে তাহাকে আলস্য এবং দোষ এবং অপরাধ বলা যায়। যাঁহার উক্ত বুদ্ধি নাই, তাঁহার সম্বন্ধে তিতিক্ষাই ভাল। জীবাত্মার বাসভূমি এই শরীর কর্ম্মের সাধন স্বরূপ—ইহাকে যিনি নরককুণ্ড করেন, তিনি অপরাধী এবং যিনি অযত্ন করেন, তিনিও দোষী। যেমন সামনে আসিবে খুঁৎ খুঁৎ কিছুমাত্র না করিয়া তেমনই করিয়া যাউন।

'নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥"

—যে টুকু সাধ্য সেটুকু করা, মরণও ইচ্ছা না করিয়া এবং জীবনও ইচ্ছা না করিয়া—ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কাশীতে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে—প্রমদা বাবু প্রয়াগে গিয়াছেন। বাবুরাম হঠাৎ এস্থানে আসিয়াছে—তাঁহার জ্বর হইয়াছে—এমন অবস্থায় বাহির হওয়া ভাল হয় নাই। কালীকে* ১০৲ টাকা পাঠান গিয়াছে—সে বোধ হয় গাজিপুর হইতে কলিকাতাভিমুখে যাইবে। আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম। কালী আসিয়া আপনাদের পত্র লিখিলে যাহা হয় করিবেন। আমি লম্বা। আর পত্র লিখিবেন না, কারণ আমি এস্থান হইতে চলিলাম। বাবুরাম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবেন।

ফুল বোধহয় রিসিট (রসিদ) প্রাপ্তিমাত্রই আনাইয়া লইয়াছেন। মাতাঠাকুরাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সমদৃষ্টি হয়—সহজাত বন্ধন ছাড়াইয়া পাতান বাঁধনে আবার যেন না ফাঁসি। যদি কেহ মঙ্গলকর্ত্তা থাকেন এবং যদি তাঁহার সাধ্য এবং সুবিধা হয়, আপনাদের পরম মঙ্গল হউক—ইহাই আমার দিবারাত্র প্রার্থনা কিমধিকমিতি—

দাস নরেন্দ্র।

* স্বামী অভেদানন্দ।

অতুল বাবু—*

আপনার মনের অবস্থা খারাপ জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম—যাহাতে আনন্দে থাকেন তাহাই করুন—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং
ইহ সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।

দাস
নরেন্দ্র।

পুনঃ—আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম—দেখি অদৃষ্ট কোথায় লইয়া যায়।

শান্তি—শ্রীমদাচার্য্য বিবেকানন্দ বিরচিত

(অনুবাদক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।)

হের উহা আসে মহাবেগে
সেই শক্তি, যাহা শক্তি নয়!
অন্ধকারে যে আলোক জাগে,
দীপ্তালোকে যাহা ছায়া হয়!

অস্ফুট আনন্দ যারে কহে।
তীব্র শোক অনুভূত নহে!
অজীবিত অমর জীবন!
অশোচিত অনন্ত মরণ!

* ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা ৺অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লিখিত এই পত্রটুকু বলরাম বাবুকে লিখিত ১৫ই মার্চ্চের পত্র মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল।

নহে শোক, নহে এ আনন্দ!
সুখ দুঃখ মাঝে করে দ্বন্দ্ব!
নহে রাত্রি, নহে ইহা দিবা—
এ দু'য়ে মিলায়ে দেয় যেবা!

সঙ্গীতের সম যার নাম!
কলা-শিল্পে যা'হয় বিরাম!
বাক্য-মাঝে যাহা নীরবতা!
রিপুদ্বন্দ্বে চিত্ত প্রসন্নতা!

অদৃষ্ট এ শোভা সুষমার!
আত্ম-প্রেমে-প্রতিষ্ঠা যাহার!
অগীত এ সঙ্গীত রাগিনী!
অজ্ঞাত এ জ্ঞানের কাহিনী!

মৃত্যু যুগ্ম-ব্যক্ত-প্রাণ মাঝে!
ঝঞ্ঝা-মাঝে শান্তি যথা রাজে!
যেই শূন্যে সৃষ্টির বুত্থান!
যথা পুনঃ হয় অবসান!

আঁখি-জল পড়ে যথা ঝ'রে,
হাসি-রেখা তুলিতে অধরে!
জীবনের যথায় নির্ব্বান!
শান্তি মাত্র যার হয় ধাম!

বৈদিক ভারত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন)

স্বামী সারদানন্দ—Stray thoughts on Literature and Religion of Indiaয় বলেন "The one peculiarity of the Upanishads in which they all differ from almost all other poetry of the world, is that they never try to express the infinie in the terms of matter, in the terms of bones and muscles."

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের আদি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন মিশর, চীন, বাবিলন প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বপুরুষ উপাসনা প্রচলিত ছিল। তদ্দেশবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—জড়দেহের ভিতর আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণী আছে—যাহা মৃত্যুর পরও দেহ চিরতরে বিলুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এই ভাবের অনুপ্রেরণা হইতেই প্রাচীন মিশরের ভুবন বিখ্যাত পিরামিড সমূহ ও "মমি" উদ্ভূত হইয়াছিল। অন্যদিকে বৈদিক ও গ্রীস্ দেশীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি প্রকৃতির সুমনোহর শক্তি সমূহের উপাসনা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। মনোরম ঊষা, স্নিগ্ধ গোধূলি প্রবল ঝঞ্ঝা, ঘর্ঘর বজ্রনাদ প্রভৃতি প্রকৃতির কমনীয় ও প্রচণ্ড দৃশ্যাবলীতে বিমোহিত, বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত চকিত প্রাচীন মানব প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে অতি গুণশীল, অতিমানবরূপে ধারণ করিয়া লইয়াছিল এবং এই প্রকার আবেষ্টনী প্রসূত ভাব ও চিন্তার বিভিন্নতারই বিবিধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—"That I propose to call the struggle to transcend the limitation of the senses." মৃত আত্মীয়ের আত্মার অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ অথবা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সমূহে অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি উপাসনা মানব মনের স্বভাবজাত অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অন্বেষণই সূচিত করে। খুব সম্ভব স্বপ্নে দৃষ্ট নানা বিষয় ও

মৃত প্রেতাত্মার দর্শন প্রাচীন মানবকে আরও অন্তর্ম্মুখী করিয়া তুলিয়াছিল। বহু চিন্তাশীল মনীষীর মতে স্বপ্নের প্রহেলিকা ও প্রেতাত্মার দর্শন লাভই প্রাচীনকালে ধর্ম্মের সূচনা করিয়াছিল। মানবমন এই প্রকারে মনস্তত্ত্বের আলোচনায় গভীর নিবিষ্ট হইয়া মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন একটি অবস্থার সন্ধান ও অনুভূতি লাভ করিল—যাহাকে প্রহেলিকাময় স্বপ্নও বলা চলে না অথচ যাহা জাগ্রৎ অবস্থাও নহে। প্রত্যেক সুসংবদ্ধ প্রাচীন ধর্ম্মেই এইরূপ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক অবস্থার (Super Conscious State) কথা পাওয়া যায়। বেদের ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা—যিনি এই মহান্ অবস্থার দর্শন ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন।

সংহিতার গাথাসমূহ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, পর্য্যন্ন প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে গীত হইয়াছে। দেবগণের প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক ও রূপক কাহিনী বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়—অহি নামক সর্প মর্ত্যলোকে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলে ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে অহির সংহার সাধন করিলেন। এবং মানবগণ সুমহৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। দেবগণ সোমপান করিতেন, যজ্ঞাদির সময় তাঁহাদিগকে সোমরস প্রদান করা হইত। ইন্দ্রদেব একবার অত্যধিক সোমরস পান করিয়া অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক সংহিতার অলৌকিক কাহিনীসম্বলিত দেবগণের সহিত অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মবিবৃত দেবগণ বিসদৃশ ও ভিন্ন। বৈদিক্ দেবগণের বৈশিষ্ট্য এই—তাঁহাদের সকলেরই পশ্চাতে বিরাট অনন্তের ভাব বর্ত্তমান—অন্য কথায় বলিতে গেলে—তাঁহারা একই সত্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি—সত্তা হিসাবে সকলেই এক কিন্তু প্রকাশের তারতম্যে বিবিধ। এক গাথায় ইন্দ্রদেব মহাগুণশীল অতিমানবরূপে বর্ণিত হইয়াছেন—অন্যত্র তাঁহাকেই আবার সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বপ্রোত বলিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে। এই প্রকার এক এক দেবতাতে ক্রমশঃ ঈশ্বরত্ব আরোপ করাকে ম্যাক্স্‌মুলার "Henotheism" নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন বাবিলীয় ও গ্রীসীয় ধর্ম্মকাহিনীতে দেবতাদের বিপুল সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাবিলনে "মোলক্" নামক কয়েকজন দেবতার উপাসনা প্রচলিত

ছিল। 'মোলক্‌গণের কলহে "Jehova" নামক মোলক্ শক্তিমান্ হইয়া শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন ও অপর সকল মোলকের উপাসনা বিলুপ্ত হইয়া গেল। গ্রীস ধর্ম্মও এই প্রকারে "Zeus" পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিকধর্ম্মে এই প্রকার বিপ্লবের কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। বৈদিক ঋষিগণ এক মহান্ উদারতার বন্যায় ধর্ম্মরাজ্য হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ভাসাইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা "একম্ সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" এই সমন্বয় বার্ত্তায় সকল দেবতার অন্তর্নিহিত অথণ্ড একত্বের অনুভূতি লাভ করিয়া সকলকেই সমানভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কোন বিশিষ্ট সমাজের আলোচনায় প্রতীচীন (Subjective) ও পরাচীন (Objective) নানা অন্ধ সংস্কার আমাদিগকে যথার্থ সত্যানু-সন্ধান হইতে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। কোনও সমাজের সমালোচনা করিতে আমাদিগকে তাহার অন্তঃসত্বার সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়—তদ্ভাবভাবিত হইয়া তাহারই আদর্শ ও ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর করিয়া বিচার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। অন্যথা বুদ্ধির একদেশ-দর্শিতা ও দেশ, জাতি ও শিক্ষাগত সংস্কার ভিন্নসমাজের কদর্থ করিয়া সত্যালোচনার পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখে। বৈদিক সমাজকে বুঝিতে হইলে বৈদিক সাধনা—যাহা তৎকালীন সমাজে ওতপ্রোত ছিল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয় ; নতুবা সামাজিক সাধনা ও আদর্শের বোধহীনতা সমাজ সম্বন্ধে ধারণা কুহেলিকাচ্ছন্ন করে। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের শ্রুতিতে আছে—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ—" সুতরাং বৈদিক যুগেই জাতিভেদ প্রচলিত ছিল—প্রমাণিত হয়। জাতি-ভেদে চারিবর্ণ যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক সত্যদ্রষ্টা, সাধ্যায় ও শাস্ত্রানুশীলন রত ও আইন প্রণেতা ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের উপর পরমার্থের সংরক্ষণ নিমিত্ত দেশরক্ষা ও অন্তর্বহিঃ বিপ্লব দমনের ভার ছিল। বৈশ্য অর্থ নৈতিক ও শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। শূদ্র সম্ভবতঃ বিজিত দাসরূপে পারিবারিক শ্রমজীবীতে পরিণত হইয়াছিলেন অথবা অসভ্যতা প্রযুক্ত

বুদ্ধি ও নীতির কিঞ্চিন্মাত্রও বিকাশ না হওয়ায় প্রথমতঃ আর্য্যসমাজ-তন্ত্রের ভিতর স্থান প্রাপ্ত হন নাই। এই জাতিভেদ প্রথা কোন সমাজ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নহে—প্রত্যেক সমাজেই এই চারিটি কর্ত্তব্য ও তদনুযায়ী চারিটি বর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু অপরাপর সমাজে এই অনুষ্ঠানগুলি ভোগাধিকারের প্রেরণা হইতে সম্পাদিত হয় আর ভারতীয় সমাজে এই-গুলি স্বধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সম্পাদিত হইত। অপরাপর সমাজে ভোগাধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলহ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে—যেমন প্রাচীন রোমে পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের বিবাদ, মধ্যযুগে পোপের অবাধ ধর্ম্মাধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নব্য ইউরোপে ধনজীবী ও শ্রমজীবীর (Capitalists and Labourers) কলহ জনিত সামাজিক বিপ্লব। আর্য্যঋষিগণ এক অভিনব উপায়ে চারিটি বর্ণের ভিতর স্বাধিকার প্রমত্ততার পরিবর্ত্তে বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিয়া সকল প্রকার সামাজিক ভোগাধিকার লইয়া বিবাদ ও অন্তর্দাহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বর্ণভেদের পশ্চাতে বৈরাগ্য ও ত্যাগমূলক আশ্রম ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না দিলে আর্য্য সমাজতন্ত্র অৰ্দ্ধেক বুঝা হইবে। সমস্ত সমাজ যেমন চারিটি বর্ণে বিভক্ত ছিল, ব্যষ্টিজীবন তেমনি এক অভিনব নিয়মের ভিতর দিয়া—Under Psycho-Ethical discipline-সংগঠিত হইত। ব্যষ্টিজীবন চারিভাগে বিভক্ত ছিল—ব্রহ্মচর্য্য জীবন মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, কঠোর সংযম ও গুরুভক্তির ভিতর দিয়া গঠিত হইত;—গার্হস্থ্যে বিবাহ করিয়া সমাজসেবা ও বলিষ্ঠ পুত্রকে বর্ণাশ্রমানুযায়ী শিক্ষিত ও উপযুক্ত করিতে হইত; বানপ্রস্থে নির্জ্জনে ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস করিয়া শেষ অবস্থায় সাংসারিক যাবতীয় সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক আপনার ব্যষ্টিগত অস্তিত্ব অনন্ত সত্তায় ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইত। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন—

"It was this special disciplines of the Asrams which as long as they were faithfully persued by the so-called higher castes developed an ideal of spiritual democracy unknown to the rest of the world."

আমরা এইবার আর্য্যগণের সামাজিক বিস্তৃতির কথা আলোচনা করিব। যে প্রণালীতে তাঁহারা ধীরে ধীরে অনার্য্য জাতি সমূহকে সাধনায় ও সভ্যতায় উন্নত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—তাহা এক অভিনব ও বিস্ময়কর ব্যাপার। জগতের ইতিহাসে সামাজিক বিস্তৃতি দুই প্রকারে সাধিত হইয়াছে। কোন জাতি অবাধ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ও কোন জাতি রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন দ্বারা বিজাতীয়গণের উপর আপন আপন অধিকার স্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মোন্মত্ত আরবজাতি বলপ্রয়োগে পারশ্য দেশে অবাধভাবে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা বিজিত জাতির স্বভাব প্রসূত অন্তঃপ্রেরণা ও ধর্ম্মভাবকে বিনষ্ট করিয়া যে অবৈজ্ঞানিক সমীকরণ (Equation) সম্পাদন করিয়াছিলেন—তাহাতে পারশ্য জাতির বৈচিত্র্যময় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন দ্বারা প্রাচীন রোমীয়গণ বিজিত দেশ সমূহে বলপ্রয়োগে আপনাদের শিক্ষা ও সভ্যতার অবাধ প্রচলন করিয়া বিজিত জাতি সমূহের আনুশীলনিক আত্মহত্যা (Cultural Suicide) সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং আধুনিক যুগে স্পেনদেশীয়গণ কর্ত্তৃক স্বার্থাধিকারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, পেরু মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসের সহিত আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ চিরকালের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু আর্য্যগণ ভাবাবেগ ও আধ্যাত্মিকতার এক বিচিত্র প্রণালী দ্বারা (by a strange process of idealisation and spiritualisation) আর্য্যভাবাপন্ন করিতেন। তাঁহাদের প্রণালী সর্ব্বতো ভাবে গঠনমূলক ছিল। অনার্য্য সামাজিক বর্ণভেদের উপর আপনাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ছাপ দিয়া সমগ্র বিজাতীয় সমাজকে আর্য্য নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়া চালিত করিয়া বিভিন্ন রীতিনীতি থাকা সত্ত্বেও চিন্তাপ্রণালীর ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন এবং কোন প্রকার বহিঃবিপ্লব ব্যতীত সমগ্র অনার্য্য সমাজ আর্য্যসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া উন্নত হইয়া উঠিত। এই ভাবে আর্য্যভাবাপন্ন করিতে গিয়া আর্য্যগণ যেমন অনার্য্য জাতির ভিতর আপনাদের মহান্ সাধনা প্রবিষ্ট করিয়া দিতেন সেইরূপ অনেক অনার্য্য রীতিনীতি ও

দেবতাকেও আপনাদের ছাঁচে গঠিত করিয়া আর্য্যসমাজে স্থানদান করিতে বাধ্য হইতেন।

ঋগ্বেদে বশিষ্ঠদেবের সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে। এইরূপ স্থানে স্থানে উল্লিখিত অর্ণবোপোত সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দ্বারা মিশর, আসিরীয়া, বাবিলন, আরব, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সহিত বৈদিক ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের অকাট্য প্রমাণ বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় "History of Indian Ship-building and Maritime activity" তে লিখিয়াছেন—"India thus began her sea borne trade with the very begining of recorded time and the trade of the Rigveda was very probably carried on with countries on the west like Chaldea Babylon and Egypt" প্রসিদ্ধ আসিরীয়, তত্ত্বজ্ঞ Dr. Sayce সংবক্ত বাবিলন রাজ্যের রাজা "Urbugus" এর রাজধানী 'Ur' নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখণ্ড ভারতীয় "Teak" (সেগুন) বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাবিলনের বাণিজ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। তিনি বলেন—প্রাচীন বাবিলনে মস্‌লিন অর্থে সিন্ধু শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। ডাক্তার Hewett এর মতে এই প্রকারের সেগুন কাঠ মালাবার উপকূল হইতে নীত, হইত। মিশর তত্ত্বজ্ঞগণ প্রমাণ করিয়াছেন ভারতবাসী মিশরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, মূল্যবান প্রস্তর, চন্দন কাষ্ঠ ও বানর ভারতবর্ষ হইতে মিশরে রপ্তানী করা হইত। Heeren, Lassen প্রভৃতি পণ্ডিত প্রমাণ করেন—জগত ইতিহাসের শৈশব হইতে আরবদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ডাক্তার Caldwell বলেন—"It appears certain from notices contained in the Vedas that the Aryan of the age of Solomon practised Foreign trade in ocean going vessels."

প্রাচীন জগৎ সভ্যতায় ভারতবর্ষের দান পণ্ডিত মণ্ডলীকে যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিতেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণই যে মিশরে

উপনিবেশ স্থাপন করিয়া মিশরীয় সভ্যতার পত্তন করিয়াছিলেন পোকক্, কর্ণেল অল্‌কট প্রভৃতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এম্, ব্লুমেনবাক্ মিশর-বাসীর মাথার খুলির সহিত বাঙ্গালীর খুলির সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণই নীলনদের নামকরণ করিয়াছিলেন। "According to Lenormant, the bas-relief of the temple of Deir-el-Bahari at Thebes represent the conquest of the land of Pun by Hatasu." উহা নিঃসন্দেহ ভারতবাসীর মিশর অভিযানেরই কথা। বাবিলন ও আসিরীয়ায়ও যে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল তাহারও অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক জ্যারন্‌স্‌জারণা বলেন "কালডীয়, বাবিলনীয় ও কোল্‌চিস্‌গণ ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" কালডীয় 'কুলদেবতা' শব্দের অপভ্রংশ। আসিরীয়া রাজ্যের রাজগণের নামের সহিত ভারতীয় নামের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান টাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই প্রাচীন বাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা, ও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশে পারস্যের সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল। মিষ্টার পোকক্ বলেন—"The Parasoos, the people of Parasoo Ram, those worriors of Axe, have penetrated into and given a name to Persia they are the people of Bharat : and to the principal stream that pours its waters into the Persian Gulf they have given the name of Eu-Bharat-es (Euphrat-es), the Bharat Chief" চীনদেশেরও সভ্যতা বহু প্রাচীন। মনুসংহিতা ও মহাভারতে চীনদেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ চীনদেশীয় সূর্য্যোপাসনা, ভাষা ও রাশিচক্র প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের সাদৃশ দেখিয়া ভারতবর্ষকেই চীন সভ্যতার আদিভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রাজস্থানে টডসাহেব লিখিয়াছেন—"The genealogists of China and Tartary declare themselves to be the decendants of Awar (আয়ুর) Son of the Hindu King Purur Dawa." এতদ্ব্যতীত প্রাচীন জগত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিকট কত ঋণী এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত জ্যারণ্‌স্-

জারণা বলেন—"It is there (India) we must seek not only for the cradle of Brahmin relgion, but for the cradle of the high Civilisation of the Hindus which gradually extended itself in the west to Ethiopia, to Egypt, to Phoenicia ; in the east to Siam to China and to Japan, in the South to Ceylon to Java; to Sumatra ; in the north Parsia, to Chaldea and to Cholchis, whence it came to Greece and to Rome and at length to the remote abode of the Hyperboreans. "

ঝড়ের তরী

(ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য)

ওগো আমার নায়ের মাঝি
ওগো পারের মাঝি
এই বাদলে ডাকছি তোমায়
কোথায় তুমি আজি ।
মেঘের পরে মেঘ করেছে
বইছে প্রবল বায়
ভাবের গাঙে ঢেউ উঠেছে
লাগ্‌ছে তরীর গায় ।
আকাশ মাঝে ঐ যে বাজে
গভীর ঘটার রব
চমক লাগে গমক শুনে
হই যে নীরব শব ।
আর না হেরি কোথায় কাকে
শুধুই আঁধার ময়
এবার বুঝি ডুব্‌লো তরী
সদাই আমার ভয় ।
তাইত তোমায় ডাক্‌ছি ওগো
কোথায় তরীর মাঝি
নেওগো বেয়ে অপর পারে
হাল ছেড়েছি আজি ।

মনুষ্যত্বের সাধনা

অকারণ-পুলক।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)।

কেন এ আনন্দ কিসের আনন্দ কে জানে? বৃন্দাবনে যখন প্রথম বংশীধ্বনী হইয়াছিল ব্রজকুমারীগণ উৎকর্ণা হরিণীর ন্যায় বংশীধ্বনি শুনিয়া নানা জনে নানা ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। কিসের ধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে কিছুই জানেন না তথাপি অকারণ-পুলকে তাঁহাদের প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরাধিকা যখন রতন-মন্দির, গুরু-গঞ্জনা, লোকাপবাদের ভয় ও দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, সকলই ত্যাগ করিয়া দ্বিপ্রহরা ঘোরা বর্ষা রজনীতে গহন কাননে বংশীরবের উদ্দেশে ছুটিয়াছিলেন তখন এই অকারণ-পুলক তাঁহার পথের সঙ্গী হইয়াছিল। এই অকারণ পুলকের স্পর্শমণি যখন চিত্তকে স্পর্শ করে তখন কোন দুঃখই আর ভয়াবহ হয় না কোন সুখই আর স্পৃহনীয় হয় না।

> যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
> যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥

এই অকারণ-পুলক ত্যাগের কষ্টি পাথর। জগতে শত শত ত্যাগের সুবর্ণ এই কষ্টি পাথরের নিকষে মেকি বলিয়া ধরা পড়ে। যখন দারুণ কর্ত্তব্য ভারে পীড়িত মানব শ্রান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলে 'এত যে করিলাম কি তাহার ফল হইল?' তখনই ধরা পড়ে মহৎ কর্ত্তব্য প্রেমের মধ্যে তাহার আত্মপ্রেমও কিছু সংগুপ্ত ছিল; কর্ত্তব্য সেবায় অকারণ-পুলকে যাঁহার প্রাণ ভরপুর, ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিবার তাঁহার অবসর কোথায়, অন্যের কাছে যতই কেন শ্রদ্ধা লাভ হোক না কেন যতক্ষণ না নিজে শ্রদ্ধা লাভ করা যায় ততক্ষণ অকারণ-পুলকের সন্ধান মিলে না সেই জন্য দেখা যায়, কেহবা বহুজনের সম্মানেও আনন্দিত নহেন আর কেহ বা অসম্মানেও পরম

আনন্দে থাকেন। লোকহিতাকাঙ্ক্ষী যখন 'লোকে কিছু বুঝিল না' বলিয়া ক্ষোভ করেন, তখনই বুঝা যায় তাঁহার পরার্থে কৃত মঙ্গল কর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা কামনার যে সামান্য ছায়া ছিল ক্ষোভ তাহা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আবার যখন 'আমি ক্ষুদ্র এ সম্মান কি আমার শোভা পায়?' এই সঙ্কোচের ভাব দেখা যায় সেই সঙ্কোচই আত্ম সঞ্চয়ের পরিচয় দেয়। বিনয় বচন বিনয়ীর ভূষণ হইতে পারে, কিন্তু সেই অকারণ-পুলকের তরঙ্গ ইহাতে নাই—যে তরঙ্গে সম্মান দাতা ও গৃহীতা একই হইয়া সরল শিশুর মত হাসিমুখে এক আনন্দই উপভোগ করেন। কর্ম্মের দুর্গম পথে নানা বিতর্কে তখনই চিত্ত বিক্ষেপ ঘটে, যখন এই অকারণ-পুলক পথের সঙ্গী হয় না।

যদি তোর আপন হতে অকারণে,
দিবারাত সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে তুই তর্ক করে কথায় কথায়,
করবি রে নানা থানা।
ষোল আনা আদায়।

বুঝা গেল, ত্যাগে এতটুকু খাদ ও অকারণ-পুলকের নিকষে গ্রাহ্য হয় না। বংশীধ্বনী মধুর, এটী চিরদিনের বিখ্যাত কথা। কিন্তু বংশীধ্বনী যে কেবল মধুর তাহা নয়, বজ্রাঘাত তুল্যও বটে।

"আমার ধৈর্য্য হেমশালাগার,
গুরু গৌরব সিংহদ্বার,
ধরম কপাট ছিল তায়,
বংশীরব বজ্রাঘাত
পড়ে গেল অকস্মাৎ
সমভূমি করিল তাহায়।"

শ্রীরাধিকা বলিতেছেন "সখি, আমার ধৈর্য্য রূপ হেম অট্টালিকা, কুল-গৌরব ও গুরুজনের ভয় তাহার সিংহ দ্বার। লোক কর্ম্ম তাহার কপাট ছিল। কিন্তু বংশীরববজ্রাঘাতে সে সমস্ত চূর্ণ হইয়া একেবারে সমভূমি হইয়া গেল। বজ্রাঘাতের মত বংশীধ্বনী কখন যে কাহার বুদ্ধি

ও পাণ্ডিত্যের অভিমান, কুল গৌরব এবং লোক ধর্ম্মের প্রবল বাধা চূর্ণ করিয়া ফেলে কে তাহা বলিতে পারে? সে বজ্রাঘাত এমন সমভূমি করিয়া দেয় যে এতটুকু ইষ্টক স্তূপও তাহাতে মাথা উচু করিয়া থাকিতে পায় না। শ্রীমদ্ভাবতে আছে, ব্রজকুমারীগণ কৃষ্ণকামনায় কাত্যায়নী অর্চ্চনার পর স্নানার্থে যমুনায় অবগাহন করিলে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাঁহাদের লৌকিক লজ্জার শেষ বন্ধন স্বরূপ বসনগুলিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশু যেমন সর্ব্বরিক্ত হইয়া জননীর ক্রোড়ে আসে সেইরূপ সর্ব্বরিক্ত না হইলে আনন্দরূপা জননী তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণ করেন না। এমন সর্ব্বরিক্ত হইতে হইবে, যে বৈষ্ণব শাস্ত্রকর্ত্তা রূপগোস্বামী বলিয়াছেন "স্বানন্দ স্বখানুভূতি" যদি "কৃষ্ণ সেবার" বিঘ্ন হয়, ভাবের সে বিলাসিতাটুকু বর্জ্জন করিতে হইবে।

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম।

সেই জন্য কর্ম্মের বাহিরের বিচারের বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয় যে কোনটী কর্ম্ম কোনটী বা অকর্ম্ম, কোনটী ত্যাজ্য কোনটী গ্রাহ্য, কোন কর্ম্ম বন্ধন ছেদনের অস্ত্র কোনটী বা নূতন বন্ধন! জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী মনের নিকষে কেবল ইহার পরীক্ষা—আর কোন বিচারকই তাহার বিচার করিতে পারেন না। কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিচার সম্বন্ধে গীতা এক কথায় বলেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র লোকেঽয়ং কর্ম্মবন্ধন।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঠিক এই কথাটীই আর একভাবে লেখা হইয়াছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য আত্মসুখেচ্ছা কেবল,
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য ধরে প্রেমমহাবল।

"যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধন স্বরূপ। অতএব হে কৌন্তেয় স্বার্থ কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল যজ্ঞার্থেই কর্ম্ম আচরণ কর।"

অন্যত্র ভগবদুক্তিতে—

"মদর্থমপি কর্ম্মানি কুর্ব্বণ সিদ্ধিমবাপ্সসি।"

কিম্বা—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা।"

"আমার জন্য কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই কর্ম্মের সার্থকতা লাভ করিবে।"

"ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মে সমর্পনের জন্য কর্ম্ম করেন পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না সেইরূপ কর্ম্মজনিত কোন দোষই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

এই সকল উক্তি একত্র মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে "যজ্ঞার্থে" "কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য" "মদর্থে" বা "ব্রাহ্মণ্যাধ্যায়" সবই যে এক, তাহা বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। যজ্ঞ ব্যাপারটী কি? না আহুতি দেওয়া। মানব যখন বিন্দুমাত্র আত্মসঞ্চয় না রাখিয়া কেবল কোন এক মহান্ ভাবের প্রেরণায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে যজ্ঞের জন্য কর্ম্মাচরণ করে। তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম যাঁহা স্বার্থ মূলক, যাহা ফলের আশায় ক্ষণিক উত্তেজিত আবার নিরাশায় ম্রিয়মান অবসাদগ্রস্ত করে—যাহা কৃপণের ধন গণনার ন্যায় নিয়ত লাভের অঙ্কগণনার মাদকতায় মানবচিত্ত বিমোহিত এবং ক্ষতি পূরণের নব আশায় এমন ভাবে জড়িত করে যে চেষ্টা করিয়াও তাহা হইতে মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য হয়,—সেইরূপ কর্ম্মই বন্ধন স্বরূপ।

"কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য ধরে প্রেমমহাবল।"

আপনার ভারে পীড়িত কাম দুর্ব্বল, কিন্তু কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য ধারণের স্পর্দ্ধা যাহার সে প্রেমমহাবল। মনস্তত্ত্ববিদ বলেন মনের এমন গূঢ় অংশ আছে, যাহা বুদ্ধির আলোকে সকল সময় প্রকাশ পায় না, আমাদের নিজের ভাব নিজের ইচ্ছা নিজের নিকট প্রচ্ছন্ন অজ্ঞাত থাকে। স্বপ্ন

অনেক সময় সেই মনের আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে। এই জন্য স্বপ্নের অর্থ সহজবোধ্য নয়, যেন রহস্যময় প্রহেলিকার মত। সেইরূপ কবিতা যেন সমগ্র জাতির স্বপ্ন, তাই কবিতা ও অনেক সময় রহস্যময় প্রহেলিকা। কবি সাধারণ জীবনে ব্যক্তি মাত্র হইলেও যখন তিনি কবি তখন সমগ্রের প্রকাশ স্বরূপ। একের অঙ্গুলী আঘাতে যখন বহু হৃদয় ঐক্য তানে বাজিয়া উঠে, বীণা বাদক তখনই "কবি" আখ্যা লাভ করেন। কবি,—কবি, ইহাই মাত্র তাঁহার পরিচয়। তাঁহার কাব্য জগতের সম্পত্তি,—ব্যক্তির ভাবে সে সম্পত্তির কেহই অধিকারী নহে। বহুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব বোধ ডুবাইয়া সমগ্রের সহিত এক হইয়া তিনি যখন কবির স্বরূপ প্রাপ্ত হন তখন তো তিনি উপাধি পরিচয়ে চিহ্নিত ব্যক্তিমাত্র থাকেন না! "সোনার তরী" কবিতার স্বপ্ন প্রহেলিকার মধ্যে এই ভাবই আমাদের মনে আসিয়া লাগে। "রাশি রাশি ভারা ভারা" কর্ম্ম রাশির সোনার তরীতে স্থান হয় কিন্তু একটী মাত্র ব্যক্তির তাহাতে স্থান হয় না। দ্রৌপদীর অন্নস্থালী জগতের সমস্ত প্রাণীর ক্ষুধা শান্তি করিতে পারে কিন্তু তিনি নিজে আহার করিলেই সে স্থালী শূন্য হইয়া যায়।

কোন্‌টী কর্ম্ম কোনটী অকর্ম্ম সে সম্বন্ধে সকলেরই কতকগুলি সাধারণ ধারণা আছে। কিন্তু গীতায় ভগবদ্ভক্তিতে সে ভাবে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিচারিত হয় নাই। গীতা বলেন—"এই কর্ম্ম যোগের কোন বিশেষ ক্ষেত্র নাই।

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত।"

সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

"যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না সেইরূপ ব্যক্তিত্ব বোধ জনিত ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মে সমর্পনের জন্য কর্ম্ম করেন, কর্ম্ম জনিত কোন দোষই তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

যাঁহার ব্যক্তিত্ব বোধ জনিত অহংজ্ঞান নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি

স্বার্থাশ্রিত লাভালাভ বোধে কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তিনি এই সকল লোককে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তজ্জনিত ফলে নিবদ্ধ হন না।

ত্যাজ্যং দোষ বদিত্যেক কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মণীষিনঃ।
যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।

কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্মে দোষ ঘটিবে বলিয়া তাহা ত্যাগ করিতে বলেন কিন্তু অপর মনীষিগণ যজ্ঞ দান ও তপস্যা রূপ কর্ম্ম অত্যাজ্য বলেন।

"যজ্ঞ দান ও তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞ দান তপশ্চৈব পাবননি মনীষিণাম।

যজ্ঞ দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে।—অবশ্য কর্ত্তব্য কেননা যজ্ঞে দান তপস্যাই মনীষিগণের চিত্ত পবিত্র করে।

যজ্ঞের অর্থ আত্মোৎসর্গ দান—কর্ম্মবর্জ্জিত জীবনসম্বল প্রতিদান কামনা না রাখিয়া দান, তপস্যা কৃচ্ছ সাধন।

"লা মিজারেবলে" ভিক্টর হুগো আত্মোৎসর্গের একটী চিত্র দিয়াছেন। ভগিনী সিম্‌প্লিস্ শৈশবে কুমারী ব্রত গ্রহণ করিয়া পরসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কথোপকথন, রোগীকে শোকীকে সন্তনা দান বা ভগবৎ-গুণকীর্ত্তন, তাঁহার বিচরণ ধর্ম্মমন্দিরে অথবা রোগী কি সন্তপ্তের গৃহে তাঁহার হস্ত দুইখানি স্বার্থের কামনা সংশ্লিষ্ট কোন কর্ম্মেই কথনও দূষিত হয় নাই, জীবনে তাঁহার জিহ্বায় কথনও কোন অসত্য বচন উচ্চারিত হয় নাই। জিন ভ্যালজিন্ পুলিসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থে যে গৃহে লুক্কায়িত হইয়াছেন ভগিনী সিমপ্লিস তথায় কোন হতভাগিনীর শবশয্যার পার্শ্বে উপাসনারত। ইন্‌স্পেক্টর জ্যাভার্ট পশুপ্রকৃতি হইয়াও সম্ভ্রমবশতঃ সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না, দুয়ার হইতে জিজ্ঞাসা করিল—

"ভগিনী, ওখানে কি আপনি একা আছেন?"

ভগিনি উত্তর দিলেন "হাঁ।"

"আর কাহাকেও দেখিয়াছেন?" "না"

ভিক্টর হুগো বলিতেছেন, "ইন্‌স্পেক্টর জ্যাভার্ট যদি সম্মুখেও জিন ভ্যালজিনকে দণ্ডায়মান দেখিত, তাহা হইলেও সে তাঁহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইত, কেননা ভগিনী সিম্‌প্লিস্ কখনও মিথ্যাকথা বলেন না।"

পরে ভিক্টর হুগো আবার বলিতেছেন "হে ভগিনী, আজ তুমি স্বর্গে তোমার সঙ্গিনী কুমারীগণের সহিত ভগবানের স্তুতিগানে আনন্দমগ্ন রহিয়াছ, এবং সেখানে তোমার চিরজীবনের ব্রতভঙ্গস্বরূপ ঐ দুইটী মিথ্যা কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।"

ভগিনী সিম্‌প্লিসের আত্মোৎসর্গের প্রসঙ্গে আরও বহু প্রসঙ্গ মনে আসে। এখানে ধাত্রী পান্নার কথাটাই কেবল উল্লেখ করিব। উদয়-পুরের রাণার জীবনরক্ষয়িত্রী ধাত্রী পান্নার কাহিনী কে না জানেন? রাজ্যলোলুপ বনবীর শিশু উদয়সিংহের প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে পান্না রাজবংশধরের রক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া হত্যাকারীর নিকট রাজপুত্রের সমবয়স্ক নিজ পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়াছিল। এমন কে জননী আছেন, যিনি এই ঘটনা স্মরণ করিয়া সিহরিয়া না উঠিবেন। ভগবান্ যে শিশুরভার বিশেষ করিয়া জননীর উপরেই অর্পণ করিয়াছেন, সেই অনন্যগতি একান্ত মাতৃনির্ভর পরায়ণ শিশুকে জননী যদি নিজহাতে হত্যাকারীর হস্তে তুলিয়া দেন, সে জননীকে, জগৎ রাক্ষসী ভিন্ন আর কি আখ্যা দিতে পারে? যে আত্মোৎসর্গ জগতের এবং নিজের মাতৃহৃদয়ের নিকট এই রাক্ষসী আখ্যা গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, সে যজ্ঞ, সে দান ও সেরূপ তপস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করাও সুকঠিন।

তুমি ও আমি।

(আনন্দ চৈতন্য)

তুমি,—অনন্ত মহিমা-পূর্ণ অনন্ত সাগর,
আমি,—বাসনা শৈবাল-পূর্ণ ক্ষুদ্র সরোবর;
তুমি,—গুণাতীত নিরঞ্জন ব্যক্ত চরাচর;
আমি,—রিপুতপ্ত সাস্ত সদা দেহের ভিতর

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

ধর্ম্ম।

(২)

(শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত বি, এ,)

তাই ব'লে 'সখের ধর্ম্মে'র দায়িত্ব-জ্ঞান নেই, এমনটা কেউ মনে করো না। বরঞ্চ এমন টনটনে দায়িত্ব-জ্ঞানের নাড়ী তুমি আর কোথাও বড় একটা দেখ্‌তেই পাবে না। দেশের ছেলে হয়েও যদি তুমি নেহাৎই এর প্রমাণ চাও, তবে হাতে-কলমে আর ক'টা তোমায় দেবো? ব্রত-পার্ব্বণ বা পূজোর দিনে দু'মিনিট করে খান কয়েক বাড়ী একটু চোখ মেলে ঘুরে এলেই তুমি সব বুঝ্‌তে পারবে। দেখ্‌তে পাবে,—একদিকে যেমন অঘ্রাণ মাসের রবিবারে নাটাই ব্রতে একুশটির জায়গায় কচুরপাতা বিশটি এনেছে বলে, বাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী বয়স্ক ছেলে বা মেয়েকে ঠেঙ্গিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর বাহির কচ্ছেন, অপরদিকে তেম্নি আবার শ্যামামার পূজোর জন্যে বাড়ীর ছোট বড় সকলের, মায় আত্মীয়-কুটুম্বের সংখ্যা গুণে গুণে, দুর্দ্দিনে ধার করেও বেছে বেছে জোয়ান তিনটি কাল পাঁঠা আনা হয়েছে। তবে 'মধু অভাবে 'গুড়ং দদ্যাৎ'-বিধি না আছে এমন নয়। কিন্তু মধুই হোক্, আর গুড়ই হোক্, পণ্ডিত ঠাকুর বা পুরুত ঠাকুর পূজোর যে ফর্দ্দ দাখিল করেছেন, তার অবমাননা করবে, এত বড় দশ কণ্ঠ কি ভূ-ভারতে কেউ আছে? ঐ যে বগলে দেখ্‌ছো তাল-পাতায় গোল করে লেখা, ওরই নাম শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তবে দেওয়া হয়েছে এই ফর্দ্দ। কেবল কি এই? ঐ ফর্দ্দের তালিকা দেওয়া দ্রব্য-সম্ভারকে অবলম্বন করেই যে পূজোর দেবতা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নিয়ে আবির্ভূত হবেন। সুতরাং এর কি আর ব্যতিক্রম হবার যো' আছে? এদিক্ ওদিক্ করেছ কি সবংশে নির্ব্বংশ হয়েছ!! আর যদি হুঁসিয়ার হয়ে ঠিক ঠিক ফর্দ্দ মেনে চল, তবে কোন ভয় নেই। মরে বার আনার খাটিয়ার শুয়ে শ্মশানে পৌছ্‌বার আগেই

চোঁচা স্বর্গে গিয়ে উঠবে। যা' হোক্, এইটুকু বিধিবাদ মেনে জিনিষ পত্র সব পূজোর ঘরে বা চণ্ডীমণ্ডপে পৌঁছিয়ে দিলেই বাড়ীর কর্ত্তা খালাস। অনেকের ত সেখানে ঢুক্‌বারই অধিকার নেই। কারণ কিছুকাল পরেই যে সেখানে জগৎ-পিতা বা জগন্মাতার আবির্ভাব হবে! যাদের অধিকার আছে, অর্থাৎ যাদের ঐ শাস্ত্র পূজোর ঘরে ঢুকতে নিষেধ করেন নি, তাঁরাও জিনিষ-পত্রের বিলি-ব্যবস্থা কত্তে ও ঘরে যত না ঢুকেন ততই মঙ্গল! তখন কর্ত্তৃপক্ষও সেদিকে আর ততটা তাকাতেও পারেন না। একে ত দায়িত্বের লেঠা চুকে গেলে সেদিকে ফিরে মনটা দেওয়াই মুস্কিল; তাতে আবার সময়েরও যে অভাব পড়ে যায়। এতকাল ধর,—মাকে কি বচ্ছর তিন দিন ধরে বাইজীর গান শুনিয়েছি, এখন দিন কাল বদ্‌লে গেলে কি হয়, একদিন ত অন্ততঃ ঐ রকম গান শোনান চাই? নৈলে বাড়ীর ছোকরাদেরও মন ভেঙ্গে যাবে, দেশের লোকের কাছেও ছোট বনে যেতে হবে। পিতৃ-পুরুষের নাম রক্ষাও ত চাই?—আর পূজো?—সে ত ঠাকুর ঘরেই হচ্ছে, যথাসময়ে সক্তের কৌটা পরে আশীর্ব্বাদ নিলেই হবে!!!

তুমি সর্ব্বত্রই এই একই হাল দেখ্‌বে, এমন বল্‌তে পারিনে। বাইজীর গান, যাত্রাগান বা কবিগান ছাড়া, ঈশ্বর বা ঈশ্বরী কীর্ত্তন-গানও ভালবাসেন। তিলককেটে, নামাবলী গায়ে, জপের মালা হাতে ভক্তবৃন্দ দেব বা দেবীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুন্‌তে বসেন। ভক্তি দেখে চম্‌কে উঠনা ভায়া! ঐ পাশের বাড়ীর কাঙ্গালী ধোপা কি বলে শোন। "পূজো বাড়ীর কর্ত্তা নাকি ভারি কৃপণ। তবে আনন্দের দিনে বাড়ীটা একেবারে নীরব থাক্‌বে, লোকেও সাত কথা নিয়ে কাণাকানি কর্‌বে, তাই একটা ব্যবস্থা করেছেন। মা ত বৈষ্ণবী। হরিনামই ভালবাসেন। বাড়ীর ছোক্‌রা বাবুরা এ সব পছন্দ করেন না। তা'রা অন্যপাড়ায় থিয়েটার দেখ্‌তে গেছেন!"

তবেই হ'ল, ধর্ম্ম এলেন আচারে। এই আচারকে আবার খুব আঁক্‌ড়ে ধরে থাকার নাম হ'ল নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা। এটা যিনি যত দেখাতে পারেন, তাঁর তত ভক্তি, তিনি তত ভক্তিমান্। বেঁচে থাক্‌তে তুমি তাঁর

বুদ্ধিশুদ্ধির যত অপবাদই কর না কেন, মৃত্যুর পর তিনি যে একেবারে First grade promotion পেয়ে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুদেবের ডান্ পাশে seat পাবেন, এটা তুমি বিশ্বাস না কল্লেও তিনি খুব ভাল রকমই জানেন। তার কারণও আছে। এই ঈশ্বর বা বিষ্ণুদেবকে, ভক্তি কর্ত্তে গিয়ে তাঁর জন্যে তিনি না করেছেন কি? সমাজ ঘর, মন্দির বা সপ্তাহান্তে রবিবারে হরি-সভা,—এতে অবকাশ মত তিনি যোগদান করেছেন। উৎসবের চাঁদার খাতা খুলে দেখ, তাঁর নাম পাবে। তারপর শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে তিনি বিলাত-ফেরতের সঙ্গে কখনো মেলামেশা করেন নি। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল,—এরা চিরদিনের অপবিত্র জাতি কখনো এদের তিনি স্পর্শ করেন নি। ষষ্ঠী পূজো হ'তে আরম্ভ করে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ ব্যবস্থা তিনি যথাশাস্ত্র পালন করেছেন। এখন তুমি বুঝে বল দেখি কি ক'রে তিনি বৈকুণ্ঠে স্থান পাবার অধিকারী নন্? ঈশ্বর সব দেখ্‌তে পান, আর এত বড় মোটা কাজগুলি তাঁর চোখে পড়বে না? তোমরা বল কি?

এই আচারে ধর্ম্ম কি করে দেশে ঢুকেছে, কবেই বা ঢুকেছে, সে বিচার বা ইতিহাসের আলোচনা এখানে কর্‌ব না। যখন যে ভাবেই ঢুকে থাকুক্, দেশে ধর্ম্ম কিন্তু সাধারণের মধ্যে এই আচার নিয়েই চল্‌ছে। ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ কেও কখনো কর্‌তে পারে না সত্য; কিন্তু ধর্ম্মই যে দেশের সকল বিষয়ের, সকল কার্য্যের, সকল চেষ্টার, সকল সফলতার একমাত্র প্রাণ, তার পথে ভুল করে চল্লে বা তার খেই হারিয়ে ফেল্লে, কেবল যে দেশটা ধর্ম্মশূন্য, সুতরাং প্রাণহীন হয়ে পড়্‌বে, এমন নয়; সঙ্গে সঙ্গে ইহকালেরও সকল উন্নতির আশা একেবারে চূর্‌মার্ হয়ে যাবে। একি চোখের উপর দেখা যাচ্ছেনা? দেশে ধর্ম্ম বা নীতি সম্বন্ধে প্রতিমাসে যত বক্তৃতা, যত লেখা-লেখি হচ্ছে, সেগুলি একত্র কল্লে বুঝি বা ধর্ম্ম-স্বরূপ স্বয়ং ভগবানও অবাক্ হয়ে যাবেন। অথচ এই দেশটার যে দিকেই তাকাও দেখ্‌বে, ধর্ম্ম যিনি, তিনি ঘুপ্‌টি মেরে পড়ে রয়েছেন; আর বাইরে ঢাক, ঢোল চেঁচামেচি, যত সব বিকারের রোগীর হাত, পা-খিঁচুনি। দেখে দেখে, শুনে শুনে, স্বতঃই বল্‌তে ইচ্ছা

হয়, ধর্ম্ম ধর্ম্মতেই লুকিয়ে আছেন; দেশের সর্ব্বঘটে তাঁর পূজোর আয়োজন হয় নি। আর যতদিন এটি না হবে, ততদিন ধর্ম্মের কি কথা, কোন বিষয়েই এদেশের আশা নেই। সবাই পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির হবেন, এমন আশা করা যায় না সত্য; কিন্তু ধর্ম্ম বা সত্যের পথকেই আদর্শ রেখে, তারই পথে ঠিক্ ঠিক্ভাবে চলবার একটা সাধারণ ঝোঁকই কি আমাদের দেশে সর্ব্ববিধ জাগরণের একমাত্র উপায় নয়?

বাংলাদেশের যুবকবৃন্দের উপর দেশের অনেক কল্যাণ নির্ভর করে। স্বামীজি একথা নানাস্থানে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। ঠাকুরের ভাবও ধীরে ধীরে তাঁদের ভিতর প্রকাশ পাচ্ছে, এত বেশ স্পষ্টই দেখ্তে পাওয়া যায়। সুতরাং এখন যদি তাঁদের অবস্থা আলোচনা কর্তে অগ্রসর হই, তবে বোধহয় সেটা অসঙ্গত হবে না। আর আমার বিশ্বাস আছে, যদি যথার্থ কথা বলতে গিয়ে বাধ্য হয়ে আমাকে দু'একটী তীব্র কটাক্ষ কর্তে হয়, তবে তার জন্যে তাঁরা ক্ষুণ্ন করে চটে উঠ্বেন না। আমি অন্তরের সঙ্গে তাঁদের কার্য্যকারিতা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বলেই তাঁদের কথা তাঁদের কাছে বল্তে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। সত্য বটে, দোষ দেখিয়ে, কঠোরতা দ্বারা কা'কেও পথে আনা যায় না; কিন্তু Addision এর to correct by indulgenceই ভাল? দেশে যাঁরা আদর্শ যুবক, তাঁদের কাছে আমার কিছুই বল্বার নাই; বরং শিখ্বারই আছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কয়টি নিয়ে? কাজেই কথা আমাকে সাধারণ ভাবেই বল্তে হবে।

পুরাণে আছে, প্রহ্লাদ ভারি হরিভক্ত ছিল। বাপ হিরণ্যকশিপু একে গোঁয়ার, তাতে আবার হরির সঙ্গে করেছে ঝগ্ড়া। ছেলেকে ডেকে বল্লে,—"হুঁসিয়ার যা'কর তা'কর এসে যায় না। কিন্তু ও ব্যাটার চেলাগিরি কচ্ছ দেখ্লে, ছেলেই হও আর যেই হও বাপু, দরকার হলে জান্ নিয়ে তবে ছাড়্বো। 'এখন বুঝে চল।" প্রহ্লাদ ডরাবার ছেলে নয়। হরি বলেই চেঁচাতে লাগ্লো। ফলে এই হ'ল যে, উল্টে বাপের জান্টাই গেল!—তা' এ হ'ল পুরাণের প্রহ্লাদ। কেই বা দেখেছে। ব্যাখ্যা করে যা' একটু বুঝ্তে পার। যদি

সত্যিকার প্রহ্লাদ দেখ্‌বে, ত দেখ আমাদের বাংলা দেশে। শত শত ঘরে শত শত প্রহ্লাদ এসে হাজির হয়েছেন। তবে শত শত হিরণ্য-কশিপুও সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছেন কিনা, সে হিসাবটা জানা না থাক্‌লেও, একেবারেই যে ফির্‌ছেন না, তা' কিন্তু হলপ্‌ করে বলা যায় না। ফলও হচ্ছে তেম্নি। নৃসিংহদেবের নখাঘাতে শতধা বিদীর্ণ না হলেও এতাদৃশ বংশদুলাল প্রহ্লাদকুলের আকস্মিক অন্তর্ধানে (পলায়নে ?) বা বিবেক বৈরাগ্যের দাপটে যে অনেকে হিরণ্যকশিপু পিতাই শোকে, দুঃখে, ঋণদায়ে বা দুর্ভিক্ষের কবলে খুবই জর্জ্জরিত হচ্ছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই।

'হুজুগে' ধার্ম্মিকদের আবার রকমারি আছে। ঠাকুর বলেছেন, —"কাম-কাঞ্চন ত্যাগ"। ধার্ম্মিকেরা তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ফস্‌ করে ধরে ফেল্লেন,— "এ ত সোজা কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ? বে' কর্ত্তে হবে না।"

ঠাকুর আবার বল্‌ছেন,—"কলিতে নারদীয়া ভক্তি।—ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে, তা সে বাপই হোক্‌, আর যেই হোক্‌, তার কথা না শুন্‌লে পাপ হয় না। তার সাক্ষী প্রহ্লাদ, ভরত, বিভীষণ।" ধার্ম্মিকেরা মাথা নেড়ে বুঝ্‌লেন,—"এ ত আরো চমৎকার কথা। ধর্ম্মকার্য্যে বাধা ? কারও কথা শুন্‌বার দরকার নাই।" তবে স্বামিজী মাঝখানে এসে গোল বাধিয়েছেন। বল্‌ছেন, "ফেলেদে তোর ভুক্তি মুক্তি, ও ত মহাস্বার্থপরতা। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা। দেশ মহাতমঃতে ডুবে রয়েছে, একে টেনে তুল্‌তে হবে। মহাবীর্য্যবান্‌ হতে হবে। দরিদ্র নারায়ণদের সেবায় প্রাণ মন ঢেলে দিতে হবে।"—হরি, হরি বোল! এইবার সেরেছে। থম্‌কে যেও না ভায়া! পেছনে তাকিয়ে দেখ, প্রহ্লাদের দল শূন্য, সব পালিয়েছে !!

'হুজুগে' ধর্ম্মের আরও লক্ষণ আছে। যেই ধর্ম্ম এসে ঘাড়ে চাপ্‌লেন, ওম্নি দেখবে, ধার্ম্মিকেরা মাথায় তেল দেওয়া বন্ধ করছেন; খালি পা, জামা বা চাদর অদল-বদলে গায়ে বিরাজ কচ্ছে। দেশে যে দিন পড়েছে, তাতে শরীর ধারণের জন্যে যে খাদ্য নেহাৎ দরকার, পনর

আনা লোকের ভাগ্যে তাও জুটছে না। ধার্ম্মিকেরা আবার তারই থেকে কমিয়ে কমিয়ে শাক, পাতা-চচ্চড়ির ব্যবস্থা কচ্ছেন, আর ব্রহ্মচর্য্য পালন কচ্ছেন! ফলও ব্যবস্থা মতই হচ্ছে—কঙ্কালসার দেহ, কোটরাগত চক্ষু, বিষাদময়, উৎসাহশূন্য মুখ, ঢোক্‌গিলে কথা বলা। আবার মাঝে মাঝে যখন করুণস্বরে 'হা প্রভু' বলে আর্ত্তনাদ করে উঠেন, তখন হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই বলতে ইচ্ছা হয়,—"আহা, বেচারার কি ব্যামো হয়েছে গা? অমন কচ্চে কেন?"

এই হুজুগের আবার এম্নি আশ্চর্য্য শক্তি যে, যখন যে রংএ মেশাবে, তখন সেই রংএই মিশবে। এই হ'ল জ্ঞান, পরক্ষণেই ভক্তি তার পর আবার কর্ম্ম, না হয় হ'ল যোগ। কখন্ কখন্ একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানও উদয় হয়। গিরগিটীর তবু রং চেনা যায়, কিন্তু হুজুগের রং চেনবার যো'টি নেই। যখন যার পাল্লায় পড়েন, তখন তারই হয়ে যান।

ঠাকুরের একটি গৃহস্থভক্ত একদিন একটী যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"মানুষ যে কে, তা মানুষ জানে না। এ তুমি মানো কি না?" যুবকটি ভাল উত্তর দিতে পারেন নাই। তাই দেখে, ভক্তটি নিজেই বল্লেন,—"এই দেখ না, মানুষ বহুরূপী হয়ে বেড়াচ্ছে। মায়ের কাছে এক রকম, বাপের কাছে আর এক রকম, আত্মীয়দের কাছে এক রকম, আবার বন্ধুদের কাছে আর এক রকম। সারা দিন রাত্ কত রকমই না মানুষ হচ্ছে। এত যার রূপ, তার প্রকৃত রূপ কোন্‌টি? আর যদি প্রকৃত রূপটিই তার না জানে, তবে মানুষ কচ্ছে কি?" যুবকটি চুপ্ করে রইলেন। ভক্তটি বল্লেন,—"তবে উপায় কি? হাত, পা, নাক, মুখ—সব মানুষের একই রকম আছে; কিন্তু ভিতরের সত্তা পৃথক্। ঐ সত্তাভেদেই ভিন্ন প্রকৃতি হয়! ভারত কখনো ঋষিশূন্য হয় নি। ভাগ্যক্রমে, ব্যাকুলতার জোরে এইরূপ কোন ঋষির সাক্ষাৎ পেলে তিনি দর্শন মাত্র তোমার সত্তা বলে দিতে পারেন। তখন তোমার পথ ধরে তুমি চল্‌তে পার। নতুবা শুধু এটা ভাল, সেটা ভাল খুঁজে বেড়ালে কি হবে? ভাল ত কতই। তোমার পক্ষে কোন্‌টি ভাল, তা চাই না?"

হুজুগ ছেড়ে নিজকে চিনবার চেষ্টা করা কি প্রত্যেক বুদ্ধিমান যুবকের কর্ত্তব্য নয় ?

কথা ত হ'ল ঢের। এখন চাই কি ?—উৎসব, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, প্রসাদ বিতরণ—সব বন্ধ করে দিতে হবে ? মঠ, মন্দির, সমাজ-ঘর, হরি-সভা ভেঙ্গে ফেলতে হবে ? কুলগুরুদের ত্যাগ করতে হবে ? ব্রত, নিয়ম, প্রতিষ্ঠা, পূজা, যাগ-যজ্ঞ তুলে দিতে হবে ? আচার নিষ্ঠার কি কোন মূল্য বা প্রয়োজন নাই ? যুবকগণ কি ধর্ম্মাধিকার হতে বঞ্চিত ? —এক কথায় সাফ্ জবাব এই দিতে চাই যে, যিনিই দেশের ধর্ম্মের দিকটা বেশ করে তলিয়ে চিন্তা করেছেন, তিনিই বলতে বাধ্য হবেন যে, না এর একটিও নষ্ট করতে হবে না। এর সবই সুন্দর, সবই পবিত্র, সবই উদার, সবই সত্য অর্থাৎ ধর্ম্মময়। কেবল এই কেন, যদি সত্যের জন্যে, প্রেমের প্রেরণায় বলাৎ সর্ব্বান্তরাগে কোন মহাপুরুষ দেশের প্রচলিত মতবাদগুলির সঙ্গে আরও কতকগুলির কখনো প্রতিষ্ঠা করেন, তবে সেগুলিও সত্য, সেগুলিও গ্রাহ্য হ'বে। কারণ সত্য শুধু নিজেই সত্য নন, তিনি যাকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হন, তিনিও তেমি সত্য, তেমি ধর্ম্মময় হয়ে থাকেন। আরও কথা এই যে, সত্য যিনি তিনি চির-স্বাধীন, তিনি কি কোন নির্দ্দিষ্ট মত বা পথকে ধরে থাকতে পারেন ? বিচার কল্লে তোমাকে মানতেই হবে, হয় তিনি সকল মতবাদের অতীত, না হয় ত তিনি অনন্তরূপে অধিষ্ঠিত। ভেবে দেখ, এ দুই-ই এক। আর এক বলেই ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সত্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ক'রে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন,—"যত মত তত পথ"। তবে কিনা যদি কেও কাঁধে গামছা রেখে, বাড়ীময় গামছা খোঁজে, এবং হল্লা করে অনর্থ ঘটায়, তবে সেটা যেমন একদিকে হাসির বিষয় হয়ে পড়ে, তেমি আবার অনুতাপের বিষয়ও হয় বটে। তাই ত এত আলোচনা।

প্রত্যাবর্ত্তন।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)

রাজধানীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল—রাজকুমারকে পাওয়া যাইতেছে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাজকুমার সমুদ্রতীরবর্ত্তী উদ্যানে তমালকুঞ্জের বেদীতে বসিয়া ধ্যান করিতেন। অদ্য প্রাতঃকালেও প্রহরী তাঁহাকে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। অনেক বেলা পর্য্যন্ত তিনি যখন প্রাসাদে ফিরিলেন না তখন তাঁহার খোঁজ আরম্ভ হইল। বেদীর উপর তাঁহাকে পাওয়া গেল না। উদ্যান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, তিনি নাই। রাজধানীতে যে সকল পরিচিত বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে তাঁহার যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তিনি কোন বাড়ীতেই যান নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল তথাপি রাজকুমার ফিরিলেন না। রাজা প্রমাদ গণিলেন। রাণী মাথায় করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আচার্য্য যদুনন্দন এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি শৈশব হইতে পরম যত্নসহকারে রাজকুমারকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন। কুমারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর শ্রদ্ধা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আচার্য্য তাঁহার নিকট অনেক আশা করিতেন। কুমারের আকস্মিক তিরোধানে তিনি পুত্র শোকাহতের ন্যায় কাতর হইলেন।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রতিবেশীরা দেখিল আচার্য্যের দ্বারদেশে বাহির হইতে তালা বন্ধ রহিয়াছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন গেল, তথাপি আচার্য্যের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। লোকে ভাবিল, আচার্য্য বোধ হয় তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছেন।

আচার্য্য গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সংকল্প করিয়াছিলেন, যতদিন কুমারের উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না ততদিন তিনি গৃহে ফিরিবেন না। দুই বৎসর ধরিয়া তিনি কুমারের সন্ধানে নানা দেশ ঘুরিলেন,—কত নিবিড় অরণ্য ও বিজন মরুভূমি পার হইলেন, কত বিশালকায় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিলেন, কত নদনদী উত্তীর্ণ হইলেন, কোথাও কুমারের সংবাদ

পাইলেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক নূতন নগরে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যদেব শ্রান্তদেহে ধর্ম্মশালার অনুসন্ধান করিতেছিলেন এমন সময় দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার দিকে কে আসিতেছে। ঐ ব্যক্তি—কুমার নয় কি? আচার্য্য আরও অগ্রসর হইলেন। 'এ যে কুমার! কুমারও আচার্য্যকে চিনিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া আচার্য্যের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। আচার্য্য কুমারকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া গেল।

নগরে একটী ক্ষুদ্র গৃহে কুমার বাস করিতেন, কুমার আচার্য্যকে সেই গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া আচার্য্য কুমারের তিরোভাব বৃত্তান্ত জানিলেন। কুমার উদ্যান মধ্যে চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ একদল লোক আসিয়া তাঁহাকে বাধিয়া ফেলিল। উদ্যানের নিভৃত উপকূলে একটী ক্ষুদ্র তরণীর উপর তাহারা কুমারকে তুলিল এবং তরণী বাহিয়া গিয়া সমুদ্র মধ্যস্থ জাহাজে উঠিল। জলপথে বহু দিন এবং স্থলপথে কিছুদিন অতিক্রম করিয়া তাহারা এই নগরে উপস্থিত হইল। জাহাজে উঠিয়াই তাহারা কুমারের বন্ধন খুলিয়া দেয় এবং কুমারকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু কেন তাহারা কুমারকে ধরিয়া আনিয়াছে এবং কোথায় কুমারকে লইয়া যাইবে তাহা কিছুতেই বলে নাই। এখানে আসিয়া কুমার জানিতে পারিলেন কেন তাহাকে আনা হইয়াছে। এখানকার রাজার পুত্র নাই। কুমারের বংশমর্য্যাদায় প্রলুব্ধ হইয়া রাজা মনে করিয়াছিলেন কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। রাজা নীচকুলোদ্ভব বলিয়া তিনি কুমারের পিতার নিকট এ প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। এজন্য বল প্রয়োগ করিয়া কুমারকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। কুমার কিন্তু রাজার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। রাজা যখন দেখিলেন, অনুনয় বিনয়ে কোন ফল হইল না তখন কুমারের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে কুমারের বাসের জন্য একটী ক্ষুদ্র কুটীর দেওয়া হইয়াছে, রাজার আদেশে কুমারকে অতি হীন রকমের আহার ও পরিচ্ছদ দেওয়া হয়। নগরের মধ্যে কুমার যথেচ্ছ বেড়াইতে পারেন।

কিন্তু নগরের বাহিরে তাঁহার যাইবার আদেশ নাই কিন্তু কিছুতেই কুমারের সংকল্প বিচলিত হয় নাই।

আচার্য্য দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন,—যে কুমার রমণীয় রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতেন, নানা সুস্বাদুভোজ্য আহার করিতেন, এখানে তাঁহাকে বন্দীর ন্যায় বাস করিতে হইতেছে, কদন্ন আহার করিতে হইতেছে, মলিনবেশ পরিধান করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহা ভাবিয়া আচার্য্যের আনন্দ ও গৌরবে হৃদয় স্ফীত হইল যেহেতু এত কষ্টেও কুমার ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। তিনি দেখিলেন তাঁহার শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। কুমারের নিকট এইরূপ আচরণই ত তিনি আশা করিতেন।

আচার্য্য তাঁহার সহিত কয়েকটী মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ আনিয়াছিলেন তাহার সাহায্যে কুমারের শিক্ষায় অগ্রসর হইলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কুমারকে উপদেশ দিতেন,—শারীরিক দুঃখকষ্টে বিচলিত হইতে নাই, শরীর ক্ষণস্থায়ী, জীবন দুঃখবহুল,—এই শারীরিক দুঃখকষ্ট ছাড়াইয়া যে অনন্তকালস্থায়ী অমৃতলোক বিদ্যমান আছে তাহা লাভ করিতে যত্নবান হওয়াই মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ বৈকালে কুমার আচার্য্যের সহিত বেড়াইতে যাইতেন। একদিন আচার্য্যের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ ছিল, আকাশের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না, কুমার একাই ভ্রমণ করিতে গেলেন। ফিরিবার সময় পথিমধ্যে অকস্মাৎ প্রবলবেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। আশ্রয়ের জন্য কুমার পথিপার্শ্বস্থ একটি বাটীর বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্বামী কুমারকে দেখিতে পাইয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং কুমারকে সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া শুষ্কবস্ত্র পরাইলেন। গৃহস্বামীর নাম সার্ব্বাক। তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সার্ব্বাক তাঁহার স্ত্রীর সহিত কুমারের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অনেক্ষণ বৃষ্টি ছাড়িল না। সার্ব্বাক নানা বিষয়ে কুমারের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বাকের সৌজন্য, পাণ্ডিত্য, বাক্‌পটুতা ও তাঁহার স্ত্রীর অমায়িক ব্যবহারে কুমার চমৎকৃত হইলেন। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় কুমার সারাপথ এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

ক্রমে সার্ব্বাকের সহিত কুমারের আলাপ আরও ঘনিষ্ঠ হইল। সার্ব্বাক একদিন কুমারকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া নানাবিধ নবাবিষ্কৃত যন্ত্র দেখাইলেন। কোন যন্ত্রের সাহায্যে অতিক্ষুদ্র বস্তু অতিবৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর আকাশের গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। কোন যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের অবিকল প্রতিকৃতি কাগজের উপর অঙ্কিত হইয়া যায়। কুমার আরও জানিলেন যে ইঁহারা শীঘ্রই এরূপ যন্ত্র সকল আবিষ্কার করিবার আশা করেন যাহার সাহায্যে অশ্ব অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেগে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাওয়া যাইবে, নিমেষের মধ্যে শতক্রোশ ব্যবধানে সংবাদ পাঠাইতে পারা যাইবে। তাঁহারা ইহাও আশা করেন যে শীঘ্রই তাঁহারা আকাশে উড়িতে পারিবেন।

রাজার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুমার যে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এজন্য সার্ব্বাক কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কিন্তু আচার্য্য যদুনন্দনের প্রাচীন আদর্শ সার্ব্বাকের ভাল বোধ হইল না। সার্ব্বাক কুমারকে বলিতেন, আচার্য্য তোমাকে যে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের বিকাশ লাভে বাধা উপস্থিত হইবে। এই দেখ না আমরা কেমন নূতন যন্ত্র, নূতন কৌশল সকল আবিষ্কার করিতেছি। ভগবান আমাদিগকে যে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন, এইরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হয়। আর তোমার আচার্য্য তোমাকে শিক্ষা দিতেছেন, মন স্থির করিয়া এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাক, কিছু দেখিও না, কোন বাহ্যবিষয় চিন্তা করিও না, সেই দুই হাজার বৎসর আগেকার লেখা প্রাচীন পুঁথি তোমাকে অভ্যাস করাইতেছেন। এ সকলই মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির অপব্যবহার। এই বিশাল বিচিত্র জগতের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়া, নিত্য নূতন সত্য ও কৌশল আবিষ্কার করিয়া জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য বাড়ান, ইহাই ত বুদ্ধির সদ্ব্যবহার।

কুমার একদিন আচার্য্যকে এই সকল নূতন যন্ত্রের কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—কৈ আপনি ত আমাকে এ সকল কিছুই শিখাইতেছেন না? আচার্য্য কহিলেন, বৎস, শিখিবার বিষয় দুইটী আছে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। জীবন ধারণের জন্য বহির্জগতের জ্ঞান আবশ্যক, ঈশ্বর লাভ

করিবার পক্ষে অন্তর্জগতের জ্ঞান বিশেষ সহায়ক। বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশী আলোচনার দোষ এই যে এদিকে বেশী ঝোঁক হইলে ক্রমশঃ মানবের চিত্ত বিলাস ও বাহ্য সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধারণতঃই আমাদের মন ইন্দ্রিয় সুখে অনুরক্ত। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার এই বহির্মুখা প্রবৃত্তিকে ইন্ধন যোগায়, তাহাতে চিত্ত ক্রমশঃ আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া পড়ে। আমি শুনিয়াছি এই সকল দেশের অধিকাংশ লোক ভোগসুখের চেষ্টাতেই চিরজীবন কাটাইয়া দেয়, এ জীবন যে অল্প দিনের জন্য এবং পরলোকে অক্ষয় সুখ লাভই যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ইহা তাহারা ভুলিয়া যায়। এজন্য ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং।

শঙ্করাচার্য্য তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

বিদ্যাহিকা ?—ব্রহ্মগতিপ্রদা যা।

আমাদের দেশে চিরকালই বাহ্যজগতের জ্ঞান অপেক্ষা অধ্যাত্ম বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধেও আমাদের বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি সকল গ্রন্থ ত সঙ্গে আনিতে পারি নাই। অতিশয় মূল্যবান, কয়েকটী মাত্র গ্রন্থই আমি সঙ্গে আনিয়াছি। যে জ্ঞান সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, তোমাকে সেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

আচার্য্য বুঝিলেন যে এ সকল কথায় কুমারের ভ্রম ঘুচিল না। তিনি ক্রমশঃ কুমারের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন! আহার ও পরিচ্ছদের অসুবিধার কথা আজকাল প্রায়ই কুমার উল্লেখ করেন। কুমারের একটী পিতৃদত্ত বহুমূল্য অঙ্গুরীয় ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কুমার একদিন মূল্যবান পরিচ্ছদ আসবাব প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন।

সার্ব্বাক একদিন কুমারকে বলিল, দেখ, তোমার আজ যে বিপদ হইয়াছে, আচার্য্যের শিক্ষাই তাহার কারণ। ভগবান মানুষকে চক্ষু দিয়াছেন, চক্ষু দিয়া মানুষ এই বিচিত্র জগৎ দেখিবে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তোমার আচার্য্য তোমাকে বলিলেন তুমি চক্ষু মুদিয়া সমুদ্রের

তীরে বসিয়া থাক। ফলে আমাদের সৈনিকেরা তোমাকে ধরিয়া আনিল। এখনও তোমার আচার্য্য তোমার উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিতেছেন না। সেই সকল পুরাতন বুজরুকি অভ্যাস করাইতেছেন। কেবল তোমাকে অতীতের কথাই বলিতেছেন। যাহা অতীত তাহা ত' আর ফিরিবে না। তাহার জন্য এত মাথা ঘামান কেন? আমার বোধ হয় তোমার বলা উচিত যে আমি আর আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে চাহি না। ইহাতে তাঁহার মনে কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তোমার মনুষ্যত্ব রক্ষা করা তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি অপরে মনঃকষ্ট পায় তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই।

কিছুদিন হইতে কুমারের মন ও আচার্য্যের প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। কুমারের আজকাল বিলাস প্রিয় প্রবৃত্তি দেখিয়া আচার্য্য কুমারের জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। আহারে সংযম ও শুচিতা রক্ষা করিলে চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হইবে, বিলাসী লোকদের সাহচর্য্য বর্জ্জন করিলে কুমারের বিলাস প্রবৃত্তির হ্রাস পাইবে ইহাই আচার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি কুমারের ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ও সার্ব্বাকের গৃহে ভোজন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কুমার ভাবিলেন আচার্য্য অযথা তাঁহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

একদিন কুমার আচার্য্যকে বলিলেন আপনি যে ভাবে আমাকে শিক্ষা দিতেছেন এ শিক্ষা আমার ভাল বোধ হইতেছে না।

আচার্য্য কহিলেন, এ শিক্ষার তুমি কি দোষ দেখিতেছ এবং কোন শিক্ষা তোমার ভাল মনে হয় বল। এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে।

কুমার কহিলেন, আপনি সেই প্রাচীন শাস্ত্রই আমাকে শিখাইতেছেন। যাহা অতীত যে অবস্থায় আর ফিরিয়া যাওয়া যাইবে না তাহাকে এত জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করা ভুল।

আচার্য্য কহিলেন অতীত যুগে ফিরিয়া যাইবার কোন কথা হইতেছে না। কথা এই যে প্রাচীন শাস্ত্রগুলি ভাল না খারাপ? যদি ভাল হয় তাহা হইলে সেই শাস্ত্র আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

কুমার কহিলেন, আমার এত সব বিধি ব্যবস্থা ভাল লাগে না। অমুক কাজ করিবে, অমুক কাজ করিবে না, অমুক জিনিষ খাইবে, অমুক জিনিষ খাইবে না. মানুষ কি একটা কল যে তাহাকে প্রত্যেক খুঁটি নাটি নিয়ম অনুসারে চালাইতে হইবে, তাহাকে এত বন্ধন দিয়া বাঁধিতে হইবে?

আচার্য্য কহিলেন, মানুষ কল নয় কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির দাস। সেই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ প্রায়ই নিজের 'শ্রেয়ঃ' পরিত্যাগ করিয়া 'প্রেয়' বরণ করে। প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ এই সকল নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মানবের শ্রেষ্ঠ অংশকে খর্ব্ব করা ইহাদের উদ্দেশ্য নহে এবং ইহারা করেও না। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সকল প্রকার বিলাস ত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনা দ্বারা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর নিয়ম করিয়া তাঁহারা কোন দুরভিসন্ধি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস্য নহে। শাস্ত্রের মর্য্যাদা স্বয়ং ভগবান কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।

কুমার কহিলেন, আমি এ সকল মানি না। আমি এক্ষণে বড় হইয়াছি। কি ভাল কি মন্দ তাহা নির্ণয় করিবার আমার ক্ষমতা হইয়াছে। এই প্রাচীন মতে শিক্ষা লাভ করা আমি ভাল মনে করি না। আপনার আর কষ্ট করিয়া আমাকে এই ভাবে শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব আপনার এখানে থাকা অনাবশ্যক!

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আচার্য্য তাঁহার প্রাচীন গ্রন্থ কয়টি বাঁধিয়া লইলেন এবং ধীরে ধীরে কুমারের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আচার্য্য যাইবার সময় ভাবিলেন, এবার সত্যই কুমারকে হারাইলাম।

প্রথম প্রথম কুমারের খুব আনন্দেই সময় কাটিল। এখন তিনি যেমন ইচ্ছা বেশ করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা খাইতে পারেন, যেমন খুসী জীবন

যাপন করিতে পারেন। কেহ আর তাঁহার জীবন প্রতিপদে বাঁধিয়া দিবে না, জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ মানিয়া তাঁহাকে আর চলিতে হইবে না। সার্ব্বাকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়া গেল। সার্ব্বাকের নিকট তিনি বিবিধ কাব্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করিলেন। ফলতঃ এক্ষণে কি আহার বিহারে, কি চিন্তা ও আদর্শে কুমার সর্ব্বাংশে সার্ব্বাকের অনুরূপ হইলেন। আচার্য্য কুমারের নিজস্ব প্রকৃতি রক্ষা করিবার জন্য এত যত্ন করিয়াছিলেন, সেই নিজস্ব প্রকৃতির চিহ্ন মাত্র রহিল না।

কুমারের পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া রাজা আশান্বিত হইলেন; এইবার কুমার রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে রাজি হইতে পারেন। কুমারের মত জানিবার জন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। কুমার সার্ব্বাকের সহিত পরামর্শ করিলেন। সার্ব্বাক বলিলেন,—আমি ত ইহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখিতেছি না। রাজা ত এক্ষণে তোমাকে জোর করিতেছেন না সুতরাং তোমার আত্ম সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রাজকন্যাকে বিবাহ করিলে তোমার প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, মূল্যবান বেশ ভূষা, দাস দাসী, ঐশ্বর্য্য সকলই হইবে,—একদিন এ দেশের রাজাও হইতে পার। ঐশ্বর্য্য, সুখ ভোগ ও প্রভুত্বই ত জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং তুমি আর কোন ইতস্ততঃ করিও না। রাজাকে জানাও যে তোমার মত আছে।

যথাসময়ে রাজার নিকট সংবাদ পৌছিল। রাজা নিরতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। রাজকন্যার শুভবিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল।

আজ কুমারের বিবাহ। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গের সময় কুমার শুনিতে পাইলেন রাজপ্রসাদ হইতে সানাইয়ের ধ্বনি প্রভাত-বায়ুতে ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ মিষ্টধ্বনি কুমারের কর্ণে আজ বিসদৃশ শুনাইল কেন? কুমারের মনে হইল সানাই যেন করুণ সুরে বলিতেছে,—দাসত্ব, অন্তরের দাসত্ব, চিরকালের জন্য দাসত্ব,—ঐশ্বর্য্যের লোভে, ভোগসুখের লোভে চিরদিনের মত হৃদয় বিক্রয় করা হইল। পিতার বহুদিনের আশা আজ বিফল হইতে চলিল, আচার্য্যের আজন্ম সাধনা আজ ব্যর্থ

হইতে চলিল। সানাই যেন এই কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার তাহাকে বলিতে লাগিল। কুমার আর ঘরের মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, গৃহ হইতে বাহির হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে সে যদি কোনরূপে জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়। আর কি উদ্ধারের কোন উপায় নাই? আজ তুমি কোথায় আচার্য্য দেব? একবার আসিয়া দেখ তোমার প্রিয়শিষ্য আজ ব্যাকুলভাবে তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে তুমি ভিন্ন কে আর তাহাকে এই বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার করিবে?

অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে কুমার নগরের এক নির্জ্জন পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। এধারে তিনি পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই। এক বিস্তৃত মাঠ, মাঠের পর ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণী। রৌদ্র কিছু প্রখর হইয়াছিল। শীতল স্থানে উপবেশন করিবেন বলিয়া তিনি তরুশ্রেণী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তরুশ্রেণীর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র কুটির। কুটিরের সম্মুখে পরিষ্কার প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ, চারিদিকে জুঁই, বেলা, প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কুমারের মনে হইল সকল ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে তিনি যদি আজ এইরূপ একটি শান্তিপূর্ণ কুটিরে আশ্রয় পাইতেন! এমন সময় কুটিরের দ্বার খুলিয়া কে বাহিরে আসিলেন। এ কি! কুমার ত স্বপ্ন দেখিতেছেন না? এ যে তাঁহার আচার্য্যদেব! সেই চন্দনচর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট, মস্তকের পশ্চাতে সেই স্থূল শিখাগুচ্ছ, সেই ধীর প্রসন্ন ঈষৎ করুণ দৃষ্টি! না, এত ভুল হইবার নয়।

আর একবার কুমার আচার্য্যের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলেন। কুমারকে সাদরে তুলিয়া আচার্য্য কহিলেন, বৎস, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছি।

পরিশিষ্ট।

কুমার হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় রাজা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি যাহাকে তাহাকে সন্দেহ করিয়া নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ রাজার অত্যাচারে পূর্ব্ব হইতেই চঞ্চল ছিল, এক্ষণে তাহারা বিদ্রোহী

হইল। রাজা নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। বিদ্রোহী প্রজাগণ সার্ব্বাককে তাহাদের নেতা নির্ব্বাচন করিল। সার্ব্বাক শাসনদণ্ড গ্রহণ করিল। রাজ্যে অশান্তি মিটিবার পর কুমার আচার্য্যের সহিত সার্ব্বাকের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুমারের গৃহ ফিরিবার ইচ্ছা জানিয়া সার্ব্বাক বহু উপহার দিয়া কুমারকে বিদায় দিলেন।

দীর্ঘকাল পরে কুমার পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শঙ্কা)—আচ্ছা, এই যুক্তি অনুসারেই 'যোগিগণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রতি যথোচিত ভাবে মুদিতা ভাবনা করিয়া', পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ত?

(সমাধান)—(যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি—) তাঁহারা প্রবৃত্ত হউন না কেন! যাঁহারা মৈত্র্যাদির দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করেন তাঁহারাই ত যোগী।

মৈত্র্যাদি চতুষ্টয় উপলক্ষণমাত্র। (অর্থাৎ তজ্জাতীয় আরও অনেক বস্তুর বোধক)। গীতার (ষোড়শাধ্যায়োক্ত) সেই চারিটি, অভয়, সত্বসংশুদ্ধি প্রভৃতি দৈবীসম্পদকে এবং (ত্রয়োদশাধ্যায়োক্ত) অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, প্রভৃতি জ্ঞানের সাধন সমূহকে, এবং জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, প্রভৃতি অবস্থার নির্ণায়ক শ্লোক সহে প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে উদ্ধৃতম্

যে সকল ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিকে অন্তর্ভূত করিয়া সূচনা করিতেছে; কেননা ইহাদিগের দ্বারা (শাস্ত্রবিহিত শুভফলদায়ক কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ) শুভবাসনা এবং (শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ ফলদায়ক কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ) অশুভ বাসনা, যে সকল বাসনকে মলিন বলা হইয়াছে, সকলেই বিদূরিত হয়।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, শুভ বাসনা ত অনন্ত, এক ব্যক্তির দ্বারা তাহাদিগের সকলগুলির অভ্যাস করা অসম্ভব। সেই হেতু সেই সকল শুভ বাসনা অভ্যাস করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা ত নিরর্থক।

(সমাধান)—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, উক্ত শুভ বাসনা সমূহ যে সকল অশুভ বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে, তাহাও অনন্ত, এবং তাহাদের সকলগুলি একই মনুষ্যে থাকা অসম্ভব। যথা আয়ুর্ব্বেদে যত প্রকার ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাদের সকলগুলিই ত একই মনুষ্যের পক্ষে সেবন করা সম্ভবপর হয় না। আর সেই সকল ঔষধ দ্বারা যে সকল রোগ বিনষ্ট হয় তাহা একই ব্যক্তির দেহে থাকিতেও পারে না। তাহা হইলে প্রথমে নিজের চিত্তকে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে যতগুলি মলিনবাসনা পরিলক্ষিত হইবে, তখন, তাহাদের বিরোধী (উচ্ছেদক) ততগুলি শুভবাসনার অভ্যাস করিতে হইবে। যেমন কেহ, পুত্রমিত্র কলত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, তাহাদের প্রতি বৈরাগ্য বশতঃ, সেই পীড়ার ঔষধ স্বরূপ, সংন্যাস গ্রহণ করে, সেইরূপ, বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলাচারমদ প্রভৃতি মলিন বাসনার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া লোকে তাহাদের উচ্ছেদক—বিবেক অভ্যাস করিবে। জনক সেই বিবেক বর্ণনা করিয়াছেন:—বাসিষ্ঠ রামায়ণ, উপশমে প্রকরণ, ৯ম অধ্যায়

অদ্য যে মহতাং মূর্দ্ধ্নি তে দিনৈ নিপতন্ত্যধঃ।
হন্ত চিত্ত মহত্তায়াঃ কৈষা বিশ্বস্ততা তব॥ *

আজ যাহাদিগের স্থান মহদ্ব্যক্তিদিগের মস্তকের উপর, কয়েকদিন

* মূলের পাঠ এইরূপ—"হতচিত্ত মহত্তায়াং কৈষা বিশ্বস্ততা বত"—রে পোড়া মন, রাজ্যাদিবৈভবোৎকর্ষে, হায় তোর (এইরূপ) বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকার!

মধ্যেই তাহাদের অধঃপতন হইবে। হায় চিত্ত, মহত্ত্বার রাজ্যাদি বৈভবোৎকর্ষের) প্রতি তোমার এই বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকার।

ক্ব ধনানি মহীপানাং ব্রহ্মণঃ ক্ব জগন্তি বা,

প্রাক্তনানি প্রযাতানি, কেয়ং বিশ্বস্ততা তব * । ২২

(ব্রহ্মাণ—পূর্ব্ববর্ত্তী হিরণ্যগর্ভের।

তোমার এ বিশ্বস্ততা—আমি মরিব না এইরূপ বিশ্বাস।)

মহীপতিদিগের ধন (রাশি আজ) কোথায় ? ব্রহ্মার যে জগৎবৃন্দ পূর্ব্বে ছিল, তাহারাই বা কোথায় গিয়াছে ? (হে চিত্ত) তোমার এ বিশ্বস্ততা কি প্রকার ?

কোটয়ো ব্রহ্মণো যাতা গতাঃ সর্গপরম্পরাঃ

প্রযাতাঃ পাংশুবদ্ভূপাঃ কাধৃতির্মম জীবিতে। † ২৪

কোটি কোটি ব্রহ্মা চলিয়া গিয়াছে, কত সৃষ্টিরাজি চলিয়া গিয়াছে, কত মহীপাল ধূলির ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। আমার এই জীবনের উপর আস্থা কি প্রকার—

যেষাং নিমেষণোন্মেষৌ জগতাং প্রলয়োদয়ৌ

তাদৃশাঃ পুরুষা নষ্টা মাদৃশাং গণনৈব কা ॥ ‡

[মূলের পাঠানুসারে অর্থ এই প্রকার—

(আভাস) আচ্ছা জনক, তুমি ত রাজা, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি সকলকেই স্ববশে রাখিতে পার, তোমার এপ্রকার অবিশ্বাসের কারণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন যাদের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হয় সেইরূপ পুরুষগণ থাকিতে আমার ন্যায় (ক্ষুদ্র জীব) ত গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না।]

যাঁহাদের চক্ষুর নিমীলন উন্মীলনে জগৎসমূহের প্রলয় ও উদয় (সৃষ্টি) হয় সেইরূপ পুরুষগণও বিলুপ্ত হইয়াছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের আবার গণনা কি। ইতি।

---

* মূলের পাঠ—'তব' স্থলে 'মম'।

† মূলের পাঠ—"ব্রহ্মণাং কোটয়ো"।

‡ মূলের পাঠ—"যেষাং নিমেষণোন্মেষৈঃ", ও তাদৃশাঃ পুরুষাঃ 'সন্তি'।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, এইরূপ বিবেক ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্ব্বে উদিত হয়; কেননা, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধন ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আর আপনার এই গ্রন্থে যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কার লাভ হইয়াছে, তাঁহারই পক্ষে জীবন্মুক্তি লাভের জন্য বাসনাক্ষয় প্রভৃতি সাধনের বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। অতএব অকস্মাৎ এই নৃত্যের কারণ কি? (অর্থাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপনের হেতু কি?)

(সমাধান)—ইহাতে দোষ হয় না। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার পরেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ,—এই সুসিদ্ধ রাজপথেই জনসাধারণে চলিয়া থাকে আর জনকের যে অকস্মাৎ সিদ্ধগীতা * শ্রবণমাত্রেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা প্রভূত পুণ্যফলে আকাশ হইতে ফল পতনের ন্যায়। তাহার পর চিত্তের বিশ্রামলাভের জন্য (জনক) এইরূপ বিবেকাভ্যাস করিলেন। সুতরাং অকস্মাৎ অনবসর-নৃত্য হয় নাই, উপযুক্ত সময়েই হইয়াছে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা এইরূপ হইলেও, এই বিবেক ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। তখন মলিনবাসনার অনুক্রম বা প্রবাহ নিবৃত্ত হওয়ায় শুদ্ধ বাসনাভ্যাসেরও ত প্রয়োজন নাই,—

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, জনকে সেই মলিন-বাসনার প্রবাহ বা অনুক্রম নিবৃত্ত হইলেও, যাজ্ঞবল্ক্য, ভগীরথ প্রভৃতিতে সেই মলিন-বাসনার প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার প্রতিবাদী উষস্ত কহোল প্রভৃতির প্রভূত বিদ্যামদ রহিয়াছে, (দেখা যায়), কেননা, তাঁহারা সকলেই (পরস্পরকে তর্কে) পরাজয় করিবায় নিমিত্ত কথায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দেখা যায়। † যদি বল তাঁহাদের যে বিদ্যা ছিল তাহা ব্রহ্মবিদ্যা নহে, তাহা অন্য কোনও বিদ্যা, তবে বলি, তাহা বলিতে পারনা, কেননা, কথা প্রসঙ্গে যে, সকল প্রশ্ন ও উত্তর করা

* বসিষ্ট রামায়ণের উপশম প্রকরণে ৮ম অধ্যায়ের ৯ হইতে ১৮ সংখ্যক শ্লোক সিদ্ধগীতা নামে অভিহিত হয়।

† বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ, ৫ম।

হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বল, তাঁহাদের প্রশ্নোত্তর ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক হইলেও, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান বাহ্যতঃ ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র ; তাহা সম্যগ্ জ্ঞান নহে, তবে তদুত্তরে বলি, এরূপ বলিতে পারা যায় না, কেননা তাহা হইলে তাঁহাদের বাক্য হইতে আমাদিগেরও (ইদানিন্তনদিগেরও) যে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে তাহাকেও অসম্যগ্ জ্ঞান বলিতে হয়। যদি বল, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সম্যগ্জ্ঞান হইলেও, তাহা পরোক্ষজ্ঞান মাত্র ; তদুত্তরে বলি, তাহা বলিতে পার না, কেন না, দেখা যাইতেছে যে মুখ্য অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়েই বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হইয়াছে যথা :—(বৃহদা উপ ৩।৪।১) (যাজ্ঞবল্ক্যোহি হোবাচ) 'যৎ সাক্ষাদ-পরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্ব ইতি)" তিনি সম্বোধন পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে যাজ্ঞবল্ক্য যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর সর্ব্বদেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট ব্যাখ্যা কর।

যদি বল পূজ্যপাদ শঙ্করাচর্য্য আত্মজ্ঞানীর বিদ্যামদ থাকে একথা স্বীকার করেন না, কেননা তাঁহার "উপদেশ সাহস্রী" নামক গ্রন্থে আছে—(প্রকাশ প্রকরণ, ১৩)

"ব্রহ্মবিত্ত্বং তথা মুক্ত্বা স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ * ।"

এবং "আমি ব্রহ্মবিৎ" এইরূপ অভিমান যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আত্মজ্ঞ; অন্য কেহ নহে।

আর, 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে'ও আছে—

ন চাধ্যাত্মাভিমানোঽপি বিদুষোঽস্ত্যাসুরত্বতঃ
বিদুষোঽপ্যাসুরশ্চেৎস্যান্নিষ্ফলং ব্রহ্মদর্শনম্ ॥† (প্রথমাধ্যায়, ৭৫ শ্লোক)

---

* এই শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ—"যো বেদালুপ্ত দৃষ্টিত্বমাত্মনো ঽকর্ত্তৃতাং তথা,"। রামতীর্থ পদ যোজনিকা ব্যাখ্যায়—এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যিনি, "আমি ব্রহ্মবিৎ" এইরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, আপনাকে বেদবর্ণিত কেবলমাত্র আত্মাকে চেতন-রূপে দ্রষ্টা বলিয়া এবং অকর্ত্তা বলিয়া জানেন তিনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ ; যিনি 'আমি ব্রহ্মবিৎ' বলিয়া অভিমানের লেশমাত্র রাখিয়াছেন তিনি ব্রহ্মবিৎ নহেন।

† এই শ্লোকের অবতরণিকায় সুরেশ্বরাচার্য্য বলিতেছেন—

তত্ত্বজ্ঞানীর অধ্যাত্মাভিমান (তত্ত্বজ্ঞান জনিত অভিমান)ও নাই, কেননা তাহা অসুর যোগ্য মোহজনিত, (গীতায় বর্ণিত আসুরী সম্পদের অর্থাৎ দর্প ও অভিমানেরই অন্তর্ভূত)। তত্ত্বজ্ঞানীরও যদি আসুরভাব থাকে তবে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল বলিতে হয়।

তদুত্তরে আমরা বলি না ইহা দোস নহে কেননা উদ্ধৃত স্থলে, যে তত্ত্বজ্ঞান (পরিপাক লাভ করিয়া) জীবন্মুক্তি প্রদান করে, এবং তাহাতেই পর্য্যবসিত হয় সেই জীবন্মুক্তি লাভের পূর্ব্ব পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল কথা বলা হইয়াছে। আর আমরাও জীবন্মুক্ত পুরুষে বিদ্যামদ থাকে একথা স্বীকার করি না।

"স্যাদ্বিধিরধ্যাত্মাভিমানাদিতি চেন্নৈবম্। যস্মাৎ" টীকাকার জ্ঞানোত্তম ব্যাখ্য করিতেছেন—"আচ্ছা জীব ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইলেও, 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি ক্ষত্রিয়' এইরূপে জাতি প্রভৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ শরীরের অভিমান হইতে ত ভেদের (ভেদজ্ঞানের) সম্ভাবনা হইতে পারে, এবং তাহা হইলে (সেই ভেদজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য) অধিকারী ব্যবস্থানুসারে কর্ম্মব্যবস্থাও করিতে হয়"—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না কেননা, বিদ্বানের অর্থাৎ তত্ত্ববিদের অধ্যাত্মাভিমান অর্থাৎ শরীরাদির অভিমান নাই, কেননা তাহা অসুরোচিত মোহজনিত' বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং দেহাদি বিষয়ক অভিমানের নিবৃত্তির জন্য অধিকার ব্যাবস্থার কথা ত দূরের কথা। তাহা হইলে দেহাদি বিষয়ক অভিমান সিদ্ধির জন্য জ্ঞানীতেও মোহ থাকে একথা স্বীকার করিতে হয়। এই হেতু বলিতেছেন—"তাহা হইলে বলিতে হয়, 'যে ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানকে বিদূরিত করিতে পারে না, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তত্ত্বজ্ঞানীতে মোহ থাকিতেই পারে না"—সুতরাং বিদ্যামদ প্রসঙ্গে এই প্রমাণটি এস্থলে অসংলগ্ন হওয়াতে, বোধ হয়, মুনিবর বিদ্যারণ্য কর্ত্তৃক ইহা সংযোজিত হয় নাই।

সমালোচনা।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস এম, এ।)

এ বৎসরের "প্রবাসী"র ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় "সর্ব্বব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ, স্পিনোজা ও শঙ্কর" নামক ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে স্পিনোজার সর্ব্বব্রহ্মবাদ ও আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ এই দুইটী দার্শনিক মতের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্করের মতের মধ্যে কয়েকটা বিরোধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রবন্ধ শেষে—"আর ব্রহ্ম! যে জীব তাঁহা হইতেই আসিয়াছে সেই জীবের মধ্যে তাঁর স্থান নাই, তাহা হইতে তিনি চিরবিচ্ছিন্ন। জীবত্ব যখন কাটিল তখন তো কেবল ব্রহ্ম। আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম—মধ্য একটা বিকট স্বপ্ন। স্বপ্নের মায়াফল ভক্ষণ জনিত বদ্‌হজ্‌মি। মায়া কি?......চুপ্"—এই কয়েকটী বিদ্রূপাত্মক কথায় মায়াবাদের উপর কটাক্ষ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন!

ধীরেন্দ্রবাবু মায়াবাদে যে কয়েকটী আপত্তিজনক যুক্তি উত্থাপন করিয়া বিরোধ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন আমরা এক হিসাবে তাঁহার সেই উদ্যম প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচনা করি। তাহার কারণ এই যে, আচার্য্য শঙ্কর যে মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে যতপ্রকার যুক্তি মানুষের মনে স্বভাবতঃই প্রবল হইয়া উঠে, সেই সকল, সত্যানুসন্ধিৎসা প্রণোদিত হইয়া নির্ভীকভাবে আলোচনা করা সত্য পথের প্রত্যেক পথিকেরই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক এপ্রকার আলোচনা মাসিক পত্রাদির ভিতর দিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট যত প্রকাশিত হয় মায়াবাদের সত্যাসত্য বুঝিবার পথ ততই সহজ হইয়া উঠে।

অবশ্য এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল, কেবল যুক্তির (conceptual thinking) উপর দাঁড়াইয়া যে বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দ্বারা যে মায়াবাদ সত্য কি অসত্য তাহা চিরকালের জন্য নিশ্চিত

রূপে স্থির হইয়া সকল বিবাদের অবসানে তাহা সত্য বলিয়া ঘোষিত অথবা অসত্যের দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমায় কলঙ্কিত হইয়া দর্শন ও সাধন জগতে চিরদিনের জন্য হেয় বলিয়া গণ্য হইবে, সে আশা করিয়া এই প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রবাবুর যুক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি না। তবে বিচার দ্বারা এক পক্ষ প্রবল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া গেলে সেই মতই যে ঠিক এইরূপ একটা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (intellectual conviction) হইতে পারে,—ইহা যাঁহারা যথার্থ বিচারপ্রিয় তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং, মায়াবাদের সপক্ষে অথবা বিপক্ষেই হউক, এইরূপ নিরপেক্ষ যুক্তিমূলক আলোচনা দ্বারা একটা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানলাভ হইবে—এই আশায়ই বর্ত্তমান আলোচনার অবতারণা।

ধীরেন্দ্রবাবু মায়াবাদে যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে প্রথমেই এই একটা মস্ত গোল উপস্থিত হয় যে, তিনি মায়াবাদে যে সকল কথা শঙ্করের সিদ্ধান্ত বলিয়া দেখাইতেছেন তাহা বা তন্মূলক কথা আচার্য্য কোন্ গ্রন্থে কোন্ স্থলে বলিয়াছেন তাহা প্রবন্ধের মধ্যে অথবা পাদ-টিপ্পণীতে উল্লেখ করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা আদৌ করেন নাই! কাজেই তাঁহার যুক্তির যৌক্তিকতা বিবেচনা করিতে গেলে দারুণ অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অসুবিধার নমুনা স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধ হইতে দুই একটী জায়গা নিম্নে উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি—

১। "তাঁহার (অর্থাৎ শঙ্করের) এক বহুর স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মে ভেদ বা বহুত্বের স্থান নাই"—এই কথাগুলি খুব সম্ভব ধীরেন্দ্র বাবু শঙ্করের সিদ্ধান্ত * বলিয়া ধরিয়া লইয়া পরে অন্যান্য কথাগুলি বলিয়াছেন। কিন্তু 'এক বহুর স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়' এই কথার মূল

---

* এই বহুস্পর্শে একের নষ্ট হওয়াটা বাস্তবিক (really) নষ্ট হওয়া—ইহাই ধীরেন্দ্রবাবুর অর্থ নয় কি? যদি এই অর্থে তিনি কথাগুলিকে শঙ্কর-সিদ্ধান্ত না ধরেন তবে 'ব্রহ্মে ভেদ বা বহুত্বের স্থান নাই' এই কথাদ্বারা দোষ দেখান কাহার?

অথবা এই রকমের অর্থ আসে এমন ভাবের কথা শঙ্করের কোন্ গ্রন্থে কোথায় আছে তাহার উল্লেখ না করিয়া কোন রকম প্রত্যুত্তরের অবসর রাখেন নাই।

২। "ইহা (অর্থাৎ শঙ্কর-মতে যে একত্ব) বহুকে অস্বীকার করিয়া বহুর বাহিরে এক কল্পিত একত্ব"—এই কয়েকটী কথাতেও আগের মতই গোলমাল দেখা যায়।

'বহুকে অস্বীকার' এই কথা বলাতেই যখন শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে সব আপত্তি উঠিতেছে, তখন সেই বহুকে শঙ্কর কি অর্থে অস্বীকার করিয়াছেন, অথবা বন্ধ্যার ছেলের মত একেবারেই অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন কি না, তাহা গ্রন্থ প্রমাণ সহিত পরিষ্কারভাবে না বলিয়া মোটামুটী একটা ভাসা-ভাসা রকমে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—"বহুর বাহিরে এক কল্পিত একত্ব"!

যাহা হউক আর দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া আসল কথায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ধীরেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"এই মায়া কি পদার্থ তার ব্যাখ্যা নাই, এবং ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া এই মায়া বা অবিদ্যাস্পর্শে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইয়াছে।"

এই কথাগুলির অর্থ আমরা যাহা বুঝিতে পারিলাম তাহা এই—মায়াবাদে ব্রহ্ম বাস্তবিক পক্ষে যদি অদ্বৈত হন, তবে তাহার অতিরিক্ত মায়া বলিয়া যে কোন রকমের একটা কিছু থাকিলেই ত আবার দ্বৈতের কথাই আসিয়া পড়িল। তবে ব্রহ্ম অদ্বৈত বলিয়া মানা যায় কিরূপে?

বোধহয় এইরূপ একটা কিছু অভিপ্রায় করিয়াই ধীরেন্দ্রবাবু আবার বলিতেছেন,—"সুতরাং জগৎকারণের একত্ব, অনন্তত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব সকলই ব্যাহত হইতেছে।"

আমরা কিন্তু এই স্থলে ধীরেন্দ্র বাবুর যুক্তির সারবত্তা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

মায়াবাদী যখন রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত ধরিয়া ব্রহ্ম ও জগতের

বিচার করিতে বসেন, তখন সেই দৃষ্টান্ত কতদূর সঙ্গত বা সেই ভ্রমস্থলটীকে দৃষ্টান্তরূপে প্রয়োগ করিবার কতটা যৌক্তিকতা আছে (অর্থাৎ সেই analogyর কতটা strength এবং কতদূর তাহার scope বা প্রসার) —সেই যথার্থ বিচারের স্থানে তিনি যখন কোন আপত্তি উঠান নাই তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে ধীরেন্দ্রবাবু সেই দৃষ্টান্ত মানিয়া লইয়া আপত্তি করিতেছেন। কাজেই সেই দৃষ্টান্তটী পরিষ্কার করিলেই তাহার উক্ত আপত্তি কতদূর সঙ্গত তাহা বুঝা যাইবে।

এক খণ্ড রজ্জুকে যখন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তখন সেই সর্প একটা কিছু জিনিষ বলিয়াই আমাদের জ্ঞানে ভাসমান হয় এবং সেই ভাস-মান সর্প যখন রজ্জু নয় তখন অবশ্য রজ্জু হইতে অতিরিক্ত একটা কিছু বলিয়াই ভ্রম হয়। অথচ রজ্জুর অতিরিক্ত সর্প বলিয়া যখন ভ্রম, তখন তাই বলিয়াই কি রজ্জুর রজ্জুত্ব বাস্তবিক পক্ষে (really) ব্যাহত হইয়া পড়ে বা সত্য সত্যই রজ্জু ছাড়া সর্প বলিয়া একটা দ্বিতীয় পদার্থ চিরকালের জন্য রজ্জুর পাশে খাড়া হইয়া উঠে?

অবশ্য ধীরেন্দ্র বাবু যদি বলেন যে—তিনি যখন বলিতেছেন, 'অবিদ্যা বা মায়াস্পর্শে শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইতেছে'—তখন অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হওয়া মানে বাস্তব (reality) ব্যাহত হওয়া নয়, কেবল জ্ঞানে সাময়িক একটা গোলমাল হওয়া ;—তবে মায়াবাদীর তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে, অবিদ্যা বা মায়াস্পর্শে অদ্বৈত ব্রহ্ম বাধ্য হইয়া তাঁহার অদ্বৈতত্ব ত্যাগ করিয়া প্রকৃত পক্ষে (অর্থাৎ চিরকালের জন্য, সাময়িক নয়) আবার দ্বৈত্ব হইয়া পড়েন তবেই মায়াবাদী তাহা অস্বীকার করিবেন।

এইরূপ অস্বীকার করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে মায়াবাদী বলিবেন যে, সামান্য একটা রজ্জু যা' জড় অর্থাৎ নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না—তাহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলেই যখন সেই আরোপিত সর্প রজ্জুর রজ্জুত্বের ক্ষতি করিতে পারিতেছে না দেখিতেছি, তখন চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম—যিনি স্বয়ং প্রকাশ হইয়া নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাতে ভ্রমকল্পিত যে জগৎ সে কেমন করিয়া তাঁহার

অদ্বৈতত্বের নাশ বা ক্ষতি করিবে ? ধীরেন্দ্রবাবু অবিদ্যাস্পর্শে শুদ্ধাদ্বৈতে অদ্বৈতত্বের ব্যাহতত্ব দেখাইতে যাইয়া এত বেশী ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি আচার্য্য শঙ্করের একটা মোটা কথা—যাহার উপর সমস্ত মায়াবাদ দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে—অদ্বৈতবাদের সেই মহা প্রতিজ্ঞাটী (grand postulate) মোটেই লক্ষ্য করেন নাই।

আচার্য্য শঙ্কর সত্য ব্রহ্মেতে জগৎ অধ্যস্ত বা কল্পিত বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, যে বস্তুতে যাহার অধ্যাস বা আরোপ হয় সেই বস্তু তাহার গুণের বা দোষের দ্বারা অনুমাত্রও সম্বন্ধ (অর্থাৎ real বাস্তব) হয় না * ।

এইরূপ গীতার ভাষ্য করিতে যাইয়াও একস্থলে তিনি বলিতেছেন,—+ "মিথ্যা জ্ঞান পরমার্থ বস্তুকে দূষিত করিতে সমর্থ নয়। মরু-মরীচিকার জল যেরূপ তদ্‌গত স্নেহের দ্বারা ঊষর দেশকে পঙ্কীকৃত করিতে পারে না সেইরূপ অবিদ্যা বা মায়াও ক্ষেত্রজ্ঞের (অর্থাৎ অসংসারী পরমেশ্বরের বা ব্রহ্মের) কিছুই (অর্থাৎ বাস্তবিক) করিতে পারে না।"

ইহার কিছু পূর্ব্বেই আবার আচার্য্য বলিয়া আসিয়াছেন,—‡ "অবিদ্যা কর্ত্তৃক অধ্যস্ত ধর্ম্মের দ্বারা লোকে কাহারও উপকার কিংবা অপকার দৃষ্ট হয় নাই।" অতএব ধীরেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বের ঐ সকল কথায় আচার্য্য শঙ্কর কেন স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, অবিদ্যা বা মায়াস্পর্শে শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইতেছে ?

আসল কথাটা এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধীরেন্দ্রবাবুর মত প্রতিবাদীরা—কল্পিত বস্তুর দ্বারা অকল্পিত বস্তু কলুষিত হইতেছে—ইহা না দেখাইতে

* আচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের অধ্যাস ভাষ্য—

"যত্র যদধ্যাস স্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অনুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে"।

\+ গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায় "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য।

‡ "ন হি কচিদপি লোকে অবিদ্যাধ্যস্তেন ধর্ম্মেণ কস্যচিদুপাকারোঽপকারো বা দৃষ্টঃ।"

পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শঙ্করের পারমার্থিক অকল্পিত ব্রহ্মবস্তুর অদ্বৈতত্বকে অপারমার্থিক কল্পিত মায়াস্পর্শে ব্যাহত করিতে যাওয়া কি নেহাৎএকটা জোরজবরদস্তির ব্যাপার নয়?

ধীরেন্দ্রবাবু মায়াবাদে একটা বিরোধ তুলিতে গিয়া বলিতেছেন— "একদিকে জগৎ-ব্যাখ্যায় ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হইতেছে, অন্য দিকে এই কিছু অবোধ্য (irrational); সুতরাং জগৎ কারণের একত্ব, অনন্তত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব সকলই ব্যাহত হইতেছে।"

আমরা তাঁহার এই কথাগুলির যা অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই—'অদ্বৈত ব্রহ্ম' ত মায়াবাদীর আছেনই, তা ছাড়া জগৎটা কোথা হইতে আসিল বা কেন আসিল এই রকমের একটা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মায়াবাদী যখন মায়া বলিয়া একটা কিছুকে টানিয়া আনেন—অথচ এই মায়া বা একটা কিছুকে যখন ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলেন না, তখন কাজেই, এই একটা কিছু বা মায়া ব্রহ্মের অতিরিক্ত হইয়া ব্রহ্মের (যিনি অদ্বৈত) পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যায়। সুতরাং, তখন ব্রহ্ম অদ্বৈত না থাকিয়া দুই হইয়া পড়েন এবং তাঁহার অতিরিক্ত একটা মায়া পদার্থ দাঁড়াইয়া দুইজনের মধ্যে ব্যবধানের একটা সীমা রেখা টানিয়া অনন্ত ব্রহ্মকে শান্ত করিয়া দেয়। আর তা ছাড়া মায়া বলিয়া জ্ঞেয় জড় একটা কিছু ব্রহ্মের অতিরিক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ থাকাতে ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপও হইতে পারেন না।

এই যদি ধীরেন্দ্রবাবুর কথার অর্থ হয়—তবে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমরা মায়াবাদীর একটা সোজা কথা বলিয়া লইতে চাই। কথাটা এই,—মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক (real) বাস্তব অকল্পিত সত্যবস্তু, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত অথচ ঠিক তাঁহারই মত পারমার্থিক বাস্তব অকল্পিত আর কোন বস্তু হইতে পারে না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় কল্পিত বস্তু হইতে পারে।

এই রকমের কল্পিত মায়া—রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের জায়গায় সর্প যেমন ভাবে দ্বিতীয় অতিরিক্ত (অথচ রজ্জুর মত অতটা সত্য নয়) বস্তু—অনেকটা সেই রকমের অতিরিক্ত দ্বিতীয় একটা কিছু। কিন্তু তা

বলিয়াই ব্রহ্মের মত পারমার্থিক (ultimately real) একটা দ্বিতীয় কিছু হইতে যাইবে কেন ?

এই কথাটাই সংক্ষেপে বলিতে গিয়া মায়াবাদী বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—অর্থাৎ অদ্বিতীয় পারমার্থিক (ultimately real) সত্য ব্রহ্ম এবং জগৎ ব্রহ্মেতে কল্পিত বলিয়া মিথ্যা (অর্থাৎ apparent or dependent reality)

এখন ধীরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি যখন বলিতেছেন যে, মায়াটা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া ব্রহ্মের একত্ব ইত্যাদি ব্যাহত হইতেছে—তখন ব্যাহত কথাটার অর্থ কি এই যে, চিরকালের জন্য বাস্তবিক পারমার্থিক ভাবেই (really) দুইটী বস্তু এবং ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর একটা কিছু দাঁড়াইয়া (অথচ যে একটা কিছু মায়াকে মায়াবাদী কল্পিত বলেন) ব্রহ্মের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া অনন্ত তাঁহাকে শান্ত করিয়া দিতেছে, অথবা রজ্জুতে যেমন সেই সময়ের জন্য রজ্জুর অতিরিক্ত আর একটা সর্প বলিয়া কিছু ভাসে সেই রকমের কিছু কালের জন্য মায়া বলিয়া একটা দ্বিতীয় কিছু ব্রহ্মের অতিরিক্ত হইয়া ব্রহ্মকে অনন্ত ইত্যাদি থাকিতে দিবে না ?

যদি 'একত্বাদি ব্যাহত হইতেছে' এই কথাগুলির দ্বিতীয় অর্থ— ধীরেন্দ্রবাবুর অভিপ্রেত হয় তবে মায়াবাদীর তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই এবং তাহা স্বীকার করার দরুণ তাঁহার মতে কোন বিরোধও উপস্থিত হইবে না—যেহেতু, তিনি ব্রহ্মের একত্বাদি বাস্তব বা পারমার্থিক (ultimately real) অর্থেই বলিয়া থাকেন।

আর যদি প্রথম অর্থই ধীরেন্দ্রবাবুর অভিপ্রেত হয় তবে মায়াবাদী বলিবেন যে রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্তের বেলায় কল্পিত সর্প যেমন চিরকালের জন্য বাস্তবিক এক অতিরিক্ত পদার্থ হইয়া খাড়া হইতে বা চিরকালের জন্য রজ্জু ও সর্পের মাঝখানে সীমা রেখা সূচক একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, সেই রকম ব্রহ্মে কল্পিত মায়া চিরকালের জন্য পারমার্থিক (ultimately real) একটা দ্বিতীয় পদার্থ এবং সেইজন্য ব্রহ্মের সীমা নির্দ্দেশক একটা পদার্থ হইয়া অনন্ত ব্রহ্মকে শান্ত করিয়া দিবে এমন কথা বাধ্য হইয়া মায়াবাদীকে বলিতে হইবে কেন ?

তিন রকমে বস্তু সান্ত হয়—যেমন দেশ, কাল, এবং তুল্য সত্তাযুক্ত অতিরিক্ত বস্তুর দ্বারা। ইহার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ—আকাশের কথা বলা যাইতে পারে। দেশতঃ আকাশ অনন্ত—যেহেতু দেশের দ্বারা আকাশের বাস্তবিক পরিচ্ছেদ হয় না (অর্থাৎ বলা যায় না যে আকাশ এইটুকু বা এই পর্য্যন্ত)।

এই সকল কথার সোজা অর্থ এই যে, যে বস্তুর দ্বারা অন্য বস্তুকে সান্ত বলিতে হয় সেই বস্তু সেই বস্তু হইতে বাস্তবিক (really) ভিন্ন একটা পদার্থ হওয়া চাই। সেই ভিন্ন বস্তু হইতে যে বস্তুকে সান্ত বলা যায় সেই বস্তুর বুদ্ধি বিনিবর্ত্তিত হইলেই সেই ভিন্ন বস্তুটী যাকে সান্ত বলিতেছি তাহার অন্ত হইবে। মোট কথা এই যে, যে একটা কিছুকে ধরিয়া কোন বস্তুকে সান্ত বলিতে হইবে সেই একটা কিছু বাস্তব (real) একটা কিছু হওয়া চাই। তাহা হইলেই সেই বস্তুটি বাস্তবিক (really) সান্ত হইবে, নচেৎ নয়। কাজেই মায়া যখন কল্পিত বস্তু অর্থাৎ বাস্তবিক (real) একটা কিছু নয় বলিয়া মায়াবাদী বলিতেছেন—অথচ সেই কথার বিরুদ্ধে ধীরেন্দ্র বাবু যখন কিছু বলিতেছেন না—তখন কেন এই কল্পিত একটা কিছু মায়ার জন্য অদ্বৈত ব্রহ্ম বাস্তবিক দুই এবং বাস্তবিক (really) সান্ত হইবেন? এই কথাটাই আচার্য্য শঙ্কর অতি পরিষ্কার করিয়া তাঁহার তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ভাষ্যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদে মায়াকে ধরিয়া ধীরেন্দ্রবাবু যে প্রধান দুইটী দোষ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—আমরা তাঁহারই যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার অন্যান্য দোষগুলি সেই রকমের সাংঘাতিক নয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাই না।

তবে প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিচার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তিনি মায়াবাদ দার্শনিক ভাবে বিচার করিতে গিয়া অনেক কথা এরূপ আল্‌গা-আল্‌গা ভাবে (loosely) ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাঁহার আপত্তির অর্থই ভাল বুঝা যায় না বলিয়া উত্তর দেওয়া বড় কঠিন হইয়া পড়ে! তাহা ছাড়া এই রকমের একটা ভাবগম্ভীর দর্শনের

মত আলোচনা করিতে গিয়া বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সেইভাবে গ্রন্থ প্রমাণ সহ দার্শনিকভাবে না লিখিয়া শঙ্করের মায়াবাদের প্রতি কতটা সুবিচার করিয়াছেন তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়! সে যাহা হউক তাঁহার মত চিন্তাশীল লেখকের নিকট হইতে আমরা আরও ভালরকমের খাঁটী বিচার আশা করি বলিয়াই সেই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই কয়েকটি কথা বলিয়া রাখিলাম।

মনুসংহিতা—দেবনাগর অক্ষরে ৺কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কৃত চিরপ্রভা ঠিকার বঙ্গানুবাদ সহ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ তর্কভূষণ মহোদয় লিখিত সংস্কৃত ভাষায় ভূমিকা সহ—কলিকাতা ১৩নং লক্ষ্মীদত্ত লেনস্থ শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিচিত্র ভারতীয় সমাজের আদি গুরু গ্রন্থ হিন্দুমাত্রেরই পাঠ্য। মূল্য ৬৷৷০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ঝরিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে শ্রীমাখনলাল হোড় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে এই পাঁচালী-খানি রচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জনসাধারণে প্রভুর সমন্বয় ভাব প্রচারে সাহায্য হইবে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

গান্ধী না অরবিন্দ! (প্রতিবাদ)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তিকা—মূল্য ৵০ আনা।

নিরুপদ্রব অসহযোগীতা ও মহাত্মা গান্ধী—নীরববন্ধু প্রণীত। মূল্য /১৫ পয়সা।

চরকা শিল্প শিক্ষা প্রণালী—শ্রীমতী কুমুদিনী সিংহ প্রণীত—প্রকাশক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন। ১০৯ নং অপার সারকুলার রোড কলিকাতা। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ইহাতে সহজে চরকা শিখিবার উপায় বর্ণিত আছে। এই পুস্তিকা পাঠে অনেকেই এই কার্য্যে উৎসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

উপাসনা—৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত কর্ত্তৃক রচিত দেবদেবীর গান।

"লক্ষ্মীনিবাস" ১ নং লক্ষ্মীদত্ত লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমূল্য-কৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অকাজের কাজ—শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত। বর্ত্তমান ভাবোপযোগী গল্প পুস্তিকা। প্রকাশক—শ্রীসত্যরঞ্জন বসু—ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল সিমডিকেট্, ১১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—মূল্য দুই আনা।

গাঁয়ের কথা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তি স্থান পূর্ব্ব। প্রাচীন পল্লীসমাজের সুখচ্ছবি লেখক বর্ত্তমান, পল্লী সমাজের সহিত তুলিত করিয়া তাহার যথার্থ কঙ্কাল স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন। "তোমার ক্ষেত্রে ফসল নেই, মাঠে গরু নেই, তোমার নদী নালায় জল নেই, তোমার চার কোটী ভাই 'লাঙ্গলা-চাষা' তারা আজ নিরন্ন উলঙ্গ হয়ে বসে আছে—আশা উৎসাহ নেই, আহা বলবার কেউ নেই, ভাগ্য-বিড়ম্বনার কাছে হার মেনে সকল জ্বালার অবসান করছে! কেউ বা সয়তানীর নূতন নূতন পথ খুঁজে খুঁজে সমাজের গায়ে দুষ্ট-ব্রণের মত শুধু অস্বস্তি আর যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে।"

এক্ষণে এই মৃত্যুর করাল কবল হইতে মাতা জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার মত উপযুক্ত কর্ম্মী কে?—"কর্ম্ম জীবনের মধ্যে মৃত্যুর অধিকার নাই এ বিশ্বাস যাহার আছে।" "মর জগতে অমর" সেবক তিনিই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষসত্য মৃত্যুকে কি করিয়া, কাহাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ তুচ্ছ করিবে তাহা লেখক দেখাইতে ভুলিয়াছেন। সেই অবলম্বন আমাদের পরমাত্মীয় পরম প্রেমাস্পদ আত্মা।

পল্লী সমাজ—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত—প্রাপ্তি স্থান পূর্ব্ব। এই পুস্তিকায় গ্রাম ও সমাজ-জীবন, কৃষকের অধিকার, প্রজাতন্ত্রের নূতন দিক, আমাদের নীরব প্রজাতন্ত্র, নূতন সংস্কার, শিল্প-জীবনে নূতন আদর্শ, কলকারখানা, সমূহ-তন্ত্র (communalism) অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর পরস্পরের সদ্ভাবের ও সমবায়ে প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের কল্যাণ বিধানের দ্বারা যে শিল্পপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করা, ধর্ম্মগোলা, পল্লীভাণ্ডার, গাঁতি বা একযোগে কৃষিকর্ম্মের নিমিত্ত কৃষকগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে গঠিত করা, গৃহ শিল্প বা ছোট

কারখানা, সাধারণ ইলেকট্রিক ঘর, গ্রাম্য পাটের কল, গ্রাম্য স্বায়ত্ত কর-স্থাপন, টাকা জমাইবার টিকিট, পঞ্চায়েতের আশা, কথকতা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অতি সুচারুরূপে বুঝাইয়াছেন। আদর্শ পল্লীজীবন পরিনতির জন্য পল্লী পরিষদের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। ইহার কর্ত্তব্য বিভাগ,—"(ক) গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি জীবন নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করণ, (খ) স্বাস্থ্য রক্ষা, (গ) শিক্ষা (কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়), (ঘ) ধর্ম্ম (যাত্রা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি) (ঙ) বিচার (গ্রাম্য বিচারসমূহের নিষ্পত্তি), (চ) বন জঙ্গল পরিষ্কার এবং জল সরবরাহ, (ছ) মনুষ্য এবং গোমহিষাদির জীবন বীমা, (জ) জল সেচন, বাঁধ রক্ষা ও নির্ম্মাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদনদী সংস্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ, (ঝ) ক্রয় বিক্রয়, বাণিজ্য; শস্য গোলা রক্ষা, মূলধন সংগ্রহ, এবং (ঞ) আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া, ব্যায়াম। এইরূপ সমবায় কর্ম্মজীবনের পরিণতিতে নবযুগের আবির্ভাব করিবে। মূল্য দুই আনা।

দারিদ্রের আহ্বান—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান পূর্ব্ব। ইহাতে ভারতের ভয়াবহ মৃত্যু সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার আলোচিত হইয়াছে। মূল্য দুই আনা।

মহিলাশিক্ষা গোষ্ঠী।

অনুষ্ঠান পত্র।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

দরিদ্র মাতৃভূমিতে অর্থাভাবে কি গবর্ণমেণ্ট এবং কি দেশনেতৃগণ কেহই অন্নজল স্বাস্থ্য প্রভৃতি আশু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিরও অভাব মোচনে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না; এক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহাদের আন্দোলন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করা সময়ের অপব্যয় মাত্র। অথচ আবার এদিকে জনসাধারণের ও কুললনাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগরিত করিবার পূর্ব্বেও অন্নজল ও স্বাস্থ্যের অভাব কোনও প্রকারেই দূর হইতে পারে না। এক্ষেত্রে উপায় কি?—

উপায় যত স্বাভাবিক উপায়ে ও অনাড়ম্বরে পারা যায় সকলকে শিক্ষিত করিয়া লইবার চেষ্টা করা। উৎসাহী ত্যাগী দেশসেবক কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে অতি অল্পমাত্র ব্যয়েই জনসাধারণকে শিক্ষিত করা অসম্ভব নহে বটে কিন্তু কুলললনাগণের অবস্থা ভিন্নরূপ। দেশে অবরোধ প্রথা আছে। সে কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজে অল্পব্যয়ে শিক্ষা বিস্তার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সত্যই অসম্ভব—যে ভাবে বিষয়টা আমরা ভাবিয়া আসিতেছি সে ভাবে ভাবিতে থাকিলে সত্যই অসম্ভব। আবার এই অসম্ভবই সম্ভব হয় যদি আমরা নূতন ভাবে ভাবিতে—নূতন চোখে বিষয়টাকে দেখিতে পারি। আমরা যদি ঐ অবরোধবাসিনীগণের উপর নির্ভর করিতে—তাঁহাদের বিশ্বাস করিয়া এই ভারটা তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি। এই উদ্দেশেই মহিলাশিক্ষা গোষ্ঠির প্রস্তাব লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমার বক্তব্য এই যে মায়েদের সামান্যা জ্ঞান করিবেন না। শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা যে কর্ত্তব্য বোধ জাগাইতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি সেটা তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াই আছে। সেইটাকে উদ্দীপনা করুন—অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই করিয়া—লইবেন।

গোষ্ঠী অর্থে—club। ইহারই স্থাপনার দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃপুর মধ্যেই একত্রিত হইবার জন্য আহ্বান করা হউক—সেখানে শিক্ষিতা জাগা মেয়েদেরই মুখে দেশের সমাজের পৃথিবীর সংবাদ শুনিতে থাকিলে শীঘ্রই তাঁহারা জাগিয়া উঠিবেন। অশ্রদ্ধাতেই তাঁহাদের মন মরিয়া গিয়াছে। মেয়েদের মধ্যে যাহারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন তাঁহারা যদি শ্রদ্ধার সহিত আপনাদের স্বাধীন চিন্তার অংশ দিতে পারেন তাহা লইলে গৃহীতার মনও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে। তখন শীঘ্রই আপন আপন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নূতন নূতন পথ আবিষ্কারে বিদ্যার্থীনীরা নিজেই চেষ্টা আরম্ভ করিবেন। তারপর বাড়ীর পুরুষদের উৎসাহে যদি তাঁহারা বঞ্চিতা না হন, তবে দরিদ্রের হীন আয়োজনের মধ্যেই এই দরিদ্র দেশে বাঙ্গালার নারী-শক্তি গঠিত হইয়া যাইবে। নীরব গোপন কার্য্যই পরিণামে বিপুল ফল প্রসব করিবে

সংবাদ।

১। কলিকাতা রামকৃষ্ণমিশন ছাত্র নিবাসের ১৯২০ সালের কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। ইহার আরম্ভ ক্ষুদ্র হইলেও ব্রহ্মচারী অনাদি চৈতন্যের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সৎ চেষ্টায় ইহা শীঘ্রই একটি বালকগণের চরিত্রগঠনের আদর্শ স্থান হইবে সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আশা করিতে পারি। যাঁহারা ইহার বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১১৯।১ করপোরেসন ষ্ট্রীট কলিকাতায় পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। গত বর্ষে সাধারণ ছাত্র ছাড়া সাতটি গরিব ছাত্রের ভরন-পোষণ ও শিক্ষার ভার লওয়া হইয়াছিল—আর্থিক উন্নতির সহিত আরও দরিদ্রছাত্রের ভরন-পোষণ ও শিক্ষার ভার লওয়া হইবে।

২। মহীশূর রাজ্যের অন্তঃপাতী বাঙ্গালোর নগরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্র-নিবাসের ১৯১৯—২০ পর্য্যন্ত কার্য্যবিবরণী আমরা পাঠ করিয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার মহাশয়ের কার্য্য-তৎপরতায় ইহারও বিস্তৃতি আমরা শীঘ্র আশা করিতে পারি।

৩। কটক রামকৃষ্ণ সেবকসম্প্রদায়ের দশম বর্ষের কার্য্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। চণ্ডিপুর (মেদিনীপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও মঠের ১৯২০ সালের কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

৫। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ (প্রেসিডেণ্ট) এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ (ভাইস প্রেসিডেণ্ট) বিগত অক্ষয়তৃতীয়ায় মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র নিবাসের গৃহ প্রবেশ কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের নিবেদন।

আসাম কুলিগণের সাহায্য।

বিগত ১৯২০ সালে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সাধারণের নিকট হইতে মোট

২৩৯৪৫৷৷৶১৫ পাইয়াছিল। সহৃদয় দাতাগণের কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রদত্ত সাহায্য যেন মেদিনীপুর জেলায় ব্যয়িত হয়।

ঐ টাকার মধ্যে ১৪৬০৪৷৶০ গত বৎসর পুরী জেলায় কানাস্ গারিসাগোদা ও ভুবনেশ্বরে, কটক জেলার জেনাপুরে এবং মেনিনীপুর জেলায় ঘাটাল ও তমলুকে দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িত লোকদিগের সাহায্য কল্পে ব্যয় করা হয় এবং স্থির থাকে যে, অবশিষ্ট ৯৩৫১৷৷১৫ টাকায় গত চৈত্র ও বৈশাখে মেদিনীপুর জেলায় দরিদ্র চাষীদিগকে বীজধান ক্রয় করিয়া দিয়া সাহায্য করা হইবে। কিন্তু তমলুক প্রভৃতি স্থানে ঐ সময়ে অনুসন্ধান পূর্ব্বক দেখা গিয়াছে যে চাষীরা তাহাদের প্রয়োজন মত বীজ ধান্য ইতিপূর্ব্বেই যোগাড় করিয়া লইয়াছে এবং তাহাদিগকে ঐরূপ সাহায্য করিবার এখন আর কোনও প্রয়োজন নাই। মেদিনীপুর জেলাতেই ঐ টাকা ভবিষ্যতে অন্য কোন জনহিতকর কার্য্যে আবশ্যক মত ব্যয় করা যাইবে এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিতে না করিতেই অসামের চা বাগানের কুলীদের সমূহ অভাব ও দুরবস্থার কথা এবং খুলনা জেলার দারুন অন্নকষ্টের সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক কর্তৃপক্ষদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সেইজন্য ঐ টাকা এই সকল কার্য্যে ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাদিগের হস্তে ঐ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা মিশনের উক্ত সংকল্প নিশ্চয় অনুমোদন করিবেন এইরূপ ভাবিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া গোয়ালন্দ ও চাঁদপুরে সেবক পাঠাইয়া উক্ত টাকা হইতে দুর্দ্দশাপন্ন কুলীদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ৪৫০ জন কুলীকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া গোয়ালন্দ হইতে নৈহাটীতে পাঠান হইয়াছে। চাঁদপুরেও কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—সবিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

সমগ্র জগদ্‌ব্যাপী এক বিরাট আন্দোলন উপস্থিত। সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য অভিজাত এবং আভিজাত্যের কেন্দ্র নগর হইতে সভ্যতাকে পতিত, নিরন্ন কৃষক শ্রমজীবীর পল্লী-কুটিরে প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য দেশে এই নব গণ-বিগ্রহের সর্ব্বপ্রথম পুরোহিত হার্ডার এই দেবতার পূজা-পদ্ধতি প্রকাশ করিলেন। সেই চৈতন্যকে অধিক উপলব্ধি করাইবার জন্য সীলার তাঁহার নাট্য-পুরাণের সৃষ্টি করিলেন। হার্জেন সেই দেবতার প্রচার করিলেন যে পাশ্চাত্য 'ব্যক্তি সর্ব্বস্বতা' এবং প্রাচ্য 'সমূহজ্ঞানের' সমবায় না হইলে রুশিয়ার উন্নতি অসম্ভব এবং সেই উন্নতিকে অসংখ্য স্বাভাবিক এবং স্বাধীন পল্লীসমাজের বিকাশ তথা প্রাণশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পুস্‌কিনের ভাবোন্মত্ততা, তুর্গনিভের 'অতিমাত্র শিল্প ও সার্ব্বজনীনত্বকে' অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে টলষ্টয়ের অভূতপূর্ব্ব দরিদ্রপ্রেম, ডষ্টয়ভেস্কির হীনতা এবং পাপের মধ্যেও বিশুদ্ধ আত্মত্যাগ।

*　　　*　　　*

কিন্তু ভারতবর্ষে সেই গণচৈতন্য উপাসনার আদিগুরু আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ। তিনিই প্রথম তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি সহায়ে আবিষ্কার করিয়াছেন যে ভারতের উচ্চবর্ণেরা মৃত, নীচবর্ণেরাই যথার্থ জীবিত। কেন ?—না এই অভিজাত সম্প্রদায়ের আর নূতনত্ব জ্ঞান আদৌ নাই। এই নূতনত্ব হীনতাই প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যুর চিহ্ন। এক রকমের চাল চলন পোষাক, ধর্ম্মে স্বাধীনতা নাই, জীবনে তাহার কার্য্যকারিতা

নাই, নূতন আবিষ্ক্রিয়া নাই, কেবল গ্রামফোনের মত কথার কচ্‌কচি, যন্ত্রের মত প্রাণ হীন, প্রতি বিষয়ে শব্দ প্রমাণ কেবল "যেনাস্য পিতরো জাতাঃ"—আর এর ফল পর্য্যসিত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

* * *

যেখানে প্রাণ, চৈতন্য সেখানে মুক্তি, সেই গণবিগ্রহের স্তুতি—যা আচার্য্য বিবেকানন্দ ভারত-ভারতীকে শুনাইয়াছেন তাহা আজ আমরা উদ্বোধন পাঠকের নিকট উপহার প্রদান করিব। "আর্য্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন আমরা "ডম্‌ম্ম্‌" বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশহাজার বছরের মমি!! যাদের "চলমান শ্মশান" বলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন। ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, উহা তাদেরই মধ্যে, আর "চলমান শ্মশান" হচ্চ তোমরা—তোমাদের বাড়ী ঘর, দুয়ার মিউসিয়ম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখলেও বোধ হয়, যেন ঠান্‌দিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম! এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা, তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লঙ্‌ লুঙ্‌ লিট সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের দেখ্‌ছি বলে, যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ্‌। স্বপ্ন রাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি কচ্ছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্ত মাংস হীন কঙ্কাল কুল তোমরা, কেন শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্ব পুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্ন পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই, এখন ইংরাজ রাজ্যে অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার

কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকানে থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা একমুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়!—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন পেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে!"

* * *

ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হইতে আসিবে তাহা আচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া, ভারতের ছোট জাত কেন পূজার্হ আচার্য্য তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—"ঐ যারা চাষা-ভূষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট-জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ কোরে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রম ফলও তারা পাচ্ছে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ সভ্যতা, প্রাধান্য, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমরা নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের

ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য! আর তুমি, কে ভাবে এ কথা। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি? তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারিতা। আমাদের গরীবরা যে ঘর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে কর্ত্তব্য কোরে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাম হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে, কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি! তোমাদের প্রণাম করি।"

* * *

গরীবদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি—এই কথাটি স্বামীজি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন—"গরীব নিম্ন জাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠ্‌তে লাগলো। রাশি রাশি, অন্য দেশের, আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুন্‌লে বা না শুন্‌লে, বুঝ্‌লে বা না বুঝ্‌লে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে, কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভা মাত্র, দেশের বাহার! কোটী কোটী গরীব নীচ যারা তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্রে আসে যায় না, কায়-মন-বাক্যে যদি এক হয়। একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে,

সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ, বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।”

* * *

তাই আচার্য্য রুদ্র বিষাণের গভীরনাদে জড়নিদ্রা পরিহারের জন্য ব্যাকুলকণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন—“ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারানসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।”

(২)

মানুষ দুঃখ চায় না—চায় সুখ। কারণ সুখ জিনিষটা মানুষের স্বরূপ লক্ষণ, তাকে না আকাঙ্ক্ষা করে সে থাকতেই পারে না। অমৃতের সন্তান অমৃতকেই চায়, এ তার জন্মগত স্বত্ব। মরণকে উপেক্ষা করে সে অমর সুখের সন্ধানে ছুটচে, কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই মরণই তার সামনে এসে দাঁড়াচ্চে। সে যত্ন করে সংসার কাননে ঘুরে ঘুরে একটী সুখ-কুসুম হয়ত চয়ন কল্লে অমনি মরণ এসে সে কুসুম ছিন্ন করে তার হাতে তুলে দিলে দুঃখের ফল। বিজলী যেমন দমক দিয়ে দিশেহারা পথিকের চক্ষে নিবিড়তর তিমির আনে, তেমনি সংসারের এই ক্ষণিক সুখ মানুষের জীবনটাকে দুঃখতর করে তোলে।

* * *

অনন্ত সত্তা হচ্ছেন অনন্ত সুখ স্বরূপ। সেই অনন্ত সুখকে আমরা পেতে চাচ্চি ইন্দ্রিয়ের সসীমতার মধ্য দিয়ে। সসীমতার মধ্য দিয়ে সেই সুখ চাচ্চি বলে, যে সুখ আমরা পাই, তা ফুরিয়ে যায়। ফুরিয়ে যাওয়া মানে সেই প্রিয় বস্তুর অভাব হওয়া। এই অভাব বোধের নামই

দুঃখ। কিন্তু দুঃখকে আমরা চাই না কেন, আর সুখকেই আমরা চাই কেন? তার কারণ মানুষের স্বভাব হচ্চে নিজের "আমি"টাকে সর্ব্বদা অনুভব করা, জাগিয়ে রাখা। জল বল, ফল বল, চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, আকাশ বল, প্রাণ বল, এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত এই আমার 'আমি'টাকে নিয়ে। আমি না থাকলে কিছুই থাকে না—সে থাকার প্রয়োজন কি?

* * *

এখন এই আমির প্রকৃত স্বরূপ হচ্চে অসীম সুখ। আর সেই সুখ যখন অসীম তখন তার সত্তাও অনাদি অনন্ত। তাই মানুষ চায় অনন্ত জীবন। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল দেশকাল নিমিত্তে নিজের আমিত্ব আরোপ করে সে লক্ষ বার মরণকেই ভ্রমে জড়িয়ে ধরচে, তার অনন্ত জীবনের অভাব হচ্চে আর আসচে তার পরিবর্ত্তে দুঃখ। আবার যার সত্তা হ'ল অসীম, তার জ্ঞানও হ'ল অসীম। তা না হলে নিজ সত্তা জ্ঞানের অভাবে সে শূন্য। সে যত বড় তার জ্ঞানও তত বড়। এই 'আমি'র অনন্ত সত্তাজ্ঞান প্রতিরুদ্ধ হয়ে অভাব এসে তাকে দুঃখ দিয়ে যাচ্চে। জানাতেই মানুষের আনন্দ। সে চায় তার জ্ঞান অপ্রতিহত হ'ক, সে অনন্ত সুখ লাভ করুক কিন্তু গণ্ডির মধ্যে সে নিজেকে রেখেছে বলে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এসে তার সামনে সসীমতার অসংখ্য প্রাচীর সাজিয়ে তার অনন্ত সুখের অন্তরায় হয়ে রয়েছে—ফলে সেই একই অভাব ও দুঃখ।

* * *

মানুষ দুঃখকে ঘৃণা করে, কিন্তু দুঃখ যে কানে কানে সর্ব্বদা তার একটা উপদেশ দিয়ে যাচ্চে সেটা বধির মানুষ শুনতে চায় না। দুঃখ বলে—ওরে মানুষ আমি আসি তোর অন্তরের বস্তু জাগাবার জন্য, তোর গণ্ডি ভেঙ্গে দেবার জন্য। চোক কানের সসীম সুখের মধ্যে তুই আপনাকে বদ্ধ করতে চাস্, আমি তাই তোর চির সাথী হয়ে সেই সান্ত সুখের অন্তরায় হয়ে ফিরি। আমি কেবল আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জানিয়ে দিই 'ও তোর স্বরূপ নয়, তুই যে অনন্ত সুখের অধিকারী, অল্পে ত সুখ নাই, যা অল্প তা মর্ত্ত্য। তুই কেবল না বুঝে চোখের জল ফেলিস্। যত দিন

তুই আমায় ঘৃণা করবি তত দিন আমার স্পর্শ কেবল তোকে যাতনা দিয়ে যাবে, মরণের সাগরজলে তোকে ডোবাবে আর তুলবে।'

* * *

'কিন্তু কেমন করে তোমায় ঘৃণা না করে পারি! তুমি যে আমার স্বরূপের অভাব থেকে ওঠো, তোমায় আমি কি করে চাইতে পারি?' দুঃখ বলে—ঐ 'ভাব' আর 'অভাব' দুটো রেখা টেনে, তুই নিজের সুখের অন্তরায় হয়েছিস। যখন ভাব আর অভাব হবে তোর সমান, তখন তোর যথার্থ স্বরূপ উঠ্‌বে ফুটে; একবার আমায় ঘৃণা না করে ভালবেসে দেখ্, আমার তাপে পুড়্‌লে, আমার আগুনে জ্বললে, আমার ঘর্ষণের স্পর্শ পেলে 'ধূপ' কেমন গন্ধ দেয়, 'প্রদীপ' কেমন আলো করে, চন্দন কেমন অমৃত হয়। সাপ ভূমির উপর বুকে হেঁটে চলে কিন্তু যখন আঘাত পায় তখন গর্জ্জে শির তুলে দাঁড়ায়। মেঘে জল থাকলে ফল কি? কিন্তু যাই বিদ্যুৎ গিয়ে মেঘের বুক ছিঁড়ে দেয় তখন তার ধারায় হয় জগৎ তৃপ্ত।'

* *

ওগো দুঃখ শিক্ষা গুরু
মোক্ষ পথ দেও দেখায়ে,
রুদ্র স্পর্শে মুক্ত কর
সুখ আবরণ সরায়ে।
হৃদয় লোহ তন্ত্রী নীরব
বাজেনা পরশ কোমলে
যাতনা কঠোর তীব্র তালে
বাজাও আঘাতি সবলে।
ঋতু বসন্ত সুখ নগরীর
শীতের তোরণ তুমি হে
অখিল রাজ মন্দির দ্বারে
তাপস তাপ রূপেতে হে।

অদ্বৈতবাদ ও ব্যবহারিক প্রামাণ্য।*

(অধ্যাপক—শ্রীসুধেন্দুকুমার দাস এম, এ।)

"Every attempt to solve the laws of causation, time and space, would be futile, because the very attempt would have to be made by taking for granted the existence of these three. What does the statement of the existence of the world mean then? "This world has no existence." What is meant by that? It means it has no *absolute existence*. It exists only in relation to my mind, to your mind, and to the mind of everyone else. We see this world with the five senses, but if we had another sense, it would appear as something still different. It has, therefore, no real existence; it has no unchangeable, immoveable, infinite existence. Nor can it be called *non-existence*, seeing that it exists, and we have to work in *and through it*. It is a mixture of existence and non-existence." (Maya and Illusion.)

"This State of things has been called Maya. It has neither existence nor non-existence. You cannot call it existence, because that only exists which is beyond time and space, which is self-existent. Yet this world satisfies to a certain degree our idea of existence. Therefore it has an apparent existence.—" (Hints on Practical Spirituality.) Swami Vivekananda.

কি প্রকার জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যই বিশ্বমানবের এই মহা জীবনযাত্রার পথে চলিয়াছে তাহার প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায় মনুষ্য মাত্রেই আপনাকে জ্ঞানের আশ্রয়রূপে কর্ত্তা (প্রমাতা), তাহা ভিন্ন অন্যান্য যত বস্তু তাহাদিগকে জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় (প্রমেয়)—এই দুই প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব করিয়া দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের নানা প্রকার সংগ্রামের ভিতর

---

* ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে, আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ঊনষষ্টীতম জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

দিয়া যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভেদে পরিপূর্ণ এই দ্বৈতমূলক জ্ঞান যে কতদূর যথার্থ ও কতকাল স্থায়ী তাহা এক শ্রেণীর মনুষ্য বিশেষ গভীররূপে অনুসন্ধান না করিয়া ইহাকেই জীবনে চিরন্তন সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লয়।

আর এক শ্রেণীর অসাধারণ লোক আছেন যাঁহারা এইভাবে পূর্ব্বোক্ত অন্ধ বিশ্বাসের বশে পরিচালিত হইয়া জ্ঞাতাজ্ঞেয়রূপে বিভক্ত প্রত্যক্ষাদি দ্বৈতমূলক জ্ঞানকে চিরস্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা এই প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ামক ভেদাবগাহিজ্ঞান কতদূর সত্য ও তাহার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ শাশ্বত সত্য কতদূর প্রকাশ পাইতেছেন তাহা সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ণ সত্যের চিরন্তন তত্ত্ব বিশ্বের নিখিল মানবের সমক্ষে স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করেন। অদ্বৈতবাদের পূর্ণাবতার পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্কর এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। আর আধুনিক যুগে আমাদের নিতান্ত অন্তরতম সুহৃদ্ ও পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ যাঁহার বীরবাণীর মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া আমরা আজ এই পবিত্র স্থানে পরস্পরের শত প্রকার মত বৈচিত্র্যসত্ত্বেও সমবেত হইয়াছি তিনিও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অসাধারণ পুরুষ।

কেবল বিভিন্নতা এই যে আচার্য্য শঙ্কর প্রসন্নগম্ভীর সংস্কৃত বাণীর সহায়তায় কেবলমাত্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বিধাহীন, সঙ্কোচহীন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্লাবিত ভারতের বিরাট জনসংঘের মধ্যে যে তত্ত্বের বীজ বপন করিবার প্রবল উদ্যম করিয়াছিলেন সেই মধুর হইতে মধুরতম তত্ত্বই বর্ত্তমান যুগের ভারতের বৈদান্তিযতিশ্রেষ্ঠ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ভারত হইতে সুদূর আমেরিকা ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্রাজকের বেশে সিংহবিক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের জড়বাদ প্লাবিত জীবন সংগ্রামে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত নিখিল নরনারীর হৃদয়ে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য অগ্নিময়ী তীব্র ভাষায় দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবার জন্য জীবনব্যাপী বিপুল চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের অগ্রণী স্বামী বিবেকানন্দ জগৎতত্ত্ব কিরূপে বুঝিয়াছিলেন

এবং কি প্রকারে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শিরোভাগে তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রবন্ধ শেষে তাঁহারই কথার পুনরুল্লেখ করিয়া স্পষ্টতর করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিব। বস্তুতঃ স্বামীজি পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের চরণ-প্রান্তে শিষ্যরূপে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনের উপলব্ধ পরীক্ষিত সত্য তত্ত্ব দার্শনিক পরিভাষা পরিবেষ্ঠিত যুক্তির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন সেই তত্ত্বই দার্শনিকভাবে আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার পদাঙ্কানুসারী পরবর্ত্তী অদ্বৈতাচার্য্যগণ দার্শনিক যুক্তি পরম্পরা দ্বারা কি ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন তাহা দেখানই এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাংসারিক জীবনের যে সাধারণ জ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেই ভেদাবলম্বি জ্ঞানকেই (ordinary facts of consciousness) ভিত্তি করিয়া আচার্য্য শঙ্কর অপূর্ব্ব বিচার নৈপুণ্য সাহায্যে পূর্ণ অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপ অতি প্রাঞ্জলভাবে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

রূপরস-গন্ধাদি মনোরম পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা এই বিপুলা বৈচিত্র্যশালিনী ধরিত্রী দেবী যখন প্রত্যক্ষ ও তদাশ্রিত অন্যান্য প্রমাণের দ্বার দিয়া মানবের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন তখন সে মনে করে যে ধরিত্রীর এই রূপই বুঝি অপরিবর্ত্তনীয় সত্য এবং ইহাকে অতিক্রম করিয়া আর কোন তত্ত্বের মধুর উৎস বিদ্যমান নাই। সুতরাং মানব এই দ্বৈতমূলক সংসারাবস্থার জ্ঞানকেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞাতব্য তত্ত্বরূপে ধারণা করে। তখন সেই আত্মকৃত দ্বৈতের কল্পিত দুর্ভেদ্য দুর্গে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও প্রতিষ্ঠিত মনে করিতে তাহার আর কিছুমাত্র দ্বিধা থাকে না।

তাহার পর যখন অদ্বৈতবাদের প্রবল যুক্তিরূপ বজ্রনিনাদী আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে তাহার এত সাধের অসার দুর্গ চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্রধূলি কণার মত বিলীন হইবার উপক্রম হয় এবং মোহ-স্বপ্নে বিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয় তখন সে ব্যস্ত হইয়া স্বীয় দ্বৈতজ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার

জন্য নানাপ্রকার অসার বিরুদ্ধতর্কের অবতারণা করে। কিন্তু তাহার সেই সকল অন্তঃসার শূন্য যুক্তিসমূহ প্রতিপক্ষের দৃঢ় যুক্তির প্রবল বন্যায় ক্ষুদ্রতৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। অদ্বৈতবাদ শ্রুতিমূলক যুক্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করেন যে যে সমুদয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপর দ্বৈতবাদী এত দৃঢ় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন তাহার মূল অতিশয় শিথিল। গভীর বিশ্বাস ও অতুল সাহসের সহিত অদ্বৈতবাদী ঘোষণা করেন যে এই সমস্ত প্রমাণ প্রমেয় জ্ঞান অধ্যাসমূলক বা অবিদ্যাগ্রস্ত—ইহাই আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যের সর্ব্বপ্রথমে অধ্যাসভাষ্যে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন—"তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ"—অর্থাৎ আত্মা এবং আত্মভিন্ন আর যাহা কিছু পদার্থ যাহাদিগকে অনাত্মা বলা যাইতে পারে তাহাদের একটীকে আর একটীর উপর আরোপ অর্থাৎ অভিন্নরূপে যে জ্ঞান তাহাকেই অবিদ্যা এই আখ্যা দেওয়া যায় এবং এইপ্রকার অবিদ্যাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের লৌকিক ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সকল প্রকার ব্যবহারই নিষ্পন্ন হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনের জড়তা জ্ঞেয়রূপ অভিজ্ঞতার দ্বারা যে সাধারণ জ্ঞান মানুষ সদাসর্ব্বদা লাভ করিতেছে সেইজ্ঞান যদি অবিদ্যা হয় তবে কি তাহা একেবারে ভিত্তি হীন ও পরম সত্য হইতে বিচ্যুত বন্ধ্যার পুত্রের মত একান্ত অলীক ও নিতান্ত মূল্য হীন, এই প্রকার প্রশ্ন স্বভাবতঃই সকলের অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে এইরূপ জ্ঞান একেবারেই অলীক নহে। পূর্ণ সত্য না হইলেও ইহার ভিতরে সত্যের অভিব্যক্তি আছে। স্বামিজীর ভাষায়—Because it satisfies to a certain degree our idea of existence—এইজন্যই ইহা ব্যবহারিক সত্য। এই প্রকারে সত্যকে পূর্ণ সামঞ্জস্যরূপে ব্যক্ত করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদী পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য এই দুই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করেন। ব্যবহারিক সত্যের ঊর্দ্ধে পারমার্থিক সত্য বাস্তবিক অপরিবর্ত্তনীয়রূপে নিত্য প্রকাশ পাইতেছেন

এই তত্ত্ব দ্বৈতবাদী তাহার ব্যবহারিক গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। এই পারমার্থিক অনপেক্ষিত সত্যের স্থল হইতেই স্মরণাতীত কাল হইতে দ্বৈতাদ্বৈতের ভীষণ সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানেও এই সংগ্রামই ধর্ম্ম-দর্শন জগৎকে দুই পৃথক ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যে সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। এই ঘোর দ্বন্দ্বকলহের মধ্যে দ্বৈতবাদী তাঁহার দ্বৈতমূলক জ্ঞানের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রতিবাদ করেন যে সত্যের আবার পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই দুই প্রকার ভেদ পরিকল্পনা কেন। বস্তুতঃ এই দিক হইতেই আমরা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আচার্য্য রামানুজ কৃত শ্রীভাষ্যে ব্যবহারিক প্রমাণের বিরুদ্ধে আপত্তি দেখিতে পাই। তিনি শ্রীভাষ্যে শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বিরোধে শাস্ত্র প্রাবল্য নিরাশ নামক বিচার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ আপত্তির দ্বারা ব্যবহারিক প্রমাণের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"নমু ব্যবহারিক প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারোঽস্মাকমপি অস্ত্যেব। কোঽয়ং ব্যবহারিকো নাম, আপাত প্রতীতিসিদ্ধাবেব যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাবস্থিত ইতি চেৎ, কিংতেন প্রয়োজনম্; প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেঽপি যৌক্তিক বাধাদেব প্রমাণকার্য্যাভাবাৎ।" (শ্রীভাষ্য নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১১৩ পৃঃ)। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদি যদি বলেন যে ব্যবহারিক প্রমাণ প্রমেয় জ্ঞান ত আমাদিগের মতেও বিদ্যমান তবে জিজ্ঞাসা করি এই ব্যবহারিক পদার্থটী কি? যদি বল ব্যবহারিক অর্থ আপাততঃ যে প্রতীতি হইতেছে তাহার দ্বারা যাহা সিদ্ধ অথচ যুক্তির দ্বারা যখন তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে যাই তখন দেখি যে তাহার আর সেই রূপ নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি সেই ব্যবহারিকে কি প্রয়োজন? প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও যুক্তির দ্বারা যদি তাহার বাধ হয় তবে সেই বাধের জন্যই ত তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না; তবে সেই ব্যবহারিকের কি প্রয়োজন?

আচার্য্য রামানুজের এই আপত্তির অদ্বৈতবাদী কি উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে অদ্বৈতাচার্য্যগণ কি অর্থে ব্যবহারিক প্রামাণ্যের

ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখা উচিত। সেই জন্য প্রথমতঃ অদ্বৈতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আচার্য্য শঙ্কর এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসারী পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাতৃগণ কি অর্থে প্রমা, প্রমাণ এবং তাহাদিগের অবিদ্যামূলকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে দেখা কর্ত্তব্য।

আচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন—"কথং পুনরবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনিপ্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি। উচ্যতে। দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহংমমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। নহীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণ ইন্দ্রিয়ব্যাপারঃ সম্ভবতি। নচানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নসত্যসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। নচ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণ প্রবৃত্তিরস্তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি।" ইহার অর্থ ঃ—আশঙ্কা হইতেছে—প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য যে সমুদায় জ্ঞানের প্রমাণ আছে এবং বেদোপনিষৎ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র আছে তাহারা সকলেই কি প্রকারে অবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছে? উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—আমাদের সকল মনুষ্যের উত্তমরূপে জানা আছে যে এই দেহ এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে যদি অভিন্ন জ্ঞান না করি অর্থাৎ আমি ইন্দ্রিয়, আমি দেহ অথবা আমার ইন্দ্রিয় ও আমার দেহ এইরূপ যদি না ভাবি তাহা হইলে আমরা কখনও যে সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া নিজকে জ্ঞাতা বা প্রমাতা বলিতেছি সেই প্রমাতা হইতে পারি না।

অথচ আমরা যদি প্রমাতা না হই তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ প্রমাতাকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যকরী হয় তাহাদেরও কার্য্য হইতে পারে না। আমাদের যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহাদিগকে গ্রহণ না করিলে প্রত্যক্ষাদি অসম্ভব হয় ইহাও আমাদের বেশ জানা আছে। আমরা আরও জানি যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কোন না কোন আধারকে আশ্রয় না করিয়া হইতে পারে না। শরীরের

সহিত আপনাকে অভিন্ন অর্থাৎ আমার শরীর বা আমিই শরীর এই রূপ না ভাবিয়া কোন্ জগতে দেহের দ্বারা কোন্ কার্য্য করিয়াছে বা করিতেছে ইহাও দেখা যায় না। অথচ এই সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার আরোপের দ্বারা অধ্যাস না হইলে স্বভাবতঃ অসম্বদ্ধ আত্মা তাহারও প্রমাণে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে এইরূপ আত্মা ও অনাত্মা ইন্দ্রিয়াদির পরস্পরাধ্যাসকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও সকল শাস্ত্রের কার্য্য চলিতেছে।"

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রধান যুক্তি ইহাই যে—আমাদের আত্মা স্বভাবতঃই অসঙ্গ এবং সর্ব্ব প্রকার বিকার বিনির্ম্মুক্ত, সুতরাং তাহার বাস্তবিক প্রমাতৃত্ব হইতে পারে না; কারণ প্রমাতা হইলেই ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের আশ্রয়রূপে বিকৃত হইতে হয়। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার রূপ ক্রিয়ার আশ্রয় হইলেই আত্মাকে ক্রিয়া দ্বারা বিকৃত হইতে হইবে। ইহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"যদাশ্রয়াহি ক্রিয়া তমবিকুর্ব্বতী নৈবাত্মানং লভতে। যগ্যাত্মা ক্রিয়য়া বিক্রিয়েত অনিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত।" সূত্রভাষ্যের বিখ্যাত টীকাকার পণ্ডিতকেশরী বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী ব্যাখ্যায় এই যুক্তিরই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"প্রমাতৃত্বং হি প্রমাং প্রতি কর্ত্তৃত্বং। তচ্চ স্বাতন্ত্র্যম্। স্বাতন্ত্র্যং চ প্রমাতুঃ ইতর কারকা প্রযোজ্যস্য সমস্তকারক প্রযোক্তৃত্বম্। তৎ অনেন প্রমাকরণং প্রমাণং প্রয়োজনীয়ম্। ন চ স্বব্যাপারমন্তরেণ করণং প্রযোক্তুমর্হতি। নচ কূটস্থনিত্যঃ চিদাত্মা অপরিণামী স্বতঃ ব্যাপারবান্। তস্মাৎ ব্যাপারবদ্ বুদ্ধ্যাদি তাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ ব্যাপারবত্তয়া প্রমাণম্ অধিষ্ঠাতুমর্হতি ইতি ভবতি অবিদ্যাবৎ পুরুষ বিষয়ত্বম্ অবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বং প্রমাণানাম্ ইতি।

এই স্থলে ভামতীকার যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে—প্রমাতৃত্বের অর্থই যখন আত্মার ব্যাপারবত্ত্ব বিশেষ, তখন নিষ্ক্রিয় আত্মাতে তাহা বাস্তবিক পক্ষে হইতে পারে না। অথচ আত্মার প্রমাতৃত্ব যখন নিত্য ঘটিতেছে তখন ঘটনার অপলাপ কেহ

করিতে পারে না সুতরাং প্রমাতৃত্ব আত্মার উপর অধ্যস্ত ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না।

মানব মাত্রেরই যে ব্যবহার অধ্যাস বা অবিদ্যা-মূলক তাহা যাহারা বিচার ভিন্ন কোন কিছু গ্রহণ করিতে চাহেন না তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য রত্নপ্রভা-কার নিম্নলিখিত অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন।

"দেবদত্ত কর্তৃকঃ ব্যবহারঃ, তদীয় দেহাদিষু অহংমমাধ্যাসমূলকঃ।

অন্বয় ব্যতিরেকানুসারিত্বাৎ। যদ্ ইত্থং তৎ তথা, যথা মৃন্মূলঃ ঘটঃ ইতি প্রয়োগঃ। তত্র ব্যতিরেকং দর্শয়তি—দেহ ইতি। দেবদত্তস্য সুষুপ্তৌ অধ্যাসাভাবে ব্যবহারাভাবঃ দৃষ্টঃ, জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অধ্যাসে সতি ব্যবহারঃ ইতি অন্বয়ঃ স্ফুটত্বাৎ ন উক্তঃ। অনেন লিঙ্গেন কারণতয়া অধ্যাসঃ সিদ্ধতি ব্যবহারানুরূপ কার্য্যানুপপত্ত্যা বা ইতি ভাবঃ॥"

আচার্য্যশঙ্কর হইতে রত্নপ্রভা-কার পর্য্যন্ত বিখ্যাত ব্যাখ্যাতৃগণের পূর্ব্বোল্লিখিত সুনিপুণ যুক্তির দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় যে প্রমাণ প্রমেয়াদিরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা চরম সত্য নয়। এই কথা সিদ্ধ হইলে ইহা অবশ্যই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে, এই দ্বৈতমূলক ব্যবহারাবস্থারও উর্দ্ধে অপর এক অপরিবর্ত্তনীয় পরম সত্য বর্ত্তমান এবং সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম—যাহাতে অবিদ্যার সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসান। অতএব সেই পূর্ণ সত্যের উচ্চ ভূমি হইতে নিরীক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই বোধ হইবে যে, এই দ্বৈতমূলক ব্যবহারাবস্থার জ্ঞান সেই সত্য জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত নয়, বরং তাহারই আংশিক অভিব্যক্তি। এই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় জ্ঞানরূপে নিরন্তর ব্যবহৃত যে জীব ও জগত তাহা যদি সম্পূর্ণ অলীক হয় তবে জগৎ প্রপঞ্চ নিরধিষ্ঠান বিভ্রান্তি তুল্য হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদের সার সত্য পূর্ণ ও সকল প্রকার বিরোধের চরম সমন্বয় স্থল। সুতরাং এই প্রপঞ্চের সহিত তাহার যে বিরোধ আপাততঃ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় তাহারও উপশম করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদের সত্যের লক্ষণ একজন নবীন প্রতীচ্য দার্শনিকের ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়—"Truth must exhibit the mark of internal harmony or

again the mark of expansion and all-inclusiveness." এতাদৃশ সত্য কখনই প্রপঞ্চকে আপনার ক্রোড়ীভূত না করিয়া—পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। প্রপঞ্চকে একেবারে সত্যের বিরোধী অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ বলিলে প্রকারান্তরে যে সত্যকেই অসম্পূর্ণ বলা হয় এমন কি শূণ্যবাদেরও আশঙ্কা হইতে পারে একথা পূজ্যপাদ আনন্দগিরি গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"সর্ব্ববিশেষ রহিতস্য অদৃষ্টেঃ দৃষ্টেশ্চ বিপরীতস্য প্রাপ্তে ব্রহ্মণঃ শূণ্যত্বে প্রত্যক্তেন ইন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যাদি হেতুত্বেন কল্পিত দ্বৈত-সত্তা-স্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেন চ সত্বং দর্শয়ন্ আদৌ— "

উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যও "সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্"—ইত্যাদিকে ব্রহ্মের অস্তিত্বাধিগমের নিমিত্ত বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"উপাধিকৃতং মিথ্যারূপমপি অস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্প্য উচ্যতে সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্ ইত্যাদি।" বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদে দ্বৈত প্রপঞ্চের সহিত বিরোধেই যে চরম সত্যের অবসান হয় নাই তাই গীতাকার সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ভাষায় বলিতেছেন—"অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।"

সত্যের প্রকৃত স্বরূপ যে দ্বৈতাদ্বৈত (?) সমন্বয় তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য অদ্বৈতিগণ জগৎ প্রপঞ্চের ব্যবহারিক প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেন নাই। ব্যবহারিক প্রামাণ্যের অঙ্গীকার করা যে বৈদান্তিকগণের ছিন্নকন্থা সংস্কার নয় তাহা একজন আধুনিক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক মহোদয়ও নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"Reality under forms of our consciousness is and can only be the conditioned effect of the absolute reality; but this conditioned effect stands in indissoluble relation with its unconditioned cause; and being equally persistent with it, so long as the conditions persist, is to the consciousness supplying these conditions, equally real."

মহামহোপাধ্যায় অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার "সিদ্ধান্তলেশ" নামক গ্রন্থে সত্যত্বের উৎকর্ষাপকর্ষক তারতম্য স্বীকার করিয়া ব্যবহারিক প্রামাণ্যের "যাবদ্

ব্রহ্মজ্ঞানমবাধাত্বম্" এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্ত পরিভাষাকার বিষয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"এবং নিরূপিতানাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যম্ দ্বিবিধম্।
ব্যবহারিকতত্ত্বাবেদকত্বং পারমার্থিকতত্ত্বাবেদকত্বঞ্চ ইতি।
তত্র ব্রহ্মস্বরূপাবগাহি প্রমাণ ব্যতিরিক্তানাং।
সর্ব্বপ্রমাণানাম্ আদ্যং প্রামাণ্যম্॥"

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের "তৎ তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে—

"দেহাত্ম প্রত্যয়োঃ যদ্বৎপ্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বৎ এবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥"

প্রত্যক্ষাদির পারমার্থিক বস্তুকে গোচর করিতে পারে এইরূপ প্রমার করণত্ব নাই বলিয়া বেদান্তবাক্যসকলেরই যে কেন ঐরূপ প্রমা-করণত্ব বলা হয় সে বিষয়ে বেদান্তপরিভাষার মণিপ্রভা-টীকাকার রামকৃষ্ণাধ্বরি নিম্নোদ্ধৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যো"যস্য প্রমাণস্য বিষয়ো ভবতি তস্মিন্নেব বিষয়ে তস্য প্রমাণস্য প্রমাজনকত্বং ইতি ব্যাপ্তে বেদান্তানাং কালত্রয়াবাধ্যস্য জীবব্রহ্মৈকরূপ বিষয়স্য বিদ্যমানত্বেন জীবব্রহ্মৈক্যরূপ-বিষয়ে সংসর্গানবগাহি প্রমাজনকত্বং সম্ভবত্যেব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণানান্তু জীবব্রহ্মৈক্যরূপ বিষয়াভাবাৎ ন পারমার্থিকবস্তু গোচর প্রমাকরণত্ব-মিতিভাবঃ॥"

অর্থাৎ—যে বস্তু যে প্রমাণের বিষয় হয় সেই বস্তুতেই সেই প্রমাণের প্রমাণ জন্মাইবার সামর্থ্য থাকে এইরূপ ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই বেদান্তের যখন কালত্রয়াবাধ্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ বিষয় সিদ্ধ, তখন তাহার সেইরূপ বিষয়ে বিশেষ্য-বিশেষণ বিনির্ম্মুক্ত (Devoid of relational form of thought)" যে প্রমাজ্ঞান তাহার উৎপাদকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহের বিষয় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন নয়, সুতরাং পারমার্থিক বস্তুকে গোচর করিতে পারে এইরূপ প্রমাজ্ঞানের জনক তাহারা হইতে পারে না। বস্তুতঃ এ সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সত্যকে সমগ্রভাবে গোচর না করিয়া তাহাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিছিন্ন করিয়া (a what and a

that, an existence and a content)—যাহারা একান্ত অবিশ্লিষ্ট তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া) আমাদিগের নিকট আনিয়া উপস্থিত করে। এই জন্যই তাহাদিগের মধ্য দিয়া সত্য আংশিকরূপে অভিব্যক্ত হয়। অদ্বৈতবাদে সত্যের এই বিচ্ছিন্ন ও আংশিক প্রকাশকেই ব্যবহারিক সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে। এই ব্যবহারিক সত্যত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া পারমার্থিক সত্য বা ব্রাহ্মীস্থিতিই বেদান্তের চরম উপদেশ, তাহা শ্রোতার হিতৈষিণী শ্রুতি অতি বিশদভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা—যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ॥"

অদ্বৈতের এই সারসত্য নির্দ্দেশের কিরূপ আশ্চর্য্য অনুরূপোক্তি আমরা আধুনিক বিখ্যাত দার্শনিক F. H. Bradley মহোদয়ের Appearnce & Reality নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই তাহা, নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি সেখানে বলিতেছেন—

"But to reach a mode of apprehension, which is quite identical with reality, surely predicate and subject and subject and object and in short the whole relational form, must be merged. * * * It would be *experience* entire, containing all elements in harmony."

এই কথাই মাণ্ডুক্য উপনিষদে ঋষি "অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণম-চিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং, প্রপঞ্চোপশমং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ—" এই সকল কথায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্রিয়াকারক ফল লক্ষণ সংসারের মধ্য দিয়া সাধারণ অধিকারীকে নিরস্ত সর্ব্বোপরি নির্ব্বিশেষ অদ্বয় তত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে এই ভেদমূলক সংসারের ব্যবহারিক প্রামাণ্য অঙ্গীকার না করিয়া যে এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই সে কথা আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা এই দুই প্রকার নিষ্ঠা বিভক্ত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আচার্য্য বলিতেছেন—"এতস্যাঃ বুদ্ধের্জন্মনঃ প্রাক্ আত্মনোদেহাদিব্যতি-

রিক্তস্য কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক পূর্ব্বকো মোক্ষ সাধনানুষ্ঠান নিরূপণ-লক্ষণো যোগ......এবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিঞ্চ আশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে ভগবতা বিভক্তে ভগবতৈব উক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্তৃত্বাকর্তৃত্ব-একত্বানেকত্ব বুদ্ধ্যাশ্রয়য়োঃ একপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা।"

অর্থঃ—জন্ম প্রভৃতি ছয় প্রকার বিকার আত্মার হইতে পারে না, এই কারণ আত্মা অকর্তা,—এইরূপ যে সাংখ্যবুদ্ধি সেই বুদ্ধির উদয় হইবার পূর্ব্বে আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন হইলেও, কর্তা ও সুখদুঃখের ভোক্তা এই প্রকার নিশ্চয় হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিবেক পূর্ব্বক, পরম্পরাক্রমে মোক্ষলাভের কারণ যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণকে যোগ বলা যায়; এই যোগ বিষয়ক বুদ্ধি যোগবুদ্ধি। আত্মার কর্তৃত্ব ও অনেকত্ব জ্ঞান থাকিলে লোকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং আত্মার অকর্তৃত্ব ও একত্বজ্ঞানই প্রকৃতজ্ঞান নিষ্ঠার কারণ; এই জন্য এক পুরুষ একই কালে কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠাকে আশ্রয় করিবে, ইহা সম্ভব নয় দেখিয়াই ভগবান্ সাংখ্য ও যোগবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে বিভক্ত করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ক্রিয়া-কারক ভেদমূলক ব্যবহারাবস্থার কর্ম্ম যে পারমার্থিক জ্ঞান নিষ্ঠা লাভের উপায় তাহা আচার্য্য স্পষ্টভাবে গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের "যাবানর্থঃ উদপানে" ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যে বলিতেছেন:—"তস্মাৎ প্রাক্ জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থ স্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্।" অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকার প্রাপ্তি না হয় সে পর্য্যন্ত কর্ম্মাধিকারী জীবের কূপ তড়াগাদি ফল স্থানীয় হইলেও কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

ইহার পর তিনি "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে ব্যবহারাবস্থায় সত্যত্বের তদুচিত যে অপলাপ করা অসম্ভব তাহা আরও পরিস্ফুট ভাবে বলিতেছেন—"প্রাক্ বিদ্যোৎপত্তেঃ অবিদ্যাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমানা ক্রিয়া কারক ফল ভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্ম হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। নাপ্রমাণ বুদ্ধ্যা গৃহ্যমানায়াঃ কর্ম্ম হেতুত্বোপপত্তিঃ।

.........নহি আত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি।" অর্থাৎ—বিদ্যার উদয় হইবার পূর্ব্বে অবিদ্যাপ্রমাণ বুদ্ধির বিষয় হইয়া ক্রিয়া, কারক ও ফল ইত্যাদি নানাপ্রকার ভেদের রূপ ধারণ করিয়া সকল প্রকার কর্ম্মের হেতু হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাকে অপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে সে আর কর্ম্মের হেতু হইতে পারে না। কিন্তু আত্মার স্বরূপ যখন অধিগত হয় তখন এই অবিদ্যাসম্ভূত প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই প্রকার প্রমাণ-প্রমেয়-লক্ষণ জ্ঞান ফলবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ; এই নিমিত্তই সে সার্থক, এতদ্ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র প্রয়োজন বা মূল্য নাই। এ ফলবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ বলিয়াই এইরূপ জ্ঞানের আপেক্ষিক অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, এই কথা আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে আরম্ভণাধিকরণে বলিতেছেন—"তত্রৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—ব্রহ্ম-প্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিত ব্রহ্ম দর্শনাদেব ফল সিদ্ধৌ সত্যাং যত্তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকার পরিণামিত্বাদি তদ্ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে, ফলবৎ সন্নিধৌ অফলং তদঙ্গমিতিবৎ ন তু স্বতন্ত্র ফলায় কল্পতে। অর্থাৎ—এক্ষণে ইহা নির্ণীত হইতেছে যে ব্রহ্মপ্রকরণেতে যখন সকল-বিশেষ-ধর্ম্ম-রহিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে দর্শন করিলেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলা হইতেছে, তখন সেইস্থলে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হন —এই যে সকল অফল কথাও শ্রুত হইতেছে, সে সকল ব্রহ্মদর্শনের উপায় বলিয়াই উল্লিখিত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের কোন পৃথক্ স্বতন্ত্র ফলের কথা বলা হইতেছে না। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিলে যেমন সকল পুরুষার্থ সিদ্ধিরূপ ফল পাওয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হন এইরূপ সৃষ্টির বিষয় জানিলে অন্য কোন পৃথক্ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে সৃষ্ট্যাদি দর্শন ব্রহ্মদর্শনের উপায় হয় বলিয়া সহায়তা করে মাত্র।

অদ্বৈতবাদী প্রপঞ্চকে পারমার্থিক সত্য বলিতে যে অস্বীকৃত হন তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে, অদ্বৈতের অভেদ জ্ঞানের দ্বারা এই অভেদাবলম্বি প্রপঞ্চ জ্ঞান বাধিত (?) হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাকে

অবাধিত সত্য বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? এইজন্যই আনন্দগিরি বলিতেছেন—"ভেদস্য লোকসিদ্ধস্য অপূর্ব্বফলবদভেদ বিরোধেন সত্যত্ব কল্পনা যোগাৎ। কিঞ্চযদ্যুভয়োরেকদা ব্যবহারঃ স্যাৎ তদা স্যাদপি সত্যত্বম্। নৈবমস্তি। একত্ব জ্ঞানেন চরমেণ অনপেক্ষেণ নানাত্বস্য নিঃশেষং বাধাৎ, শুক্তিজ্ঞানেনেব রজতস্য ইত্যর্থঃ অপিচান্ত্যমিতি॥" ইহার অর্থঃ—লৌকিক ব্যবহারের দ্বারা স্থিরীকৃত যে ভেদ সেই ভেদের যখন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা লভ্য অপূর্ব্ব ফলবৎ অভেদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে তখন সেই ভেদ পারমার্থিক সত্য একথা বলা যায় না। অধিকন্তু যদি লোকসিদ্ধ ভেদ এবং ব্রহ্মজ্ঞান-জন্য অভেদ এই উভয়ের একই সময়ে ব্যবহার সম্ভবপর হইত তাহা হইলেও না হয় ভেদের সত্যত্ব বলা যাইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বশেষ যে, একত্বজ্ঞান—যাহা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না—সেই জ্ঞানের দ্বারা নানাত্বজ্ঞান নিঃশেষ রূপে বাধিত হইয়া যায় অর্থাৎ নানাত্বের আর কোন চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রমের পর ইহা শুক্তি 'এই জ্ঞানের দ্বারা রজত একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় তখন ভেদ বা নানাত্বকে' কি প্রকারে অনাপেক্ষিক অবাধিত সত্য বলা যায়?

যে পর্য্যন্ত পূর্ণ সত্য লাভ করিতে না পায়া যায় সে পর্য্যন্ত যে লোক ব্যবহারের অপলাপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, প্রত্যুত তাহাদিগের প্রামাণ্য রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আচার্য্যশঙ্কর স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া সূত্র ভাষ্যের দ্বিতীয়াধ্যায়ে অভাবাধিকরণে বলিতেছেন —"নহি অয়ং সর্ব্বপ্রমাণ প্রতিষিদ্ধো লোকব্যবহারোঽন্যৎ তত্ত্বমনধিগম্য শক্যতেঽপহ্নোতুং অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ।" অর্থঃ—ভেদকে অবলম্বন করিয়া এই যে জাগতিক লোক-ব্যবহার,—যাহা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় সকল প্রমাণের দ্বারাই নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে—সেই লোক ব্যবহারকে যে পর্য্যন্ত পূর্ণত্ব লাভ না করা যায় সে পর্য্যন্ত অপলাপ করা যায় না; কেন না আমরা সকলেই উত্তমরূপে জানি যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন নিয়ম না হয় ততক্ষণ

পর্য্যন্ত লোকে সাধারণ নিয়মকেই অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নির্ব্বিশেষ পূর্ণ সত্যকে লাভ করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভেদ পরিপূর্ণ এই সাংসারিক ব্যবহারকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া ইহারই মধ্য দিয়া ইহাকে অতিক্রম করিবার জন্য চলিতে হইবে—ইহাই উপরের কয়েকটী কথায় জ্ঞানিগুরু শঙ্কর আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যবহারিক সত্যের প্রমাণ্য সমর্থক অদ্বৈতাচার্য্যগণের যে সমুদয় উক্তি এ পর্য্যন্ত আলোচিত হইল তাহাতে কোন কোন ব্যক্তির হয়ত এই প্রকার গুরুতর ভ্রমাত্মক আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাধারণ জাগ্রদ-বস্থায় আমরা জাগতিক ব্যাপারের মধ্যদিয়া নানাপ্রকার ভেদ সম্বলিত যে সত্যকে গ্রহণ করিতেছি সর্ব্বোত্তম অনাপেক্ষিক অবাধিত সত্যের প্রকাশ বোধহয় তাহারই অধীন; দার্শনিক পরিভাষায়—সোপাধিক প্রপঞ্চ হইতে নিরুপাধিক ব্রহ্মের যেন কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। বাস্তবিক এ প্রকার সংশয় যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তাহা আচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে 'প্রপঞ্চ ব্রহ্ম স্বভাব কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চ স্বভাব নহেন' এইরূপে অনেক স্থলে জিজ্ঞাসুকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

পরিণামিনী পৃথিবীর যে ভেদময় রূপ সেইরূপে সে যে কিছুতেই সত্যব্রহ্মের সহিত সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত হইতে পারে না এই কথা অমলানন্দ যতি প্রবর শাস্ত্রদর্পণে একটী সুন্দর শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"তত্ত্বে শ্রুত্যুপপত্তিব্যপগতে দ্বৈতস্য তদ্‌গ্রাহিনঃ
প্রামাণ্যং ব্যবহারকারিবিষয়ং মিথ্যাপিসদ্‌বোধকম্।
মায়া যন্তরপীশ্বরস্য মুখতঃ কূটস্থতাম্নানতো
দৃষ্টান্তৈঃ পরিণামধী ব্রহ্মৈকমেকান্ততঃ॥"

অর্থ:—শ্রুতি এবং শ্রুতিমূলক যুক্তির দ্বারা দ্বৈতের তত্ত্ব চলিয়া গেলে দ্বৈতগ্রাহি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য ব্যবহারিক বিষয়কে লাভ করিয়া মিথ্যা হইলেও অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয়।

এদিকে তিনিই আবার দৃঢ়তার সহিত সংসারাবস্থায় ব্যবহারিক

প্রামাণ্যের প্রয়োজনীয়তা অতি সুন্দরভাবে বলিতেছেন—"এবং শ্রুতি ব্রহ্মবগতে কার্য্যস্থ অতাত্ত্বিকত্বে, অভেদগ্রাহি প্রত্যক্ষাদেঃ অর্থক্রিয়াসমর্থ-বস্তু বিষয়ত্বে বাধাভাবাৎ তাদৃশ বস্তু পরিচ্ছেদকত্বমেব প্রামাণ্যম্। নহি কুম্ভাদেরুদকাহরণাদি হেতুত্বং প্রত্যক্ষাদি সিদ্ধং বাধ্যতে।"

এই কয়েকটী কথার ভিতর অমলানন্দের প্রধান হৃদয়গ্রাহিনী যুক্তিটী এই যে, প্রপঞ্চ বা কার্য্য যদি ব্রহ্মের সত্যত্ব হিসাবে মিথ্যাই (মিথ্যা অর্থ একেবারে সত্য লেশশূন্য নয়) হয় তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী কলসী যে জল আনিবার হেতু এবং সেইজন্যই যে তাহার মূল্য বা সার্থকতা আছে তাহা ত অস্বীকার করিতেছেন না।

এই যুক্তির ভিতরে দর্শন ও ধর্ম্ম জগতের একটী গুরুতর তথ্য লুক্কায়িত আছে। তথ্যটী এই যে ঘটনামূলক জ্ঞানের (facts) অপলাপ পূর্ব্বক সত্য নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়া সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে বিরোধ, স্থাপনের পরিবর্ত্তে ধ্বংসে উপনীত হওয়া অদ্বৈত কেন, কোন দর্শন বা কোন ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

সুতরাং অদ্বৈতবাদীর অতি সরল সহজ কথা এই যে, ভেদকে অবলম্বন করিয়া তাহার সাহায্যে আমরা যে সত্যকে উপলব্ধি করিতে যাই তাহার মধ্যে সত্য যে একেবারেই ধরা দেয় না তাহা নয়; আবার তাহাতেই যে সত্য নিঃশেষভাবে আপনার যথার্থ সমগ্রস্বরূপে প্রকাশ পায় তাহাও নয়। প্রকৃতপক্ষে সত্য অদ্বৈতে নির্ব্বিশেষ ভাবেই আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া এই ভেদকে কুক্ষিস্থ করিয়া নেয়; কিন্তু ভেদের আর এই 'রূপ' থাকে না। ভেদ যখন নিজে অভেদে আত্মবিলোপ করিয়া পূর্ণ সত্যের মধুর উজ্জ্বল মূর্ত্তির অমল প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তখনই পূর্ণসত্য সাধকের হৃদয়ে "তত্ত্বমসি" বাণীতে ঘোষিত হয়। আমাদের পূজ্যপাদ অন্যতম অগ্রণী বৈদান্তিক যতিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিময়ী ভাষায় অদ্বৈতের চরমাবস্থা—

"In the centre, at the heart of things, is no one to be mourned for, and none to weep. For He hath penetrated all things—the Pure one, the Formless, the Bodiless, the Stainless, He the knower, He the Great root, the Self-Existent."

অতএব জগতের সকল সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত সম্মিলিত হইয়া আমরা ব্যবহারাবস্থার সত্যতাশৃঙ্খল জ্ঞানাসির দ্বারা ছিন্ন করিয়া অদ্বৈতের পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করি—

"চোদ্যং বাপরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈতভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপিতদুত্তরং।
ন বিরোধো নচোৎপত্তি র্নবন্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মমুক্ষু নৈব মুক্তঃ ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

শান্তি।

মহাশূন্য স্বরূপ প্রকাশ
যাহে হয় সৃষ্টির উদয়
পুনঃ যাহে সকল বিকাশ
মিলে হয় নিধনেতে লয়।
আঁখি জল ইহাতে মিলায়
হাস্য মুখ প্রকাশের তরে
জীবনের যাহাতে বিলয়
সেই লোক শান্তি নাম ধরে

ক্ষেত্রীর মহারাজের প্রতি।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

(অনুবাদক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।)

ঢেকে রাখে মেঘে যদি তপনে খানিক,
আঁধারে আকাশ যদিও ছায়,
তথাপি সাহস ধর—হে বীর নির্ভীক,
জানিও বিজয় আগত-প্রায়!

মণ্ডল-ভ্রমণে বদ্ধ শীত, গ্রীষ্ম রয়,
আবর্ত্ত (ই) তোলে তরঙ্গ যত,
আলো-ছায়া-সম তারা করে অভিনয়,
রহহে অটল বীরের মত!

জীবন-কর্ত্তব্য বটে অতি দুঃখময়,
সুখ—বৃথা, অনিত্য ইহার;
অস্পষ্ট আঁধারে ঘেরা পরিণাম হয়;
তথাপি সাহস বাঁধি' দৃঢ় ব্রতে বীর-হৃদি,
আগে চল ভেদিয়া আঁধার!

কর্ম্ম না বিফল হ'বে উদ্যম না বৃথা যা'বে,
শক্তি নষ্ট হয় যদি,—আশা প্রতিহত,
তোমার নেতৃত্বে পরে জাগিবে অনেক নরে,
শুভকার্য্য নিস্ফল না হ'বে দৃঢ়-ব্রত!

জ্ঞানী ও পুণ্যাত্মা বটে বিরল সংসারে,
তথাপি তা'রাই চির পথ-প্রদর্শক!
সাধারণে সে প্রভাব জানে বহু পরে,
না শুনে কাহার (ও) কথা—চালাও চালক!

বহু-দর্শী ঋষিকুল চালাবে তোমারে,
সর্ব্ব-শক্তিমান হ'বে তোমার সহায়,
মঙ্গল-আশীষ তুমি পা'বে ভারে ভারে,
সদ্ধর্ম্ম, ধর্ম্মাত্মা, যেন তোমারে চালায়!

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

বৈদ্যনাথ।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

নমস্কারপূর্ব্বকম্—

বৈদ্যনাথে পূর্ণ বাবুর বাসায় কয়েক দিন আছি। শীত বড় নাই, শরীরও বড় ভাল নহে—হজম হয় না, বোধ হয় জলে লোহাধিক্যের জন্য। কিছুই ভাল লাগিল না—স্থান, কাল ও সঙ্গ। কাল কাশী চলিলাম। দেওঘরে অচ্যুতানন্দ—র বাসায় ছিল। সে আমাদের সংবাদ পাইয়াই বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বড় জিদ করে। শেষে আর একদিন দেখা হইয়াছিল—ছাড়ে নাই। সে বড় কর্ম্মী, কিন্তু সঙ্গে ৭।৮টা স্ত্রীলোক বুড়ি জয় রাধেকৃষ্ণই অধিক—রুচি ভাল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা! তাহার কর্ম্মচারীরাও আমাদের অত্যন্ত ভক্তি করে। তাহারা কেহ কেহ উহার উপর বড় চটা—তাহারা তাহার নানাস্থানের দুষ্কর্ম্মের কথা কহিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে আমি—র কথা পাড়িলাম। তোমাদের তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রম বা সন্দেহ আছে—তজ্জন্যই বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি। তাঁহাকে এখানকার বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরাও বড় মান্য ও ভক্তি করে। তিনি অতি বালিকা অবস্থায়—র কাছে আসিয়াছিলেন, বরাবর স্ত্রীর ন্যায় ছিলেন। এমন কি,—র মন্ত্রগুরু ভগবান্ দাস বাবাজীও জানিতেন যে, তিনি উহার স্ত্রী। তাহারা বলে, উঁহার মা তাঁহাকে—র কাছে দিয়া গিয়াছিল। যাহাহউক তাঁহার এক পুত্র হয় ও মরিয়া যায় এবং সেই সময়ে—কোথা হইতে একটা জয় রাধেকৃষ্ণ বামনি আনিয়া ঘরে ঢোকায়, এই সকল কারণে তিনি তাহাকে

ফেলিয়া পলান। যাহাহউক, সকলে একবাক্যে স্বীকার করে যে, তাঁহার চরিত্রে কখন কোনও দোষ ছিল না, তিনি অতি সতী বরাবর ছিলেন এবং কখন স্ত্রী স্বামী ভিন্ন—র সহিত অন্য কোনও ব্যবহার বা অন্য কাহারও প্রতি ছিল না। এত অল্প বয়সে আসিয়াছিলেন যে, সে সময়ে অন্য পুরুষ সংসর্গ সম্ভবে না। তিনি—র নিকট হইতে পলাইয়া যাইবার পর তাহাকে লেখেন যে, আমি কখনও তোমাকে স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যবহার করি নাই, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির সহিত আমার বাস করা অসম্ভব। ইহার পুরাতন কর্ম্মচারীরাও ইহাকে সয়তান ও তাঁহাকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে ও বলে, তিনি যাবার পর হইতেই ইহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।

এ সকল লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধী গল্পে আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না। এ সকল ভাব-সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে না তাহার মধ্যে এত পবিত্রতা—আমি romance * মনে করিতাম, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি—সকল ঠিক। তিনি অতি পবিত্র, আবাল্য পবিত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সকল সন্দেহের জন্য তুমি আমি সকলেই তাঁহার নিকট অপরাধী। আমি তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম করিতেছি ও অপরাধেব জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি মিথ্যা-বাদিনী নহেন। তাঁহার ধর্ম্মে ঐকান্তিকী আস্থাও চিরকাল ছিল, একথাও শুনিলাম।

এক্ষণে ইহাই শিখিলাম, ঐ প্রকার তেজ মিথ্যাবাদিনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে না।

আপনার পীড়া এখনও আরাম হইতেছে না। এখানে খুব পয়সা খরচ না করিতে পারিলে রোগীর বিশেষ সুবিধা বুঝি না। যাহা হয় বিবেচনা করিবেন। সকল দ্রব্যই অন্যত্র হইতে আনাইয়া লইতে হইবে।

বশম্বদ নরেন্দ্রনাথ।

---

* কাল্পনিক গল্প মাত্র।

(২)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

C/o জর্জ্জ ডবলিউ হেল,
৫৪১নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো,
২৬শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয় ভগিনীগণ,

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্থানী কবি তুলসীদাস তাঁর রামায়ণের ভূমিকায় বলেছেন,—

"আমি সাধু অসাধু উভয়েরই চরণ বন্দনা করি, কিন্তু হায়, উভয়েই আমার নিকট সমভাবে দুঃখপ্রদ। অসাধু ব্যক্তি আমার নিকট আসিলেই তাহাতে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয় আর সাধু ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যায়।

আমি বলি ঠিক কথা। আমার পক্ষে ভগবানের প্রিয় সাধু ভক্তগণকে ভালবাসা ছাড়া সুখের ও ভালবাসার জিনিষ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই—আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এক মরণ তুল্য যন্ত্রণা।

কিন্তু এসব অনিবার্য্য। হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি! তুমি বাজ্‌তে থাক—তুমি যেদিকে চালাও, আমি সেই দিকে চলছি। হে মহৎস্বভাবা মধুর প্রকৃতি সহৃদয় পবিত্রস্বভাবাগণ তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে আমার যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা আমার পক্ষে প্রকাশ করা অসম্ভব। হায় আমি যদি ষ্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকগণের মত সুখ দুঃখে নির্ব্বিকার হতে পারতাম!

আশা করি তোমরা সুন্দর গ্রাম্য দৃশ্য বেশ উপভোগ করছো।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ গীতা।

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন আর প্রাণীগণ যাহাতে জাগ্রত থাকেন, আত্মজ্ঞানী মুনির পক্ষে তাহা রাত্রি-স্বরূপ।

এই জগতের ধূলি পর্য্যন্ত যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে কারণ, কবি বলতে পারেন, জগৎটা হচ্ছে মড়ার উপর একরাশ ফুলের মালা চাপান মাত্র। যদি পার উহাকে স্পর্শ কোরো না। তোমরা স্বর্গের হোমা পাখীর শাবক—তোমাদের পদ এই মলিনতার পঙ্কিল পল্বলস্বরূপ জগৎ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তোমারা আকাশের দিকে আবার উড়ে যাও।

"যে আছ চেতন ঘুমায়োনা আর।"

"জগতের লোকের ভালবাসার বস্তু অনেক আছে—তারা তাদের ভাল বাসুক—আমাদের প্রেমাস্পদ একজন মাত্র—সেই প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। জগতের লোক যাই বলুক না, আমরা সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। তবে যখন তারা আমাদের প্রেমাস্পদকে আঁকতে যায় ও তাঁকে নানারূপ কিম্ভূত কিমাকার বিশেষণে বিশেষিত করে, তখনই আমাদের ভয় হয়। তাদের যা খুসি তাই করুক, আমাদের নিকট তিনি কেবল প্রেমাস্পদ মাত্র—তিনি আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম—প্রিয়তম—আর কিছুই নন।

তাঁর কত শক্তি কতগুণ আছে—এমন কি আমাদের কল্যাণ করবারও কত শক্তি আছে তা কে জানতে চায়? আমরা একেবারেই বলে রাখছি আমরা কিছু পাবার জন্য ভাল বাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই, আমরা কিছু প্রতিদান চাই না, আমরা কেবল দিতে চাই।

হে দার্শনিক, তুমি আমার তাঁর স্বরূপের কথা বলতে আসছ তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা তার গুণের কথা বলতে আসছ? মূর্খ তুমি জান না, তাঁর অধরের একটী মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বার হবার উপক্রম হচ্ছে। তোমার ওসব বাজে জিনিষ পুঁটলি বেঁধে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটী চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পার কি?

মূর্খ তুমি যার সামনে ভয়ে হাতজোড় করে রয়েছ, যাঁর সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা কোরছো, আমি আমার হার নিয়ে বগলসের মত তাঁর গলায় দিয়ে তাতে একগাছি সুতো বেঁধে তাঁকে আমার সঙ্গে

সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছি—ভয়, পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যান।

ঐ হার প্রেমের হার—ঐ সূত্র—প্রেমের জমাট বাঁধা ভাবের সূত্র। মূর্খ, তুমি ত এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝ না যে, যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি কি জান না যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জান না যে যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচতেন?

আমি এই যে পাগলের মত যা তা লিখলাম, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করবে। অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার ব্যর্থপ্রয়াসরূপ আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবে—ইহা কেবল প্রাণে প্রাণে অনুভব করবার জিনিস। সদা আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি—
তোমাদের ভ্রাতা—
বিবেকানন্দ।

অব্যক্ত।

মৃত্যু সংজ্ঞা ইহা বিলীনতা
দুই ব্যক্ত মাঝারে প্রাণের,
ঝটিকান্তে স্থির নিস্তব্ধতা
যাহে উঠে ঝঞ্ঝা সুগভীর॥

---

* বন্দৌঁ সন্ত অসন্তন চরণা।
দুখপ্রদ উভয়বীর কুছু বরণা॥
বিছুরত এক প্রাণ হরি লেই।
মিলত এক দারুণ দুখ দেই॥

শ্রীবুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।*

(অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ)

নেপাল ও সিংহল দেশে প্রচলিত বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্তে একটী অলৌকিক গল্প আছে। কোন সময়ে মহারাজ শুদ্ধোদন শিশু সিদ্ধার্থকে সঙ্গে লইয়া হৈমন্তিক উৎসব উপলক্ষে কৃষিক্ষেত্রে গমন করেন। প্রাচুর্য্য ও প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের অনুভবে সকলেই তখন আনন্দে বিভোর। নৃপতি সিদ্ধার্থকে বিস্মৃত হইয়া পরিজন ও প্রকৃতি বর্গের সহিত আনন্দে মগ্ন। এদিকে বালকরূপী ভগবান্ একাকী একান্তে পরিত্যক্ত রহিয়াছেন। সংস্কার বশে তিনি তখন এক বৃক্ষতলে বদ্ধ পদ্মাসনে আসীন হইয়া ধ্যান নিবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিগ্বিভাগ হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিগন্তে হেলিয়া পড়িলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হওয়াতে অবশেষে সকলের রাজকুমারকে মনে পড়িল। তখন সকলে আসিয়া দেখিল যে দিবস পরিণামের সহিত সমস্ত প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৃক্ষ সকলের পত্র শীর্ণ—ছায়া বিরল ও পশ্চিম সূর্য্যের বিপরীত দিকে আপতিত। কিন্তু রাজকুমার সিদ্ধার্থ যে বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন—সে বৃক্ষের ছায়া হেলিয়া পড়ে নাই—তাহার পত্রাবলী প্রাতঃকালেরই মত ঘন ও সরস এবং স্থির অবিকম্পিতভাবে গৌতমের দেহকে বেষ্টন করিয়া আতপ হইতে রক্ষা করিতেছে।

ভারতবর্ষ, রাজা শুদ্ধোদনের মত প্রায় সহস্র বর্ষব্যাপ্ত নানা ঘটনার মধ্যে ভগবান্ তথাগতকে একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যখন প্রাচীর সূর্য্য প্রতীচীর ললাট-গগনে উজ্জ্বল হইয়া শোভিতেছে—এবং এসিয়া ভূখণ্ডের বিভিন্ন রাজ্য সকল ও জনসঙ্ঘ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—সেই সময়ে রাজরাজেশ্বরীরূপিনী অতীত ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধদেবকে এদেশ আবার স্মরণ করিতেছে। আমরা দেখিতেছি

---

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৩২৮ সালের বুদ্ধোৎসব সভায় পঠিত।

চারিদিকে পুনর্ব্বার বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব ও ইতিহাস জানিবার জন্য আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগিয়াছে। বিদ্বেষবুদ্ধিকে পরিহার করতঃ প্রসারিত বাহুতে আমরা ভারতমনীষীর সেই অবিনশ্বর নিদর্শনকে পুনর্ব্বার স্বাগত করিতেছি। আর বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে দেখিতেছি গৌরবের রাজচ্ছত্র শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উপরে এখনও পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিতেছে।

সমগ্র পৃথিবীর ১৬০ কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ কোটি অধিবাসী এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। আচার ব্যবহার জাতি ও অবস্থা সকল বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে অসংখ্য প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও ইহারা এখনো পরম কারুণিক শাক্যমুনির চরণ তলে ভক্তিভরে প্রণত হয় এবং তাঁহার মধুর উপদেশাবলীর অনুশীলন করতঃ দুঃখ জ্বালা হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে; এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ জাপান হইতে পশ্চিম প্রান্তস্থ তাতার পর্য্যন্ত, উত্তরে মঙ্গোলিয়া হইতে দক্ষিণে সুমাত্রা ও যবদ্বীপ পর্য্যন্ত অগণিত প্রাণী আজও তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করতঃ দুঃখে সান্ত্বনা, উৎসবে অপ্রমাদ, প্রিয়জন বিচ্ছেদে শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হয়—তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর আলোকে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করে। প্রতিনিয়ত অসংখ্য মন্দিরে আজও কপিলবাস্তুর সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে ধূপ দীপ জ্বলে ও আরতি কিঙ্কিনী ধ্বনিত হইয়া থাকে। কত স্তূপ, কত স্তম্ভ, কত গুহা তাঁহার জীবন কাহিনীর চিত্র অঙ্গে ধারণ করতঃ পবিত্র হইয়াছে—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কত চৈত্য, কত বিহার, কত সঙ্ঘালয় সেই এক মহাপুরুষের বিভূতির সাক্ষ্য দিতেছে—তাহার কে পরিমাণ করিবে? যদি শিষ্য প্রশিষ্যের সংখ্যা লইয়া ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে নির্ব্বাণোপদেষ্টা ভগবান্ তথাগতের আসন সকলের উচ্চে।* কেননা প্রতিবৎসর সম্যক্ বিভিন্ন এক কোটি মানবকে তিনি ভক্তরূপে পাইয়াছেন এই ভাবে গণনা করিলেও বুঝা যায় যে কুশীনগরে তাঁহার তিরোভাব হইতে আজ খ্রীষ্টীয় ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত দ্বিসহস্রাধিক কোটি মানব তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্রের তলে শান্তি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু মস্তক গণনা দ্বারা ধৰ্ম্ম মত সম্বন্ধে এরূপ বিচার করা কাহারও মনঃপূত হইবে না। তাহা না হইলেও এই অগণিত জনসমুদ্র কেন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী বৌদ্ধ ধৰ্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছে—কেন যে ইহাকে পরম শান্তির আকর ভাবিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে—তাহার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন নহে! একজন প্রতীচ্য দার্শনিক বলিয়াছেন —মহাপুরুষ তিনিই, যাঁহার সত্তা ও কার্য্যকলাপের সহিত আমার কোনরূপ সম্বন্ধ বা সাকৰ্ম্ম্য আছে বা থাকিতে পারে। যদি এরূপ সংযোগ সূত্র না থাকে তাহা হইলে তিনি আমার পক্ষে মহাপুরুষ নহেন—কেন না তাঁহার বাসনা বা ভাবনা, প্রয়াস বা অনুভূতির দ্বারা আমি চালিত হইতে পারি না। ইন্দ্রদেব সহস্র বৎসর তপস্যার ফলে কোন অতীন্দ্র বিভূতি লাভ করিলেন এ কাহিনী আমার অলস বৃত্তিনিচয়কে তপশ্চর্য্যায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যদি দেখি আমার সমাবস্থ কোন পুরুষ—অতিমৰ্ত্ত্য বা অতিমানুষ না হইয়াও —আধ্যাত্মিক বা মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন—তখন সেই আপনার জনের উদ্যম ও সহিষ্ণুতায় আমি অনুপ্রাণিত হই—আশান্বিত হই—সচেষ্ট হই। ভগবান্ তথাগতকে যে পৃথিবীর এত লোক জীবনের আদর্শ ও পথনির্দ্দেশক বলিয়া বরণ করিয়াছে তাহার কারণ ইহাই—তিনি অতিমৰ্ত্ত্য বা অতিমানুষ ঐশ্বর্য্যের দাবী করেন নাই— দৈবী শক্তির বা ঐশ্বরিক প্রেরণার অধিকারী বলিয়া নিজেকে খ্যাপন করিতেন না। বারাণসীসন্নিকটস্থ মৃগদাবে যখন প্রথম ধৰ্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয় তখন অষ্টবিধআর্য্যমার্গোপদেশ প্রসঙ্গে ভগবান্ তথাগত অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিলেন যে তাঁহার মতামত বেদাধ্যয়নের ফলে বা অন্যের উপদেশ শ্রবণের ফলে গঠিত হয় নাই—কিন্তু তাঁহার নিজ যুক্তি ও সহজ সংস্কারের প্রয়োগেই লব্ধ হইয়াছিল। সাধারণ ধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম্মের মূল যুক্তিতর্কের অতীত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। ফলে তাঁহাদিগের উপদেশ হয় অবিচারিত চিত্তে গ্রহণ করিতে হয় অথবা একেবারে প্রত্যবায় করিতে হয়। ভগবান বুদ্ধদেব সাধারণ কৰ্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের এই উচ্চ ও অবিচারণীয় ভিত্তি হইতে নামিয়া আসিয়া

সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনার নিম্নস্তর আশ্রয় করিলেন ফলে প্রত্যেক মানব স্বাধীন আলোচনার দ্বারা তাঁহার উপদেশ ও শাসন পরীক্ষা করিতে সুযোগ পাইল। তিনি স্বল্পজন বোদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নিজ উপদেশ বিতরণ না করিয়া আপামর জনসাধারণের প্রযুক্ত পালি ভাষায় প্রচার কার্য্য সম্পাদন করেন—ফলে বৌদ্ধের আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটী সুগম পথ সৃষ্ট হইল।

যে দিক্ হইতেই এই মহাপুরুষের জীবনীর আলোচনা করা যাউক না কেন, ইহাতে একটী পূর্ণ মানবতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে দুই জাতীয় চরিত্র দেখিতে পাই প্রথমতঃ যাঁহারা জন্মাবধি সংসারের ভোগ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন সত্ত্বার অখণ্ড বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ যাহারা সাংসারিক ভোগে লিপ্ত হইয়াও অন্তর্নিহিত বিরক্তির বলে পদ্মপত্রস্থ বারিবিন্দুর মত অথবা সূচ্যগ্রস্থ সরিষার মত প্রপঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, যীশুখ্রীষ্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ শাক্যমুনি, মহম্মদ ও চৈতন্যদেব। এখানে "প্রথম" ও "দ্বিতীয়" বিশেষণ দিয়া ইহাঁদের একটীকে উচ্চে ও অপরটিকে নীচে বলিয়া ইঙ্গিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে দুই ছত্র ইংরাজি কবিতা এই স্থলে মনে পড়ে—

It is better to have looked and lost
I have never to have loved at all.

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়া যিনি তাহাদিগকে হেলায় ত্যাগ করিতে সমর্থ তিনি চির বিরক্তদিগের সমকক্ষ কিনা বিচার করিতে চাহি না কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা যে ব্যাপক ও পূর্ণতর তাহা নিশ্চিত—এবং সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহার সাধর্ম্ম্য যে অধিকতর তাহাও স্পষ্ট। এই জন্যই শ্রীভগবানের নবম অবতার শাক্য পূর্ণাবতংসের জীবন কাহিনী আমাদিগের এত চিত্তাকর্ষক এত শিক্ষাপ্রদ। শ্রাবস্তী নগরীতে মচ্ছরি কোসিয় সেট্‌ঠিকে তথাগত শিক্ষা দিয়াছিলেন—

যথাপি ভমরো পুপ্‌ফং বণ্ণ গন্ধং অহেঠয়ং
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী বরে।

ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে বর্ণ ও গন্ধ নষ্ট না করিয়া মধু আহরণ করিয়া পলায়ন করে মুনিও সেইরূপ জনপথে বিচরণ করিয়া থাকেন। সিদ্ধার্থ যখন গৃহত্যাগ করেন তখন পার্থিব ভোগের সামগ্রী সকল—আকাঙ্ক্ষার বস্তু নিচয় চারিদিক হইতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেছিল, কিন্তু—

উয্যুঞ্জন্তি সতীমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে
হংসা ব পল্ললং হিত্বা ওকমোকং নহন্তিতে।

স্মৃতিমান্ উদ্যোগী পুরুষ যাহারা তাঁহারা গৃহে সুখ পান না। হংস যেমন পল্লল ত্যাগ করতঃ চলিয়া যায় তাঁহারাও সেরূপ গৃহ ত্যাগ করেন। নানা দেশ ও নানাজাতির অসংখ্য ভক্তের মানসমরাল সুগতদেব যখন এইরূপ পল্ললের প্রায় কপিলবাস্তুর রমণীয় প্রাসাদ ও বিলাসোপবন প্রীতিনিবদ্ধ হৃদয়া মহিষী ও সদ্যোজাত কুমার, জনক ও সহচর-বৃন্দকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যান—তখনকার সে বিষাদের দৃশ্য কত ভক্ত কবির মহাপরিনিষ্ক্রমণ কল্পনা, ও লেখনীকে উচ্ছ্বাসিত করিয়াছে? এই মহা প্রব্রজ্যার এই মহাপরিনিষ্ক্রমণের কাহিনীতে কারুণ্যের অনন্ত উৎস নিহিত আছে—ইহা অগনিত জীবের হৃদয়ে যুগে যুগে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা Detroit সহরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন I wish I had one infinite small part of Buddha's parts—প্রকৃতই, মৈত্রী, করুণা, মুদিতার অবতার ভগবান তথাগতের কার্য্যাবলীতে যে উদার ও মহান্ অপরিমেয় বল অথবা কুসুম সুকুমার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বর্ণনার অতীত। সমস্তই যেন দূরে দিক্‌চক্রবালের প্রান্তস্থিত অদ্রিরাজ হিমালয়ের অবয়ব সংস্থানের মত—শ্যামল ও নয়নাভিরাম—বিস্তৃত ও কোমল সকলই সজীব ও সরস সহৃদয়তায় ও সহানুভূতিতে প্রাণ স্পর্শী। কোথাও রুক্ষতা বা কর্কশতার লেশ নাই—নির্দ্দয়তার চিহ্ন নাই। তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে মধুর প্রেম যেন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সর্ব্বত্র বহিয়া যাইতেছে। সুজাতার আতিথ্য স্বীকারে, পিতার আদেশে বৃদ্ধাবস্থায়

কপিলবাস্তু প্রত্যাবর্ত্তনে, প্রিয় সহচর আনন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সঙ্ঘ মধ্যে ভিক্ষুনীর স্থান নির্দ্দেশে, তাঁহার এই পেলব হৃদয়ের পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাই। মুণ্ডিত মস্তক, মণ্ডিত শ্মশ্রু শুষ্ক পীতবসন ভিক্ষুশিরোমণি যখন নিজ পিতৃরাজধানী কপিলবাস্তুতে ভৈক্ষ্যচর্য্যা অবলম্বন করিলেন—তখন অভিমানিনী অবিক্ষামা শীর্ণদেহযষ্টি যশোধারার সহিত বহু বৎসর পরে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পার্শ্বচর শিষ্যদ্বয়কে তিনি আদেশ করিলেন, ভিক্ষুধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইলেও বিচ্ছেদ বিহ্বলা যশোধারা যদি তাঁহাকে স্পর্শ করে যেন নিবৃত্ত করা না হয়। উন্মত্তার প্রায় ছুটিয়া আসিয়া যশোধারা তাঁহার পদে পতিতা হইলেন। কিন্তু ভিক্ষুর শান্ত ও স্থির মুখাকৃতি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল—

"ইদানীমাবয়োর্ম্মধ্যে সরিৎ সাগর ভূধরাঃ"

তিনি কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন—উভয়ের মাঝে অনন্ত ব্যবধান। সে সময়ে ভগবান তথাগতের ধৈর্য্য অটল, বিরক্ত অথচ করুণ তথাগতের হৃদয়ে কি ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল—কে বলিবে? মাধ্যাকর্ষণ শক্তির লোপ হইলে, পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রশান্ত সাগরের অনুদ্বেল জলরাশির ভিতর কি স্রোত বহে—তাহার কে ধারণা করিবে? তিনি অবিকম্পিত স্বরে অবিক্ষুব্ধ কারেঙ্গিতে জাতকের একটী গল্প বলিয়া জন্মজন্মান্তরেও যে যশোধারা তাঁহার প্রতি এমনই অনুরক্তা ছিলেন তাহা বিবৃত করিলেন। ইহার পর চল্লিশ বৎসরাধিক গত হইলে অশীতি বর্ষ বয়সে শাক্যসিংহ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। পাবা নামক স্থানে চুন্দ বলিয়া পরিচিত এক অন্ত্যজের গৃহে তিনি অতিথি হন। চুন্দ নিজ আচারানুসারে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার জন্য তরুণ বরাহ মাংসের সহিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দেয়। আহারান্তে দ্বিপ্রহরের পর তিনি কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুষ্পাচ্য বরাহ মাংসাহারে উদরের পীড়ায় যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, অর্দ্ধপথে কুকুৎস্থা তীরে তীব্র পিপাসায় কাতর হওয়ায় নিত্য সহচর আনন্দ নদীর জল আনিয়া তাঁহার পিপাসা শান্তি করিল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সেই নদীতে শেষবার স্নান করিলেন। প্রদোষে কুশীনগরে উপনীত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় আনন্দকে

নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আমি গত হইলে চুন্দকে বলিও যে সে ভবিষ্যৎ জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হইবে—কারণ চরম সময়ে আমি তাহারি অন্ন গ্রহণ করিয়াছি। বলিবে আমি নিজ মুখে কথা বলিয়াছি। বোধিবৃক্ষ তলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে সুজাতার দান এবং মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বে চুন্দের এই দান—এই দুইটী সকল দান মধ্যে প্রথিত ও ধন্য জানিবে।” এসিয়ার ভাস্কর—জগজ্জ্যোতি বুদ্ধদেবের এই অন্তিম কাহিনী পড়িতে পড়িতে হৃদয় শান্তরসে আপ্লুত হয়, এই মহাপরিনির্ব্বাণের কথার আলোচনা করিতে করিতে সংসারের অনিত্যতা মানস সমক্ষে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই অনিত্যতা উপলব্ধি করাইবার জন্য শ্রীভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তথাগত বলিতেন অনিত্য বস্তু নিচয়ে যে তৃষ্ণা তাহাই দুঃখের কারণ। এই তৃষ্ণা পরিহার করিলে দুঃখেরও অন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত মানবের পক্ষে এই তৃষ্ণা পরিহার অতি দুরূহ। একমাত্র উপায়—অষ্টবিধ আর্য্যমার্গ অবলম্বন করতঃ নির্ব্বাণ মুখে অগ্রসর হওয়া। এই পথ ধরিতে গেলে প্রদীপ স্বরূপ হইবে—প্রজ্ঞা ও ভূতদয়া। প্রজ্ঞার সাহায্যে মানরসত্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। জেতবনে রূপনন্দ থেরীকে সম্বোধন করতঃ তথাগত দেহের স্বরূপ পরিব্যক্ত করিলেন—

অট্‌ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিত লেপনং
যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্খো চ উহিতো।

অস্থির নগর নির্ম্মিত হইয়াছে—মাংস ও রক্তে তাহা লিপ্ত—জরা, মৃত্যু, অভিমান ও কাপট্য (ম্রক্ষ) তাহার অধিবাসী। অনেক অন্বেষণের পর নির্ব্বাণের অধিকারী এই গৃহের নির্ম্মাতার সন্ধান পাইয়া থাকেন।

গহ কারক দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে কামুকা ভগ্‌গা, গহকুটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয় মজ্ঝাগা।

হে গৃহকারক এইবার তোমায় দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার সকল কাষ্ঠ দণ্ড ভগ্ন হইয়াছে—গৃহকুট নষ্ট

হইয়াছে। নির্ব্বাণ গত আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেহগেহের নির্ম্মাতা হইতেছে তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ ও মোহ—কাষ্ঠদণ্ড সকল, গৃহকূট-অবিদ্যা।

বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি রহস্যের সমাধান করিতে ব্যস্ত নহে। এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সত্বেও সে রহস্য অসমাহিতই রহিয়াছে। মালুঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বিশ্ব কি শাশ্বত বা অশাশ্বত ? "উত্তরে বোধিসত্ব নীরব রহিলেন। সমবেত মনুষ্য জাতির মনীষা আজও এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মূক রহিয়াছে। কিন্তু কর্ম্ম ব্যাপৃত মনুজের মনস্তত্বের সম্বন্ধে এবং সমাজ বদ্ধ জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ রাশি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তরে সঞ্চিত আছে—তাহা মানব জাতির চিরন্তন ও সাধারণ সম্পদ—তাহার মূল্য এখনও অপরিহীন ও অক্ষয্য। বৌদ্ধ গ্রন্থের চরম শিক্ষা এই যে কর্ম্মের সহিত কর্ম্ম ফলের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, ইহার ব্যতিক্রম নাই। এই কর্ম্ম ফল বর্ত্তমান জন্মেই ভুক্ত না হইতে পারে কিন্তু তাহা নষ্ট হইবার নহে—দেহের উপচয় অপচয় স্থিতি ও নাশের অপেক্ষা না করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের এই অনিবার্য্য স্রোত বহিয়া যাইতেছে ও যাইবে। যিনি এই স্রোতের প্রবর্ত্তক তিনিই কল্যাণ কর্ম্ম দ্বারা ইহার নিবর্ত্তক হইতে পারেন—অন্যে নহে। জেত বনে ভগবান শিখাইলেন—

অত্তনাহব কতং পাপং অতনা সঙ্কিলিস্পিত
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনাহব বিসুজ্ঝতি
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাহঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোকতে।

স্বয়ং পাপ করিলে (জীব) স্বয়ং ক্লিষ্ট হইতে হয়। নিজে পাপ না করিলে জীব নিজে বিশুদ্ধ থাকে; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি আত্ম নিষ্ঠ অন্য অন্যকে শুদ্ধ করিতে অসমর্থ। আর্য্য ঋষিরা বলেন—উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মান-মবসাদয়েৎ। সংসারে পাপ ও দুঃখের হ্রাসের জন্য তাই গৃহী শ্রমণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই উদ্যম করিতে হইবে। জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম—অপ্রমাদ ও বীর্য্য অবলম্বন করা। দ্বেষ, হিংসা নিবারণের অমোঘ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া তথাগত বলিলেন—

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীক কুদাচন।
অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধাম্মা সনন্তনো।

এ জগতে বৈরের দ্বারা বৈরোপশম হয় না। অবৈরেরদ্বারা বৈর শান্ত হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীর যাবতীয় মানবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিলেন—

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো
সুসুখং বব জীবাম আতুরেসু অনাতুরা
আতুরেসু মনুসেস সু বিহরাম অনাতুরা
সুসুখং বত জীবাম উস্সুকেসু অনুস্সুকা
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা।

এস বৈরিগণের মধ্যে বৈরহীন হইয়া আমরা সুখে বিচরণ করি,—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান প্রভৃতি ক্লেশাতুরগণের মধ্যে এস আমরা অনাতুর হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। পঞ্চকামাসক্ত মনুজগণের মধ্যে এস আমরা অনুৎসুক বা অনাসক্ত হইয়া আনন্দে বিচরণ করি। রিপুর আকর্ষণে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান জীবগণ কবে এই আহ্বান স্বীকার করিয়া সমস্বরে শুদ্ধ সঙ্কল্পভরে বলিবে—"ওম্"? তখনি বোধ করি বোধিবৃক্ষতলে পদ্মাসনাসীন বোধিসত্বের যুগ যুগ ব্যাপী ঐ ধ্যান যে ধ্যান বেষ্টন করিয়া ষড়ঋতুর নৃত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়াছে—যাহার চতুষ্পার্শ্বে মারের লীলা আজ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে—সেই নিবাত নিষ্কম্প ধ্যানের অবসান হইবে। তখন যুগপৎ মেত্তভাবনা, করুণা-ভাবনা, মুদিতা ভাবনা, অশুভ ভাবনা ও উপেক্ষা ভাবনায় মুদ্রিত ঐ নয়নপদ্মযুগল উন্মিলিত হইবে। স্থির শান্তিতে অকুঞ্চিত ঐ অধর পল্লবে ঈষৎ স্মিতরেখা অঙ্কিত হইবে ঝঞ্জায়ত স্থানুসম ঐ শরীর দণ্ডায়মান হইবে এবং আসন পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয় বুদ্ধ প্রসারিত উত্তান করে শান্তি বিতরণ করিতে করিতে ভক্তি বিস্ময় বিনম্র মানব জাতির অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

সুখের কথা।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

তোমরা সুখের কথা কহিতে ভালবাস। সত্যই ত, দুনীয়ায় সুখ চায় না কে? যে বৈজ্ঞানিক ইহকাল পরকাল ভুলিয়াছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসকে পর্য্যন্ত সগর্ব্বে উড়াইয়া দিয়াছে, প্রত্যক্ষবাদী সাজিয়া বলিয়াছে—যতটুকু চক্ষে দেখিতেছি তাহাই সব, অতীন্দ্রিয় যাহা কিছুর কথা সকলই কল্পনাবাজি। তাহারও সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত উচ্ছ্বাসের মূলীভূত উৎস—প্রভূততমের প্রচুরতম সুখ সাধন। আবার ঈশ্বর ও পরকাল যে পূজানিরত ধার্ম্মিকের অবলম্বন তাঁহারও সমস্ত মন একাগ্র লক্ষ্যে সন্ধান করিতেছে—সুখস্বরূপ ভগবানের শ্রীচরণ আর সুখেরনিলয় স্বর্গ। আবার তত্বজ্ঞ জ্ঞানীশিরোমণি জগতের নিগূঢ় রহস্যের প্রান্তে দাঁড়াইয়া সত্যের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা নির্দ্দেশে তাঁহার নির্দ্দেশকে বিশেষিত করিতেছেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

নিশ্চেষ্ট পাদপ তাহারও পরিচর্য্যা করিয়া দেখ সুখের স্পর্শে কত সে পুষ্ট হইয়া উঠে। নির্ব্বোধ পশু তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাক সুখেরই সাড়ায় পুলকে আত্মহারা হইয়া সে তোমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে। ছেলের জাত যত্ন বুঝে মানুষ ভালবাসায় আপন হয় সকলি এই সুখের সন্ধান।

কিন্তু—একবার বলত অকুণ্ঠিত সরল চিত্তে—পাওয়ার দিক দিয়া, জীবনে দিনের পর দিন কত দিন ত অতিবাহিত হইয়া চলিল—সুখ মিলিল কি? সাধকের মুখে করুণ সহানুভূতির বক্তৃতায় শুনিলাম—

—কিন্তু কোথা সুখ
মৃত্যু মুখে পশে শেষে।

কবির কণ্ঠে তরল উচ্ছ্বসিত আবেগে রোদনময়ী বেদনগীতি শুনিয়া চক্ষু মুছিলাম—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল!"

আর সংসারের জীর্ণ নাটকে অভিনেতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কোন মর্ম্মচ্যুত কথা বাহিরিতে শুনিলাম—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!"

এইত আর এক দিক। সংসারে আছে সুখের প্রার্থনা সুখের অন্বেষণ—নাই সুখ। বহুদিন সেই সনাতন যুগ হইতেই এমনি বিধান চলিয়া আসিতেছে! এ আজিকার তোমার আমার নিরাশা নহে। তবুও কিন্তু সংসার সংসার, তবুও কিন্তু জীবনের লক্ষ্য সুখের অন্বেষণ। নিবৃত্তি নাই। ভ্রমের পর ভ্রম সংশোধনের পর সংশোধন—কত ভাঙা গড়া নূতন নূতন প্রবর্ত্তন তবুও বিশ্ব মানবের মনের পরিবর্ত্তন নাই, তাহার গতিপথ দিগন্তর আশ্রয় করিল না—সে ওই একই পথে চলিবে।—ওই সুখ চাহিবে, পাইবে না, হা হুতাশ করিবে, আবার চাহিবে। একি বিস্ময়কর ব্যাপার! সত্যই বিস্ময়!—এক পরম গুহ্য বিচিত্র রহস্য! আর তাহারই সমাধান ওতঃপ্রোতঃ ভাবে একে অপরের সহিত মিশিয়া গিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আমাদের বিভ্রম বাধাইতেছে! এই বিভ্রমজাল ছিন্ন করিতে পার তুমি মানুষ তোমাতে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছে। না পার, তুমি যন্ত্রারূঢ় প্রকৃতির লীলাপুত্তলী—প্রাণের স্পন্দন সঞ্চালিত জড়ের সমবায় মাত্র।

কি বিচিত্র সমারোহেই না মানুষ বাঁধিয়াছে তাহার জগৎরূপী এ ঘর। জগৎ বলিব না, বলিলে হয়ত উপযুক্ত সম্ভ্রম সহযোগে এ নাম উচ্চারণ করা হইবে না! যুগ যুগান্ত ধরিয়া যে জাতির পর জাতির ইন্ধন জমা হইয়া মানবের এই স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহার এই গৌরবের বস্তু—এই civilization—আর কি ইহাকে ছোট নামে ডাকা যায়? এই যে রাজস কর্ম্মচণ্ডতা আর তামস অনুভূতির মূলাধার রূপী—একটা জমাট বাঁধা ভাব, এই যে মানবের নাকি প্রাণবস্তুঃ বিকাশ (practical world) যাহার স্থূল চিত্র, সেই বস্তুকে ক্ষুদ্র একটী মাত্র শব্দে জগৎ বলিয়া কেমন করিয়া ডাকি? তাই ডাকিতেছি civilization। সুখের লাগিয়া বিশ্ব মানব যে ঘর বাঁধিয়াছে তাহার নাম civilization এই ঘরের প্রত্যেক ইটখানিই বিদ্রোহ বিপ্লব

বাহিত—রক্ত কর্দ্দমে গাঁথা। ভারতের কুরুক্ষেত্র বাঙ্গালার সে দিনের মাৎস্যন্যায় হইতে জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন প্রত্যেক অভ্যুদয়টীর কথা ভাবিয়া দেখ—ভাবিয়া দেখ ফ্রান্সের বিপ্লব নব্য-বিজ্ঞানের ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা ভাবিয়া দেখ বর্ত্তমান পৃথিবীর মানব সভ্যতার মূল স্তম্ভ capitalismএর একটু একটু করিয়া এক এক দেশে প্রতিষ্ঠার কথা, বুঝিবে এ মন্দিরে আর কোনও উপাদান নাই—কেবল আছে শোণিত অস্থি নিষ্পিষ্ট মেদ মজ্জা। সঙ্গে সঙ্গে একবার ক্ষণিকের মত মানুষ হইতে মানুষের এই civilizationএর আদর্শটা সরাইয়া লইয়া, কল্পনা পটে তাহার মূর্ত্তিখানি অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাও ত! দেখিবে না বটে অনেক মূল্যবান সামগ্রী! সেখানে মানুষের চতুরঙ্গ সুসজ্জিত কোষ বল আমাত্যময়ী রাজত্বেরঘটা নাই—সেখানে বিশাল বিপণী কর্ম্মশালা সজ্জিত সশস্ত্র তরণীমালা নাই—নাই, ব্যোমযান বিদ্যুৎ উন্মত্তজীবন সংগ্রামস্রোতের হল্‌হলা! তবুও কিন্তু এত না থাকার মধ্যে এমন কিছু, দেখিবে যাহাকে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়! এমন কিছু দেখিবে যাহাকে দেখিয়া হয়ত বা মনে করিতে পার মানুষের এই উৎকট বেগময় আতিশয্য যাহাকে এতদিন ধরিয়া বিফলে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই ত এখানে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে রে?

এই যে সব বিশ্ব মানব ইহাকে কেন বাঁধিয়াছে সুখের জন্য। বড় গলায় বড় নাম দিয়া তাহাকে অবশ্য বলিতে পার উন্নতি। বস্তু একই। অবনতির মধ্যে সুখের নিশ্চিত নিরুপদ্রব প্রাচুর্য্যের নির্দ্দেশ দাও দেখি দেখিব কোথায় থাকে তোমার উন্নতি? বিজ্ঞানের এক একটা আবিষ্কার কেন হইয়াছে? আবিষ্কার না হওয়ার জন্য অসুবিধার সুখাভাব ঘটিয়াছিল। শিল্পের পর শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে কেন? প্রয়োজন সুখেরই অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাই। বিদ্যা ব্যবস্থা আচার শাসন সকলই সমবেতবহুর শৃঙ্খলা আনিতে, এই সুখেরই সর্ব্বজন উপভোগ্য উপায়ের সন্ধানের জন্য। ধর্ম্মেরও স্থাপনা, বাহিরের চেষ্টায় অকৃত কার্য্য হইয়া অন্তরের দিক দিয়া ওই ব্যবস্থা শাসন

প্রভৃতির কৃতকার্য্যতার জন্য। মোটের উপর মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে সবই আপনাকে অসুখী বলিয়া জানিবার পর করিয়াছে। সুখের চেষ্টাতেই করিয়াছে। এই বিচিত্র আয়তন যুগযুগান্তর গঠিত মানবের চেষ্টা-রাজ্য যাহা আপনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে বলিলেই হয় সে দুঃখিমানবের রচনা। সুখের জন্য রচনা। যদি রচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, মানব ইহার মধ্যে সুখের সন্ধান পাইয়া থাকে, তবে ইহার বিকাশ শেষ হইয়া গিয়াছে। আর অতিরিক্ত ঘটিবার কিছুই নাই।

কিন্তু তা ত হয় না, হইবেও না। civilization আপনার এ ঘর যেমন করিয়াই গঠন করুক—এ যে অনন্ত কালের বিধান, গঠন সম্পূর্ণ কিছুতেই হইবে না। যে সম্পূর্ণতার কল্পনা লইয়া এক যুগের কর্ম্মী প্রাণপাত করিয়া যান, সেই সম্পূর্ণতার উপর পরবর্ত্তী যুগে তাঁহাদেরই পদাঙ্কগামিগণ দেখিতে পান—অতিরিক্ত অনেক কিছু সন্নিবেশের প্রয়োজন। সে সম্পূর্ণতার সম্ভাবনা জাগিবার পূর্ব্বেই তাহার অসম্পূর্ণতা বাহির হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার হইবার পর বিশ্ব মানব দেখিল আবিষ্কারই তাহার চেষ্টার সফলতা। যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আবিষ্কার—সে এই আবিষ্কারের অনেক দূরে—তাহার জন্য আরো অনেক কিছু চাই। বিদ্যা ব্যবস্থা, আচার শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া মানুষ দেখিল যে জটিলতা দেখিয়া তাহার কল্পনায় এগুলি আসিয়াছিল এখন এগুলির সহযোগে তাহার সে জটিলতা আরো বাড়িয়া গিয়াছে মাত্র। শিল্প সৃষ্টি করিয়া দেখিল সে অভিমন্যুরই মত প্রয়োজনের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, এখন আপনি মরা বরং সহজ, ইহাদের মারিয়া বাহির হওয়া বড়ই কঠিন।

এমনি করিয়াই civilizationএর সুখের ঘর আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কোথায় সুখ আর কোথায় বহ্নি দাহ।

ব্যষ্টির সুখ সুখাশার অবসান ও সুখের লাগিয়া রচিত ঘরে বহ্ন্যুত্থের চট্ চটা ধ্বনি তাহাই প্রবন্ধের অগ্রে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু এতক্ষণ যাহা বলিলাম সমষ্টির কথা। সমষ্টি কবিতা বা সুখের

বিলাপে আপনার ব্যথা জানায় না। সে জানায় সমর কোলাহল ভৈরব ধ্বনিতে আ দিগ্মণ্ডলব্যাপী মুখরিত আর্ত্তনাদে হত্যাকাণ্ড মধ্যে। সে সব কথা থাক একটু ব্যষ্টির কথা বলি।

সমষ্টি রূপ যে মরীচিকাকে দেখিতেছে civilizationরূপে, ব্যষ্টির চক্ষে তাহারই দীপ্তি মায়া। তুমি আমি মায়াবদ্ধ বলিয়াই জগতের সৃষ্টি। এই জগৎ প্রপঞ্চকে সমষ্টি বদ্ধরূপে ব্যাখ্যা করিবার civilizationএর মত এমন উপযুক্ত শব্দ আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। ব্যষ্টি মায়া বলিয়া যাহাতে আবদ্ধ হইতেছে সমষ্টির চতুর্দ্দিকে তাহারই ঠাস বুনুনি এই civilization.

বস্তুতঃ মায়া কি? মায়া তাহাই যাহা তোমার অ মার জীবনকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া অবিরত অর্থহীন প্রদক্ষিণের আবর্ত্ত রচনা করিতেছে। যাহার বেগ অর্থহীন লক্ষ্যহীন কেবল গতির দাপটে রুদ্ধশ্বাস যাহা কোনও দিনই আপনার লক্ষ্যে পৌছিবে না।

যেমন সুখ তৃষ্ণা। সমষ্টি ব্যষ্টি যাহার জন্য অবিরত হৃদয়ের রক্ত তিল তিল সিঞ্চিত করিয়া আশায় স্ফীত হইয়া উঠে আবার সেই উঠারই নিশ্চিত পরিণাম স্বরূপ নিরাশায় জলিয়া উঠে—সেই সুখ তৃষ্ণা।

সুখের কথাই বলিতে বসিয়াছি। তোমরা কত বেহাগে মল্লারে কত পূরবীতে ইমনতানে কখনও বা কত দীপকের উদ্দীপ্ত রাগে সুখের গান শুনিয়াছ। কখনও কাঁদিয়াছ কখনও মুগ্ধ হইয়াছ কখনও স্তব্ধ হইয়াছ কখনও বা জলিয়া উঠিয়াছ। আজি আমি শুনাইব এ যাহা স্বর নহে ঝঙ্কার নহে—ভাষাও নহে। এ এক কি—তাহা আমিও এখনও সবটা বুঝি নাই। এখনও মানবে তাহার সবটার মীমাংসা করিতে পারে নাই।

আমি শুনাইব সুখেরই কথা—ঠিক সুখটুকু,—সুখ বলিতে যাহা জান তাহারই রহস্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটুকু। হাসিও না—অবাক হইও না। তুমি সুখ চাহিতেছ অর্থে বুঝায় কি? তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা যথেষ্ট নহে—আরো চাও—সেই আরো যে কি তাহাও জান না। আমাকে বিশ্বাস কর—কেহই তাহা জানে না। ঐ চাওয়াটারই অস্তিত্ব

আছে। কুহকিনীর যাদু মন্ত্রের অবগুণ্ঠনের মত আরো পদার্থটী তাহারই চারিদিকে ঘেরা এক নীবিড় অজ্ঞাত তথ্যপূর্ণ অপরূপ মণ্ডল। দৃশ্য—কি অদৃশ্য! অনুভবের পারে কি অতীতে—কেহই জানে না।

মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব তাহার আপনার মধ্যে—অথচ এই আপনার বাহিরে তাহাকে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে আপনাকেই সম্পূর্ণরূপে পাইবার জন্য, আপনার সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য। যেমন আপনার মুখ আপনি দেখিতে পাই না তেমনি আপনার চেতনাও আপনি কিছুই জানিতে পারি না। বাহিরে আসিয়া দেহটাকে আঁকড়িয়া তাহাকেই অবলম্বন করিয়া যতখানি বুদ্ধি দাঁড়াইতে পারে সেই পুঁজিটুকু খাটাইয়া বলি—আমি দেহী। সে জিনিষটা প্রতি নিমেষেই ধসিয়া ধসিয়া পড়িতেছে তাহাকে ত রাখিতে হইবে,—আরো বাহিরে যাইতে হয়, কোথায় সেই রাখিবার উপকরণ? উপকরণের পর উপকরণ তাহার পর উপকরণ এমনি করিয়া কত কি যে আঁকড়িতে হয়—কতদূর যে বিক্ষিপ্ত হইতে হয়,তাহার আর স্থিরতা নাই। দূরের পর দূর উপকরণের পর উপকরণ অথচ যে বস্তুর জন্য তাহা, সে একেবারেই অসম্ভব.প্রাপ্য। এমনি করিয়াই আমরা মায়ার শৃঙ্খলে জড়িত হই। শিব ভুলে জীব হই।

তাই ত বলি শ্রেষ্ঠ সুখ তাহাই যাহার নাম—সুখ নাই ইহা জানিয়া একটা স্থির স্থিতি।—কিন্তু কিছুই কি নাই! কিসের উপলক্ষ্যে এই গতিটা।

সে ওই আপনাকেই পাওয়া। আপনাকে পাইবার প্রকৃত স্থান ভুলিয়া বাহিরে আসিবার কালীন অনুভূত যে গতির বেগ তাহাকেই সুখ বলিয়া বুঝিতেছি, কিন্তু প্রকৃত কথা কি? আপনাকে পাইবার প্রকৃত স্থান চিনিয়া অন্তরে ফিরিবার জন্য যে যাত্রা তাহারই গতির নাম সুখ। আর ইহারই নাম অমৃত।

অমৃতত্বই জীবনের লক্ষ্য—অমৃতেই সুখ।

মনুষ্যত্বের সাধনা

(৯)

ধর্ম্মে ও কর্ম্মে বিরোধ।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

"কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য ধরে প্রেম মহাবল।" আর একবার সেই সুন্দর কথাটী বলিতে ইচ্ছা হইতেছে "যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।" পান্নার ন্যায় কৃচ্ছ্র সাধনের মহাবল, পান্নার পক্ষেই সম্ভব।

সাধারণ ধর্ম্মমতে ও কর্ম্মবাদে যেন চিরকালই একটা বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কর্ম্মের কথা উঠিলেই সেই সঙ্গে বৃথা কর্ম্মের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। প্রতীচ্যে এখন কর্ম্মযুগ, প্রাচ্যেও যে তাহার প্রভাব আসিয়া পড়ে নাই এমন নয়, তথাপিও এই যে কল কারখানা যুদ্ধবিগ্রহ এ সব প্রাচ্য প্রকৃতির সহিত মিশ খায় না। তদ্ভিন্ন কর্ম্মসাধনা এক কথা, কর্ম্মোন্মত্ততা অপর কথা। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে অকারণে কিছু ঘটে না। তন্ত্র, শাস্ত্র যুগানুযায়ী নানাভাবে ইষ্টমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন; কখনও শুভ্রবসনা শ্বেতশতদলবাসিনী স্মিতহাসিনী বীণাপাণি, কখনও দিগ্‌বসনা খড়্গাকরা কপালমালিনী কালিকা; কখনও সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জননী জগদ্ধাত্রী, কখনও বা সর্ব্বত্যাগী শ্মশানচারী প্রলয় দেবতা শিব। পূজোপকরণ কখনও ষোড়শোপচার, কখনও বা গঙ্গাজল বিল্বদল মাত্র। কখনও শ্বেতচন্দন ও শুভ্র কুসুম, আবার কখনও বা রক্তজবা রক্তচন্দন শোণিতধারা। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস তাঁহার রচিত গীতে বর্ত্তমান যুগকে 'কর্ম্মযুগ' আখ্যা দিয়াছেন। * কিন্তু 'ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বিচিত্র

---

* সময় ফিরিয়া কেবা পায়? (যা' যায়)
কেবল শুনিনু কানে, না চাহিনু তার পানে
বৃথা উপেখিনু তারে হেলায় হেলায়।

মানবজীবনের ব্যক্তিগত রুচি বৈচিত্র্যে, জাতিগত ভাব বৈচিত্র্যে ও দেশ কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়া যখন যে কোন ভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ হইয়াছে, সকল সময়ে কর্ম্মই তাহার অবলম্বন, কিন্তু যখন এবম্বিধ প্রকাশ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণতা লাভ করে, যখন কর্ম্মী বা কর্ম্ম কিছুই থাকে না তখনই সমাধিরূপ মহাযোগের পরিপূর্ণ স্তব্ধতায় বিলীন হওয়া সম্ভব, তৎপূর্ব্বে চেষ্টাকৃত কর্ম্মত্যাগ; গীতা যেমন বলিয়াছেন ;—

"মোহাত্তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগ তামস ত্যাগ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

"দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥"

দুঃখ, দৈহিক ক্লেশ অথবা ভয়ে যে কর্ম্ম ত্যাগ করে সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগ ফল শান্তি লাভ করে না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আমাদের মনে কতকগুলি সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায়। যেমন, পূজাঅর্চ্চনা, ব্রতনিয়ম, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, নিয়মিত উপাসনা, দান, বিশেষভাবে ভগবানের আরাধনার দিনে উপবাসাদি

এখনো যা কিছু আছে তাহারে ধরিলে এঁটে,
যে কটা দিন আছে বাকি আনন্দেই যেত কেটে',
কিন্তু এমন কপাল পোড়া, এমনি অভাগা মোরা
বিধি লিপি কপাল জোড়া কথায় কথায়।
আমরা যেন ফুট্‌বলে "কিক্" দিয়ে এই ধরা জিনি,
বিধিরে ভেবেছ বুঝি এম্‌নি একটা হাবা তিনি,
বিশ্বপতি কর্ম্মময় হাবা ছেলের বাবা নয়,
কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়।
কর্ম্মক্ষেত্রে এসে যারা কর্ম্মই করে না সাথী,
ক্ষণস্থায়ী যেন ভাই তাদের জীবন বাতি।
এই মহা কর্ম্মযুগে শান্তি নাই কর্ম্মব্যয়ে।
মুকুন্দ বরেছে কর্ম্ম শান্তিবারি পিপাসায়।

এইগুলি সাধারণতঃ আমরা ধর্ম্মাচরণ বলিয়া গ্রহণ করি। তদ্ভিন্ন অপর যাহা কিছু বৃথা কর্ম্ম। মধ্যেও আবার বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। জ্ঞানী "ইহা নয়, ইহা নয়" বলিয়া "নেতি নেতি"র পথ দিয়া চলিয়াছেন, ভক্ত নিখিল বিশ্বে ইষ্টরূপ দর্শন করিয়া "অস্তি অস্তি"র পথ দিয়া চলিয়াছেন। জ্ঞানী ভক্তের ভক্তিকে ভাবুকালী বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন, ভক্ত বলিলেন,—

"অভাগীয়া জ্ঞানী চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসিক ভকত পিয়ে প্রেমাম্র মুকুলে।"

খৃষ্টান যীশুকে যে না পরিত্রাতা স্বীকার করে তাহার অনন্ত নরকের ব্যাবস্থা করিলেন। দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবের বিবাদ চির প্রসিদ্ধ। নিরাকার ও সাকারবাদ লইয়া কতই না বিচার বিতর্ক চলিয়াছে। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা রসিক বৈষ্ণব দ্বিভুজ মুরলীধরই তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য; নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পতিত হইতে হয়। মুসলমানের মধ্যে সিয়া ও সুন্নিতে উভয় সম্প্রদায়ে বিরোধ শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী জৈন কেহ কাহারও দেবদর্শন করেন না, এইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদের বিরোধ শেষে এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে বিধর্ম্মিবধও ধর্ম্মাচরণের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মের নাম নিয়া যতদূর অধর্ম্মাচরণ ও নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে অন্যত্র সেরূপ অতি অল্পই হইয়াছে।

মানব মহত্ত্ব এই সকল মতবাদের কোন অপেক্ষা রাখেনা, রূপ ও অরূপের বিতর্কে তাহার কিছু যায় আসে না; অস্তি নাস্তির স্বীকার বা অস্বীকারে তাহার বৃদ্ধি অথবা হানি কিছুই হয় না। কোন ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি যদি একজন চিকিৎসককে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করেন না বলিয়া অনুযোগ করিয়া এইরূপ উত্তর পান যে, "যতক্ষণ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া সময় নষ্ট করিব ততক্ষণ চিকিৎসার গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়িলে ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারিব" তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত ও বিরক্ত হন। কিন্তু গীতা বলেন,—"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

"স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে। * চিকিৎসক যদি চিকিৎসকের কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় সাধন করিতে পারেন তবে তিনি কি তাঁহার সেই কর্ম্মসাধনের তপস্যাতেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারেন না! কোন দূষিত ক্ষত অস্ত্র করিতে হইলে চিকিৎসকের হস্তে চর্ম্মাবরণী পরিধান প্রয়োজন হয়, কেন না যদি কোনরূপে তাঁহার শরীরে ক্ষতসংশ্লিষ্ট বিষ প্রবেশ করে তবে তাঁহার জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু অনেক সময়, চর্ম্মাবরণী হস্তে রাখা অনভ্যাস বশতঃ অস্ত্রোপচার যেরূপ দ্রুতভাবে করা প্রয়োজন তাহা হয়তো ঘটিয়া উঠেনা। এমন অবস্থায় কোন চিকিৎসকের হস্তে ক্ষত থাকা সত্বেও মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও তিনি অনাবৃত হস্তে রোগীর অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। মুমূর্ রোগী জীবন পাইয়াছিল, কিন্তু চিকিৎসক কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। এইরূপে সেই চিকিৎসক নিষ্ঠা সহকারে স্বকর্ম্মের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন চিকিৎসক নিজে সঙ্কটাপন্ন আহত হইয়াও কিছুদূরে পতিত কোন আহতের ছিন্ন ধমনী হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। নিজের অন্তিমবল প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়া অতি কষ্টে তাহার নিকটস্থ হইয়া আহতের শিরামুখ বাঁধিয়া দিলেন এবং পরক্ষণেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কয়লার খাদের কোন কুলী সহসা পদস্খলিত হইয়া শত সহস্র হস্ত নিম্নে গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, পড়িবার সময় সে নিজের প্রাণ ভয়ে চিৎকার না করিয়া এই বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল,—"সরে যাও, জিনিষ নাম্‌ছে।" কোন ভারী দ্রব্য নামাইবার সময় গহ্বরস্থ কুলীদিগকে ঐরূপ চিৎকার করিয়া সাবধান করা হয়, সে নিজে পড়িবার সময়ও অপরের প্রাণহানি না হয়, সেইরূপ সাবধানতা সূচক চিৎকার করিয়া তাহার শেষ কর্ত্তব্য পালন করিল।

* যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মনা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

সাধুসঙ্গ।

(দুলাল)

সন্ন্যাসী সত্যব্রত গঙ্গাস্নানে এসেছেন। তাঁর জ্যোতির্বিচ্ছুরিত বরবপু একঘাট নরনারী অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছেল। স্বামিজীর দৃষ্টি গঙ্গার দিকে স্থির নিবদ্ধ। তিনি মৃদু গম্ভীরস্বরে 'তবজলমমলম্ যেন নিপিতং' ইত্যাদি আবৃত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে দ্রবময়ী জননীকে প্রণাম—ও কয়েক বিন্দু বারিকণা পান ক'রে যখন সলিলে অবতরণ করলেন, তখন যেন মনে হ'ল একটী সহস্রদল পদ্ম কোন অনন্ত তেজোময় রবির পানে আকুল নয়নে চেয়ে প্রস্ফুটিত রয়েছে। তাঁর সুপ্রশস্ত ললাট প্রতিভার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত, উন্নত আর্য্যজনোচিত নাসিকা, হেমগৌরকান্তি, সুবিস্তৃত বক্ষদেশ ও দীর্ঘদেহ একটা দেখ্‌বার জিনিষ। সুন্দর গৈরিকে সেই বরস্নঙ্গ আবৃত থাকায় তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর স্তবপাঠ একটা শুন্‌বার জিনিষ, সে যেন গঙ্গার কলকল্লোলের চেয়েও শুভকর, পাখীর কলতানের চেয়েও সুমধুর, নারীর কলকণ্ঠের চেয়েও মোহনীয়। একে তিনি রূপবান, তার উপর আকুমার ব্রহ্ম-চর্য্যপরায়ণ, সে রূপের জোড়া এ জগতে আর কোথায় পাওয়া যাবে? তাই সেই অমরার দেবতাকে এ মরদেশের নরনারী অবাক হ'য়ে, আকুল হয়ে দেখ্‌ছিল, সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত স্তব্ধ হয়ে শুন্‌ছিল। স্নান-স্তোত্র-জপ শেষ হলে তিনি উপরে এলেন—তাঁর সঙ্গী তাঁকে একখণ্ড শুষ্ক গৈরিক বস্ত্র দিল—তিনি তাহা পরিধান করে ধীরে ধীরে বিস্মিত নরনারীর অতৃপ্তদৃষ্টির অন্তরালে মিশে গেলেন।

(২)

সে দিনের সেই বিস্মিত নরনারী গঙ্গার ঘাটে অপূর্ব্বরূপের কথা হয়ত ভুলে গিছ্‌ল, কিন্তু বাসন্তীর তাহা জীবন মরণের সঙ্গী হয়েছে—তাহা তাহার জীবনকে আকুল করেছে—বিচলিত করেছে,—হয়ত

পরিবর্ত্তন করেছে। আজ তার স্নেহময় পিতার কথা মনে হচ্ছিল—সে অতি অল্প বয়সে মাতৃহারা হয়—পিতা ছিলেন তার বাপ-মা উভয়ই। তিনি গৃহে শিক্ষক রাখিয়া ও বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাকে উত্তমরূপে শিক্ষিতা করেন। পনর' বছর বয়সে তার এক পরম রূপবান শিক্ষিত যুবকের সহিত বিবাহ হয়। বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিতা কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার বুক হ'তে পরের ঘরে গিয়েছিল, দশদিন, না যেতে যেতে নিরাভরণা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে এসে পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। দশটী দিনের তরে তার সিঁথির সিঁদুর উজ্জ্বল হয়ে চিরদিনের জন্য মুছে গেল,—পিতা আদরিণী কন্যাকে অবলম্বন দেবার জন্য গৃহে পণ্ডিত রেখে উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি পড়ালেন। ধনী পিতা দিবারজনী আদরের শতধারা তার মাথায় ঢালতে লাগ্‌লেন, এত কর্‌লেন কিন্তু তাকে সংযম অভ্যাস করালেন না—ব্রহ্মচর্য্যের সহজ সরল নিয়মগুলি শেখালেন না। পাশের বাড়ীর অনিল,—তার বাল্যবন্ধু, প্রতিদিন তাদের ঘরে বেড়াতে আসত। গল্প গুজবে, খেলা-ধূলায় কয়েক ঘণ্টা কাটাত। অভাগিনী একদিন তার সঙ্গে এমন স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে অকূল অজানা সাগরে ঝাঁপ দিল। তার সঙ্গে বাসন্তী ভারতের বহু নগর ভ্রমণ ক'রল। দুই বৎসর পরে এই তৃষিত চরিত্র হীনের তৃষ্ণা মিটে গেল, তখন সে তাকে অসহায় ভাবে ফেলে পালালে! তারপর বহুকষ্টে পড়ে সে এক পতিতার আশ্রয় পায়—তার শিক্ষায় ও চেষ্টায় বাসন্তী আজ পতিতা-জীবনযাপনে বেশ পটু হয়েছে। সে এখন রূপকে না ভালবেসে অর্থকে ভালবাস্‌তে শিখেছে। রূপের হাওয়া তার মনকে চঞ্চল করলেও সে আর তার মুখে উধাও হয়ে যায় না—তবে তার চোখের উপর যে সব রূপ খেলা করে তা সুন্দর হলেও আবিলতা পূর্ণ। কিন্তু সে এমন অনাবিল, এমন আড়ম্বর শূন্য রূপ-সুধা আর কখনও পান করে নি। তারা এসেছে তার কাছে ভিথারীর মত—উন্মত্ত অসংযতভাবে, তার রূপের রাজ্যে দাস হতে, প্রজা হতে, আপনার সর্ব্বস্ব হারাতে,—আর ইনি এসেছেন রাজার মত, ইঁহার উন্নত সংযত দৃষ্টি যেন এ জগতের কিছুই দেখ্‌তে

চায় না, সে যেমন একটা পাথরের দিকে তাকায় না আবার তার সর্ব্বজনবাঞ্ছিত ভুবনভোলান অপরূপের দিকেও ঠিক তেমনি তাকায় না। গর্ব্বিতা এতদিন ভা'বত তার রূপের ফাঁদে না পড়ে এমন বুঝি ত্রিজগতে কেউ নেই। আজ তা'র সে গর্ব্ব ছুটেছে তাই সে এত চঞ্চলা,—এত অধীরা—অপরাজিতা আজ পরাজয়ের লাঞ্ছনা কোন রকমে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌ছিল না।

এক একবার ভাব্‌ছিল, 'কে তিনি, কিসের তরে তার জন্য এত ব্যাকুল হব, তার না আছে অর্থ, না আছে পার্থিব ভালবাসা; আমার এই নবীন যৌবন, অনন্ত রূপরাশি; কত ধনী ভ্রমর আমার ভালবাসার ফুলবনে ব্যার্থ প্রয়াসে রাতদিন স্তুতি ক'রে ঘুরে বেড়ায়, আর আমি সেই পাগলটার জন্যে পাগল হব।' এমন সময়ে তার দাসী এসে বল্লে 'বাবু এসেছেন' অকারণে দাসীকে হঠাৎ একটা ধমক দিয়ে বাসন্তী ব'লল, "তাকে, আজ যেতে বল আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ, আজ দেখা হবে না।" বহুক্ষণ পরে দাসী পুনরায় ভয়ে ভয়ে ফিরে এসে বল্লে, "তিনি অনেক ক'রে বল্‌লেন, শুধু একটিবার দেখে যেতে চাই, আমি বস্‌বো না।"

বাসন্তী চোখ লাল করে উচ্চকণ্ঠে উত্তর ক'রল, "আ মর্ মাগী, জ্বালাতন কর্‌লি যে, তাকে বলে দে আর যেন সে কখনও আমার বাড়ীর দোর না মাড়ায়।" দাসী বার হওয়া মাত্র বাসন্তী সশব্দে দুয়ার বন্ধ করল। হরিপুরের জমীদার তরুণ যুবক সুনীলবাবু বাহিরে পরদার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি অবাক হয়ে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ কর্‌লেন। সুনীলবাবুকে তাড়িয়ে তার মনটা যেন এলো-মেলো হ'য়ে গেল—চিন্তার সূত্র যেন ছিঁড়ে গেল। আন মনে একথা ওকথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মাঝে মাঝে সেই উন্নত বরতনু তার মনাকাশে ভেসে উঠতে লাগ্‌ল আর তার মন্‌টা হুহু কর্‌তে লাগ্‌ল—যেন কোন অমূল্য রত্ন সে হারিয়ে ফেলেছে, যুগ যুগান্তের অন্ধতমিস্রার অন্তরালে তার হৃদয়মণি কে যেন চুরি করেছে; হয় তো এ জীবনে বা জীবনান্তরে তার আর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

এমন সময়ে তার বন্ধু, তার শিক্ষক যার কৃপায় আজ সে মহানগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা, নটবর এসে বহু চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে গেল। আজ যেন প্রকৃতির কাজ পাল্টে গেছে তাই অসময়ে বসন্তের বুকের উপর দিয়ে শীতের হাওয়া বইছে, তার কোকিল উ'ড়ে গেছে, তার সব ফুল ঝ'রে পড়েছে।

(৩)

গঙ্গার কিনারা হ'তে কিছু দুরে এক বাগানে স্বামী সত্যব্রত বাস ক'রছেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর মধুময় চরিত্রে আকৃষ্ট বহু নবযুবক ব্রতময় সমুন্নত জীবন যাপনে কৃত সঙ্কল্প।

সেই যুবকগণের হৃদয়ের আহ্বানে এই বনের দেবতা নগরে প্রতিষ্ঠিত। হিমারণ্যের সুকঠিন ক্রোড়ে যে আত্মা অনুক্ষণ চিদাকাশে বিচরণ ক'র্‌তো তাকে বহুর মধ্যে এমন কি কীটানুকীটের মধ্যেও পাবার জন্য আজ তিনি জনপদে। আত্মার মুক্তির জন্য যিনি অন্তরের গোপন ঘরে প্রবেশ করে ছিলেন, তিনি জগদ্ধিতায় তাকে নিযুক্ত করবার জন্য বাহিরে এসেছেন। বাহিরকে ভিতরে দেখিয়া আজ তিনি ভিতরকে বাহিরে দেখিতে প্রস্তুত। সেই জন্য যেখানে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে ওঠে সেই খানেই তাঁর অন্তরের দেবতাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর মনপ্রাণ ছুটে যায়। যেখানে অভাব, যেখানে অশান্তি সেই খানেই তাঁর দেবতাকে তিনি নির্য্যাতিত দেখ্‌তে পান, আর তাঁর মহাপ্রাণ হাহাকারে ফেটে পড়ে। তিনি দেখ্‌ছেন যত দরিদ্র, যত ক্ষুধিত, যত আতুর, যত মূর্খ, ওরা ছোট নয়, ওরা হীন নয়, ওরা দেবতা—নারায়ণ, পরব্রহ্মের বিকাশ। তাঁর কাছে আজ ব্রাহ্মণ কাঙ্গাল একাসনে ব'সছে, আর তাঁর মহাপ্রাণ দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তাঁদের সেবা করছে।

সেই সন্ন্যাসীর আগমনে আজ নগরে সাড়া পড়ে গেছে—দলে দলে উন্নতহৃদয় যুবকবৃন্দ তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছে, তিনি অরণ্যের বেদান্তকে ব্রাহ্মণের গুপ্ত মহামণিকে আচণ্ডালে বিলিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, তাই স্থানে স্থানে সেই মহাবিদ্যা প্রচার করেন; তাঁর প্রচারকালীন

সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়, সকলে মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাঁর বাক্যসুধা পান করে, সকলেই এক বাক্যে বল্‌ছে এমনটী হয় নি, হবে কি না সন্দেহ। একদিন সকালে স্বামিজী বাগানে বেড়াচ্ছেন, গ্রীষ্মকালের প্রভাতের সুখস্পর্শ বায়ু সারা বাগানময় ঝির ঝির করে খেলছিল, তিনি আনমনে ঘু'রতে ঘু'রতে কখনও কখনও বেলা, জুঁই বা গোলাপের ঝাড়ের নিকট দাঁড়িয়ে ফুলের রূপ দেখ্‌ছিলেন; এমন সময় ফুলের মত সুন্দর একটী মেয়ে তাঁ'র পায়ের নিকট লুটিয়ে পড়লো। সদ্যস্নাতা এলোচুলে তখনও গঙ্গাজল বিন্দু বিন্দু ঝর্‌ছিলো; একখানি লাল পেড়ে পাটের কাপড় তার অঙ্গখানি বেড়ে ছিল। সন্ন্যাসীর পায়ের উপর তার মাথা, তিনি স'রতে পা'রলেন না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার মুখে একটা আনন্দের হিল্লোল খেলছিল, মনে হলো আজ যেন তার জীবন পূর্ণ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী দেখলেন যেন প্রাভাত রাণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে তাঁর নিকট উপস্থিত। তিনি বল্‌লেন—"কে তুমি মা! এখানে কি কিছুর প্রয়োজন আছে?". মেয়েটী একটু চঞ্চলা হয়ে উত্তর দিল—"না, দরকার তেমন অন্য কিছু নাই, শুধু আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি।" তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমার সঙ্গে আর কি কেউ এসেছে?" না,—আমি গঙ্গা নেয়ে বরাবর একা এসেছি, ঘাট পর্য্যন্ত একজন ঝি সঙ্গে ছিল, সেখান থেকেই তাকে বাড়ী যেতে বলে দিয়েছি।"

"তোমাদের বাড়ী কোথায়, মা?"

মেয়েটী আবার একটু বিচলিতা হয়ে ব'লল, "কালিতলায়। আপনি যদি দয়া ক'রে একবার সেই বাড়ীতে পদধূলি দেন তা হলে সেই অপবিত্র পুরী ধন্য হয়ে যায়—তীর্থ হ'য়ে যায়।"

"আমিতো বড় একটা কোথাও যাই না, আর বাড়ী যাবারই বা দরকার কি? তিনি ত সর্ব্বত্রই প্রকাশ রয়েছেন, তাঁর স্পর্শে যা কিছু সবই তীর্থ—তুমি এই খানেই এস মা, মাঝে মঝে এই খানেই দেখা হবে।" অভিমানিনীর চোখ লাল হয়ে উঠল, কান্না যেন বুকের দুয়ার ঠেলে বার হবার জন্য উছ্‌লে উছ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

"বেলা হ'য়ে গেল তোমায় আবার অনেক খানি পথ যেতে হবে, রোদে কষ্ট হবে, আজ তা হলে এস, প্রভুর ইচ্ছা হলে আবার দেখা হবে।"

মেয়েটী গলায় আঁচল দিয়ে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম ক'রল, আর সে কান্নার উৎসরোধ করে রাখ্‌তে পাল্লে না চোখের জল দিয়ে বৈরাগীর পাদুটি ধুইয়ে বাগানের ফটকপার হয়ে গেল।

(৪)

আর একদিন বৈকালে স্বামীজি বারান্দায় বসেছিলেন, এমন সময়ে মেয়েটী এসে প্রণাম ক'রল। সাধু বল্লেন, "বস মা, বস, সেদিন তোমার মনে খুব কষ্ট দিয়েছি।" মেয়েটী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে উত্তর দিল, "সেদিন আমার বাড়ী না গিয়ে ভালই করেছেন, আমি সেদিন আপনাকে বলিনি যে আমি একজন পতিতা, আপনাকে দেখে আমার ভিতর ওলট পালট হয়ে গেছে, মনে করে ছিলাম আপনাকে নিয়ে গিয়ে সেই অপবিত্র পুরী শুদ্ধ করে নেব। আর অসৎ কাজ করব না, আমার যা আছে তাতে একটা জীবন সুখেই কেটে যেতে পারে—শেষ কটা দিন তাঁর চিন্তাতেই কাটিয়ে দেব কিন্তু দেখ্‌ছি তাঁর ইচ্ছা অন্য রকম।"

সন্ন্যাসী বল্লেন—"মা তুমি পতিতাই হও আর যাই হও, তাতে আমার যাওয়া বাধে না, কারণ ভগবানের রাজ্যে কাউকে পতিত বা পতিতা ভেবে তাঁর অবমাননা করি নি। আমার কারুর বাড়ী যাওয়া আসে না, স্বভাব নয় তাই যাই না।"

মেয়েটী খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বল্লে "দেখুন আমি শুনেছি আপনি গরীব দুঃখী নিরাশ্রয় পীড়িত লোক জনকে যত্ন করে কাছে নিয়ে থাকেন ও মায়ের মত তাদের সেবা করেন। আর শুনেছি তাদের সংখ্যাও বড় কম নয়—অতগুলি লোকের সেবা একা করা কখনও সম্ভব নয় যদি আপনার বিশ্বাস হয়, যদি দয়া করে একটু স্থান দেন তবে আমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু দিয়ে আপনার কাজের সাহায্য করতে পারি—দেখুন বাড়ীতে আমার একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা হয় না;

মনে হয় যেন আগুন—আর আমিও একজন পতিতা নিরাশ্রয়া আমাকে দয়া করে আপনার চরণে স্থান দিতেই হবে।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—"অবিশ্বাস—আমি তোমায় কখনও করিনি, প্রথম সাক্ষাতেই তোমার ভেতর একটা মহৎ ভাবের, জগৎব্যাপী প্রাণের পরিচয় পেয়েছিলাম। দৈব বিড়ম্বনায় তুমি এমন হয়ে ছিলে; আমি বুঝে-ছিলাম অসৎ তোমায় কখনও বেঁধে রাখ্‌তে পারবে না। তুমি তার বাঁধন একদিন কাটাবেই কাটবে। কিন্তু মা এখানে তোমার অনেকগুলি সন্তান বাস করে, তুমি কেমন করে থাকবে। তুমি মনে ক'রোনা যে তুমি পতিতাদের ভিতর থেকে আস্‌ছ বলে একথা বলছি, তুমি যদি ভদ্রের গৃহ থেকে আশৈশব ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী হয়ে আস্‌তে তাহলেও একথা বল্‌তুম।"

"কেন ঠাকুর—পবিত্র হৃদয় নরনারী কি একসঙ্গে থেকে কাজ কর্‌তে পারে না, আমার তো মনে হয় এ যুগল হৃদয়ের মিলনে অদ্ভুত শক্তির উদয় হয়। যদি এ পবিত্র পুরুষপ্রকৃতি একত্র হয় তবে তারা নূতন পবিত্রতর জীবন সৃষ্টি কর্‌তে পারে—আর যখন তারা পবিত্র বাসনা নিয়ে কাজে নাম্‌ছে কেন তাদের পতন হবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বল্‌ছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"।

মৃদু হা'সতে হা'সতে সাধু উত্তর করলেন, "মা তোমার মত মহাপ্রাণ নরনারী এ কথাই ভেবে থাকে, কিন্তু আমার জীবনের, কেবল আমার জীবনের নয় আমার পূর্ব্বের শত সহস্র সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছি, এ সম্ভব নয়। আমাদের মন সাধারণতই নিম্নগামী, সদ্‌বাসনা তাকে যতই ওপরের দিকে তুল্‌তে চেষ্টা করুক না কেন, একটা অবলম্বন পেলেই সে নীচের দিকে ছুটতে থাকে, সেইজন্য আমাদের উভয়কে নর ও নারীকে পৃথকভাবে অবলম্বন শূন্য হয়ে উঠতে হবে। প্রবর্ত্তক সাধক সাধিকার পক্ষে পরস্পরের মিশ্রন কখনও শুভকর হয় না। শ্রীবুদ্ধদেবকে যখন তাঁর শিষ্য বলেছিলেন, "হে প্রভূ জগতের অর্দ্ধটাই উদ্ধার করলেন, অপর অর্দ্ধটা কি মাটীতেই পড়ে থাকবে।" তথাগত উত্তর করেছিলেন—"তুলতে পারি, তবে পুরুষ যদি নারীকে সঙ্গে নিয়ে

ওঠে তবে সে ওঠা স্থায়ী হবে না—আবার পড়তেই হবে।” তাই বহু অভিজ্ঞতার ফল এ যুগের ধর্ম্ম হচ্ছে যে পুরুষ পুরুষের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠ্‌বে; নারী নারীর পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠ্‌বে। কেউ কারুকে ধরে উঠ্‌বে না, কেউ কারুর হাত ধর্‌বে না এই রকম অবলম্বন শূন্য হ’য়ে যদি উঠ্‌তে পারে তবেই তা স্থায়ী হবে, সার্থক হবে। তবে তারা যখন শেষ সীমায় পৌছয় তখন মিলতে পারে কারণ তখন তাদের নর বা নারী জ্ঞান চলে যায়, দেখে সবই সচ্চিদানন্দময়।

নারী জিজ্ঞাসা ক’রল—“সন্ন্যাস্ নেবার আবশ্যকতা কি? ভগবান্ লাভ বা জগৎ সেবা কি ঘর থেকে হয় না? আমিতো অনেক পণ্ডিত মহচ্চরিত্র লোকের মুখে শুনেছি—হয়।”

তিনি বললেন—“আমিও নিজ জীবনে দেখেছি, আর অন্যান্য পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলেছেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করলে কিছুই হয় না—ভগবান লাভ, জগৎ সেবা, বিশ্বপ্রেম তো দূরের কথা। কায়মন বাক্যের সবখানি এতে নিয়োগ না কর্‌লে কেউ কি কিছু কর্‌তে পারে? আমার সন্ন্যাস—জটা চিম্‌টে গেরুয়া কাপড়ে নয়—পূর্ণ আত্মসমর্পণ—তৎকারণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ। ধন, মান, স্বদেশ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি এমন কি আপনার শরীরও সেই মহাপ্রেম সমুদ্রে ডুবে যাবে। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কেউ তা পারেন নি আর পারবেন বলে মনেও হয় না। মা, মনটা আমাদের সঙ্গে অনবরতই জোচ্চুরি কচ্ছে। সে কত রকম ক’রে আমাদের ভোগের দিকে, রূপরসের দিকে টেনে নিয়ে যায়, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি তার কতটুকু খবর পায়। মন চায় সুখ, চায় ভোগ, তাই নানারকম ক’রে মহাপ্রাণকে ভোলায় —বলে ঠিক কচ্ছো কারু কথা তুমি শুন না—এইরূপে সে নিজের বাসনা চরিতার্থ ক’রে নেয়, সে মানুষকে অন্ধ ক’রে দেয় বিচার বুদ্ধি শূন্য ক’রে দেয় সেইজন্য সংযমের বাঁধন দিয়ে ধীরে ধীরে শক্ত ক’রে তাকে বাঁধতে হয়—হয়তো কতবার খুলে যাবে তবু বাঁধতে হবে। দেখ না লোকে অসংযতমন, চঞ্চলবুদ্ধি নিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন

করে, দুদিনেই সবটা পেতে চায়; তা না হলেই তারা ফিরে পালায়, ঘরে গিয়ে বলে— ওসব কিছু নয়, বুজরুকী। তা কি হয়? ধীরে ধীরে এই পথে উঠ্‌তে হবে—তা আজও হতে পারে আবার যুগ যুগান্তেও না হতে পারে। ধৈর্য্য, সংযম, বৈরাগ্যই এই পথের বন্ধু। শবরী চল্লিশ বৎসর প্রিয়তমের আসার আশায় বসেছিল; তার যৌবন যে তাকে বার্দ্ধক্যের দুয়ারে ফেলে দিয়ে গেছে সে কথা পর্য্যন্ত সে জানতে পারেনি।

"অস্থির অবিশ্বাসী লোকের এ পথে না আসাই উচিৎ। যাক্, তোমার যখন এমন শুভমতি হয়েছে তখন তুমি বাড়ীতে থেকেই কাজ আরম্ভ কর, যতসব দীন দুঃখী পীড়িতদের বাড়ীতে নিয়ে এসে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা কর, নিজেকে কর্ত্তা মনে ক'রোনা, মনে করবে তাঁর কাজ তিনি তোমার ভিতর দিয়ে কর্‌ছেন, দেখ্‌বে তিনিই তোমায় পথ দেখিয়ে দেবেন। রমণী সবিনয়ে প্রশ্ন ক'রল—"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কামকাঞ্চন ত্যাগ করা। অনেকে বলেন কাম ত্যাগটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তার কাঞ্চন ত্যাগটার বাহাদুরী কোথায়? লোকে কাঞ্চন সংগ্রহ করে ভোগের জন্য—আহারের জন্য; সন্ন্যাসীর কোন কষ্ট নাই, বেশ সুখে সমাজের বুকের উপর বসে সবার সেরা খাচ্চেন—সে কাঞ্চন ত্যাগ অনায়াসে করতে পারে; কিন্তু গৃহী নিজের, স্ত্রী পুত্রের সামান্য পেট ভরাবার জন্য খেটে খেটে অস্থির অথচ কুসংস্কারপূর্ণ সমাজ নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রেষ্ঠঅন্ন সন্ন্যাসীর মুখে ধরে দেয়।"

সন্ন্যাসী বললেন, "সাধুর ব্রহ্মচর্য্য-পূর্ণ হৃষ্টপুষ্ট শরীর অনেকের চক্ষুশূল বটে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র আহারে সন্তুষ্ট থাকা—না হয় ধরে নিলেম সে আহারটা খুব ভালরকমই—কি সহজ কথা! লোকে আহার ছাড়া অন্য অনেক রকমে ভোগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। দেখ যার টাকা আছে সে হয় তা বাড়ায়, নয় তা ওড়ায়। যা আছে তাই রক্ষা করা, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা শক্ত। সন্ন্যাসীর যদি কাঞ্চন স্পৃহা থাকতো তবে সে শুদ্ধমাত্র আহারেই সন্তুষ্ট থাকতো না অন্য অনেক জিনিষের জন্য অর্থ জোগাড় করতে চেষ্টা করতো। তবে এটা নিশ্চয়ই গেরুয়া পরলেই

সাধু হয় না ; তবে সে বায়ু ভুক্‌ হ'তে পারে না তাই খায়, আর সে ভাল ব'লে লোকে তাকে ভাল খেতে না দিয়ে থাকতে পারে না। ব্যষ্টির মুক্তিতেই সমষ্টির মুক্তি, বিন্দুর সার্থকতাতেই সিন্ধুর সার্থকতা। সন্ন্যাসী সমাজের চোখের সামনে ত্যাগের আলেখ্য ধরে রেখেছে। লোকে আজকাল এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করে না—কেবল বাইরে বাইরে ভেসে ভেসে বেড়ায়, তাতে কি কোন কাজ হয়—জিনিষটা যতই নাড়াচেড়া করা যায় ততই তার গুণাগুণ বুঝা যায়। আমতলা দিয়ে গেলে না—তার ফল টক্‌ কি মিষ্টি-কি ক'রে বুঝবে? ত্যাগমার্গে থাক, শাস্ত্র পড়, তা ধারণা কর্‌বার চেষ্টা কর তবেই বুঝবে সন্ন্যাস সমাজের কি করেছে, তাকে দুটি খেতে ও একখণ্ড পরতে দেওয়া যায় কি না? আজ আলোচনা এই পর্য্যন্তই থাক, সন্ধ্যা হলো এখন এস।"

রমণী এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছিল, তাঁকে প্রণাম করে বল্লে, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার উপদেশ পালন কর্ত্তে পারি। তিনি উত্তর দিলেন, "শুভ সঙ্কল্পে ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।"

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

পল্লী-ব্যথা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সাবিত্রী-প্রসন্ন এই পুস্তিকায় ছোট ছোট কবিতায় অতীতের পল্লী-জীবনের স্বপ্ন-সুখচ্ছবির আলোচনার পাশে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিষে জর্জ্জরিত নাগরিক ও গ্রাম্য সমাজের বিভৎসতা ও বিভীষিকার অন্ধকার কে গাঢ় করিয়া দেখাইবার জন্য উভয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আশা—যদি আমরা পুনরায় এই পূতি দুর্গন্ধ বিলাস ও কৌটিল্যে ভরা "আধানিক" সভ্যতা যথা—

কল্‌কাতাতে থাকেন ছেলে খরচ একটু বেশীই হয়
কারণ, জমিদারের ছেলে 'ষ্টাইলে' না রাখলে নয়,

মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব সহ তিনি বেরোন 'টুরে'-
মাস তিন চার গয়া কাশী দিল্লী এবং লাহোর ঘুরে,
আমায় যখন লেখেন—"আমার টাকার বড় টানাটানি"
পাঠাতেই হয়—একটী ছেলে রেগে কোথায় যান না জানি।
সাহেব শুবোর সঙ্গে আলাপ তাদের বাড়ী ডালি দিতে
হক্ সাহেবের বাজার থেকে দুচার ঝুড়ি পার্শেল নিতে,
অনেক আমার খরচ আছে, যদিও সেটা করাই চাই
আমারই ত খরচ সে সব, তোমাদের তা ভাবনা নাই!
মেয়ের বিয়েয় দু'দশ হাজার খরচ যদি নাই বা হ'বে
এত বড় জমিদারী রূপ দেখানর জন্য তবে?
গাড়ী ঘোড়া পাল্কী রাখায় খরচ বড় অল্প নয়,
না রাখলে যে মান থাকেনা, কাজেই সবই রাখতে হয়।
আদায় পত্র বন্ধ হ'লে কেমন করে চল্‌বে বল
হকের পাওনা পাব না হে—কথাটা এ কেমন হ'ল?

—হইতে সেই অনাবিল শান্ত সরল পল্লীর, যেথা—

"ঘর ক'খানি খড়ে ছাওয়া, মাটির দেয়াল চারিপাশে
নাই বা হ'ল দালান কোঠা তাতে আমার কি যায় আসে?

* * *

সাজ সজ্জায় নাইকো ঘটা চাদর ধুতির আদর বেশী
মিলন আছে প্রাণে প্রাণে নাইকো পাড়ায় রেশারেষি;

* * *

চায় না তারা বিলাস ব্যসন শাড়ী শাঁখায় হাস্য মুখ
চায়—হাতের নোয়া অটুট থাকুক, বজায় মাথায় সিঁদুর টুকু"

—শীতল ক্রোড়ে ফিরিয়া যাই। তুরী ভেরীর দ্বারা ঘোষিত ত্যাগ, ধর্ম্ম সেই অতীতের পল্লী সমাজে ছিল না—অন্তঃ সলিলা ফল্গুর মত নীরবে ধর্ম্ম সকল হৃদয়ে প্রেমের উৎসের সঞ্চার করিতেন—

"তাদের সকল পুণ্য কর্ম্ম ছড়িয়ে আছে ঘাটে বাটে।

পর খাইয়ে নিজে খাওয়া পরের সুখে নিজের সুখ
পরের গর্ব্বে হৃদয় ভরা পরের দুখে আপন দুখ।

* * *

সুখে তারা, দুঃখে তারা, দায় বিপদে সমান বল
তাদের হিয়ায় ধৈর্য্য স্নেহ চিরদিনই অচঞ্চল।
কাঙাল জনার দুঃখ দেখে বুক ভেসে যায় চোখের জলে
পরের শান্তি-সুখে হেথায় সুখ উপজে হৃদয় তলে।
চাষী ব'লে নাইকো ঘৃণা, দুঃখী ব'লে নাইকো হে'লা
ধূলায় ধূসর ছেলের সনে ধনীর ছেলে করছে খেলা।"

কিন্তু আজ আমরা ধর্ম্মকে তুচ্ছ আর সয়তানকে হৃদয়ের রাজা করিয়া তাহার জয় ঘোষণা করিতেছি,—

"কাঙাল দহিতে চাও যদি তবে পীড়নের মহানল
জ্বাল ওগো আজ জ্বালো,
কাঙাল সে কেন জনম নিয়েছে ভবে
মরণই তাহার ভাল।"

আজ যাহাকে আমরা "মিছে করা এই আশা, অন্ধ-ভকতি সকল করম-নাশা।" বলিয়া "ষষ্ঠীতলায় সিঁদুর মাখান জমান পাথর নুড়ি," "যুগলকিশোর পাঁচুঠাকুরের বছর বছর মেলা," "পাষাণ খণ্ডে সিঁদুর লেপা শীতলা মা" "ধর্ন্," "মাদুলী কবচ দেবতা" মানিতে আমাদের হাসি আসে, আমরা বলি "তুচ্ছ এ সব, বিপদ কভু কি নাশে?" কিন্তু সেই সরল পল্লীবাসীদের নিকট "তুচ্ছ জড়ের মাঝে, বিশ্ব-চেতনা রাজে," "পাষাণে পরাণ জাগে, যদি সে মুক্তি মাগে" একথা আমাদের অবিশ্বাসের বস্তু—কারণ প্রকৃত পক্ষে আমরা নাস্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছি এবং পল্লী সমাজকেও সেই বিষে দূষিত করিয়াছি। বিশ্ব চৈতন্যকে সর্ব্বভূতে দেখা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই সেই সরল চাষার প্রাণ আমরা হারাইয়াছি। চাষার হৃদয় তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিত—যুক্তি তর্ক নয়—সে—

"গয়লা দিদির পেটের ভাত, তার যোগাড়টা করাই চাই
মনটী যে তার দুধে-সাদা, আহা বল্‌বার কেও যে নাই;

*   *   *

ছাটার মুনিব নিয়ে আমি জমি টুকুন চষে' নেব,
কেটে মেড়ে নিজের রেখে দীন দুখীরে বিলিয়ে দেব।
খাওয়া পরা বাস-বসতের আমার কোনও কষ্ট নাই,
গাঁয়ের যারা পায় না খেতে, তাদের দেখেই দুঃখ পাই।"

আর আজিকার সভ্যতার বাণে বিদ্ধ হৃদয়া অসহায়া বুক নিঙাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চিৎকার করিতেছে,—

ওগো, সব বেচে নাও নিলামের ডাকে
কোনও কথা মোর নাই,
শুধু, 'খাড়ু' জোড়া মোর বড় আদরের
সে জোড়া ফিরায়ে চাই।"

যেখানে—"বারমাসে নাকি তের পর্ব্বণ ছিল আমাদের বাড়ী
আমাদের বাড়ী কাজ হ'লে গাঁয়ে চড়াতে হ'তনা হাঁড়ী;
ঠাক্‌মা ছিলেন অন্নপূর্ণা দুহাতে অন্ন দান
তারপরে মা তো অচলা লক্ষ্মী এলেন বাড়ায়ে মান,
ঠাকুর দাদা তো দিয়েই 'ফতুর', দানে ছিল খুব নাম।

কিন্তু—"আজ কিছু নাই আছে শুধু সেই অতীত মহিমাময়
ধ্বংস সে স্মৃতি জাগায়ে হৃদয়ে মাঝে মাঝে কথা কয়;
শালগ্রাম শিলা গঙ্গার জলে পূজা কে করিবে আর
তুলসীমঞ্চ গড়গড়ি যায় বক্ষে ধরণী মায়।"

আশা—বুক দিয়ে তাই পড়ে আছি আমি বুক চিরে চিরে ডাকি
দুঃখ তারণ দেবতা আমার সে ডাক শুনিবে নাকি?

ত্রয়ী—মহাত্মা গন্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই তিন যথার্থ ত্যাগী স্বদেশ সেবকের ক্ষুদ্র জীবন চরিত। প্রথম দুই স্বদেশ-প্রাণ মহাত্মা সম্বন্ধী বিবরণ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক লিখিত এবং শেষোক্ত মহাপ্রাণ সম্বন্ধে শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা লিখিয়াছেন। এই দেশ-নায়কদের চরিত্র সম্বন্ধে যাঁহারা সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই পুস্তিকা পাঠ করুন।

সংবাদ।

১। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম প্রিয় "ভক্ত ভাই" ভূপতি কলিকাতার অন্তঃপাতী দর্জ্জীপাড়া পল্লীতে নিজ বাসভবনে বিগত রবিবার ২২শে জৈষ্ঠ, ভোর ৬-১৫ মিনিট সময় দেহরক্ষা করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।

২। ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গৌড়ীয়-সর্ব্ববিদ্যায়তন-মণ্ডপে পর্য্যাপ্ত স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কবিরাজশ্রীযুক্ত শ্যামদাস বাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ (ন্যাশনাল আয়ুর্ব্বেদ কলেজ) ৬৪নং বলরাম দে ষ্ট্রীটে (সিমলা) স্থানান্তরিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রায় সমস্ত পণ্ডিত কবিরাজই ইহার অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তারী বিভাগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্যগণ ও ইহার প্রয়োজনানুরূপ সহায়তা করিবেন।

৩। সানফ্রানসিস্‌কো নগরীর অন্তর্গতঃ পল্‌এলডার নামক গির্জ্জায় শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দ ("Noted Sanskrit Scholar and Philosopher of India") ব্রহ্ম সম্বন্ধে রাল্‌ফ্ ওয়ালডো ইমারসন্ (The Concord Sage) যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধীয় গভীর মর্ম্মস্পর্শী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২রা এপ্রিল শনিবার ২॥০ ঘটিকা)

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ সুদীর্ঘ আমেরিকা প্রবাসের পর ভারতে ফিরিতেছেন। বর্ত্তমান জুলাই মাসে রওনা হইয়া জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশে পৌছিবেন—খবর পাইয়াছি।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের বিবরণ।

মিশনের সেবকগণ যে আসামপ্রত্যাগত দুর্দ্দশাপন্ন কুলিগণের সেবার জন্য চাঁদপুরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন শ্রীভগবানের কৃপায় এখন সে কার্য্য শেষ হইয়াছে। ২৯শে মে হইতে মিশন এক সপ্তাহের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আর্ত্তবিপন্ন কুলিগণের সকল প্রকার সেবা কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। এই কার্য্যে মিশন ফণ্ড হইতে ২৮৭৯৯৶১৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। হিসাব আগামী মাসে বাহির করিব। কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণ, মাড়োয়ারী সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ, স্থানীয় এবং মফঃস্বলের দাতৃগণ এবং সকল সেবকগণকে মিশন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকগণের সেবার জন্য মিশন হইতে গত ১২ই জুন ৩জন সেবক প্রেরিত হন। আপাততঃ তাঁহারা শ্যামনগর থানার ১টী ইউনিয়ন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। "এই থানাটীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃস্থ। ২।৩টী গ্রাম ব্যতীত সকল গ্রামগুলিই ঐরূপ। কার্য্যাভাবে লোকে অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ এবং না খাইতে পাইয়া মরিবার মত হইয়াছে। কাহারও পরিধানে একখানি আস্ত কাপড় নাই, অনেকের দিকে চাহিতে পারা যায় না। বস্ত্রের বিশেষ অভাব। বহু স্ত্রীলোক গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন না। এই থানার সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করিয়া কাজ করিতে সপ্তাহে ৮০০৲ টাকা ও বস্ত্রের প্রয়োজন হইবে। সহৃদয় জন সাধারণের নিকট নিবেদন—অর্থ কিংবা বস্ত্র যিনি যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

(স্বাঃ) সারদানন্দ

(১) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়, জিলা হাবড়া।

(২) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন,

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

জগত আজ সপ্তবর্ষব্যাপী নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিগ্রহের পূজোপকরণে সমাকীর্ণ। উদ্দেশ্য—মনুষ্য সমাজের উপর স্বাধিপত্য। যদিও প্রতি জাতিই বরাবর বলিয়া আসিতেছেন যে তাঁহারা শান্তিকামী হইয়াই নির্য্যাতিতের উদ্ধারকল্পে অসি ধারণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অন্তরের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা ছিল আধিপত্য। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক রণনায়কেরাই বুঝিতেছেন যে যেখানে আধিপত্য এবং উৎপীড়ন সেখানেই দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ। তরবারির দ্বারা সমাজ-তরুর ছেদন করিয়া কদাচ শান্তির ফল—সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতাকে ভোগ করা যাইতে পারে না। তাই আজ ব্রিটিশ সম্রাজ্যের প্রধান সচীব লয়েড জর্জ্জ, কোন ধর্ম্মসভায় আহুত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন, "The conscience of peoples must be trained so as to abhor bloodshed as crime and churches must create the atmosphere". "বিশ্বের বিভিন্ন জাতির বিবেক এরূপে দীক্ষিত করিতে হইবে যেন রক্তপাতকে সকল মানুষ গর্হিতজ্ঞানে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করে—দেশের ধর্ম্মমন্দিরাদিকেই ঐরূপ আবহাওয়ায় সৃষ্টি করিতে হইবে।"—কারণ যাঁহারা যথার্থরূপে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারাই নিরপেক্ষভাবে জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারেন। যে হেতু তাঁহারা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন যে একই সদাপ্রভু বিভুরূপে ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা, ধার্ম্মিক পাপীর অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান। প্রেমই তাঁহাদের স্বভাব—স্বার্থে

নয়, ত্যাগেই তাঁহাদের দীক্ষা। তাঁহারা কদাচ নিজ ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা জাতিগত আকাঙ্ক্ষা-লালসার পরিতৃপ্তির জন্য, নরসমাজের এক পক্ষ না এক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া, জগতের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। ইহার উদাহরণস্থল ভারতবর্ষকেই ধরা যাইতে পারে। ভারতীয় সমাজ এত সমন্বয়-প্রাণ, গঠনশক্তি সম্পন্ন তথা বহুকালব্যাপী দাসত্ব ও নানা অত্যাচার ব্যাভিচারের মধ্যেও এত স্থিতিশীল কেন?—ইহা ঋষি প্রণীত বলিয়া। অবস্থাভেদে ব্যবস্থা এবং অতি উদার ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া—যে ধর্ম্ম ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া সকলকে উন্নতির মার্গে লইয়া যায়। (অবশ্য এস্থলে যথার্থ ভারতীয় ধর্ম্মই আমাদের উদাহরণ, ধর্ম্মের ব্যভিচারকে উদ্দেশ্য করিয়া আমরা বলিতেছি না। ভারতের হীনতা তাহার যথার্থ ধর্ম্মের পরিপালনে নয়, তদ্ধর্ম্মের ব্যভিচারে।)

* * *

অতঃপর তিনি বলিতেছেন "There must be some less barbarous way of settling industrial disputes than the war of starvation. Churches could engerminate a spirit of goodwill between classes with greater readiness to consider each other's point of view." "শিল্প ও বাণিজ্যগত বিবাদ মিটাইবার জন্য অবরোধ প্রথাদি বর্ব্বরোচিত উপায় অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট পন্থা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহানুভূতি ও পরস্পরের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ভাব সমাজ শরীরে ছড়াইতে ধর্ম্মমন্দিরাদিই সক্ষম হইতে পারে।" প্রাচীন ভারতে ছিলও এইরূপ। ঋষিরা ঈশ্বরধ্যান-পরায়ণ বিবিক্ত দেশসেবী ছিলেন। রাজা প্রজায় বিবাদ ঘটিলে তাঁহারাই মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষের স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করিয়া নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবাদের সমাধান করিতেন। তাঁহাদের তপস্যা ও শাপবজ্রকে উপেক্ষা করিয়া কোন ক্ষত্রিয়ই সে সিদ্ধান্তে অন্যথাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। মাত্র বিশেষ দুই স্থলে ব্রাহ্মণের অস্ত্র পরিচালন দৃষ্ট হয়। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের

অত্যাচারে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন এবং দাম্ভিক বেণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা কুশ-বজ্রের সৃষ্টি করেন। কিন্তু সসাগর পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রজাদের ভোগের নিমিত্ত দান করিয়াছেন। এবম্বিধ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহারা রাজাজ্ঞা মানিয়া চলিতেন এবং বিপদে রাজার দারস্থ হইতেন। কারণ, প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে সংসারে সংশ্লিষ্ট হইলে ঋষির ঋষিত্বের হানি হয়। লয়েড জর্জ্জ অন্যত্র "The interference by a religious organisation in the task of government" "শাসন কার্য্যে কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ করা" অনুচিত, এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহা যদি উপর্যুক্ত কারণে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সত্য। আর যদি প্রভুত্বের হানির আশঙ্কায় বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার প্রথমোক্ত বাক্যের সহিত শেষোক্ত বাক্যের বিরোধ ঘটে।

*　　　　*　　　　*

এক্ষণে "বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহানুভূতি ও পরস্পরের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ভার সমাজশরীরে ছড়াইতে ধর্ম্ম মন্দিরাদি সক্ষম হইতে পারে"—কি প্রকারে? এমন এক উদার ধর্ম্মভাব প্রচার করিতে হইবে যাহার ভিতর 'আমার মত এবং পথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার অনুসরণ বিনা নরকে যাইতে হইবে' এই আসুরিক বাণীর স্থানই নাই এবং যাহা আধুনিক অপরাবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যের সহিত অতিউচ্চ পরাবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়া অতি নিম্নস্তরের ধর্ম্ম সকলেরও প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে, সকল মানবের অন্তর্নিহিত সত্যকে জাগ্রত করিয়া একত্বের বিধান করিবে। জড়বিজ্ঞান যেমন জগতের একত্ব স্থাপন করিয়াছে, অদ্বৈতবেদান্ত সেরূপ আত্মার একত্ব স্থাপন করিয়াছে; এই ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ এবং বিবেক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া উভয়কেই গ্রহণ করিবে। জড়বিজ্ঞান যেরূপ বলিতেছে যে পাপী ও ধার্ম্মিকের দেহ একই উপাদানে গঠিত, সেইরূপ অদ্বৈতবেদান্ত বলিতেছে, উভয়েতেই একই আত্মা বর্ত্তমান—একজন বলিতেছে অবস্থার তারতম্য, আর একজন বলিতেছে বিকাশের তারতম্য। স্বাস্থ্যবান

লোক যেমন পীড়িতকে ঘৃণা করিতে পারে না সেইরূপ ধার্ম্মিক, বা বলবানের, পাপী বা দুর্ব্বলের প্রতি ঘৃণা বা অত্যাচার করার কিছুমাত্র সত্ব নাই বরং সেখানে সমধিক যত্নেরই প্রয়োজন।

* * *

সেইহেতু উপর্যুক্ত ধর্ম্ম যাহারা যথার্থরূপে জীবনে প্রতিফলিত করিয়া, দেহ চিত্ত এবং আত্মার সমতা লাভ করিয়াছেন এইরূপ একদল নিরপেক্ষ বিচারক বা মধ্যস্থের জগৎ পরিচালন বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজন ঘটিয়াছে, যাহারা মানব সমাজের অন্তর্গত বর্ণ, জাতি, আশ্রম এবং ব্যক্তিত্ব বৈচিত্র্যের মধ্যেও আত্মার একত্ব ও স্বাধীনতা প্রচারের দ্বারা শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করিবেন।

(শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী)

ভারতের স্বারাজ্য-সিদ্ধি আজ বহু দিন হতে তাঁর "জ্যোতিরিবাধূমকঃ" নয়নদুটী নিমীলিত করে বসে আছেন বলে অন্ধকারে নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছেন না। তাই কিছু দিন পূর্ব্বে বেদান্ত কেশরী পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঐ চক্ষু উন্মীলনের জন্য উদ্বোধনের বাণী প্রচার করে গেছেন। সম্প্রতি স্বপ্রকাশকে বিজলী প্রভৃতি জাড্যালোকে তাঁর স্বরূপ দেখবার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য আলো জেলেই অন্ধকার দূর করতে হয় সত্য, কিন্তু যাঁকে লক্ষ্য করে উপনিষদ্ বলেছেন "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," তাঁকে আর "নেমা বিদ্যুতো ভান্তি।" তাই বিজলীর আলোতে কেউ দেখছেন—হারিয়ে গেছে আমাদের স্বরাজ্য গড়বার 'স্ব'টুকু; এখন ঐ 'স্ব'টুকু খুঁজে পাওয়া না গেলে স্বারাজ্য-সিদ্ধি ত দূরের কথা, 'রাজ্য'টাই ঠিক ঠিক গড়ে উঠছে না। কেউ দেখছেন—ওটা এদেশে কখনো ছিল না, বিলেত থেকে আমদানি করতে হবে। আবার কেউ দেখছেন—এদেশেই আছে—তবে ভট্‌চায্যি মশায় মাদুলিতে পুরে বর্ণাশ্রমের বাক্সতে বন্ধ করে চাবি হারিয়ে ফেলেছেন। এ ছাড়াও তাঁদের আর এক দুর্ভাবনা হয়েছে এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত

'স্ব' নিয়ে এক একটা 'রাজ্য' গড়ে বসলে শেষে তেত্রিশ কোটি স্বরাজ্যের ঠোকাঠুকিতে একটীও টিকবে কি না।

এখন স্বরাজ্যের এই শূন্যবাদ পাছে সংক্রামক হয়ে পড়ে বলে, আচার্য্য বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তারই কিছু এখানে উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলাম।

স্বামীজি বলেছেন, সত্তা আর বোধ একই বস্তু বলে যেমন শঙ্করের মতে "নানয়োঃ পরস্পর ব্যাবৃত্তিরস্তি," তদ্রূপ স্বরাজ্য বলতে 'স্ব' ও 'রাজ্য' দুটো পৃথক্ জিনিষ একসঙ্গে জোড়া নয়; উহা একই মুদ্রার এপিট ওপিট। আর 'আধানিক' বিজলীর আলোতেও যখন রাজ্যটার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তখন আর 'স্ব'টা হারিয়ে গেছে বলে শঙ্করের "দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য" বাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করা আদৌ সঙ্গত নয়। আমাদের 'স্ব'ও হারায়নি, 'রাজ্য'ও হারায়নি; স্বামীজি বলেছেন—আমাদের হারিয়ে গেছে সেই বল, যাকে লক্ষ্য করে উপনিষদ্ বলেছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

স্বামীজি আরও বলেন, কেবল অনুভব করছি বলেই যখন জগৎটাকে আছে বলতে হচ্ছে, তখন প্রতি নিশ্বাসে—প্রতি পাদক্ষেপে স্বরাজ্য উপলব্ধি করে আর নেই বলা চলে না। আর শুধু যে কেবল উপলব্ধি করছি বলেই স্বরাজ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তা নয়; স্বরাজ্যই আমাদের স্বভাব—আমাদের স্বরূপ। আমরা স্বরূপতঃ যা, তা সম্রাট্ স্বরূপ—রাজা স্বরূপ; জাগতিক কোন শক্তিই আমাদের এই চির প্রাপ্ত অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারে না। কেবল আমরাই সেই বল হারিয়ে উহা হতে বঞ্চিত হয়েছি, যে বল হারিয়ে সিংহ শাবক নিজেকে মেষ তুল্য মনে করেছিল। আর এই জন্যই স্বামীজির ঔপনিষদিক চরম উপদেশ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

স্বামীজি বলেন, স্বরাজ্য কেবল আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই লাভ হতে পারে; কোন শাস্ত্র, কোন ব্যক্তি অথবা কোন জাতি আমাদের স্বরাজ্য দিতে পারে না। সুতরাং ভট্‌চায্যি মশায়ের উপর দোষারোপ না করে, দোষ আমাদের নিজেদের ঘাড়েই নিতে হবে। তিনি বলেন,

যতদিন না আমরা আমাদের নিজের ঘাড়ে দোষ নেওয়ারূপ বল লাভ করতে পারছি, ততদিন আমরা কোন মতেই স্বরাজ্য লাভের যোগ্য নই। তাই সেই বেদান্ত কেশরীর চরম উপদেশ—"নিজ হস্তে রজ্জু—যাহে—আকর্ষণ।"

স্বামীজি বলেন, এই যে তেত্রিশ কোটি স্বরাজ্যের কল্পনা, এটাও কেবল ঐ বল হারিয়ে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝতে না পারাতেই ঘটেছে। তিনি বলেন, যখন বল লাভ হবে, তখন আমরা স্পষ্টই দেখতে পাব—আমাদের ব্যক্তিগত 'স্ব' কোথায়। চিন্তা, ভাব মন, শরীর—এমন কি, জ্ঞানের পর্য্যন্ত অহরহঃ পরিণাম হচ্ছে; সুতরাং ব্যক্তিগত পরিণামশীল 'স্ব' এর ব্যক্তিত্ব বা 'স্ব' বলে কিছুই থাকতে পারে না। তবে কেবল তখনই আমাদের ব্যক্তিত্ব বা 'স্ব' সম্ভব, যখন আমরা সমগ্র জগতের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে জাগাতে পারব। আর যখন সেই 'স্ব', সেই ব্যক্তিত্বে আসবে, তখন "কেন কং পশ্যেৎ।" অতএব, স্বরাজ্য আমাদের আছেই; তবে কেবল নেই সেই বল, যে বল ছিল না দেখে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

এখন শেষ কথা এই যে, এই সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা না করে, কি করে সেই বল লাভ হবে, ধীর শান্ত ভাবে আচার্য্যের কাছে তার উপায় জিজ্ঞেস করা।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস,—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়! * * * নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্য্যবান হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক।"—বিবেকানন্দ।

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(৫)

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

ইউরোপীয় জড়বাদ আমাদের একেবারে মাটী করে ফেলবার দাখিল করেছে তা আমাদের দেশ এখন একটু আধটু বেশ বুঝতে পেরেছে। আমরা চাই যে আমরা প্রত্যেকেই কর্ম্ম-কুশল হই কিন্তু এই কর্ম্ম-কুশলতা যে আমরা কেবল দেখাতে পারি ধর্ম্মের দিক দিয়ে, ইউরোপী জড়বাদের মধ্য দিয়ে নয়, সে রাস্তায় চলতে গেলে যে আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তা আমাদের দেশ দিন দিন বেশ বুঝছে। "যদি কেহ আমাদিগকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে; আমরাও যদি আবার কোন যুদ্ধ-প্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রিয়াশীল দেখিতে চাই, আমরাও তদ্রূপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্যেরা আসিয়া দেখুক আমরা তাহাদেরই ন্যায় কর্ম্মী—আমরা এখনও জীবিত রহিয়াছি। এই সকল ভাবিয়া আমরা যে আদৌ পূর্ব্বাবস্থা হইতে হীন হইয়া পড়িয়াছি, এই কথাতেই আমার বিশ্বাস হয় না।"—আচার্য্য অত্যাশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে ভারত ভারতী হৃদয়ান্তর্গত এই সুপ্ত শক্তিকে আবিষ্কার করে জনসাধারণে সেই সত্যের আবার প্রচার করলেন—যে সত্য সবিতা আজ ভারত গগন উদ্ভাসিত করে প্রকাশ হচ্চেন—আজ যাহার আলোক স্পর্শে কোটি হৃদয়ের সহস্রদল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। "আমার মনে হয়, আমার দ্বারা যে যতটুকু সামান্য কার্য্য হয়েছে, যদি তাহার জন্য সমগ্র জাতি এতদূর প্রশংসা করে, তবে আমাদের পরে যে সকল মহা মহা দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীর মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই জাতির নিকট হইতে না জানি আরও কত প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিবেন। ভারত ধর্ম্মভূমি। হিন্দু, ধর্ম্ম—কেবল ধর্ম্মই বুঝে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু

* উদ্ধৃতাংশগুলি মনমাদুরা ও মাদুরা অভিনন্দনের উত্তর হইতে

কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে যে, ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রতস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পার যে, ইহা সত্য। সকলেই দোকানদার হউক, বা স্কুল মাষ্টার হউক বা যোদ্ধা হউক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই সামঞ্জস্য পূর্ণ জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাব লইয়া এক মহাসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিবে।"

এত দারিদ্র্য অত্যাচার যাতনার মধ্যেও ধর্ম্ম কেন্দ্রীয় নব জাগরণ দেখে মনে হয় যে সত্য সত্যই ভারত ভারতী জাতীয় ঐক্যতানের আধ্যাত্মিক সুর বাজাইবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক চির নিযুক্ত। আর এই নব জাগরণের কারণ, আমরা আমাদের মহামহিমান্বিত পূর্ব্ব পুরুষদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে মহান্ তত্ত্বরাশি পেয়েছি তা এখনও আমরা ভুলি নি, আমাদের জাতীয় হৃদয় এখনও অটুট রয়েছে, আমরা এখনও জাতীয় আদর্শ হতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইনি। কিন্তু একথা সত্য বলে মেনে নিলেও, কেন আমরা মাটি হয়ে যেতে বসেছি একথার উত্তর দিতে গেলে, আমাদিগকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, এই মাটি হবার কারণ বাইরে থেকে যতটা না এসেছে ভেতর থেকে তার চাইতে বেশী উঠেছে। দোষ আমাদের নিজেদেরই। ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক কেন মুসলমান হল, দেড়শ বৎসরের মধ্যেই দশ লক্ষের উপর খৃষ্টান হয়ে গেল কেন! এ দোষ কাদের! এই নিম্ন শ্রেণীদের স্বধর্ম্ম ত্যাগের জন্য দায়ী কারা? উত্তরে আচার্য্য বলচেন্ "আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—'যখন অনন্ত জীবন নির্ঝরিণী নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিবে কেন'? প্রশ্ন এই,—ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে? আমি ইংলণ্ডের জনৈক সৎ বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম—সে অসৎ পথে পদার্পণ করিবার—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়, এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন

আমায় কেহই সাহায্য করিবে না, কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।”

এখন আমরা তাদের হারিয়ে নিজেদের যে কতদূর দুর্ব্বল করে ফেলেছি তা বুঝতে পেরে বুক চাপড়াচ্ছি। এর পূর্ব্বে আমরা তাদের জন্য কিছুই করিনি তাদের ঘৃণাই করে এসেছি, স্পৃশ্য বলে দূর দূরই করেছি। কিন্তু সেই তারাই, সেই ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জাতিই যাদের এক পুকুরে জল খেতে দেওয়া হয়নি, এক রাস্তায় হাঁটতে দেওয়া হয়নি, উচ্চ বর্ণের সেবা ছাড়া অপর সকল ধর্ম্ম ও মোক্ষের পথ রুদ্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছিল, তারাই যখন দেখলে যে মুসলমান রাজত্বে মুসলমান হলে, খৃষ্টান রাজত্বে খৃষ্টান হলে ব্রাহ্মণেতর উচ্চ সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য করা যেতে পারে, তাদের নিকট থেকে সম্মান জোর করে আদায় করা যেতে পারে, তখন তাদের নিকট হতে যথেচ্ছাচার, হৃদয়হীন, অশাস্ত্রীয়, দেশাচারা, কুলাচার, স্ত্রীআচার প্রধান ধর্ম্ম ত্যাগ করা ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের ক্ষয়ের কারণ এই আমরা উচ্চ বর্ণেরাই। আমরা আমাদের বাপ পিতামহের ধর্ম্ম, যা আকাশের চেয়েও নির্ম্মল ও প্রশান্ত, যা সমুদ্রের চেয়েও গম্ভীর, নানা ভাবলহরী যুক্ত, সাধারণকে তার দ্বারা উন্নত না করে নিজেদের সমাধি নিজেরাই খনন করচি। আমরা যদি নিজেরা জ্ঞানসম্পন্ন এবং উদার হ’তাম্ তাহলে জড়বাদ বা মুসলমান, খৃষ্টান কেউ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। দেহ অনিয়ম, অত্যাচারের দ্বারা দুর্ব্বল হলেই দেহের মধ্যে রোগের বীজাণু ঢোকে। সবল দেহ মন যুক্ত লোক মড়কের মধ্যে বাস করেও সুস্থ থাকে। এখন দোষ কার এই বিচার করতে গিয়ে বিদেশীর উপর সকল দোষ না চাপিয়ে এই দোষের প্রতিকারের জন্য কায়মনবাক্যের প্রয়োগ করাই যুক্তিসিদ্ধ।

আমরা বহু বর্ষ যাবৎ ছোট ছোট জিনিষে মাথা ঘামিয়ে শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছি, বড় বড় আদর্শের জন্য চিন্তা করবার অবসর আর আমাদের নেই। তাই আচার্য্য বলচেন, “গত ৬০০।৭০০ বৎসর ধরিয়া কি ঘোর

অবনতি হইয়াছে, দেখ। বড় বড় মদ্দরা শত শত বর্ষ ধরিয়া এই মহা বিচারে ব্যস্ত যে, এক ঘটি জল খাব ডান হাতে কি বাঁ হাতে, হাত তিনবার ধোব না চারবার, কুল্‌কুচো করব পাঁচবার কি ছয়বার। যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় ও এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় মহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন লিখিতে ব্যস্ত তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পার? আমাদের ধর্ম্মটা রান্নাঘরেই ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে, এইরূপ আশঙ্কা বিলক্ষণ রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নহি, পৌরাণিকও নহি, তান্ত্রিকও নহি—আমরা এখন কেবল 'ছুঁৎমার্গী' আমাদের ধর্ম্মমন্দির এখন রান্নাঘর। আমাদের ঈশ্বর হইয়াছেন ভাতের হাঁড়ি আর মন্ত্র 'আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা আমি শুদ্ধ'। যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেকেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে।" যখন মানুষের দেহ মন দুর্ব্বল হয় তখন মৌলিক চিন্তা আর তাদের নিস্তেজ মস্তিষ্কে স্থান পায় না, কার্য্যকরী শক্তি হারিয়ে জীবন সংগ্রামে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য গণ্ডির পর গণ্ডি টেনে শেষে শ্বাসরোধে প্রাণ হারায়।

এখন এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোর জন্যে মাথা না ঘামিয়ে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় বেদান্তের এই আত্মবলি রূপ মহান্ আদর্শের অনুবর্ত্তী হয়ে জীবনকে সার্থক করাই বাঁচবার একমাত্র উপায়। পরার্থে সর্ব্বস্ব দানই আমাদের আদর্শ। আর এই ভারতবর্ষে অন্ন দান কার্য্য যথেষ্ট হয়েছে। জগতের একমাত্র এখানেই ভিক্ষুকও তার ভিক্ষালব্ধ অন্ন থেকে দান করতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু বিদ্যা দান ও ধর্ম্ম দানে আমরা চিরকালই কৃপণ। আচণ্ডালে এই দান আমাদিগকে করতে হবে। আর এই কার্য্যে "যদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া ভাবের ঘরে একবিন্দু চুরি না রাখিয়া কাযে লাগিয়া যাই, তবে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমুদয় সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে—বিরুদ্ধ মতাবলম্বী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্য্যগণের ন্যায় উন্নত হইবে।" আর তা না

হলে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, বিরহ যুক্ত পশুত্ব ভোগে জীবনের তাৎপর্য্য কি ?

এ জগতে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্ট হয়ে থাকে যে যখনই কোনও জাতির বাঁচবার জন্য কোনও শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে তখনই অপর জাতি হতে, সেই শক্তি, যেখানে খুব তাজা অবস্থায় আছে, এসে সেই মৃতপ্রায় জাতিকে নূতন জীবনে উদ্বোধিত করে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই জাতি যে গৃহীতা, দাতার আসন গ্রহণ করে সেই আগন্তুক জাতিকে গৃহীতায় পরিবর্ত্তিত না করতে পারে তবে তার হয় ধ্বংস; আর না হয় অনুকরণ প্রাণ হয়ে সেই অগন্তুক শক্তিমান জাতিতে মিশিয়ে যেতে হয়। ভারত যে বেঁচে আছে তার কারণ যখনই কোনও বিদেশী শক্তি তার মধ্যে এসে পড়ছে তখনই সে তার ভাব হজম করে তাকে যা দেবার তা তাদের দিয়েছে। সে কেবল জগতে শিষ্য হয়ে বেঁচে নেই গুরুর আসনও সে বরাবর রক্ষা করে এসেছে। কি এক প্রাকৃতিক বিধানে আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হতেই একবার নয় দুইবার নয় বহুবার যেথানেই ধর্ম্মের অভাব ঘটেছে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহার অদ্ভুত হৃদয় ও মস্তিষ্ক প্রসূত উদার ধর্ম্মের অংশ বিশেষ সেখানে গিয়ে সে জাতির আধ্যাত্মিকতা সম্পাদন করেছে, পক্ষান্তরে অপরাপর জাতিরও রাজনৈতিক, সামাজিক বা যা কিছু দেবার আছে তা ভারতকে দেওয়ায় উভয় জাতির সামঞ্জস্য বিধান হয়েছে। ভারতবর্ষের সহিত এই আদান প্রদান মিশর, ব্যাবিল, কালদে, পারস্য, গ্রীক ও আরবের সহিত ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশের পূর্ব্বে হয়েছে এবং বর্ত্তমানে এই ইংরাজ প্রাধান্যকালে সে আপন বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালনে নিযুক্ত। "যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, পাশ্চাত্যদিগের সম্মিলিতভাবে কার্য্যপ্রণালী ও বাহ্য সভ্যতারভাব আমাদের দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন বন্যায় পাশ্চাত্য দেশকে ভাসাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে।" আমারাও পাশ্চাত্যদেশীয় জড়বাদ প্রধান

সভ্যতা প্রভাবের সম্পূর্ণ প্রতিরোধে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্য সভ্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতার আবশ্যক। তাহা হইলেই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। আমাদিগকে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব শিখিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে আমাদের নিকট সব শিখিতে হইবে তাহা নহে। সমগ্র জগৎ যুগযুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ-জগতের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহার আবির্ভাব হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এতদুদ্দেশে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে দেওয়া উচিৎ।" এই সামাজিক সম্পূর্ণতা আমরা আমাদের জীবনে না দেখে যেতে পারি, কিন্তু প্রাণপণ করে ওর জন্য আমাদের খাটতে হবে যাতে আমাদের সন্তান সন্ততিদের সেই আদর্শে পৌছিবার রাস্তা আরও সুগম হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই এই বিরাট দায়িত্বভার নিজের মাথার ওপর নেওয়া উচিৎ, প্রত্যেকেরই মনে করা উচিৎ যে মনুষ্য সমাজের সম্পূর্ণতা তারই নিজ ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করচে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে বিরাট ভারত-ধর্ম্ম-সাগর গভীর কল্লোলে স্ফীত হয়ে উঠছে জগৎকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় ভাসাবার জন্য। ভারতের নানা অংশে নানা ভাবাদর্শের স্ফুরণ যা সম্প্রদায়শীর্ষদের মধ্য দিয়ে ত্যাগতিতিক্ষা রূপে বেরুচ্চে তা সেই মহাসাগরেরই পূর্ণ বিস্তারের পূর্ব্বে বৈচিত্র্যময়ী ভাবলহরীর ক্রীড়া চাঞ্চল্য মাত্র। কিন্তু আবার বিপদের আশঙ্কাও আছে। এই প্রবল পুনরুত্থানের সঙ্গে ভয়ানক গোঁড়ামি এসে সমাজ অঙ্গ দুষ্ট করে। কখনও কখনও লোকে এত পাগলামীর বাড়াবাড়ী করে ফেলে যে অনেক সময় যাদের চেষ্টায় এই জাগরণ আরম্ভ হয়, কিছুদূর অগ্রসরের পর তাঁরাও আর প্রবৃত্তি পরিচালিত জনসাধারণের চাঞ্চল্য নিয়মিত করতে পারেন না। "আমাদের দুই পথের মাঝামাঝি চলিতে হইবে। এক দিকে কুসংস্কার পূর্ণ প্রাচীন সমাজ অপরদিকে জড়বাদী ইউরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা * *। এই দুইটী হইতেই সাবধান হইতে হইবে।

প্রথমতঃ আমরা কখন পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারি না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা। মনে কর, যদি তোমরা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিতে পার, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে—তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ ইহা অসম্ভব। সময়ের প্রারম্ভ হইতে মানব জাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটী নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তুমি কি উহাকে উহার উৎপত্তি স্থান হিমালয়ের তুষারময় শৃঙ্গে লইয়া যাইতে চাও? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব।"

কিন্তু এদিকে আবার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আমরা আমাদের গ্রাম্য দেবতা সম্বন্ধীয় কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কুসংস্কার পূর্ণ অথচ পরস্পর বিরোধী দেশাচারকেই যেন ধর্ম্ম বলে নিয়ে বসে না থাকি। এক দেশে যা সদাচার অপর দেশে তা অসদাচার। কিন্তু প্রত্যেক দেশের অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ গ্রামের আচার পদ্ধতি জগৎকে জোর করে মানবার জন্য ব্যস্ত—আর সকল বিবাদের আরম্ভ হচ্চে ঐ 'মাতুয়ারা' বুদ্ধি থেকে। "উদাহরণ স্বরূপ দেখ, দক্ষিণাত্যের একজন, ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে একটুকরা মাংস খণ্ড খাইতে, দেখিলে ভয়ে দু'শহাত পিছাইয়া যাইবে—আর্য্যবর্ত্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত—পূজার জন্য তিনি শত শত ছাগ বলি দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাঁহার দেশাচারের দোহাই দিবেন।"

এত গেল গ্রাম্য আচার ব্যবহার। এরপর আবার দেখা যায় শাস্ত্রীয় আচর ব্যবহারও কোনও কালে স্থির নয়। দেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন স্মৃতি বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ চিরকালই সমান। সেই অনাদি অনন্ত সার্ব্বভৌম মহাব্রত দেশকাল পাত্রকে অপেক্ষা না করে চিরকালই অব্যাহত ভাবে মানবকে অনন্তের পথে অগ্রসর করছে। এ সকলের আলোচনা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে করে এসেছি। আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন চিরকালই হবে কারণ কোনও জাত যদি

বাঁচতে চায় তাহলে আচারে মৌলিকত্ব না দেখালে বাঁচতে পারে না। যখনই কোনও জাতি আচারে ব্যবহারে চিন্তায় মৌলিকত্ব হারিয়েছে তখনই যন্ত্রপ্রায় হওয়ায় তা'দের উপর মৃত্যুর ছায়া এসে পড়েছে, এ বহুবার দৃষ্ট। "মনে রাখিও এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকালই পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড় লোক আসিলে ছাগ ও গো হত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান প্রথা ছিল; ক্রমশঃ সকলে বুঝিল আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী সুতরাং ভাল ভাল ষাঁড়গুলি মারিলে সমগ্র জাতিরই ধ্বংস হইবে। এই কারণেই গো হত্যা প্রথা রহিত করা হইল—গো হত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়ত এমন আচার সকল প্রচলিত ছিল, যাহা এখন আমরা বীভৎস জ্ঞান করি। ক্রমশঃ সে গুলির পরিবর্ত্তে অন্য বিধির প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ঐ গুলিরও আবার পরিবর্ত্তন হইবে, তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটীই বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্তু স্মৃতির প্রধান্য যুগ পরিবর্ত্তনেই শেষ হইয়া যাইবে।"

অক্লান্ত কালস্রোতের প্রতি তরঙ্গশীর্ষে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়ে থাকে আর তাঁরই নিঃস্বার্থ জনহিতকর নিয়মাবলী জগতকে দান করে উন্নতিরদিকে এগিয়ে দেন। সেই ঈশ্বরকল্প মানবেরা স্বার্থ সাধন বা নামের জন্য নিজ শক্তি বিকাশ করেন না পরন্তু লোক কল্যাণের নিমিত্তই তাঁদের আগমন। চেলা চাপাটিরাই তাঁর প্রতি প্রীতির নিমিত্ত নানা প্রকার গোড়ামীর সৃষ্টি করে সকল অনর্থের উৎপাদন করে। যদি কোন বিংশ শতাব্দীর লোকের সহিত খৃষ্ট বা রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাহারা যদি জিজ্ঞাসা করে 'হাঁ মশাই, আপনারা কি নিজ নাম প্রচারের জন্য এত সাধ্য সাধনা জগতে দেখিয়ে গিয়েছেন?' তখন তাঁরা কি উত্তর দেবেন? তাঁরা নিশ্চয় বলবেন 'আমরা থাকি বা না থাকি তাকে

এসে যায় না কিন্তু সত্য অবিনাশী। আমরা সেই সত্য সচেষ্টা বলে লাভ করেছি এবং জগতকে পথ দেখিয়েছি। তোমরাও যে পথ হয় অবলম্বন করে সত্যকে লাভ কর। সেই সত্যকে লাভ করতে তোমার পথে যদি লাখ বিধি-নিষেধের দরকার হয় তা মান, আর যদি সেগুলো অন্তরায় স্বরূপ মনে কর তবে নির্ম্মম ভাবে ত্যাগ কর।' 'আমার পথই একমাত্র পথ' প্রভৃতি তথাকথিত ভগবদবাণী চেলাদের সাজান কথা। কিন্তু গাছ যখন ছোট থাকে তখন ব্যাড়ার দরকার হয়, শিশুকে অপরের সাহায্যে অক্ষর পরিচয় করতে হয়। আবার নূতন—ভুঁইফোড় একটা কিছু নয়—পুরাতনের সঙ্গে চিরন্তন শৃঙ্খলে সে বদ্ধ নচেৎ ক্রমোবিকাশের অর্থই হয় না—কিছু না থেকে কিছু হোতেই পারে না। "আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু, তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদিগকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মত উন্নতিশীল হইতে হইবে আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমান কালের চির সঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে—হিন্দুই কেবল প্রাচীন প্রথার সম্মান করিতে জানে। সাদা কথায় বলি, সব বিষয়ই আমাদিগকে মুখ্য ও গৌণ উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য বিষয়গুলি সর্ব্বকালের জন্য—গৌণ তত্ত্বগুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি সময়ে সেইগুলির পরিবর্ত্তে অন্য প্রথা সকল প্রবর্ত্তন না করা হয়, তবে সেগুলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমাদিগকে প্রাচীন আচার পদ্ধতিসমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে—অতিশয় কুৎসিৎ আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরই করিও না—এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীতকালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনপ্রদ ছিল। যদি এখন সেইগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময় সেইগুলির নিন্দা করিও না। বরং উহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ মহৎ কার্য্যের সাধন হইয়াছে, তাহার জন্য তাহাদিগের প্রশংসা কর ও তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

কে তুমি ?

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু)

(বাউল সঙ্গীত)

কে তুমি আমি সেজে মনের মাঝে কও কথা
বলহে বল তোমার বসতি কোথা !
তুমি রাজা উজীর, ফকির কি আমীর,
উদাসী কি গৃহবাসী, বিলাসী কি বীর,
তুমি বিষয়ী কি ব্রহ্মচারী, বল স্বরূপ বারতা !
তুমি অযোনি কি সর্ব্বযোনি, পুরুষ কি নারী,
যুবা বৃদ্ধ, কিম্বা তুমি কুমার কুমারী,
সংযমী কি ব্যভিচারী, অসতী পতিব্রতা ?
তুমি চোর কি সাধু, নফর কি নেতা,
তুমি অস্থি কি মেধ, শোণিত কি স্বেদ, চিত্ত কি চেতা,
তুমি সুধা গরল, সরল কি ছল, কেমন তুমি বল তা !
তুমি কি ভাবে হে ছিলে কোন্‌খানে,
কি তত্ত্বে এসেছ হেথা কিসের সন্ধানে,
পঞ্চভূতের ফাঁদে তোমায় বেঁধেছে কার মমতা !
তোমায় ধর্‌তে গেলে দাও না ত' ধরা,
মুখে বল আমার আমার কথার ছল করা,
তুমি আপন হয়ে পর করেছ তাইত মনে পাই ব্যথা !
তোমার সাধন ভজন—ছাগল দিয়ে যব মাড়া,
বল কি নাম ধ'রে ডাক্‌লে পরে দাও তুমি সাড়া,
আছে সাধুর উক্তি নামেই মুক্তি—অপার নামের ক্ষমতা !

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

গ্রীনএকার সরাই,
ইলিয়ট, মেন।
২৬শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমি অনেকদিন তোমাদিগকে কোন পত্রাদি লিখি নাই, লিখ্‌বারও বড় কিছু ছিল না। খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিকগণ* এই গ্রীনএকারে তাদের সমিতির এক বৈঠক বসান'র দরুন ইহা একটা মস্ত বড় হোটেলখানা ও একটা পাড়াগেয়ে বড় গৃহস্থের বাড়ীগোছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত বসন্তকালে নিউইয়র্কে যে মহিলাটীর মাথায় এই বৈঠকের কল্পনাটা প্রথম আসে তিনি আমাকে এখানে আস্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাই আমি এখানে এসেছি। এ জায়গাটী বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা, তাতে কোন সন্দেহ নাই আর আমার চিকাগোর অনেক পুরাতন বন্ধু এখানে রয়েছেন। তোমাদের মিসেস মিল্‌স্ ও মিস ষ্টক্‌হ্যামের কথা স্মরণ থাকতে পারে। কোরা ষ্টক্‌হ্যাম এবং আর কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নদীতীরে খোলা যায়গায় তাঁবু খাটিয়ে তাতে বাস কচ্চেন। তাঁরা খুব স্ফূর্ত্তিতে আছেন এবং কখন কখন তাঁরা সকলেই সারাদিন যাকে তোমরা বৈজ্ঞানিক পোষাক বল তাই পরে থাকেন। বক্তৃতা প্রায় প্রত্যহই হয়। বোষ্টন থেকে মিঃ কল্‌ভিন নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি প্রত্যহ বক্তৃতা করিয়া থাকেন—সকলে বলে, তাঁর উপর মৃত আত্মার ভর হয়। 'সার্ব্বজনীন সত্যে'র সম্পাদিকা যিনি জিমি মিল্‌স্ প্রাসাদের

* Christian Scientist—আমেরিকার একটী প্রবল সম্প্রদায়। ইহারা যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় অলৌকিক উপায়ে রোগীকে আরাম করিতে পারেন বলিয়া দাবি করেন।

উপর তালায় থাক্‌তেন—এখানে এসে জেঁকে বসেছেন। তিনি উপাসনা সম্মিলন কর্‌ছেন আর লোক জড় করে মনঃশক্তিবলে সব রকমের ব্যারাম ভাল করবার চেষ্টা কর্‌ছেন—আশা করি, এঁরা শীঘ্রই অন্ধকে চক্ষুদান এবং এতদ্রূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন কর্‌বেন। মোট কথা এই সম্মিলনটী অন্যান্য সম্মিলন থেকে একটু বিশেষ রকমের। ওরা সামাজিক বাঁধাবাঁধি নিয়ম বড় গ্রাহ্য করে না—সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাব ও বেশ আনন্দে আছে। মিসেস মিল্‌স্ বেশ জাঁকজমকে আছেন, অন্যান্য অনেক ভদ্রমহিলাও তদ্রূপ। মিসেস ব্যাপিন নাম্নী এক ভদ্র মহিলাকে এতদিন আমি বিধবা ঠাউরেছিলাম—এখন দেখ্‌ছি তাঁর স্বামী বরাবরই রয়েছেন। তিনি পরমা সুন্দরী। ডিট্রয়েটবাসিনী আর একটী দীর্ঘ কেশী সুন্দর কৃষ্ণ নয়না উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা সমুদ্রতীর থেকে পনর মাইল দূরবর্ত্তী একটী দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন বলেছেন—আশা করি তথায় আমাদের পরমানন্দে সময় কাট্‌বে। মিস্ আর্থার স্মিথ রয়েছেন। মিস্ গার্নসি সোয়াম্প্‌স্কট থেকে বাড়ী গেছেন।

আমি এখান থেকে আমিস্‌কোয়াম যেতে পারি বোধ হয়। এস্থানটী বড় চমৎকার—এখানে স্নান করার ভারি আরাম। কোরা ষ্টক্‌হ্যাম আমার জন্য একটী স্নানের পোষাক করে দিয়েছে—হাঁস যেমন জল পেলে মহা আনন্দ পায়, আমিও তদ্রূপ জলে নেমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে আনন্দ পাচ্চি আর "মৃৎপল্লীনিবাসী"দের (হাঁসের দলের) পদেও পক্ষেও ইহা পরম উপাদেয় বটে।

আর বেশী কিছু লেখ্‌বার পাচ্ছি না—আমি এখন এত ব্যস্ত যে, মাদার চার্চ্চকে পৃথক্ ভাবে লেখ্‌বার আমার সময় নাই। মিস হাউইকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাবে।

বোষ্টনের মিঃ উড এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পাণ্ডা। তবে তাঁর 'জলাবর্ত্ত' (?) * মহোদয়ার

---

* খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস এডিকে স্বামীজি রঙ্গ করিয়া Mrs. Whirplool বলিতেছেন—কারণ, Eddy ও Whirlpool সমানার্থক।

সম্প্রদায়ভুক্ত হ্যতে বিশেষ আপত্তি—সেই জন্য তিনি দার্শনিক, রাসায়নিক, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক আরও কত কি বিশেষণ দিয়া নিজেকে একজন মনঃশক্তিপ্রভাবে আরোগ্যকারী বলে পরিচিত করতে চান। কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছিলো—তাতে তাঁবু গুলোর উত্তম মধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এই সব 'আরোগ্য-বক্তৃতা' চল্‌ছিল, সেটার ঐ 'চিকিৎসা' প্রভাবে এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে, সেটা মর্ত্ত্যলোকের দৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান করেছে আর প্রায় দুশ চেয়ার ভাবে গদগদ হয়ে নাচ্‌তে আরম্ভ করেছিল। মিল্‌স কোম্পানির মিসেস ফিগ্‌স প্রত্যহ প্রাতে একটা করে ক্লাস করে থাকেন আর মিসেস মিল্‌স ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সমস্ত জায়গাটায় যেন লাফিয়ে বেড়াচ্চেন—ওরা সকলেই খুব আনন্দে মেতে আছে। আমি বিশেষতঃ কোরাকে এই আনন্দে মাত্‌তে দেখে ভারি খুসী হয়েছি—গত শীত ঋতুতে ওরা বিশেষ কষ্ট পেয়েছে—একটু আনন্দ করলে ওর পক্ষে ভালই হবে।

তাঁবুতে এরা যে রকম স্বাধীন ভাবে রয়েছে শুন্‌লে তোমরা বিস্মিত হবে—তবে এরা সকলেই বড় ভাল ও শুদ্ধাত্মা—একটু ছিট আছে—, এই পর্য্যন্ত।

আমি এখানে আগামী শনিবার পর্য্যন্ত থাকব—সুতরাং তোমরা যদি পত্র প্রাপ্তিমাত্র জবাব দাও, তবে এখান থেকে চলে যাবার পূর্ব্বেই পাব। একটী যুবক রোজ গান করে—সে পেশাদার—তার কনে তার সঙ্গে রয়েছে—সেও বেশ গাইতে পারে ও পরমা সুন্দরী—তার বোনও সঙ্গে আছে। এই সেদিন তাঁবুর সকলে একটা দেবদারু গাছের তলায় রাত্রি যাপন করতে গিয়েছিল—আমি রোজ প্রাতে ঐ গাছতলাটায় ভারতীয় ধরণের আসন পীড়ি হয়ে বসে এদের উপদেশ দিয়ে থাকি। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে গেছ্‌লাম—তারকাখচিত নভোমণ্ডলের নীচে জননী ধরিত্রীর কোলে শুয়ে রাতটা বড় আনন্দেই কেটেছিল—আমিত এই আনন্দের এক ফোঁটা পর্য্যন্ত বাদ দিই নি।

একবৎসর ভোগ বিলাসের ভিতর থেকে পশুবৎ জীবন যাপনের পর

এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে শুয়ে, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা তোমায় কি বল্‌বো। সরাই বা হোটেলে যারা রয়েছে তারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নরনারী। আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' করতে শেখাই আর তারা উহা আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই যে শুদ্ধাত্মা কারও মনে যে এতটুকু দাগ পর্য্যন্ত নেই—আর কি সাহসী ও নির্ভীক সকলে—সুতরাং এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ঈশ্বর ধন্য—যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন; ঈশ্বর ধন্য যে, তিনি এই শিবির নিবাসীদের নিঃস্ব করেছেন। বাবু বাবুনীরা রয়েছেন হোটলে কিন্তু তাঁবুবাসীদের স্নায়ুগুলি যেন লোহা বাধান, মন তিন-পুরু ইস্পাতে তৈরি আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উলটে পালটে ফেলেছিল, তখন এই নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায় সেই জন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুলছিল, তা যদি দেখ্‌তে তবে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হোতো—আমি এদের জোড়া দেখ্‌তে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আশা করি, তোমরা তোমাদের সুন্দর পল্লীনিবাসে বেশ আনন্দে আছ। আমার জন্য এক মুহূর্ত্তও ভেবো না—আমাকে তিনি দেখ্‌বেনই দেখ্‌বেন, আর যদি না দেখেন নিশ্চিত জান্‌বো আমার যাবার সময় হয়েছে—আমি আনন্দে চলে যাব।

"হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিষ দেয়—আমি গরীব—আমার আর কিছু নাই, কেবল এই শরীর মন ও আত্মা আছে—এইগুলি সব তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করলাম—হে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, দয়া করে এইগুলি গ্রহণ করতেই হবে—নিতে অস্বীকার করলে চল্‌বে না।" (আমি তাই আমার সর্ব্বস্ব চিরকালের জন্য দিয়েছি।) একটা কথা—এরা কতকটা শুষ্ক ধরণের লোক আর সমগ্র জগতে খুব কম লোকই আছে, যারা শুষ্ক নয়। তারা 'ম

অর্থাৎ ভগবানের রসস্বরূপ একেবারে বোঝে না। তারা হয় খুব জ্ঞান-চর্চ্চড়ি করে অথবা ঝাড়ফুক করে রোগ আরাম করে—টেবিলে ভূত নাবায়, ডাইনগিরি ইত্যাদি ইত্যাদি। এদেশে যত প্রেম, স্বাধীনতা, তেজের কথা শুনা যায় আর কোথাও তত শুনিনি, কিন্তু এখানকার লোকে এগুলি যত কম বোঝে আর কোথাও তত নয়। এখানে ঈশ্বরের ধারণা হয় 'সভয়ং বজ্রমুদ্যতং' অথবা রোগ আরামকারী শক্তিবিশেষ অথবা কোন প্রকার স্পন্দন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু এদের মঙ্গল করুন—এরা দিনরাত তোতা পাখীর মত 'প্রেম', 'প্রেম' 'প্রেম' করে চেঁচাচ্ছে।

তোমরা শুদ্ধস্বভাবা ও উন্নতচিন্তা—তোমাদের শুদ্ধতাতে তোমাদের জন্য আমার ভিতর থেকে শুভচিন্তা টেনে বার কর্‌ছে। এদের মত চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে—জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর, অন্ততঃ প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্য রাজ্যের সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য, শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্যের একটু আভাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভাব ভূমিতে বাস কর্‌বার চেষ্টা কর। অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু কখন খুঁজো না, উহাদিগকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়েও যেন স্পর্শ করো না—তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয় সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক—বাকি যা কিছু অর্থাৎ দেহ ও অন্য যা কিছু তাদের যা হবার হোক্ গে।

জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়—দিবারাত্র বল, "তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—আমি তোমায় ছাড়া আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না। তুমি আমাতে আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি।" ধন থাকে না, সৌন্দর্য্য থাকে না, জীবন থাকে না, শক্তি থাকে না—কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন—প্রেম চিরদিনই থাকে। যদি এই দেহযন্ত্রটাকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌লে তাতে কিছু গৌরব থাকে, তবে দেহের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আস্‌তে

না দেওয়া আরও গৌরবের কথা। তুমি যে জড় নও ইহাই তার একমাত্র প্রমাণ—জড়কে নিজের ভাবে থাক্‌তে একদম ছেড়ে দেওয়া। ঈশ্বরে লেগে থাক—দেহে বা অন্য কোথাও কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা বিপদ দুঃখ এসে বিভীষিকা দেখাতে থাকে তখন বল—হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; যখন মৃত্যুর ভীষণ যাতনা হতে থাকে, তখনও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়—জগতে যত রকম দুঃখ বিপদ আসতে পারে তা এলেও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়। তুমি এইখানে রয়েছ, তোমাকে আমি দেখ্‌ছি, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আমি অনুভব কর্‌ছি। আমি তোমার, আমায় টেনে নাও প্রভু; আমি এই জগতের নই, আমি তোমার—তুমি আমায় ত্যাগ কোরো না। এই হীরার খনি ছেড়ে কাচ খণ্ডের অন্বেষণে যেও না। এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ—কি! তোমরা এই সুযোগ অবহেলা করে সংসারের সুখ অন্বেষণে যাবে! তিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ—সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধান কর, সেই পরম বস্তুই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক তা হলে নিশ্চিত সেই পরম বস্তু লাভ করবে।

সর্ব্বদা আমার আশীর্ব্বাদ জান্‌বে

তোমাদের—

বিবেকানন্দ।

"শাস্ত্রের মর্ম্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন কর্‌তে হয়।"

"ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়! বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে? শ্যালারা, পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মরছে!—মর্ শ্যালারা ডুব দেয় না!!"—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

বিবেকানন্দ।

(শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার তত্ত্বনিধি, বি, এল,)

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিতে হইলে তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছেন এবং এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি ইহা অবগত হওয়া যেমন একান্ত প্রয়োজন তেমনি যে সকল ঘটনা ও জীবনীর সংযোগে তাঁহার জীবনকে জগদ্-ব্রত রূপে গঠিত করিয়াছে সেই সকল ঘটনা ও জীবনী বিশেষভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক।

(ক) তৎকালীন পারিপার্শ্বিক জগৎ।

তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময় প্রতীচ্যে ধর্ম্ম materialism বা জড়বাদের আঘাতে সাধারণ মানবহৃদয় হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের আসন জড়বাদ গ্রহণ করিয়াছিল বা গির্জ্জাভ্যন্তরে জনকতক পুরোহিতের নিকট নিবদ্ধ হইয়াছিল। অনেক স্থলে ধর্ম্ম শুধু কতকগুলি নিয়মকানুন, dogmas, forms, rules, প্রতিপালনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম পোষাকী ধরণের মতবাদ হইয়া পড়িয়াছিল। আর খৃষ্টধর্ম্ম—যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রেমের ধর্ম্ম, তাহা বেতনভোগী অনুভূতিহীন প্রচারকের হাতে পড়িয়া অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ, কুৎসাকীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা আক্রমণে পরিণত হইয়া যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিত মনে করিতেন যে ধর্ম্ম অন্ধ বিশ্বাস মাত্র বা অসভ্য আদিম জাতিদের ভূত বিশ্বাসের একটী সভ্য সংস্করণ মাত্র। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষাশালায় দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, তাপমান, আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক শক্তিমান যন্ত্র (Telescope, microscope, thermometer, spectroscope, electrometer) দ্বারা ধর্ম্মের কিছু না পাইয়া বা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (chemical reaction) না পাওয়ায় ভাবিতেন উহা একটা মানসিক বিকার মাত্র।

ধর্ম্মের সহিত কতকগুলি সামাজিক নিয়ম, রীতি, প্রাচীনকাল-প্রিয় রূপক বা কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাসীর সংস্কার জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেহ ঐগুলির কোন একটাকে কোন প্রকারে অসার বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন তবে সমস্ত ধর্ম্মে কিছুই নাই ভাবিতেন। এমনও হইয়াছিল যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করা দুর্ব্বলতা বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহারা নিজ নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, জীবনের কোন্ অংশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই তাহা জানিতেন না।

প্রাচ্যেও ধর্ম্মের নামে একদিকে কতকগুলি আচার ও কুসংস্কার খাড়া হইয়াছিল, যদিও কতকগুলি আচারের প্রয়োজনীয়তা সাময়িকরূপে থাকিলেও সেগুলি যে লক্ষ্য নহে, উপায় মাত্র—তাহা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছিল, উপায়ই লক্ষ্যরূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল; সমাজের এক ব্যক্তি তাহার নিম্নতর স্তরের আর এক ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে কয় বার স্নান করিতে হইবে তাহা লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, হয় ত তাহা লইয়া দশ বিশটা শ্লোক সংগ্রহে রত থাকিয়া জীবন ধন্য বিবেচনা করিতেন। মহাপ্রভুর পবিত্র প্রেম নিকেতনে কামের তাণ্ডব নৃত্য, ভৈরবী চক্র, লতা সাধন ইত্যাদিতে শাক্তের শক্তি সাধনার পরিণতি মাতৃভাবের স্থানে পৈশাচিক বৃত্তির চারিতার্থতার ক্রীড়া হইতেছিল। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণকে প্রতীচ্যের ভীষণ জড়বাদ (materialism)-এর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, তাঁহারা ভাবিতেন হিন্দুর যাহা কিছু সব কুসংস্কার মাত্র, হিন্দুর দেবদেবী পূজা পৌত্তলিকতা মাত্র, প্রতিমা দর্শনে তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাহাতে অশ্লীলতার গন্ধ অনুভব করিতেন (যদিও কথঞ্চিৎ প্রকারে তাহা অন্যপক্ষের কার্য্যের ফল)। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি তাদৃশী ভবেৎ। পাশ্চাত্য শিক্ষার দাপটে হিন্দুধর্ম্ম কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, দলে দলে লোক খৃষ্টান (christian) হইতেছিল, এই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপনিষদুক্ত নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়া এবং তৎসহ সামাজিক বিধিনিষেধের কথঞ্চিৎ শিথিলতা আনয়ন করিয়া সে

স্রোতে কতক পরিমাণে বাধা প্রদান করেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী। একদিকে সমাজের উপেক্ষা, ও স্বল্পমতিদের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের বিকৃতিকরণ অন্য দিকে প্রখর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, নব্য শিক্ষাগুরুদের দ্বারা শিষ্যমণ্ডলাকে স্বমতের দিকে আকর্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্লেষ নিক্ষেপণ, এবং নব্য শিষ্যমণ্ডলীর স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার ফলে যুবকগণ ধর্ম্ম পিপাসা মিটাইবার জন্য বা স্বার্থ প্রণোদিত কঠোর সামাজিক অত্যাচার বা আপাত প্রতীয়মান বিরুদ্ধ ভাবগুলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দলে দলে ভাসিয়া যাইতেছিল—রামমোহন তাহাদের সম্মুখে মহোচ্চ ব্রহ্মোপাসনা ও সাম্যবাদের আদর্শ ধরিয়া সে স্রোতের মুখ হইতে তাহাদিগকে থামাইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কালক্রমে তাহাও ধর্ম্মের একটা ইউরোপীয় সংস্করণ হইয়া দাড়াইল।

এইরূপে নানা বিপর্য্যয়ে প্রপীড়িত হইয়া জগৎ যখন ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল, সেই সময়ে কত মহাত্মার কাতর প্রার্থনার ফলস্বরূপে বিবেকানন্দ অবতীর্ণ হন। সত্যের একনিষ্ঠ সেবক নরেন্দ্রনাথ এই সময় অপরিসীম ধীশক্তি ও মহান্ হৃদয় লইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যানুসন্ধানে প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রাণের আকুল পিপাসা মিটাইবার জন্য তিনি বিবিধ ব্যক্তির নিকট উপনীত হন কিন্তু কোথাও তাঁহার অতৃপ্ত পিপাসা মিটে নাই; অবশেষে তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসারূপ সেই তীব্র অতৃপ্ত পিপাসা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে অমৃতসাগরের উপতটে উপনীত করায়। সেই সাগরে স্নান করিয়া তাঁহার সকল পিপাসা মিটিয়া যায়। সেইখানে তিনি বুঝেন ধর্ম্ম শুধু Intellectualism or sentimentalism—বিচারবুদ্ধিমত্তা অথবা ভাবপ্রবণতা নহে, উহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। ব্রহ্ম উপলব্ধির বিষয় এবং তাহা অতীব সত্য। সেই অমৃতসাগরে আত্মবিলীন করিয়া তিনি নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন। সেইখানেই তিনি প্রেমসিক্ত অভিনব বেদান্ত শিক্ষা পান—যাহাতে জ্ঞান কর্ম্ম প্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ।

সেখানে তিনি শিক্ষা পান—ব্রহ্মই সত্য বস্তু, কিন্তু জগতেরও

আপেক্ষিক সত্যতা আছে। এই শিক্ষায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়া তিনি জড়বাদের উৎস ও ক্রীড়াভূমি আমেরিকা ও ইউরোপে গমন করেন। তথায় ভীম হুঙ্কারে জানাইয়া দেন—Religion is not Intellectualisation nor Sentimentalism but Realisation. সেখানে বুঝান Hinduism is not idolatry, হিন্দুত্ব পৌত্তলিকত্ব নহে; আর বুঝান' উহার বিশাল উদারতা, বিশ্বজনীনতা। হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব কোথায় নিহিত তাহা প্রদর্শন করেন। ধর্ম্ম শুষ্ক বিচার নহে, অনুভূতির বিষয়, খেয়ালের বিষয় নহে; শুধু কতকগুলি theory (মতবাদ) মাত্র নহে। উহার practical side বা কার্য্যকরী দিকও আছে। তিনি দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া প্রকৃত খৃষ্টান হইতে হয়, কেমন করিয়া প্রকৃত হিন্দু হইতে হয়। তাঁহার এই সত্য প্রচারের ফলে ইউরোপ ও আমেরিকাতে বেদান্ত সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠা। তাঁহাতে এক দিকে যেমন জ্ঞান ধর্ম্মের বিকাশ দেখি অন্য দিকে কর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। ভারতের 'দরিদ্র নারায়ণে'র জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল, তাই তাঁহার সে প্রেম দরিদ্র নারায়ণের সেবারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, সেই প্রেমবশেই তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন। যখন ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইল তখনই পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষায় মোহাবিষ্ট নব্য ভারতের কতকটা চমক ভাঙ্গিল, তাহারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিলেন ও ধর্ম্মে যে কিছু আছে, হিন্দুধর্ম্মে যে অমূল্য রত্নরাজি বর্ত্তমান তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় না গেলে, পাশ্চাত্যগণ তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে, পাশ্চাত্যের মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্যগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন কি না তদ্‌বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ, বোধ হয় বুঝিতেনই না। আবার, এই নব শিক্ষায় শিক্ষিতগণই সমাজের নেতা, পথপ্রদর্শক—তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে জনসমাজ ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বা বুঝিতে পারিত না বা চেষ্টাও করিত না। তাঁহারই নির্দ্দেশে সকলে আজ বুঝিতেছেন ধর্ম্ম কতকগুলি বিশ্বাসের সমষ্টি নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। ধর্ম্মের নামে

পূঞ্জিত কুসংস্কার ও কদাকাররূপ পঙ্ক হইতে যে মহাপুরুষ প্রকৃত ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি জড় উপাসনার হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বর্ত্তমান কালোপোযোগী এক অভিনব বেদান্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার চরণে স্বতঃই আমাদের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

আবার দেখি তাঁহার স্বদেশ প্রীতি বক্তৃতামঞ্চের বাক্য বিন্যাসে পর্য্যবসিত হয় নাই। তাই দেখি তাঁহার নিকটে ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণা পবিত্র। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্বদেশ প্রীতি কে শিখাইবে? তিনিই বুঝাইয়াছেন, আতুর, দরিদ্র, অন্ধের প্রতি দয়া করা নয়, তাহারা দয়ার পাত্র নহে—নারায়ণ বোধে তাহাদিগকে সেবা করিতে হইবে; আর শিখায়েছেন এই নারায়ণ সেবা সেবকের হৃদয়ের উৎকর্ষ, আত্ম-বিস্তৃতির অবসর মাত্র। আর "যত্র জীব তত্র শিব"রূপ অদ্বৈতমূলক মহাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সেবাধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ এবং বিস্তারেই ভারতের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান। তাই ভাবিয়া ধন্য হই,—ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ কোথায়?

(খ) তাঁহার সত্য প্রচার।

তিনি আসমুদ্র হিমাচল, ভারত, ইউরোপ, আমেরিকায় সত্য প্রচারে, অভিনব প্রেমসিক্ত বেদান্ত প্রচারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রকৃত ধর্ম্মকে, সমস্ত ধর্ম্মের মূল সত্যগুলিকে অকুতোভয়ে প্রচার করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। এবং কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস, স্বার্থ প্রণোদিত মতবাদের মূলে কঠোর প্রহার জন্য তাঁহার জীবনও অনেক সময় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বলিতে লজ্জা হয় কতকগুলি নাম যশাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মধ্বজী নীচাশয় ক্ষুদ্রমনা লোক, তাঁহার জীবন যাহাতে বিপন্ন হয়, এমন কি অনাহারে, বা বস্ত্রাভাবে তাঁহার জীবন যাহাতে নষ্ট হয় এরূপ চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান, সত্যের একনিষ্ঠ সেবক, মহা প্রেমিক সেই সকল বিষয় জানিতে পারিয়াও সেদিকে কিঞ্চিৎমাত্রও দৃকপাত না করিয়া জীবনের

লক্ষ্যে অটল থাকিয়া তাঁহার প্রিয়তম মহাসত্যগুলি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশ ঘোর তামসিকতায় পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যাহার ফলে শুধু জড়তা, শুধু অজ্ঞান, অন্ধ বিশ্বাসের সেবা, ধর্ম্ম বিদ্বেষ, ধর্ম্মের নামে পৈশাচিকতার অভিনয়! তাই দেশকে তামসিকতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কর্ম্ম দ্বারা তামসিকতা দূর করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আর ইউরোপ ও আমেরিকা ভোগের চরমে গিয়াছে, ঘোর রাজসিকতায় পূর্ণ, সাত্বিকভাবের একান্ত অভাব, যাহার জন্য কথায় কথায় লক্ষ লক্ষ নরবলি ঘটে কথায় কথায় ভীষণ সংঘর্ষ, তাই ইউরোপ ও আমেরিকাকে সত্ব ভাবের অনুশীলনের উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য মূল লক্ষ্য সকলের সম্মুখে এক রাখিয়াছেন, সে লক্ষ্য গুণাতীতে পৌছান।

(গ) বিবেকানন্দের জীবনে রামকৃষ্ণের প্রভাব।

বিবেকানন্দ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব বুঝিতে হইলে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক পরিচয় অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং ঐ পরিচয় অবগত হইবার জন্য আমি শ্রীঅমিয়ধারা হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটী উদ্ধৃত করিতেছেন—

"বুদ্ধ লয় শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, শঙ্করাচার্য্য পরিষ্কার ক'রে দিছিলেন। বুদ্ধের উত্তর শঙ্করাচার্য্যের কার্য্যের কাছে। জ্ঞানী ছাড়া বুঝ্‌তো না কি না, তাই চৈতন্যের আবির্ভাব। ধর্ম্ম নিয়ে হিংসা হয়েছিল কি না তাই একত্ব দেখাতে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। থাক্ ধর্ম্ম কর্ম্ম, আমার আমিত্ব পেলে বাঁচি এখন।"

আমরা এই মহাবাক্য হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে ভারতবর্ষে অভিনীত মহালীলার চারিটী অঙ্কের প্রধান ৪ চারিজন নায়কের জীবনের পরস্পর সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। চতুর্থ নায়ক জগতে মুখ্যতঃ অভিনব ভাব প্রবর্ত্তনের জন্য আগমন করেন নাই, বর্ত্তমান ভাবসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য, এবং বিবেকানন্দের প্রচারিত শিক্ষায় এই সত্যই ধ্বনিত হইতেছে। "I want Hindus to

be better Hindus, Christians to be better Christians and so on."

বহু সংখ্যক ধর্ম্মমতে পরিপূর্ণ জগতে অভিনব ভাবের প্রচার ও প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে, সকল ধর্ম্মমতের মধ্যে সমন্বয় প্রদর্শন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের অর্থ ইহাই যে বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে বর্ত্তমান সার সত্যগুলি যে এক ইহা ব্যক্ত করা। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মের অভ্যন্তরে সংকীর্ণতা ও আবিলতা উপস্থিত হইয়াছে কেবলমাত্র ধর্ম্মসমূহের সমন্বয় দ্বারা সেই আবিলতা দূরীভূত হয় না। আমরা দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেব মুখ্যভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ আবিলতা ও সংকীর্ণতা দূর করিবার প্রয়াস পান নাই কিন্তু সমন্বয়ের দ্বারা ঐ সকল বিদূরিত করিবার পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। যথা তিনি নিজে ছাগ বলি দর্শনে একান্ত ব্যথিত অথবা অসমর্থ হইলেও তিনি উহাতে সাধারণ মানবের ন্যায় বাধা দেন নাই। যিনি বৃক্ষ হইতে পত্র ছিন্ন করায় অথবা দুর্ব্বাদলকে পদদলিত করায় ব্যথিত হইতেন, তিনি এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া স্থানান্তরিত হইতেন, বাধা প্রদান করেন নাই।

এই অলৌকিক কার্য্যের রহস্যের উদ্ঘাটন করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এবং তাঁহাকে বুঝিলেই রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। তিনি যদি বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচলিত রীতি নীতিতে বর্ত্তমান দোষ উদ্ঘাটন করিতেন তবে তাঁহার কৃত সমন্বয় তাঁহার কার্য্যের দ্বারা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

(ক্রমশঃ)

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(১০)

এই জাতীয় কর্ম্মতপস্যার দৃষ্টান্ত বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য হইতেই গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের দেশে কি এরূপ দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব? তাহা নয়। তথাপি একথা নিশ্চয় বলিতে হইবে জেনোয়ার যে ঘড়ির দোকানের কর্ম্মচারী বালক দিনের পর দিন নূতন প্রকারের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মুদ্রা যন্ত্র উদ্ভাবনের ধ্যানে আহার নিদ্রা ভুলিয়া পরিশ্রম করিয়াছিল, সেরূপ প্রকৃতির অধ্যবসায় ভারতবর্ষে সুলভ নহে। তাহার কারণ, অনুশীলনী শক্তির অভাব নহে অনুশীলনে মনঃসংযোগের অভাব।

আজ কাল এই একটী কথা অনেকের মুখে শুনা যায়, অনেক প্রবন্ধে দেখা যায়, যে "পাশ্চাত্যের গতি প্রবৃত্তির দিকে, প্রাচ্যের নিবৃত্তির দিকে।" পাশ্চাত্য ভোগের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, প্রাচ্য ত্যাগের আদর্শ। কিন্তু বোধ হয় প্রকৃত পক্ষে আদর্শ সর্ব্বত্রই ত্যাগের, ত্যাগকেই আমরা ভোগের উপাদানরূপে গড়িয়া লই। খৃষ্টানধর্ম্মের আদর্শ ত্যাগ, ভোগ নয়, কিন্তু ক্যাথলিকের ত্যাগের মন্দির কপটতার উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া ভোগ মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। অকপট মার্টিন লুথার সেইজন্য ত্যাগের চিহ্নস্বরূপ গৈরিক বস্ত্রে সান্ত্বনালাভ করিতে পারেন নাই। অপর দিকে, যাহাকে আমরা ত্যাগের নিকেতন বলিয়া গর্ব্ব করি সেই ভারতবর্ষেও ইহার সমদৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভক্তি শাস্ত্র পাছে ভাবের দিকে বেশী হেলিয়া পরিণামে আত্মবিনোদনের বিলাসিতায় পরিণত হয় সেজন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ পদে পদে সাবধান হইয়াছেন, তথাপি যে সাধনা রাধিকার সর্ব্বত্যাগী প্রেমকে আদর্শ করিয়া চন্দ্রাবলীর প্রেমকেও ধিকৃত করিয়াছে, "কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্রই" যে সাধনার মূল মন্ত্র, যে সাধনা লোকাচারের বন্ধন তুচ্ছজ

আর্য্যপথ পর্য্যন্ত ত্যাগ করাইয়া সাধককে লোক দৃষ্টে কলঙ্কের পথ আশ্রয় করাইয়াছে, যে সাধনার প্রচলিত উক্তি "ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকিতে নয়" সেই অতি উচ্চ প্রেম ও ভক্তির সর্ব্বত্যাগের আদর্শ কেমন করিয়া ভাবের বিলাসিতাটুকুই গ্রহণ করিয়া অপৌরুষ ও অধঃপতনের পথে চলিয়াছে তাহার দৃষ্টান্তের কোন অভাব নাই। জগতের সকল ধর্ম্মেই, স্বর্গের প্রলোভন, নরকের ভয়, অন্ততঃ পক্ষে ভগবান লাভের প্রলোভন কিম্বা তাঁহার বিরাগের ভয় অনুশাসন দণ্ডরূপে গোচারণের ন্যায় মানব চারণে নিয়োজিত হইয়াছে; এমন যে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনার পরম উপদেশ ভগবদ্গীতা, পরবর্ত্তীগণ ঔষধের সহিত মধু অনুপাণের ন্যায় গীতা মাহাত্ম্যে তাহারও ফলশ্রুতি উপসংহার দিয়া গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এবং যে গীতার প্রতি ছত্রেই ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ আছে গীতা মাহাত্ম্য পাঠ না করিলে সেই "গীতা" পাঠেরই কোন ফল হইবে না বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সিংহবিক্রমী শাক্য সিংহ এ আবরণ একেবারেই ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যজ্ঞের প্রকৃত তাৎপর্য্য আত্মোৎসর্গ, সহজ পথচারী ফলকামী মানব সহজে আত্মদানের ফল লাভের জন্য পরিবর্ত্তে ছাগল ঘোড়া ধরিয়া বলি দিতে আরম্ভ করিল। পরে আবার প্রতি-নিধিত্বটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য মানুষ বলি দিতেও দ্বিধা করিল না। অবশেষে বলির এক শাস্ত্রই বাহির হইল, তাহাতে সকল রকম বলির জীবের সম্বন্ধে ব্যবস্থা রহিল কেবল আত্মবলিদানটুকুই বাদ রহিল। বুদ্ধদেব মানবের এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া বাক্য দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া কর্ম্মের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি ঈশ্বরের নামোল্লেখ করিলেন না, আত্মা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে কিছু বিচার করেন নাই, কেন না সেরূপভাবে বুঝাইতে গেলে মানব ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ করিয়া স্বার্থপরায়ণতার পন্থাকেই ধর্ম্মের নামে অভিহিত করিবে। আত্মার কোন ব্যাখ্যা নাই, হইতেও পারে না, তাহা কেবল উপলব্ধিগম্য। নির্ব্বাণধর্ম্ম আত্মতত্ত্বের কর্ম্মময় ব্যাখ্যা, মৌখিক ব্যাখ্যা নহে। একদা কোন পরিব্রাজক বুদ্ধের নিকট আসিয়া "মৃত্যুর পর পরলোক আছে

কি না, বোধিসত্ত্বগণ ইহলোক ত্যাগের পর সূক্ষ্মশরীরে বর্ত্তমান থাকেন কি না" প্রভৃতি নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধদেব সে প্রসঙ্গে কোন উত্তর না দিয়া মৌন রহিলেন। পরিব্রাজক উত্তর না পাইয়া চলিয়া যাইবার পর আনন্দ দুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো, আপনি উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসুকে নিঃসংশয় করিলেন না কেন?" তদুত্তরে বুদ্ধদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ইহাতে উত্তর দিবার কিছু নাই। মৃত্যুর পর পরলোক নাই জানিলে এ ব্যক্তি জানিত ইহলোকই সার; এবং পরলোক আছে জানিলে পারলৌকিক সুখ দুঃখ কল্পনা করিয়া তাহাতেই বদ্ধ রহিত।" অন্যত্র, এইরূপ প্রশ্নাদিতে নিরুত্তরে রহিবার হেতু বুঝাইবার জন্যই যেন বলিয়াছেন "যদি কেহ বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ তীরের আঘাত পাইয়া মরণাপন্ন হয়, সে যদি তখন পণ করে, 'এই তীর কোথা হইতে আসিল, যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার আকৃতি কিরূপ, কে প্রস্তুত করিয়াছে, এই সমস্ত অবগত না হইয়া ঔষধি পান করিব না' তবে, সে সময় তাহার আত্মীয়স্বজন কি তাহার কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করেন অথবা ঔষধ দিয়া তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন? এরূপ স্থলে, কৌতূহল নিবৃত্তিই প্রয়োজন, অথবা যাহাতে প্রাণরক্ষা হয় সেইরূপ ঔষধ প্রয়োজন?"

বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতের প্রতিধ্বনি স্বরূপ কেহবা বৌদ্ধধর্ম্মকে চার্ব্বাকের দেহাত্মিকা ধর্ম্মের ন্যায় নাস্তিক ধর্ম্ম বলেন, কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে চৌদ্দ আনা তথাকথিত ঈশ্বর বিশ্বাসী চার্ব্বাকের ধর্ম্মই কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, প্রেমে, করুণায়, দয়ায়, পরসেবায় স্বার্থবোধের লয়। কুমার সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বাহির হইলে কিসা গৌতমী নামে এক শাক্য কুমারী তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া এই গাথা গান করিয়াছিল,—

"যাহার এমন পুত্র সেই জননীই সুখী,
"যাহার এমন পুত্র সেই জনকই সুখী,
"যাহার এমন স্বামী সেই রমণীই সুখী,
"যাহার এমন পিতা সেই পুত্রই সুখী"

এই সঙ্গীত শ্রবণ মাত্র কুমার সিদ্ধার্থের হৃদয়ে নির্ব্বাণের অনুভূতি স্পষ্টতর হইল। কুমার ভাবিলেন এই সঙ্গীতের ভাবার্থ,—

সেই জননীই সুখী যিনি পুত্রস্নেহে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

সেই জনকই সুখী যিনি পুত্রের স্নেহে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

সেই পত্নী সুখী যিনি স্বামীর প্রেমে নির্ব্বাণ লাভ করেন,

সেই পুত্র সুখী যিনি পিতৃভক্তিতে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

ইঙ্গিতে এইরূপ বলা হইতেছে। সিদ্ধার্থ তখন গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শাক্য কুমারীকে নিজ কণ্ঠের বহুমূল্য রত্নহার পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নিজ শিশুপুত্রকে ভিক্ষাপাত্র ও গৈরিক-বস্ত্র দিয়া নির্ব্বাণ মন্ত্র দান করিয়াছিলেন তাঁহার ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী-গণও ভোগকে ত্যাগের বস্ত্র পরাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরিণামে তাঁহাদেরই ধর্ম্মরক্ষার কূটনীতি রাজ্যরক্ষার কূটনীতিকেও পরাস্ত করিয়াছিল।

অন্যদিকে আবার, মহম্মদ তরবারি সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। রৌদ্রপ্রখর আরবদেশে স্বাধীনচেতা মরুসন্তানগণের মধ্যে মহম্মদের অভ্যুদয়। মহম্মদ এক হাতে তরবারি ও অপর হাতে কোরাণ লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিন্দা করেন। কিন্তু ইহা কখনও সম্ভব নয় যে একক মহম্মদ অস্ত্রবলে সমস্ত দেশকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন। ভবিষ্যতে এই তরবারি সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার যদিও বিধর্ম্মীপীড়নরূপেই পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমে কোন্ ভাব হইতে তরবারি সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার অভ্যুদিত হইয়াছিল ভাবিয়া দেখিলে একথা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তরবারির পশ্চাতে নিয়ত জাগ্রত একটী কল্যাণ ইচ্ছা বর্ত্তমান ছিল বলিয়া এককের তরবারির নিকট অসংখ্য মস্তক নত হইয়াছিল। জননীও অবোধ সন্তানের কল্যাণের জন্য তাহার উপর কখনও কখনও বলপ্রকাশ করেন। অন্যে যেখানে মুখে উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হয়, তাঁহার স্নেহাতুর কল্যাণকামী হৃদয় সেখানে মুখের কথায় না বুঝিলে বলপ্রকাশেও সন্তানকে অকল্যাণ হইতে নিবৃত্ত করে। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই,

প্রেমাবতার মহাপ্রভু ভাবাবেশে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে দণ্ড দিয়াছিলেন। যীশু জেরুজিলামের ধর্ম্মমন্দিরে ব্যবসায়ীদিগকে বাজার পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের মুদ্রা প্রভৃতি ছড়াইয়া দিয়া কষাঘাতে তাহাদিগকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সে কষাঘাত ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠে আঘাত করা নয়, ধর্ম্মমন্দিরে ব্যবসায় রূপ অন্যায়কেই আঘাত দেওয়া। মহম্মদের প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব লাভের ইচ্ছা হইলে অনায়াসেই তিনি আরব-পুরোহিতগণের নেতৃত্ব লাভ করিতে পারিতেন, সেই দুর্দ্ধষ মরু-সন্তানগণকে নব ধর্ম্মপথ দেখাইতে গিয়া, উত্তেজিত করিয়া তাহার নিজের জীবন বিপন্ন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি না করিয়া পারেন নাই। তাহার তরবারি গ্রহণের মূলে যে কি ভাব বর্ত্তমান ছিল, কোরাণের একটী উক্তি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

"তোমার ভাই মুসলমানকে সাহায্য কর, যদি সে নিজে পীড়নকারী হয়, অথবা অন্য কর্ত্তৃক পীড়িত হয়। কিন্তু একজন পীড়নকারীকে কেমন করিয়া সাহায্য করিবে? ইহার ভাবার্থ—তাহার অন্যায় কর্ম্মে বাধা দাও, অর্থাৎ তাহাকে দোষী হইতে দিও না।"

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্যের অধিকারী বলিয়া আমাদের সকলের মনই নিবৃত্তিমার্গে অবস্থিত, একথা বলার তুল্য বাতুলতা আর কি আছে? ভিক্ষুক আবার কি ত্যাগ করিবে? প্রবৃত্তি পূরণের শক্তিই যাহার নাই তাহার মুখে নিবৃত্তির উপদেশ,—সে যে কেবল উপহাসের বিষয়। আমাদের জাতীয় কবি বজ্রস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব দণ্ড বজ্রসম তারে যেন দহে।"

আমরা অন্যায়কে মন ও বাক্য দ্বারা অস্বীকার করিলেই সকল সময় অস্বীকার সম্পূর্ণ হয় না, অনেক সময় বাহু দ্বারাও অস্বীকার করিতে হয়; পরসেবা ও পরপীড়ন নিবারণ উভয়ে যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে তাহা নহে। "যুদ্ধ" এই নাম দিয়া মানুষ মানুষকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতেছে, এটী যতদূর ভীষণ, মীরজাফরের যুদ্ধবিমুখতা তদপেক্ষা অধিক

ভীষণ, ইহাতে মতভেদ নাই। যদি অস্ত্রত্যাগ করিলেই হিংসাবৃত্তি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইত, তাহা হইলে সশস্ত্র জাতিই হিংসাপরায়ণ এবং নিরস্ত্র অহিংসক হইত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যায়, প্রতীকারে অসমর্থ কাপুরুষই অধিক হিংসাপরায়ণ হয়। ব্যক্তিগতভাবে বিচার না করিয়া জাতীয় ভাবের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে কেবল এই মতে আমরা বলিতে পারি পাশ্চাত্যের আদর্শে ও প্রাচ্যের আদর্শে অনেক প্রভেদ আছে। ভারতবর্ষ আজ যুদ্ধবিমুখ হইলেও চিরদিন যুদ্ধবিমুখ জাতি নহে, সমস্তদিনের যুদ্ধান্তে উভয়পক্ষ পরস্পরের শিবিরে গিয়া কুশল প্রশ্ন করিতেছেন এমন কাহিনীও রাজস্থানের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মের নবযুগ।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী।)

একটা নূতন ধারায় প্রবাহিত স্রোত এখনকার দিনে সকল দেশেই বইতে দেখ্‌চি—ধর্ম্ম নিয়ে—ঈশ্বরতত্ত্ব জগৎ রহস্যের বিচার নিয়ে সমস্ত মানবচিত্তই চমকে উঠেছে। পৃথিবীর প্রাণবহা নাড়ী চঞ্চল,—সেথা উষ্ণ রক্তের তর তর স্রোত একটা উন্মাদনা জাগিয়েছে। এ আর এখন তুমি নও, আমি নয়, সকল দেশের সকল জ্ঞানী তত্ত্বান্বেষী মাত্রেই আজ চিন্তার পদ্ধতিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এতদিন ধর্ম্ম বলতে ছিল—বিশ্বাস। যে দেশে যেমন যেমন মতবাদ প্রচলিত সে দেশের লোক সেইটেকেই আঁকড়াত, এই আঁকড়ে ধরার অটুট দৃঢ়তাটাই ছিল ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ। এইটে এইটে আমার দেশে সকলে সত্য বলে মানচে। এই গুলোকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন আর তাঁদের মত তেমন সুমহান চরিত্র নরলোকে আর পরিস্ফুট হয় নি, অতএব দ্বিধা নয় বিচার বিতর্ক নয়,—বিশ্বাস। এই সব মত গুলো বিশ্বাস কর্ব্ব।

বুকের পাঁজরের মত এগুলো আমা হতে অচ্ছেদ্য হবে। এই দৃঢ়তাই ছিল ধর্ম,—এই প্রতিজ্ঞাই ছিল ধর্ম।

এখন হঠাৎ এসে গেছে সন্ধানের যুগ। মানুষ মাত্রই আজ কিছু কিছু প্রত্যক্ষ কর্ত্তে চায়। তারা বলে জানতে চাই না—হতে চাই। মানতে চাই না—পেতে চাই। আমার দেশে যা প্রচালত আছে সে যদি সত্য হয়, তবে তার প্রমাণও আছে। পূর্ব্ব পুরুষগণ যা মেনে জীবন কাটিয়ে গেছেন তা কেবল মাত্র মানার দ্বারা তাঁদের ভক্তি করা যেতে পারে। কিন্তু ভক্তি করাতেই পূর্ব্ব পুরুষের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না। আমাদের মধ্যে যদি কেউ পাগল জন্মে থাকে মাত্র সেই-ই মনে কর্ত্তে পারে যে, আমার ছেলে কেবল দুবেলা দণ্ডবৎ হয়ে আমায় প্রণাম করুক আমায় ভক্তি করুক, আমার গুণগ্রামের অধিকারী হয়ে তার কাজ নেই। পরবর্ত্তী পুরুষের প্রতি যেমন আশা কর্চ্ছি পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষদেরও তেমনি; এই সন্ধানের যুগে আমরা মানুষেরা, একই ভাবে কল্পনা কর্ত্তে আরম্ভ করেছি। আমরা অনুভব কর্চ্ছি নিজেদের মধ্যে বিষম দৈন্য। ভাবচি কি ছাই কর্ল্লুম! পূর্ব্বপুরুষরা আমাদের, তাঁদের আপনারই থাকব বলেই না আমাদের এই তাঁদের অনুবর্ত্তী হওয়া? তাঁরা যা অবলম্বন করে দিন কাটিয়ে গেছেন সেই গুলোর প্রাধান্য স্বীকার কর্ল্লুম না কর্ল্লুম সত্যকার অনুবর্ত্তীতার কাছে তা রয়েই যাবে যদি না আমরা তেমনি আমাদের চরিত্রও গড়ে তুলতে পারি। অতএব তাঁরা যা মেনে গেছেন জয় ঘোষণা করে আমরা তা মানব না। সে গুলির সাহায্যে তাঁদের তুল্য চরিত্র সঞ্চয় করেই মানব। অথবা যেমন করে ঠিক তাঁদের মত চরিত্র সঞ্চয় কর্ত্তে পারি তাইই কর্ব্ব।

এইতে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন চক্ষের সম্মুখে বিভ্রম বাধিয়ে দিয়েছে। এখন তাঁদের মতগুলোকে যতই মানতে শিখি পথটার দোহাই দিয়ে যতই গৌরব করি, সত্য সত্য আমরা তাঁদের থেকে খানিকটে দূরে এসে পড়ছি। এতদূর যে, তাঁদের পদচিহ্ন, যে পথটার নাম আমরা কর্চ্ছি সে পথটার কোথায় পড়েছিল কিংবা আজো মুদ্রিত আছে, এখনও মোছে নি, তা আমরা জানি না। বর্ত্তমান এই দূর

স্থানটায় দাঁড়িয়ে জগতের মধ্যে সত্যই যাঁরা বড় ছিলেন তাঁদের সম্ভ্রম এক রকম করে বজায় করে আসছি। এখন সদ্ উদ্দেশ্যেই না হয় হল,—এই যে আপনাকে ভেঙ্গে গড়তে যাব, এই চেষ্টায় সম্ভ্রমটাকে যদি খুইয়ে বসে, তারপর পরিবর্ত্তে কিছু না পাই তখন দশা কি হবে? সে যে 'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ' অবস্থা।

আমাদের মধ্যে, যে বুদ্ধি-বেণিয়া আছে তার ব্যবসাবৃত্তিকে সন্ধানের যুগ কিছুতেই আপন বসে আনতে পার্ব্বে না। তার দাম-চোকাচুকির যে সংস্কার, সে কেবলই আপনার হিসাবের খাতা খুলছে —নূতন প্রেরণা ওখানে একটা কিছু ভজিয়ে দিতে পারে, এতটা প্রস্তুত বোধ হয় হয়ে ওঠেনি, গণ্ডগোল তাই চলেইছে।

সে বলে বেণের কাজ নয় গড়া। বেণে ত চোরের জাত আসলটাকে ডুবিয়ে দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার নকল একটা চালবাজি বলে কি খাড়া করে। যখন গড়তে হবে তখন খাঁটি জিনিষ চাই, ও চালাকির বেণে-গিরি এখন শিকেয় তোলা থাক।

বুদ্ধির বেণেও দাঁত খিঁচিয়ে হাঁ হাঁ করে চিৎকার কর্চ্চে ব্যাপার ত এই, এমনি ধারা মাথা ঠোকা ঠুকি।

এমনিধারা যখন চলেচে, পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়া আপন দেশে সব লণ্ডভণ্ড করে ভারতের ওপর দিয়ে হুহু করে বয়ে গেল।

সেখানে সন্ধানীর দল জিতেছিল। বেনেকে হটিয়ে দিয়ে নববলোদৃপ্ত জিজ্ঞাসা-বিজ্ঞানের মহাস্ত্র এমন নির্ঘাত হানছিল যে বিশ্বাসের প্রাচীর সেখানে টলে গিয়েছিল। Faith বলতে সেখানে আর কিছু ছিল না, সকল মানুষই আপনার পায়ে দাঁড়িয়ে সন্ধানের জয়ধ্বনি সেখানে তুলেছিল, তাদের হৃদয়মন্দির আলোকিত করে তখন জ্বলে উঠেছে Knowledgeএর প্রাচীন আবর্জ্জনাদাহী শিখা। এ সেই 'নিষিদ্ধ-বৃক্ষের' ফল নয়, সে জ্ঞান নয় বরং যাজক-প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্মের শোচনীয় ব্যর্থতাই এ জ্ঞানের উদ্ভবের কারণ।

বিশ্বাস জিনিষটা অন্ধ। এর রাজত্ব যখন চলে তখন আর ঐ যে ভাবৃবার চিন্তাবার দেখবার প্রয়োজন তা থাকে না। সুতরাং যার ওপর

বিশ্বাস তার মধ্যে বিশ্বাস পদার্থের অতীত বস্তুর রাজত্বের প্রয়োজন হয়। মানুষ পিছিয়ে পড়ায় সে জিনিষটা তখন আর তার মধ্যে ছিল না। বিশ্বাসের রাজত্বের পরিণামও ভাল হয় নি। যিশু সত্যই মানবের ত্রাণের জন্য এসেছিলেন—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যেতে লাগল, যারা আপনারই ত্রাণের জন্য এসেছে তারা আর তাঁর নামের মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে কত ত্রাণ কর্ত্তে পারে? শীঘ্রই আচার্য্যদের মধ্যে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' ভাবটা প্রবল হয়ে হয়ে অপ্রতিভ আতিশয্যে ফেটে পড়ে অত্যাচারে রূপান্তরিত হল। লোকে তাঁদের বিশ্বাস কর্চ্চে সুতরাং ওখানে ইচ্ছা-পূর্ব্বকই অন্ধ, তাদের আর অজ্ঞানে কুসংস্কারে মোড়াই করে দেওয়া কঠিন কি? কালে কালে এমনি হল—যিনি ত্রাণ কর্ত্তে এলেন এসে জীবন দিয়ে গেলেন, তিনিই হয়ে দাড়ালেন বন্ধনের উপলক্ষ।

সন্ধানের যুগে মানুষের যাই চেতনা ফুটল তারা শিউরে উঠলে। কি সর্ব্বনাশ! যেটা সবচেয়ে ভাল তারই নিমিত্ত এই সবচেয়ে মন্দ এসে দাঁড়িয়েচে। এমন করে পচিয়ে তোলবার শক্তি মানুষে আছে?—না মানুষ-জানোয়ারের ওপর আর বিশ্বাস নয়! দেখ মানুষ ছাড়া আর কে আছে আমাদের ত্রাণ কর্ত্তে পারে? এই যে জীবনব্যাপী ভয়-দুঃখ-হিংসা ব্যাধি এ সবের হাত হতে জগতে রক্ষা কর্ত্তে পারে? কার ওপর নির্ভর করা যায়?

সন্ধানী তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল তার চক্ষের সম্মুখে যতখানি আছে সব। তাদের দৃঢ় সবল মাংসপেশী অদম্য সাহস দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা,—প্রাণেও ব্যাঘ্রবৎ জ্বালা! প্রকৃতিকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কুটে তারা তার অণু অণু পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে লাগল। দেখতে দেখতে বিশাল সাহসে একদিন গর্জ্জন করে তারা বলে উঠল—পেয়েছি পেয়েছি! এই যে এতবড় প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এরে ধরে রেখেচে—চালাচ্ছে, এই দেখ কতগুলি অমোঘ নিয়ম। এর ত নড়চড় নেই যুগ যুগান্তর ধরে—কবে থেকে কেউ জানে না—অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে আপন মনে আপন কাজ করে আসচে। জগৎ ত ওরই ওপর নির্ভর করে রয়েচে। আমরা তবে কারে মানছিলুম এতদিন?

যাজকের ক্ষমতার অভ্রভেদী প্রাসাদ সেই অট্টহাস্যের মহা ঝটিকার অভ্যুত্থানের ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়ে গেল। চাপা পড়ে গেল ঈশ্বরের বিচারাসন। মানুষ উপহাস করে উড়িয়ে দিলে স্বর্গ নরকের সত্যতা।

কিসের পরিত্রাণ? স্বর্গ নরক এ সকলের কল্পনার মূলে যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে তবে সে কোন্ উদ্দেশ্য? কোন জিনিসটা ঈশ্বর কল্পনার উদ্দীপক? অতীত যুগে ভারতেও যেমন চার্ব্বকবাদ প্রচার প্রয়োজন হয়েছিল তেমনি ভগবানের কোনও গূঢ় অভিপ্রায়ে বিশ্বাস স্থাপিত ধর্ম্মকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে নাস্তিকতার প্রবল বন্যাস্নাত পাশ্চাত্যে মানুষ বেপরোয়া প্রকৃতির বাহ্য জড় অংশটাকে অবলম্বন করে জীবন ও জগতের তাৎপর্য্য বুঝতে লাগলো। অধর্ম্মের রাজত্ব এলো এ কথা যে বলতে পারে বলুক, তবে, ধর্ম্মের রাজত্ব শেষ হলো তা আমি বলচি।

সন্ধানী সন্ধান করে স্থির সিদ্ধান্তে এলো—উন্নতি আর সুখ, এর বড় স্বর্গ নেই। আপনার অজ্ঞান নাশ, আত্মশক্তির স্ফুরণ, প্রতিষ্ঠা—এর বড় আর পরিত্রাণ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে সরল অন্তঃকরণে সকলে সকলের জন্য ঐ সকলের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম (Sacrifice)—এর বড় আর ভগবান নেই।

তখন তার দলে আদর্শ তৈয়ারী হয়ে গেল—প্রচুরতমের প্রভূততম সুখসাধন (greatest good of the greatest number)।

কিসে তা হয় কেমন করে তা হয় সন্ধানীরা এই নিয়ে লেগে পড়ল।

এখনও তাই লেগে আছে।

বিজ্ঞানের এক একটা আবিষ্কার আবার সেই আবিষ্কারকে কলকব্জার মধ্যে জুড়ে দিয়ে শিল্পী আপনার প্রতিভাপ্রকাশ, বণিকমণ্ডলীর সেই সব শিল্পপ্রণালীকে সুবিহিত ভাবে কর্ম্মতৎপরতায় বিন্যাস (Organisation), আত্ম পুষ্টির জন্য বল প্রয়োগার্থ পরস্পরকে একত্রিত রাখবার নিয়ন্ত্রিত কর্ব্বার উপায় (Political life)—এই সমস্ত পাশ্চাত্যের জীবন মন্ত্র হতে লাগ্‌ল।

ঐ যে ইয়োরোপের শিল্পবাণিজ্য রাজনীতি যুদ্ধ কূটনৈতিক চাল সমস্তই প্রচুরতমের প্রভূততম সুখ সাধন! কিসে সুখ তারই সন্ধান।

চেষ্টারই কেবল ব্যর্থ আত্মপ্রকাশ। ঐ দেখ উপকরণরাশি পুঞ্জীভূত গগনপ্রমাণ উচ্চতায় সকলকে ছাপিয়ে উঠল। ঐ দেখ কিসে সুখ এখনও সন্ধানী স্থির সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে অপারগ, ঐ দেখ সন্ধান ক্রমেই সমগ্র হয়ে জগৎটাকে বিকট কোলাহলে পরিপূর্ণ করে তুল্‌লে!

সে যাই হোক ঐ আপন দেশ লণ্ড ভণ্ড করা পশ্চিমের হাওয়া আচমকা ভারতের বুকে এসে লেগে এই সুপ্ত অচলায়তনের রুদ্ধদ্বার গবাক্ষমালাকে ঠেলে দিয়ে ঝনৎকার ধ্বনি মন্দ তোলেনি।

এখানকার সন্ধানীর দলও বেণেকে কড়া কড়া গালাগাল সুরু করে দিলে। বেণেও এখানে মুখে কম যায় না, সেও উত্তর বেশ গুছিয়ে দিতে লাগল। মেয়েরা যেমন সপ্তম পর্য্যন্ত গলা তুলে ঝগড়াঝাঁটি করে অবশেষ কেউ আর কাকেও যখন আঁটতে পারে না কান্না জোড়ে, তেমনী ছিঁচ-কাঁদুনীতে দেশ ভরে গেল।

সন্ধানীরা কেঁদে মরে—এ দেশ পূতিগন্ধময় ছিন্ন মাংসখণ্ডের মত কীটাণুকীটের বাসা, এখানে দাসেরা বাস করে—হিংসায় এর পবন উত্তপ্ত হয়ে রয়েচে! ভগবান তোমার মহাসমুদ্রে কি জল নাই! প্রভু, এ দেশ ডুবে যাক ভেসে যাক। আবার নূতন বালি পড়ে নূতন জাত না জন্মালে উদ্ধার নেই।

বিশ্বাসের ব্যাপারী কাঁদে—সব উৎসন্নে গেল। ঘাড়ে যখন দুর্ব্বুদ্ধি চেপেছে ওরা ত মর্ব্বেই—শীঘ্র মরুক। হায় হায় ধোপা বন্ধ কর্‌লুম নাপিত বন্ধ কর্‌লুম আড়াল হতে পৃষ্ঠদংশকের কাজ করে যথাসাধ্য দুর্ণাম ছড়ালুম ওদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগুলোকে পর্যন্ত গালিগালাজ কর্‌লুম তবুও যে রে 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।'

পাশ্চাত্যের অশংসয় প্রমাণ যে ও ধর্ম্মওয়ালাদের পুঁথিপাঠ্য সব ভুয়া। তারই আবৃত্তি করে এখানকার সন্ধানীরা জেহাদ ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু ঐ যে রবিবাবু বলেচেন—

দেশটা হচ্চে গরম বিছানাটাও নরম
প্রেয়সীর সেই হাসিটুকু তাও হচ্চে চরম।

কাজেই ওই রকম একটার তাড়াতে সন্ধানীরা জেহাদ তুলেই বসে

রইলেন। বিশ্বাসের দুর্জ্জয় দুর্গ যে জ্ঞানের অগ্নিবান চালিয়ে পুড়োতে হবে, প্রাচীন আবর্জ্জনারাশি যে তপঃপূত শক্তিগঙ্গাপ্রবাহ নামিয়ে এনে ধুয়ে বার করে নিয়ে যেতে হবে, তার জন্য আর বার হওয়া হল না। পশ্চিমের আচমকা হাওয়া অচলায়তনের জানালা দরজা আছড়ে শিকল ছিটকিনি নাড়িয়ে দিনকতক আচ্ছা রকমের ঝনৎকার বাধালে মাত্র, ধর্ম্মের নবযুগ সমাজ সংস্কার আন্দলোনের যুগ বলে পরিচিত হল, বাঁশপাতার আগুন দপ্ করে জ্বলে খপ্ করে নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুজুগেরও সোয়াস্তি।

কিন্তু এই গ্লানি জর্জ্জরিত হিন্দুত্বের বক্ষ কোটরে এখনও যে আছে—আছে সেই মহানপ্রাণ, যা মানবত্বের শৈশবে সভ্যতার সত্যযুগের দোলাখানি দুলিয়েছিল। অজ্ঞান কুসংস্কার বিকৃতার্থ সম্ভূত কদাচারের গলৎকুষ্ঠগ্রস্ত আপনার আশ্রয়রূপ দেহটার ব্যাধি সারাতে সেও একবার সময় মত আপনার জীবনী শক্তি প্রয়োগ কর্লে সেও একবার আপনার অমোঘ সত্যবাণী আপনার অমৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে এই যুগধর্ম্মের নিঃশ্বাস ছাড়লে।

—বাহিরের ঝড় ঝাপ্টা যা পারেনি, ভেতরের কি একটা অদ্ভুত শক্তি হঠাৎ আপনি তাই করে দিয়েছে! সন্ধানী বিশ্বাসী সবাই কি একটা অনুভব করে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে! ভেতর থেকেই এক একটা জানালা খুলে গিয়ে বাহিরের আলো অচলায়তনের ঘরের মধ্যে প্রবেশ কচ্ছে। এই শক্তিই নবযুগের যুগধর্ম্ম—নূতনের প্রকাশ।

এরই অগ্রদূত কে এলেন ?—রামকৃষ্ণ।

কি আশ্চর্য্য! এলেন একেবারে অধঃপতিত জাতির সর্ব্বাপেক্ষা পচ্যমান আবর্জ্জনা কুণ্ড হতে। এলেন গোড়া পূজারী বামণের ঘরে যাদের কুসংস্কার যাদের অজ্ঞানের দম্ভ এত নিদারুণ নির্ম্মম নির্লজ্জ যে তার তুলনা নেই। আরও আশ্চর্য্য তাঁর মিশন স্থাপয়িতা হলেন—নরেন্দ্রনাথ। জন্মেছেন সমাজ অচলায়তন ঘরের কায়স্থবংশে। ব্রাহ্মণ রামমোহনকে বাধা দিয়েছিলেন—রাধাকান্ত, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্রকে বাধা দিয়েছিলেন—কালীপ্রসন্ন। এবার নরেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রগামী পতাকা-ধারী সৈনিক হলেন, সাজলেন বিবেকানন্দ মূর্ত্তিতে। ভারতের নিজস্ব

সত্য, মহামানবের বিবেক বাণী এই গলৎকুষ্ঠগ্রস্ত দেহে প্রাণরূপে অচলায়তন যা ধরে ছিল সেই বহু বহু শতাব্দীর প্রচ্ছন্ন নিগূঢ়তত্ত্ব তিনি বীর কণ্ঠে বিশ্বের সম্মুখে ঘোষণা কর্লেন।

বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে শুনল সেই বজ্রদৃঢ় কণ্ঠের অবিচল অভয় বাণী—পৃথিবী যতদূর সন্ধান করে এগিয়েছে সে সত্য কিন্তু চরম সত্যের জন্য আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। 'প্রভূততমের প্রচুরতম সুখ সাধন' ঠিকই আদর্শ। সত্যই ঈশ্বর স্বর্গ নরক সবই এই প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার উপাদান, তোমরা যা আবিষ্কার কচ্ছ তাও উপাদান বটে কিন্তু তোমাদের আবিষ্কার একদেশদর্শী। কিসে সুখ তা জানা চাই সত্য, তবে কোথায় সুখ তা না জানলে এ সব উপাদান সঞ্চয় কার জন্য? কিসে সুখ তাও জান কিন্তু আরো ভাল করে জান কিসের সুখ। সুখের উপাদান সঞ্চয় কর্লে কি হবে, যে সুখের বোদ্ধা তারে জেনেছ কি? আমাদের ভারতবর্ষ তারই আবিষ্কার করেছে। আমরাও তাই তোমাদের দিতে পারি। তোমাদের সভ্যতাকে সম্পূর্ণ কত্তে হলে আমাদের সঙ্গে তোমাদের যোগ চাই। আমাদের আবিষ্কারও তোমাদের নিতে হবে। এই বোদ্ধাকে জানতে হবে। তিনি আত্মা। আত্মানং বিদ্ধি।

"স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্য্যন্তও অসম্ভব।"

"যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেইদিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ।"—বিবেকানন্দ।

আলো।

(শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী)

জীবনের অন্ধকারপূর্ণ এই পথে
দাঁড়াইলে দেব! তুমি আলোক ধরিয়া
হেরিয়া তোমার জ্যোতিপূর্ণ মুখখানি
আমার হৃদয় আজি উঠিল ভরিয়া।
চকিতে সরিয়া গেল ঘোর অন্ধকার
আলোক—আলোক শুধু দেখি নিরখিয়ে
বহুদূরে গিয়াছে যে আঁধার সরিয়া
পারিবে না আর মোরে ফেলিতে সে ছেয়ে
হে গুরো! হৃদয় মম ভগ্ন অবসাদে
নিরাশার মাঝে আমি নিজেরে ভাসায়ে
দিয়াছিনু; জানি নাই কি হইবে শেষে
ভেবেছিনু একা আমি রয়েছি দাঁড়ায়ে
আশা দিলে, উঠাইলে হাত ধ'রে মোরে
জানাইলে কেন আমি নত হয়ে রই,
হীন ভেবে আপনারে কেন বা মলিন
সংসারের সুখ দুঃখ শিরোপরে বই?
হে গুরো! জীবন তুমি করেছো উজ্জ্বল
নিজেরে বিকাশ তুমি ক'রগো হেথায়
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা তব করিবার তরে
আমার এ প্রাণ প্রভু! ভিক্ষা সদা চায়।
তুমি রাজা—অনুমতি দাও যদি তবে,
প্রজার বাসনা ওগো, হইবে সফল
তোমার জিনিষ যাঁর রাখ অধিকারে
করে রাখ তারে তুমি পবিত্র বিমল।

সাধু সঙ্গ

(দুলাল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

এইরূপ আলোচনার ৫।৭ দিন পরে এটর্ণি শ্রীযুক্ত প্রাণধন ঘোষ মহাশয় স্বামী সত্যব্রতের সঙ্গে দেখা ক'রে বল্‌লেন, "আপনি কি মধ্য প্রদেশে দরিদ্র ও পীড়িতদের জন্য আতুরাশ্রম স্থাপন করেছেন ? এখানকার বাসন্তী নামে এক বারবিলাসিনী লক্ষাধিক টাকা মূল্যের তার সমুদয় সম্পত্তি আপনার সেই শুভ কার্য্যে দান করেছে। এই তার দান-পত্র।"

স্বামিজী দান-পত্র হাতে নিয়ে বল্‌লেন, "হাঁ, আমি আশ্রম স্থাপন করেছি আর তার জন্য অর্থেরও যথেষ্ট প্রয়োজন, শ্রীভগবান্ ঠিক সময়েই তাঁর কাজের ভার নিজেই নিয়েছেন। আচ্ছা সেই মেয়েটী এখন কোথায় বল্‌তে পারেন ?"

এটর্ণি বাবু বল্‌লেন, "তার বাড়ী ঘর অলঙ্কার সব বিক্রি ক'রে টাকা আমার হাতে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। লোকে বলে আপনার কথায় তার বৈরাগ্য হয়েছে বৃন্দাবন কিম্বা কাশী এমন কোন স্থানে মাধুকরী করে খেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে তার ইচ্ছা। টাকা ব্যাঙ্কে আছে আর এই রসিদ দেখালেই আপনাকে দেবে। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে এখন আসি।" এই বলে প্রণাম করে তিনি চলে গেলেন। স্বামিজী দান-পত্র হাতে নিয়ে কিয়ৎক্ষণ বসে রইলেন। পাষাণ ফাটিয়া বিন্দু বিন্দু জল ঝরতে লাগ্‌ল।

(৬)

সীতানগর মধ্যপ্রদেশে একটি গণ্ডগ্রাম। গ্রাম খানির লোক সংখ্যা যদিও বেশী কিন্তু তাহারা অধিকাংশই দরিদ্র ও অশিক্ষিত।

গ্রামের অধিবাসিগণ যদিও রূপ, শোভা সম্পদহীন কদাকার কিন্তু প্রকৃতি দেবী গ্রাম খানিকে অতি যত্নে সাজিয়েছেন। ছোট ছোট পাহাড়গুলি হাত ধরাধরি করে তার তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর এক দিকে একটি স্বচ্ছ ক্ষীণসলীলা তটিনী দিনরাত এক অনাদি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শুনিয়ে নেচে ব'য়ে যাচ্ছে। নদীর পরপারে সুদূর বিস্তৃত পলাশ ও শালবন, তাতে হরিণ, ময়ূরের দল নেচে বেড়ায়, প্রাতে সন্ধ্যায় তাঁরা নদীতে জল পান করতে আসে আর বড় বড় ভীত-চকিত-চোখ তুলে অবাক হ'য়ে গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে একটা আধটা বাঘের ডাক'ও শুনা যায় তবে তা কদাচিৎ। শীতকালে যখন শাল ও পলাশ বনে ফুলের আগুন জ্ব'লে ওঠে তখন বনের যা শোভা হয় তা শুধু দেখবার, মজবার জিনিষ, বর্ণনা করতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও অসাধ্য।

গ্রামের শেষে, নদী ও পাহাড়ের মাঝে স্বামীজি আশ্রম স্থাপন ক'রেছেন। আশ্রমটি বহুদূর বিস্তৃত ও নানা ভাগে বিভক্ত। ঠিক মাঝ খানে নদীর ধারে মন্দির। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা সদাশিব ঢা'র হাতে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ও সেবা আশ্রমবাসী ও জগৎবাসীকে বিতরণ কচ্ছেন।

মন্দিরের খুব নিকটেই সাধু ও সেবকদের থাক্‌বার মঠ। মঠের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় একশত। তাঁহারা অধিকাংশই যুবক, শিক্ষিত ও সৌম্যদর্শন। তার কিছু দূরেই অনাথ বালকবালিকাদের থাকবার আবাস। ও তাহাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়। মন্দিরের অন্য দিকে গ্রামের ও অনাথ বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি বিরাট কর্ম্মশালা, তাতে তাঁত, চরখা, ছুতারের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্ম্মশালার পরেই পুস্তকালয় তাহা ধর্ম্ম, দর্শন শিল্প, ইতিহাস, ভূগোল ও শিশুদের শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাবলীতে পরিপূর্ণ। ৭।৮ খানা সাময়িক পত্রও নিয়মিত সেখানে এসে থাকে। পুস্তকালয়ের পর সুদূর বিস্তৃত আতুরাশ্রম। সেখানে প্রায় তিন শত দরিদ্র আতুর নারায়ণ জ্ঞানে সেবা পেয়ে থাকে। পাহাড়ের ধারে কুষ্ঠাশ্রম,

তাদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা বন্দোবস্ত, তাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্য পৃথক অপেক্ষাকৃত ছোট পাঠাগার ও শিল্পাগার আছে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে ব্যাধির জন্যও পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে। এই বিরাট ব্যাপার স্বামী সত্যব্রত স্থাপন করেছেন ও নিজ পরিশ্রমে সুচারু রূপে চালাচ্ছেন। সেখানে যেন জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম মূর্ত্ত রয়েছে। সত্য শিবসুন্দরের এই অপূর্ব্ব উপাসনা-স্থান একটা দেখবার ও শেখবার জিনিষ।

এক দিন যখন গোধূলির রক্তিমরাগে আশ্রম রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছিল, গৃহছাড়া পাখী হাওয়ার সাগর বেয়ে নীড়ের দিকে ছুটে আস্‌ছিল স্বামী সত্যব্রত নদীর ধারে আপন মনে ভ্রমণ কর্‌ছিলেন আর পরপারের আলো আঁধারের খেলা দেখ্‌ছিলেন এমন সময়ে মুণ্ডিত মস্তক, সুন্দর দর্শন, গৈরিকধারী একটি নবীন কিশোর সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রণাম কর্‌লেন। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" "আপাততঃ কাশী থেকে।" "আপনার কি আশ্রম দর্শনের অভিলাষ?" নবাগত উত্তর করিলেন—"যদি দয়া ক'রে এখানে স্থান দেন তবে জীবনের অবশিষ্টকাল সেবাকার্য্যে কাটাবার জন্য ইচ্ছা আছে।"

স্বামিজী সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন।

কিশোর সন্ন্যাসী করুণাময়ের অপূর্ব্ব চরিত্র মাধুর্য্যে আজ আশ্রমবাসী সকলেই মুগ্ধ। তাঁর প্রাণপণ সেবানিষ্ঠা, নিরভিমানতা, নিঃসঙ্গভাব সকলকেই আকৃষ্ট ক'রেছে। তিনি নিঃশব্দে নতমুখে দিনরাত রোগীর শিওরে বসে থাকেন, আহার বিশ্রাম নাম মাত্র, রোগীরাও যেন তাঁর কাছে অন্য রকম হ'য়ে যায়। তিনি যখন তাঁর কোমল সুচারু অঙ্গুলী-গুলি পীড়িতদের মাথায় সঞ্চালন করেন তখন তারা অসুখের কথা ভুলে যায়, শিশু যেমন মায়ের স্নেহের গানে ঘুমিয়ে পড়ে তারাও তেমনি সেই মমতামাখা সর্ব্বত্যাগীর কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে। এখানকার সাধু সেবকরা অক্লান্ত ভাবে, তাদের ইষ্টজ্ঞানে আতুরের সেবা করে। কিন্তু এ বালক যেন তার প্রাণের রস নিঙড়ে নিঙড়ে সব অশান্তের গায়ে মাখিয়ে দেয় আর সবাই স্থির হয়ে যায়।

সেবার ছোটনাগপুরে দুর্ভিক্ষ রাক্ষস ঘোর রবে তাণ্ডব নর্ত্তন জুড়ে দিলে, স্বামিজী আশ্রম থেকে ১০।১২ জন সহচর নিয়ে তাকে শান্ত করবার জন্য ছুটে গেলেন। তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনিয়মিত আহারের পুরস্কার স্বরূপ টাইফয়েড সঙ্গে নিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরলেন। পথেই তিনি চেতনা হারিয়েছিলেন, করুণাময় মূর্ত্তিমতী করুণার মত তাঁর সেবার ভার নিলেন। সেরূপ বিনিদ্র অক্লান্ত সেবা সাধুরাও কখনও দেখে নাই। একবার মানবীর সঙ্গে মৃত্যুর যুদ্ধ হয়েছিল সেবার মরণ পরজয় স্বীকার করে, এবার বুঝি মানব-তার গায়ে পরাজয়ের কালিমা মাখিয়ে দিলে।

স্বামিজী তখনও সম্পূর্ণ বল পান নাই। বৈকালে আশ্রমের বারান্দায় ব'সে উদাস নয়নে নদীর দিকে চেয়ে ছিলেন এমন সময়ে একটি সাঁওতাল রমণী একটী শিশুকে কোলে ক'রে নিয়ে এসে তাঁর সামনে বসে পড়লো। মেয়েটা প্রথমে কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না শুধু কাঁদতে লাগল। স্বামিজী তাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করে জানলেন যে সে অতিশয় দরিদ্র। তার সম্বলের মধ্যে পঙ্গু স্বামী ও এই শিশু। বহুকষ্ট ক'রে সে এই দুটি অশক্তকে পালন করে। আজ ছ' দিন হলো এই দুজনেরই বসন্ত হয়েছে। গ্রামের লোকের কাছে সে সাহায্য চেয়েছে তারা সাহায্যতো বিন্দুমাত্র করেই নি তার উপর এ অবস্থায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। সে যে কোন উপায়ে হোক তার স্বামীর সেবা করবে কিন্তু তার প্রাণের পুত্তলিকে আর কোন রকমেই দারিদ্র্যের মধ্যে, অচিকিৎসার মধ্যে রাখতে পার্চ্ছে না, ইহার একটা উপায় তাঁকে করতেই হবে। স্বামিজী এই মর্ম্মভেদী কাহিনী শুনে আকুল নয়নে সকলের দিকে চাইলেন। অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে করুণাময়ও সেখানে ছিল, সে ধীরে ধীরে এসে শিশুকে বুকে তুলে নিলে ও করজোড়ে বল্লে, "প্রভু যদি অনুমতি করেন ও যোগ্য বিবেচনা করেন তাহলে এই শিশুর সেবা আমি করবো।" স্বামিজীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো তিনি বল্‌লেন—"আর তোমার কোন ভয় নাই, আজ যেন জগজ্জননী তোমার সন্তানকে আশ্রয় দিয়েছেন যমের সাধ্য কি তাকে মারে? এই ২০৲ টাকা নিয়ে যাও প্রাণপণে স্বামীর সেবা

করগে, আশ্রম থেকে চিকিৎসক প্রতিদিন যাবে, প্রয়োজন হয় আরও টাকা নিয়ে যাবে তারপর সবই ভগবানের ইচ্ছা।" বন্য-রমণী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলে না তার নয়ন দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগ্‌ল। অতুলনীয় সেবাধর্ম্মের আদর্শ দেখিয়ে, যমের হাত থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে যখন তিনি তাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন তখন সবাই মনে ভাবলে যে—এ মানুস—না দেবতা—না আর কিছু! সেদিন রাত্রে সকলে প্রসাদ ধারণ কর্ত্তে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লে যে করুণাময় উপস্থিত নেই। প্রসাদ ধারণ ক'রে করুণাময়ের কক্ষে গিয়া স্বামিজী দেখ্‌লেন যে একখানা মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে তিনি জ্বরে ছট্‌ফট্ করছেন। স্বামিজী এসে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"করুণা, কখন জ্বর এলো?" কোন উত্তর না পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখ্‌লেন উত্তাপ খুব বেশী, তিনি আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুল্‌তে লাগ্‌লেন, তার যেন সমস্ত যন্ত্রনার অবসান হ'য়ে গেল, সে যেন ঘুমিয়ে পড়ল। স্বামিজী কক্ষ হতে বেরিয়ে একজন সেবককে তার শুশ্রূষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেবক এলে করুণাময় বললে "আমার কোন দরকার নাই, বেশ আছি, তুমি বিশ্রাম করগে, দরকার হলে ডাকবো।" সেবক অনেক ক'রে বল্‌লে, কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজি করতে না পেরে পাশের ঘরে শয়ন করতে গেল।

খুব ভোরে স্বামিজী করুণাময়ের খবর নিতে এসে দেখলেন যে শয্যায় কেউ নাই। কোন প্রয়োজনে গেছেন মনে করে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করলেন কিন্তু তখনও সে ফির্‌লে না। তিনি সেবককে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সেবক যা জান্‌ত তা বললো। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল কিন্তু করুণাময় ফিরল না। স্বামিজী সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করে খুজ্‌লেন, গ্রাম গ্রামান্তরে লোক পাঠালেন দিন রাত শেষ হয়ে গেল কিন্তু কেউ তা'র সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না। হতাশ হ'য়ে সকলে ফিরে এলো। স্বামিজী কিছু বল্‌লেন না কেবল ঝরিবার পূর্ব্বের জলভরা মেঘের মত গম্ভীর হয়ে রইলেন।

তিন দিন পরে একজন সাঁওতাল কাঠুরে এসে বল্লে যে এখান থেকে

দেড়ক্রোশ দূরে বনগাঁর জঙ্গলে পাহাড়ের ঝরণার ধারে একজন গেরুয়া পরা সাধুকে পড়ে থাকতে দেখেছে। স্বামিজী সেই কথা শুনে সদল বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে তথায় গিয়ে দেখ্লেন প্রাণপাখী চিদাকাশের অনন্ত নিলীমার কোলে কোথায় উধাও হয়ে মিশে গেছে। বসন্তে তার সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেছে সে আগে থেকেই তা জানতে পেরেছিল পাছে, তার সেবা কর্তে গিয়ে আশ্রমের কারু অনিষ্ট হয় তাই পালিয়ে এসে এই ঝরণার ধারে দেহ পরিত্যাগ করেছে।

স্বামিজী বল্লেন—"এই পবিত্র দেহ আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সেই পুণ্য ভূমিতে ইহার পরিণতি করতে হবে।"

সেবকেরা দেহ নেবার জন্য তুল্তে গিয়ে বিস্ময়ে অবিভূত হ'য়ে বল্লে,—"মহারাজ, এযে নারী।" স্বামিজী বল্লেন—"হোক নারী, তবু একে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেব মন্দির এখনও অসম্পূর্ণ মহেশের পাশে শবাসনার আসনের জন্য আমি এরূপ পবিত্র দেহই খুঁজছিলেম, এর সমাধির উপরেই উমার মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে আজ আমাদের অন্তরের দেবতা পূজা সম্পূর্ণ করবো।"

সমালোচনা।

(১)

(ক) **নারীর কথা**—(শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৮।) লেখিকার আক্ষেপ যে, অতি আদিম কাল থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ পর্য্যন্ত সকল মহাপুরুষই নারী জাতির প্রতি অতি অবিচার করে এসেছেন, তাদের পুরুষদের সহিত সমকক্ষ এবং সমাসন না দিয়ে ভোগের উপকরণ স্বরূপ সমাজ বক্ষে স্থান দিয়েছেন, এমন কি নিজেদের জননী, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, কন্যাকে পর্য্যন্ত পিশাচী স্বৈরিণী বলতে কুণ্ঠিত হন নি। নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য লেখিকা রামপ্রসাদ রচিত একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধার করেছেন,—

"রমণীর মুখে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী ;
ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি।"

যদিও তিনি গানের রচয়িতাকে "খুব শ্রদ্ধা" করেন কিন্তু ভগবানের নিকট রামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্ত বন্ধুগণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এক্ষণে দেবীর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে কোনও "ভক্তিভাজন আত্মীয়ের মুখে," "শ্লেষের সুরে" উক্ত গানের কিয়দংশ শুনে বিবেকবুদ্ধি পরিত্যাগ করে সমগ্র মহাপুরুষ-কুলকে কলঙ্কিত করে নারী-জাতীর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কি সফল হবে? ভালমন্দ সব জাতিতেই আছে—তা কি নারী, কি নর। আমরা সাধারণত ভাল গ্রহণ করি এবং মন্দটা ত্যাগ করি। সেইরূপ শাস্ত্র ও মহাপুরুষেরা বিদ্যা স্ত্রীর স্তুতি এবং অবিদ্যা স্ত্রীর নিন্দাই কীর্ত্তন করেছেন। "নারীত্বের মহিমা" এবং অমহিমা উভয়ই "শাস্ত্র বুঝতেন"; তাই "নারীদের পূজা করিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন" একথাও যেমন বলেছেন আবার "বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে নারীর থাকিতে হইবে—কদাচ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিৎ নহে" একথাও আবার তেমনি বলেছেন। ভারত এবং ভারতীয় শাস্ত্র যেমন নারীর দেবীত্ব এবং মা[illegible] উপলব্ধি করেছেন এমন বোধ হয় আর কোনও দেশ বা শাস্ত্র করে নি এবং পুরাকালে স্ত্রী জাতির প্রতি তথা-কথিত অবিচার এবং অবরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় নারী যেরূপ দেবীত্ব ও মাতৃত্বের বিকাশ দিয়েছেন এরূপ আধুনিক অতিবাদী বিদুষীদের মধ্যেও দেখা যায় না কেন? এত স্বাধীনতা, এত বিদ্যার অবাধ চর্চ্চা সত্ত্বেও আধুনিক জগতে ত সতী, গৌরী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি পতিপ্রেমের আদর্শমণি সকল, ঋষি কন্যা বাক্, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীগণ, বিপুল সাম্রাজ্য পরিচালনকারিণী মদলসা, লীলা, চূড়লা প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞা, স্বামী শিক্ষয়িত্রী সম্রাজ্ঞীগণ, এবং এই সভ্যযুগের কিছু পূর্ব্বেও সর্ব্ববিদিতা, উভয়ভারতী, লীলাবতী, ক্ষমা, বেহুলা, পদ্মিনী, মিরাবাঈ প্রভৃতি নারী-জাতির অপূর্ব্ব রত্ন সকল ত রাস্তা ঘাটে পড়ে নেই। এত আদর্শ এঁকেও হে ভারতীয় সভ্যতার

স্তম্ভ স্বরূপ অতীত ঋষিগণ! তোমরা নারী ঘৃণাপরায়ণ এ কলঙ্ক তোমাদের মুছবে না। তোমরা যেমন নারীর পতিপ্রেমে সতীত্ব, সন্তান পালনে মাতৃত্ব, চিত্তানুশীলনে দেবীত্ব দেখিয়ে তাঁদের পূজার্হ করেছ, তেমনি আবার তার হীনত্ব দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করেছ, এই তোমাদের অপরাধ। আবার সতী অসতীর মধ্যে, লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর মধ্যে সেই এক পরমা শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করে যে স্তুতি করেছ হে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অতীত এবং বর্ত্তমানের ঋষিগণ! তোমাদের এ মনভাব বৃথা তর্ককারীরা কখনও বুঝবে না, তারা হীন; যথেচ্ছাচারীর দোষ নিজেদের এবং সকলের ওপর জোর করে চাপিয়ে বৃথা তর্কের অবতারণা করে নিজেদের বড় মহিমান্বিত মনে চিরকালই করবে।

আবার লেখিকার মত হচ্চে যে, শাস্ত্রে যায়গায় যায়গায় সতীমাহাত্ম্য যা দেখা যায় যার তেজে তপস্বীর তেজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, চন্দ্র সূর্য্যের গতি রুদ্ধ হয়েছে, ব্রহ্মা রুদ্রাদি ঈশ্বরগণের শক্তিও স্তব্ধ হয়েছে, যে সতীর পবিত্র প্রতীক গ্রহণে মানব মোক্ষ-মার্গাবলম্বী—এমন যে নারী মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়েছে সে কেবল "নরপূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন" "পতি-দেবতার সন্তুষ্টি সাধন"। লেখিকা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন যে সীতা সাবিত্রীর ভর্ত্তৃ অনুগতত্ব প্রেমই তার হেতু দাসত্ব নয়, প্রেমের সর্ব্বজয়ীত্বই শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়েছে দাসত্বের নয়। এ কথা না বুঝে তিনি "রম্ভার" কথাকেই শ্রেষ্ট-রূপে গ্রহণ করে নারদের উপর কলঙ্কের আরোপ করেছেন, পবিত্র সনাতন ধর্ম্মকে অপবিত্র আখ্যা দিয়েছেন। একটি সত্যকে সর্ব্বদা লেখিকার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যতকাল বিদ্যা অবিদ্যা, সুখদুঃখ সম্বলীত সংসার বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল রম্ভার ন্যায় স্ত্রী ও তদুপযোগী পুরুষেরও অভাব হইবে না এবং তৎপ্রণীত অসৎ কার্য্যের অভাবও ঘটবে না, তা সে যত বড়ই সভ্য শিক্ষিত সমাজ হ'ক না কেন। আবার সেই সভ্যতার অনুশীলন ফলে বিদ্যাকে অবলম্বন করে পবিত্র চিত্ত নর নারীর জগতে অভাব হবে না; যদিও শেষোক্তই আমাদের আদর্শ, তথাপি পূর্ব্বোক্তও জগতে চিরকাল থাকবে।

(শ্রী—)

(খ) "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে, নন্দতে তত্র দেবতা।"

এই শ্লোকের দোহাই, লেখিকা দিয়াছেন। এই শ্লোকের মত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলাই প্রধান উদ্দেশ্য।

"রমণীর মুখে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।"

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের এই গানটির এক ছত্র শ্রবণ করিয়াই লেখিকা পুরাণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া তুলসীদাস, কবির এবং বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপর অজস্র বাক্যবান বর্ষণ করিতে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। বাক্যবান বর্ষণ করিবার পূর্ব্বে লেখিকা যদি ভাবিয়া দেখিতেন কি অবস্থায় ঐ সব মতামত নারীজাতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি হঠাৎ কঠোর মতের ফোয়ারা এরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না। এরূপ সহজ ভাবপ্রবণতা বদহজমের লক্ষণ বলিয়াই বিশ্বাস।

আমরা কোন বিষয় পড়িবার বা চিন্তা করিবার পূর্ব্বেই যদি কোনও বিশেষ ভাবদ্বারা অকারণে বিচলিত হইয়া পড়ি—তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে যতই চেষ্টা করি না কেন ধীর মস্তিষ্কে তাহার চালনা করিতে সক্ষম হই না,—সঠিক সমালোচনা করিতেও দ্বিধা বোধ করি। কোনও ব্যাপারেই চরমে উপস্থিত না হইয়া ধীর পন্থার অনুসরণ করিয়া ভাল মন্দ দুইদিক বিচার করিলেই আমরা অনর্থক ভ্রমে পতিত না হইয়া এবং হঠাৎ চঞ্চল চিত্ততার প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে ভাবের ঐক্য রাখিতে পারি এবং নির্ব্বিবাদে নিজ মতের (তাহা সার্ব্বজনীন হউক আর নাই হউক) পোষকতা করিতে পারি। বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী তিনিই যিনি সহজে পাঠককে আত্মভাব ধরিতে দেন না,—অথচ কথার প্যাঁচে নিজ মত সাধন করিয়া লয়েন। নিজের দুর্ব্বলতা সহজে ধরা পড়িলেই, পাঠক সমাজে ততটা প্রতিপত্তি জমাইয়া তোলা মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়—বিশেষ এই তর্কযুক্তি বহুলতার দিনে।

এই গণতন্ত্রের যুগে আমরা সকলেই নিজের বা নিজদলের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। হে নবীন নবীনা, মানিয়া লইতাম

তোমাদের তর্কযুক্তি, যদি তোমরা তোমাদের পাণ্ডিত্যের অকাট্য যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারিতে। দোষ নিজেদেরই যদি সত্যই অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। নিজেদের অবস্থার পর্য্যালোচনা না করিয়া, নিজেদের দোষ ত্রুটীর অনুসন্ধান না করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির শিরে দোষভার নিক্ষেপ সুসাধ্য। আমি বলিতে চাই যে তথাকথিতা নিন্দিতা, নিষ্পেষিতা জননী, যখনই তুমি তোমার নিজের মোহের ভাব অবগত হইবে, যখনই তুমি বুঝিতে পারিবে, সত্যই তুমি আজ পদদলিতা, অকারণে নিষ্পেশিতা, তখন তোমার প্রয়াস হইবে না, অপরকে তোমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী করিতে—তখন সত্য সত্যই তোমার মোহান্ধকার দূরীভূত হইবে;—শিশু তার জননীকে আর বলিবে না, "মা আমার খিদে পেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।"

ভবিষ্যৎ জনসমাজের মঙ্গলবিধায়িনী মাতৃসমাজ তোমার ঐ ঘুমের ঘোর আজ কাটাইয়া তোল—তোমার মাতৃত্ব আবার ফুটাইয়া তোল,—রমণীত্বকে চাপা দিয়া। তোমার অন্নপূর্ণামূর্ত্তী আবার প্রকট কর।

"হে ভারত, ভুলিও না তোমরা নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী"। যখনই আমাদের এই ভুল (?) আসিবে তখনই আমাদের পতন, তাই সন্নাসী দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে সতর্ক করাইতেছেন "ভুলিও না, ইত্যাদি" বাক্যে। আত্মবিস্মৃতিই আত্মবঞ্চনা, ও পতনের মূল কারণ—এই আত্মবিস্মৃতি আজ আমাদের সমাজকে ধ্বংসের মুখে উপনীত করিয়াছে—এই আত্মবিস্মৃতির মূলে বর্ত্তমান বিলাসাবিল শিক্ষা, ভাব, ও সভ্যতা যে কতটা দায়ী তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধি ভারতীয়, বিশেষ স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে আজ বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের প্রসঙ্গ পরে উত্থাপন করিব—পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে ভাব কিরূপ ছিল তাহার দু একটা কথা উত্থাপন করিয়া লেখিকার অযথা সন্ন্যাসীর উপর দোষারোপ ক্ষালনের চেষ্টা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখি স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য—তাঁহার জ্যোতিতেই স্বামিজী জ্যোতিষ্মান। স্বামিজী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন—

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারা তিনি যে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই এমন মনে হয় না। বিশেষ তিনি কিছুকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে বসবাস ও কার্য্য করিয়াছিলেন এবং ঐ সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে সংশ্লিষ্টও হইয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামিজী তদীয় শিষ্যা নিবেদিতা প্রভৃতি কতিপয় ব্রহ্মচারিণীর সাহায্যে আমাদের ভারতের পুরাতন স্ত্রীশিক্ষা ও সভ্যতাকে নূতন ভাবে ঢালিয়া গড়িতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। যদি কথা উঠে পাশ্চাত্য রমণীর নিকট হইতে ভারতীয় ভাব ও আদর্শ শিক্ষা করিব কি প্রকারে? উত্তর—স্বামিজী ও নিবেদিতার জীবনী ও কার্য্যের বিশ্লেষণ করিলে, তবেই সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। বেশী ঘটনা ও কথার মাত্রা বাড়ান নিষ্ফল।

শেষ কথা, বর্ত্তমান শতাব্দীর সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন স্বামী বিবেকানন্দ, মাতৃ শক্তিকে পুনরায় প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন—উদাহরণ, তাঁহার প্রবর্ত্তিত মেয়ে মঠ বা "মাতৃমন্দির" ও মেয়েদের তথায় সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা।

সেই স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রীজাতিকে সমাজের একটা অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ (যাহা বাদ দেওয়া চলে না—পুরুষের মতই সমান রূপে) বলিয়া জানিতেন, যিনি বলিয়া গিয়াছেন এই অকারণে নিষ্পেষিতা স্ত্রীজাতিকে, শিক্ষা দীক্ষা ক্ষমতায় যতদিন তোমাদের (পুরুষদের) সমকক্ষ করিয়া না তুলিতে পারিবে—ততদিন ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ তমসাচ্ছন্ন; আজ না তাহাকেই আমরা সদর্পে woman hater (নারী বিদ্বেষী) বলিয়া ঘোষণা করিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করি না। নারী জাতি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে তাঁহার পত্রাবলী প্রভৃতি হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক বর্গকে দেখালেই যথেষ্ট হইবে।

"জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।"

"সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী গুরু গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব

সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ।"

"শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। * * আবার গার্গী, মৈত্রেয়ী, জগতে জন্মাবে। * * শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবে না।"

"মেয়ে মদ্দ দুই চাই. আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নাই। শক্তির বিকাশ চাই, হাজার হাজার পুরুষ চাই—স্ত্রী চাই—।"

"আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য কীট নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। প্রভু কিঁ গপ্পি বাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উতবা কুমারী—আর আমরা বলছি "দূরমপসর রে চণ্ডাল, কেনৈষা নির্ম্মিতা নারী মোহিনী।"

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষদের বিষয়ে দুচার কথার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহারে উপনীত হইব।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব মাতৃমূর্ত্তির বা শক্তির উপাসক ছিলেন—চির-জীবন মা মা করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ও পঞ্চবটী উদ্যান মুখরিত করিয়া, পাষাণ মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া এবং স্বীয় জীবন দ্বারা ঐ ভাব সাধারণে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আজও গঙ্গার তীরে ঐ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে সত্য সত্যই দর্শকের মন মাতৃভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—সে জগতে মাতৃমূর্ত্তি বিনা আর যেন কিছুই দৃষ্ট হয় না।

একদিন কলিকাতার রাস্তার পার্শ্বে জনৈকা বারবনিতাকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন "ঐ যে মা আমার বেশ্যারূপে বিরাজ করিতেছেন"। তাঁহার নিজ জীবনের সাধকাবস্থায় সাক্ষাৎ নারীমূর্ত্তির পূজা করিয়া জগতের স্ত্রীজাতিকে মাতৃরূপে আবাহন করিয়াছিলেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব "কামিনী কাঞ্চন" বিষয়ে বিশেষ করিয়া তাঁহার নবীন সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন; সত্যই যে যোষিৎ

সন্ন্যাসীর উন্নতির পথের কণ্টকস্বরূপ এরূপ কথা শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক জগৎগুরু সন্ন্যাসিগণ এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিশু-খৃষ্টও বলিয়া গিয়াছেন। নবীন সন্ন্যাসীর অবস্থা দুধের মত, জলের সহিত মিশাইলেই মিশ খাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী—সে তখনও মাখনে পরিণত হয় নাই যে জলে ভাসিবে—তাহার ঘট তখনও সোণার ঘটিতে পরিণত হয় নাই যে কলঙ্ক পড়িবে না। পরমহংস দেব তাঁহার গৃহস্থ ভক্তদিগকে কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধে তদ্রূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা জানি না,—তিনি ভব রোগের উত্তম বৈদ্য ছিলেন, জানিতেন কোন্ ছেলেকে অবস্থাভেদে কি পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। লেখিকা এই দেশকাল পাত্রের বিবেচনা না করিয়াই বৃথা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। এইটা বেশ বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে সন্ন্যাসী এক ভিন্ন জাত—তাদের সঙ্গে জগতের গৃহস্থালীর সম্পর্ক অল্প।

তুলসীদাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটা কথার অবতারণা করিব। তুলসীদাসের ধর্ম্মপ্রেরণা কোথা হইতে আসিয়াছিল বোধ হয় সকলেই জানেন; তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অন্যায় স্ত্রী-আসক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন এই আসক্তি ভগবানে (রামে) অর্পণ করিলে তাঁহার জীবন সার্থক হইত। স্ত্রীর এই ভর্ৎসনাসূচক উপদেশেই তুলসীদাসের চৈতন্য উদয় হইল। তিনি তাঁহার এই আসক্তি "রামসীতায়" অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শন (ভগবদ্দর্শন) করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সীতাতে তাঁহার অহৈতুকী ভক্তি ও ভালবাসা ছিল বলিয়াই তিনি সীতাচরিত্রে মাতৃত্বের ও সতীত্বের ভাব অমন সম্যকরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন! কি স্থলে, কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে গিয়া তুলসীদাস "দিনকো মোহিনী, রাতকো বাঘিনী" ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়।

আমি এই শতাব্দীর স্বতন্ত্রভাবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়ার জোরে আজকাল আমরা, মেয়েদের বন্ধন দূর হইয়াছে, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সমূহ উন্মুক্ত বাতাসে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে, যথেষ্ট বুঝি—যদি শুধু দেখিতে পাই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার

ক্ষমতা থাকে, Vote এর অধিকার লাভ করে এবং যদি স্বামীকে বলিতে পারে "তোমার আমার অধিকার সমান"। এইরূপ স্বাধীনতা আমাদের দেশপ্রসূত নয়, উহার আগম পাশ্চাত্য দেশ হইতে। কই, যদি পাশ্চাত্য সভ্যতাই একমাত্র আদর্শ সভ্যতা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইউরোপ ও আমেরিকায় আজ যে সামাজিক ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে তাহার কারণ কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন ব্যাপারেরই বাড়াবাড়ি ভাল নহে—একটা সীমা ঠিক রাখিয়া চলা ভাল। উশৃঙ্খল জীবন কষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে,—আমরা চাই liberty, libertinity নয়। যে সভ্যতা ও শিক্ষার বিষ উদ্গীরিত হইয়া আজ পাশ্চাত্য সমাজ ও জীবন বিধ্বস্ত, যে সভ্যতার ফলে আজ গার্হস্থ্য জীবন বিষময়, স্নেহ মমতা শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং যে সভ্যতার সংস্কার করিবার জন্য আজ পাশ্চাত্য সমাজ বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে, আজ না আমরাই আপন রতন চিনিতে না পারিয়া সেই আপাতমধুর ঝুটা সভ্যতার মোহ কাটাইতে পারিতেছি না,—বরং দিনের দিন সেই দিকেই ঝুকিয়া পড়িতেছি। সম্মুখে অগ্নি শিখার সম্মোহিনী শক্তি—পতঙ্গ সাবধান! পরানুকরণই শিক্ষার ও জ্ঞানের চিহ্ন নহে—আত্মশক্তির বিকাশ কর, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও এবং নিজের দেশ, হাওয়া ও অবস্থার সঙ্গে আত্ম সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার থাপ খাওয়াইয়া তোল—তবেই ত ঠিক ঠিক ভারতীয় ভাব ফুটিয়া উঠিবে—তবেই ত আবার ভারত ললনা শিক্ষা দীক্ষায় গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত, স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা, কোমলতা ও সতীত্বে সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর মত হইয়া উঠিবে।

(২)

(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সিংহ।)

গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "জাতিগঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের" বক্তৃতার সারাংশ বাহির হইয়াছে উহাতে কাজের কথা অনেক আছে সত্য কিন্তু কয়েকস্থলে গুরুতর ভ্রম থাকায় উহার প্রতিবাদ নিতান্ত আবশ্যক।

(১) "বিবেকানন্দের ভক্ত বলবেন—বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার কর।"—বিবেকানন্দের ভক্ত সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু সন্তানগণকে আপন আপন ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক রাখিয়া বেদান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। দ্বৈত অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্যে আপন অভিরুচি মত যে কোনরূপ ব্যাখা করুন তাহাতে আপত্তি নাই। এক উদ্দেশ্য—হিন্দুধর্ম্মের সকল শাখা প্রশাখাই বেদান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অপর উদ্দেশ্য—"অন্তর যার বাধা নির্ম্মুক্ত তার কাছে বাহিরের বাধা কখনও সাংঘাতিক হয় না। বাহির যে অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। অন্তরে সত্যের আলোকে যা গ'ড়ে ওঠে, বাহিরে তার প্রতিষ্ঠা হবেই, সে কোন বাধা মান্‌বে না।" তাই বেদান্ত পাঠ করিলে সকলেই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষরূপ মনের শক্তি লাভ করেন। জেলে ভাল মাছ ধরিতে পারে, উকীল ভাল জেরা করিতে পারেন, ডাক্তার ভাল রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। হিন্দু ব্যতীত অপর ধর্ম্মাবলম্বী যদি ইহা পাঠ করেন তবে তাঁহার নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, আরও তিনি আপন ধর্ম্মেই অধিকতর নিষ্ঠাবান হইবেন। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য বেদান্ত পড়িতে হইবে বলিয়া যে, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, রসায়ন বা বাণিজ্য প্রভৃতি অন্য কোন বিদ্যা আর শিখিতে হইবে না এমনকি খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন, পরিধানের জন্য বস্ত্র বয়ন, নদী নালা পার হইবার জন্য নৌকাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না বিবেকানন্দের ভক্ত কবে একথা বলিয়াছেন? বরং সম্পূর্ণভাবে তার বিপরীত কথাই চিরদিন বলিতেছেন। বিবেকানন্দের ভক্তগণই বলিতেছেন হে ভারত সন্তান! তোমাদের ধর্ম্ম যথেষ্ট আছে এখন কর্ম্ম কর। আগে খাইয়া বাঁচ তারপর ধর্ম্ম করিও। বিবেকানন্দের ভক্ত সন্ন্যাসিগণই ভক্তি, মুক্তি সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষুধাতুরকে খাদ্য ও পীড়িতকে ঔষধ দিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিবেকানন্দের ভক্তগণই সর্ব্বাগ্রে মেথর, মুচি, হাড়ি ডোম, চণ্ডালকে দরিদ্র নারায়ণ আখ্যা দিয়াছেন ও সেবা না বলিয়া পূজা বলিয়া আসিতেছেন!

(২) "পরম ধার্ম্মিক হিন্দু রাজার রাজত্বকালে শূদ্র তপস্যা করেছে

ব'লে তার শিরচ্ছেদনের ব্যবস্থা হল" ;—যিনি প্রজাগণের মনোরঞ্জনার্থ প্রিয়তমা পত্নীকে বনে দিয়া অসহ্য বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তিনি কেন তপস্যা করার অপরাধে শূদ্রকে হত্যা করিলেন ? তিনি ত নিজেই বানরকে "উপনিষদ্" শুনাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন। তবে এ কঠোর দণ্ড কেন ? এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই প্রকৃত সদুত্তর পাওয়া যায়—শূদ্র, পদদ্বয় গাছের ডালে বাঁধিয়া মাথা নীচুদিকে ঝুলাইয়া আবার মাটীর উপর প্রবল অগ্নি জ্বালাইয়া কঠোর কৃচ্ছ তপস্যা করিতেছিলেন; সে সময় লোকে ঐরূপ তপস্যায় দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া যে বর লাভ করিত, তাহার শক্তিতে আপন সুখের আশায় অনেক লোকের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিত। ইহাতে সমাজে অশান্তির ভয়ে তাহাকে ঐরূপ দণ্ড দিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ ভ্রাতৃকল্প শূদ্রগণের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া কলথানাওয়ালারা তাহাদের আত্মোন্নতির সরল, শান্তিময় ও সমাজের নিরুদ্বেগ জনক তপস্যা ধ্বংস করিয়া দিল, সে সময় কিন্তু এই শ্রেণীর বক্তাগণ নীরবে শাস্ত্র আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। আর তাঁহার আদর্শ মত, কল কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ শত শত তপস্বিশূদ্রের মস্তক ছেদন অহরহ হইতে থাকিবে ইহা যেন একটু ভাবিয়া দেখেন। আর আজকাল শূদ্র বলিতে যেরূপ হীন জাতি বুঝায় তখন সেরূপ ছিল না, মহাভারতকার স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন "সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল, ক্রমে অবনতি হওয়াতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে আবার সত্যযুগের আরম্ভে সমস্ত জাতিই ব্রাহ্মণ হইবেন।" তখন সমাজে জাতিবিভাগ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, জীবন্ত সমাজে যদি কেহ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পাদনে ক্রটী করে তাহাকে কঠোর দণ্ডই ভোগ করিতে হয়। সমাজ গঠনের প্রথমেই যদি কেহ নিজ সম্প্রদায়ের কার্য্য সম্পাদনে অনিচ্ছুক হয় তবে তাহার প্রথমেই ঐ দলে প্রবেশ না করাই অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, শূদ্রের যদি তপস্যা করিবারই এত সাধ হইল, তবে সে পৈতা গলায় দিল না কেন ? তখন এক বাপের দুই ছেলের একজন পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যজন ক্ষুর নরুণ ধরিয়া নাপিত হইলেন এ দৃষ্টান্ত

ও বিধির অভাব ছিল না, আবার আজকালকার মত পৈতা লইতে হইলে থালা, ঘটি, বাটী, গেলাস প্রভৃতির আবশ্যক হইত না। কতকগুলি ফল," ফুল, কুশ, মৃগচর্ম্ম ইত্যাদি বন হইতে কুড়াইয়া আনিতে পারিলেই হইত! মনে রাখিতে হইবে যে রাজা শূদ্রের মাথা কাটিয়াছিলেন, তিনিই হীনতম চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন।

(৩) "মনু মহাশয় ব্যবস্থা করেন যে শূদ্রের কর্ণে বেদোচ্চারণ শব্দ প্রবেশ করিলে উত্তপ্ত তরল সীসক সেই কর্ণে ঢালিয়া দিতে হয়। এই মনুস্মৃতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি?" মনু মহাশয় না হয় বেদ শুনিলে তাহার কর্ণে উত্তপ্ত তরল সীসক ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু এ দিকে যে, "যজুর্ব্বেদ" স্বয়ং বলিতেছেন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে হইবে, সকলেই বেদ পড়িবে। বেদ স্বয়ং যাহা বলিতেছেন তাহা না শুনিয়া পরবর্ত্তী কালে রচিত স্মৃতির উপর এত ভক্তি কেন? "যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানীজনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥ (শুক্লযজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২য় মন্ত্র) আর মনু তখনকার সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা দেখিয়া তখনকার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন ত কলিতে "পরাশর স্মৃতি" চলিবে। অতীত যুগের সেই সুপ্রাচীন প্রথা স্মরণ করিয়া মনুর উপর এত ক্রোধ কেন? যাঁহারা মনু মহাশয়ের হুকুম বজায় রাখিতে গিয়া বেদ পড়িতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা মনুর অপর আদেশগুলি (ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা, সন্তান উৎপাদন, অর্থ উপার্জ্জন, ধনসঞ্চয়, সকল বিষয়ে সংযম ও দান প্রভৃতি ব্যবস্থা) যথাযথ প্রতিপালন করিয়া কতদূর উন্নত হইয়াছেন? মনুর আদেশে বেদের সংহিতা ভাগ না হয় পড়া চলিল না, কিন্তু বেদের সার উপনিষদ্‌ভাগ যাহার কোন কোন অংশের শ্রোতা বনের বানর তাহা পড়িয়া শূদ্রগণ আত্মোন্নতি করিতে পারিলে না কেন? উপনিষদের জীবনপ্রদ অমৃতবাণী শূদ্রগণকে এতদিন এমন অবস্থায় লইয়া যাইত যাহা ব্রাহ্মণগণেরও বিশেষ লোভনীয় হইত। আর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মুকুটমণি শ্রীমৎ ভগবৎগীতা খানা, পুরোহিত ঠাকুর যে, দুয়ারে দুয়ারে

প্রত্যেক শ্রাদ্ধে, প্রত্যেক পুষ্করিণী, কূপ ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠায় পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মেথর মুচি নির্ব্বিশেষে সকলকে শুনাইয়া বেড়াইলেন তাহার সেই "মৃত সঞ্জীবনী" অমর বার্ত্তাই বা কয়জন শুনিলেন?

মনুর পর পুরাণকার বলিলেন

"চাণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"

তৎপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন—

"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।"

এবং তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু, দেশাত্মবোধের জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য নিজ পিতার শ্রাদ্ধপাত্র যাহা সুলক্ষণযুক্ত বেদজ্ঞ কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহাকেও কখন দেওয়া হয় না, তাহা "যবন হরিদাসকে খাইতে দিলেন", শত শত ব্রাহ্মণের আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। সেই সকল মহাপুরুষগণের আদেশ ও উপদেশ, কার্য্য ও দৃষ্টান্ত লঙ্ঘন করা হইতেছে কেন? মুচি রামদাসের ব্রাহ্মণ হইতে কোটীগুণ সম্মানদর্শনে শূদ্রজাতি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইল না কেন?

বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতগণ, ব্রাহ্মণজাতি ও তাঁহাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষগণ, কি বর্ত্তমান অবনত বংশধরগণকে যত ক্ষুদ্র হৃদয় বলিয়া ঘোষণা করুন না কেন আমরা বিশেষ অনুসন্ধান বলে সাহসের সহিত বলিতেছি তাঁহারা তত ভীষণ নহেন। বঙ্গদেশে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "ঋক্‌বেদের অনুবাদ" শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস মহাশয়ের "ঋকবেদের অনুবাদ" শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের সংগৃহীত "বেদসংহিতা" শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় প্রকাশিত সানুবাদ "ঋক্‌বেদ" শত শত ব্রাহ্মণের ঘরে সাদরে রক্ষিত ও পঠিত হইতেছে। ইঁহাদের একজনও ব্রাহ্মণ নহেন। এদিকে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ অপর শূদ্র ভিন্ন তৃতীয় জাতি নাই। বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণমণ্ডলী কর্ণে উত্তপ্ত সীসকের পরিবর্ত্তে বেদপাঠক শূদ্রের মস্তকে "অগুরু"সিঞ্চনই করিতেছেন। প্রমাণ—"ময়নাজলের ঘোষঠাকুর

মহাশয়গণ কায়স্থ হইলেও তাঁহাদের শত শত কুলীন ব্রাহ্মণ শিষ্য। আর স্বামী বিবেকানন্দ কায়স্থ হইলেও তাঁহার শত শত সুশিক্ষিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শিষ্য।" মহাত্মা গান্ধীর মহামন্ত্রে মেথর, মুচি, কুলী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ যেরূপ জাগিতেছে তাহাতে অচিরে আমরা শত শত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি মিলিয়া তাহাদের পদতলে বসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" বোধ করিব। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ যে সুবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, মহাত্মাগান্ধি আজ তাহাকে ফলপুষ্পে সুশোভিত করিতেছেন, অচিরে সমগ্র ভারত তেত্রিশ কোটী ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়া, এক প্রাণ, এক জাতি ও এক কর্ম্মী হইয়া পড়িবে। তাহাতে ব্রাহ্মণকে "বেদ", মুসলমানকে "কোরণসরিফ" বা খৃষ্টানকে "বাইবেল" ছাড়িতে হইবে না বরং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ধরিতেই হইবে।

(৪) "বেদ, বেদান্ত পাঠ্য হ'লে বাঙ্গালার শতকরা ৫২ জন মুসলমান কি করবে? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ—কোন পন্থী হলে মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে?" যে যে প্রতিষ্ঠানে মাত্র বেদ-বেদান্ত পাঠ্য হইয়াছে কিন্তু কোরাণসরিফ বা বাইবেলের স্থান নাই, সেই সেই প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় বিশেষের জন্যই স্থাপিত বুঝিতে হইবে। কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের সকল বিদ্যার্থীই যে ঐ গুলিতেই অধ্যয়ন করিবে তাহা নহে, যাহাতে অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা নাই, ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগেরই জয় জয়কার শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে তাহার ছাত্র সংখ্যা আর কত হইবে? ঐ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত মিলিত হইয়া সাধারণ জাতীয় বিদ্যাপীঠ গুলিতেই পড়িবে। তবে, মাত্র বেদবেদান্ত পাঠ্যযুক্ত বিদ্যা-মন্দিরগুলিরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কেননা আমাদের বেদবেদান্ত উপনিষদ-গুলি যেরূপভাবে আলোচিত হইলে আমরা উহার সুধাময় ফল উপভোগ করিতে পারি, বর্ত্তমান "টোল ও দেবালয়গুলি" সে ভাবে যাইতেছেন না, যদি বর্ত্তমান "মাদ্রাসা ও মসজিদ" অথবা "খৃষ্টীয় বিদ্যালয় ও চার্চ্চ" মুসলমান ও খৃষ্টিয় ভ্রাতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে না পারিতেছে, যদি কোরাণ সরিফ ও বাইবেল যথাশাস্ত্র আলোচনার ক্রটী হইতেছে তবে

অচিরে ঐ দুইশাস্ত্র আলোচনার জন্যও পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতেই হইবে। অর্থ, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারত সন্তানই প্রদান করিবেন। প্রত্যেক ভারত সন্তানকেই কিছু কিছু সাধনা করিতে হইবে, নতুবা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইত্যাদি সকল শ্রেণীকে, এক স্থানে বসাইয়া যদি শত বৎসরকাল, ধর্ম্মহীন, একধর্ম্ম বিশিষ্ট, আপন আপন ধর্ম্ম বিশিষ্ট, সমগ্র মিশ্রিত ধর্ম্ম বিশিষ্ট অথবা আরও যত রকম কল্পনা করিতে পারেন সেইরূপ মাত্র মৌখিক বাহ্য শিক্ষা প্রদান করা যায় তবে কিছুতেই তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে পারিবে না। হিন্দু ধর্ম্ম ভাল কি মুসলমান ধর্ম্ম ভাল তাহা লইয়া ত ঝগড়া নয়, ঝগড়া হইতেছে "কি! আমি বল্‌ছি হিন্দু ভাল, আমার কথাটা থাক্‌বে না?"—"আমি বলছি মুসলমান ভাল আমার আবার প্রতিবাদ?" যতক্ষন এই যে ভীষণ মহাপাপ—"আমি", ইহার সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্ভব না হইলেও—কঠোর দমন না হইতেছে ততদিন মিলনের আশা সুদূর পরাহত। একত্র আহারী ও একধর্ম্মী হইলেই যদি দেশে শান্তি স্থাপিত হইত তবে ইউরোপে এই মহাকুরুক্ষেত্র হইল কেন? ভিন্ন প্রদেশের সহিত পরস্পর বিবাহ চলিলেই যদি শান্তি স্থাপিত হইত তবে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের মধ্যে সেই ভীষণ মনান্তর জন্মিল কেন? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ কোন-পন্থী না হইয়া "স্বপন্থী" অবস্থাতেই মুসলমান ভ্রাতাদের 'টেনে' নেওয়া যেতে পারে! নিজের হৃদয় যাঁর প্রশস্ত তিনি পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোককেই টেনে নিতে পারেন। আর যাঁর হৃদয় সংকীর্ণ তিনি সকলকেই পর ভাবিয়া তাড়াইয়া দেন।

(৫) "মনুর মতে রাজা দেবতা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগের স্থান নেই, যা বল্‌বেন তাই মান্‌তে হবে।" মনুর মতে রাজা যাহাই হউন পঞ্চম বেদ মহাভারত কিন্তু জলন্ত ভাষায় রাজার কুলের কথা বাহির করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান নূতন নূতন রাজনৈতিক মত সমূহ বাহির হইবার কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই মহাভারত বলিয়াছেন যে, "রাজা আর কিছুই নয়, পূর্ব্বে ত এর নাম গন্ধই ছিল না পরে কতকগুলি লোক মিলিত হইয়া একজনকে নেতা ঠিক করিল, আর সকলে মিলিয়া কতকগুলি

নিয়ম প্রণয়ন করিল। সেই নেতার অধীনে ঐ নিয়মগুলি প্রতিপালন করিয়া ঐ দল বেশ সুখ শান্তিতে আছে দেখিয়া আরও অনেকে ঐ দল ভুক্ত হইয়া একটী রাজ্য স্থাপন করিল, তাহার অনুকরণে শত শত রাজ্য স্থাপন চলিতে লাগিল।" যদি দেশের লোককে জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যেও স্বাধীনতার আন্দোলন জাগিয়া উঠিত নিশ্চয়। কারণ, অত্যাচারী রাজা বেণ ও নহুষকে রাজ্যচ্যুত করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান কালে একজন ভারত সন্তান "হাম্‌ডেন্‌" ও "পিম" প্রভৃতির নামও জানিত না।
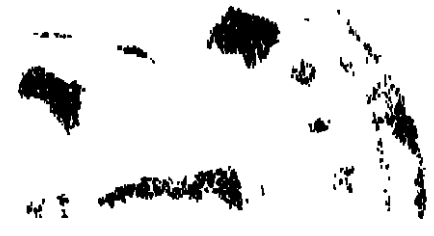
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কুলি-সেবাকার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কুলি-সেবাকার্য্যের (গোয়ালন্দ ২৫শে মে এবং চাঁদপুর ২৮শে মে হইতে ২৮শে জুন, ১৯২১) হিসাব।

জমা—রামকৃষ্ণমিশন প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে গৃহীত ৪০৩৸/০, বর্ত্তমান প্রাপ্ত দান ২৩৯৭৸/০, কার্য্য স্থানে প্রাপ্ত দান ৭৭৵০, খুচরা জিনিষ পত্র বিক্রয়ে প্রাপ্ত ১৩।৷/১৫, মোট ২৮৯২।/১৫।

খরচ—কুলিদের চাল, ডাল, নুন, চিঁড়া, গুড় প্রভৃতি ১৬৭৬৸৶৫, গোয়ালনন্দ হইতে কুলিদের নৈহাটি পৌছিবার জন্য (২৫।৫।২১) ৭৫০ খানি টিকেটের দাম ৭০৩৲, কুলি রোগীদের জন্য নূতন কাপড় ৫৭৶১৫, চাঁদপুরের কুলিদের (৮১৮) আর্থিক সাহায্য ৬৯৬৷৵০, ঐ বাবদ অপরাপর খুচরা খরচ ১৪৷৷/০, কলিকাতা, ঢাকা, বরিশাল কেন্দ্র হইতে ২২ জন সেবকের যাতায়াত ও খাওয়াদাওয়া. ষ্টেসনারী, পোষ্টেজ, উপকরণ ইত্যাদি বাবদ মোট খরচ ১৮৭৷৷৶১৫, মোট খরচ, ২৮৯২।/১৫।

এতদ্ব্যতীত ৪/ মন চাল, ।০ সের ডাল, ।০ সের নুন্ এবং তরীতরকারী (দান স্বরূপ প্রাপ্ত) কুলীদের মধ্যে বিতরিত হয়।

কংগ্রেস কমিটি ৪৩২১।১৫ এবং মারবারী সেবক সমিতি ১১২৬৵১৫ কুলিদের সাহায্যের নিমিত্ত আমাদের হাতে দেন। ঐ টাকার হিসাব পৃথক ভাবে তাঁহাদের নিকট দেওয়া হইয়াছে।

আগামীবারে খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষ কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিব। যাঁহারা সাহায্য দানে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় হাওড়া বা সেক্রেটারী, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অর্থ বস্ত্রাদি পাঠাইলে বাধিত হইব। (স্বাঃ) সারদানন্দ।

UPLIC

আগমনী।

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়)

সুনীল নভের বক্ষে ভাসে শাদা মেঘের ভেলা;—
নীল সাগরে শুভ্র ফেনার হরেক রকম খেলা।
শরৎ-শেষের অর্ঘ্য লয়ে ঐ যে আকাশ সাজে;
ভুবন ব্যেপে কাহার আগমনীর সুর বাজে!
বাংলা মায়ের দীন আলয়ে শ্যামল সভায় পূজা;—
আয় মা! মোদের সকল আশা! আয় মা দশভুজা!

*　　　*　　　*

শিউলি ফোটা শ্যামল বনে রূপের ছড়াছড়ি,
গন্ধ তাহার উবিয়ে গেল বাতাস পাগল করি।
হরেক ফুলের রঙীন নেশায় ভ্রমর আকুল হ'ল;
দোয়েল শ্যামা গোপন ঝোপে আকুলিয়া গেল।
বাংলা মায়ের কানন-ঘেরা শিউলি-কুঞ্জে পূজা;—
আয় মা! মোদের সকল আশা! আয় মা দশভুজা!

*　　　*　　　*

শিশির মালার মুক্তো দিয়ে পান্না সবুজ সাজে;
করুণ চোখের অশ্রুকণা তাতেই সুধু রাজে।
শিশির-ভেজা শীতল-করা বায়ুর লহর ছোটে;
প্রাণের জড় কারার বাঁধন অলক্ষ্যে আজ টুটে।
বাংলা মায়ের শান্তি-শীতল অঙ্গনে আজ পূজা;—
আয় মা! মোদের সকল আশা! আয় মা দশভুজা!

সরসীর আজ ফুল্ল কোলে কমলিনীর আলো,
কাহার আগমনীর প্রদীপ হরষে জ্বালালো !
শোভার পুরে হীরক-মালা, তটিনী আজ সাজে,—
ঢেউএ ঢেউএ আগমনীর জল-তরঙ্গ বাজে।
কমল-কুমুদ অর্ঘ্য দিয়ে তোরি চরণ পূজা ;—
আয় মা ! মোঁদের সকল আশা ! আয় মা দশভূজা !

* * *

কাশের বনের শুভ্র শির ঐ প্রতি স্তরে স্তরে,
তোমার আসার আনন্দেতে নর্ত্তনেতে ওড়ে।
শুভ্র ঢেউএর অভ্র মাঝে চরণ দুটি ফোটে ;
তোরি তরে জগৎ জুড়ে কি আনন্দ ছুটে !
শুভ্র বকের অর্ঘ্য দোলে, রক্ত জবার পূজা ;—
আয় মা ! মোদের সকল আশা ! আয় মা দশভূজা !

* * *

বুলবুলি আর পাপিয়ার ঐ মোহন বাঁশীর খেলা ;
আলোয় রাঙা আকাশতলে কাটছে সকাল বেলা
তোরি তরে জগৎ জুড়ে আয়োজনের সাড়া ;—
মূর্চ্ছনা আর গমক মীড়ে বাহির ভিতর হারা।
জগৎ জোড়া চরণ দুটির দীনপ্রাণের এই পূজা ;—
আয় মা ! মোদের সকল আশা ! আয় মা দশভূজা !

* * *

বাংলা মায়ের দীন কুটীরে—হাসির-লহর ছবি,
সেথায় তোরে বরিয়ে লব আয় মা প্রাণের দেবি !
আয় মা গগন-ভুবন ব্যেপে, আয় মা গৃহের কোণে,
আয় মা চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভায়, আয় মা বনে বনে।—
আয় মা মনোমন্দিরেতে সেথায় তোরি পূজা ;—
আয় মা ! আয় মা ! আয় মা দেবি ! আয় মা দশভূজা !

কথাপ্রসঙ্গে।

এক অনন্ত অপার শক্তি সমুদ্র। সে স্বচ্ছ শক্তি সাগর অণুপরমাণুর রঙ্গভঙ্গীতে আবিল, কোথাও বা নীহারিকার ফেন পুঞ্জে ধবল বক্ষ; আবার আবিলতার ঘন সন্নিবেশে গভীর বিপুল আকাশে অসংখ্য ভাসমান দ্বীপমালার চকিতে বিকাশ, চকিতে বিলয় ঘটিতেছে। সে শক্তির স্পন্দন কালের সূচক, প্রতি তরঙ্গ দেশের জনয়িতা, তরঙ্গের পরম্পরা নিমিত্তের বোধিকা। পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্যজগতের সময়ে জন্মস্থিতিভঙ্গ হয় বলিয়া তাঁহার মহাকাল আখ্যা কিন্তু যাহার স্থিরতায় মহাকালও বিলীন হইয়া যান তিনিই আদ্যাশক্তি ভগবতী কালী। এই আদ্যাশক্তি এক হইয়াও বহুরূপে ক্রীড়াশীলা—যাহার ফল বিবর্ত্ত, পরিণাম, বিকার ক্রমবিকাশ বা পরিবর্ত্তন। জগৎ অর্থে গমনশীল—প্রবাহ বা পরিবর্ত্তনেই ইহার প্রাণ—পরিবর্ত্তন নাই, জগৎও নাই।

* * *

"হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী,
শব্দহীন সুর।
অন্ত হীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া?
সর্ব্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘর ছাড়া!
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন-ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল;

অঞ্চল আকুল

গড়ায় কম্পিত তৃণে,

চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;

বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল

জুঁই চাঁপা বকুল পারুল

পথে পথে

তোমার ঋতুর থালি হতে।"

* * *

"যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,

তুমি তাই

পবিত্র সদাই।

তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি

মলিনতা যায় ভুলি

পলকে পলকে,—

মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।"

* * *

চঞ্চলার প্রতি পাদক্ষেপে অন্তর ও বাহ্যজগতে পরিবর্ত্তন ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্ট বা অনুভূত হইতেছে। ব্যষ্টির পরিবর্ত্তনে সমষ্টির পরিবর্ত্তন। অণুপরমাণুর পরিবর্ত্তন জগদব্রহ্মাণ্ড পরিবর্ত্তনের বোধক। অন্তর বিভাগে এই অনাদি প্রবাহের পরিচয় আমরা পাই ধর্ম্মে, রাজনীতিতে সমাজে, সাহিত্যে। যখন বিরাট ইচ্ছাশক্তি ধীরে ধীরে ব্যষ্টি মানব-মনের মধ্য দিয়া বিকশিতা তথা একীভূতা হইতে থাকেন, তখন ক্ষীণ-প্রায় বিরুদ্ধ ইচ্ছাধার 'পুরাতন' তাহাকে অন্তর্বিপ্লব আখ্যা দেয়, কিন্তু 'নবীন' সেই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে আদি ইচ্ছাশক্তির সফলতা ও পরিপূরণই অনুভব করিয়া থাকে। সেই অনাদি ইচ্ছাশক্তির ঐক্যতানে সুর মিলাইতে অপারগ পুরাতনের কর্ত্তব্য হয় শেষ এবং লীলাধার নবীন রাজা, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্যের হয় উত্থান।

পরিণাম ত সর্ব্বক্ষণই চলিয়াছে, তবে পুরাতনে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার ফল ব্যভিচার বা সংস্কার, অরাজকতা বা সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন, ভাষার অস্পষ্টতা বা সুমধুরত্ব। পরন্তু নবযুগাগমনের যথার্থ কারণ নবজ্ঞানোন্মেষ। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব প্রতি ব্যষ্টিতে অজ্ঞানাবরণে সুপ্ত ; ক্রমে যতই সেই আবরণ উন্মোচিত হইয়া ব্যষ্টির স্বরূপের প্রকাশ ঘটিতে থাকে তখন আর সে মৌলিকত্বহীন পুরাতনের পরিবর্ত্তনে তৃপ্ত হইতে না পারায় এক বিরাট গুপ্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে —যে অস্থির অতৃপ্ত শক্তি ধীরে ধীরে সমষ্টি সভ্যতার ভিত্তিতে আঘাত দিয়া একদিন অকস্মাৎ ভূকম্পনের ন্যায়, আগ্নেয়গিরির বিস্ফারণের ন্যায় পুরাতনের জীর্ণ প্রাসাদ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু পুরাতনের অজীর্ণাংশ ভবিষ্যৎ নবীন সভ্যতা প্রাসাদ নির্ম্মাণের উপকরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

*　　　　*　　　　*

আমরা অতীতকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারি না। কারণ অতীত-দৃষ্টিহীনের কদাচ ভবিষ্যৎদৃষ্টি সম্ভবপর নয়। কারণ—অতীত, কার্য্য—বর্ত্তমান, কারণ—বর্ত্তমান, কার্য্য—ভবিষ্যৎ। কার্যাকারণের তরঙ্গ পরম্পরায় এই বিরামবিহীন জগৎপ্রবাহ। অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত। যখন কোন অতিমানবের শুভাগমনে পুরাতনের বিপর্য্যয় উপস্থিত এবং নব নব ভাব তরঙ্গের অভ্যুত্থানের দ্বারা নবজ্ঞানবন্যায় জগৎ উপপ্লাবিত, তখন সাধারণ কল্পনা করে এ অতিমানব কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিত—ভূঁইফোঁড় !—এ নবজ্ঞান প্লাবন আকস্মিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভ্রূণ যেমন গর্ভে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা লাভে অকস্মাৎ নানা যন্ত্রণা ও উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, পদ্মার অন্তর্নিহিত শক্তি ধীরে ধীরে কার্য্যকারিণী হইয়া হঠাৎ একদিন যেমন গ্রামকে গ্রাম নিজ গর্ভে টানিয়া লয়, সেইরূপ নব জ্ঞানোন্মেষে পুরাতনে অতৃপ্ত মানবের ইচ্ছাশক্তি সকলের অজ্ঞাতসারে কার্য্যকারিণী হইয়া উপযুক্ত আধার লাভে প্রচণ্ডবেগে নিঃসরিত হয়। এই আধারকেই আমরা অতি-মানব বা যুগ-নায়ক

আখ্যা দিয়া থাকি। তাঁহারা 'নবীন শক্তির স্রষ্টা নহেন, পথ প্রদর্শক! আলোক স্তম্ভ!

* * *

পুরাতনের পতনেরও একটা আবশ্যকতা আছে। জলধী তরঙ্গের উত্থান-পতনই ইহার উদাহরণ। তরঙ্গ পড়ে কেন?—প্রবল বেগে, নূতনরূপে উঠিবার জন্য। এইরূপ ক্রমবিকাশের অঙ্গরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়াছে। কি চিন্তা জগতে, কি পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক রাজ্যে সর্ব্বত্রই এই ক্রমবিকাশের গতি ঝঙ্কারে আরোহণ ও অবরোহণের চির সমাবেশ। উত্থান তাহার নবীনত্বের উজ্জ্বলতায় লোকচক্ষুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু আমরা বুঝি না যে অতীতের ভাবরাশি পরিপাকের নিমিত্ত পতনের বর্ম্ম দিয়া লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইতেছে নবজ্ঞান সমন্বয়ে প্রবলবেগে উঠিবার জন্য।

* * *

যুগ নায়কের মর্ম্মস্থলে লেখা থাকে প্রাচীন যুগের সকল ইতিহাস। কারণ সমগ্র তরঙ্গশক্তি কেন্দ্রীভূত হয় শীর্ষদেশে এবং শীর্ষদেশেই যুগ নায়কের অবস্থান। যদি আমরা ইঁহাদের প্রতি উক্তি এবং কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করি তাহা হইলে বিশ্বের সমগ্র পুস্তকাগারে তাহা ধরিবে না, যদি তাঁহাদের অপূর্ব্ব বাণী এবং কার্য্যের বিশ্লেষণ আমরা করি তাহা হইলে কত যুগ যুগান্তরের ইতিহাস তাহার কঞ্চুক মোচন করিয়া বাহির হইবে তাহার ইয়ত্তা কে করে। তাঁহারা সেই অতীতের জ্ঞানরাশি নবাবিষ্কৃত জ্ঞানের সহিত সমবায়ে জগৎকে দান করিয়া দিশেহারা মানবের পথপ্রদর্শক হন।

* * *

প্রতি ব্যক্তিগত জীবনে অতীতের সংস্কারবীজ সংগোপনে নিহিত যাহা বর্ত্তমানে চরিত্ররূপে প্রকটিত হয়। বংশ, বেষ্টনী, শিক্ষা এবং পূর্ব্বজন্মাভিজ্ঞতা হইতে উহা জীবের হৃদয় গর্ভে সঞ্চারিত। সুতরাং প্রতি জীবে বহুযুগের সমুদয় অতীত সম্পত্তি বর্ত্তমান। তাই কবি অতীতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"যুগযুগান্ত ঢালে তা'র কথা
তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে!
সেথা এসে তা'র স্রোত নাহি আর,
কল কলভাষ নীরব তাহার,—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন!
তুমি তারে কোথা লও!
"কোন কথা কভু হারাওনি তুমি,
সব তুমি তুলে লও,—
"তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া!
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হ'য়ে রও!"

সাধারণ ব্যক্তি এবং যুগনায়কে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ এই —আমরা যেন চিরচঞ্চল কালপ্রবাহে অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ আর তাঁহারা যেন বিরাট তরঙ্গ; আমাদের তন্বী-স্মৃতি অতীতের ইতিহাসকে অতি অল্পই প্রকাশ দিতে সমর্থ, আর তাঁহারা যেন অতীতের মূর্ত্ত-বিগ্রহ তথা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের দ্রষ্টা। কবি তাই জাতিস্মরের অটুট স্মৃতি অনুভব করিয়া বলিতেছেন,—

"কত কি যে আসে কত কি যে যায়
বহিয়া চেতনা-বাহিনী!

আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত,—
ছিন্ন সূত্র বাছি শত শত
তুমি গাঁথ ব'সে কাহিনী।
"কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,
কত ভুলি, কত হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
তুমি তাই ল'য়ে বিরাম বিহীন
রচিছ জীবন কাহিনী।"

" 'দুর্ভাগা' এশিয়া! তুমি কি এশিয়া মহাদেশকে 'দুর্ভাগা' এশিয়া বলিতে চাও? পারমার্থিক ভাবরাজি ও অধ্যাত্মিক অভাবের লীলা-নিকেতনকে তুমি এই আখ্যা দিবে? বিশ্বের অন্যান্য অংশের যাকে তুমি 'জাগরণ' কহিতেছ তদপেক্ষা এশিয়ার এই 'ঘুমঘোর' অধিক আবশ্যক, কারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির স্বপ্ন সাধারণ মনুষ্যের সতর্ক জাগরণ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান্। তবুও বলিবে 'দুর্ভাগা' এশিয়া? হায় ইউরোপের দুর্ভাগ্যের জন্যই আমার দুঃখ হইতেছে?"

—Benjamin Disraily.

"আমাদের কার্য্য-প্রণালী অতি সহজেই বর্ণিত হইতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে, কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনরায় স্থাপিত করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, কিন্তু ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ গৌরব-শিখরে আরোহন করিল। ইহাই রহস্য। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটী বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা আপনিই উন্নত হইবে। এদেশে ধর্ম্মের নিশান যতই উচ্চ করা হউক, কিছুতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।"

—বিবেকানন্দ।

বেদান্ত চর্চ্চা।

(অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ)

ঊর্দ্ধে অনন্ত বিসারি নির্ম্মল নীলাম্বর, তলে হিমশুভ্র দুই এক খণ্ড মেঘ ধীরে, সন্তর্পণে অনন্তের কোলে গা ঢালিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রখর কিরণ মালা আকাশ সাগরে ঢেউ খেলিয়া দিগ্-দিগন্তে ছুটিয়াছে, মাঝে মাঝে চিল শকুনি পক্ষ বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ভূতলে আহার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছে। নিম্নে পুঞ্জীকৃত সৌধমালা,—রাজপথে অবিশ্রান্ত জনসমারোহ, শ্রবণবধিরকারী বিকট কোলাহল, জীবন মরণের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ, ঐহিক সুখদেবতার তাণ্ডব নৃত্য, দারিদ্র্য পিশাচীর ভীতিপ্রদ অট্ট হাস্য। মধ্য প্রদেশে দাঁড়াইয়া 'আমি'। কে 'আমি'! ঐ অনন্ত আকাশের সঙ্গে আর এই চাক্ষুষ্মর জগতের সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ! বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়ই বটে। অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত সম্ভার লইয়া চারিদিক হইতে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন। বস্তুতঃ এই বাহ্য জগৎ পরিবর্ত্তন প্রবাহ বই আর কিছুই নয়। প্রত্যেকটী পদার্থই অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্। আবার একটী পদার্থ এই মুহূর্ত্তে যদ্রূপ পরমুহূর্ত্তে অন্যরূপ। এই অবিরাম পরিবর্ত্তনশীলতাই জগতের জগত্ব। এই পরিবর্ত্তন বা ভেদই জগতের মূল সূত্র; অথবা এই ভেদই জগৎ। এই—নিয়ত পরিবর্ত্তন রাশির মাঝে দাঁড়াইয়া—আমি কে?—এই চিন্তা মানব মনে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেসঙ্গেই অনাদি কাল হইতে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই—অতি জটিল অথচ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য একএক জন যুগব্যাপি তপস্যায় জ্ঞানের আলোক লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই সমস্যা পূরণে যিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন কেবল মাত্র তিনিই তাহার ফল ভোগী হইয়াছেন, তাঁহার শ্রমলব্ধ রত্ন অন্যের উপভোগ্য হয় নাই।

এক্ষেত্রে যার যার পথ তাহাকেই করিয়া লইতে হইয়াছে। অপরে কেবল পথ প্রদর্শক মাত্র। তাই আজও মনে হয় ঐ গুরুতর সমস্যা বুঝি কোন কালেই মীমাংসিত হয় নাই বা হইবেও না। সেই জন্য প্রাচীন কালের ন্যায় বর্ত্তমান যুগেও আমরা ঐ সমস্যা পূরণের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করি। কিন্তু উভয়যুগের অন্বেষণ পন্থা বড়ই বিভিন্ন ও বিসদৃশ। ইহাই এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব।

এই 'আমি'র স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া একএক জন একএক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বিভিন্ন মনীষীর চিন্তা-প্রবাহ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল মনীষী প্রকৃত সত্যোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না তাহা আমাদিগের দেখিবার প্রয়োজন নাই; তবে এটুকু নিশ্চিত যে তাঁহারা প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যিনি যাহাই বলুন না কেন অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করাই যে মানব জীবনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে সে বিষয়ে কাহারও মত দ্বৈধ হইবে না। এই সুখ-সমুদ্রে প্রবহমান চিন্তাধারার অন্যতম ধারা বেদান্ত। বেদান্ত বলিতে ষড়্দর্শনের অন্যতম বেদান্ত বা উত্তর মীমাংসাই সাধারণের বোধের বিষয় হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপনিষৎ সমূহই প্রকৃত বেদান্ত। উপনিষদের তত্ত্বগুলি যুক্তি তর্ক সহকারে পরস্পরের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করেন এবং পরবর্ত্তী যাবতীয় বেদান্ত গ্রন্থই ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া রচিত।

বর্ত্তমানে বেদান্ত আলোচনার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অন্যান্য যে বিষয়ে যতই পারদর্শিতা লাভ করুন না কেন বেদান্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে তিনি স্বীয় জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ মনে করেন। Indians are born philosophers, কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ভারতবাসী নিরক্ষর কৃষকের মুখেও বেদান্তের চরম সত্যের আভাস শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন এদেশের দরিদ্র কুটীরের চরকায় সোঽহম্ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। বেদান্তের তথ্যগুলি যেন এদেশবাসীর অস্থি মজ্জাগত। এমন

দেশে শিক্ষিত সমাজ যে বেদান্তের প্রতি এতটা আগ্রহান্বিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে বেদান্ত আলোচিত হইতেছে তাহা প্রকৃতই ভয়াবহ। আমাদের মনে হয় এইরূপে আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বেদান্ত একটা নেহাৎ ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বলিতে গেলে সুরসাল আম্র কাননের শাখা পত্র গণনা করিতেই আমাদের শক্তি সামর্থ নিঃশেষিত হইবে, আম্ররসাস্বাদন কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। তাই একদিকে যেমন আনন্দ, অপরদিকে আবার ততোধিক নিরানন্দ।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। মনে করুন, এক ব্যক্তি মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিবেন মায়াবাদটী কাহার প্রবর্ত্তিত। শঙ্কর না অন্য কেহ? অন্য কেহ হইলে কে, কবে, কোথায় তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মঙ্গোলিয়ান কি ভারতবাসী, শ্বেত কি পীত ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কোন্ সময় হইতে ঐ মায়াবাদ তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, উহাতে শঙ্করের হাত কতটা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে শঙ্করের হইলে, তিনি তাঁহার কোন্ গ্রন্থে ঐ মত ব্যক্ত করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু মায়াবাদ জিনিষটী কি, উহার মূল্য কি, বাস্তবিক উহা একটা dogma না প্রকৃত কিছু এ বিষয়ে অতি অল্প লোকেই বিচারশক্তি প্রয়োগ করেন। দশখানা গ্রন্থের কোন্ কোন্ স্থলে ঐ মতের আভাস পাওয়া যায় ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করাই বর্ত্তমানের 'মৌলিক গবেষণা'। অনেকেই এতৎ সম্বন্ধে বহু বহু অবান্তর বাক্য বিন্যাস করিয়া স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু মূলে কেহই বড় একটা আঘাত করেন না। ফলে শাখাপত্র গণনাই সার হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী গল্প দেখিতে পাই—কয়েকজন শ্রোত্রিয় গৃহস্থ ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া একস্থানে মিলিত হন। কিন্তু বহু আলোচনায়ও প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহারা এক ব্রহ্মজ্ঞের শরণাপন্ন হন এবং ঐ তথ্য উপলব্ধি করিবার জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার

করেন। অবশেষে এক ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজার কৃপায় তাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এখানে দেখিতে পাই প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহাদের মনে একটা উৎকট ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ঐ তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে না পারিলে প্রকৃত সুখের স্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা বেদান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট বেদান্ত আলোচনা আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং প্রকৃত শান্তির উৎস—আর বর্ত্তমানে উহা Intellectual culture এবং যশোলাভের পন্থা। আজকাল এমন অনেক বেদান্ত বিশারদ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে একান্ত অপরিচিত, এবং উপনিষদের নাম মাত্র হয়ত শ্রবণ করিয়াছেন, অথচ বর্ত্তমান যুগের তাঁহারাই বেদান্তের আচার্য্য। জীবনে যাহারা বেদান্তের একটী তথ্যও উপলব্ধি করেন নাই তাহারাই আজ খট্টারূঢ় হইয়া বাহ্বাস্ফোট করিতেছেন।

বেদান্ত যেন একটা ঐতিহাসিক বিষয় হইয়া পড়িয়াছে; প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ঐ একই ধারা। কেহ উপলব্ধি করিতেই পারিতেছেন না যে তাঁহারা কেবল মাত্র খোসা ভুসি লইয়াই টানা-হ্যাঁচড়া করিতেছেন। একটী সমস্যা উপস্থিত হইলে এ বিষয়ে অমুক ভাষ্যকার কি বলেন, অমুক টীকাকার কি বলেন, অমুক বৃত্তিকার কি বলেন ইত্যাদি নিরূপণ করিতে পারিলেই যেন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। নারদ পঞ্চরাত্র নামক পুরাণে কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার একটী অতি সুন্দর উপায় বর্ণিত আছে। সন্দিগ্ধ বিষয়টী গুরুর অনুমোদিত, স্বীয় অনুভবের গোচরীভূত এবং শাস্ত্রবাক্যসম্মত হইলে উহা সত্য, অন্যথা নহে। বর্ত্তমানে যেন একমাত্র শাস্ত্রবাক্য ও নিজ কল্পিত যুক্ত্যাভাসই সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের তুলাদণ্ড। ব্যাপারটী ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। যিনি স্বমত সংস্থাপনের জন্য শাস্ত্রবাক্য যত উদ্ধৃত করিতে পারিবেন তাঁহার বাক্য ততই প্রামাণ্য। প্রামান্যেরও তারতম্য! বস্তুতঃ বিচার-লব্ধ জ্ঞান যদি একটা নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ প্রদান করিতে সমর্থ না হয় তবে উহা যতই যুক্তিতর্ক সম্মত হউক না, প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে পারে

না। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি সূর্য্যোদয় বা আপ্ত বাক্য দ্বারা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেও যেমন তাঁহার একটা মানসিক অশান্তি থাকিয়াই যায় উহাও তদ্রূপ।

বর্ত্তমানের আলোচনাকারিগণ আলোচ্য বিষয়ে কতকগুলি মতামত নিদ্ধারণ করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু পূর্ব্বকালে বিচারকগণ যুক্তি তর্ককে বর্ত্তমানের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন বলিয়া মনে হয় না। আত্মতৃপ্তিই যেন তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল ছিল। মায়াবাদের প্রবর্ত্তক এবং উহার কালাদি নিরূপণ করিয়া দর্শন আলোচনার কি ফল যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। ঐতিহাসিকের পক্ষে উহার একটা মূল্য আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে উহা কি একটা বিকট বিড়ম্বনা নয়? বস্তুতঃ আলোচ্য বিষয়কে যুক্তিতর্কের সুদৃঢ় নিগড়ে যতই দৃঢ় সম্বদ্ধ কর না কেন সন্দেহ দানব অলক্ষিতে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেই। যত বড় উর্ব্বর মস্তিষ্কই হউক না কেন উহার সুশৃঙ্খল যুক্তি তর্কেরও একটা সীমা আছে। কতকদূর অগ্রসর হইলে সমস্ত যুক্তি তর্কই পরাহত হইয়া পড়ে। যুক্তির পর যুক্তি যোজনা করিতে করিতে এমন একস্থানে পৌছাইতে হয় যাহার পর যুক্তির প্রসার একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। সে স্থলে কেবল অনুভূতিরই একাধিপত্য। আর ঐ অনুভূতি ভিন্ন প্রকৃত তথ্য চিরকালই অজ্ঞাত রহিয়া যায়। এবং সেই অজ্ঞতা জনিত একটা অস্বস্তি দুঃসহ হইয়া পড়ে। তাই যাহারা প্রকৃত তত্ত্বোপলব্ধি করিয়া শান্তি লাভে অভিলাষী হন তাহারা যুক্তি তর্ককে ততটা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতে পারেন না।

উপনিষদে দেখিতে পাই ইন্দ্র আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত বহু বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবশেষে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা একদিনেই তাঁহার সম্মুখে সমগ্র বিষয়টী উপস্থাপিত করেন নাই। তাঁহার মানসিক অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আজকাল আমরা একদিনেই তত্ত্বজ্ঞ হইয়া উঠি। এবং অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিয়াই বেদান্তের দুরূহ

জটিল সমস্যাগুলি তাহাদিগের নিকট উপস্থাপিত করি। ফলে গুরু শিষ্যের বড় একটা বৈষম্য থাকে না। "অন্ধেনৈব নীয়মানো যথান্ধঃ"। সংস্কৃত শাস্ত্রে কোন একটী বিষয় অবতারণা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথমে অধিকারী নির্ণয় করেন। বর্ত্তমানে উহা আমরা একেবারেই উপেক্ষা করি। এই বেদান্ত বিচারের অধিকারী প্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন প্রমাতাই প্রকৃত বেদান্ত বিচারে অধিকারী। বর্ত্তমানে উহা আমরা একটা কথার কথা বলিয়া উড়াইয়া দেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যিনি আপনাকে যতই জ্ঞানী বলিয়া মনে করুন না কেন উক্ত সাধন সম্পন্ন না হইলে তিনি কিছুতেই বেদান্তের সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারেন কিন্তু তত্ত্বদর্শী হইতে পারিবেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর একটা লক্ষণ এই যে তিনি বিষয়টী অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, শ্রোতৃবর্গের নিকট মহা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি একবার অন্তর্দৃষ্টি করেন তবে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন তিনি কত বড় আত্মপ্রবঞ্চক। পক্ষান্তরে তত্ত্বদর্শী বাগ্ বিন্যাসে পটু নহেন। তিনি আপনাতে আপনি ভুলিয়া প্রকৃত রসাস্বাদনে মত্ত থাকেন। বস্তুতঃ মানবের যাহা চরম সত্য তাহা বাক্যে প্রকাশ্য নহে, পরন্তু উপলব্ধব্য। মহাত্মা বাষ্কলি* যখন বাদ্ধের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন তখন বাদ্ধ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও যখন তিনি কোন কথাই বলিলেন না তখন বাষ্কলি একান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাদ্ধ বলিলেন, "আমি ব্রহ্ম পদার্থ সম্যক্ ব্যক্ত করিলাম, কিন্তু তুমি বুঝিলে না। তিনি 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্'।—'বাক্য ও মনের অতীত'। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, 'নুণের পুতুল সমুদ্র মাপিতে যাইয়া নিজেকেই হারাইয়া ফেলিল, সমুদ্রের খবর আর দিবে কে?' বাস্তবিক চরমসত্য বাক্যদ্বারা প্রকাশ্য নহে। বর্ত্তমানে কিন্তু বাক্যই উহার একমাত্র প্রকাশক।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সাধন চতুষ্টয়কে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পক্ষে একান্ত অনুকূল এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে অনেকের

নিকট তাহা একটা মস্ত রকমের বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইতে না পারিলে তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট প্রকৃত সত্য কিছুতেই পরিস্ফুট হইবে না। এক্ষণে আমরা ঐ সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধন ষট্‌ক এবং মুমুক্ষুত্ব—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। প্রথমতঃ, নিত্য (Eternal, Permanent) ও অনিত্য (Transitory) বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে হইবে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিভেদ জানা হইলে প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানই লাভ হইল, সাধনান্তরের প্রয়োজন কি? কিন্তু এস্থলে অভিপ্রায় এই যে সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকটী বস্তুই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলতা এত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হইতেছে যে সাধারণ মানুষ তাহা ধরিতে পারে না। এক খণ্ড কাষ্ঠ ফলকের অগ্রভাগে একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রাখিয়া তাহাকে বেগে ঘুরাইলে যেমন একটী অখণ্ড অগ্নিরেখাই প্রতিভাত হয়, অন্তরালগুলি যেরূপ চক্ষে পড়ে না; বায়স্কোপের ছবিগুলি যেরূপ একটীর পর একটী আসিয়া একটা অখণ্ড অঙ্গ চালনার জ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু খোলা চোখে ঐ পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না, মনে হয় যেন জগৎ একটা স্থির পদার্থ। এই ভ্রান্ত স্থিরতার উপর নির্ভর করিয়া, অথবা এই নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীলতা লক্ষ্য করিতে না পারিয়াই মানুষ ঐহিক সুখে আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় জগতের কিছুই নিত্য চিরস্থায়ী নয়—যে গগনভেদী পাষাণস্তূপ কালের কঠোর পীড়ন সহ্য করিয়া ধীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও একদিন সমুদ্রের অতল তলে বিলীন হইয়া যায়—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য। দৈনন্দিন জীবনেও একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে কিছুই স্থির নয় পরন্তু অস্থির, চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী। পার্থিব বস্তুর এই—অনিত্যতা যাহার আপাততঃ হৃদয়ঙ্গম

হইয়াছে যাহার মনে সময়ে সময়ে এই অনিত্যতা উকি ঝুঁকি মারিয়া এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের অন্তরালে একটা নিত্য বস্তুর অস্তিত্বের বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছে, সেই ব্যক্তিই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকসম্পন্ন।

পার্থিব সামগ্রীর এই—অনিত্যতার উপলব্ধি যখন প্রকটাকার ধারণ করে সাধকের প্রাণ তখন সেই নিত্য বস্তুর জন্য আকুল হইয়া উঠে; ইহ-লৌকিক পদার্থের উপর তাহার একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়; এই নিত্য বিবর্ত্তনশীল জাগতিক বস্তুর জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা কমিয়া যায়; ক্রমে পার-লৌকিক স্বর্গাদি সুখ-ভোগের প্রতি ও তাঁহার একটা বিরাগ উপস্থিত হয়। সাধক তখন বুঝিতে পারেন কার্য্য (effect) কারণের অনুরূপই হয়। অনিত্য যাহার সাধন তাহা নিত্য হইতে পারে না। অনিত্য হইতে নিত্যের উৎপত্তি অসম্ভব। পারলৌকিক সুখ-ভোগের মূলে পার্থিব যজ্ঞাদি সাধন অতএব স্বর্গাদি সুখ ভোগও অনিত্য। সেই জন্য সাধকের তখন ঐহিক ও পারলৌকিক যাবতীয় বস্তুর উপর একটা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

বৈরাগ্যের প্রধান সুফল শম বা শান্তি। আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় তাড়নায় মানুষ যে নিরন্তর ছুটাছুটি করিয়া অহরহঃ অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছে, সেই দুরাশা পিশাচীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া সাধক তখন শান্ত হইয়া যায়। বাসনার উত্তাল তরঙ্গান্দোলিত মানস সমুদ্রে বৈরাগ্য তৈলধারা—দুর্দ্দম, অশিক্ষিত মানসাশ্বের বৈরাগ্য কশা।

সেই বৈরাগ্যের প্রভাবে মন যখন শান্তভাব ধারণ করে তখনই সে দমিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বন্যঅশ্ব যখন শিক্ষার ফলে শান্তভাব ধারণ করে তখনই তাহাকে দমিত (trained) বলা হয়। সেই দমিত অশ্বই শকটাদি বহনের যোগ্য। সেইরূপ বৈরাগ্যের কশাঘাতে শান্ত মনই দমিত বা যোগ্য। কিসের যোগ্য ?—

—উপরতির। বিষয় বিলাস দূরীভূত হইয়া যখন মন শান্ত—হইয়া গেল তখনই সাধক উপরম বা সন্ন্যাসের যোগ্য হন। বিষয় হইতে উপরত বা বিরত হওয়াই উপরতি।

বিষয় বিরত ব্যক্তির বিষয়ের আগমে বা বিগমে সুখ বা দুঃখ

অনুভূত না হওয়াই স্বাভাবিক। তখন তিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"। সংসারের কোন দুঃখ কষ্টই তখন আর তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে পারে না। ইহাই তিতিক্ষা।

তৎপরেই শ্রদ্ধা। গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। এস্থলে গুরু ও শাস্ত্র কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। আমরা বারান্তরে তাহার উত্তর দিতে প্রয়াস পাইব। আমি যে বিষয়টীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করি তাহার প্রতি যদি আমার একটা অন্তরের টান না থাকে, একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা না থাকে তবে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে না। গুরুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কোন সাধন মার্গে অগ্রসর হইলে নিন্দা স্তুতি অনেক সহ্য করিতে হয়। তিতিক্ষা হীন হইলে গুরুর বাক্যে আস্তিক্য বুদ্ধির ব্যাঘাত হওয়া অনিবার্য্য।

সাধক যখন গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে অচল অটল বিশ্বাস সম্পন্ন হন তখন তিনি সেই বিষয়ে চিত্ত সমাধান করেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তাস্রোত ঐ একদিকেই প্রবাহিত হয়।

ইহাই হইল সাধন ষট্‌ক। তারপর মুমুক্ষুত্ব। মোক্ষের বা মুক্তির ইচ্ছাই মুমুক্ষা। বদ্ধ ব্যক্তিরই মুক্তি হয়, যাহার আপনাকে বদ্ধ বলিয়া জ্ঞান আছে তাহারই মুক্তি বা মোক্ষের ইচ্ছা সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত সাধন ত্রয় সম্পন্ন ব্যক্তিই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তিনি দেখেন, চতুর্দ্দিকে অনন্ত ভোগ বিলাস। আকাঙ্ক্ষার সুবিস্তৃত মায়াজাল, আসক্তির দুর্ভেদ্য প্রাচীর। যখনই মন এই অনন্ত আবিলতার মাঝখান হইতে আপনাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া মুক্ত বাতাসে বিচরণ করিতে চায়, তখন চারিদিক হইতে বাসনার সহস্র লেলিহান জিহ্বা তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠে বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সংসারের আবর্জ্জনা-রাশির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, বন্ধন আরও কমিয়া যায়। সংসারে বন্ধনটা যে কি তাহা যিনি সাধনমার্গে একটু অগ্রসর হইয়াছেন তিনি বেশ বুঝিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বিষয়াসক্তিই বন্ধন। যে সাধক

বিষয়কে তীব্র হলাহলবৎ মনে করিতে শিখিয়াছেন তিনি বিষয়পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছুক হইবেনই। সুতরাং মুমুক্ষুত্ব পূর্ব্বোক্ত সাধনত্রয়সম্পন্ন ব্যক্তির প্রাণে স্বতঃই জাগিয়া উঠে।

এক্ষণে এই মোক্ষলাভের উপায় কি? পূর্ব্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে যে বিষয়ের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেওয়াই (indentify) করাই প্রকৃত বন্ধন। আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই বন্ধন। সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করাই মোক্ষ। এই মোক্ষ বা আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হিন্দুশাস্ত্রের মতে সদ্‌গুরুর স্মরণ। গুরুকৃপালব্ধ শিষ্য স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই শাস্ত্রালোচনা করিবেন ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, ঋষিদের অভিপ্রায়। আমাদের মনে হয় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই প্রাচীন যুগে শাস্ত্র গ্রন্থ লিখিত হইত। বর্ত্তমানে শাস্ত্রালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি (যদিও প্রায় সব ক্ষেত্রেই আগাছার জন্ম), রসনা ও হস্তের কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি এবং যশোলিপ্সা। ফল—

ষড়্‌দর্শন মহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানন্তি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥

দুর্ব্বার গর্ব্ব।

(শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়)

অঙ্গ মলিন ধূলিতে মোর
মাটীর সঙ্গে মিলে।
তাইতে কিগো যাওগো চলে
চরণতলে দলে॥
"মানুষ তুমি," দীনের কদর
বুঝবে কেমন কোরে।
"দেবতা যিনি," রাখেন আমায়
আদর কোরে শিরে॥

বিবেকানন্দ।

(শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার তত্ত্বনিধি, বি, এল্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগবান বুদ্ধদেব বেদান্ত নিহিত নিত্য সত্যের উপর আপনার ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেও, তিনি পশু হননাদি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড মুক্তি বিরোধী ও ভোগমূলক বলিয়া উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন। এইজন্য তত্ত্বতঃ হিন্দুধর্ম্মের সহিত তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র পার্থক্য না থাকিলেও হিন্দুগণ তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধের মহত্বে সমগ্র হিন্দুসমাজ মুগ্ধ, তাঁহার প্রেমে বৌদ্ধ-হিন্দুগণ সমভাবে আকৃষ্ট। তিনি হিন্দুসমাজে বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে সর্ব্বজন সম্মতিক্রমে গৃহিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দুর পরম উপাস্য বিষ্ণুর সহিত তাঁহার একত্ব স্বীকার করিয়াও হিন্দুগণ তৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে হৃদয়ে স্থান দান করিতে পারেন নাই।

হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে লইয়া কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা নিম্ন-লিখিত কল্কিপুরাণের উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখান যাইতেছে।

পুনরিহ বিধিকৃত বেদধর্ম্মানুষ্ঠান-বিহিত-নানাদর্শন সংঘৃণঃ সংসার কর্ম্ম ত্যাগ বিধিনা ব্রহ্মাভাসবিলাস চাতুরীং প্রকৃতি বিমান নাম সম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতারস্তমসি।

অধুনা কলিকুলনাশাবতারো বৌদ্ধ পাষণ্ড ম্লেচ্ছাদিণাঞ্চ বেদধর্ম্মসেতু পরিপালনায় কৃতাবতারঃ কল্কিরূপেণাস্মান্ স্ত্রীত্বনিররাদুদ্ধৃতবানসি তবানু-কম্পাৎ কিমিহ কথয়ামঃ॥

পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃবিহিত বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে নানাপ্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই।

এক্ষণে আপনি কলিকুল ধ্বংসের নিমিত্ত এবং বৌদ্ধ পাষণ্ড ম্লেচ্ছ প্রভৃতির শাসনের জন্য কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিক ধর্ম্মরূপ সেতু রক্ষা করিতেছেন।

অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন, কল্কিপুরাণকারীর দশা দেখিলেন, দেখিলেন, কি কুসংস্কার ও অনুদারতার পূর্ণ পরিচয়? লেখক একবার বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলিতেছেন আবার পরক্ষণেই বুদ্ধভক্ত-বৌদ্ধ বিনাশক কল্কিরূপে সেই বুদ্ধ দেব অথবা ভগবানকে স্তুতি করিতেছেন।

এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় হয় নাই। সেই হেতু বলিয়াছি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারক, রামকৃষ্ণ যদি বিভিন্ন ধর্ম্মে বিদ্যমান দোষসমূহ প্রকাশিত করিতেন তবে সমন্বয় নিরোধে পরিণত হইত। তাঁহাকে এই সমন্বয় কার্য্যের জন্য যে যে পন্থা ও যে যে অবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে সেই সেই পন্থা ও অবস্থার অবলম্বন তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের অন্তরায়রূপে কার্য্য করিয়াছে। এই জন্য তাঁহার সাধক ভাবাদির আলোচনা করিয়া লোকে তাঁহাকে একজন অসামান্য ভক্ত বলিয়াই মনে করে। অনেক লোকে বুঝিতে পারে না তাঁহার নানাবিধ ভাব সাধনাদি সিদ্ধির জন্য নহে, আপনার নিজের জন্য নহে, লোকশিক্ষার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুকাল সাধনা করিয়া মহাপুরুষদিগেরও যে অবস্থা লাভ করা সুকঠিন, বিনা সাধনায় অতি সাধারণ অবস্থায় এবং বাল্যকালে তিনি সেই অবস্থা উপলব্ধি করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের ন্যায় অনন্যমুখী কৃষ্ণপ্রেমের স্রোতে ভাসিয়া জগতকে মুগ্ধ করেন নাই। মানুষ শ্রীচৈতন্যের অভ্যন্তরে প্রেমের যে অদ্ভুত ও অলৌকিক স্ফুরণ অনুভব করিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যন্তরে সেইরূপ প্রেমের বিকাশ অনুভব করে নাই। যদি তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমলীলার ন্যায় লীলায় মগ্ন থাকিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিতে হইত তবে আর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ভাবের পূর্ণাভিব্যক্তি সম্ভব হইত না। বৈজ্ঞানিক যুগে শাস্ত্রীয়যুগের ন্যায় কেবল মাত্র ভাব প্রবণতা দ্বারা অপ্রস্তুত হৃদয় মানবমণ্ডলীকে মুগ্ধ করা কখনই সম্ভব নহে। মানুষের জাগতিক প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সহিত

মহাপুরুষ বিশেষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলে অথবা সামঞ্জস্য আছে তাহা না বুঝিলে কখনই তাহা সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। এই সকল কারণে তিনি যে মহাসত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র তাহাই প্রচার করিলে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা শত গুণে অধিক হইতে পারিত কিন্তু তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। বর্ত্তমানকালে এই ভারতবর্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানবসকল যে ভাবে একত্রিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্য্যের সময়ে সেইরূপ মহামানবের সম্মিলন ভারতভূমিতে সংঘটন হয় নাই। এই বিশ্বমানবের সম্মিলন জন্য বর্ত্তমান যুগ অভ্রান্ত সত্য প্রচার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ব্যতীত সকল ধর্ম্মমতের লোকের সম্মুখে সত্যপ্রচারের চেষ্টা করিলে প্রচারিত সত্য হয়ত সম্প্রদায় বিশেষের মতের প্রতিকূল হওয়ায় আরব দেশের ন্যায় প্রেমবন্যা প্রবাহের উপলক্ষ্য করিয়া রক্তবন্যা প্রবাহিত হইবার কারণরূপে পরিণত হইত। বিশ্বমানবের হৃদয়ে সত্য গ্রহণোপযোগী সাম্যভাব, উদারতা ও জিজ্ঞাসুভাবের বীজবপন করাই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। মানব হৃদয়রূপ অসমতল ক্ষেত্রসমূহ যেন সমন্বয়রূপ যন্ত্রের সাহায্যে সমতল ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিয়া গঠিত করা হইয়াছে। যে মানদণ্ডের দ্বারা মানুষ বুদ্ধ, চৈতন্য ও শঙ্করাচার্য্যকে মাপিয়া থাকে রামকৃষ্ণের পরিমাণের জন্য সেই মানদণ্ড প্রযুক্ত হইলে রামকৃষ্ণের স্বরূপ ও মহিমা বোধ করা কখনই সম্ভব হইবে না, এবং এই জন্যই বুদ্ধ, চৈতন্য অথবা শঙ্করাচার্য্যকে মানুষে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও হৃদয়ের যে স্থানে উহাঁদিগকে আসন দান করিয়াছে রামকৃষ্ণকে সেস্থানে আসন দান করিতে পারে নাই। যাঁহারা এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কারকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তাঁহারাই রামকৃষ্ণ হৃদয়ের বিশ্বব্যাপী প্রসারতা দেখিয়া মুগ্ধ ও তৎ পদাশ্রিত হইয়াছেন।

তাঁহার মাতৃভাবের উপাসনাবলম্বনও মানব হৃদয় প্রস্তুত কার্য্যের প্রধানতম সহায়। দেশে মাতৃভাবের অথবা কামহীন ভাবের একান্ত

অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। মাতৃভাবের ভিতর দিয়া অগ্রসর না হইলে কথনই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই জন্যেই বিশ্ব-মানবকে প্রেমরস আস্বাদন করাইতে হইলে এবং মানবের অপূর্ণতা দূর করিয়া উপযুক্ত করিয়া গঠন করিতে হইলে সমগ্র মানব সমাজে যে ভাবের অভাব সেই মহাভাবকে জগতে আবির্ভূত করান একান্ত আবশ্যক। এইজন্যই বিশ্বমানব জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ রামকৃষ্ণের জীবনের অভ্যন্তর দিয়া মাতৃভাবরূপ মহাভাব জগতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের সর্ব্বপ্রধান অপূর্ণতা ও অভাব দূর করিয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনাসমূহ হইতে বুঝা যাইতেছে রামকৃষ্ণ লীলা অপূর্ণ; কারণ রামকৃষ্ণ লীলায় বিশ্বমানবের হৃদয় সত্য গ্রহণোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইলেও সত্য প্রচার কার্য্য সম্যক্‌রূপে সংসাধিত হয় নাই। আমরা দেখাইয়াছি প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দোষ উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মাত্র মূল সত্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার জীবনে সম্ভব ছিল না। ইহা সম্ভব করিতে হইলেও তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের বিরোধী হইয়া পড়িত।

তিনি বলিয়া গিয়াছেন "আবার আমাকে জন্মাতে হবে জানি কি না, জন্মাবার উপযুক্ত এক আধটা বাসনা রেখে দিয়েছি"। এই বাক্য হইতেও আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার মহালীলার আংশিক অভিনয় শেষ হইলেও পূর্ণ অভিনয় সম্মুখে। এই সকল কারণে তাঁহার লীলাকে আমরা গুপ্তলীলা বা অপ্রকাশ লীলা নাম দিতে পারি। তাঁহার অতীতলীলা প্রকটলীলা হইলে অনুপযুক্ত ও অপ্রস্তুত মানব হৃদয় উহার মাধুর্য্য ও মহিমা কথনই উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাঁহার অতীত লীলা প্রকট হইলে উহা উষর ক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায়, "উলুবনে মুক্তা ছড়ানর মত" সম্পূর্ণ বিফল হইত। তিনি তাঁহার সত্যস্বরূপ বা বিশেষত্ব উপলব্ধি করাইতে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন মানব মণ্ডলীতে সাম্যভাব ও উদারতা প্রচারের জন্য একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তাঁহার এই সকল কার্য্য হইতে ও ভাব হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে

কোন্ অংশ অভিনয় করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা জানিতে পারি শুদ্ধ চৈতন্য, মহাপ্রেম অথবা পূর্ণতম আনন্দকে স্থূল জগতে আকর্ষণ করিবার সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যেমন অদ্বৈত মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্যকে স্থূল জগতে আনয়ন করিয়াছিলেন তেমনই বিশ্বের মহামোক্ষ-দাতৃ শক্তিকে এই স্থূল জগতে আকর্ষণ করা ও তদুপযোগী করিয়া জগতকে প্রস্তুত করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র করণীয়। রামকৃষ্ণ-জীবনের সুবিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন এই যে মস্তক ও হৃদয়ে যে সম্বন্ধ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দে সেই সম্বন্ধ। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক তনয়। রামকৃষ্ণ ব্যতীত বিবেকানন্দ অথবা বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণের জীবনের আলোচনা অপূর্ণ প্রসঙ্গ।

রামকৃষ্ণের ভিতরে যাহা ভাব-রূপে বর্ত্তমান বিবেকানন্দের ভিতরে তাহা কার্য্যরূপে প্রকাশিত। আমরা বিবেকানন্দ কর্তৃক জীবনের যে অভিনয় আদর্শ দেখিতে পাই তাহার মূল প্রস্রবণ রামকৃষ্ণ। বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য, জগতের মুক্তিকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও জীবের জন্য ঐ আদর্শ প্রচার করেন নাই, অথবা প্রচার করিলেও বিবেকানন্দের ন্যায় পরিস্ফুট ভাবে প্রচার করেন নাই। জগতের সকল জীবের মুক্তিতে আমার মুক্তি, সকলের মুক্তি প্রত্যেকের মুক্তি। ব্যক্তিগত মুক্তি অথবা ব্যক্তিগত ভাবে ভগবানের প্রেম লাভ অতি ক্ষুদ্র আদর্শ; এই সত্য ও এই ভাব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট করান। তাই বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন আপনার মঙ্গল, আপনার কল্যাণ বা আপনার মুক্তি আমরা সম্পূর্ণ-ভাবে বিস্মৃত হইয়া জগতের কল্যাণ ও জগতের মুক্তি আমাদের লক্ষ্য—ইহাই প্রত্যেকের আদর্শ হওয়া উচিত।

শঙ্কর প্রচারিত অদ্বৈত-বাদ ব্যক্তিগত মোক্ষকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, অদ্বৈতবাদিগণ জগতে সত্য প্রচার কার্য্যকে জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বরং উহাতে জগতের উপর আকর্ষণ আসিতে পারে বলিয়া উহা হইতে দূরে থাকিবারই উপদেশ দিয়াছেন; জগতে সত্য প্রচার জগতকে মায়া জ্ঞান করায়

বিরোধী বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত-বাদের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সত্য হইলেও জগত সত্য বিরোধী নহে। জগত ক্ষুদ্রতর সত্য। শঙ্কর প্রচারিত মায়াবাদ শঙ্কর পথাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের হস্তে পতিত হইয়া জাগতিক কার্য্যের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের যে বিরোধ উৎপাদন করিয়াছিল, বিবেকানন্দ প্রচারিত অদ্বৈতবাদ সেই বিরোধ-খণ্ডন করিয়া জাগতিক কার্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এবং নিজের জীবনেও উহার দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ জীবনে বিশ্বের সহিত একত্ব অনুভূত হইয়াছিল। আর এই অনুভূতির অভিব্যক্তি বিবেকানন্দ প্রচারিত অভিনব বিশ্ব প্রেমোৎপাদক অদ্বৈতবাদ। রামকৃষ্ণ জীবনে যে ভাব বিশ্ব-মাতার প্রতি ভক্তিরূপে বর্ত্তমান বিকানন্দের ভিতর সেই ভাব বিশ্ব-মাতার বহু মূর্ত্তির বা বহু সন্তানের বিশেষতঃ অক্ষম দরিদ্র ও অন্ধ-রূপ বিশ্ব বা বিশ্ব সন্তানের পূজায় পর্য্যবসিত। রামকৃষ্ণের অভ্যন্তরে যে ভাব অমূর্ত্তরূপে বর্ত্তমান বিবেকানন্দে সেই ভাব মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে, এক চৈতন্য শক্তি যেন কার্য্যের সুবিধার জন্য এক দেহের পরিবর্ত্তে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ রূপ যুগল দেহের ভিতর দিয়া যুগপৎ কার্য্যকরী—হইয়াছে। রামকৃষ্ণের যে অবস্থা তাহা বেদান্তের লক্ষ্য, বেদান্তের প্রাণ, বেদান্তের উপাস্য। আর বিবেকানন্দ সেই অবস্থার প্রচারক, উপাসক, স্থূল মূর্ত্তি। রামকৃষ্ণ উপাস্য দেবতা, আর ঐ উপাসনার মন্ত্র বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণ জগতে অবতরণ অথবা চৈতন্য ধামে অবস্থিতি সম্ভব নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। রামকৃষ্ণে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ-প্রেমের যেরূপ একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই, বিবেকানন্দে সেইরূপ অদ্বৈতবাদ-নিরূপিত সোঽহং জ্ঞানের সহিত ভক্ত-সুলভ সেবাধর্ম্মের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রচারক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিহিত শক্তি বর্ত্তমান লীলা ব্যাখ্যার নিমিত্ত পুনর্ব্বার জগতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক ভাব দূরীভূত করিয়া রূপক সত্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ও কুসংস্কার

বিজড়িত সত্য সমূহের প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া জগতে মহা-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর মহামিলন সম্ভব করিবেন। কল্পান্তরে ভগবান যেমন বেদ উদ্ধার করেন তেমনই কুসংস্কাররূপ জলে নিমগ্ন, দুর্ব্যাখ্যা ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকরূপ কর্দ্দমে বিজড়িত বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ-শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন অথবা উদ্ধার করিবেন। অনুভূতির অভাবে তন্ত্র, পুরাণ স্মৃতি ও বেদ নিহিত সত্য সকল জীবন হীন হইয়াছে। বিশেষতঃ অনুভূতিহীন পণ্ডিতগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া ঐ জীবনহীন শাস্ত্রদেহ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভানুরশ্মির আভাব যেমন পচন ক্রিয়ার সহায়ক, তত্ত্ব জ্ঞানরূপ ভানুরশ্মির অভাবও তেমনি শাস্ত্র দেহ পচনের সহায়ক, শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্য বিস্মৃত হইয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত শাস্ত্র নিহিত সত্যের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে না পারিয়া অনুভূতি হীন পণ্ডিতগণ বন্ধনমোচক শাস্ত্র সাহায্যে মুক্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং উদ্দেশ্য বিহীন আচার ব্যাবহারাদি বাহ্য শৃখল দ্বারা নিজেরাও শৃঙ্খলিত হইয়াছেন। এবং সমাজকেও শৃঙ্খলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দেখিতে পাই ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিগ্রহের সম্মুখে পুষ্প ও বিল্বপত্র নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু প্রত্যেক সাধকের ছয় মাসের চেষ্টার ফলে যে সকল প্রাথমিক অনুভূতি হইয়া থাকে সেই প্রাথমিক অনুভূতি পর্য্যন্তও লাভ করিতে সমর্থ হন না। শাস্ত্রের বাহ্য ক্রিয়াকলাপে একান্ত আসক্ত এবং অভ্যান্তরীণ সাধন পদ্ধতিতে উদাসীন শাস্ত্রজ্ঞগণের এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন জড়জগতে আসক্ত ব্যক্তি-গণের উদ্ধারের জন্য সকলে আবার কাতরভাবে এস আমরা প্রার্থনা করি যেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিহিত শক্তি, বৈদিক পশু হননাদি ক্রিয়াকাণ্ডে বিধ্বস্ত মানবের উদ্ধারক শ্রীবুদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশক শ্রীশঙ্কর ও স্মৃতিশাস্ত্র শৃঙ্খলিত মানবের উদ্ধারক প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য নিহিত শক্তির সহিত সমবেত হইয়া বিশ্বমানবের মহামিলনের যুগে জগতে মহাউদ্ধার সংসাধিত করুন।

(ঘ) (বিবেকানন্দের পরিচয় "আধ্যাত্মিকভাবে")

আমরা অবগত আছি রামকৃষ্ণদেব সমাধিমগ্ন বিবেকানন্দকে জগতের কার্য্যের জন্য, জগতের উদ্ধারের জন্য এ স্থূল জগতে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের অবতার। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য জগতের যে স্তর হইতে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি তদপেক্ষা নিম্নতর স্তর হইতে অবতীর্ণ হন নাই। আজকাল কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অবতার বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। অনেকেই বিবেকানন্দকে শঙ্করাচার্য্যের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন এবং এই বর্ণনা দ্বারা বিবেকানন্দের অ-শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু এ প্রচেষ্টা বৃথা। আমরা বিবেকানন্দকে শঙ্করাচার্য্যের অবতার বলিয়া মনে না করিলেও ইহা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি যে শঙ্করাচার্য্যের আসন হইতে বিবেকানন্দের আসন কোন অংশে হীন নহে। এবং বিবেকানন্দের আসন শঙ্করের আসন অপেক্ষা উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, একথা বলিতে গেলে বহু শতাব্দীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং অগণ্য সেবকমণ্ডলীর দ্বারা সেবিত শঙ্করাচার্য্যের মহিমাহানীর আশঙ্কায় তাহা বলিতে সাহস করি না। বিবেকানন্দের প্রেমসিক্ত অদ্বৈতবাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রচারকের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই। যদি অদ্বৈতবাদকে মহানির্ব্বাণবাদ বা শূন্যবাদের সহিত অভিন্নরূপে স্বীকার করা যায় তবে বুদ্ধ প্রচারিত প্রেমসিক্ত মহানির্ব্বাণতত্ত্বের সহিত মাত্র বিবেকানন্দ প্রচারিত অদ্বৈতবাদ উপমিত হইতে পারে। আমরা বিচারকালে শঙ্করাচার্য্যে যে কঠোরভাব দেখিতে পাই, বিবেকানন্দে সে কঠোরতা দৃষ্ট হয় না। অথচ বিবেকানন্দ ও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিচার দ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে শঙ্করাচার্য্য যে যুগে আসিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের আবির্ভাবের যুগ এই উভয়ের তুলনা করিলে উভয়কেই যুগোপযোগী প্রচারকরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। বিবেকানন্দের যুগ শঙ্করাচার্য্যের যুগ অপেক্ষাও হীন স্তরের। বিবেকানন্দের যুগে মানবগণ যে ভাবে জড়োপাসনায় আসক্ত তাহাতে ঐ সকল

মানুষকে চৈতন্যোপাসনায় নিযুক্তকরণ কার্য্য শঙ্করাচার্য্যের করণীয় কার্য্য অপেক্ষাও কঠিনতর কর্ম্ম। পাণ্ডিত্যের বা খ্যাতির সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ইউরোপীয় হিগেল, ক্যাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বালকবৎ হইলেও পাণ্ডিত্যহিসাবে জগতে অপরিসীম খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। একাধারে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশ শঙ্করাচার্য্যে যেরূপ দেখিতে পাই এরূপ কদাচিৎ কোনও যুগে পৃথিবীর কোন দেশে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। হিন্দুর বেদ বেদান্তাদি অখিল শাস্ত্র শঙ্করাচার্য্যের কণ্ঠস্থ ছিল। হিন্দু-শাস্ত্রজ্ঞান হিসাবে অথবা পাণ্ডিত্য হিসাবে শঙ্করাচার্য্যের স্থান বিবেকানন্দের অনেক উপরে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সংস্কৃত ভাষায় ও দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য শঙ্করাচার্য্যের যুগোপযোগী আর শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের যুগপৎ ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও মাতৃভাষায় অধিকার বিবেকানন্দের যুগোপযোগী। এইজন্য সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়ের পাণ্ডিত্য তুলনা করা কঠিন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিচার কৌশলাদি ও পাণ্ডিত্য হেতু শঙ্করের খ্যাতি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমরা বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দের যেরূপ আকর্ষণ দেখিতে পাই এবং উভয়ের ভিতরে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাই তাহাতে শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বুদ্ধের সহিতই বিবেকানন্দের অধিক সৌসাদৃশ্য আছে এরূপ বলা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

"জানিনা সেই ঈশ্বর কেমন? ঐ যে মুল্লা চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন তাহার অর্থ কি? তোমার প্রভু কি বধির? হায়, অতি ক্ষুদ্র কীটের চরণেও যে নুপুর বাজে তাহাও তিনি শুনিতে পান্। মালাই ফিরাও, তিলকই লাগাও, লম্বা জটাই বাড়াও তোমার অন্তরে শাণিত খড়্গ;—এমন করিয়া ঈশ্বর মেলে না।"—কবীর।

অন্তর্দেবতা।

(স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ)

সত্য যেখানে মূর্ত্ত রয়েছে,—
আকুল বিভোর চিত্ত খান,
প্রেরণা তাঁহারি উদ্ভূত হয়,
জাগ্রত করে মোহিয়া প্রাণ।
নিত্য সেখানে দীপ্ত যখন,
ব্যথিত দলিত যে আছ যেথান,
শাশ্বত বাণী ডাকিছে তোদেরি,
খুলিয়া দুয়ার কর আহ্বান।
রিক্ত হস্তে আয় তোরা আয়,
ভৃত্য কি তোরা শঙ্কিত মন!
আপন জিনিষ লইবি আপনি,
তবে কেন এত বিচার জ্ঞান?
জ্ঞান ভক্তি, পুণ্য প্রেম,
প্রীতি শোভা ত্যাগ, অটুট বল,
তাঁহারি দেওয়া ফিরে নে'য়া তাঁর
সকলি তাঁর তাঁহারি সকল।
ভজন সাধন, শৌর্য্য বীর্য্য,
ধর্ম্ম কর্ম্ম, সিদ্ধি মহান্,
গরিমা তাঁর, বুদ্ধি ঋদ্ধি,—
অন্তরে চা' ব্যাকুল প্রাণ!
উদ্যত হও জাগ্রত হও,
বিশ্ব মানব শোনগো শোন!
উত্থিত হও, প্রাপ্তি তরে
পূর্ণ হও হে পাইয়া দান!

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো।
২৯শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয়—

সেদিন মহীশূর থেকে জি, জি-র এক পত্র পেলাম। দুঃখের বিষয়, জি, জি, আমাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে, তা না হলে সে চিঠির মাথায় তার অদ্ভুত কানাড়া ঠিকানাটা আর একটু পরিষ্কার করে লিখ্‌ত। তার পর চিকাগো ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আমাকে চিঠি পাঠান বড্ড ভুল। অবশ্য গোড়ায় আমারই ভুল হয়ে ছিল—আমারই আমাদের বন্ধুদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা ভাবা উচিত ছিল—তাঁরা ত আমার চিঠির মাথায় একটা ঠিকানা দেখ্‌লেই যেখানে খুসি আমার নামে চিঠি পাঠাচ্ছেন। আমাদের মান্দ্রাজ বৃহস্পতিদের বোলো, তারা ত বেশ ভাল করেই জান্‌তো যে, তাদের চিঠি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হয়ত আমি সেখান থেকে ১০০০ মাইল দূরে চলে গেছি, কারণ, আমি ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। চিকাগোয় আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়ী হচ্ছে আমার প্রধান আড্ডা। এখানে আমার কাযের প্রসারের আশা প্রায় শূন্য বল্লেই হয়। কারণ, যদিও উহার খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উহার আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়েছে—

(১) ভারতের খবর আমি যা কিছু পাচ্ছি, তা মান্দ্রাজের চিঠি থেকে। তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুনছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি কর্‌ছে—কিন্তু সে ত ঘরাও কথা হয়ে যাচ্ছে—তুমি জান্‌ছো আর আমি জান্‌ছি, কারণ, আলাসিঙ্গার প্রেরিত একটা তিন বর্গ ইঞ্চি কাগজের টুক্‌রো ছাড়া, আমি একখানাও ভারতীয় খবরের কাগজে আমার

সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে—তা দেখিনি। অন্যদিকে, ভারতের খ্রীষ্টিয়ানরা যা কিছু বল্‌ছে মিশনরিরা তা খুব যত্ন করে সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে প্রকাশ কর্‌ছে এং বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমায় ত্যাগ করেন, তার চেষ্টা কর্‌ছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভালরকমই সিদ্ধ হয়েছে, কারণ, ভারত থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বল্‌ছে না। ভারতের হিন্দু পত্রগুলি আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা কর্‌তে পারে, কিন্তু তার একটা কথাও আমেরিকায় পৌছায় নি। তজ্জন্য এদেশের অনেকে মনে কর্‌ছে, আমি একটা জুয়াচোর। একে ত মিশনরিরা আমার পিছু লেগেছে—তার উপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—এক্ষেত্রে তোমার একটা কথাও জবাব দেবার নেই। এখন মনে হচ্ছে, কেবল মান্দ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়ির জোরে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া আমার আহাম্মকি হয়েছিল, কারণ, তারা ত ছোকরা বই আর কিছুই নয়। অবশ্য আমি অনন্তকালের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু তারা ত গুটি কতক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কিছু নয়—কাযের ক্ষমতা তাদের যে একদম নেই। আমি কোন নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি আর যখন কারও অর্থসাহায্যের আবশ্যক হয়, তার নিদর্শন পত্র থাকার দরকার, তা না হলে মিশনরি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে আমি যে জুয়াচোর নই, তা কি করে প্রমাণ করব? আমি মনে করেছিলাম, গোটাকতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন কায হবে না। আমি মনে করেছিলাম, মান্দ্রাজে ও কল্‌কেতায় কতকগুলি ভদ্রলোক জড় করে এক একটা সভা করে আমাকে এবং আমেরিকাবাসিগণকে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার কর্‌বার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব পাস করিয়ে সেই প্রস্তাবটা দস্তুরমত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অর্থাৎ সেই সেই সভার সেক্রেটারিকে দিয়ে আমেরিকায় একখানা ডাঃ ব্যারোজের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে তথাকার বিভিন্ন কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করা,—ঐরূপ বোষ্টন, নিউইয়র্ক ও চিকাগোর বিভিন্ন কাগজে পাঠান বিশেষ কঠিন কায হবে না। এখন দেখ্‌ছি, ভারতের পক্ষে এই কাযটা বড়ই গুরুতর ও কঠিন—এক বছরের ভিতর ভারত থেকে কেউ আমার

জন্য একটা টুঁশব্দ পর্য্যন্ত করলে না—আর এখানে সকলেই আমার বিপক্ষে! তোমরা নিজেদের ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে যা খুসি বল না কেন, এখানে তার কে কি জানে? দুমাসেরও উপর হল আলাসিঙ্গাকে আমি এই বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। আমার আশঙ্কা হয়, তার উৎসাহ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সুতরাং তোমায় বল্‌ছি, আগে এই বিষয়টী বিবেচনা করে দেখো তার পর মান্দ্রাজীদের এই চিঠি দেখিও। এদিকে আমার গুরুভাইরা কেশব সেন সম্বন্ধে আহাম্মকের মত বিশেষ প্রমাণ না দিয়েই নানা কথা বল্‌ছে আর মান্দ্রাজীরা থিওজফিষ্টদের সম্বন্ধে আমি যা কিছু লিখ্‌ছি, তাই তাদের বল্‌ছে—এতে শুধু শত্রুর সৃষ্টি করা হচ্ছে। হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাযের লোক আমার সহায়তা কর্‌বার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—আমি এদেশে জুয়াচোর বলে গণ্য হলাম। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, কোন নিদর্শনপত্র না নিয়ে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া—আশা করেছিলাম, অনেক আস্‌বে। এখন দেখ্‌ছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কায করতে হবে। মোটের উপর, আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণ ভাল, আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনদের দেশ অপেক্ষা এখানে অনেক ভাল কায করতে পারি। যাইহক্, আমাকে কর্ম্ম করে আমার প্রারব্ধ ক্ষয় করতে হবে। আমার আর্থিক অবস্থার কথা যদি বলতে হয়, তবে বলি, আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই আছে এবং সচ্ছলই থাক্‌বে। সমগ্র আমেরিকায় বিগত আদমসুমারিতে থিওজফিষ্টদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৬২৫—তাদের সঙ্গে মিস্‌লে আমার সাহায্য হওয়া দূরে থাক্, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কায চুরমার হয়ে যাবে। আলাসিঙ্গা বল্‌ছে, লণ্ডনে গিয়ে মিঃ ওল্ডের সঙ্গে দেখা করতে ইত্যাদি ইত্যাদি। ও কি বাজে আহাম্মকের মত বক্‌ছে! বালক—ওরা কি বল্‌ছে, তা নিজেরাই বোঝে না। আর এই মান্দ্রাজী খোকার দল নিজেদের ভিতর একটা বিষয়ও গোপন রাখ্‌তে পারে না!! সারা দিন বাজে বকা আর যেই কাযের সময় এল, অমনি আর কাকেও কোথাও দেখ্‌বার যো নেই!!! বোকারামেরা পঞ্চাশটা লোক জড় করে কয়েকটা সভা করে আমার সাহায্যের জন্য গোটাকতক

ফাঁকা কথা পাঠাতে পার্‌লে না—তারা আবার সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দেবে বলে লম্বা লম্বা কথা কয়!

আমি তোমাকে ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে লিখেছি। এখানে এক রকম বৈদ্যুতিক পাখা আছে—দাম ত্রিশ ডলার—বড় সুন্দর চলে—উহার ব্যাটারিতে ১০০ ঘণ্টা কায হয়; তার পর যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে নিলেই হল।

বিদায়, হিন্দুদের যথেষ্ট দেখা গেল। এখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্—যা আসুক অবনত মস্তকে স্বীকার কর্‌ছি এবং আমার কর্ম্মকে প্রণাম কর্‌ছি—যাই হোক্ আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না, মান্দ্রাজীরা আমার জন্য যতটা করেছে, আমি ততটা পাবারও উপযুক্ত ছিলাম না, আর তাদের ক্ষমতায় যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী তারা করেছে। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল—ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেছলাম যে, আমরা হিন্দুরা এখনও মানুষ হইনি—ক্ষণ কালের জন্য আত্মনির্ভর হারিয়ে হিন্দুদের উপর নির্ভর করেছিলাম—তাইতেই এই কষ্ট পেলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ভারত থেকে কিছু আসবে আশা করছিলাম—কিন্তু কিছুই এলো না। বিশেষতঃ বিগত দুইমাস প্রতি মুহূর্ত্তে আমার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সীমা ছিল না—ভারত থেকে একখানা খবরের কাগজ পর্য্যন্ত এলো না!! আমার বন্ধুরা মাসের পর মাস অপেক্ষা কর্‌তে লাগলেন—কিছুই এলো না—একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত এলো না—কাজেই অনেকের উৎসাহ চলে গেল ও আমায় ত্যাগ কর্‌লে। কিন্তু ইহা আমার মানুষের উপর—পশুধর্ম্মীদের উপর নির্ভরের শাস্তি স্বরূপ—কারণ আমার স্বদেশবাসীরা এখনও মানুষ হয় নি। তারা নিজেদের প্রশংসাবাদ শুনতে খুব প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাদের একটা কথা মাত্র কয়ে সাহায্য কর্‌বার যখন সময় আসে তখন তাদের আর টিকি দেখ্‌তে পাবার যো নেই। মন্দ্রাজী যুবকগণকে আমার অনন্তকালের জন্য ধন্যবাদ—প্রভু তাদের সদাসর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করুন। কোন ভাব প্রচার করবার পক্ষে আমেরিকাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র—তাই আমি শীঘ্র আমেরিকা

ত্যাগ করবার কল্পনা করছি না—কেন?—এখানে খেতে পরতে পাচ্ছি—অনেকে সহৃদয় ব্যবহার করছেন—আর দু দশটা ভাল কথা কয়েই এই সব পাচ্ছি! এমন উন্নতমনা জাতকে ছেড়ে পশু প্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন অনন্ত যুগের কুসংস্কারে বদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন হতভাগাদের দেশে কি কর্ত্তে যাব? অতএব আবার বলি বিদায়। এই পত্রখানি একটু বিবেচনা করে লোককে দেখাতে পার। মান্দ্রাজীরা এমন কি আলাসিঙ্গা পর্য্যন্ত যার উপর আমি এতটা আশা করেছিলাম—বড় সুবিবেচনার কাজ করেছে বলে মনে হয় না। ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত খান কতক চিকাগোয়ে পাঠাতে পার?—কলকেতায় অনেক আছে। আমার ৫৪১নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ (ষ্ট্রীট নহে) চিকাগো অথবা কেয়ার টমাস কুক, চিকাগো, ঠিকানা যেন ভোলো না—অন্য কোন ঠিকানা দিলে অনেক দেরি ও গোলমাল হবে—কারণ আমি এখন ক্রমাগত ঘুরছি আর চিকাগোই আমার প্রধান আড্ডা—কিন্তু এই বুদ্ধিটুকুও আমাদের মান্দ্রাজী বন্ধুদের মাথায় ঢোকে নি। অনুগ্রহপূর্ব্বক জি, জি, আলাসিঙ্গা সেক্রেটারি ও আর আর সকলকে আমার অনন্তকালের জন্য আশীর্ব্বাদ জানাবে—আমি সর্ব্বদা তাঁদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তাদের উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নি—আমি নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি জীবনে এই একবার অপরের সাহায্যে নির্ভর করা রূপ ভয়ানক ভুল করেছি। আর তার শাস্তি ভোগও করেছি। এ আমারই দোষ, তাদের কিছু দোষ নাই। প্রভু মান্দ্রাজীদের আশীর্ব্বাদ করুন—তাদের হৃদয়টা বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক উন্নত। বাঙ্গালীদের কেবল বাক্য সার—তাদের হৃদয় নেই, তারা অসার। বিদায়, বিদায়, আমি এখন সমুদ্রবক্ষে আমার তরণী ভাসিয়েছি—যা হবার হোক। আমার কঠোর সমালোচনার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো। বাস্তবিক ত আমার কোন দাবি দাওয়া নাই। আমার যতটা পাবার অধিকার তোমরা তার চেয়ে অনন্তগুণ আমার জন্য কোরেছো। আমার যেরূপ কর্ম্ম, আমি তেমনি ফল পাব আর যা ঘটুক আমাকে চুপটী

করে মুখ বুজিয়ে সয়ে যেতে হবে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আমার বোধ হয় আলাসিঙ্গার কলেজ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আমি তার কোন খবর পাই নি আর সে আমাকে তার বাড়ীর ঠিকানাও দেয় নি।

ইতি—বি

আমার আশঙ্কা হচ্ছে—বুঝি পুনর্মূষিক হয়েছে।

বি

" বর্ষায় বাড়িয়া বনলতা,
উচ্চে উঠে দেবদারু বাহি' ;
'কত হ'ল বয়ঃক্রম তব ?'
জিজ্ঞাসে তরুর মুখ চাহি'।
তরু কহে 'বর্ষ দুই শত,—
মাস ছয় এদিক্ ওদিক্।'
লতা বলে 'এতে বৃদ্ধি এই !—
সপ্তাহে যা' হ'ল মোর ঠিক !'
তরু বলে 'বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ু ও বৃদ্ধির কথা হ'বে তার পরে।' "

—খুশ্‌হাল্

স্বপ্নভঙ্গ।

(প্রতিবাদ)

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার।)

গত বৈশাখ ও আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র দত্ত বি, এ, 'স্বপ্নভঙ্গ' শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের কিছু বলিবার ও বুঝিবার আছে তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা। তিনি যে বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা অতি গুরুতর বিষয়, এক কথায় মীমাংসা হইবার নয়। সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতেই বোধ হয়, ঐরূপ মতদ্বৈধ চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মাচলে উঠিবার পথ অসংখ্য এবং প্রত্যেক পথই মহাজনদিগের দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন যাঁহার পক্ষে যাহা ভাল বলিয়া বোধহয় তাহার পক্ষে তাহাই অবলম্বনীয়, অন্যথা তাহাতে প্রাণের টান থাকিবে না এবং প্রাণের টান না থাকিলে তাহা বিফল প্রয়াসে পর্য্যবসিত হইবে। আরও এককথা—যদি কেহ ধর্ম্মভ্রমে অধর্ম্মের পথে চলিতে থাকে, তাহাতেই তাহার প্রাণের টান থাকে; কেউ কি তীব্র কশাঘাত দ্বারা তাহার সে পথ চলা বন্ধ করিতে পারে? কখনই না। যদি কাহাকেও সৎপথে আনিতে হয় মৃত্যু হইতে জীবনের দিকে চালাইতে হয়,—তবে পথপ্রদর্শককে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে এবং তাহার সকল ত্রুটী উপেক্ষা করিয়া স্নেহভরে ডাকিয়া আপন পথে টানিয়া লইতে হইবে। সেটান যেন তাহার গতিপথ পাষাণ স্তূপের ন্যায় রুদ্ধ না করে, পরন্তু তাহার গতির সহায় হয় এবং উহা আরও সহজ ও সরল করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে অদৃশ্য প্রেম বন্ধনের স্বরূপ হয়।

হেমবাবু প্রথমেই লিখিয়াছেন:—"বাঙ্গলাদেশের আবহাওয়ায় এমনি একটা কি আছে যে, তাতে কেবল করুণ সুরটাই বেশী ক'রে বেজে উঠে"। এটা খুব সত্যকথা—বাঙ্গালী জাতি চিরদিনই ভাব

প্রবণ ভাবের উচ্ছ্বাসে সহজেই মাতিয়া উঠে। আর সেই জন্যই এখানে নিত্য নূতন ভক্ত ও কবির সৃষ্টি হইতেছে। কারণ ভাবের উচ্ছ্বাস না থাকিলে কাহারও ভিতর হইতে কবিতা বাহির হয় না। এবং কাহারও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইবার আগেও ভাবের উচ্ছ্বাস অর্থাৎ একটা কিছু পাইবার ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে। তাহা হইতেই ক্রমে সাধনার দ্বারা ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে যে একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিবে সেটা বোধহয় নিতান্ত স্বাভাবিক। করুণ সুর না বাজিয়া উঠিলে এখানে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কবিতারূপ নন্দনকাননের সৃষ্টি সম্ভব হইত না। আবার এদেশের আব-হাওয়ায় করুণসুর না বাজিলে চৈতন্য দেবের ন্যায় প্রেমাবতার কিরূপে এই বঙ্গদেশকে পবিত্র প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া আচণ্ডাল ভদ্রকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া বক্ষে টানিয়া লইতেন তাহাও বুঝিলাম না! হেমবাবু এখানে 'করুণসুর' বাজার কথা যে ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহার সরলঅর্থ—বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ঐ সুর বাজা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। অতএব তাঁহার মতে তবে কি বাঙ্গলা দেশের জগদ্বিখ্যাত ভক্ত কবিকুলের উৎপত্তিও অন্যায় হইয়াছে? তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন:—"তা তুমি যতই যা বল ঐ করুণ সুরটার মত মারাত্মক জিনিষ আর একটা কোথাও দেখি নাই, বিশেষতঃ ধর্ম্মে কর্ম্মে"। তাঁহার মতে ধর্ম্মে কর্ম্মে করুণ সুর নিতান্ত অন্যায়, যেখানে বাজবে কেবল টনটনে কঠোর সুর। ধর্ম্মে কর্ম্মে হৃদয়কে কোমল করিবার কিছুই আবশ্যক নাই, তাহা বজ্রের ন্যায় কঠিন হইবে তবে ভগবানের মন্দিরে প্রার্থনার অধিকার জন্মিবে। তাঁহাকে ডাকিতে হৃদয়ের ব্যাকুলতা, নয়নের অশ্রুরও কোন দরকার নাই; তেজোগর্ব্বিত সুরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে হইবে। এই কি? তারপর তিনি বলিতেছেন—"ঐ সুরের আতিশয্যেই যত ভাব প্রবণতা, যত উৎপেতে ভক্তির পথে ঝোঁক্"। ভক্তি আবার উৎপেতে কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে আমরা একেবারেই অসমর্থ। শাস্ত্রে ভক্তির লক্ষণ অনেক প্রকারই আছে

বটে, কিন্তু তার মধ্যে 'উৎপেতে' ভক্তির লক্ষণ কখনও আমাদের নজরে পড়ে নাই। যে কোন রকম ভক্তি হউক না কেন করুণ স্বর হইতেই তাহার উৎপত্তি। যে অতি নীচ শ্রেণীর ভক্ত, সে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি হইতে অসীম ব্যবধানের অন্তরালে আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যার হৃদয়ে করুণ স্বর বাজে সে নিজের ভাবেই নিজে মত্ত থাকে কখনও কাহারও উপর বিশেষ উৎপাত করে বলিয়া ত মনে হয় না। বরং অনেক তেজস্বী কর্ম্মবীর অনেক সময় দেশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়া অনেককে জড়াইয়া সেই আগুণে ঝাঁপ দেয় এবং পুড়িয়া মরে। নিরীহ ভক্ত হয়ত অকূল সাগরে হাবুডুবু খায়, কিন্তু নিজেই—কাহাকেও সঙ্গে জড়ায় না। তারপর হেমবাবু কীর্ত্তন, হরিনাম ইত্যাদির উপর কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন,—"গাঁয়ে গাঁয়ে কীর্ত্তনের ধুম লেগেই আছে। উচ্চরোলে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত লম্ফন, কুর্দ্দন, ক্রন্দন বা অশ্রুবর্ষণ, এরও অভাব নাই"। এটাও কি খুব খারাপ? হইতে পারে ইহার মধ্যে প্রকৃত ভক্তির লেশমাত্রও নাই, তার পরিবর্ত্তে আছে ভাবের একটা ক্ষণিক উন্মাদনা; কিন্তু তাহা হইলেও ধর্ম্মের বা ভক্তির কৃত্রিম অভিনয়ও ত অনেকটা ভাল! কারণ হুজুগে পড়িয়া সকলের সঙ্গে ভক্তির অভিনয় করিতে গিয়া অনেকের হৃদয়নিহিত ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বা স্বপ্নাতীত ঘটনা নহে। অতি হীন জীবঘাতী ব্যাধও ভক্তের বেশভূষা মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। লেখক অনেক স্থলেই স্বামিজীর দোহাই দিয়াছেন। উত্তম কথা আমরাও স্বামিজীর দোহাই দিয়াই বলিব, যে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা স্বামিজীর হৃদয়ের একমাত্র কামনা ছিল, জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ের কোন্ সুরের স্পন্দনে? কোন্ সুরের মূর্চ্ছনায় আত্মহারা হইয়া স্বামিজী দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন? করুণ—না কঠোর? তা' ছাড়া ঐ 'গাঁয়ে গাঁয়ে কীর্ত্তনের ধুম' (যদিও উহা হৃদয়হীনদিগের তাণ্ডব নৃত্য) হইতে কত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হয় তাহা কি তিনি জানেন না? মানুষ যাহাতে একটু আনন্দ অনুভব করে সেই দিকেই

চলিয়া পড়ে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের চরম সফলতা একমাত্র প্রকৃত স্থায়ী আনন্দকে লাভ করার মধ্যে। অতএব যদি কেহ নিতান্ত নীতি-বিগর্হিত কাজ না করিয়া আত্মানন্দের ক্ষণিক আংশিক ভাবও অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? বরং এই ক্ষণিক আনন্দের উত্তেজনায় তাহারা অনেক মহৎ কাজও করিয়া ফেলিতে পারে, যদি পিছনে শক্তি যোগাইবার কেহ থাকে। তাহাতে ত কাহারও সর্ব্বনাশ হইবার কোন আশঙ্কা নাই? তারপর তিনি আবার বলিয়াছেন—"কিন্তু বেশ করে' খুঁজে দেখ মজা দেখবে, ঐ অশ্রু বর্ষণ হরিনামের সঙ্গে হচ্ছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ওর পিছনে রয়েছে হয় ত দারিদ্র্য জ্বালা, কারও পুত্র-বিয়োগজনিত অন্তর্দাহ অথবা এমনি একটা কিছু তীব্র যন্ত্রণা"। এত অতি বড় খাঁটি কথা। তীব্র যন্ত্রণা পিছনে না থাকিলে ব্যাকুলতা আসিবে কোথা হইতে? অশ্রুই বা আসিবে কোথা হইতে? আবার তেজঃ গর্ব্বই বা আসিবে কোথা হইতে? শিখ মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল কিরূপে? পিছনে অত্যাচার জনিত তীব্র বেদনা ছিলনা কি? আবার এই করুণ সুরে আত্মহারা বাঙ্গালী জাতিই বা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল কিরূপে? পিছনে, তীব্র যন্ত্রণা ছিলনা কি? বর্ত্তমানে আব্রহ্মহিমানী ভারত গগনে যে মাতৃমন্ত্রের মৃদু কোলাহলে ছাইয়া পড়িয়াছে—ইহা কিসের জন্য? পিছনে দারিদ্র্য জ্বালা, অথবা পুত্রশোকের করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাতর ক্রন্দনের রোল এবং তজ্জনিত তীব্র বেদনা নাই কি? তীব্র বেদনা যখন হৃদয়ের অন্তস্তলে দারুণ আঘাত করে, তখনই মানুষের প্রাণে একটা তীব্র ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে; এবং কখন গণ্ড বহিয়া অশ্রু বন্যা ছুটিতে থাকে, আবার কখন আত্মাভিমানের অদম্য প্রেরণায় হৃদয় মাতিয়া উঠে। যশঃ, মান, ধন, প্রাণ সব তুচ্ছ হইয়া যায়। তখন সে একেবারে বিপুল কর্ম্ম-সাগরে লাফাইয়া পড়ে; কাহারও কথা শুনে না, কাহারও বাধা মানে না, পিছনে ফিরিয়া তাকায় না। অতএব অশ্রুই হউক, করুণ সুরই হউক, অথবা আত্মাভিমানই হউক, হৃদয়ে জাগিবার সময় পিছনে একটা তীব্র বেদনা থাকা স্বাভাবিক। করুণ সুর কি বীর হৃদয়েরও ভূষণ নয়? দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজেণ্ডার

বন্দি শত্রুর তেজোগর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া যখন তাঁহাকে স্নেহভরে বক্ষে টানিয়া লইয়াছিল, তখন তাহার হৃদয়ে কোন্ সুর বাজিয়াছিল?—করুণ—না কঠোর? যদি বলি তিনি বীর ছিলেন তাই বীরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু মুগ্ধ হয় মানুষ কোন্ সুরে জানি না। এক্ষণে স্বামিজীর ভাষায় দরিদ্র-নারায়ণের সেবার কথাই যদি ধরা যায়;—তবে দরিদ্র-নারায়ণের সেবারূপ মহা সাধনার শক্তি আ[illegible] কোথা হইতে পাইব? তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতে কে জাগাইয়া দিবে? প্রথমতঃ হয়ত আমি তাহাদের দুঃখ কষ্টের দারুণ জ্বালা আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া প্রতিকারার্থে ব্যাকুল হইয়া উঠিব, কিম্বা লেখকের "হুজুগে ধর্ম্মে যোগ" দেওয়ার ন্যায় সেবাব্রত গ্রহণ করিব। কিন্তু যে ব্রতে আন্তরিকতা নাই সে ব্রত সুচারুরূপে সম্পন্নই বা হইবে কিরূপে? কবি বলেন "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদনা বুঝিতে পারে? কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥" মানুষ যতদিন তীব্র বেদনায় জর্জ্জরিত না হয় ততদিন সে অপরের বেদনা বুঝিবে কিরূপে? করুণ সুরই বা বাজিবে কিরূপে? আবার বেদনার অনুভূতি যদি না থাকিল, করুণ সুর যদি না বাজিল, তবে দরিদ্র নারায়ণের সেবাব্রত গ্রহণ করা তাহার পক্ষে একটা সখ বা হুজুগ ছাড়া আর কি হইতে পারে? তাই তীব্র বেদনা পিছনে লইয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া যাওয়া—করুণ সুর বাজিয়া উঠা অথবা অশ্রুবর্ষণের প্রতি হেম বাবুর ন্যায় তীব্র কটাক্ষপাত করিতে আমরা অনিচ্ছুক। তিনি ওটাকে যত মারাত্মক বলিয়াছেন তত মারাত্মক মোটেই হইতে পারে না এই আমাদের ধারণা।

যদি মানুষের জীবনের চরম পরিণতি বা সফলতার জন্য ভক্তি বলিয়া কোন পথ থাকে, তবে তাহার সাধনা কিরূপে আরম্ভ হইবে? প্রহ্লাদের ন্যায় অহৈতুকী ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত করিয়া কয়জন সংসারে জন্মগ্রহণ করে? যদি ভক্তি বলিয়া কোন পথ থাকে, তাহার দ্বারা পূর্ণ মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানকে পাইবার কোন

উপায় থাকে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহার একটা হেতুও থাকিবে। মানুষের প্রাণ স্বভাবতঃ যশ, মান, ধন, বন্ধু প্রভৃতি আরও নানারূপ সুখোপকরণ পাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল; এবং উহাই যদি সাধারণ মনুষ্য জীবনের স্বভাবতঃই কামনার জিনিষ হইল তবে সেত তাহা পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেই! যদি সে তাহা না পায়, অথবা তাহার প্রাপ্ত ধন সহসা অন্তর্হিত হয়, তখন তাহার হৃদয় তাহা পুনঃ প্রাপ্তির আশায় দ্বিগুণতর ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। যোগ বা প্রাপ্তির দ্বারাই মানুষের হৃদয়ে আনন্দ জাগিয়া উঠে, আবার বিয়োগ বা বিচ্ছেদ দ্বারাই হৃদয়ে আকুলতা ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ মানুষ জন্মের পর হইতেই, কি যেন একটা হারান ধন পাইবার জন্য অল্প অল্প ব্যাকুলতা অনুভব করিতে থাকে, এই ব্যাকুলতাই মানুষের অতৃপ্তির একমাত্র কারণ। সে যাহা পায় কিছুতেই আশা মিটে না। তাই নিঃসম্বল পথের ভিখারী লক্ষপতি হইলেও তাহার পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, বরং তাহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে।—কেন এরূপ হয়? কারণ তাহার হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে সুপ্ত মানব প্রকৃতি তাহার স্থূল দৃষ্টির ও অনুভূতির অন্তরালে যাহা চাহিতেছে তাহা পাইতেছে না তাই পার্থিব নশ্বর ধন প্রচুর পাইয়াও এত অতৃপ্তি এত আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাহার পর বিয়োগ বা বিচ্ছেদের জন্য যখন তাহার পাইবার আশা প্রায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই সে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অসারতা অনুভব করিয়া আর একটা কি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন তাহার হৃদয়ে বিয়োগ জনিত করুণ সুরের সঙ্গে সুপ্ত মানব প্রকৃতির চির আকাঙ্ক্ষিত অদৃশ্য হারান ধনকে পাইবার ব্যাকুলতা মিশিয়া যায়, এবং সেই সম্মিলিত শক্তি প্রেরণা তাহাকে মরু প্রান্তস্থিত দারুণ পিপাসাকুল পথিকের ন্যায় চির স্নিগ্ধ ভক্তিবারি অন্বেষণে বেগে চালনা করিতে থাকে। ক্রমে সেই ব্যাকুলতাও প্রবল হইতে থাকে।

তাহার পর যখন এই হৈতুকী ব্যাকুলতা ক্রমে ভাগবদ্ভক্তির স্নিগ্ধ আরামপ্রদ মৃদুস্পর্শে নূতনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই হারান ধনকে, তাহার

স্থূল দৃষ্টির অন্তরালস্থিত আজন্ম আকাঙ্ক্ষার ধনকে যখন প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে তখনই তাহার জন্ম জন্মান্তরের অদম্য আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। অতএব তীব্র বেদনা পিছনে লইয়া যে অশ্রুবর্ষণ, তাহা আপাততঃ অশোভনীয় হইলেও একেবারে অলীক অথবা মানুষের আত্মোন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ একথা কেমন করিয়া বলিব?

মানুষ যখন দৈব দুর্বিপাকে অনন্যোপায় হইয়া পড়ে তখনই সে সকল উপায়ের কাণ্ডারী দয়াময় হরিকে প্রাণভরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। তখন সে আর্ত্ত ভক্ত হয়, এবং কেবল স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করে, হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে। অবশ্য শতবার স্বীকার করি, সে যখন অশ্রুবর্ষণ করে তাহার পার্থিব ধনের বিয়োগজনিত দুঃখে, তখন এই বিচ্ছেদজনিত দুঃখই তাহার ভগবানকে ডাকার হেতু হয়। কিন্তু এই হেতু ক্রমশঃ "ডাকব বিনা আশায়, ডাকব বিনা আশায়, ডাকব মুখের হাসি দিয়ে ডাকব চোখের জলে" এই অহৈতুকী ডাকায় পরিণত হয় এবং শেষে তাহা-অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া হৃদয় ভরপুর করিয়া দেয়, মানব জন্ম সার্থক করিয়া দেয়। অতএব যদি দরিদ্র-নারায়ণের সেবাব্রতে কখন সফলতা আসে তবে তীব্র বেদনায় জর্জ্জরিত করুণ সুরে আত্মহারা বাঙ্গালীর দ্বারাতেও আসা অসম্ভব নয়।

আবার লেখকের মতে নবযুগ 'বিশ্বাস' চায় না। তবে কি অবিশ্বাসের উপর সমাজ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে? আমরা গোড়ামীর পক্ষপাতী নই আবার নবযুগের নবনব বিলাস স্রোতে ভাসিয়া যাইতেও প্রস্তুত নই। "চাই আমূল সংস্কার"। কিন্তু কত প্রতিভাশালী ঋষিগণের জীবনান্ত কালব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে যে অলৌকিক আর্য্যকীর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হঠাৎ একদিনে অবিশ্বাস করিব কেমন করিয়া? পূজনীয় অগ্রবর্ত্তী পুরোহিতেরা তা ত বলেন না? লেখক বেদ্ বেদান্ত উপনিষদ্ সবই মানেন; কিন্তু আমাদের দিক্ দিয়া নয়; তবে তিনি কোন্ দিক্ দিয়া মানেন স্পষ্ট করিয়া বলিলেই ত সব গণ্ডগোল মিটিয়া যাইত, আমরাও সেই পথ অবলম্বন করিয়া অকূলে কূল পাইতাম। লেখক পথ দেখান নাই

সকল স্থলেই একটা ঝাল মিটাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? তিনি "ঠিক্ ঠিক্" ভাবে চলিতে বলিয়াছেন, কিন্তু "ঠিক্ ঠিক্" ভাবটী যে কোন্ ভাব তাহাই যদি বুঝিব তবে আর বাকী থাকিল কি? আধুনিক ভাবের ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস ইত্যাদিকেও তিনি ফ্যাসানের মধ্যে ফেলিয়াছেন, আর প্রাচীন ভাবের ত কথাই নাই। অতঃপর কোন্‌পথে মানুষ ধর্ম্মের দিকে যাইতে পারে, মানুষ মানুষ নামে খ্যাত হইতে পারে সেই সোজা পথটী দেখাইয়া দিলেই ত বেশ ভাল হইত? অনাবশ্যক বাক্যাড়াম্বরের কি দরকার ছিল? দেশের তীব্র সমালোচনা অবশ্য দরকার কিন্তু দেশকাল বুঝিয়া আদর্শ সম্মুখে ধরাই মঙ্গলজনক। অবশ্য তাঁর প্রবন্ধ দরকারী, রক্ষণীয় অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যে সকল স্থলে আমরা বিষম সন্দেহের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াছিলাম তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। বারান্তরে আরও কিছু বলিবার আশা থাকিল। আমরা জিজ্ঞাসু অতএব ক্রটী মার্জ্জনীয়।

ভারতের আদর্শ

(স্বামী নির্ব্বাণানন্দ)

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"The national ideals of India are renunciation and service. Intensify her in those channals and the rest will take care of itself."

"ভারতীয় জাতীয় জীবনের সার্ব্বজনীন আদর্শ ত্যাগ এবং সেবা। এই দুইটী দিক দিয়া ভারতীয় জীবন প্রবাহকে পরিপুষ্ট করিয়া তোল, দেখিবে আর সবদিকই আপনি আপনি উন্নত হইবে।"

ত্যাগ এবং সেবা এ কথা দুটী বড় সামান্য নহে। ত্যাগ বলিলেই মনে হয়—ইন্দ্রিয় মনের সংযম এবং পরমার্থ লাভের সাধন। সেবা

কথাটাও ঐরূপে ধর্ম্ম সাধনার গতি নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। স্বামিজীর ভাবে সেবা বহির্ম্মুখীন মনকে অন্তর্ম্মুখীন করিবেই।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"॥

এই হইল স্বামিজীর সেবার ভাব, নারায়ণ জ্ঞানে জীব সেবা। মনুষ্যত্বে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা এবং দেবতার প্রকৃতি অনুযায়ী পূজার ব্যবস্থা; তবেই সেবা পরমার্থলাভের সহায়ক এবং আস্তে আস্তে মনকে প্রবৃত্তির মোহ হইতে তুলিয়া নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাইবে। মোট কথা ত্যাগ এবং সেবা উভয়ই ধর্ম্মতত্ত্বের গতি নির্ণয় করিয়া দিতেছে। ধর্ম্মই ভারতীয় জাতীয় জীবনের আদর্শ এবং উহার পরিপুষ্টিতেই ভারতের উন্নতি। স্বামিজীর এ কথার সত্যতা কতদূর আমরা এখন বুঝিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজির এ কথায় স্বভাবতই একটা আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, কারণ ধর্ম্ম দুইচার জনেরই ব্যক্তিগত সাধনার লক্ষ্য হওয়া সম্ভব, সমাজ সমষ্টিতে ঐরূপ আচরণ আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনাতেই পর্য্যবসিত থাকিবে এবং এই ধর্ম্ম সহায়ে ঐহিকতার লাভ এবং দুঃখ দৈন্যের উপশম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। উত্তরে বলিতেছি ভারতের জাতীয় সংগঠন জগতের পক্ষে নূতন ব্যাপার নহে। ভারতের এ প্রাচীনত্ব জগতের একটা জানিবার বিষয়, বুঝিবার বিষয়। কেন ভারত শত শত বৎসর ধরিয়া বিজাতী, বিদেশীর পদদলিত পদলাঞ্ছিত হইয়া আজও জাতীয়ত্বের কীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিতেছে! ধর্ম্মই উহার কারণ নয় কি? ধর্ম্মেই ভারতের সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মই ভারতীয় জীবনের আদর্শরূপে নিরূপিত, ঐতিহাসিক তত্ত্ববিৎ ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকেন।

হে নব্যভারত, তুমি আজ পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা তোমার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে; এখন তোমার আর প্রাচীনত্ব ভাল লাগিতেছে না। আপাতমধুর পরিণামে বিষময় সম্পদ নেশায় তোমার চিত্ত আকর্ষিত। এরূপ অনুকরণে তোমার সমাজ

কতদূর উন্নত হইবে ইহা ভাবিবার বিষয়। অনুকরণ দ্বারা উন্নতিলাভের আশা বৃথা। ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত কাক কি ময়ূরত্ব লাভে সক্ষম হয়! প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব আছে। এবং উহাই জাতির জীবনী-শক্তি। ঐ শক্তি আশ্রয়েই জাতি উন্নত হয়। ধর্ম্মই ভারতে জীবনী শক্তি। এই ধর্ম্মের উদ্বোধনেই ভারত উন্নত এবং অমরত্ব লাভ করিবে। সৃষ্টির প্রারম্ভেই ভারতে এ শক্তি উদ্দীপ্ত; কাহারও অনুকরণে সিদ্ধ নহে।

এখন অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে নবাবী 'আমলের টাকা একালে আর চলিবে না। সময়োপযোগী ব্যবস্থাই বুদ্ধিমানের কায, এবং এই 'আধুনিকতা'র দিনে প্রাচীনত্বের স্থান ইতিহাসে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নয়। সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনীর উৎপত্তি স্থানে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন যদিও সম্ভব হয় কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি পাশ্চাত্য অনুকরণে সংগঠিত হইবে—ইহা অসম্ভব। নব্য ভারত, তোমার ঐ ধারণা, তোমার এ বিশ্বাস তোমার এ কার্য্য প্রবণতা সমস্তই ভুল এবং বৃথা। ভারত কতবার এই-রূপে ঐহিক প্রতিপত্তি লাভে সচেষ্ট হইয়াছে কিন্তু দৈব নিয়মে উহা পুনঃ পুনঃ বিফল। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র শক্তির অবমাননা, বুদ্ধের মহানির্ব্বাণ প্রচার, শঙ্করের বেদান্ত প্রতিষ্ঠা এবং চৈতন্য রামানুজাদির প্রেম ভক্তির বন্যা ভারত সমাজ পুনঃপুনঃ ধর্ম্মপথে নিয়মিত। এই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সমাজ নেতাগণই ভারতের অবতার কল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এই ব্রহ্মজ্ঞপুরুষই সনাতন সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥

এই কথার স্বার্থকতা দেখাইতে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই আশ্বাসবাণীর বিফলতা কখনও ঘটে নাই, ঘটিবেও না। ধর্ম্ম সমন্বয়েই ভগবানের অবতারত্ব। ভগবানই যেখানে নেতা যাহার নিয়ন্তৃত্ব অব্যাহত রূপে কার্য্যক্ষম সেখানে অনুকরণ স্পৃহা বাতুলতা মাত্র। এইরূপ অনুকরণ প্রিয়তা মিচরি ফেলিয়া গুড় খাওয়া, সুধার পরিবর্ত্তে গরল পান করা।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং শিক্ষাদীক্ষায় অশান্তি দ্বন্দ্ব কোলাহল প্রভৃতি

পৈশাচিক লীলাভিনয়ের বীজ নিহিত। যেখানে সম্পদের আশা বলবতী স্বার্থপরতাও সেখানে চির বিদ্যমান। স্বার্থপরতাই সমস্ত অনর্থের কারণ। স্বার্থপরতা হইতে অনাচার অত্যাচার হিংসাদ্বেষাদির সৃষ্টি এবং অশান্তি গরল উদ্গীরিত হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতারদিকে দৃকপাত করিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার শিক্ষাদীক্ষায় স্বার্থের লেশমাত্র নাই—ত্যাগের ভাব থাকায় আনন্দের প্রবল উৎস প্রবাহিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তারতম্য আলোক অন্ধকারের ন্যায় বিদ্যমান। আলো ছাড়িয়া অন্ধকারে যাই-বার সাধ বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ ছাড়া আর কি বলিব।

মানুষ যাহা চায় তাহাই কি পায়, না যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে। ভারত কতবার বিষয়ের মোহে আদর্শকে হারাইয়াছে ভগবানও "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "সম্ভবামি যুগে যুগে" ভগবানের এই আশামূলক প্রতিজ্ঞাবাণী শুধু অতীতের জন্য নহে; তাহা যদি হইত তবে বুঝিতাম ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ স্বামিজীর প্রদর্শিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন সুফল নাও ফলিতে পারে এবং সময়োপযোগী পাশ্চাত্য অনুকরণেই মঙ্গল হইবে কিন্তু তাহা ত নহে—সেই মহানশক্তি যে শক্তির বিকাশ বারবার ভারতের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল যাহার নিয়ন্তৃত্বে ভারত চিরকাল পরিচালিত সেই পূর্ব্ব শক্তিসমূহের একত্র সমাবেশ আজও আবার ভারতের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তোমরা কি শোন নাই; সহস্র সহস্র সন্দেহ এবং ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যেও ভগবান নিজেই আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ"। ঐ শোন স্বামীজির আশাপ্রদ ঘোষণাবাণী "সতত বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা বিভক্ত, সর্ব্বথা আচার-সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ

হইয়াছেন। এই নবযুগধর্ম্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান। এবং এই নবযুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্ব্বক শ্রীযুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ! হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর।"

ভারতের সনাতন ধর্ম্ম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। বেদ বেদান্তাদি সনাতন ধর্ম্ম জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আজ শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে প্রকাশিত।

পাশ্চাত্য মোহজালে বিজড়িত, সম্পদ সম্বর্দ্ধনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারতের নিয়ন্তৃত্বপদ অধিকার করিতে আজ আবার অবতার-কল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সনাতন সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বামীজি প্রদর্শিত ঐ ধর্ম্মই সমাজ সংগঠনের পথরূপে নির্দ্দিষ্ট। ত্যাগ এবং সেবা এই দুটি পথ দিয়াই ভারতের ধর্ম্ম জীবন, জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। 'আধুনিকতা'রূপ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত, জগতের সমক্ষে ঘৃণিত, হিংসাদ্বেষ পরশ্রীকাতরতায় সমাচ্ছন্ন, এবং নিজ লক্ষ্যৈকনিরূপণে অসক্ত ভারতের অনুল্লঙ্ঘনীয়, সময়োপযোগী এবং শান্তিপ্রদ উন্নতির এই পথ ভগবানেরই নির্দ্দিষ্ট—স্বামীজি স্থানান্তরে এবং ভাষান্তরে উহার সংযোজনা করিয়াছেন মাত্র। হে ভারতবাসি "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য," "ওঠ, জাগ," তোমার নিজ সাধন পথে দাঁড়াইয়া ত্যাগ ও সেবার দ্বারা পরমার্থ লাভ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর, দেশকে সমাজকে এই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোল, তবেই আমাদের জীবন সফলতা লাভ করিবে, দেশের উন্নতি দ্রুতগতিতে হইতে থাকিবে এবং স্বজাতির আসন জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা দেখিয়াছি ধর্ম্ম সমন্বয়েই সমাজ সংগঠিত হইতে পারে এবং বর্ত্তমানে শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতে ধর্ম্ম সমন্বয় কিরূপে সম্ভাবিত এবং সমন্বয় যে হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। শান্তিপূর্ণ জীবন সকলেরই অনুসরণীয়। শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ!

৺কেশব সেন।*

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

কেশব সেন অত বড় লোক, যিনি রাণীর কাছে মান্য পেয়েছিলেন,—ঠাকুরের কাছে হাতজোড় ক'রে ব'সে থাকতেন। তাঁর ঠাকুরের কথার উপর বিশ্বাস কত! তিনি হিংসুক ছিলেন না। ঠাকুর তাঁকে শিবপূজা করতে বলায়—তিনি তা' ক'রেছিলেন। কেশববাবু তাঁর কথা খুব বিশ্বাস করতেন এবং জানতেন যে, ওঁর কথা মানলেই কল্যাণ হবে। একদিন ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে চুপ ক'রে রইলেন। কেশববাবু বল্লেন, 'আর কিছু বলুন'। ঠাকুর বল্লেন, 'আর বল্লে তোমার দলটল থাকবেনা'। তখন তিনি বল্লেন 'তবে থাক'।

তিনি জানতেন আর কিছু বল্লেই—তাঁর মন বদলিয়ে যাবে, আর দল রাখতে পারবেন না।

ঠাকুর বলতেন—কেশববাবুর মান নেবার ইচ্ছা আছে। তিনি কেশব সেনকে একদিন বলেছিলেন—তুমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বল!

কেশববাবু বল্লেন—কি বলবো, আপনার কথা নিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ব'লে—নিজেও আনন্দ পাই, দশজনকে আনন্দ দিতে পারি।

যখন কেশববাবু বিডন ষ্ট্রীটে লেকচার দিতেন, বুড়োরা বলতো—ব্রাহ্ম কেশব এসেছে। তিনি ভগবানের সম্বন্ধে বলতে বলতে নিজেও কেঁদে ভাসতেন, অপরকেও কাঁদাতেন! তারপর বুড়োরা বলতো—কেশব যা বল্লে সব ঠিক ঠিক।

ঠাকুর একবার ব্রাহ্মসমাজে গিছলেন। কেশববাবু ভক্তগণ নিয়ে ব'সেছিলেন। ঠাকুর কথায় কথায় বল্লেন,—কেশবের ল্যাজ খসেছে। তা'তে অন্য ব্রাহ্মরা চ'টে গেলেন। কেশববাবু তাঁদের বল্লেন—'চুপ কর, এর মধ্যে অর্থ আছে'।

কেশববাবু নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে পূজা ক'রেছিলেন।

---

* জনৈক ব্রহ্মচারীর ডাইরী হইতে।

তিনিই প্রথমে ঠাকুরের সম্বন্ধে কাগজে লিখ্‌তেন। তাই প'ড়ে ঠাকুরের সন্তানেরা ঠাকুরের কাছে যান্।

রামদত্ত ঠাকুরকে নিয়ে উৎসব করেন; কেশববাবু রামদত্তকে বলেছিলেন, "রাম, এ জিনিষ দৈবাৎ কখন হয়। গ্লাসের (glass case) মধ্যে রেখে দূর থেকে—নমস্কার কর্‌তে হয়। এ লাট্ করার জিনিষ নয়।"

ঠাকুর কেশববাবুকে ধ্যান করতে দেখে বলেছিলেন—'এর ফাতনা নড়ছে অর্থাৎ ঠিক ঠিক ধ্যান হ'চ্ছে।

বড় বড় লোক ক্রমশঃ সুখের পথে যাচ্ছে যেমন কেশব সেন; এ জন্মে অনেক উন্নতি কল্লো পরজন্মে আরও উন্নতি কর্‌বে।

তিনি ঠাকুরকে সভার মধ্যে লুচি খাইয়েছিলেন; যোগীন মহারাজ খবরের কাগজ হাতে ক'রে ঠাকুরের ঘরে এসে প্রণাম কল্লেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কল্লেন—"কোথা থেকে আসছ?"

যোগীন মহারাজ বল্লেন—দক্ষিণেশ্বর হ'তে। আমি অমুকের ছেলে। ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের লোক বুঝ্‌তে পারত না। তিনি অবাক হ'য়ে বল্লেন—"এখানকার কথা কি ক'রে জান্‌লে? যোগীন মহারাজ বল্লেন—'কেশববাবু কাগজে আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন।" তাই শুনে ঠাকুর কেশববাবুকে ডেকে এনে ধম্‌কিয়ে বল্লেন "আমি কি মান ভিখারী?—আমি কি 'ইদানীং সাধু'! যা করেছ করেছ আর লিখনা।

ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তেন—কেমন হচ্ছে! কেশববাবু বল্‌তেন "মহাশয় আপনার কৃপায় সমাজে লোক ধরে না।

কেশববাবু পয়সার জন্য ব্রাহ্ম হন নাই। হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম ছিল না, তাই তিনি ব্রাহ্ম হ'য়েছিলেন। ছোটকাল থেকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর্‌তেন। পরমহংসদেব স্বীকার কল্লেন—কেশববাবুর ঠিক ঠিক ধর্ম্ম। একটি লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—কত বড় শক্তি। কেশববাবুর অনেক 'ফলোয়ার' হ'য়ে গেল। তাঁর সঙ্গ পেয়ে কত লোক বেঁচে গেল।

সৎ কথা।

১। Jesus Christ বলেছেন—"দোষী আত্মা ভগবানের কাছে যেতে পারে না, নির্দোষী আত্মা; পবিত্র আত্মা যেতে পারে।" তিনি তার কাছে প্রকাশ হন।

২। কর্ম্ম ফলে কেউ গুরু হয়, আবার কেউ শিষ্য হয়।

৩। পরস্পর পরস্পরকে দুঃখ দিচ্ছে, জানে না আবার তাকে বুড়ো হতে হবে। এসব মায়ার খেলা।

৪। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ও ভগবান রামচন্দ্রের জীবন যে জানে সে বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করবেই। এঁরা জীবের শিক্ষার জন্য বাপকে পূজা করেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি যত অবতার, তাঁদের হুকুম প্রতিপালন করেছেন। এরা বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে জানেন। যে বলে আমি বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি না—সে পশু।

৫। যারা ভগবানের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন ভগবান তাদের প্রতি বড়ই খুসী হন। তাদের আত্মা বড়ই সুখে থাকে। সংসারীরা তাকে ঘৃণা করেন কিন্তু ভগবান খুব আদর করেন যে 'আমার জন্য তুমি সব ত্যাগ করেছ।

৬। এ সংসারে লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে না পারলে তাকে বেকুব বলে। মহামূর্খ টাকা রোজগার করলে তাকে খুব বুদ্ধিমান বলে।

৭। তিনি বলতেন খাবার সংস্থান থাকলে, জোচ্চরি প্রবঞ্চনা না করে দুটো খাও আর দাও, তাঁর নাম কর। তা'তে আত্মা সুখে থাকে।

৮। মন গড়া ধর্ম্ম কি থাকে? সেখানে যে দায় নেই।

৯। যেখানে ধর্ম্ম থাকে সেথায় কি হিংসা থাকে?

১০। ত্যাগ না হলে তাকে বুঝবার যো নাই।

১১। যে ভগবানকে জানবার চেষ্টা কচ্ছে তার সঙ্গে আলাপ করলে শান্তি পাবে।

১২। যে ঠিক সন্ন্যাস লবে সে জীবকে অভয় দেবে, সে আর কাহারও ভালবাসা চায় না।

১৩। তাঁহাতে মন থাকলে সব ভয় কেটে যায়। তাঁর উপর মন থাকাই হলো প্রধান। তিনি যে কোথা থেকে বুদ্ধি জুটিয়ে দেন তা কি জীব বুঝিতে পারে। তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করতে হয়। বাহিরে লোক দেখান না হয়। আন্তরিক প্রার্থনা হলে তিনি শোনেন।

১৪। দ্রোপদী কি ব্রত করে লোকজন খাওয়াচ্ছিলেন; তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছিলেন সখা ঐ লোকটাকে খাওয়াও। দ্রোপদী খুব আয়োজন করেছিলেন। তার পর সেই লোক খেতে বসা মাত্র শাঁখ ঘণ্টা বাজিতে লাগল। ঐ লোকটার খাওয়ার ঠিক নেই, পর পর খাচ্ছে না, কখনও এটা সেটা, তাই দেখে দ্রোপদী মনে ভাবছেন যে লোকটা এমন যে খেতেও জানে না। মনে করিবামাত্র শাঁখ ঘণ্টা থেমে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রোপদীকে বলিলেন যে তুমি কি ভাবছিলে বল দেখি; শাঁখ ঘণ্টা থেমে গেল কেন? তখন দ্রোপদী ঐ বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বড়ই অন্যায় করেছ ওর কি খাওয়ার উপর মন আছে। আমার উপর মন আছে; দ্রোপদীর মন্তশিক্ষা। অহঙ্কার যেন না হয়।

১৫। কর্ম্ম না থাকার জন্য গুণীর গুণ বুঝতে পারে না, কেবল দোষই নজর আগে।

১৬। যে সাধু ভগবান লাভ করেছেন সেই জানে ভগবান, ও বৈরাগ্য কি জিনিষ। সাধুর ভেষ থাকলেই হয় না ভগবান লাভ করাই প্রধান।

১৭। অসৎ কাজ করলে ভয় আসবে, দুঃখ পাবে। সৎকাজ করলে ভগবানের দিকে মন যায়, শান্তি পায়।

১৮। কর্ম্মের পথ ও মত কারুর মিল হয় না তবে উদ্দেশ্য সকলেরই এক হতে পারে। যে কর্ম্মের পথ মিল করতে চায় সে নির্বোধ।

১৯। মান সম্ভ্রমের জন্য জীব কি না কচ্চে, খবরের কাগজে নাম দিচ্ছে। যে জানে এসব কিছু নয়, মিথ্যা, সব মায়ার খেলা সে ভাগ্যবান।

২০। ভগবানে মতিগতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকলে কি হয়? সে অসৎ কাজ করবে না; সে জানে উপরওয়ালা একজন আছেন। অসৎ কাজ কল্লেই ভুগতে হবে।

২১। কামিনী-কাঞ্চন এ দুটী ভয়ানক বন্ধনের কারণ ও সংশয় আনে। পার্থিব ভালবাসার কথা ছেড়ে দাও এদুটী ভগবানের পথে যেতে দেয় না, যেখানে থাকে—বিবাদ করায়। যে এদুটী ফেলে দিতে পারে সে জীবন্মুক্ত। এও মায়ার খেলা।

২২। গুরু শিষ্যের খুব গুণ থাকলেও শিষ্যের দোষ ধরেন; বাপও ছেলের গুণ থাকলে দোষ ধরেন।

২৩। ভাই ভাইএ মিল থাকার খুব দরকার। এক সঙ্গে থাকতে গেলেই বকাবকি হয়। মনে রাগ হওয়া খারাপ। তিনি বলতেন 'সতের রাগ, জলের দাগ'।

২৪। অসময়ের উপকারের মূল্য নেই।

২৫। গুরু কে? যিনি সংস্কার বিহীন পুরুষ, তাঁহাকে গুরু বলে মানতে হয়।

২৬। চোরকে ভগবান ঘৃণা করেন।

২৭। দুঃখের সময় গুরুকে, ভগবানকে ঠাকুরকে মনে পড়ে।

২৮। যে গুরুর দোহাই দিয়া খাচ্ছ তার উপর আবার রাগ! এ আবার কি বেয়াদবী।

২৯। পাপাত্মারা সাধুকে বলে আমাদের পাপ আপনি ভুগুন।

৩০। অর্থ থাকবে অথচ সৎবুদ্ধি হবে, এ ভগবানের খুব কৃপা চাই।

৩১। মেয়ে জাত হয়ে অর্থ থেকেও অহংকার, অভিমান হয় না—খুব ভগবানের দয়া বৈ কি।

৩২। অসৎ লোকের জিনিষ খেতে নাই।

৩৩। পুণ্যবাণ লোককে দেখলে মন হরষিত হয়, আর পাপাত্মাকে দেখলে হৃৎকম্প হয়।

৩৪। সকলেই তাঁর সন্তান, তবে যে ভগবানকে ভক্তি করবে, শরৎ লবে সেই সুসন্তান।

৩৫। গুরুর কৃপা না হলে সংশয় যায় না।

৩৬। তাঁর হুকুম কি কেউ মানে! মানলে সকলেরই কল্যাণ হ'ত।

৩৭। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এক অনন্ত আর কি কেউ অনন্ত হয়।

৩৮। ভগবান কি তোমার বাঁধা যে তোমার নিয়মে চলবেন?

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যাহারা অপরকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা করে তাহাদের ত আত্মজ্ঞানও নাই কেননা পূজ্যপাদ আচার্য্য (সুরেশ্বর) স্বীকার করিতেছেন—

"রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু
কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরেতরোঃ।"

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ৪।৬৭) *

চিত্ত, ব্যায়ামের জন্য (অনুশীলনাদির উদ্দেশ্যে) শব্দাদি যে সকল বিষয়ে (তর্কাদি শাস্ত্রে) প্রবেশ করে, সেই সকল বিষয়ের প্রতি আসক্তি, অজ্ঞানেরই লক্ষণ। যে বৃক্ষের কোটরে অগ্নি রহিয়াছে, তাহাতে হরিদ্বর্ণ কি প্রকারে সম্ভবে?

* জ্ঞানোত্তম কৃত টীকানুবাদ—যেহেতু সিদ্ধের এবং সাধকের, আসক্তি ও দ্বেষ বশতঃই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, সেই হেতু প্রবৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া যদি আসক্তি অনুমতি হয় তবে তাহা অজ্ঞানের লক্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এই বলিয়া উপসংহার করিতেছেন—'চিত্ত ব্যায়াম ভূমিষু—স্বাভাবিক সুখানুভব বশতঃ চিত্ত শব্দাদি যে সকল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে যে "রাগ" আসক্তি, তাহা অজ্ঞানেরই চিহ্ন।

কেননা সেই আচার্য্যপাদ সুরেশ্বরই, (জ্ঞানীর আসক্তি প্রভৃতি থাকে একথা) এই স্থলে স্বীকার করিতেছেন—

তদুত্তরে বলি এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না কেন না আচার্য্যপাদ—নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রণেতা সুরেশ্বরাচার্য্যের বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক হইতে, মুনিবর বিদ্যারণ্য এই প্রমাণটি, দুইটী বিভিন্ন শ্লোক হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১৫৩৭ সংখ্যক শ্লোক "শাস্ত্রার্থস্য সমাপ্তত্বান্মুক্তিঃ স্যাৎ তাবতা মিতেঃ। রাগাদয়ঃ সন্তুকামং ন তদ্ভাবোহপরাধ্যতি" ॥; উক্ত ব্রাহ্মণের ১৭৪৬ সংখ্যক শ্লোক—"উৎখাত দংষ্ট্রোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতি। বিদ্যমানাপি বিধ্বস্ততীব্রানর্থ পরম্পরা" ॥ টিকাকার আনন্দগিরি প্রথম শ্লোকটি এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন :—তাহা হইলে মুক্তি কিপ্রকারে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে তাহার নাম "মিতি"; তাহা হইতে মুক্তি হয়, কেননা "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্ম স্বরূপই হ'ন (মুণ্ডক ৩।২।৯)। এই শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ জানিবা মাত্রই মুক্তি হয়, ইহাই উপনিষদ্বিচারের চরম ফল, (তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কিছু ফল নাই)।

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন যে বৃক্ষে অগ্নি রহিয়াছে তাহাতে হরিদ্বর্ণ সম্ভবেনা। সেইরূপ, যে স্থলে আসক্তি আছে সেস্থলে জ্ঞান নাই।

এস্থলে কেবল মন ও বুদ্ধির উল্লেখ হইলেও, চিত্ত ও তাহার বৃত্তি সমূহকেও বুঝিতে হইবে। শেষে—আত্মতত্ত্বে আত্মতত্ত্ব বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব, এই হেতু তাহাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাতে "স্থির সমাধান বা বিশ্রান্ত হইয়া অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিশ্রামলাভ করিয়া "যেন"—যে কল্পনা নামক অহঙ্কার, দ্বৈত-কল্পনার মূল স্তম্ভ-স্বরূপ, তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সকল বস্তু তুমি ত্যাগ করিলে, তাহাকেও পরিত্যাগ কর। এই সকলের ত্যাগ বলিতে, সেই সেই বস্তুতে 'আমি' 'আমার' এইরূপ অভিমান ত্যাগই বুঝিতে হইবে। আর সেই অহঙ্কারেও শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপ আত্মার যাহাতে 'আমি' বুদ্ধি নাই—সেই আত্মার উপলব্ধি দ্বারা মূলাজ্ঞানের উচ্ছেদ ঘটিলে, তাহা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে কল্পনান্তরের অপেক্ষা নাই। এই কারণে "অনবস্থা দোষ" ঘটে নাম অর্থাৎ তাহার বিনাসক কে? খুঁজিতে হয় না।

এই হেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্য ধারণা করিতে পারিলেই মুক্তি। ইহাই—ভাবার্থ। এস্থলে যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে সেইরূপ জ্ঞান হইবার পরেও যদ্যপি আসক্তি প্রভৃতি দেখা যায়, তাহা হইলে ত বুঝিতে হইবে তাঁহার জ্ঞান হয় নাই—তদুত্তরে বলিতেছেন যে সেইরূপ আসক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেই তাহাদিগকে যে জ্ঞানের বিরোধী বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। কেননা জ্ঞান দ্বারা তাহাদের বীজ দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে ঐ সকল আসক্তি প্রভৃতির আভাস মাত্র। এই হেতু বলিতেছেন আসক্তি প্রভৃতি থাকে, থাকুক ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিতেছেন—'অবিদ্যা থাকিয়া গেলে সংসার রচনা করিবেই, এই হেতু যাহাতে তাহার বিধ্বংস ঘটে, তাহা ত করিতে হইবেই ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অবিদ্যা যে উৎকট অনর্থ রাজি প্রসব করে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে, উৎপাটিত দন্ত সর্পের ন্যায় অবিদ্যা (থাকিয়া গেলেও) কি করিতে পারে ?

জীবন্মুক্তি-বিবেকের আনন্দাশ্রম সংগৃহীত তিনখানি প্রতিলিপিতে উক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধ ("উৎখাত……করিষ্যতি") নাই। ইহাতে মনে হয় অন্য কেহ স্বকীয় স্মৃতি হইতে পারে উহার সংযোজন করিয়া থাকিবেন।

রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তদ্ভাবোঽপবাধ্যতি।

(বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক ১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১৫৩৯ শ্লোক শেষার্দ্ধ।)

উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতি॥

বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক ১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ প্রথমার্দ্ধ। ১৭৪৬।

আসক্তি প্রভৃতি থাকে থাকুক। তাহারা থাকিলেই দোষ ঘটায় না। যে সর্পের দন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই সর্পের ন্যায়, অবিদ্যা কি করিতে পারে ? (অর্থাৎ কোনও হানি ঘটায় না)।

আর একথা বলিতে পার না যে আচার্য্য পাদের উক্তবাক্যদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, কেন না স্থিতপ্রজ্ঞ ও কেবলজ্ঞানী এই দুই প্রকার (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) সম্বন্ধে উক্ত বাক্যদ্বয়ের (যথাক্রমে) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (অর্থাৎ উক্ত দুইটি বচন যথাক্রমে উক্ত দুই প্রকার পুরুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা যদি 'জ্ঞানীতে আসক্তি প্রভৃতি থাকতে পারে' একথা স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে ত সেই আসক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মা-ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া জন্মান্তর ঘটাইতে পারে ?

(সমাধান) না এরূপ হইতে পারে না। যে বীজ ভাজা হয় নাই, তাহারই যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে সেইরূপ অবিদ্যা প্রসূক্ত যে আসক্তি প্রভৃতি জন্মে তাহারাই মুখ্য আসক্তি ইত্যাদি বলিয়া, তাহারাই পুনর্জ্জন্মের কারণ হইতে পারে। জ্ঞানীর কিন্তু যে আসক্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ভাজা বীজের ন্যায় আভাস মাত্র। এই অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে :—

উৎপদ্যমানা রাগাদ্যা বিবেক জ্ঞান বহ্নিনা।
তদা তদৈব দহ্যন্তে কুতস্তেষাং প্রারোহণম্ ॥ *

(বরাহোপনিষৎ ৩।২৪।২৫)

আসক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হইবা মাত্রই, বিবেকরূপ জ্ঞানাগ্নি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে। তাহারা আবার অঙ্কুরোৎপাদন পূর্ব্বক নূতন শাখা পত্র ধারণ করিবে কি প্রকারে ?

(শঙ্কা)—আচ্ছা তাহা হইলে স্থিতপ্রজ্ঞেরও কেন সেই গুলি থাকুক না ?

"কেহ কি হয় অধোবদন
অকলঙ্ক দরিদ্রতায় ?
দৈন্য মোরা করি বরণ,
ভীরু যে জন গণি না তায়।"

রবার্ট বার্ণস।

* পাঠান্তর—'যদাতদৈব'। পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ধৃত অনেকগুলি শ্লোকই বরাহোপনিষদের একই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে সেই শ্লোকগুলি প্রসঙ্গ নিবদ্ধ কিন্তু উক্ত উপনিষদে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথবা কষ্টকল্পিত ভাবে তাহাদের সম্বন্ধে ঘটাইতে হয়। ইহাতে মনে হয় উক্ত উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টার হৃদয়ে জীবন্মুক্তি-বিবেকের সংস্কার থাকা অসম্ভব নহে।

সমালোচনা

রাজা-বাদশা ;—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ছেলেদের জন্য সরল ভাষায় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গল্প 'রাজা-বাদশা' ঘটনাস্তূপে এবং তারিখের জঞ্জালে শিশু মস্তিষ্ক গুলাইয়া দেয় না। পরন্তু ইতিহাসের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য—অতীতের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানের উৎকর্ষসাধন—সিদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে শিশু-হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগ, সত্যপালন, দেশভক্তি, নারী-মাহাত্ম্য প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির বিকাশ হইবে। হিন্দুর পুরাতন রক্ত তাজা করিতে হইলে প্রতি মাতাপিতার কর্ত্তব্য এই পুস্তকের সহিত নিজ সন্তানদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া।

পুণ্ডরীক ;—ইংরাজিতে 'বুদ্ধ' ও 'নলদময়ন্তী' নাটক প্রণেতা শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু, বি, এ, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল প্রণীত। ভিক্টর হিউগোর 'নত্র্‌ দাম দ পারী' নামক উপন্যাসের 'ফ্রলোর' চরিত্রাবলম্বনে ব্রহ্মচারী পুণ্ডরীকের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। জগতে অঘটনঘটনপটিয়সী দেবী মায়ার প্রতাপ পুণ্ডরীক মুখেই বর্ণিত হয়েছে "আর আমি,—আমার অভিমান, আমি বিদ্বান, শুদ্ধাচারী, সংযমে আদর্শচরিত্র,—আমি শুধু তাকে দেখেছি, দূর থেকে দেখেছি মাত্র, আমি আজ দুর্নিবার বাসনাবশে উন্মাদ, আমার দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, অস্তিত্ব সব ঐ পথভিখারিণী ইরাণি বালিকার দৃষ্টি সঙ্ঘর্ষে বিদারিত, বিচূর্ণিত হয়েচে! ছি, ছি, ছি,...

"ভ্রম, ভৃঙ্গার! শুধু রমণি দর্শনে পুরুষের কখন চিত্তবিকার হয় না। কালের ক্রীড়াপুত্তলি পুরুষ, কালপূর্ণ হলে তার অন্তঃ শত্রুসমূহ আপনি জাগরিত, আপনি উন্মত্ত হয়ে উঠে। তখন আর তার বিপ্লুত বৃত্তিনিচয় সংযমের শাসন মানে না,—অস্থির হয়ে চারিদিকে আপন তৃপ্তির আধার অন্বেষণ করে। তখন, কোথা হতে তার বাঞ্ছিত প্রতিমা অপ্সরাবেশে আপনি এসে সম্মুখে উপস্থিত হয়, আর বৃত্তিপ্রপীড়িত

পুরুষ উন্মত্ত হয়ে তাকে আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে আহ্বান করে, তাকে হৃদয়ের লৌহদ্বার খুলে দিয়ে তথায় পূর্ণ আধিপত্য দান করে। আমি মূর্খ, তাই মনে করেছিলাম এ প্রাণ পাষাণ প্রাচিরে বেষ্টিত, কামিনী-লিপ্সা কখন এ হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ভগবান...ভগবান ...কেন তুমি মানব হৃদয়ে সংযমশক্তি এত ক্ষীণ করেছ?...কেন তুমি পশু প্রবৃত্তিকে এত প্রবল করেছ?...কেন তাকে মনুষ্য হৃদয়ে এত বেশী স্থান, এত বেশী অধিকার দান করেছ?...

"কবে তাকে দেখেছি? সে ঘটনা অতি সামান্য কিন্তু কি ভয়ানক পরিণাম! একদিন এই অধ্যয়ন কক্ষে, ঐ বাতায়নে বসে প্রকৃতির সান্ধ্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করছিলাম। সমস্ত বিশ্ব তখন রক্ত রবিকরে বিভাসিত, যেন প্রকৃতি সতি তার রক্তিম ললাটে সিঁন্দুরের ফোঁটা কেটে শশধরের প্রতিক্ষা করছে। সেই সময় হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হ'ল...সেরূপ দৃশ্য আর জীবনে কখন দেখি নাই। দেখলাম, ঐ ইরাণি বালিকা করতাল বাজায়ে নৃত্য করছে। মনে হ'ল যেন সে অলোক সুন্দরী নারী মরজগতের নয় ত্রিদিবের। তার সৌন্দর্য্যে, শরীর সৌষ্ঠবে, নিপুণ পাদবিক্ষেপে আমি চমৎকৃত হলাম, সম্মোহিত হলাম...চক্ষু আর সে দৃশ্য হ'তে ফিরতে চাহিল না। মনে হ'ল যেন ঐ মোহিনী নর্ত্তকী শত সংখ্যাতীত মূর্ত্তি ধারণ করে আমার অন্তরের অভ্যন্তরে নৃত্য করছে; হৃদয় অভিভূত হ'তে লাগল ...অন্তরের শুদ্ধতা, সংযম যেন সমস্ত জড়ীভূত, নিদ্রাগত হয়ে আসতে লাগল· দেখতে দেখতে প্রাণে একটা ভীতির সঞ্চার হ'ল...মনে হ'ল যেন নিয়তি আমাকে গ্রাস করতে আসছে...ভাবলাম পালাই! কোথায় পালাব?...হর্ম্ম্যতলের মর্ম্মরসমূহ যেন আমাকে আকোটি প্রথিত করেছে...আমি জড়পুত্তলির ন্যায় সেখানে বসে রহিলাম...শরীর তুষার শীতল, মস্তিষ্ক জ্বলন্ত অঙ্গার! তথনি দেবী মন্দির হ'তে সন্ধ্যা আরতির বন্দনা গীতি শ্রুত হ'ল, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সেই মোহজাল ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার কল্পনা-নয়ন হ'তে অপসারিত হ'ল· ছুটে মন্দিরে গেলাম, মা শিলাদেবীর পদে আত্মনিক্ষেপ করলাম, কিন্তু মনে

হ'ল অন্তর হ'তে কি যেন অন্তর্হিত হয়েছে, আর আসবে না, আর বসবে না…। অনশন, অধ্যয়ন শতগুণে বৃদ্ধি কর্‌লাম…সব পণ্ড… সব পণ্ড সব পণ্ড

"আর আলোকের বিকাশ হবে! আমি আজীবন ঐ আলোকের অনুসন্ধান করেছি…ঐ অন্বেষণে,—অনশনে, অধ্যয়নে, নিষ্ঠায়, কঠোরতায়, শুদ্ধাচারে, শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করেছি,…ব্যর্থ, সব ব্যর্থ…! দুর্নিবার বাসনার ধার কার সাধ্য রোধ করে?…ঐ দেখ, ভৃঙ্গার, এক মূর্খ পতঙ্গ, আমারি মত আলোক অন্বেষণে ধাবিত হয়েছে,…আবার দেখ, পথে এক উর্ণনাভ কি ভয়ানক জাল বিস্তার করে তারই জন্য অপেক্ষা করছে!…ঐ দেখ, পতঙ্গ ধৃত…উর্ণনাভ ঊর্দ্ধশ্বাসে তাকে গ্রাস করতে যাচ্ছে!…আমিও ঐ আলোক প্রয়াসী পতঙ্গের মত চিত্তবৃত্তির মহাজালে আবদ্ধ হ'য়ে পীড়িত নিষ্পেশীত হচ্চি।…আত্ম প্রতারিত শাস্ত্রজ্ঞান! তুমি অসহায়, শরণাপন্ন মানবকে কল্প কল্পান্তর হ'তে আলোক মরিচিকার পথ প্রদর্শন করছ…আর ক্ষুদ্র মানব পথে নিজ প্রবৃত্তির লৌহজালে বিজড়িত হয়ে অনন্তকাল শত নির্যাতন সহ্য করছে! শাস্ত্র, তুমি মিথ্যা…মিথ্যা দর্শন, বিজ্ঞান …মিথ্যা ইন্দ্রিয় দমন, চরিত্র-গঠন…মিথ্যা শুদ্ধাচার, সংসার বর্জ্জন… ভগবান, ভগবান তুমি…মিথ্যা…

"না, না, এ হৃদয়ে আর শান্তি নাই! উদ্দাম, অপ্রতিহত বেগে বাসনা স্রোত আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেচে, আর আমি কত বিক্ষুব্ধ, উত্তাল-তরঙ্গ শীরে ক্ষুদ্র তৃণের মত উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হতে হতে চলেছি। প্রতিরোধের উপায় নাই,…যতই চেষ্টা করছি, আজীবনের রুদ্ধস্রোত আজ ততই উন্মত্ত হয়ে, উদ্বেলিত হয়ে, বালির বাঁধ বিদীর্ণ করে, উচ্ছলিত কলেবরে আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সংযম সমস্ত বিপ্লাবিত, ব্যাপ্ত করছে।…কূল নাই, ভৃঙ্গার! কূল নাই, আমি অকূলে পতিত.. আমি মহা নরকসমুদ্রে নিমজ্জিত!…

"ওই…ওই…নরক…নরক…লোলজিহ্বা নরকাগ্নি চারিদিকে হু হু জলছে! তার মধ্যে ইরাণি, তাণ্ডব নৃত্য করছে…আমায় ডাকছে,

আমায় টানছে, আমায় যেন কি অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ করেছে।...আমি এ আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করতে পারব না,...এ আবাহন আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারব না...ঐ চলে যায় ;...ইরাণি, যেওনা,...দাঁড়াও,...অপেক্ষা কর,...তোমার জন্য আমি ঐ জ্বলন্ত নরক সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করব !"

ধন্য ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া ! বাক্ মুখে তুমি সত্যই বলিয়াছ,—

"যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"

তুমি ছোটকে বড় কর পশুকে দেবতা কর। আবার,—

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসার স্থিতি কারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোহানিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।"

তুমি অতি বড় পণ্ডিতকেও মোহাবর্ত্তে বলপূর্ব্বক নিপাতিত কর। হে রাম ! ধন্য তেরি মায়া !

পদ গুলিতের মনস্তত্ব অতি চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ কিন্তু সাধারণের নিকট কিছু কঠিন। মুদ্রাঙ্কণে ভুল অত্যধিক বেশী। বাধাই, কাগজ ও অক্ষর ভাল। ক্রিয়াগুলি ঠিক ঠিক চলিত ভাষায় সর্ব্বদা রক্ষিত হয় নাই।

"স্বর্ণপাত্র ভাঙ্গিলেও তার সোনা বলি সমাদর ;
ধন নাশে জ্ঞানী জ্ঞানীই থাকেগো অক্ষয় গুণাকর ;
মূর্খের যদি হয় ধন নাশ—কিবা সে মূল্য তার ?
মাটির পাত্র ভাঙিবা মাত্র হয়ে পড়ে ধূলি সার।"

—পণ্ডিতা অবৈয়ার।

সংবাদ।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে সকলেই আশা করি, কনথল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নাম শুনিয়াছেন। যাঁহারা এই আশ্রম হইতে ঔষধাদি লইয়া যান, তাঁহাদের সংখ্যা কয়েক বৎসর দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে—গত বৎসর রোগীর সংখ্যা বিংশ সহস্রের উপর হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে যেখান হইতে ঔষধ দেওয়া হয়, তাহাতে কোনরূপে কুলাইতেছে না। উহাতে দুইটী ছোট ছোট ঘরমাত্র আছে—রোগীদের দাঁড়াইবার স্থান মোটেই হয় না, তাহার উপর অস্ত্র চিকিৎসা করিবার এবং তাহার পর ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বাঁধিয়া দিবার ঘর মোটেই নাই। এই কারণে এতদুদ্দেশ্যে একটী উপযুক্ত বাটী শীঘ্র নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে উহার জন্য যে প্ল্যান হইয়াছে, তাহাতে দশটী ঘর ও পাঁচটী বারান্দা থাকিবে (১) অস্ত্রচিকিৎসার ঘর (Operation room), (২) ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবার ঘর (Dressing room) (৩) অস্ত্রযন্ত্রাদি বাষ্পের দ্বারা শোধন করিবার ঘর (Sterilizing room). (৪) ডাক্তারের থাকিবার ঘর, (৫) পুরুষ রোগীদের বসিবার ঘর (৬) স্ত্রীরোগীদের বসিবার ঘর (৭) পুরুষ রোগীদিগকে ঔষধ দিবার ঘর (৮) স্ত্রীরোগীদিগকে ঔষধ দিবার ঘর (৯) ঔষধ রাখিবার ঘর (১০) শিশি, বোতল এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ঘর। সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০০০৲ আন্দাজ খরচ হইবে। তন্মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসার ঘর ব্যতীত অন্যান্য ঘরগুলিতে আন্দাজ ১৫০০৲ করিয়া পড়িবে, অস্ত্র-চিকিৎসার ঘরটীতে মার্ব্বেলের মেজে এবং কাঁচের ছাদ প্রভৃতির জন্য আন্দাজ ৩৫০০৲ টাকা পড়িবে। এই টাকার মধ্যে ৭০০০৲ টাকা ইতি-মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আর দশ সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় বাটীটী ভিত পর্য্যন্ত গাঁথা হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য উপস্থিত বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। আশ্রমাধ্যক্ষ মহাশয় সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এতদুদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

ইহার জন্য যিনি যাহা কিছু দিবেন, তাঁহাই সাদরে গৃহীত হইবে। অনেকে পবিত্র তীর্থস্থানে তাঁহাদের প্রিয় আত্মীয় স্বজনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে উৎসুক। তাঁহারা এক একটী ঘরের জন্য ১৫০০৲ টাকা অথবা অস্ত্রচিকিৎসা গৃহের জন্য ৩৫০০৲ এককালীন দিয়া তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের নাম সম্বলিত ফলক স্থাপন করিয়া স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে পারেন।

এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে বা অর্থ সাহায্য পাঠাইতে হইলে নিম্নলিখিত দুইটী ঠিকানায় পত্রাদি ব্যবহার করিতে পারেন ;—

(১) স্বামী কল্যাণানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনথল পোঃ, (জেলা সাহারণপুর) U. P.

অথবা

(২) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ (জেলা হাওড়া)

উজ্জয়িণী পূর্ণকুম্ভ মহামেলা।

(ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য)

অতি সমারোহে মাসাধিক কালব্যাপী অবস্থিত থাকিয়া এই মহামেলা বিগত ২১শে মে তারিখে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সাধু ও গৃহস্থগণের মধ্যে যাঁহারা চতুর্থবার এই মেলা দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহারা বলেন, এবারকার কুম্ভমেলায় অন্যান্য বারাপেক্ষা বিশেষ বিশেষত্ব ছিল। যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭।৮ লক্ষ হইয়াছিল। ১৯শে মে পর্য্যন্ত স্থানীয় আখড়াতে সাধুর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ-লক্ষের কিছু কম ছিল। পরন্তু স্নানের শেষ দুইদিন সংখ্যা আরও অধিক হইয়াছিল। এই একমাস কাল উজ্জয়িণী নগর যাত্রীর কোলাহলে, সাধুগণের পবিত্র ভজন-গীতিতে মুখরিত হইয়াছিল। রাজপথে, শিপ্রা পুলিনে ও সৈকতভূমে

কি যেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে মন প্রাণ মাতিয়া উঠিত, তাহাও যিনি কখন এই মহামেলা দর্শন করেন নাই তিনি বুঝিতে পারিবেন না। ধর্ম্মের নামে ভারতীয় মানব মনের যে পবিত্র উন্মত্ততা তাহা এই কুম্ভ মেলায় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

১৬ই মে তারিখে সন্ন্যাসিগণ এক মহতী সভা করিয়া শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মোৎসব বহু সমারোহের সহিত সম্পাদন করেন। ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মে প্রত্যহ সাধু মহা মণ্ডলীর অধিবেশন হইত। প্রায় ১০।১২ হাজার মনীষী এই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। এই অধিবেশনে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্বামী হরিহর তীর্থ মহারাজ প্রথম দিনের, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মোহন্ত শ্রীজগন্নাথ দাসজী দ্বিতীয় দিনের ও উদাসী সম্প্রদায়ের সাধু শ্রীনারায়ণ মুনিজী তৃতীয় দিনের সভাপতি ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণ মিলিত হইয়া প্রেমের সহিত যাহাতে লোক-কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োজিত হন এ সভায় বিশেষ ভাবে তাহার আলোচনা হইয়াছিল। সাধু মহাবিদ্যালয় স্থাপন, ধর্ম্মোপদেশক-সম্প্রদায় সৃষ্টিকরণ ও সমাচার পত্র প্রকাশনাদি প্রস্তাব বিশেষভাবে পরিগৃহীত হয়। ১৯শে মে সুস্ত সভানামে আর এক বিরাট সভা হয়। ডাকোরের মোহন্ত শ্রীগোকুল দাসজী তাহার সভাপতি ছিলেন।

২০শে মে উজ্জয়িনী নগর যেন এক বিশাল জন সমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। শিপ্রা নদীর ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া দত্ত আখাড়া পর্য্যন্ত—কেবল মস্তকসারি ব্যতিত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এই দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষাধিক যাত্রী আশ পাশ হইতে আসিয়া স্নানের জন্য শিপ্রাতীরে সমবেত হয়। উজ্জয়িনী গভর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে রাত্রি ২টা হইতে আরম্ভ করিয়া ২১শে মে প্রাতঃকাল ৫॥টা পর্য্যন্ত স্নান করিবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।

২১শে মের প্রাতঃকালের দৃশ্য অবর্ণনীয়, নদীর উভয় তটে যে দিকে দৃষ্টিপড়ে সে দিকে মনুষ্য ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রীষ্মের এই প্রাতঃকাল জনসমূহের সংঘর্ষণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় নব জলধর আকাশে ছত্ররূপে বিরাজিত হওয়ায়

এবং পবনদেব সংক্ষুব্ধ জন সমূহকে সুশীতল সুমন্দ বায়ু বীজন করিতে থাকায় এই ভয়ঙ্কর অবস্থা অধিকক্ষণ থাকিতে পারে নাই।

গোসাই সম্প্রদায়ের চারিটি আখড়ার (যথা,—দত্ত, জুনা, নিরঞ্জনী ও নির্ব্বাণী) সাধুগণ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে অতি ধুমধামের সহিত স্নান যাত্রা সম্পাদন করেন। সকলের আগে দত্ত আখড়ার ও পরে অন্য তিন আখড়ার সাধুগণ শোভা যাত্রায় শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করিয়াছিলেন।

বস্ত্রধারী ও কৌপীনমাত্র সম্বল সাধুগণের মধ্যে নাগাগণের এক বৃহৎ সম্প্রদায় হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। যে সকল নাগাসাধু পদব্রজে যাইতেছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে সহস্রাধিক স্ত্রী অবধূত ছিল। এই স্ত্রী অবধূতের মধ্যে বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত ছিল। একজন প্রায় দুইফুট উচ্চ নাগা মহাত্মা অপর নাগা সাধুর স্কন্ধে আরূঢ় থাকিয়া সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছিলেন।

২২শে মে সন্ধ্যার সময় শ্রীমান্ মহারাজসিন্ধিয়া আলিজাহ বাহাদুর রাজবংশের প্রাচীন প্রথা অনুসারে মণ্ডলেশ্বর এবং সমুদয় আখড়ার মোহন্তগণকে স্বীয় রাজ অন্তঃপুর মধ্যে আহ্বান করেন এবং পশমী বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন।

মেলা সমাপ্তির কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই এই বৃহৎ জনসঙ্ঘের মধ্যে কলেরার ভীষণ আক্রমণ চলিতেছিল। উজ্জয়িনী সেবা-সমিতি, মাধব কলেজ "বয়স্কাউট" এবং লস্কর, বড়নগর ও শাজাপুর সেবা-সমিতির সেবকগণ যাত্রিগণকে সর্ব্বপ্রকারের সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের দুর্ভিক্ষ কার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন গত জুন মাস হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত খুলনাবাসীদিগের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমরা সেখানকার সেবকদিগের নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, শ্যামনগর, রতনপুর প্রভৃতি গ্রামের

অধিবাসীরা যে কেবলমাত্র অনশনক্লিষ্ট তাহা নয়, তথাকার অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ একেবারে নগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা চাউল লইতে আসে তাহারা কোন রকমে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া আইসে। অবশিষ্ট প্রায় সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় গৃহে অবস্থান করে। আজকাল লোকে শাক সিদ্ধ ওল সিদ্ধ বন্যফল কলাগাছের 'বাকলো'র রস, তুষ প্রভৃতি পশুর খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এক একটি পরিবারে দুই একজন উপার্জ্জনক্ষম আর ৮।১০ জন করিয়া পোষ্য। এইরূপ বহু পরিবার অন্নাভাবে ও কার্য্যাভাবে মরিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা দুর্ভিক্ষের বিবরণ সম্বন্ধে একটি আবেদন সংবাদ পত্রে দিয়াছি।

গত জুন মাস হইতে ৪।৫ খানি গ্রাম লইয়া আমাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যক ইউনিয়নের ৫৭ খানি গ্রামে কার্য্য হইতেছে। নাকিপুরে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সংক্ষেপে কার্য্য বিবরণ দেওয়া হইল।

৬ই জুলাই তারিখে ৩৪ খানি গ্রামে ৭২৮ জনকে ৩৭ মন, ১৩ই তারিখে ৫৩ খানি গ্রামে ১০২৫ জনকে ৫১॥ মন, ২০ তারিখে ৫৭ খানি গ্রামে ১২৩৯ জনকে ৬২ মন, ২৭শে তারিখে ৫৭ খানি গ্রামে ১১৭৬ জনকে ৫৯ মণ, ৩রা আগষ্ট তারিখে ৫৭ খানি গ্রামে ১৩৫৫ জনকে ৬৮মণ ও ১০ই আগষ্ট তারিখে ৫৯ খানি গ্রামে ১৪২২ জনকে ৭১ মণ ২৪ সের চাউল দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ছয়শত টাকা খরচ হইতেছে। আমাদের বোধ হয় সেবাকার্য্য অগ্রহায়ণ অবধি চলিবে। সম্প্রতি যেরূপ ভাবে কার্য্যের বিস্তৃতি হইতেছে তাহাতে আরও অধিক অর্থ ও বস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা এই দরিদ্র-নারায়ণ সেবাকার্য্যে অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য করিয়া পীড়িতেদের রক্ষা করুণ!

নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে :—

১। উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া। ইতি—

স্বাঃ—সারদানন্দ।

কথাপ্রসঙ্গে।

যদি কোনও ধর্ম্ম বা সত্য আমরা জীবনে এবং সমাজে পরিণত করিতে পারি তবেই তাহার সার্থকতা। যদি কোনও ধর্ম্ম কেবল কথায়, পণ্ডিতজিদের গলাবাজিতেই থাকিয়া যায়, যাহার বাস্তবতা ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ব্যক্তি, সমাজ, জাতি এবং জগৎকে উন্নততর না করে, তবে তাহার থাকা না থাকার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিনা—Aliceএর Wonder Land কিম্বা আকাশকুসুমের অনুসন্ধানে ফল কি?

* * *

শাস্ত্র বলিতেছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—দৃষ্ট অদৃষ্ট সবই ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি"—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভেদ। নানা যুক্তির দ্বারা শ্রীশঙ্কর প্রমুখ মহাত্মারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু উত্তম মস্তিষ্কেরা ব্যবহারিক সত্তার দোহাই দিয়া, নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য, উপর্যুক্ত মহান্ সত্য—ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতীয় জীবনে প্রকাশ বা উপলব্ধি না করিয়া—ছুঁৎমার্গাবলম্বনে এক ঘৃণিত অভিশপ্ত সমুদ্রবৎ পশুসমাজ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবহারে দেখা যায় সর্ব্বব্যাপী অনাদি অনন্ত সত্তা-জ্ঞান-আনন্দ কেবল উচ্চবর্ণের মধ্যেই নিহিত, ঘৃণিত বলিয়া তিনি যেন নীচবর্ণ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন সাধনার প্রথম অবস্থায় ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিতেই হইবে (অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তু যে নীচের মধ্যেও আছেন একথা ভুলিতে হইবে, নচেৎ ছুঁৎমার্গ অবলম্বন অসম্ভব) পরে হঠাৎ একদিন সত্যবস্তু প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বভূতে প্রীতি ও সহানুভূতি আনিবে। কিন্তু আমরা বলি—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—যে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দ্বৈত, ভেদ ও ঘৃণার কল্পনা করে তাহার

ভেদ জ্ঞানই রহিয়া যায়, আর যে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে সচ্চিদানন্দ আত্মার একত্ব কল্পনা করে তাহারই যথার্থ সমত্ব লাভ হয়।

* * *

যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে বিভু আত্মার কল্পনা করেন, উচ্চ-নীচে শ্রদ্ধা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। তাঁহারা অসতের মধ্যেও সতের প্রকাশকে নির্দ্দেশ করিয়া পতিত ঘৃণিতদের জীবন সংগ্রামে উৎসাহিত করেন, আর ভেদদর্শীরা পক্ষান্তরে অসৎকে অসৎরূপেই চিরকাল বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায় পাছে নিজেদের মহত্ত্ব নষ্ট হয়।

* * *

যেমন বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইতে হইলে ধাতু-তন্ত্রীর প্রয়োজন, সেইরূপ মহৎ হৃদয় প্রসূত চিন্তাশক্তি মনুষ্য সমাজে প্রতিফলিত করিতে হইলে বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যই প্রধান সহায়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিগত সমস্যা সম্বন্ধে নব নব ভাবের দ্বারা আলোকিত করা। তাই বর্ত্তমান সাহিত্যের এক প্রধান উদ্দাম প্রচলিত নীচের প্রতি ঘৃণাপরতন্ত্রতা ত্যাগ করিয়া অসতের মধ্যেও যে মহত্ত্ব সম্ভব তাহা দেখাইয়া অসৎকে সৎপথে উৎসাহিত করা। পশু প্রায় ব্যক্তি সমাজে অভাব নাই কিন্তু এ কথাও মানিয়া লইতে হইবে যে উচ্চবর্ণকৃত ভীষণ অবস্থা চক্রে পড়িয়া মানুষ পশুবৎ হইয়া পড়ে—যেরূপ নানা প্রলোভনীয় অবস্থাচক্রের মধ্যে পতিত হইয়া অতি বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরাও মিথ্যা কথা বলেন কিম্বা স্বদেশীয়কে বিদেশ বিভূমে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন না। অতএব পাপ অবশ্য হেয় হইলেও পাপীর প্রতি সহানুভূতি দোষ নহে—বিশেষতঃ যাঁহারা অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনা করেন।

* *

খাদ না থাকিলে গঠন কার্য্য অসম্ভব। নিখুঁত সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা জগতে দুষ্প্রাপ্য। অসুন্দর অংশ পরিত্যাগ করিয়া কাল্পনিক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে কিন্তু মরণকে বিস্মৃতিরদ্বারা মুড়িয়া রাখিলেও সে যেমন আত্মপ্রকাশ করিবেই সেইরূপ জগতের অসুন্দর অংশ কোনও স্থলে গোপন থাকিবে না। বরং মরণকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বীরের ন্যায় অতিক্রম করিবার পথ সকলকে দেখান উচিৎ।

সেইরূপ সমাজ ও তদঙ্গের কুৎসিৎ ও অসুন্দর অংশের নির্দ্দেশ করিয়া জনসাধারণকে উহাদের অতিক্রম করিবার পথ দেখান উচিৎ। পাপ সর্ব্বথা হেয় তাই বলিয়া পাপী আমাদের বিদ্বেষ ভাজন হইবে কেন? আর তাহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশে আমাদের প্রতি মুগ্ধ হইয়া সে কিরূপে সৎপথে চলিবে? আমরা ত জানি সহানুভূতির দ্বারা বনের পশু পোষ মানে, হিংস্রক শান্ত হয়, বেশ্যা সৎপথাবলম্বী হয়, জগাই মাধাই ভক্ত হয়, গিরীশ ঘোষ মহত্ত্ব লাভ করে।

*　　　*

মানব-চরিত্র ত্রিগুণাত্মক। তমঃ গুণাবলম্বীকে হঠাৎ যদি তাহার সকল কদাচার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া যায় তাহা হইলে অভ্যাস-ত্যাগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া হয় সে অস্বাভাবিক উপায়ে মৃত্যুকেই অবলম্বন করিবে আর না হয় সৎপথে প্রবর্ত্তন অসম্ভব জ্ঞানে ভগ্নাশ হইয়া চূড়ান্ত অসৎ হইয়া উঠিবে। বরং—মহত্ত্ব যে তাহার মধ্যে তাজা অবস্থায় আছে, অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে হীন কার্য্য করিতেছে—এইরূপ সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয়ে যদি আমরা তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেখাই, তবেই তার ভবিষ্যৎ উত্থান সম্ভব হইবে। নচেৎ তাহাকে ঘৃণা করিয়া তাহার নীচত্ব দেখাইয়া তাহাকে বড় করিতে পারি না—কারণ ঘৃণার ফল প্রতিহিংসা। আচার্য্য বলিতেছেন; "তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা ইউরোপীয়েরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিয়াছে। আমি নিউইয়র্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনার্থ আসিতেছে। তাহাদের দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে, পদদলিত, আশাহীন, এক পুঁটলি কাপড় কেবল তাহাদের সম্বল কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাথের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা। এখন মজা দেখ, ছ'মাস বাদে সেই লোক-গুলিই আবার উত্তম বস্ত্র পরিহিত হইয়া সোজা হইয়া চলিতেছে সকলের দিকেই নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কিসে করিল?

মনে কর, সে ব্যক্তি আরমেনিয়া অথবা অপর কোথা হইতে আসিতেছে সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না—সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত 'তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু যদি নড়্তে চড়্তে চেষ্টা করিস্ ত তোকে পিষিয়া ফেলিব'। চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম, তুই গোলাম আছিস যা আছিস্, তাই থাক্। জন্মিছিলি যখন, তখন যে নৈরাশ্য অন্ধকারে জন্মিছিলি, সেই নৈরাশ্য অন্ধকারে সারাজীবন পড়িয়া থাক্'। সেখানকার হাওয়ায় যেন তাহাকে গুণ গুণ করিয়া বলিত তোর কোন আশা নাই—গোলাম হইয়া চিরজীবন নৈরাশ্য অন্ধকারে পড়িয়া থাক্। সেখানে বলবান্ ব্যক্তি পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিল; আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল, একজন উত্তম বস্ত্র পরিহিত ভদ্রলোক তাহার করমর্দ্দন করিল। সে যে চিরপরিহিত আর ভদ্রলোকটী যে উত্তম বস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন, সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিবার জন্য বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল—দেখিল এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতর সেও একজন মানুষ। হয় ত সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া আসিল, হয় ত সে তথায় দেখিল,—দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামসমূহ হইতে মলিন বস্ত্র পরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম—মায়াবশে এইরূপ দুর্ব্বল দাস্য ভাবাপন্ন হইয়াছিল। এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল,—মনুষ্যপূর্ণ জগতের মধ্যে সেও একজন মানুষ।" কিন্তু কৌতুক দেখ এই আমেরিকান জাতি এখন এত মহৎ কিন্তু তাহার উৎপত্তি—ইউরোপীয় নরসমাজের তথাকথিত আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়া।

মহতের কর্ম্ম অসৎকে সৎপথ দেখান, অসুরকে দেবতা করা— মহত্ত্বের ইহাই একটী প্রবল লক্ষণ। ইহার অভাব যেখানে দৃষ্ট হয় সেখানে মহত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করে নাই বুঝিতে হইবে। এক প্রকারের পণ্ডিত-মণ্ডলী আছেন যাঁহারা জ্ঞানরশ্মি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ পেটিকার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া ইতরকে অজ্ঞতার মধ্যে নিক্ষেপ করেন, অথচ ইতরেরই পরিশ্রমোপার্জ্জিত অন্নের দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছেন একথা তাঁহারা স্মরণ রাখেন না। ইহার ফল ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। নির্য্যাতিত, তথাকথিত হীন সম্প্রদায় যখন ধৈর্য্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া অসুরের ন্যায় সত্বগুণীদের স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে তখন বহুকালের চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রসূত দেবসভ্যতা, পলকে প্রলয় করিয়া জগতের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে। উচ্চ ও নীচ উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষের ফল কি ভয়াবহ উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে বর্ত্তমানের একটি রুশিয় সঙ্গীতের অনুবাদ যাহা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, উদ্বোধন পাঠকদের নিকট ধৃত করিতে আমরা ইচ্ছুক,—

"দুনিয়া জুড়ে যে জ্বলেছে অনল
আঁচে তার মোরা মুষড়ে গেছি।
গলা ছেড়ে কর চেঁচামেচি
"দমকল! দমকল!"
মুরিলোর সব ছবিগুলি
জ্বলিছে বাতাসে শিখা তুলি'।
কর্ণেই আয় রাসিনের পুঁথি তেল ঢেলে
আগুন লাগাই পথে ফেলে,
তবুও খানিক আলোকিত হবে পথের ধূলি।
'কটা' দলেদের সেপাই দেখিলে চালাবে গুলি।
র‍্যাফেলকে যদি কিম্বা পাও রাস্ত্রেলিকে,
কেউ তারা যেন হাতছাড়া হয়ে রয় না টিকে।
পুস্কিন আর তাঁরি মতো সেকেলে লেখা
ঝাড়ে মূলে ছেড়ে যাক্ আমাদের এই এলাকা।"

অজ্ঞাত-দেব-ভাব, আসুরিক মদে মত্ত রুশিয় গণশক্তির এই ত

স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত। অতঃপর তাহাদের দর্শনেতিহাস সম্বন্ধে অভিমত পাঠ করুন,—

"জার্ম্মাণী, তব ভাবরতনের যতেক পুঁজি
এই ধ্বংসের দাঁতের জাতায় দাওনা গুঁজি!
যেথানে যা আছে পুঁথিপত্তর
যত যাদুঘর সেই সকলি
বন্যাবেগের মুখে এনে দাও জলাঞ্জলি।
এসো ছোকরারা শণি দুরন্ত,
বেপরোয়া হয়ে খিঁচাও দন্ত
মরণেরে করে সাথী
কাণ্ট্-দর্শন মাড়াইয়া নাচো
তাণ্ডব তালে মাতি'।
বার করো তলোয়ার, রুশিয়া হুঁশিয়ার!!!
কেড়ে নেবার ছিনিয়ে নেবার
তৃষ্ণা তোমার কোথায় এবার?
বার করে আন্ কোথা ক্ষীণ প্রাণ
টলষ্টয়ের দলে,
বোঝা বোঝা মতবাদ জড়ো করে
লুকায়েছে তার তলে,
ন্যাংচা পায়ে পারবে না ত হাঁটিতে,
হিড় হিড় করে দাড়ি ধরে
এনে আছড়ে ফেল মাটিতে।

* * *

রুশিয়ায় টলষ্টয়, টুরগেনিভ, ডষ্টয়ভেস্কি, ল্যাভরফ, বাকুনিনের মত সদাশয় ব্যক্তি জন্মান সত্ত্বেও এ ব্যাভিচার হইল কেন? জাতীয় ক্রমবিকাশ অর্থে যখন অতীতের রক্ষা এবং বর্ত্তমানের উন্নতি, তখন অতীতের সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিতে রুশিয়া এত দৃঢ় সংকল্প কেন? কারণ অতীতের নিকট হইতে তাহারা কদাচ সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাই

আজ অতীতের সকল জিনিষই তাহাদের নিকট হেয় ও পরিত্যজ্য। তাই আমরা বলিতে চাই যে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে পাপীকে ত্যজ্য না করিয়া যাহাতে তাহারা মহতের সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ও সাহায্য পায় সেই চেষ্টাই সমধিক কর্ত্তব্য, যেন উচ্চ ও, নীচের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান আমরা সৃষ্টি না করি। পশু-প্রায় মানব সমাজের ব্যাধি স্বরূপ। ব্যাধির অন্তর প্রতিকার দ্বারা সমাজ পুষ্ট হয়; ব্যবচ্ছেদের দ্বারা শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

দিব্য-দর্শন।

(শ্রীসাহাজি)

এই যে মাটির ধরণী,
  এরে, কতই ঠেলেছি চরণে,
একি দেখি আজি, বন্ধু,
  এই, আলোকে পুলকে স্বপনে,—
মাটিতে যা আছে, সজনি,
  দেখি, তার বেশী নাই তপনে।
দেবালয়ে দারু মূর্ত্তি,
  কভু, করিনি ব্রহ্ম ভাবনা,
পূজিনি পুতলি, বন্ধু,
  তবু, জাগে আজি একি চেতনা,—
ব্রহ্মে, দারুতে অভেদ,
  ওরে, প্রভেদ কোথায়, কহ না ?
মৃণ্ময়ী বলি ভ্রমেও
  কভু, নোয়াইনি মাথা যেখানে,
চিন্ময়ী, দেখি চাহিয়া,
  সেথা, আলো করে আজি গোপনে,
নরের মাঝে নারায়ণ,
  সখি, তাই দেখি আজি ধেয়ানে।

গৌতম বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

১। জাতীয় জীবনের অতীত যুগের ইতিহাস যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই দুইটী বিশিষ্ট মূর্ত্তি মানসপটে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। ইহাদের বৈশিষ্ট এমনই পরিস্ফুট যে ইহাদের সমান ধর্ম্ম আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তিতে মানবজাতির ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গৌতমবুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য ভারতাকাশের দুইটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র—ভারতের সাধনা ও সিদ্ধির দুই মহান জ্যোতিঃস্তম্ভ। অতীত যুগের ইতিহাস আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—এই দুই মহামানব, মানব জাতির পরম ও চরম লক্ষ্যের দীপ-শিখা মাথায় লইয়া—জলধিতীরস্থিত আলোকস্তম্ভের ন্যায় সংসার সাগর যাত্রী ভবিষ্যমানবের মহাপ্রয়াণের পথ প্রদর্শনের জন্য। কল্যাণের পথে, জ্ঞানের পথে, ইঁহারা মানব-জাতিকে কতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, মানব জাতির চিন্তা স্রোতকে ভাবের কোন্ তুঙ্গশিখরে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহার সম্যক পরিচয় লইবার সময় এখনও বহুদূরে অবস্থিত।

২। গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান উত্তর ভারতের উত্তর সীমান্তে—শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে। একজনের জন্ম রাজপ্রাসাদে, রাজোচিত ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—অপরের জন্ম চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে। বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, শক্তি ও স্বাধীনতার ক্রোড়ে একজন পালিত ও বর্দ্ধিত—অপরের পুষ্টি শাস্ত্রের সহস্র বিধিনিষেধের মধ্যে। বুদ্ধদেব ২৯ বৎসর বয়সে গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আচার্য্যদেব অভুক্ত বৈরাগী গার্হস্থ্যজীবনের ত্রিসীমার বহির্ভূত। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ ৩৫ বৎসর বয়সে, তিরোধান ৮০ বৎসর বয়সে—আচার্য্যদেবের ৩২ বৎসর বয়সে জীবনলীলার অবসান।

৩। জীবন প্রণালীর পার্থক্য আকাশ পাতালের মত। একজনের জীবনে গতির প্রারম্ভ স্বাধীন চিন্তায়, অপরের শাস্ত্রচর্চ্চায় ও শাস্ত্র বিচারে। কিন্তু উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ এক, ব্রতও এক। নিজের মুক্তি ও জগতের হিত। উভয়েই নিজনিজ সাধনার বলে ও তপস্যার প্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের স্তূপীকৃত ভেদরাশি ঠেলিয়া ফেলিয়া মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও দেশ কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া উভয়েই বীরের মত প্রবেশ করিয়াছেন—অদ্বৈতের দেশে, লীলার দেশ অতিক্রম করিয়া নিত্যের দেশে, ইন্দ্রিয়ের অধিকার ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে, মৃতের রাজ্য ছাড়াইয়া অমৃতের পারাবারে—অমৃতের অসীমসাগরে অবগাহন করিয়া উভয়েই জীবনের লক্ষ্যে পৌছিয়াছেন, নামরূপ হারাইয়া ব্যষ্টি জীবনের গতি শেষ করিয়াছেন।

৪। কিন্তু কোন্ এক অলঙ্ঘ্য প্রকৃতির অনুশাসনে, উভয়েই ফিরিয়া আসিয়াছেন—শোকদুঃখময় বাস্তব জগতের মধ্যে। উভয়েরই মুক্ত আত্মা মুক্তির আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্মের বন্ধন গ্রহণ করিয়াছে। উভয়েরই আমরণ প্রযত্ন জগদ্ধিতায়, সর্ব্বমুক্তির জন্য সমষ্টি জীবনকে অগ্রসর করিয়া দিতে। বুদ্ধদেব ফিরিয়া আসিয়াছেন একখানি করুণা-স্নিগ্ধ হৃদয় লইয়া, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন লইয়া; সঙ্কল্প—ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন—হিংসা ও ভেদক্লিষ্ট মানব সমাজকে অহিংসার ঐক্য মন্ত্রে দীক্ষিত করা অমৃতের দ্বার সকলের নিকট খুলিয়া ধরা। আচার্য্যদেব ফিরিয়াছেন একখানি ব্রহ্মময় অহং ও শানিত বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া। জীবনের প্রতিপরমাণু ব্রহ্মানুভূতির এক তারে বাঁধা; সঙ্কল্প—বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। অমোঘ যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ বলে ব্রহ্মানুভূতিকে বুদ্ধির স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানব চিত্তভূমির সহিত তাহার যোগ স্থাপন করিয়া দেওয়া।

৫। শিক্ষা ও সঙ্কল্পের পার্থক্য উভয়ের কর্ম্মজীবনে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। বুদ্ধদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের বিকাশ—হৃদয়বত্তায়, ভাবের গভীরতায় ও বিশাল কর্ম্মপ্রেরণায়; আচার্য্যদেবের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট—

সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম মন্থনে ও বুদ্ধির প্রখরতায়। বুদ্ধদেব স্বাধীন চিন্তার পুরোহিত—আচার্য্যদেব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর প্রতিনিধি। একের চরম প্রমাণ আত্ম-প্রত্যয়—অপরের আত্ম-প্রত্যয় শাস্ত্র নির্দ্দেশ ও জাতি প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত,—চরম প্রমাণ, শাস্ত্র। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব এক অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন এবং এক নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন—আচার্য্যদেব বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, বৈদিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। বুদ্ধদেব জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া জনসাধারণের ভাষায় জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রচার করিয়াছেন —আচার্য্যদেব বিদ্বৎসমাজের কাছে দর্শনের ভাষায়, বিজ্ঞানের আকারে প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের বীরবাণী স্নিগ্ধ মধুর করুণরসাত্মক, সংসারী মানবের সুখদুঃখের সহানুভূতি ব্যঞ্জনা দ্বারা সিক্ত, দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় তাহা পতিত জনেরও জীবন পবিত্র করিয়া দেয়— আচার্য্যদেবের বাণী তরল বহ্নির মত তেজোময়ী—তাঁহার নিশ্বাসের প্রকম্পনে মায়ার সংসার ভস্মীভূত হইয়া উড়িয়া যায়। বুদ্ধদেব প্রেম ও নীতির জগতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন—আচার্য্যদেবের প্রভাব তত্ত্ব ও বুদ্ধির জগতে।

৬। তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে বুদ্ধদেবের প্রচার সাধনার দিক হইতে—আচার্য্যদেবের প্রচার সিদ্ধির দিক্ হইতে। বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম ও কর্ম্ম সমন্বিত সাধনাময় জীবন গঠন—আচার্য্যপাদের লক্ষ্য তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা, একটা সমন্বয় ভূমি আবিষ্কার করা। চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেব মৌন রক্ষা করিয়াছেন—চরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই আচার্য্যের প্রধান কীর্ত্তি। একজন সেখানে নির্ব্বাক—সেইখান হইতেই অপরের বাণীর উদ্ভব। বুদ্ধদেব বিশ্বকে তুলিয়া ধরিয়াছেন বিশ্বাতীতের দিকে— আচার্য্যদেব বিশ্বাতীতকে টানিয়া আনিয়াছেন বিশ্বের কাছে। এক জনের গভীর মৌন বিশ্বাতীতকে দূরে রাখিয়াছিল—অপরের মুখর বাণী তাহাকে নিকটতম করিয়া ধরিয়াছে।

মর্ত্ত ছুটীয়াছে স্বর্গের দিকে—স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে মর্ত্তের দিকে। সাধনা ও সিদ্ধি, নীতি ও তত্ত্ব, কর্ম্ম ও জ্ঞান মানব জীবনে ধরা দিয়াছে।

মনে হয় উভয়ে উভয়ের পরিপোষক ও পরিপূরক। যেন একই আত্মার দ্বিবিধ বিকাশ।

৭। জাতীয় জীবনের ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী, কেননা শঙ্করাচার্য্যই বৌদ্ধগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টি ও প্রচারের প্রকৃত ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে উভয়েই যুগোপযোগী কর্ম্ম প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা ভারতের সনাতন জীবনাদর্শেরই সংরক্ষণ ও প্রচার করিয়াছেন। উভয়েই একই লক্ষ্যের বাহক ও প্রচারক। বুদ্ধদেবকে শাস্ত্রসীমানার বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রচার করিতে হইয়াছে—আচার্য্যদেবকে শাস্ত্রেরই প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রের পক্ষই সমর্থন করিতে হইয়াছে। বৈদিক সমাজের বাহিরে দাঁড়াইয়াও বুদ্ধদেব এই স্বরূপগত সত্যের প্রভাবেই পরবর্ত্তী কালে অবতার বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ জাতীয় জীবনের উপাস্য আদর্শের প্রতীকরূপে পরিণত হইয়াছে।

৮। মানব জাতি এই দুই মহাপুরুষকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রণিধান যোগ্য। বিশাল কর্ম্মপ্রেরণা ও বিশ্বপ্রেমের প্রভাবে গৌতমবুদ্ধের আত্মা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে নূতন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পৃথিবীর প্রতি কোণে তাহার ধাক্কা লাগিয়াছিল। সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইলেও আজিও অর্দ্ধ পৃথিবী তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীতে তাঁহার প্রতি মানব জাতির শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের তথা বৌদ্ধধর্ম্মের যাঁহারা চির বিদ্বেষী তাঁহারাও বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের কাছে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বুদ্ধদেবের আদর্শ মূর্ত্তি বিশ্বমানব চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৯। আচার্য্যের আত্মা শাস্ত্রের অর্গলবদ্ধ মন্দিরে ধ্যানমগ্ন। শাস্ত্র-

জীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকায়, তাঁহার প্রখর প্রতিভা শাস্ত্রের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। মানব সাধনার যে তুঙ্গ শিখর হইতে তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, বর্ত্তমান পৃথিবীর চিত্তভূমি তাহার বহু নিম্নে অবস্থিত। ভারতের বাহিরে কচিৎ কোনও পণ্ডিত এক-আধটু আলোচনা করিলেও, আচার্য্যের দর্শন তাঁহাদের কাছে প্রহেলিকামাত্র। আচার্য্যের চিত্ত-মন্দিরে প্রবেশের যে দুর্গম পথ, তাহা চলিবার উপযুক্ত জ্ঞান ও নির্ভীকতা তাঁহাদের নাই।

১০। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এই দুই মহাপুরুষ কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ আদর্শ ভারতবর্ষে একবার প্রকট হইয়াছিল, জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রে ও সমাজে সম্যক পরিগৃহীত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ভারতের তাহাই শ্রেষ্ঠসম্পদ, গৌরবের অবদান। সম্রাট অশোকের পরই সে গৌরব রবি অস্তমিত হইয়াছে। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া জাতি-স্মৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতমাতা তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানের এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সম্প্রদায় প্লাবিত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অনস্তিত্ব বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু তাহার কারণও রহিয়াছে। বুদ্ধদেব স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপ্রত্যয়কে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, জাতিপ্রত্যয় বা শাস্ত্রপ্রমাণকে স্বীকার করেন নাই। আত্মপ্রত্যয়কে সম্মুখে ধরিয়া জাতীয় জীবন-ধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে পারেন নাই—জাতির জীবন-ধারার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। জাতির অতীত জীবনের সঙ্গে সমন্বয় না রাখায় জাতির ভবিষ্যৎ জীবনে স্থান পাইতে পারেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবের পর ভারতবর্ষে একটা ভাবের বন্যা, জ্ঞান ও কর্ম্মের উচ্ছ্বাস আসিয়াছিল বটে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয় তাহার সফলতার মূল কারণ। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সফলতা বিদ্রোহী রাজপুত্রের অথবা বিজাতীয় রাজার রাজনৈতিক সফলতার মত ক্ষণিকা কিন্তু বুদ্ধদেবের অবতারীকৃত আদর্শ-মূর্ত্তি জাতি-চৈতন্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ও থাকিবে।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলুপ্তি ইহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে জাতীয় জীবন ধারার সঙ্গে যে সব প্রতিষ্ঠানের যোগ নাই অথবা যে সকল প্রতিষ্ঠান জাতীয় জীবনের স্বরূপের অঙ্গীভূত হইতে পারে নাই, তাহাদের বিলয় অবশ্যম্ভাবী।

১১। শঙ্করাচার্য্য বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারক ও প্রতিনিধি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির যুগে, যখন অপধর্ম্মসমূহ প্রবল হইয়া ধর্ম্মবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, আচার্য্যদেব অলোকসামান্য প্রতিভাবলে সেই বিপ্লবের গতিরোধ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপধর্ম্মের বিনাশ, বৈদিক মোক্ষমার্গের উদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অদ্ভুত কীর্ত্তি। বৈদিক সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, এবং ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু সমাজ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে এইভাবে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা, ভারতের সকল সম্প্রদায়ে তাহা সম্যক আদৃত হয় নাই। তিনি সর্ব্বত্র বিজয়ী বীরের সম্মান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যে শক্তির সাহায্যে এই বিজয় লাভ অদ্বৈতবাদরূপ সেই শক্তি সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় নাই। হিন্দুসমাজ তাঁহার জীবনের কর্ম্মভাগকে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশরূপ কর্ম্মের ধ্বংসাত্মক ভাগকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানভাগকে, জ্ঞানের গঠন ভাগকে সেই ভাবে গ্রহণ করে নাই। তাঁহার 'জগদ্‌গুরু' উপাধির সার্থকতা রক্ষিত হয় নাই। অধিকাংশ শাস্ত্রীয় সম্প্রদায় তাঁহাকে সম্যকরূপে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে। অনেকেই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং সততই নিরাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সন্দেহের মধ্যেই এমন একটা গভীর সত্য নিহিত ছিল যাহা ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যদের মধ্যে ভাবের ঐক্য দেখাইয়াছে।

১২। বুদ্ধদেব শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের জীবন শাস্ত্র-সর্ব্বস্ব। যে প্রদীপ্ত প্রতিভা ও গভীর সত্য দর্শন একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া জগতে জ্ঞানবীরের প্রাপ্য সম্মান অর্জ্জন করিতে পারিত, সেই ব্যক্তিত্বের মহিমা শাস্ত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধদেব জাতি-

প্রত্যয়কে বরণ না করিয়া বিশ্বকে বরণ করিয়াছিলেন। প্রেম ও নীতির জগতে যে মহনীয় রসমূর্ত্তি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবজাতির অন্তররাজ্যে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্যদেব স্বাতন্ত্র্য উপেক্ষা করিয়া বিশ্বকে না চাহিয়া জাতিপ্রত্যয়কে, বৈদিক সমাজকে বরণ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-জগতে তিনি যে অপূর্ব্ব বীরমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া বিশ্ব-মানবের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

১৩। বর্ত্তমান ভারতের ভাবজগতে বুদ্ধ-আত্মার প্রেরণার প্রভাব নিতান্তই কম নয়। বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট মূর্ত্তি বৈষ্ণবরসমূর্ত্তিতে বিলীন হইয়া বহুকাল হইল জাতিচৈতন্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার প্রেম, কর্ম্ম ও জ্ঞানময় জীবনের পরিশুদ্ধ আদর্শ-মূর্ত্তি প্রেমিক কর্ম্মযোগীর বেশে জাতিচৈতন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটা স্পষ্ট প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আচার্য্যদেবের প্রেরণার প্রভাব সবেমাত্র অনুভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে উদাত্ত সুর ও তেজোময়ী বাণী জাতি-হৃদয়ে তুল্য প্রতিধ্বনি না পাইয়া মন্দির-প্রাঙ্গনে শাস্ত্র ও বিদ্যার কঠিন কারাগারে আবদ্ধ ছিল, আজ তাহার মুক্তির দিন আগতপ্রায়। যে অদ্বৈত-ব্রহ্ম-বৈদিক-ঋষির সমাধিমগ্ন চিত্তে চকিতে প্রতিভাত হইয়া ছিল, বুদ্ধির স্তরে যাহার প্রতিষ্ঠা—আচার্য্যদেবের জীবন ব্রত, বর্ত্তমান ভারতের ভাব-জগতে তাহা যেন স্বতঃস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। ধ্যানলব্ধ শাস্ত্র দৃষ্টি সহজ জ্ঞানের মধ্যে ধরা দিতেছে, আত্মিক জ্ঞান বুদ্ধির স্তরে নামিয়া আসিতেছে। ব্যবহারিক জগতে তাহার কার্য্যকারিতার, সত্তাবার্তার পরিচয় পাইয়া ভাবুক কর্ম্মীর হৃদয় এই আকস্মিক জ্ঞানপ্লাবনে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান ভারতের আদর্শকে যাঁহারা মূর্ত্তি দান করিয়াছেন, তাঁহারা গৌতম বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য এই দুই যুগাবতারের আপাতঃ দৃষ্টিতে বিরোধী সাধনাকে একাধারে কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। এই মহাসমন্বয়লব্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ইহা ভাবিতে পারা যায় যে, যে আত্মা বুদ্ধরূপে শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়াছিলেন, চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে

মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই আত্মাই পূর্ব্ব যুগের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আচার্য্যের বেশে শাস্ত্র ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাল ও কালগত বৈচিত্র্য বিলোপ করিয়া আজ ভাবিতে পারা যায় গৌতমবুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই ভারতের সনাতন আদর্শের বিধারক, সংরক্ষক ও প্রচারক।

১৪। বিজাতীয় শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বর্ত্তমান ভারতের চিত্তভূমি এতটা নামিয়া গিয়াছে যে নির্ব্বাণ ও মোক্ষের নামে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—নির্গুণ ব্রহ্মবাদের নামে তাঁহাদের আত্মা শিহরিয়া উঠে, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্যের নামে অনেক শিক্ষিত লোক এজন্য খড়্গহস্ত। তাহাদের ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়্গগুলি স্বহস্তেই নিবদ্ধ থাকিবে। হিমাচলের বক্ষে বামনের পদাঘাতের মত তাহাদের প্রযত্ন কৌতুকেরই যোগ্যরস সৃষ্টি করিবে। যাঁহারা সনাতন আদর্শের বিধারক ও প্রচারক মানবজাতির অন্তর্জ্জগতে তাঁহারা স্বমহিমায় নিত্য বিরাজমান। মানবসমাজ তাঁহাদের জীবন-স্মৃতির পূজা করিতে বাধ্য।

স্বামিপাদ শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্মরণম্।*

(শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য)

(সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ)

যদা ধর্ম্মো গ্লানিং বহতি বহুধা দুর্গতিবশাৎ
অধর্ম্মা বর্দ্ধন্তে জগতি জনদুঃখায় মহতে।
তদা দীপ্তপ্রেমা কিমপি বপুরাধায় ভগবান্,
বিনেতুং দৌর্গত্যং চরতি সুচিরং ক্ষৌণিবলয়ে।
স্বদেশৈকপ্রীত্যা বিমলতমনীত্যা প্রথিতয়া
কয়াচিদ্ বিখ্যাতো জগতি বহুমানং খলু ভজন্।

---

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর শ্রীবিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভায় পঠিত।

যত্র কঃ সৌভাগ্যাদজনি ধরণৌ ভারতনৃণাম্
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ॥
বিদিত্বা বেদান্তং বিবিধবিধিশান্তং সুমনসাং
তপঃ স্মারং স্মারং মুনিনিয়মসারং পরিচরন্।
চরন্ দেশে দেশে নিরদিশদহো তত্ত্বমতুলম্
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ॥
যদীয়ো বেদান্ত প্রথম নবসিদ্ধান্তমহিমা
হিমার্ত্তানাং দীপ্তো রবিরিব দদে শান্তিমসমাম্।
য একঃ প্রোদ্দীপ্ত প্রতিভয়জড়ং ধর্ম্মমতনোৎ,
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ।
পবিত্রে চারিত্র্যো নিরবধি বিনীতেন বিধিনা
সুবিজ্ঞাতো লোকে বিবিধবিধিমার্গানুপদিশন্।
মহামোহধ্বান্তং সপদি লয়মানীয় মহসা
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ॥
গুণনামাধারঃ শুভচরিতসারো যতিবরঃ
প্রসারং ধর্ম্মাণাং বিদধদপি পারে জলনিধেঃ।
নিধিং শাস্ত্রাম্ভোধেরনুগুণগুণং যঃ সমতনোৎ,
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ॥
বহূনাং শিষ্যাণাং গুরুরমরধামাতিথিরভূৎ
সমুদ্দেশ্যং লোকে সুচিরমুপদেষ্টুং ব্যবসিতঃ।
তমাদর্শীকৃত্য প্রচরতি সতী শিষ্যসমিতিঃ
ততো জীয়াদেষা সকলশুভসম্পাদনপরা॥
জীয়াৎ স্বামিবরস্য ভূমিবলয়ে ধর্ম্মোপদেশাবলী,
জীয়াদ্ গৌরবদীপ্তভত্ত্ববিভবঃ প্রাচীনশাস্ত্রাশ্রয়ঃ।
জীয়াৎ স্বামিবিনীতশিষ্যসমিতিঃ সর্ব্বোচ্চভাবপ্রিয়া,
জীয়াদ্ ভারতভূতলং সুবিপুলং জন্মাবনী স্বামিনঃ॥

বিশ্বজনীনতা।

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য মিত্র বি, এ।).

"মহাশয়, আপনার অপূর্ব্ব বাণী আজ সমগ্র আথিনীয় রাজ্য তোলপাড় করিতেছে, আপনি কোন্ দেশের লোক, কোথায় আপনার বসতি—আমার জানিবার জন্য বড় ঔৎসুক্য হইয়াছে, কৃপা করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তরদানে বাধিত করিবেন কি ?"

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির ব্যগ্রতা দেখিয়া উপদেশরত মনীষী, মহাত্মা সক্রেটীস একটু থমকিয়া গেলেন—তাঁহাকে একটু অপ্রতিভ হইতে দেখা গেল ! কিন্তু কি করিবেন,—প্রশ্নকর্ত্তার সমগ্র মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া একটা প্রবল ব্যাকুলতার এবং পরম হৃদ্যতার ভাব পরিস্ফুট দেখিয়া, মহাত্মাকে উত্তর দিতে হইয়াছিল। শান্তভাবে সহাস্যবদনে সক্রেটিস বলিলেন—"আমার কোন্ দেশে বাস জানিতে ইচ্ছুক হয়েছেন ?—তা মহাশয়, আমি এই বিশ্বেরই একজন বাসিন্দা"।

পাশ্চাত্যজগতে ইহাই হইল চিরবিশ্রুত বিশ্বজনীন ভাবের কুলজী—প্রথম সূচনা—পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিতে পাই। তাই পূর্ব্বোক্ত উক্তিটা প্রতীচীর ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে সযত্নে লিখিত রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা মহতেরই উপযুক্ত মহনীয় উক্তি !

সক্রেটিসের সুরে সুর মিলাইয়া আজ অনেকেই বিশ্বজনীনতার জয়-গান গাহিতেছেন—বিশ্বজনীনতার লীলাস্থল এক নবরাজ্যের কল্পনায় তাঁদের প্রাণ আজ মাতোয়ারা—ভরপুর—আমরা বলি, উহা বাস্তবে পরিণত হইলে বাস্তবিকই মানবের সমূহ-কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী, পৃথিবীতে মৈত্রী-করুণা-সাম্যের নূতন মধুচক্র রচিবার তোমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হউক ! বর্ত্তমানের চাঞ্চল্য-রেষারেষির যবনিকাপতনের অবসানে আমাদের সবাকার চিরকাঙ্খিত বিশ্বেতিহাসের সেই শুভ-সুন্দর পরিণতি সন্দর্শনে আমরা মানবজন্ম সফল করিবার জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র—

নয়ন-মন ভরিয়া বিভিন্ন জাতিরূপ বহুসন্তানপরিবৃতা বিশ্বজননীর সেই অপরূপ শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইব—তাই মনে হয়, প্রতি জাতীয়-ইতিহাসের ভাগ্যনিয়ন্তা শ্রীভগবানের অস্ফুট আহ্বানবাণী যেন আজ সকল জাতির নেতাদিগকে ঐ উদ্দেশ্যে ডাক দিতেছে—'সর্ব্ব জাতীয় সঙ্ঘের' (League of Nations) ইহাই হইল প্রধান সমস্যা।

সেই জন্যই ব্যষ্টিভাবে, সমষ্টিভাবে এই বিশ্বজনীনতার বিষয় ভাবিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে—আমাদিগের বক্তব্য কি?

সার্ব্বজনীনভাবে পৌঁছিয়া সকল জাতির মানুষকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে যখন প্রকৃতই আমরা সক্ষম হইয়া উঠিব সেটী আমাদের জীবনে বাস্তবিকই একটী শুভদিবস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। উহা যে একটী শ্লাঘনীয় আদর্শ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের নাই। জীবনব্যাপী সাধনার উহাই শ্রেষ্ঠ সাফল্য। কিন্তু একটী কথা আছে। প্রথমকার এবং মাঝখানের ধাপগুলি না ছুঁইয়া একেবারে মাটিতে দাঁড়াইয়া করামলকবৎ চন্দ্রমা পাইবার ন্যায় অত্যুচ্চ শিখরে পৌঁছাইবার প্রয়াস অনেক সময়ে সুলভ চপলতার পরিচায়কমাত্র হইয়া থাকে, চাই কি প্রায়শঃ বাতুলতার লক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—একথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। বিশ্বজনীন হইতে গেলে তার জন্য শিশুকাল হইতেই একটা বিশেষ পৃথক সাধনা, ভূয়োভূয় প্রয়াস ও পরিশ্রমের আবশ্যক। সে শিক্ষা-দীক্ষা চপল বিশ্বজনীনদিগের মধ্যে অনেকেরই নাই। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি জাতীয়ভাব-রূপ মধ্যমসোপান না মাড়াইয়া একেবারে সার্ব্বজনীন হইতে পারেন তিনি আমাদিগের নমস্য—তবে সাধারণের পক্ষে উহা সব সময়ে সম্ভব হইতে পারে না—ঐরূপ ব্যক্তি "লাখে না মিলয়ে এক"—কারণ অতিমানবের (ইহাই ইঁহাদের উপযুক্ত আখ্যা) সংখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে বাস্তবিকই অল্প।

আমাদিগের মনে হয় জাতীয়ভাবরূপ সোপান অবলম্বনেই আমরা আমাদের আদর্শ সার্ব্বজনীন জীবন লাভে ধন্য হইতে পারি। জাতীয়তাই আমাদের বিশ্বপ্রেমরূপ মহাসাগরসঙ্গমে লইয়া যাইবার তরণী—আদর্শ—লক্ষ্য কিন্তু সেই। ঐ কারণেই আমরা যখন দেখি কোন চপল যুবক 'ভুঁইফোঁড়ের'

ন্যায় কিয়োটো, হইতে চিলী পর্য্যন্ত বাত্যাহিতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর সকলকে বিশ্বজনীনতার উপদেশ দিয়া অনুক্ষণ বলিতেছে—"স্বদেশ বলিয়া আবার কিছু আছে নাকি,—ওরে সঙ্কীর্ণমনা?"—তখন আমরা বেশ বুঝি যে ইহা সাধনসাপেক্ষ—মনের উদারতা-জ্ঞাপক উক্তি নহে। ঐরূপ যুবক আমাদের সকলের হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। অস্মদ্দেশে আজিকার দিনে যে বিশ্বজনীনতার নব-হিল্লোল উঠিয়াছে তাহাতে যুবকজনের চপলতাই বেশী দেখিতে পাই।

পাশ্চাত্য ইতিহাসের আরও দু একটা দৃষ্টান্ত ইঁহাদের মধ্যে অনেককে গর্ব্বভরে আবৃত্তি করিতে দেখা যায়। যখন বহিঃশত্রু আসিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত, যখন জার্ম্মাণির রাষ্ট্র, সমাজ—সকল ক্ষেত্রেই এক বিরাট আন্দোলন, চাঞ্চল্য ও ভাঙ্গণের ভীষণ রব উঠিয়া সকল প্রাণে আতঙ্ক আনিল—সেই সময়ে স্বদেশ স্বজাতির সকল কল্যাণ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে হিগেলের ন্যায় মনীষী দার্শনিকের, গ্যেটের ন্যায় কল্পনাপ্রিয় নাট্যাচার্য্যের এবং লেসিঙের ন্যায় উচ্চদরের কবির পক্ষেই বিশ্বজনীনভাবে ভরপূর হইয়া আত্মচিন্তায় রত থাকা শোভা পায় এবং উচ্চকণ্ঠে প্রচার করা চলে যে স্বাদেশিকতা একটা "বীরোচিত দুর্ব্বলতা" (Heroic weakness)। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই সার্ব্বজনীনতা সত্য সত্যই জীবনে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে সাধারণের উহা পথ নহে—মার্কিন ঐতিহাসিক মায়ার্সের এ মত সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সার্ব্বজনীনতার আবরণে অনেকেই এক নূতন প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমাদিগের মনে হয়, ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে আমরা প্রত্যেকেই বিধাতার কোন এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই এক বিশেষ পরিবারে, এক বিশেষ সমাজে ও এক বিশেষ জাতির মধ্যে জন্ম লইয়াছি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাই পরিবার-গত, সমাজ ও জাতিগত কতকগুলি সংস্কার ও পরম্পরাগত জনশ্রুতির উত্তরাধিকারী হইয়াছি। আর ইহাও দেখিতে পাইব যে আমাদের পূর্ব্বকালের

জাতীয়-ইতিহাস সর্ব্বদা উন্নতির একটা বিশিষ্ট পথের ইঙ্গিত্ করিতেছে—একমাত্র জাতীয়ভাবে ভাবিত হইলেই আমরা অতীতের উপদেশ ও বাণী সঠিক প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিব। আর তা ছাড়া ইহা যেন প্রকৃতির নিয়ম বলিয়াই বোধ হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে আপনার পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর সকল সমস্যা-সমাধানে আত্মনিয়োগ করুক্। সে নিয়মের ব্যতিক্রম অতি-মানবদিগের জীবনে দেখা গেলেও সাধারণপক্ষে প্রযোজ্য নহে। প্রকৃত আত্মজ্ঞানীদের কথাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তাঁদের পক্ষে স্বাদেশিকতা ও বিশ্বজনীনতা এ দুটীর কোনটিরই কিছু মূল্য নাই। সেই জন্য মনে হয়, সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে যাঁরা ঠিক ঠিক জাতীয় মন্ত্রের বীর-সাধক তাঁদেরই বিশ্বজনীন হওয়া সাজে।

প্রশ্ন হইতে পারে জাতীয়ভাবটী কি? জাতীয় ভাবের প্রকৃত দ্যোতনা কোথায়? এক্ষেত্রেও পূর্ব্বকথিত অনুরূপ বা ততোধিক সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর কোন জাতির ক্রোড়ে আপন জাতীর সকল বৈশিষ্ট্য ও পৃথক্ সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া যাঁরা বিশ্বজনীনতার বড়াই করেন তাঁহাদের সে কার্য্য কোনরূপেই প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আবার, আমরা অপর জাতির সহিত মিশিব না, অপরের সদ্গুণ শিখিব না, অপরোদ্ভাবিত উপায়-প্রণালী গ্রহণ করিব না,—মনের এইরূপ ভাবও অত্যন্ত দূষণীয়। ভারতভূমিতে আজি এই যে প্রাচ্য-প্রতীচীর মিলন হইয়াছে ইহাতে উভয়কেই, বাঁচিতে হইলে আদান-প্রদাম করিতে হইবে। আর তা ছাড়া অতীত-ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিয়া বলিব—ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণভাব চিরকালই উন্নতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রাচীন ও আধুনিক সকল সভ্যতাই এই আদান-প্রদান নীতি পালনে পুষ্ট ও উন্নত হইয়া আসিয়াছে। আবার রাষ্ট্রজীবনে এই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা অকল্যাণের উৎস হইয়া এক ভীষণ রাক্ষস-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ইউরোপের ইতিহাস (যেখানে রাষ্ট্র জীবনের মূলমন্ত্র) তাহার সাক্ষ্য। ইহারই বশবর্ত্তী হইয়া একজাতি আপন ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিস্তারকল্পে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগের

প্রতি অন্যায়ভাবে পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী কুরুক্ষেত্রের অবসানে উদার জাতীয়ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জাতীয়তার প্রকৃত প্রাণের-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিতেছেন—"Live and let live—let that be our motto." । আমরা বলি, 'বাঢ়ম্'!

শেষ কথা, আজিকার সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আমাদিগের সকলক্ষেত্রে সকল ভুলভ্রান্তিই দেখিতেছি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার পরিণাম। ঐ সকলের নিরাকরণের একমাত্র উপায়—উদার ব্যক্তিবাদ ও বিশ্বজনীনভাবের প্রসার। তাই বলি, কবির প্রার্থনা পূর্ণ হউক,—

"ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে
দেখ তা'রে সর্ব্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে
দেখ তা'রে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে
ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তা'রে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ
ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।"

অসীম - সসীম।

(শ্রী—)

আজন্ম ছুটেছে জীব,
উর্দ্ধশ্বাস বিঘূর্ণিত,
অণুপুঞ্জ দেহ বহি কার অন্বেষণে ?

চতুর্দ্দিকে যাহা পায়,
মুহুর্মাত্র স্বাদি তায়,
ত্যজি,—ভাবে অতি ক্ষুদ্র অভাব পূরণে !
পুনঃ গতি হেন ধারা,
জনমি জনমি সারা,
'হ'লনা, হবেনা, দুঃখে চিন্তে মতিমান্'।
প্রবৃত্তি, বাসনা, আশা,
বহু সম্ভোগ পিয়াসা,
দুর্জ্জয়, অতৃপ্ত ! তবু দিয়েছে সন্ধান :-
আমি আদি, আমি অন্ত,
আমি মধ্যে হই শান্ত,
মহান্ আশ্রয়ে এক রয়েছি কণিকা :
অনন্ত, চেতন—অন্তঃ,
বহিঃ—জড়, স্থূল ভ্রান্ত,
অসীম-সসীম দ্বন্দ্ব জীব প্রহেলিকা।
ধর্ম্ম, শ্রী, সৌন্দর্য্য তত,
অসীম বিকাশে যত,
সসীমের সীমা লঙ্ঘি পায় পূর্ণ প্রাণ।
হেথা হ'তে বহে ধারা,
"প্রেম" নাম দেয় তা'রা,
অসীম সসীমে প্রেম, সাজে আলিঙ্গন !
দ্বন্দ্বহীন ব্যবধান,
করেছে যে আস্বাদন,
প্রেমরূপ যথা তথা আপন বিকাশ,
ধন্য মানি হেন জীব,
অনন্য হয়েছে শিব,
জগৎ হৃদয়ে নিত্য স্থাপিত আবাস।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল, ২৯শে জুন ও ১১ই জুলাইএ স্বামিজীর লিখিত ইংরাজী পত্রগুলির কোন অংশ বাদ না দিয়া সমগ্র অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। কোন কোন সংস্করণে এইগুলির মধ্যে উপদেশপূর্ণ অংশগুলি মাত্র বাছিয়া বাছিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের সমগ্র পত্র প্রকাশের কারণ,—যথার্থ তথ্যপূর্ণ জীবনচরিত রচনার পক্ষে কোন ব্যক্তির লিখিত পত্র যেরূপ সাহায্যকারী, আর কিছুই তদ্রূপ নহে। বিশেষতঃ, উহা দ্বারা সেই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ের চিন্তা ও কল্পনারাশির সহিত একটা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটে। তবে ইহাতে যে তাঁহাকে অনেক স্থলে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা নাই, তাহাও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত পত্রগুলির এক-আধখানি মাত্র তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িলে মনে হইতে পারে, স্বামীজি ভারতে তাঁহার শিষ্যদের বলিয়া কহিয়া সভাসমিতি করাইয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া গালাগালি করিতেছেন। কিন্তু ঐ তিনখানি পত্র একত্র—বিশেষতঃ শেষ পত্রখানি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে সে ভ্রম দূর হইবে—বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় শিষ্যগণ এমনকি সমগ্র ভারতবাসী পাশ্চাত্যদেশের ধরণ ধারণ অবগত না থাকায় স্বামীজি তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন মাত্র। সমগ্র ভারত তখন তাঁহার প্রশংসায় মুখরিত, কিন্তু ঐ প্রশংসা কেবল ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াই পর্য্যাপ্ত—পাশ্চাত্যদেশে যথায় স্বামিজীর কার্য্য চলিতেছে, তথায় উহার কিছুই পঁহুছিতেছে না, এদিকে বিরোধিগণ প্রণালীবদ্ধভাবে তাঁহার নিন্দাবাদ পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতেছে। এক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সভাসমিতি করিয়া ভারতবাসীর যথার্থ মনোভাব পাশ্চাত্যদেশে দস্তুরমত প্রণালীতে প্রচারিত না হইলে কার্য্যপ্রসারের বিঘ্ন হইতেছে—সেই কারণেই স্বামিজীর ঐরূপ লেখা; আর পত্র প্রেরণের গোলযোগ বশতঃ স্বামিজীর নিকট ভারতীয়

সংবাদ যথাসময়ে না পৌঁছায় শিষ্যগণের, এমন কি, সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি সাময়িক অনুযোগ, অভিমান ও দুঃখ প্রকাশ।]

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

নিউ ইয়র্ক,

৯ই এপ্রেল, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার শেষ পত্রখানি কয়েকদিন আগে পেয়েছি। দেখ, আমাকে এখানে এত বেশী ব্যস্ত থাক্‌তে হয় আর প্রত্যহ এতগুলো চিঠি লিখ্‌তে হয় যে, তুমি আমার কাছ থেকে সদাসর্ব্বদা পত্র পাবার আশা কর্‌তে পার না। যা হোক, এখানে যা কিছু হচ্ছে, যাতে তুমি মোটামুটি জান্‌তে পার, তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করে থাকি। আমি ধর্ম্মমহাসভাসম্বন্ধীয় একখানি বই তোমায় পাঠাবার জন্য চিকাগোয় লিখ্‌ব। ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চিত আমার দুটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা পেয়েছ।

সেক্রেটারী সাহেব আমায় লিখ্‌ছেন, আমার ভারতে ফিরে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—কারণ, ভারতই আমার কার্য্যক্ষেত্র। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এমন একটা প্রকাণ্ড মশাল জ্বাল্‌তে হবে, যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে। অতএব ব্যস্ত হয়ো না ঈশ্বরেচ্ছায় সবই সময়ে হবে। আমি আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে বক্তৃতা করেছি এবং উহাতে যে টাকা পেয়েছি, তাতে এখানকার ভয়ানক খরচ বহন করেও ফের্‌বার ভাড়া যথেষ্ট থাক্‌বে। আমার এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল বন্ধু হয়েছে—তার মধ্যে কতকগুলির সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অবশ্য গোঁড়া পাদরিরা আমার বিপক্ষে আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গাল মন্দ নিন্দাবাদ কর্‌তে আরম্ভ করেছেন আর ম—বাবু তাঁদের সাহায্য কর্‌ছেন। তিনি নিশ্চত হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদ্‌মাস, আবার কলকাতায় গিয়ে তথাকার লোকদের বল্‌ছেন, আমি আমেরিকাতে গিয়ে ঘোর পাপকার্য্যসমূহে বিশেষতঃ ব্যভিচারে লিপ্ত

হয়ে মহা কদাচারীর জীবন যাপন করছি!!! প্রভু তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোন ভাল কাযই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য্য হয়। আমি তোমার ভগিনীপতির * লিখিত পুস্তিকাগুলি এবং তোমার পাগলা বন্ধুর আর একখানি পত্র পেয়েছি। যুগসম্বন্ধে প্রবন্ধটী বড় সুন্দর—উহাতে যুগের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই ত ঠিক ব্যাখ্যা—তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসেছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর!

একটা জিনিষ করা আবশ্যক—যদি তোমরা পার চেষ্টা করলে ভাল হয়। তোমরা মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতে পার? রামনাদের রাজা বা ঐরূপ একজন বড় লোক কাকেও সভাপতি করে ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে নিতে পার যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছ (অবশ্য যদি তোমরা সত্যই ঐরূপ হয়ে থাক)। তার পর সেই প্রস্তাবটী চিকাগো হেরাল্ড, ইণ্টারওশ্যান, নিউইয়র্ক সান এবং ডিট্রয়েট (মিচিগ্যান) থেকে প্রকাশিত কমার্সিয়াল এডভার্টাইজার কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে। চিকাগো—ইলিনইস কাউন্টিতে অবস্থিত—নিউ-ইয়র্কসানের আর বিশেষ ঠিকানার আবশ্যক নাই। কয়েককপি ধর্ম্মমহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় পাঠাবে—আমি তাঁর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গেছি, রাস্তাটার নাম ইণ্ডিয়ানা-এভিনিউ। এক কপি ডিট্রয়েটের মিসেস যে, যে, ব্যাগির নামে পাঠাবে—তাঁর ঠিকানা ওয়াশিংটন-এভিনিউ। এই সভাটা যত বড় হয় করবার চেষ্টা করবে। যত বড় বড় লোককে পার ধরে নিয়ে এসে এই সভায় যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করবে—তাদের ধর্ম্মের জন্য, তাদের দেশের জন্য তাদের এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশূরের মহারাজও তাঁর দাওয়ানের নিকট

* অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য।

হতে সভা ও উহার উদ্দেশ্যের সমর্থন করে চিঠি নেবার চেষ্টা কর—খেতড়ি মহারাজের নিকট থেকেও ঐরূপ চিঠি নেবার চেষ্টা কর—মোটের উপর সভাটা যত প্রকাণ্ড হয় ও উহাতে যত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা কর।

উঠ বৎসগণ—এই কাযে লেগে যাও। যদি তোমরা এটা করতে পার, তবে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কায করতে পারব নিশ্চিত।

প্রস্তাবটী এমন ধরণের হবে যে, মান্দ্রাজের হিন্দুসমাজ যাঁরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা আমার এখানকার কার্য্যে সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি সম্ভব হয় এইটীর জন্য চেষ্টা করো—এত আর বেশী কায নয়। সব জায়গা থেকে যতদূর পার আমাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ পত্রও যোগাড় কর, ঐগুলি ছাপাও আর যত শীঘ্র পার মার্কিণ সংবাদ পত্রসমূহে পাঠাও। বৎসগণ, ইহাতে অনেকদূর কায হবে। এখানকার ব্রা—সমাজের লোকেরা যা তা বলছে—যত শীঘ্র হয়, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হউক। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ কোরবো। আমার পত্রগুলি প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যতদিন না আমি ভারতে ফিরছি ততদিন এইগুলির যতটা অংশ প্রকাশ করা উচিত, ততটা আমাদের বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করা যেতে পারে। একবার কায করতে আরম্ভ করলে খুব হুজুগ মেচে যাবে, কিন্তু আমি কায না করে বাঙ্গালীর মত কেবল লম্বা লম্বা কথা কইতে চাই না।

ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় কলকেতার গিরীশ ঘোষ আর এম, মিত্র আমার গুরুদেবের ভক্তদের দিয়ে কলকেতার ঐরূপ সভার আহ্বান করাতে পারে। যদি পারে ত খুব ভালই হয়। কলকেতায় উহারা পারে ত সভা করে ঐ একই রকম প্রস্তাব করিয়ে নিতে বলবে। কলকেতায় হাজার হাজার লোক আছে যারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। * *

আর বিশেষ কিছু লিখবার নাই। আমাদের সকল বন্ধুগণকে

আমার সাদর সম্ভাষণাদি জানাবে—আমি সতত তাঁদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—সাবধান—পত্র লিখ্‌বার সময় আমার নামের আগে 'His Holiness' লিখো না—এখানে উহা অত্যন্ত কিন্তুতকিমাকার শুনায়।

ইতি বি।

শ্রীবিবেকানন্দ স্তোত্রম্।*

(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি. এ।)

(সংস্কৃত কলেজ)

জীবসেবাব্রতং যস্তলক্ষ্যমাসীন্মহীতলে
জ্ঞানমাত্মগতং যোবৈ তেনমার্গেন সংগতঃ
কর্ম্মিণে জ্ঞানিনেচৈব ভক্তায় স্বামিনে পুন
বিবেকানন্দরূপায় ভূয়োভূয়োনমাম্যহম্॥

১। যৎ সেবাব্রতমামনন্তিমুনয়ো বুদ্ধোজিনঃশঙ্করঃ
শ্রীরামঃ কমনীয়কাম্যকবনে বৃন্দাবনে মাধবো।
জাহ্নব্যাঃ সুতটেষু গৌরগহনে গৌরাঙ্গদেবোযথা
তৎ সেবা-ব্রতমস্য সাধকবরঃ স্বামী পুনর্ঘোষতে॥

২। দেবানাগাশ্চযক্ষা খগভুজগগণাশ্চাপ্সরোবংশভূতাঃ
গন্ধর্ব্বা রাক্ষসা যে সকল-ভুবনজাশ্চাসুরাবৃক্ষজাতাঃ।
শত্রুর্মিত্রঞ্চযেবা নিখিলনরকজা যাতনাস্থাশ্চজীবা
আব্রহ্ম স্তম্বরূপং জগদিদমখিলং তৃপ্যতাং তৃপ্যতাং ভোঃ॥

---

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর শ্রীবিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভায় পঠিত।

৩। চণ্ডালোব্রাহ্মণোবা গুরুরুত বয়সা লাঘবঃ পণ্ডিতোবা
মূর্খোদীনোধনাঢ্যঃ সকলগুণগণৈরন্বিতোনির্গুণোবা।
সর্ব্বে নারায়ণাস্তে বয়মপিচতথাস্বয়মপ্যত্রভূতা
আত্মানারায়ণোয়ং প্রচরতি বহুশঃ সেব্যতামাত্মরূপঃ॥

৪। দ্বারেভিক্ষুর্বুভুক্ষুঃ কথয়তিকরুণং "মুষ্টিমেয়ং কদন্নং"
ক্ষুদ্রোমার্জ্জারকোমে বিলপতি নিতরাং "দেহিমে মৎস্য খণ্ডং।"
তেসর্ব্বে ভূতজাতাঃ সমমপি জগতাং সেবিতাশ্চেদ্‌ভবেয়ু
র্নূনং সৈবাত্মসেবা ভবতি চ সকলা নান্যতঃ সেবনাম্নে॥

৫। এবং পুত্রাশ্চদারাঃ সকল পরিজনাঃ বান্ধবাশ্চার্থরাশিঃ
সর্ব্বং যদ্‌বাস্মদীয়ং ভবতিচভুবনে তত্তু নারায়ণার্থং।
বাক্যংকায়োমনোমে ভবতি ভগবতা চালিতংহৃদ্‌গতেন
দীনোহহং ভগবন্ তবৈব নিয়তং দাসোহস্মি দাসাধমঃ॥

৬। দাসোহহং ভবতো গৃহাণ কৃপয়া মৎকর্ম্মলব্ধং ফলম্
এবং কর্ম্মফলং সমর্প্য ভগবন্নারায়ণোদ্দেশতঃ।
মুক্তঃ কর্ম্মফলাদ্‌বিশুদ্ধহৃদয়োযোগে মনোদীয়তাং
মুক্তিং বন্ধনতোলভস্ব নিয়তাং 'কস্ত্বং' পুনশ্চিন্ত্যতাম্॥

৭। নাহং কায়োজঘন্যঃ কফমলসহিতঃ পঞ্চভূতাত্মকোবা
নাহং ছেদ্যো নদাহ্যোন চ মরণবশোনাপিজাতঃ কদাচিৎ।
নাহং কর্ম্মী ন ভক্তোন চ সুখমপিবা দুঃখলেশো মদীয়ঃ
'সোহহং' যঃ ষষ্ঠচক্রে বিলসতি নিয়তং 'সচ্চিদানন্দরূপঃ'॥

৮। ইত্যেতত্তত্ত্বজাতং নবতরভুবনে প্রাচ্যপাশ্চাত্যভাগে
যোহয়ং নব্যাবতারো গুরুকুলতিলকো ঘোষয়ামাস নাদৈঃ।
যেনায়ং ধর্ম্মরাজ্যে সকলজনগুরুর্ভারতোহস্যাং ধরণ্যা
মিত্যেতৎ সাধিতং বৈ সুনিপুনবচসা পূজিতঃ সর্ব্বথাহসৌ॥

হে মুক্ত! লোকস্থিতসিদ্ধসাধো!
ভক্তাধমোহহং ন চ কর্ম্মলিপ্তা।
জ্ঞানামৃতং কিং নহিতৎ প্রজানে
নিরাশ্রয়োহহং শরণং প্রযাচে॥

বিবেকানন্দ ও ধর্ম্ম।

(ব্রহ্মচারী অখণ্ড চৈতন্য)

মানুষ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে যাইলে কেবলমাত্র ধর্ম্মচর্চ্চা বা মতবাদে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সে চায় যথার্থ মানুষ—যাহার জীবনে শাস্ত্রোক্ত উপদেশসমূহ প্রতিফলিত—সে চায় জীবন্ত, মূর্ত্ত শাস্ত্র। কেবলমাত্র পুঁথিগত উপদেশাবলীতে তাহার মনেও শান্তির উদয় হয় না, সে চায় উপদেশের মূর্ত্তরূপ দেখিতে। বেদ বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র ত' বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি মানুষ কেন ধর্ম্মের জন্য ধাবিত হইতেছে না, কেন সে বৃথা জাগতিক সুখে আপনাকে নিমগ্ন করিতেছে, কেন সে ঘোর নাস্তিক হইতেছে, তাহার কারণ, সে যথার্থ মানুষ দেখিতে পাইতেছে না। সেই জন্য শ্রীভগবান সময়ে সময়ে নরবিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বীয় জীবনে শাস্ত্রের তত্ত্ব সমূহ অনুষ্ঠান করিয়া জগদ্বাসীর সন্দেহ জাল ভঞ্জন পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য শান্তির রাজ্য স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হন। অথবা কখনও কখনও তিনি স্বয়ং নরবিগ্রহ ধারণ না করিয়াও অধিকারী পুরুষ সহায়ে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। উদাহরণস্বরূপে আমরা নানক, নাগার্জ্জুন, আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপ মহাত্মাদিগের জীবনেতিহাসই জগদিতিহাসরূপে পরিগণিত করা যাইতে পারে, ইঁহারাই ভাব রাজ্যের রাজা। যুগোপযোগী নূতন নূতন ভাবসহায়ে জগতের ভাবরাজ্যে ইঁহারাই পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন ও সমগ্র মানবমণ্ডলী সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের পদাঙ্কন অনুসরণ করিয়া থাকে। দার্শনিক Carlyle সেই জন্য বলিয়াছেন The History of the Greatmen is the History of the World. আমরা যে মহাত্মা সম্বন্ধে অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি তিনিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুত।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া যে

আধ্যাত্মিকতার সৌধ নির্ম্মাণ করিল—যাহা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও মুসলমানগণের পাশববলে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হয় নাই বরং অত্যুঙ্গ হিমালয়ের ন্যায় স্বীয় মহিমায় অচল অটলরূপে বিরাজ করিতেছিল, ইদানীং তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ নিবিড় তমসায় আবৃত হওয়ায় ভারতবাসীর নয়ন বহির্ভূত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কেহ মনে করিল বুঝি বা হিন্দুর চিরসম্বল ধর্ম্মও এবার আর কাল প্রভাবে বিদ্যমান রহিল না, কেহ বুঝিল এতদিনের কুসংস্কারের সমষ্টি, পুরোহিত কুলের অত্যাচার প্রভৃতির হস্ত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইব, কেহ কেহ আবার নিজেদের বিশেষ বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া ভোগরূপ যক্ষকে বরণ করিয়া লইল। যেমন মায়া স্বীয় আবরণী শক্তি দ্বারা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং—ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপ শক্তি সহায়ে তাহাকে জগদ্রূপে প্রতিভাসিত করে ও মানুষের হৃদয়ে বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হইলে তাহার বিভীষিকা অন্তর্হিত হয়; সেইরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতা এই অপূর্ব্ব সনাতন ধর্ম্মকে আবৃত করিয়া উহা আমাদের নিকট একটি কুসংস্কারের সমষ্টি মিথ্যা মাত্র ও ভোগই একমাত্র সারবস্তু বলিয়া প্রতিপাদন করিলে, মূর্ত্ত-বিবেক-বৈরাগ্য বিবেকানন্দের আবির্ভাবে তাহার মোহজাল ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সঙ্ঘর্ষণের সন্ধিস্থলে যদি স্বামিজীর ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে কালের অতল রসাতলে মগ্ন হইতে হইত। স্বমিজী বলিতেছেন—

"Though many a stately column on which it rested, many a beautiful arch and many a marvellous corner have been washed away by the innundations that deluged the land for centuries—the centre is all sound, the Keystone is unimpaired, the spiritual foundation upon which the marvellous monument of glory to God and charity to all beings has been reared, stands unshaken, strong as ever."

আজ কাল স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিত অনেকেই পাঠ করিয়া

থাকেন ও তৎসম্বন্ধে কিছু না কিছু সকলেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিয়া তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ হইতে যে ভাব পাইয়াছি তাহারই আলোচনা করিব। স্বামিজীই বাস্তবিক পক্ষে জগতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাণী বিঘোষিত করেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার পুরুষবৃন্দ একটি বা দুইটি ভাব স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়া মানবমণ্ডলীকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ সমন্বয়ের বাণী সম্বন্ধে একটু আধটু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা যেন অবান্তর বলিয়া বোধ হয়—যেন মতবাদ বা Theoritical মাত্র কিন্তু Practical নহে। উদাহরণ স্বরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্......ইত্যাদি বলিলেও নিজ জীবনে সমস্ত ধর্ম্ম যে পরিমাণে সেই অনন্ত ভগবানে লইয়া যায়, এরূপ ভাবের সাধনা করিয়াছেন কিনা তাহার কোন বিবরণ আমরা পাই না; অধিকন্তু গীতায় যে স্থলে আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই সেখানে তিনি কর্ম্ম সম্বন্ধেই বিশেষভাবে বলিতেছেন, সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বা পরে কোন কথাই উল্লেখ নাই। যদিও ভগবান গীতাতে জ্ঞানেই মুক্তি এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় কর্ম্ম-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলায় আমরা গীতায় নিষ্কামকর্ম্মই ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিতে পারি। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার মত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ যে গ্রন্থের যাহা প্রতিপাদ্য তাহা সেই গ্রন্থের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে আলোচিত দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ উপক্রম. উপসংহার, অর্থবাদ নিয়মের দ্বারাই কর্ম্মকে গীতার মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমরা দেখি যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় প্রথমেই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি"॥ পরেও তিনি কর্ম্মের কথা বলিতেছেন,

যথা—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়, সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে"। ইতি ২ অধ্যায়—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং……(৩য় অধ্যায়)

তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ (৪র্থ অধ্যায়)

যোগিণঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গংতক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে . (৫ম অধ্যায়)

নহি দেহভৃতাশক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ (১৮শ অধ্যায়)

আমরা গীতার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। সুতরাং যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে……ইত্যাদি শ্লোকটি গীতার প্রধান আলোচ্য বিষয় নহে। আবার আমরা দেখিতে পাই যে Example is better than precept তাই শ্রীভগবান নিজেই কুরুক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভক্তকে উপদেশ করিয়াছিলেন, কারণ উপদেষ্টা যদি নিজ জীবনে উপদেশগুলি প্রতিফলিত করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার উপদেশের কোন মূল্যই থাকে না। যাহা হউক এই অদ্ভুত সমন্বয় বাণী যে কেবল এই যুগের জন্যই রক্ষিত ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

যেমন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীগৌরাঙ্গদেবে মূর্ত্তরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন ঋষির তেজঃপূর্ণ মন্ত্র "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সসুপর্ণোগরুত্মান্" "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" এবং গীতার অস্ফুট সমন্বয়বাণী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দে মূর্ত্তরূপ ধারণ করে।

সমন্বয়বাদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে উত্থিত হইয়াছিল বটে কিন্তু পরিণামে দেখা যায় ইহা বিশেষ সফলকাম হয় নাই, কারণ ইহা কোন কার্য্যকরী প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আমরা দেখিতে পাই মধ্যযুগে ইউরোপে Eclectics বলিয়া একদল দার্শনিকের প্রাদুর্ভাব হয় তাঁহারা সব মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া নিজমত গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জগতে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার

করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারা সকল মতের মূল সূত্রটির সন্ধান পান নাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মমতই সত্য একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উহাদের সামঞ্জস্য সাধনের এমন কোন কার্য্যকর উপায় দেখাইয়া দেন নাই যাহার দ্বারা তাহারা এই সমন্বয়ের মধ্যেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই প্রকৃত কার্য্যকর যাহা ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়াও অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এ যাবৎ যে সকল উপায়ে ধর্ম্মজগতে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে গুটিকতক মত বিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই হেতু অপর কতকগুলি পরস্পর বিবদমান ঈর্ষাপরায়ণ নূতন দলেরই সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত এইরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদীদিগের পার্থক্য এইখানে।—তাঁহারা প্রত্যেক ধর্ম্মের ভাল ভাল উপদেশ সমূহ সংগ্রহ করিয়া একটি সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন, আর স্বামিজী কোন ধর্ম্মের ব্যক্তিত্ব নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের সাহায্যেই যে ভগবান্ লাভ হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মই যে সত্য, কোন ধর্ম্মের কিছুমাত্র বাদ দিবার প্রয়োজন নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

সাধারণতঃ প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমস্ত ধর্ম্মই যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলিই বা কি করিয়া সমভাবে সত্য হইবে? খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কি সমভাবে সত্য? খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সহিত জৈন ধর্ম্মের বিশেষ বিরোধ রহিয়াছে, আবার শূন্যবাদী বৌদ্ধের সহিত দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকের মিল নাই, এক্ষেত্রে কি প্রকারে সমস্তধর্ম্মমত গুলিকে সত্য বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে স্বামিজী বলিতেছেন "মনে করুণ এক ব্যক্তি সূর্য্যের দিকে গমন করিতেছে এবং যেমন অগ্রসর হইতেছে অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্য্যের এক একটি ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ফিরিয়া আসিবে তখন তাহার নিকট সূর্য্যের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ থাকিবে। যদি সে সেগুলি আমাদের সম্মুখে রাখে, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহার কোন

দু'খানিই ঠিক একরকমের নহে, কিন্তু একথা কে অস্বীকার করিবে যে এগুলি একই সূর্য্যের ফটোগ্রাফ, শুধু ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত··· এইরূপে আমরা একই সত্যকে আমাদের জন্ম, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখিতেছি। আমরা সত্যকেই দেখিতেছি; তবে এই সমুদয় অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতটা দর্শন হওয়া সম্ভব ততটাই পাইতেছি। তাহাকে আমরা নিজনিজ হৃদয়ের দ্বারা রঞ্জিত করিতেছি, আমাদের নিজনিজ বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজনিজ মন দ্বারা ধারণা করিতেছি......এই হেতুই মানুষে মানুষে প্রভেদ এমন কি কখন কখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে, তথাপি সকলেই সেই সার্ব্বজনীন সত্যের অন্তর্ভূক্ত।"

এখন পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ কি সমভাবে সত্য? এই তিন বাদের প্রত্যেকের ফল মোক্ষ। এখন এতত্ত্রয়ের মোক্ষে কোনরূপ তারতম্য আছে কি না? আমরা পূর্ব্বে মোক্ষ শব্দটির অর্থ কি সে বিষয়ে আলোচনা করিলে উত্তর বেশ বুঝা যাইবে। মোক্ষ শব্দের অর্থ আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি। আচার্য্য গোতম, মোক্ষ শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন; তবে তাঁহার মতে মুক্তাবস্থাটা জড়াবস্থার ন্যায়—মুক্ত ব্যক্তির কোনরূপ চৈতন্য থাকে না। তিনি প্রস্তর কাষ্ঠাদির ন্যায় অবস্থান করেন—এই মাত্র ভেদ। তিনি বলেন "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপয়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দোষের নাশ, দোষের নাশে প্রবৃত্তির নাশ, প্রবৃত্তির নাশে জন্মের নাশ ও জন্ম নাশ হইলে দুঃখের নিবৃত্তি। সাংখ্যকার কপিল মোক্ষকে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি কহিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী মোক্ষশব্দের এরূপ অর্থ করেন "তদৈক্য প্রমেয়গতাজ্ঞান নিবৃত্তিঃ স্বস্বরূপানন্দপ্রাপ্তিশ্চ"। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়গত অজ্ঞান নিবৃত্তি এবং তাহার ফলস্বরূপ আনন্দ প্রাপ্তি। শ্রুতি ইহার পোষকতা করিতেছেন, "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", "তত্র কঃ মোহঃ, কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।" আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ—কি দ্বৈতবাদী কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী

সকলেই স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী যে কোন একটি ভাব সহায়ে তাঁহার প্রেমাস্পদকে লাভ করেন, কিন্তু তাঁহার সহিত এক হইয়া যান না। তিনি বলেন 'আমি চিনি হ'তে ভাল বাসি না চিনি খেতে ভাল বাসি।' তিনি আনন্দঘন মূর্ত্তি দেখিয়া বিভোর হইয়া ভগবদানন্দ উপভোগ করিতে চান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মুক্তি সামীপ্য মুক্তি। যেমন কোন নিবিড় পত্র শোভিত বৃক্ষে একটি ক্ষুদ্র পাখী উড়িয়া বসিলে তাহাকে আর দেখা যায় না, কিন্তু পাখীটির সহিত বৃক্ষের স্বাতন্ত্র্য থাকে তেমনি জীব সগুণব্রহ্মে লীন হইলেও তাঁহার সহিত এইরূপ ভাবের একটা পার্থক্য থাকে। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয় না। এদিকে অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়। যেমন 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছ্‌লো, সমুদ্রে যাই যাওয়া অমনি গলে গেল, তখন আর পুতুল ও সমুদ্রে কিছু ভেদ রইল না, সব একাকার হ'য়ে গেল।' আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় ইহাদের মোক্ষফলের কিছু প্রভেদ আছে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। যদি দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মুক্তিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে চরম মুক্তাবস্থা বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলেই বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ, দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মতে মুক্তাবস্থাতেও উপাস্য উপাসক ভেদ বর্ত্তমান থাকে এবং ভেদ কল্পনাই মায়ার অন্তর্ভুক্ত, অতএব ঐরূপ মুক্তাবস্থায় জীব মায়ার রাজ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পায় না। হইতে পারে তাহার পার্থিব বোধের সুখদুঃখ অল্লাধিক উপশম হইয়াছে, কিন্তু উপাস্যের অন্তর্ধান জনিত বিরহ যন্ত্রনা তাহার চিত্তকে ক্ষোভিত করিয়া থাকে। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে তাহার আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইল না। অদ্বৈতবাদীর মুক্ত অবস্থায় সে স্বরূপে অবস্থান করে, মায়ার মোহিনী প্রহেলিকা তাহার কাছে বিলীন হইয়া যায়, সে নিঃশংসয় হইয়া এক অপার নিরবচ্ছিন্ন, সমরস আনন্দানুভবে বিভোর হইয়া যায়। তখন সে এক অখণ্ড সদ্‌বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুর সত্বা বোধ করে না, সমস্ত ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়, সে জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অতিক্রম করে। শ্রুতি বলিতেছেন "মৃত্যোঃ

স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি”—ভেদ দৃষ্টিই জন্মজন্মান্তরের হেতু। অতএব দ্বৈতবাদীর যখন উপাস্য উপাসক ভেদ থাকে তখন সে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য যে দ্বৈতবাদী কি চিরকালই উপাস্য ও উপাসকরূপ ভেদ লইয়া থাকিবে? তাহার কি কখনও “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞান হইবে না? যদি ইহা নিশ্চয় হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বৈতবাদীর মোক্ষ অদ্বৈতবাদীর মোক্ষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমরা দেখিতেছি যে দ্বৈতবাদীও একত্বজ্ঞান উপলব্ধি করে। সে যখন নিজ প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে “সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ” দেখে তখন তাহার সহিত অদ্বৈতবাদীর “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইহার কোন পার্থক্য থাকে না। যেমন জ্ঞানী বিচার সহায়ে ‘নেতি নেতি’ মার্গে এক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করে, তেমনই ভক্ত উপাসনা করিতে করিতে “সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ” দেখে, তাহার ইষ্টই তাহাকে ঐরূপ জ্ঞান দান করেন।—তাহা হইলে দেখা গেল যে দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; একত্বানুভূতির পক্ষে সোপান স্বরূপ। স্বামিজীও ঠিক তাহাই বলিতেছেন :—

"In these three systems we find 'the gradual working up of the human mind towards higher and higher ideals till everything is merged in that wonderful unity which is reached in that Advaita system."

ধর্ম্মের ভিতর তিনটি সোপান দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম দ্বৈতবাদ, তার পর মানব যখন অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হয়—তখন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এবং সর্ব্বশেষে একত্বানুভূতি লাভ হয়।—সুতরাং এই বাদ সকল পরস্পর বিরোধী নহে, পরন্তু সহায়ক।

এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি শ্রুতি বা বেদ। বেদেই আমরা কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান প্রভৃতির বিষয় সূত্রাকারে পাইয়া থাকি, পরে এই সূত্রগুলিই পুরাণ প্রভৃতিতে বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ প্রশ্ন হইতে পারে, বেদকেই বা কেন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইল, কোরাণ বা বাইবেলকে কেন গ্রহণ করা হইল না? তদুত্তরে বলা যায়—বেদই

সত্যসমূহের সমষ্টি মাত্র, ইহা অপৌরুষেয়। অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ কোন না কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত জড়িত বা ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক রচিত, কেবল মাত্র বেদই কোন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা রচিত নহে। বৈদিক ঋষিগণ বেদমন্ত্র সকলের দ্রষ্টা—রচয়িতা নহেন এমন কি স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্তও উহার রচয়িতা নহেন ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে বেদ যেরূপ ছিল পরবর্ত্তী কল্পে তিনি সেইগুলিকে নিশ্বাসের ন্যায় প্রকটিত করিয়াছেন, অধিকন্তু বেদেই আমরা সার্ব্বজনীন ভাবের কথা পাইয়া থাকি। কি দ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, কি যোগী, সকলেই আপন আপন মতের সহায়ক ভাব বেদ হইতে পাইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই বেদকে একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। এমন কি বৌদ্ধ ও জৈনদিগের নীতিবাদও আমরা উপনিষদে প্রাপ্ত হই। স্বামিজী বলিতেছেন :—

"I think it is Vedanta and Vedanta alone that can become the universal religion of man and no other is fitted for that role. Excepting our own, almost all the great religions of the world are inevitably connected with the life or lives of the one or more of their founders......If one blow is dealt with the historicity of that life, as has been the case in modern times with the lives of almost all the so-called founders of religion, ...the whole building tumbles down—broken absolutely never to regain its lost status. Everyone of the great religions of the world excepting our own is built upon historical characters, but ours rests upon principles."

এখন কি উপায়ে এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলাভ করা যায় তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিত আলোচনা করিব। সংসারে আমরা নানারূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষ দেখিয়া থাকি। কাহারও প্রকৃতি কর্ম্মপ্রধান, কাহারও বা ভক্তিপ্রধান, কাহারও আবার বিচারশীল। কর্ম্মপ্রবণ মানুষ গভীর চিন্তা করিতে পারে না অথবা বিশ্বের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়ে না। সে চায় কায, সে চায় tangible কিছু যাহা 'হাতে নাতে' করা যায়। প্রেমিক ভক্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর তাহার প্রেমাস্পদকে ভাবিতে থাকে। সে তাহার প্রেমাস্পদ ভগবানকে লাভ

করিবার জন্য পুষ্প, চন্দন, সুরম্য হর্ম্ম্য, পূজা, উৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করে। তাহার নিকট ভগবান্ সত্যবস্তু—তাঁহাকে ধরা-ছোঁয়া যায়—তাঁহার সহিত কথা বলা যায় এবং তাঁহার বাণী শোনা যায়। আবার বিচারশীল মানব সামান্য জাগতিক বস্তুতে পরিতুষ্ট নহে, সে তাহার তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধি সাহায্যে জগতের অনিত্যতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া "যো বৈ ভূমা তৎসুখং" সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম-লাভের জন্য উৎসুক হয়। সে ভক্ত ও ভগবানের ভেদ না রাখিয়া স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ হইতে চায়। জ্ঞানীই ভগবানের বিদ্রোহী সন্তান (?)। আমরা ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিক ঋষিগণ জ্ঞানকেই মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদিও বেদে কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তথাপি তাহারা ঋষিদের মনের উপর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। পরে আমরা দেখি যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সময় জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সামঞ্জস্যের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলবতী হয় নাই।

তারপর লোকে ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার দৈহিক ও মানসিক কঠোরতাপূর্ণ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও গৃহস্থগণ প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ শ্রীবুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া অষ্টাঙ্গিক বা মধ্যম মার্গ প্রচার করিলেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের সহিত উপনিষদুক্ত জ্ঞানমার্গের বিশেষ পার্থক্য নাই। তখনকার লোককে ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেই এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ গ্রহণ করিতে হইত। বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তৎপর ভগবান্ শঙ্কর জ্ঞানমার্গ প্রচার—নানা প্রকার স্তোত্র রচনা ও 'কর্ম্ম জ্ঞানের পক্ষে "আরাৎ প্রয়োজক" অর্থাৎ Remote cause বলায় ভক্ত ও কর্ম্মীর ধর্ম্মলাভের পথ সুগম হইয়াছিল। আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমধর্ম্ম প্রচার করাতে জ্ঞানী ও কর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তন্নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইল, তাহাদের মোক্ষলাভের কোন উপায় রহিল না। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, নচেৎ অসম্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এইরূপ একদেশী ভাব প্রচারিত হওয়ায়, সমগ্র

মানবমণ্ডলীর ধর্ম্মলাভের পথ সুগম না হওয়াতে শ্রীভগবান্ পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া বিবেকানন্দ প্রমুখ আচার্য্য সহায়ে সমন্বয়বাণী জগতে প্রচার করিলেন।

স্বামিজী বলিতেছেন "এই চারিটি দিকেই সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশ লাভ করা মদুক্ত ধর্ম্মের আদর্শ এবং ভারবর্ষে আমরা যাহাকে যোগ বলি তাহা দ্বারাই এই আদর্শ ধর্ম্ম লাভ করা যায়। কর্ম্মীর নিকট ইহা মানবের সহিত মানবজাতির যোগ, যোগীর নিকট জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, ভক্তের নিকট নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের যোগ ও জ্ঞানীর নিকট বহুত্বের মধ্যে একত্বানুভূতিরূপ যোগ। যিনি কর্ম্মের মধ্য দিয়া যোগ সাধন করেন তিনি কর্ম্মযোগী—যিনি ভগবানের মধ্যদিয়া যোগ সাধন করেন তিনি ভক্তিযোগী—যিনি ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধানের মধ্যদিয়া যোগ সাধন করেন তিনি রাজযোগী এবং যিনি জ্ঞান বিচারের মধ্যদিয়া যোগ সাধন করেন তিনি জ্ঞানযোগী।" আবার দেববাণীতে (Inspird Talks) বলিতেছেন "প্রাচীন কালের লোকের ভাব ছিল অপর সকল ভাবকে নষ্ট ক'রে একটা ভাবকে প্রবল কর। আধুনিক ভাব হচ্ছে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি করা। আর একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে মনের বিকাশ কর ও তা'কে সংযত কর—তারপর যেখানে ইচ্ছা তা'কে প্রকাশ কর তা'তে ফল খুব শীঘ্র হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ আত্মোন্নতি করবার উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর—আর যেদিকে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর; এরূপ করলে তোমার কিছুই খোয়াতে হবে না।" এই সার্ব্বভৌমিক সমন্বয়বাদের সহিত 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত'রূপ মতটীর বিশেষ সম্বন্ধ। কর্ম্মজীবনে বেদান্তটি ইহার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা সমন্বয়বাদের সহিত অবয়ব অবয়বীর ন্যায় সম্বন্ধে জড়িত। বেদান্তের মতটি আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে কিরূপ ভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা এই 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত' বক্তৃতায় দেখান হইয়াছে। বেদান্ত বলিতে আমরা উপনিষদকেই ধরি; কারণ, ইহাই বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণের অন্তর্ভাগ তজ্জন্য ইহাকে বেদান্ত বলা

হয়।—কিন্তু এখানে বেদান্ত শব্দে উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদটী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অদ্বৈতবাদ অথবা জ্ঞানযোগ কর্ম্মজীবনের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে কি ভাবে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে ও ভক্তিযোগের সহিত ইহাদের কোনরূপ সাপত্ন্য সম্বন্ধ নাই স্বামিজী তাহাই এই বক্তৃতায় দেখাইতেছেন।

পূর্ব্বে ঋষিরা বেদান্ত অরণ্যে পাঠ করিতেন বলিয়া ইহার নাম আরণ্যক হইয়াছে। ঋষিরা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ইহারই চর্চ্চা করিতেন, সেই অবধি ইহা মুষ্টিমেয় ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঋষিরা আবার মহাকর্ম্মী অতুল সাম্রাজ্যের অধিকারী নানাপ্রকার ভোগবিলাসের মধ্যে বর্ত্তমান রাজন্যকুলের নিকট হইতেই এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। এই কথা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাপ্ত হই। এইরূপে উপনিষদ্ ক্ষত্রিয়দিগের হস্তচ্যুত হইলে তাহা ঋষিদিগেরই একমাত্র সম্বল হইয়া উঠিল। তাঁহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন লইয়াই জীবন কাটাইতেন—সংসারের পঙ্কিল আবহাওয়ায় আসিতে ইচ্ছা করিতেন না; তৎজন্য এইরূপ সারগর্ভ অমূল্যরত্ন একপ্রকার লোকচক্ষুর অন্তরালেই বর্ত্তমান ছিল। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন "ঋষিরা ভয়তরাসে!"

এইরূপে বহুশত বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ শঙ্কর সেই উপনিষদ্ গুলিকে সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে প্রচার করিলেন, কিন্তু এই সাধারণ মনুষ্য বলিতে আমরা যেন শূদ্র ও অন্ত্যজদের না ধরি; কারণ তিনি এই গুলিকে শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন, কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের হস্তে যাহা ছিল তাহাকে তিনি গৃহস্থের মধ্যেও প্রচার করিলেন। এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই উপনিষদ্ নিবদ্ধ উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ নিরন্তর কর্ম্মশীল সাম্রাজ্যের অধিনায়ক রাজাগণের মস্তিষ্ক প্রসূত। তাঁহারা যদি অত্যধিক কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও সেই উপনিষদুক্ত সত্যসমূহ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারেন, তবে কেন আমরা দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। সেই অতুল সাম্রাজ্যের অধিপতি

অপেক্ষা কে অধিক কর্ম্মী? বেদান্তের উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসমূহ সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদের অন্তরে সঞ্জীবনী শক্তি জাগ্রত করাই স্বামিজীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মানুষ এতদিন নিজকে দীন হীন ভাবিয়া একেবারে নির্জ্জীব বলহীন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে বেদান্তের ওজঃপূর্ণ গভীর বাণী শুনাইলে তাহাদের মধ্যে, সুপ্ত সিংহ জাগরিত হইবে।' এইজন্য স্বামিজী বেদান্ত আলোচনা ও তাহার প্রচারের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। রঙ্গাচার্য্যকে তিনি বলিতেছেন "Give a rub to the Calcutta people" আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "যদি বেদ শালগ্রাম শিলার ন্যায় ঘরে ঘরে পূজা হয় তবে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।"

এখন আমাদিগের পূর্ব্ব ক্রম অনুসরণ করা হউক। কর্ম্মের মধ্যে কি ভাবে বেদান্তের তত্ত্বসমূহ কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা আমরা তাঁহার বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারি। বেদান্তের মূল সিদ্ধান্তটি এই যে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম উপাধিভেদে বহুজীবরূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন। জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোনরূপ পার্থক্য নাই। জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম, যেমন এক মহাকাশ বিভিন্ন বস্তু, ঘট মঠ প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন আকাশ—ঘটাকাশ, মঠাকাশ রূপে প্রতিয়মান আবার ঘট মঠ প্রভৃতির বিনাশ হইলেই সেই ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ ও মঠাবচ্ছিন্ন আকাশ এক মহা আকাশে বিলীন হয়। সেইরূপ এক অখণ্ড সত্ত্বা বিভিন্ন উপাধি ভেদে জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে এবং উপাধি নাশেই সেই এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। জীব ও ব্রহ্মে বাস্তবিক যে ভেদ নাই, বেদান্ত তাহার "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। অতএব জীব যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হইল, তাহা হইলে সে অনন্ত শক্তিমান্ ইহাও স্থির হইল। বেদান্তের এই মহান্ সত্যগুলি যদি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে মানুষ তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সমূহও সুশৃঙ্খলার সহিত করিতে সক্ষম হইবে, বাধা বিপত্তি ও নৈরাশ্যের ছবি তাহার সম্মুখ হইতে দূরে অপসারিত হইবে। জীবনের যে যে স্তরে যাহারা বর্ত্তমান তাহারা যদি নিজে ভাবে যে আমি ব্রহ্মস্বরূপ আমার মধ্যে অনন্ত-

শক্তি বর্ত্তমান তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আপন আপন স্তরে উন্নতি লাভ করিবে।—উকিল যদি ভাবে, সে ব্রহ্মস্বরূপ অনন্তশক্তিশালী সে খুব ভাল উকিল হইবে, জেলে যদি ভাবে আমি অনন্তশক্তিশালী, সে ভাল মাছ ধরিতে পারিবে, আবার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী যদি ভাবেন আমি ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিবেন। "যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। স্বামিজী বলিতেছেন—

"These conceptions of Vedanta must come out, must remain not only in the forest, not only in the cave but they must come out to the bar and the bench, in the pulpit and in the cottage of the poor man, with the fisherman that are catching fish and with the students that are studying......... If the fisherman thinks that he is a spirit he will be a better fisherman. If the student thinks he is a spirit he will be a better student."

একদিকে যেমন দেখিলাম কর্ম্মজীবনে বেদান্ত ঐহিক জীবন যাপনে আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে, অপরদিকে দেখিব যে তাঁহারা পারত্রিক ব্যাপারেও তদ্রূপ অনুকূল, এমন কি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ভাব আনয়ন করে। নিষ্কামভাবে, কর্ম্মকরাই কর্ম্ম-যোগের মূল সূত্র। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ এই সম্বন্ধেই উপদেশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। মানুষ কিছুনা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারে না, সেইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মাণি" আবার বলিতেছেন "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

কায করিয়া যাও, সিদ্ধি ও অসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিও না! সিদ্ধি হউক তাহাতেও আনন্দিত হইবার প্রয়োজন নাই, অসিদ্ধি হইলে নিরাশ হইও না, উভয় বিষয়ে তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই "শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্"—বিমল আনন্দলাভ করিতে পারিবে। এদিকে ভক্তিযোগে বলা হইয়াছে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন। নাম ও নামী অভেদ, যেই নাম—সেই ভগবান্,

সেই ভগবানেরই এই জগৎসংসার—এরূপ জানিয়া সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করিবে। এবং ভক্ত ও ভগবানকে—কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবকে এক জানিয়া বৈষ্ণব ও ভক্তসমুদয়ের পূজা বন্দনা ও সেবা করিবে। আবার জ্ঞানী বলিতেছেন—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জীব ব্রহ্মৈব নাপর, ইত্যাদি প্রত্যেক পদার্থ প্রাণী, জীব প্রভৃতি যাহা আমরা দেখিতেছি সমস্তই ব্রহ্ম, কেবল উপাধি ভেদে বিভিন্ন দেখাইতেছে।' কর্ম্মজীবনে বেদান্ত আমাদিগকে শিখাইতেছে যে, মানুষকেই শিবজ্ঞানে সেবা কর 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। বেদান্ত বলিলেই যেন লোকের মনে স্বতঃই নদনদী, পর্ব্বত, ভীষণ অরণ্য বা তপোবন প্রভৃতির ছবি, ও বেদান্তজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহাকে এই সংসার নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হইবে, এবং ভক্তি ভালবাসারূপ কোমল মনোবৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে ইত্যাদি ভাবসমূহ উদয় হয়। কিন্তু স্বামিজী এই সেবাধর্ম্ম প্রচার করায়—ভক্তিযোগের সহিত জ্ঞানযোগের অপূর্ব্ব সম্মিলন হইল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি জীব শিব, এই কথা জ্ঞানী বলিতেছেন; আবার ভক্ত বলিতেছেন জীবে দয়া কর। স্বামিজী বলিলেন —জীবকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা কর, তোমার সাধ্য কি যে তুমি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে, সে যে শিবস্বরূপ, তুমি তাহার সেবা করিয়া ধন্য হও। জ্ঞানী চরম অবস্থায় দেখেন যে জীবজগৎ সবই ব্রহ্ম এবং শাস্ত্রে বলে যে সাধকের পক্ষে সিদ্ধাবস্থার আরোপই সাধনা। অতএব জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিতে করিতে পরিণামে সাধক কেননা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন! আবার ভক্তও 'সেবাধর্ম্ম' হইতে বিশেষ আলোক পাইবেন। সর্ব্বভূতে নিজ ইষ্ট দর্শন পরাভক্তির লক্ষণ; জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিয়া সর্ব্বভূতে ইষ্ট দর্শন করিয়া ভক্তসাধক পরাভক্তি লাভে যে সমর্থ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অপর দিকে কর্ম্মযোগীও বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। মানুষ কর্ম্ম না করিয়া একদণ্ডও থাকিতে পারে না। এই জীবসেবারূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সে পরিণামে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। গীতা বলিতেছেন, "আরুরুক্ষো-র্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।"

এখানে আমাদিগের মনে রাখা উচিত যে সেবাধর্ম্ম স্বামিজীর স্বকপোল কল্পিত নহে। "যত মত তত পথ" রূপ Universal Religion বা সমন্বয়বাণী প্রচার করায় মানুষ ধর্ম্মরাজ্যে নূতন আলোক পাইতেছে তাহা যেমন তিনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ "সেবাধর্ম্ম"ও তিনি তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত হন। পরমহংসদেবই একদিন অর্দ্ধবাহ্য দশায় বলিতেছিলেন 'জীবে দয়া! জীবে দয়া! দূর শ্যালা! তুই কীটাণুকীট জীবকে তুই দয়া করবার কে?—না না জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।' এই মূল সূত্রটীই স্বামিজীর দ্বারা পরিণামে 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত'রূপ ভাষ্যে পরিণত হইয়াছে।

এই কর্ম্মজীবনে বেদান্ত বা সেবাধর্ম্ম ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইলে মানবকে সর্ব্বতোভাবে নিজ স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিতে হইবে; একমাত্র ত্যাগরূপ ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত,—ত্যাগই সকল ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। উপনিষদ্ বলিতেছেন "ত্যাগেনৈক অমৃতত্বমানশুঃ।" আজকাল ত্যাগের কথা বলিলেই লোকের মনে গৈরিকবসন, দণ্ড কমণ্ডলু, প্রভৃতির চিত্র উদিত হয়—যেন মনে হয় দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ না করিলে আর ত্যাগী হওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সকল আশ্রমে ত্যাগী হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান যুগে নাগ মহাশয়, মহাত্মা গান্ধি, লোকমান্য তিলক প্রভৃতি মনীষীগণ সংসার আশ্রমে থাকিয়াও ত্যাগের কিরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন! শাস্ত্রে আমরা ধর্ম্মব্যাধ, রাজর্ষি জনক, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উপাখ্যান হইতে জ্ঞাত হই যে তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাহার কিয়দংশও ইদানীং তথাকথিত ত্যাগীদের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ত্যাগেই মানুষকে দেবতা করে। সেইজন্য স্বামিজী বলিতেছেন "Renunciation and service be your motto." ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতেছেন "ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না তোমার বিবাহ—তোমার ধন—তোমার জীবন—ইন্দ্রিয় সুখ নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।"

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

(জনৈক ব্রহ্মচারীর ডায়রী হইতে

১। "যার দ্বারা উপকার হয় যদি তাকে উপকৃত ব্যক্তি মানে তবে ত নিজেরই কল্যাণ। ভগবানের ঘরে বাঁচোয়া না মানলে সেই ভুগবে।

২। সৎ হইলে অনেক লোক অন্ন পায়।

৩। ভাই ভাইএ মিল হয় না, আবার ধর্ম্ম করবে কি ?

৪। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলেছেন দয়া আমার কোথায় ? যেখানে যার দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে লই।

৫। অসৎ সঙ্গ করলে অসৎ বুদ্ধি আসবে। যেমন সঙ্গ কর, তেমনি ফল পাবে।

৬। যে তাঁর জন্য দুঃখ করে সে ফল পায়।

৭। বাসনাতে লোক মরে, দুঃখ পায়। ক্রমাগত বাসনা উঠে।"

৮। জান আর না জান তাঁর গুণ যাবে কোথা ? আনন্দময় তিনি, জগতের কর্ত্তা, ত্রিলোকনাথ তিনি মানুষরূপ ধারণ করেছেন। উঁরা শক্তিমান পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গোয়ালার ঘরে লালিত, দেখিয়ে দিলেন আমি যেখানে জন্ম লই, সেখানে কোন দোষ নেই। হে জীব! দোষ ধরিও না।

৯। সৎ লোক সৎ লোককে উপকার করে। এর নাম সাধু সঙ্গ।

১০। উপরে ভক্তি, ভিতরে কপট দেখলে ভগবান বুঝতে পারেন, দেখতে পান।

১১। দান করলে দানের ফল পাওয়া যায়।

১২। তপস্যা করলে ভগবান পাওয়া যায়।

১৩। সৎ লোকের কথাই সার।

১৪। যার অন্ন খেয়ে অনিষ্ট কর, তার ভোগ ভুগতে হবে।

১৫। যে নিজেও দুঃখ ভোগ করে, অপরকেও দুঃখ ভোগ করায় সেই সয়তান।

১৬। সৎ বুদ্ধি হলে সকলেই আদর করে।

১৭। আজ কাল যে সময় পড়েছে, কা'র উপর নির্ভর করা কঠিন।

১৮। সৎ কাজ যত হয় ততই সুখের বিষয়। সৎ কাজ করতে প্রথমে কষ্ট হয়, ভবিষ্যতে আরাম হয়। আর অসৎ কাজ করতে প্রথমে আনন্দ হয়, ভবিষ্যতে দুঃখ হয়।

১৯। গুরু কৃপা করে বুঝিয়ে দিলে বুঝা যায়। যার যার অদৃষ্টে যা কর্ম্ম আছে তা হবেই।

২০। নিজে অনুভূতি করা, আর বই-পড়া বহু তফাৎ।

২১। সাধু, রাজা, নদী, অগ্নি এঁদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হয়। কোন্ সময় কখন কি যে মেজাজ হয় তা বলা যায় না।

২২। কার ইচ্ছা যে দুঃখ ভোগ করি, বুড়ো হই?

২৩। এ জগতে কারুর সুখ নেই। যার অর্থ আছে তার দুঃখ, যার অর্থ নেই তারও দুঃখ। ভগবান বলছেন, হে জীব! আমায় ভুলিও না।

২৪। যে যার সংস্কার লয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

২৫। ভগবানকে লয়ে পড়ে থাক। কারুর হিংসা করিও না, হিংসাতেই যত গোলযোগ, হিংসুকেরাই দুঃখ পায়।

২৬। ভগবানের সুখে ক'জন সুখী?

২৭। যার সংসারে কিছু নেই সে আর ভগবান ছাড়া কাহাকে ডাকবে, যার সব থাকতে ভগবানকে ডাকে তারই বাহাদুরী।

২৮। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে নিচ্ছেন, খুব কাছে আছেন অথচ জানতে দিচ্ছেন না যে তিনি ভগবান! হে অর্জ্জুন! কর্ম্ম কর আর আমার দোহাই দেও, তা হলে আমাকে বুঝতে পারবে।

২৯। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম্ম করতে হয়। আকাঙ্ক্ষা করে কর্ম্ম করলে সিদ্ধাই হয়। ভগবান সিদ্ধাইকে ঘৃণা করেন। সিদ্ধাই এত ঘৃণিত যে সে জায়গা অপবিত্র হয়।

৩০। ভগবানের নাম হয় না বলেই ত জগতে এত কষ্ট।

৩১। সঙ্গ করলে কি স্বভাব যায়? কথায় আছে কাকের সঙ্গে এক হাঁসের খুব বন্ধুত্ব ছিল। কাক হাঁসকে, হাঁস কাককে নিমন্ত্রণ করেছিল। হাঁস কাককে ভাল জিনিষ খাওয়াইল, কাক হাঁসকে বিষ্ঠা খাওয়াইল। এর অর্থ এই যে কাকেরও হাঁসের সঙ্গ করে স্বভাব যায় নাই।

৩২। বিপদের সময় যে সাহায্য করে সেই বন্ধু।

৩৩। সংসারে জনে জনে কর্ত্তা হইলে চলে না, একজন সংসারে কর্ত্তা হলে সে সংসার ভালরূপ চলে। তেমনি ধর্ম্ম জগতে ভগবানকে কর্ত্তা করে কায করলে ভালরূপ ফল পাওয়া যায়।

৩৪। ভগবান বলছেন, যে তাঁকে জেনেছে তার সঙ্গ কর।

৩৫। কলিতে যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা কিছু নেই। কলিতে ভগবান সে শক্তি দেন নাই। কেবল হরিনাম ছাড়া অন্য গতি নেই। জীব হরিনাম করবে না, ভগবানকে কি করে বুঝবে? এই জন্যই ত দুর্দ্দশা; চৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য শাস্ত্র বাক্য—সে কি মিথ্যা? হরিনাম করলে ভবরোগ দূর হয়। অবতারদের বাক্য না মেনেই জীবের এ দুর্দ্দশা।

৩৬। শাক্ত হউক বৈষ্ণব হউক, শৈব হউক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন গতি নাই।

৩৭। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, দুপুর মধ্য রাত্রি—এই চা'র সময় মধ্যে যে সময় ইচ্ছা সে সময় নিয়মিতরূপে ধ্যান জপ করা উচিৎ। তা হলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়।

৩৮। লিখা পড়া করা খুব দরকার। তা'হলে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়।

৩৯। সন্দেহ দূর হ'তেই হবে। সন্দেহ না গেলে কিছুই হবে না। সর্ব্বদা ভগবানের নাম ক'রলে সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়।

৪০। ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকলে দেবলোক-পিতৃলোক প্রকাশ হন।

৪১। জীবকে ঠকালে তার কি কোন কালে গতি আছে?

৪২। তিনিই সংশয় করান আবার তিনিই তাহা দূর করান।

৪৩। চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান্ বল, বিষ্ণুর অবতার বল—লিখা পড়ায়

খুব পণ্ডিত—তানই ভিক্ষে করে খেয়েছেন তা জীবের কা কথা! তিনি মেয়েদের ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন। যে সাধু হবে সে ঐ সব ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখবে।

৪৪। ভগবান চাইই, এই জগতের কর্ত্তাকে যদি না পেলাম, তবে জন্ম বৃথা।

৪৫। প্রহ্লাদের পবিত্র অহেতুক বৈরাগ্য। কারুর হেতুতে বৈরাগ্য হয় তাও ভাল। যে কোন কারণে ভগবানকে ডাকতে পাল্লেই হলো,ভাল।

৪৬। ভাগবৎ শুনে যদি হুকুম প্রতিপালন করে ত জীবের কল্যাণ হবে।

৪৭। ভগবান সত্য, জগৎ মিথ্যা। এক সময় না এক সময় জগৎ নাশ হবে, ভগবান কখনও নাশ হন না।

৪৮। মন যত উচ্চ হবে তত দুঃখ দূর হবে, সুখী হবে?

৪৯। যার দ্বারা সৎ কায হয় তাকে কি ভোগাতে পারে?

৫০। যার ভগবানের অভাব হয় সেই ভগবানকে ডাকে। এই সংসার সুখ নিয়েই ব্যস্ত। যতটুকু হয় ততটুকুই ভাল।

৫১। কলিতে জীবন ধারণ করে একটু মাছ-মাংস খেলে কি হয়? পবিত্র জীবনের কোন দোষ নেই। মাছ, মাংস খেয়ে তবু ভগবানকে ডাকছে, ভগবান ভগবান কচ্ছে, আর তোমরা মাছ-মাংস না খেয়ে বজ্জাতি কচ্ছো! হে জীব! পবিত্র হও, পবিত্র হলে ভগবান দয়া করেন।

৫২। ভক্ত নানা রকমের আছে।

৫৩। ভগবান বলছেন যতটুক পার জীবকে রক্ষা কর। জীবকে নষ্ট করিও না জীবকে রক্ষা করতে করতে আমাকে বুঝতে পারবে যে আমি কি জিনিষ!

৫৪। গৃহস্থই হোক আর সাধুই হোক ভগবান কর্ম্মহীনকে খুব ঘৃণা করেন।

৫৫। সুখে কি কেউ চাকুরী করে? দুঃখ থেকে চাকুরী করে।

৫৬। ভগবানের এমনি মায়া যে কোথায়ও মেঘ নাই হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এল।

৫৭। সৎ কাজ যে করে সে সৎ লোক বৈ কি! বিশেষ টাকার মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন।

৫৮। যার অর্থ আছে সে যদি গরীব দুঃখীকে না দেয় তা হলে ভগবানের কাছে দোষী। যার অর্থ নাই তাকেই সাহায্য করা উচিৎ।

৫৯। যে হরষিত হয়ে তাঁর জিনিষ তাঁকে দেয় সেই ভাগ্যবান পুরুষ। ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(সমাধান)—না 'এইরূপ' বলিতে পার না। কেননা সেই সময়ে মুখ্য আসক্তি প্রভৃতির ন্যায় তাহাদের আভাসও 'স্থিতপ্রজ্ঞতার বাধক হয়।' (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, সেই) রজ্জুসর্পও তৎকালে প্রকৃত সর্পের ন্যায়ই ভীতি উৎপাদন করে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। *

(শঙ্কা)—আচ্ছা (সেই আসক্তি প্রভৃতির) আভাসকে যদি আভাস বলিয়া স্মরণ রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে ত কোনও বাধা ঘটিতে পারে না।

(সমাধান)—দীর্ঘজীবি হও * * * ইহারই নাম জীবন্মুক্তি, ইহাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু যে সময়ে বিচারে জয়লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

* অর্থাৎ পরে না হয় সর্পভ্রম অপসারিত হইলে সেই সর্পকে রজ্জু বলিয়া জানা গেল কিন্তু প্রথমং দর্শন কালে ত তাহা প্রকৃত সর্পের ন্যায় ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। সেইরূপ অস্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যেন প্রজ্ঞাবলে পরিশেষে আসক্তি প্রভৃতিকে তিরোহিত করিলেন, কিন্তু প্রথম আবির্ভাব কালে তাঁহাকে ত জ্ঞানহীনের ন্যায় বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

সেই সময়ে এইরূপ ছিলেন না, কেননা চিত্তের বিশ্রান্তিলাভের জন্য বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিতে তখনও তাঁহার বাকী ছিল। তখন যে তাঁহার কেবল বিচারে জয়লাভ করিবারই ইচ্ছা ছিল, তাহা নহে, প্রবল ধনতৃষ্ণাও জন্মিয়াছিল, কেননা বহুসংখ্যক ব্রহ্মবিদ্‌দিগের সমক্ষে স্থাপিত, সহস্র সালঙ্কার ধেনু বিনানুমতিতে গ্রহণ করিয়া তিনি নিজেই বলিতেছেন :—

"নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্ম, গোকামা এব বয়ং স্মঃ ইতি"

(বৃহদাঃউঃ ৩।১।২)

আমরা (উপস্থিত) ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষকে প্রণাম করিতেছি। (যদি বল তবে তাঁহার প্রাপ্য ধেনুগুলিকে কেন স্বগৃহে লইয়া যাইতেছ ? (তবে বলি) আমরা হইতেছি কেবল গোকাম (গো প্রার্থী)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা ইহাত হইতে পারে যে অপর ব্রহ্মবিদ্‌দিগকে অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্যে ইহা এক প্রকার বাক্যের ভঙ্গী মাত্র।

(উত্তর)—তাহা হইলে ইহা আর একটি দোষ। আর অপর ব্রহ্মবিদ্‌গণ আপনাদের প্রাপ্য ধন যাজ্ঞবল্ক্য অপহরণ করিতেছেন মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিই আবার ক্রোধপরবশ হইয়া শাপ দিয়া শাকল্যের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন।* কেহ যেন এরূপ মনে না করে যে ইনি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কেননা কৌষীতকিগণ পাঠ করেন (কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩।১)

"নাস্য কেনাপি (কেন চ) কর্ম্মনা লোকো হীয়তে (মীয়তে) ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন, ন স্তেয়েন, ন ভ্রূণহত্যায়া ইতি। †

(কোনও কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, মাতৃবধের দ্বারাও নহে, পিতৃবধের দ্বারাও নহে, চৌর্য্যের দ্বারাও নহে ভ্রূণহত্যার দ্বারাও নহে।)

---

* টীকা—বৃহদা উপ, ৩।৯।২৬।

† টীকা—মূলে কিন্তু "কেনাপি" স্থলে "কেন চ" এবং "হীয়তে"র স্থলে "মীয়তে" এইরূপ পাঠ আছে।

বাংলা সাহিত্যে সংযম।

(স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ).

ইংরাজগণের ভারতাধিকারের পর হইতে বাংলাভাষা শিশুজীবন হইতে যৌবন সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শত বৎসরের মধ্যে কত একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী বাংলার দীনাতিদীন ধূলিমলিন অঞ্চলে জন্মলাভ করিয়া বিশ্ব-সৌন্দর্য্যাগার হইতে কত নিরুপম রত্নরাজি, কত চির-নবীন কুসুম নিচয়, কত চির-শ্যামল লতাবিতানে বীণাপাণির চিন্ময়ী প্রতিমা ও অর্চ্চনা মন্দির সুসজ্জিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। হইতে পারে—চণ্ডিদাস, ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, গিরীশচন্দ্র, রমেশ-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র ও স্বর্ণলতার মত জননীর মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান সন্ততির সংখ্যা প্রচুর নহে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় সেই ক্ষুদ্র 'কাঠ বিড়ালে'র সামান্য উদ্যমও ভগবদ্ চক্ষে সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। ভাষাই জাতীয় ভাবের প্রকাশক। ভাষা যে পরিমাণ সরল, স্বাধীন ও সম্পূর্ণ হইবে জাতীয় ভাব-স্পন্দনও সেই পরিমাণ সরল, মুক্ত ও পরিপূর্ণ আকার ধারণ করিবে। ভারতের জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হইলে মাতৃ-ভাষার উন্নতি বিধান যে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তাহা সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন। ভাষা ভাবের স্থূল অভিব্যক্তি। মাতৃভাষাকে বৈদেশিক মোহ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিলে আমরা বৈদেশিক ভাব হইতে যে বহুল পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইব ইহা সুনিশ্চিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেশীয় অন্যান্য ভাষার বিষয় অনধিকার চর্চ্চারূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক যে দিন ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল সেই দিন যেন আমাদের ভাষা পূর্ণজীবন লাভ করিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য, অস্পষ্ট, ভ্রমসঙ্কুল হস্তলিখিত

পুঁথি ছাড়া আমাদের মাতৃ-ভাণ্ডারে আর ছিল কি? ছিল অনন্ত ভাবপ্রবাহ যাহা ইংরাজগণের শুভেচ্ছায় আজ অনন্ত রূপে ও অনন্ত ভঙ্গীতে প্রকৃতির অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। দুই শত বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত ভাব পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে যদি মুদ্রণের প্রবর্ত্তন বাংলাদেশে না হইত তাহা হইলে উহা যে কতদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর অনন্ত সৌন্দয্য-তৃষ্ণার বিষয় বিশ্ববাসীর নয়ন সমক্ষে উপস্থিত করিত তাহা বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন বাংলা সাহিত্য প্রবাহে প্রবল জোয়ার আনিয়া দিলেও ঐ জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে আবিলতা ভাসিয়া আসিয়া যে সে প্রবাহের বিশুদ্ধতা অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তুমি বলিবে সকল জিনিষের ভাল মন্দ দুটা দিকই আছে—ভাল'র সঙ্গে মন্দটা ত আসিবেই তাহাতে কি করিবে? আমি বলি তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও কোন একটী দ্রব্যের মন্দ দিক্‌টা বর্জ্জন করিবার চেষ্টাই মানব জীবনের বিশেষত্ব। ভগবদ্ সৃষ্ট অন্যান্য জীবের মধ্যে কেবল মনুষ্যই কোন একটা বস্তু হইতে মন্দাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাল অংশটী গ্রহণ করিতে সচেষ্ট ও সক্ষম হয়। নির্ব্বিচারে কোন একটী জিনিষ গ্রহণ না করিয়া বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অনন্ত ভাববাহী সাহিত্য-চর্চ্চা-স্রোত বাংলার মস্তিষ্কে আজ যেমন কোন্ অজানা অমর রাজ্যের অমৃত বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে, মৃত সঞ্জিবনীসুধা পান করাইয়া বাংলার হৃদয়ে যেমন নূতন আলোকের নব-স্পন্দন অনুভব করাইতেছে, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বিষাক্ত বায়ুও উড়িয়া আসিয়া এই নবজীবনের পাদদেশে ভীষণ কুঠারাঘাত করিতেছে। যদি আমরা আমাদের জাতীয় জীবন উন্নত ও রক্ষা করিতে বাস্তবিকই ইচ্ছুক হই, তবে এই বিপুল সাহিত্যচর্চ্চার দিনে আমাদিগকে কিছু সংযমী হইতে হইবে। দেখা যাইতেছে কাগজ ও মুদ্রণের সুলভতা বহু অবিবেকী, দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখক-লেখিকাকে তাহাদের নিজ নিজ চরিত্রগত ভাবানুযায়ী পুস্তক প্রণয়নে উন্মুখ করিয়া বাংলার ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনকে দুর্ব্বল ও ব্যভিচারী করিয়া ফেলিতেছে;

এবং অসংখ্য শিশু—মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রভৃতি বাজারে জন্মলাভ পূর্ব্বক পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দিগ্‌-বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া অখাদ্য খাইয়া সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দেশবাসীকে অনর্থক বিপন্ন করিয়া ফেলিতেছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই সকল বিবেকহীন চিত্তের দুর্ব্বল চিন্তাপ্রবাহ, যাহা মানবকে মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বে লইয়া যায়, নানা আপাতমনোরম অরুচিকর ভাবপূর্ণ পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদের স্বভাবলুব্ধ মনকে প্রলুব্ধ করতঃ মস্তিষ্কের বিভ্রান্তি ঘটাইতেছে। যে সকল ভাব গুরুজন সমক্ষে প্রকাশ করা দূরে থাকুক বন্ধুবর্গের নিকটও যাহা অকথ্য সেই ভাবরাশি ভাষা ও লেখনী সংযোগে বড় ছোট প্রায় সকল মাসিক সাহিত্যের অঙ্গে ব্রণের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় স্বাস্থ্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে পাওয়া যায় যাহার আদর্শ উচ্চ না হয় তাহা জনসমাজে বড়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠে। তথাকথিত বর্ত্তমান সাহিত্যসেবী বা বীণাপাণির অর্চ্চনাকারিদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় না যে তাহাদের উদ্দেশ্য সচন্দন কুসুমদামে বাগ্দেবীর অর্চ্চনা করা—বরং মনে হয় তাহারা যেন নিজ নিজ স্বার্থ চেষ্টাতেই প্রমত্ত। বড় বড় মঠের ও মন্দিরের মোহন্তদের জীবনোদ্দেশ্য আজ ঈশ্বরোপাসনা হইতে যেমন কাঞ্চনোপাসনায় গিয়া উপনীত হইয়াছে বর্ত্তমান সাহিত্যসেবীদের উদ্দেশ্যও যদি ঐরূপ হইয়া দাঁড়ায় তবে অগত্যা আমাদের বলিতে হইবে—"হে ভগবান, সাহিত্যিকদের হস্ত হইতে আমাদের নিস্তার কর!" অধুনা প্রকাশিত উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না—ধর্ম্ম, দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের জন্য বড় বড় আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ, দেখিতে পাওয়া যায় না ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, সত্য ও সংযমের ভূরি ভূরি নিদর্শন, দেখিতে পাওয়া যায় না কেমন করিয়া দীনহীন সমাজ ও দেশ ধীরে ধীরে স্বাধীনতার আলোকে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে, কেমন করিয়া ন্যায়, সত্য ও সাধনা সহায়ে চিরদুর্ব্বল মানব ঈশ্বরত্বে উপনীত হইতে পারে, কেমন করিয়া একটি ব্যষ্টি মানবের আত্মবিসর্জ্জনে দেশের সমগ্র নর-নারী অসত্যের পথ হইতে সত্যপথের আশ্রয় গ্রহণ করে,—কেবল দেখিতে

পাওয়া যায় দরিদ্র পল্লীবাসী ছাত্রের প্রেম, বিধবার আসক্তি, এবং সর্ব্বোপরি সধবার বিশ্বাসঘাতকতা—ইহাই অধুনা আমাদের সাহিত্য চর্চ্চার বিষয়। বড়ই দুঃখের বিষয় বড় বড় সাহিত্যসেবী ও নামজাদা মাসিক পত্রিকাগুলি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যিক ও পত্রিকাগুলি সকলেই এই ভীষণ অপবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না। সাহিত্যসেবার উদ্দেশ্য কি সমাজ ও দেশ সেবা নহে? সাহিত্যই সমষ্টি মানবের মধ্যে ব্যষ্টির ভাবরাশি বিকীর্ণ করিবার যন্ত্র স্বরূপ। তা ভাল হউক আর মন্দ হউক উভয় ভাবরাশিই সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়। যে সমস্ত নব্য সাহিত্যিক সমাজ, দেশ ও জাতির পাতে কিছু শুভকর, কিছু কল্যাণকর দ্রব্য দিতে সক্ষম নহেন তাঁহারা কি অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষের বাটী পরিবেশন করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যের পূর্ণ পরিসমাপ্তি করিবেন? আমাদের চিত্ত ত 'আদি-রসে' দিবারজনী হাবুডুবু খাইতেইছে, তাহাকে আর জোর করিয়া উহার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া লাভ কি? হিন্দুর সাহিত্য হইতে, হিন্দুর মস্তিষ্ক হইতে কি 'আদিরস' ব্যতীত অন্য সমস্ত রস এককালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? অন্য জাতির সম্বন্ধে তাহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুজাতির পক্ষে ঐরূপ হইবার কোন সম্ভবনা নাই। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় হিন্দুর বর্ত্তমান সকল বর্ণের মূলেই কোন না কোন ঋষি মহর্ষির অস্তিত্ব বিরাজ করিতেছে। যাঁহাদের মন একদিন পার্থিব ভোগবিলাস তুচ্ছ জ্ঞানে প্রকৃতি দেবীর অবগুণ্ঠন মোচন করতঃ তাঁহার অন্তরালস্থিত অনন্ত সৌন্দর্য্যসুধার এক বিন্দু পান করিয়া সমাধি সাগরে ডুবিয়া যাইত তাঁহাদের বংশধরগণ যে আজন্ম কবি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ যে প্রকৃতিসুন্দরীর অবগুণ্ঠনান্তরালে অন্য কোন রস-সৌন্দর্য্য না দেখিতে পাইয়া কেবল 'আদি-রসের'ই বিকাশ দেখিতেছেন ইহা তাঁহাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন—'যে বার বছর দাসত্ব করে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়।' হিন্দুর এই সহস্র বর্ষ ব্যাপী দাসত্বের ফলে যে তাহার মনুষ্যত্ব এককালে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার মতিগতি বক্র হইবে, রুচি

বিকৃত হইয়া যাইবে, যাহা কিছু সতেজ, বলকর তাহাতে বিরাগ জন্মিয়া যাহা কিছু দুর্ব্বলতাবর্দ্ধক, মস্তিষ্ক-বিকৃতিকর তাহাতে অনুরাগ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই উঠা-জাগার দিনে যখন সমস্ত হিন্দুজাতি স্বাধীনতার অমৃতবারি পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছে তখন আমাদের যাহা কিছু অমঙ্গলজনক, যাহা কিছু দুর্ব্বলকর, যাহা কিছু অবাধ উন্নতির পরিপন্থী, সেই সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে হইবে। আজকাল বাংলার প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে, জাতীয় ভাষার উন্নতিবিধানকল্পে দেশের বড় বড় মাথা চিন্তিত রহিয়াছে, তাঁহারা যদি ভাষার মধ্য হইতে যাহা কিছু পঙ্কিল, যাহা কিছু বিকৃত রুচির পরিচায়ক সেই সমস্ত কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে সচেষ্ট না হন তবে আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে—বাংলার পূর্ব্ব দিক্‌চক্রবালে মঙ্গল উষার পদার্পণে এখনও অনেক বিলম্ব। দেশের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহারা উৎকৃষ্টতর কিছু চাহে না, অন্ধকারে বহুদিন অবস্থান করিয়া আলোকের স্বর্ণরশ্মি আর পছন্দ করে না। তাহার নিদর্শনরূপে বলিতে পারা যায় বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে সমস্ত পুস্তক শিক্ষাপ্রদ, যাহারা উচ্চ ভাবের দ্যোতনায় মানব মনকে ভরাইয়া তুলে সেই সমস্ত পুস্তক দোকানে বহুদিন পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে কীটের আহার্য্য হইয়া থাকে; যে কয়টী মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্র দেশের উন্নতি বিধানের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সমাজ ও দেশের প্রকৃত সেবাই যাহাদের সাধনার একমাত্র লক্ষ্য তাহাদের জীবন দেশ-জননীর স্তন হইতে ক্ষীরধারার অভাবে আজ মৃতপ্রায়! বুদ্ধদেব, নিমাইচরিত, শঙ্করাচার্য্য, সাবিত্রী প্রভৃতি উচ্চ ভাবের নাটক সমূহ অভিনীত হইলে রঙ্গালয়ে আশানুরূপ দর্শকের অভাব হয় কিন্তু কুরুচিপূর্ণ নাটক ও প্রহসন সমূহের অভিনয়কালে অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে যুবক যুবতী, বালক বালিকা সকল শ্রেণীর দর্শকের আতিশয্যে রঙ্গালয় পূর্ণ হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—মানবের এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় ঘৃতাহুতি না দিয়া

উহাকে একেকালে নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করা। তাঁহাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন হইতে বিরত হইয়া উহাদের যথাসাধ্য সেবা করা। তাহা না পারিলে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের চিরবিদায় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য—কেন না কাহারও উপকার করিতে সক্ষম না হই অপকারের প্রয়োজন কি? মানবজাতির মঙ্গল সাধন না করিতে পারি—অমঙ্গলের হেতু হইব কেন? বর্ত্তমান সময়ে ভারতের জাতীয় জীবনের সকল স্তরেই যখন আমূল সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সকলের উদ্দেশ্যই যখন দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন তখন সাহিত্যিকগণের সকল সাধনাও ঐ একেরই অভিমুখী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভগবদ্ সাধনায় যেরূপ সংযমের প্রয়োজন, সংযম ব্যতিরেকে যেমন সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব সাহিত্য ক্ষেত্রেও তদ্রূপ সংযমের একান্ত আবশ্যক। সংযমহীনতা সাহিত্য সাধনাতেও নানারূপ ব্যভিচার সৃষ্টি করে। এই ব্যভিচার সাধকেরও অনিষ্ট সাধন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও সমাজকেও হীনাদর্শ করে। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ যদি সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিজ নিজ আভ্যন্তরিক কুরুচি সমূহ দেশের সর্ব্বসাধারণের পাতে এখনও পরিবেশনে বিরত না হন তবে অগত্যা অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইবে—"আপনি মজিবে ভাই, মজাবে লঙ্কায়!"

সমালোচনা

নিবৃত্তির পথে।—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। ইহাতে অতি সংক্ষেপে ষড় দর্শন প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক সাধনাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শারীরক মীমাংসাদি দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে যে কয়টী প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, যাঁহাদের তদ্‌বিষয়ক প্রচুর জ্ঞান আছে তাঁহাদের নিকট উপাদেয় হইলেও সাধারণের নিকট ইহা প্রায় দুর্বোধ্য। অতএব বঙ্গভাষায় ইহার পুনরাবৃত্তির সার্থকতা কি?

পথের সাথী।—স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাবিশারদ, কল্পতরু-গুরুকুল-পাব্‌লিশিং-হাউস। জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া অমর পথের পথিকের 'পথের সাথী'। উক্তি,—"বিশ্বাস কর, তোমার কর্ম্মজীবনই ভগবানচরণে রক্তজবার পুঞ্জীকৃত অঞ্জলি। প্রত্যয় রাখ, তোমার প্রত্যেকটী উজ্জ্বল চিন্তা, তাঁহার আরতির অমর আলোক।" "যত তিমিরাচ্ছন্নই হউক, না কেন মানুষ, আলোকেরই পুত্র; যত অবসন্নই হউক না কেন, সবলতারই সে উত্তরাধিকারী।"

পথের প্রদীপ।—স্বামী স্বরূপানন্দ। প্রকাশক—শ্রীনকুলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, কল্পতরু-গুরুকুল-সমিতি। জাতীয়তার সাধন "পথের প্রদীপ।" উক্তি—"নির্ভর করিও, জ্বলন্ত সাধনায়—জীবন্ত তপস্যায়, কথার উপরে নয়। বিশ্বাস করিও, প্রাণের প্রেরণায়—অন্তরের আহ্বানে, বাহিরের উচ্ছ্বসিত শত কল কোলাহলে নয়।" "হৃদয়টাকে যে যত নির্ব্বিচারে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে বিলাইয়া দিয়াছে, সে তত বলবান্; আর অপ্রেমের দৃঢ় রজ্জুতে আপন বিরাট অস্তিত্বটাকে বাঁধিয়া যে যত সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সে তত দুর্ব্বল।"

দেশের কাজ ও পল্লীর ব্যবস্থা।—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দে। প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী। লেখক বলিতেছেন "মানুষ তৈয়ারীর কথা বলিতে যাইলেই আমাদিগকে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে Child is the father of a man." "পিতামাতার কর্ত্তব্যের উপর শিশুর পূর্ণ মনুষ্যত্বের দাবী করা যদিও অন্যায় তবুও ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে মনুষ্যত্বের foundation stone (ভিত্তি প্রস্তর) পিতা-মাতাকেই সর্ব্বাগ্রে বসাইতে হইবে।" "যাহার নিকট হইতে কোনও বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায় তিনিই গুরু; গুরুর জাতি বর্ণ ভেদ নাই। তাঁহার আদর্শ এবং কর্ম্মময় জীবনই শিশুর ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক।" "আদর্শ যুবকমণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে হইলে বালকগণকে উপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে হইবে।" "Yellow Perilএর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ভীতিও বালকগণকে শঙ্কিত ও ত্রস্ত করিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্য জ্ঞান

হইতে অনেক দূরে সরাইয়া" ফেলিতেছে।" জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতেছেন "জাতীয় প্রাচীন্ ইতিহাস জ্ঞান বিজ্ঞানের অসীম ভাণ্ডার এখনও যাহা অনন্ত সমুদ্রের মত পড়িয়া রহিয়াছে তাহার অতল তলে ডুবিয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নবীন সভ্যতার পাশ্চাত্য মেঘ খানি কোন্ স্থানে যাইয়া দাঁড়ায় তাহারও একটা সন্ধান রাখিতে হইবে। মোট কথা প্রাচ্যের অনন্ত জ্ঞান রাশির সহিত পাশ্চাত্যের ব্যবসায়াত্মিকা আধুনিক শিল্প চাতুর্য্য ও নব নব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আমাদিগকে আপনার করিয়া লইতে হইবে।" "পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। এ ইতিহাস দুই একটি রাজা গজার বংশ তালিকা নয়, ইহা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং নূতন পুরাতন সর্ব্বকালিক দেশের অবস্থা, আচার ব্যবহার; আদান প্রদান পদ্ধতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষিসাহিত্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত সমস্ত বিষয়ে যে কোন Exhaustive খবর দিতে পারে সেইরূপ ইতিহাস পড়িতে হইবে; ভৌগলিক বৃত্তান্ত, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধার কথা সমস্তই শিখিতে হইবে।" কৃষি—"ভারত কৃষি প্রধান দেশ,—এ দেশে চাল, গম, পাট, তিষি, তুলো, চা, নীল, ইক্ষু যাবতীয় Raw material এবং কত প্রকার খনিজ পদার্থ ই না জন্মাইতেছে, কিন্তু আমরা বিলাসিতায় গা ভাসাইয়া দিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া আলস্যের এক একটি জীবন্ত বিগ্রহের মত সখের জন্য সমস্ত দ্রব্যই বিদেশীকে বিকাইয়া দিয়া দু' আনার জিনিষ ভড়ং বদলাইয়া পাঁচ টাকায় কিনিতে বাধ্য হইতেছি, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় এবং মূর্খতা কি হইতে পারে।" শিল্প—"আর্থিক হিসাবে ভারতকে বড় করিয়া তুলিতে হইলে ভারতের গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে শিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে; বৃহৎ বৃহৎ mill, factory ইত্যাদি করিয়া পাশ্চাত্য অনুকরণে ব্যয়ের ভার বাড়াইয়া ফেলিয়া, পাশ্চাত্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগীতা ভারতের পক্ষে আপাততঃ সম্ভব হইবে না।" "এরূপ ভাবে শিল্প প্রচার করিতে হইবে যে সামান্য মানবকেও ভারতবাসী কোন দিন অপমান জনক মনে না করে এবং এমন কি বিলাসের সাজসরঞ্জামের জন্যও যেন

সে কোন দিন পরের দ্বারে হাত পাতিয়া চাহিয়া না থাকে।" রপ্তানি ও আমদানী—"ভারতের এই অভাব দূর করিতে হইলে প্রথমতঃ ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যাদির অবাধ রপ্তানি দুই দিন আগে হোক বা পরে হোক যে কোন প্রকারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের দরকার তাহার অতিরিক্ত আমরা উৎপন্ন করিব না বা করিলেও তাহার উপর দেশের একটা control থাকিবে। বিদেশীয় দ্রব্যাদি যাহাতে ভারতের হাট ঘাট গ্রাম মাঠকে ছাইয়া ফেলিতে না পারে তজ্জন্য বিদেশীবর্জ্জন পণ করিতে হইবে; অন্যথায় সহস্র চেষ্টাতেও দেশীয় শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না এবং সমস্ত আশা বিলীন হইয়া যাইবে।" পল্লী সংস্কার—"পল্লীদৃশ্য যতই কেন বিভিষিকা-ময় হউক না কেন তাহার সাম্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ভার আমাদের" কত প্রাণ নষ্ট হইবে, কত প্রকার দুঃখের ঝঞ্ঝায় এবং নিরাশার হুহুরবে মনপ্রাণ অস্থির হইয়া দেহটী আত্মগোপনে প্রয়াস পাইবে; দেহ আর চলিতে চাহিবে না. কত অপমান সহ্য করিতে হইবে, তখন অতিষ্ঠ হইলে চলিবে না।" স্বাস্থ্য—"গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট সংস্কার ও জলাশয় খননের ব্যবস্থা করিতে হইবে; দরকার হইলে তজ্জন্য নিজের হাতে কোদাল ধরিতে হইবে। ছোটখাট খানা ডোবা যাহার ভিতরকার অপরিষ্কার জল গৃহীর স্বাস্থ্য রক্ষার বিঘ্ন ঘটায় সে সমস্ত বিষয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া ঐ সমস্ত গর্ত্তাদি ভরাট করাইয়া লইতে হইবে।" তাহা ছাড়া প্রাচীন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, কূপ খনন, বৃক্ষ রোপন, জঙ্গল পরিষ্কার, খাল, বিল, ডোবা, ঝিল বা পুকুরের জলে মল মূত্রাদি ত্যাগ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে। জলে ডোবা, আগুণে পোড়া, সর্পাঘাত প্রভৃতি আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষার উপায়, এবং মাদক দ্রব্য ব্যবহার প্রভৃতির অনুপকারিতা শিক্ষা দিতে হইবে। পুস্তকাগার, Co-operative Banking Society বা যাহাতে কৃষকগণ সামান্য সুদে একজন মাত্র জমীদারের সাহায্যে যে কোন সময়ে হাত পাতিবা মাত্র টাকা পাইতে পারে তাহার

বন্দোবস্ত, Poultry বা হাঁস, পায়রা, ছাগ, মেষ প্রভৃতি পুষিবার বন্দোবস্ত, মৎস্য, গরু, শূকর প্রভৃতির সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বামীজীর 'সোনার-ভারত' আবিষ্কারের পথ অতি দুর্গম বলিয়া কবির গানে গ্রন্থারম্ভে লেখক প্রার্থনা ও দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন,—

"তোমার পতাকা যারে দাও বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া, দুঃখের মাঝে দুঃখের ত্রাণ
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুকতি
দুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি।"

* * * *

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে।
একলা চল, একলা চল, একলা চল রে॥
যদি কেউ কথা না কয়—(ওরে, ওরে ও অভাগা!)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা বল রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়—(ওরে, ওরে ও অভাগা!)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্ত মাখা চরণতলে একলা দল রে॥
যদি আলো না ধরে—(ওরে, ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বল রে।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে॥
একলা চল একলা চল
একলা চল রে॥"

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অভাব অভিযোগ এবং উহা কি ভাবে প্রবর্ত্তন ও পরিচালনা করিলে ভবিষ্যৎ স্ত্রীসমাজের কল্যাণ হইবে এ সমস্যা আজ প্রত্যেক ভারত ভারতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত। এমন সময় আসিয়াছে যে, আমাদিগকে চুপ্ করিয়া আর ভাবিলে চলিবে না—এখন বিলম্বের অর্থ জাতীয় উন্নতির অগ্রগতিতে বাধা প্রদান। 'স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার কর' এই রব যেমন আমরা নিত্য' শুনিতেছি, তখনই আবার ভাবনা, কি প্রকারে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাহাতে ভারত-লক্ষ্মীদের অন্তরের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা নষ্ট না হয়, বিকৃত না হয়।

রমণীগণের জীবন ভারতে বর্ত্তমান কালে কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত—পাশ্চাত্য মহিলাগণ, সমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেছেন, ভারতের কন্যাগণকে সেই সকল কতদূর প্রদান কর্ত্তব্য,—প্রভৃতি সমস্যাসকলের মীমাংসাস্থলে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"স্ত্রীজাতীর জীবন ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সকল কথা রমণীগণের দ্বারাই নিরূপিত হওয়া উচিত—কারণ, তাঁহাদিগের ন্যায্য অভাব ও আকাঙ্ক্ষা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেকস্থলে নিঃস্বার্থ পুরুষগণেরও সামর্থ্যে কুলায় না। অতএব বৈদিক-যুগে রমণীদিগকে পুরুষের ন্যায় যেরূপে সমভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হইত, এখনও ঐরূপ করিয়া অন্য সকল বিষয়ে আমাদিগের নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। উহাতে সুশিক্ষিতা, স্বার্থপরিশূন্যা মহিলামণ্ডলী, সীতা সাবিত্রী প্রমুখ ভারতের জাতীয় রমণী-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।"

স্বামিজীর শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়োগ মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া বেলুড় রামকৃষ্ণ-মঠের কর্তৃপক্ষগণ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীস্থ বসুপাড়া লেনে ১৭নং ভাড়াটিয়া বাটীতে—বালিকা ও অন্তঃপুরচারিকাগণের কল্যাণকল্পে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক গত অষ্টাদশবর্ষ কাল উহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ভারতের শুভ সাধনে আজীবন ব্রতধারিণী গুরুগতপ্রাণা, পরম বিদুষী সিষ্টার নিবেদিতা ও সিষ্টার ক্রিষ্টিনা নাম্নী পাশ্চাত্য ব্রহ্মচারিণীদ্বয় এবং ব্রহ্মচারিণী সুধীরা দেবী সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দৈন্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া ঐ মন্দিরে আরাধ্য দেবতার উদ্বোধন, আবাহন ও প্রাণদান পুরঃসর অন্তর্বাহ্য পূজায় সতত নিযুক্তা থাকিয়া ঐ কার্য্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষার যজ্ঞানলে সিষ্টার নিবেদিতা, ব্রতধারিনী সুধীরা তাঁহার জীবন পূর্ণাহুতি স্বরূপে প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যাপ্রভাবে শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার পরিচয় গত অষ্টাদশ বর্ষের কার্য্য সাফল্য। বহু বালিকা ও অন্তঃপুরচারিণী রমণী এই মন্দিরে সমাগতা হইয়া প্রকৃত শিক্ষালাভে ধন্যা হইয়াছেন ও হইতেছেন।

এই মন্দিরের পরিচালিকাগণ ত্যাগ, তপস্যা, সংযম ও পরহিতে জীবনোৎসর্গ করা রূপ ব্রত স্বয়ং অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে বৈদিকযুগের ব্রহ্মচারিণীদিগের ন্যায় উন্নতচরিত্রা হইতে একদিকে যেমন শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন অন্য পক্ষে সামাজিক মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম অটুট রাখিয়া যাহাতে তাহারা আবশ্যক হইলে আপনার ভার আপনি স্কন্ধে লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদ্রূপ কার্য্য ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরশীলা করিতে যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

যে বিদ্যামন্দির ঐরূপে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে রমণীগণের জীবন মহিমান্বিত করিতে এতকাল ধরিয়া সচেষ্ট আছে, তাহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতে আমরা আজ সকল নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। হে ভারত ভারতী! আজ সত্যই যদি আবার স্ত্রীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে

চাও, সমাজের কল্যাণ চাও তবে নিজ জাতির কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া এইরূপ কার্য্যে সহায়তা কর—উপযুক্ত স্থানে ও ভবনে এই শিক্ষা মন্দির চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা কর। তোমাদের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিদ্যালয়ের জন্য বাগবাজার পল্লীস্থ নিবেদিতা লেনে প্রায় ষোল কাঠা পরিমিত ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভাড়াটিয়া বাটী এতই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে উহাতে কার্য্য চালান বিপজ্জনক। ছাত্রীনিবাসও এত অল্পপরিসর যে উহাতে আর ছাত্রী লওয়া অসম্ভব হইয়াছে;—দিন দিন নূতন ছাত্রী প্রবেশের আবেদন আসিতেছে—কিন্তু স্থান কোথায়, অর্থ কোথায়? এই বিদ্যাদানের এবং মাতৃ জাতির কল্যাণ করিবার শুভাবসর আজ দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত। এই শুভানুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিবেন তাহার শতগুণ সামাজিক কল্যাণরূপে ফিরিয়া পাইবেন। এই বালিকা-শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইয়া আজ সহায্য প্রার্থী আমরা ভারতের প্রত্যেক জনক-জননীর নিকট দণ্ডায়মান। আশা করি আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। ভগিনী নিবেদিতার অমূল্য জীবনব্যাপী সাধনা পূর্ণ হউক!

আমরা আনন্দের সহিত সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত করিতেছি যে শ্রীমতী সংজ্ঞা দেবী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দেশীয় ভগিগণের নিকট হইতে অতি সামান্য সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া মোট ৩৬১৫।৫ এই সৎকর্ম্মে সাহায্য করিয়াছেন এবং আরও ১৫০০৲ টাকা তিনি শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবেন বলিয়াছেন। এই সচ্চেষ্টা সকল মহিলারই অনুকরণীয়। আমাদের মনে হয় এইরূপ আদর্শে প্রতি জননী চেষ্টা করিলে এই কার্য্য অতি দ্রুত গতিতে সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ বসু, (আগ্রা কলেজ), তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিনী শিবরাণী বসুর স্মৃতি-রক্ষার্থে ৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। শিবরাণী এই বিদ্যালয়েরই একজন বিশিষ্টা ছাত্রী ছিলেন। আজ যদি তিনি ইহজগতে থাকিতেন তাহা হইলে এই স্ত্রীশিক্ষাসঙ্ঘ তাঁহার নিকট বহু প্রকারে কল্যাণ লাভ করিত। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা যথার্থই ব্যথিত।

অনুগ্রহপূর্ব্বক শিক্ষামন্দির-কল্পে যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে—

সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
১নং মুখাৰ্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

"ভারতবর্ষে দারিদ্র্য অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে—ইহা সৌভাগ্য বটে; কিন্তু দারিদ্রের সঙ্গে ব্যাধির যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহা নিশ্চিত।"

—"প্রবুদ্ধ ভারত"
সেপ্টেম্বর ১৯২১।

*

"বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকে মনে করেন;..................... আমেরিকাবাসীর নিকট দেশের মান মর্য্যাদা তাহার ভগবানের অপেক্ষাও প্রিয়তর।"

—"বেদান্ত কেশরী"
সেপ্টেম্বর ১৯২১।

* * *

"আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এক অত্যাবশ্যকীয় গুণ।"

—"মেসেজ্ অব্ দি ইষ্ট"
জুন ১৯২১।

পূজার আনন্দ।

বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিন কয়টী পলে পলে শেষ করিয়া সেই পূজার দিন আবার আসিয়াছিল,—কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে কত হৃদয়ের উদ্বেলিত ধারায় দিগ্দেশ পূর্ণ করিয়া যেমন আসে, আমার এই শ্যামা মায়ের বিশাল বক্ষ শ্যাম-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া আসিল প্রথম শরৎ—আনন্দময়ী মায়ের আগমন বার্ত্তা লইয়া, তাহার মধুর হাসির দীপ্তি বিকীরণে আকাশ ভুবন আলোকিত করিয়া। তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলাম, আর তাহার অভিনন্দনের জন্য আমি আমার কণ্ঠে সঞ্চিত অতীত-স্মৃতির যে বিচিত্র বরণ-ডালা সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহা সেই সুন্দরের চরণে উপহার দিলাম! সঙ্গে সঙ্গে আসিল —শারদীয়া আনন্দময়ী দেবী ;—শরতের সৌন্দর্য্য-গরিমার উপর আনন্দের ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাকে আরও সৌন্দর্য্যময় আরও মহিমাময় করিয়া। বড় আনন্দে মাকে বরণ করিলাম; কিন্তু জানিনা সে আনন্দ হৃদয়ের কিনা। কেবল আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দোচ্ছ্বাসে চতুর্দ্দিক ভরিয়া যাওয়া যেন একটা চিরন্তন প্রবাদ তাই নিরানন্দকেই আনন্দ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আনন্দের স্বতঃ উচ্ছ্বাস আজ তীব্র দহনের নিষ্ঠুর জ্বালায় যেন চিরতরে শুষ্ক, নিরাশায় বিলীন।

এই পূজার বার্ত্তা একদিন বঙ্গের প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে গৃহস্বামীর হৃদয়ে, শিশুর প্রাণে প্রাণে ঘোষিত হইয়া মুখের যে আনন্দ তাহারা তাহাতে আত্মহারা হইত, আজ তাহাদেরই জীবনে সে আনন্দ স্বপ্নে পর্য্যবসিত, সে শোকের তরঙ্গে বিধ্বস্ত। দেশের, বিরাট সমাজের সকলেই কি তবে আজ একই বেদনায় জর্জ্জরিত? না তা নয়।

আজ কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চায়না, কেহ কাহারও সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া অপরের ব্যথার ভার আপনার বুকে লইতে পারে না। আজ প্রত্যেকেই আপনার সুখে আপনি ভাসমান, আপনার দুঃখের অকূল পাথারে আপনি মজ্জমান। আশ্রয়তরী ভগ্ন, দিক হারা হইয়া তরঙ্গাভিঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

তাই আজ আনন্দময়ীর আগমনে কাহারও রত্নাভরণ শোভিত কৈলাস-প্রতিম প্রাসাদ খানি আনন্দ ও হাস্য কৌতুকের উচ্চ কোলাহলে মুখরিত, আবার কাহারও জীর্ণকুটির খানি শোক বিষাদ-জনিত করুণ ক্রন্দনের মৃদুরোলে পরিপূরিত। কেহ তাহার জীর্ণকুটির অঙ্গনে বসিয়া ভাবিতেছে পূজার কথা,—সেই সুদূর অতীতের কত স্মৃতি বিজড়িত দিনের কথা—যে দিনে সেও তার প্রতিবেশীর মত কত আনন্দে কত উৎসাহে, কত আশায় হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছে। —সেই পূজাইত আবার আসিল ? কিন্তু তাহার সে আনন্দ কই, সে উৎসাহ কই, সে আশাই বা কই ? আজ তাহার দশদিক অন্ধকার বিষাদময়! আজ তাহার সকল আশ্রয় হারাইয়া গিয়াছে তাই শূন্য হৃদয়ে শূন্যে ভর করিয়া মার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, যদি সেই বরাভয়দাত্রীর চরণে আশ্রয় পায়। কিন্তু হায় একি! যেখানে সামর্থ্যের বিচিত্র প্রাসাদ-শিখর গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান, তাহারই পার্শ্বে এই নিরাশ্রয় দীনের জীর্ণ কুটিরখানি পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত অনুগ্রহা-কাঙ্ক্ষায় ভর করিয়া ; কিন্তু সামর্থ্যের সেদিকে চাহিবার অবসর নাই, সে আপনার গরিমায় আপনি ভরপূর।

দেখিলাম—দীনা অনাথিনী-জননী বড় আশায় বুক বাঁধিয়া সামর্থ্যের তোরণদ্বারে দাঁড়াইল, শুধু তাহার প্রাণপ্রতিমাটীর জীবনরক্ষার মানসে। হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল :—"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে, হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়ে কাঙ্গালিনী মেয়ে"। কিন্তু হায়! তাহার কাতরতা শুনিবে কে, তাহার অবস্থা দেখিবেই বা কে ? সে একটু মুখের সান্ত্বনাও পাইল না, তাহার ভূম্যবলুণ্ঠিত দেহের সকল শক্তি নিয়োজিত ক্ষীণ প্রার্থনার স্বর কেহ শুনিলনা—

বাতাসের দোলায় ভাসিয়া গেল, শুধু লৌহময় তোরণদ্বারে প্রতিহত একটী প্রতিধ্বনি কানে ফিরিয়া আসিল—"কিছু খাবার দাও, এক টুক্‌রা কাপড় দাও"। শিশু আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল—মায়ের বক্ষে শেল বিধাইয়া। ক্রমে অবসন্ন হইয়া শিশু স্নেহময়ীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। পাগলিনী স্নেহের পুত্তলটীকে বক্ষে চাপিয়া ছল্ ছল্ নেত্রে দাঁড়াইল আসিয়া পূজা মন্দিরের অঙ্গনে। হৃদয়ের বেদনা উচ্ছ্বসিত ধারায় বহিয়া নীরব ভাষায় আনন্দময়ীর প্রতিমার উদ্দেশ্যে জানাইল:—"মাগো! এত বাঁশী এত হাসিরাশি, এত তোর রতন ভূষণ, তুই যদি আমার জননী মোর কেন মলিন বসন"।

তখন মার বোধন-উৎসব শেষ হইয়াছে। দেখিলাম পূজামন্দিরে করুণাময়ীর প্রতিমা সজ্জিত, সম্মুখে পূজার উপকরণ স্তূপীকৃত; কিন্তু যেন প্রাণহীন! তারপর শুনিলাম—সামর্থ্য-নিয়োজিত পূজারীর অর্থাকাঙ্ক্ষিত প্রাণ "ধনংদেহি, পুত্রংদেহি, যশোদেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে" রবে পূজা শেষ করিল। মন্দিরাঙ্গনে "অন্নং দেহি, বস্ত্রং দেহি" রব অন্নপূর্ণার কানে গেলনা। বুঝিলাম না ইহা পূজা কি পিপাসিতের পিপাসা শান্তির দারুণ চাঞ্চল্যের প্রেরণায় অসার প্রাণহীন আয়োজন! আজ দেশময় কেবল তৃষিতের ব্যাকুল চীৎকার "দেহি দেহি"। এই কি আমাদের সেই মা! মাগো! কোন অপরাধে আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা? অপরাধের সীমা নাই। এই যে দিগন্ত ভরিয়া যাতনা রুদ্ধ বেদনাগীতি, ইহা কি মার কোমল প্রাণে আঘাত করিয়াছে? কেন করিবে? কার কাছে জানাইলাম? মাটীর প্রতিমার কাছে না আদ্যাশক্তির চিন্ময়ী মূর্ত্তির কাছে? সত্য যদি হৃদয়ের সকল কালিমা ছাপাইয়া উঠিয়া উত্তর দেয় তবে বলিতে হইবে—'মাটির প্রতিমার কাছে, স্বার্থাসূয়ার বিকট মূর্ত্তির কাছে, বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষার কাছে' আজ পূজার আয়োজন!! আমার অতীত পুরুষের কীর্ত্তি নামে মাত্র বজায় রাখা, পুরোহিতের প্রাপ্য হইতে তাহাকে নিতান্ত বঞ্চিত না করা, সর্ব্বোপরি আপনার গৌরব প্রচার করা। তারপর আবার আপনার প্রাণহীন দৈন্যের রঙে

ঢাকিবার জন্য অদৃষ্টের দোহাই স্বরূপ মায়ের ত্রুটী ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হই না। আজ পূজা বাড়ীতে অন্নপূর্ণার আগমনে দীন আতুরের সেবা-মুখরিত আনন্দকোলাহল কোন্ নিরাশার নিবিড় আঁধারে মিলাইয়া গিয়াছে। আছে শুধু তার উজ্জ্বলস্মৃতিটুকু—যাহা এখনও প্রাণের ভিতর অব্যক্ত আকুলতার তরঙ্গ ছুটাইয়া দেয়। তাই বলি মা! আমার অপরাধ অপরিমেয়, জানিনা বিধাতার কাছে ইহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান কি আছে। হায়! কে এই আশ্বাসবাণী শুনাইবে যে আমার সেই স্বপ্ন-জীবন আবার বাস্তব জীবনে পরিণত হইয়া সেই প্রাণ সেই হৃদয় ফিরাইয়া আনিবে? আর অপরাধের বাকী কি? বাস্তব জীবন আজ স্বপ্নের মত অচিন্তনীয় অসম্ভাব্য! দেবতার সিংহাসন তাই আজ অসুরের পদভরে নিপীড়িত বিপর্য্যস্ত, কলঙ্কিত, চিরতরে বিনষ্ট প্রায়!

এইরূপে মার পূজা শেষ হইল। দেখিলাম—দেশের বিশাল বক্ষ ভরিয়া একটা বিরাট শোকাভিনয়ের করুণ দৃশ্য। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু করিলাম কি? করিব আর কি? করিবার শক্তিই বা কোথায়? আমাদের সকল শক্তি আজ নিষ্পেষণে তরল-বহ্নি অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাই জীবনের একমাত্র সম্বল। তাই সেই সম্বলই মার চরণে উপহার দিয়া বিসর্জ্জন-উৎসব শেষ করিলাম। কাঁদিলাম সত্য, কিন্তু কাহার জন্য? নিজেরই জন্য, স্বার্থের জন্য। আজ আমার সমস্ত জীবনই স্বার্থে পরিপূর্ণ, দুঃসহ ভারে অবনত। এখন এই 'স্বার্থ' এই 'আমিত্ব' হৃদয়ের সকল স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, আমার কর্ম্মাকর্ম্ম, পূজা-প্রার্থনা সবই এক অভিনব বর্ণে চিত্রিত করিয়া জীবন-গতি এক লক্ষ্যহীন অভিনব পথে মরুর বক্ষে পিপাসিত পথহারা পথিকের ন্যায় সীমাহীন দারুণ প্রান্তরে ছুটাইয়া দিয়াছে। এ গতি রোধিবে কে? আজ আমি 'স্বার্থ' ছাড়া আর সব বিসর্জ্জন দিতে পারি।

তাই বলি মাগো! যে হৃদয় স্বার্থাসূয়ার অত্যাচারে সর্ব্বদাই কলঙ্কিত সেখানে তোর বোধন-উৎসব কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইল মা? এখনও তোর পূজার সময় হয় নাই, তোর পূজার আয়োজনই করিতে পারি

নাই। পূজার সময় হইবে তখন—যখন আমার এই উন্মত্ত 'আমি' বিশ্বের 'তুমির' মধ্যে চিরদিনের মত হারাইয়া যাইবে। "বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর, আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর"? আমার বিধাতা আমাতে কি এখন জাগিয়াছেন? 'সেদিন আমার কবে বা হবে? ও-রূপ হৃদয় মাঝে ভাতিবে, সেদিন কবে হবে? নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ভাসিব রূপসাগরে। শান্তং শিবমদ্বিতীয়ম্ রাজ রাজ চরণে, কবে বিকাইব?' কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? হৃদয় দেবতার দ্বার রুদ্ধ আমার প্রাণযন্ত্র বিকল, স্নায়ুমণ্ডলী অনুভূতি বিহীন। তাই সব নীরব নিস্তব্ধ কোন উত্তর নাই। মা করুণাময়ী! আবার বলিতেছি তোর পূজার আয়োজন এখনও হয়নি। তোর পূজা করিতে কে আমায় শিখাইবে মা! আমি যে কর্ণধার বিহীন! বিশ্ব জননী! আমার লক্ষ্যহীন শূন্যের মাঝে স্নেহময়ী বরাভয় দাত্রী মাতৃ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া, দৈত্যকুলের ভীতি উৎপাদন করিয়া একবার 'মাভৈঃ মাভৈঃ' বাণী শুনা মা! আমার সকল ভয় দূরে পলাইয়া যাক্, —সকল বন্ধন টুটিয়া যাক্, অসার সুখের হাট চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া যাক্। তবে আমার এই কলঙ্কিত প্রাণ পবিত্র হইবে, নিষ্ঠুর নির্ম্মমতায় দূরে সরাইয়া তেজোগরিমার কমনীয় মূর্ত্তি প্রকাশিত হইবে, আমি তোর চরণে আত্মবলি দিয়া তোর নিখিল বিশ্বে আপনাকে হারাইয়া দিয়া পূজার যোগ্য হইব। মাগো! আমার সকল শোক, সকল দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা, সকল কালিমা আজ তোর বরে আমার প্রাণ জাগাইয়া দিক্—তবে শোক-বিষাদ অশ্রুই আমার জীবনের সাথী হইলেও ধন্য হইব, আত্মবলি দিয়া আপন হারা হইতে শিখিব, দেশময় তোর পূজার মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইবে! "যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার—আঘাত সে যে পরশ তব সেই ত পুরস্কার।" আমি অশ্রু বন্যাকে ভয় করি না মা! ইহাই আমার জীবনের কাম্য—সেও ত তোরই দেওয়া!

এস ভাই! মার কোটি সন্তান আজ এক সঙ্গে মিলিয়া, প্রাণে প্রাণ, হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া মার বোধন উৎসবের আয়োজন করি,

মার নিখিল বিশ্বে আপনাকে হারাইয়া ফেলি। তবেই জীবনে সার্থকতা আসিবে, জন্মে সফলতা আসিবে। নতুবা এই আসা যাওয়া পথের পরিশ্রম ও লাঞ্ছনাই একমাত্র সার হইবে। এস আজ আব্রহ্ম—হিমানী-মাতৃভূমির দিগন্ত-প্রসারিত বক্ষ কম্পিত করিয়া প্রাণ খুলিয়া গাহি :—
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

যে নিপুন ভাবে ছোট কায করতে পারে, বড় কাযেও সে সম্পূর্ণতা দেখাতে পারে। অবস্থাচক্রে পড়ে অতিবড় মূর্খ সেও হঠাৎ একটা বড় কায করে ফেলতে পারে—কিন্তু তাই বলে তাকে মহৎ বলা যায় না। প্রকৃত মহত্ত্ব সেখানেই যে দৈনন্দিনের অতি ক্ষুদ্র কায থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত মনপ্রাণ দিয়ে করতে পারে—তা তাতে তার সিদ্ধি আসুক আর না আসুক।

* * *

বড় বড় কর্ম্মীদের জীবনের মন্ত্র হচ্চে "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি"! কর্ম্মফলের দিকে তাঁরা দৃষ্টি আদৌ করেন না—ফলটাকে সিদ্ধি বলে গ্রহণ না করে কর্ম্মের নিপুণতা এবং আন্তরিকতাটাই তাঁরা সিদ্ধি বলে গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রে যাঁরা সিদ্ধ হাতাশা বা নিরানন্দ বলে কোনও জিনিষ তাঁদের কাছে আসতে পারে না—কারণ কর্ম্মফলে তাঁহারা আসক্তি বর্জ্জিত—তাঁদের লক্ষ্য নিপুণতা এবং আন্তরিকতার উপর—যা তাঁদের কাছে সিদ্ধির সমতুল।

আমরা স্বরাজ গড়বার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি কিন্তু অতবড় কাযটা করবার আগে আমাদের প্রতিকর্ম্মে নিপুণতা এবং আন্তরিকতা এবং উহাতেই সিদ্ধিজ্ঞান করতে শিখতে হবে—ছোট ছোট কর্ম্ম করে। ঐ দুটি চরিত্র আমাদের ফুটিয়ে তুলতে হবে প্রথমে পারিবারিক জীবনে, পরে সামাজিক জীবনে তারপর জাতীয় জীবনে। পারিবারিক জীবনে খাওয়া পরা প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ছাড়াও উৎসবাদি অপেক্ষাকৃত বড় কায আছে। সেগুলি যেমন আন্তরিকতা এবং নিপুণতার সহিত করতে হবে তেমনি আবার পরিবারের সকল অঙ্গের সমবেত চেষ্টায় হওয়া চাই।

* * *

ব্যক্তিগত চরিত্রে নিজ দেহ মনের কল্যাণ হয় কিন্তু সমবেত চেষ্টায় যে চরিত্র গঠিত হয় তার দ্বারা নিজ দেহ মন এবং দশের কল্যাণ হয়। পারিবারিক জীবনে পূজাপার্ব্বনাদি বড় কর্ম্ম সকল যদি অতি শিশু হইতে গৃহস্বামী পর্য্যন্ত সকল অঙ্গের সমবেত চেষ্টায় সাধিত হয় তা হলে তাঁর দ্বারা যে চরিত্র গঠিত হয় তা সামাজিক সম্পূর্ণতা আনয়নের এক মহৎ সহায় হবে। বল্‌তে পারেন 'পারিবারিক উৎসবাদি ব্যাপার ত সকলের চেষ্টার সমবায়েই হয়ে থাকে'। হয়ে থাকে বটে কিন্তু উহা অনুপানযুক্ত হয় না বলেই উহার দ্বারা যথার্থ কল্যাণ লাভ হয় না, যেটুকু হয় সেটুকু কেবল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার সৃষ্টি করে মাত্র কিম্বা কর্ম্মের বিফলতায় হতাশা এসে সকলের হৃদয় অধিকার করে।

* * *

সেই অনুপান হচ্চে—(১) 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' এই জ্ঞান—অর্থাৎ কর্ম্মের নিপুণতা এবং আন্তরিকতাটাকেই সিদ্ধি জ্ঞান করা—ফলের আসক্তি ত্যাগ করতে হবে; কারণ কর্ম্মে আমাদের অধিকার আছে—ফলাফলে ভগবানের হাত। কিন্তু এ রকম শুষ্ক ভাবে আমরা কার্য্য করতে পারি না যদি ভগবানে আমাদের প্রেম না থাকে। সেই জন্য কর্ম্মের আর এক অনুপান হচ্চে—(২) প্রেমময় হরি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, এই সত্যে সংস্কারবান হয়ে সকল কর্ম্মের দ্বারা তাঁর সেবা।

যদি যথার্থই আমরা ভগবানকে ভালবাসি এবং জানি যে তিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান তাহলে প্রিয়তমের সেবার জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টায় নিপুণতা এবং আন্তরিকতা আপনিই আসবে, ফলাফলের দিক থেকে নজর আপনিই সরে যাবে। উদাহরণ,—যেমন মা ছেলের সেবা করেন প্রত্যুপকার পাবার জন্য নয়—পুত্র সম্বন্ধে ভালবাসাই তাঁর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, ছেলে তাঁর অনিষ্ট কল্লেও তিনি তার অনিষ্ট করতে পারেন না—তিনি তাঁর মঙ্গল কামনা করতে বাধ্য। প্রেম জিনিষটি জোর করে দেহ মন প্রাণ দিয়ে তাঁকে তার সেবা করাবে।

* * *

কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে জীব-বুদ্ধিতে যে ভালবাসা পণ্ডিতেরা তাকে মায়া বলেছেন। কারণ ব্যক্তি বিশেষে ভালবাসা থেকে অপরের প্রতি দ্বেষ উপস্থিত হয়। আর ব্যক্তি বিশেষে ঈশ্বর বুদ্ধিতে যে ভালবাসা তাকে পণ্ডিতেরা পূজা বলেছেন। কারণ এস্থলে সেবকের নিকট সকলেই তার প্রিয়তমের প্রতীক রূপে বর্ত্তমান সেই জন্যে দ্বেষ, হিংসা তার হৃদয় আশ্রয় করতে পারে না।

* * *

পারিবারিক জীবনে এই দুই চরিত্র ফুটিয়ে তুলে যদি আমরা সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হই তবেই আমরা আদর্শ-সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ হব। তা না হলে কতকগুলো দ্বেষ হিংসা নিয়ে সমাজ গড়্‌তে গেলে কেবল দলাদলি ও অশান্তির সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হবে না।

* * *

ঐ যে আগে প্রেম জিনিষটির কথা আমরা বলেছি, ঐটি এলেই সমাজ এবং পরে জাতি গড়বার সকল চারিত্র্য-উপাদান লাভ করা যেতে পারে। সে চরিত্রগুলি এই,—(১) উদারতা (২) ত্যাগ (৩) তপস্যা (৪) সত্যতা (৫) শ্রদ্ধা ও (৬) মৌলিকতা।

* * *

(১) যিনি প্রেমিক, প্রেমময় হরিকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, তিনি

উচ্চ-নীচ, পুণ্যবান—পাপী, রাজা-প্রজাকে সমভাবে প্রীতির চক্ষে অবলোকন করেন। তাঁরা সমাজের কোন অংশকে বাদ দিতে চান না—সংশোধন করিতে চান। কারণ ফেলিবার ত কিছুই নাই—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিলভুবন যে তাঁরই আলোকে আলোকিত; কেবল আধারের তারতম্যে প্রকাশের তারতম্য। তাই উদার ব্যক্তি সকল জীবের অন্তরবর্ত্তী পূর্ণতাকে প্রকাশ করবার সদাই সহায়ক।

* * *

(২) প্রেমের ভাব 'সাহায্য' নয়—'সেবা'। তিনি যে কার্য্যই করুন সকলই শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত করেন। 'কাঁচা-আমি' বা কর্ত্তা-আমি তাঁর চলে গিয়ে 'পাকা-আমি' বা দাস আমি বা সন্তান আমি তাঁর থেকে যায়। তখন তিনি পরার্থে, নিজ প্রিয়তমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। ব্যক্তিগত প্রেমেতেই জীব মরণকে বরণ করে, মৃত্যুর অচ্ছেদ্য নিয়ম ছিন্ন করে, সংসারে দেখা যায়। তখন ভগবৎ প্রেমিকের তীব্রতা ও আন্তরিকতা কতদূর হওয়া সম্ভব তা আমরা কল্পনা করিতে অপারগ। তাঁরা সমাধির জন্যও যেমন ত্বগস্থিমাংস শুষ্ক করিতে প্রস্তুত, তেমনি আবার ছাগ শিশুর জন্যও নিজেকে বলি দিতে সর্ব্বদা উৎসুক। প্রেমের দ্বিতীয় প্রকাশ এই ত্যাগ।

* * *

(৩) স্ত্রী স্বামীর জন্য, মাতা পুত্রের জন্য অনাহার, অনিদ্রা, মানসিক যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করেন, এ আমরা সংসারে দেখতে পাই। কিন্তু সে ভালবাসা গণ্ডি বদ্ধ বলে পণ্ডিতেরা তাকে মোহ বলে থাকেন, কিন্তু যখনই ঐ জিনিষটি ভগবানের নিমিত্ত আত্মপর সমভাবে হয় তখনই শাস্ত্র তাকে তপস্যা বলেছেন। ব্যক্তি বিশেষের জন্য যে দেহিক ও মানসিক কষ্ট এবং পরার্থে যে তপস্যা—এই দুটিতে প্রভেদ এই, —দ্বিতীয়টীতে (ক) রিপুর তাড়না থাকেনা—(খ) অভিশাপের পরিবর্ত্তে সদা আশীর্ব্বাণী স্ফুরিত হয় এবং (গ) তপস্যার নিষ্ফলতাও নিরানন্দ আনে না। কিন্তু প্রথমটিতে এই সকলের বিপরীত দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর

প্রেমিক ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে, প্রহারে রক্তাক্ত হয়ে, বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে, কলঙ্কের কালিমায় আবরিত হয়েও আশীর্ব্বাদ করতে ছাড়েন না।

* * *

(৪) সততা মানে 'মন মুখ এক করে' কায করা। অপর কোনও 'উদ্দেশ্য' নিয়ে সৎ-কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়া—তা সে সৎ-কর্ম্ম হলেও—তাকে 'ভাবের ঘরে চুরি' বলে। প্রেম এবং ত্যাগ না থাকলে সততা আসতে পারে না। আমাদের দেশে অভাব-অনটনের জন্য সততা এবং ত্যাগ একরকম হারিয়ে গিয়েছিল বল্লেই চলে। সেই জন্য আমরা 'যেন-তেন প্রকারেণ', নিজের স্বার্থ এবং ভোগের জন্য একরাত্রে বড় লোক হতে গিয়ে ব্যক্তিগত বা সমবায় সকল মহদনুষ্ঠান পণ্ড করে বসি।

* * *

(৫) সে যাকে ভালবাসে তারপ্রতি তার শ্রদ্ধা স্বতঃই প্রসূত হয়। শ্রদ্ধা' অর্থে জলন্ত-বিশ্বাস। মানুষকে মানুষ বলে'বিশ্বাস করতে হবে—ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতীক রূপে গ্রহণ করতে হবে। অপমান এবং অপবাদ যদি হাজার ফণা তুলে আমাদের দংশন করে তা সত্বেও অসতের মধ্যেও শ্রীভগবানের কল্পনার দ্বারা তার অন্তরবর্ত্তী দেবত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। বিশ্বাস যদি পাষাণে ঐশী চেতনা আনে, তবে সৃষ্টির আদর্শ মানুষে সে চৈতন্যের আবির্ভাব সে আর করাতে পারবে না। যে শ্রদ্ধা-হীন সে পরশ্রীকাতর। পরশ্রীকাতর বলেই আমরা যে কোন অবৈতনিক মহদনুষ্ঠান বা নির্ম্মল সমবায় আনন্দ উপভোগ করতে যাই অমনি হিংসা, দ্বেষ, অভিমান এসে আমাদের হৃদয় জর্জ্জরিত করে ফেলে।

* * *

(৬) উদারতা থেকে আর একটা গুণ মানুষের চরিত্রে ফুটে ওঠে। সেটি হচ্চে মৌলিকত্ব-প্রিয়তা। উদার প্রকৃতি যিনি তিনি কখনও পুরাতনে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। সর্ব্বদা নব নব ভাবে ও আকারে নিজ পরিবার ভূষিত করেন, সমাজের সেবা করেন এবং জাতীয় শক্তির পুষ্টি সাধন করেন। গোঁড়ামী পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবন

জীর্ণ করে ফেলে—তাই নব ভাবোচ্ছ্বাসের সংঘর্ষে চূর্ণ হয়ে হাওয়ায় মিশে যায়। আমাদের দেশের এই মৌলিকত্বহীন গোঁড়ারা, প্রাচীন নয় বলে দেবালয়ে বিদ্যুতের আলোক দিতে নারাজ, বিদেশের ফল মূল পর্য্যন্ত ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিবেদন করতে প্রস্তুত নয়—এমন কি আধুনিক বাদ্য যন্ত্রে ভগবৎকীর্ত্তন পর্য্যন্ত সম্ভব নয় বলে থাকে। এই বাতুলেরা যে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিরোধী হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

* * *

এক্ষণে এই সকল দৈবী সম্পদ আমাদের লাভ করতে হবে ছোট ছোট দৈনন্দিন ব্যক্তিগত কর্ম্মের মধ্য দিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনে—বিবাহ, উৎসব, ব্যবসায়াদি সমবায় কর্ম্মে, সামাজিক জীবনে—বিদ্যালয়, সেবাশ্রম, সাধারণ ধর্ম্মমন্দির, গ্রাম্য স্বাস্থ্যবিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা। এসকল কর্ম্মে মানুষের যথাযথ প্রকৃতি বের হয়ে পড়ে এবং সংশোধন করবার স্থলও ঐ সকল কর্ম্ম। যাঁরা এই সকল ক্ষুদ্র কর্ম্মে কথিত চরিত্র লাভ করেছেন, তাঁরা দেশ শাসন ত তুচ্ছ কথা জগৎ শাসনও করতে পারেন।

ভারতীয় সমস্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ।

(বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন)

(১)

"National union in India must be a gathering up of the scattered Spiritual forces in India. A nation in India must be the union of those whose hearts beat with the same Spiritual tone."

Swamiji Vivekananda

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শের নির্ম্মম সংঘাতে ভারতের জাতীয় জীবনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তৎকালীন তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী অম্লানবদনে স্বদেশীয় আদর্শকে বর্জ্জন করিয়া বৈদেশিক ধর্ম্ম ও সমাজনীতির আপাত মনোরম চাকচিক্যে ঝলসিত ও লুপ্তবুদ্ধি হইয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাতীর অন্তর্নিহিত শক্তি তখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই—পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বাংলা দেশে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া শক্তি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কার আন্দোলনের প্রথম যুগে—প্রথমতঃ ভারতবর্ষ যে অলক্ষ্যিতভাবে ধর্ম্ম সংস্কারেই মনোনিবেশ করিয়াছিল—তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য জড় সাধনার প্রতিযোগীতা করিতে গিয়া ভারতবর্ষ রাজনৈতিক বা সমাজিক সংস্কার চাহিল না—ধর্ম্মেরই সংস্কার চাহিল। ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে নূতন যুগের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা যে কেবলমাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের অবাধ আকর্ষণ হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিল তাহা নহে—দেশের সামাজিক গোঁড়ামি প্রভৃত সংকীর্ণ বুদ্ধিকে চিন্তার স্বাধীনতার দ্বারা ব্যাপকতার দিকে টানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু, বেদান্ত গ্রহণ, মহান্

স্বদেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমানে সম-প্রীতি থাকা সত্ত্বেও রাজার ভাব ও প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাব-গন্ধ-সংস্রব-রহিত ছিল না। বিবিধ ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা যে মত সমূহ তাঁহার অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সমীচীন বোধ হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সারাংশ একত্র সুসংবদ্ধ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় অপেক্ষা সমীকরণ-নিমিত্তই অধিকতম প্রয়াস করিয়াছিলেন। গুরু নানক, রামদাস স্বামী, চৈতন্য, দেব প্রভৃতি মহাপুরুষের ধর্ম্ম সংস্কার যে ভাবে দেশের জন সাধারণের মন আকৃষ্ট ও আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল,—রাজার মতবাদ সমূহ সেই ভাবে অল্প সংখ্যক শিক্ষিত শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে জন সাধারণের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেশের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন তাঁহার নিকট স্বদেশের মুক্তির সত্য উপায় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—তাই তিনি সরল ও শুদ্ধ মনে তদুদ্দেশ্য সাধনে মহান প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীর বিজয় লাভ ও অবাধ প্রচলন, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মতানুসারে ভারতের সনাতন সাধনাকে পঙ্গু করিয়া সুফল অপেক্ষা অধিকতর কুফলই প্রসব করিয়াছে; কারণ—তৎকালে আমরা স্বাধীনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া আমাদের অন্তরতম প্রদেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, ফলে উহা আমাদিগকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"রাজা রামমোহন ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যালয় সমূহে উহার প্রচলন করায় বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন—অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের জন্য উহাতে দেশটাকে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপ না করিয়া যদি তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রচলন রাখিতেন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদি বিদ্যাও গ্রহণযোগ্য চিন্তাসমূহ ঐ ভাষায় অনুদিত করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশ পূর্ব্বক বিদ্যালয় সমূহে পঠন পাঠন করাইতেন—তাহা হইলে অতিশীঘ্রই দেশময় ঐ সকলের প্রচার সাধিত হইয়া সমস্ত জাতিটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইত।"

কাল মাহাত্ম্যে ধর্ম্ম-সংস্কার সমাজ-সংস্কারের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু বহু বর্ষব্যাপী উভয়পক্ষীয় তীব্র আলোচনা ও বাদানুবাদ যখন কোনও চিরস্থায়ী সুফল প্রসব করিতে পারিল না, সংস্কারের প্রেরণা ও আদর্শ কেবল জনকয়েক নব্য শিক্ষিতগণের বুদ্ধির যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হইয়া জাতীয় শরীরকে অন্তর্বিবাদের বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল—তখন নব্য শিক্ষিতগণ সংস্কার আন্দোলনে ক্লান্ত ও বীতস্পৃহ হইয়া আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত সরল, উদার ও মহান্ চরিত্রের নেতাগণ পাশ্চাত্য আদর্শ ও প্রণালীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমগ্র ভারতকে এক সুদৃঢ় রাজনৈতিক জাতিরূপে সংগঠন করিয়া তুলিবার সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। নেতাগণের সরল ও বিশুদ্ধ স্বদেশ প্রেম, মহান চরিত্র ও আত্মত্যাগ থাকিলেও এ কথা সত্য যে ভারতীয় জাতীয়তার মুল ভিত্তি, ভারতীয় সাধনার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও ভারতবর্ষের সুমহান্ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ও অনুভূতি ছিল না ;—সুতরাং তাঁহারা দেশের মুক্তির, সত্য ও সংগঠন মূলক প্রণালী জাতীয় মনে সঞ্জীবিত করিয়া দিতে সমর্থ হন নাই—পাশ্চাত্য আদর্শ ও ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রণালীতে আপনারা আন্দোলিত হইয়া সমগ্র দেশকেও আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুন্দর ও চিরস্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে সুপ্রতিষ্ঠ ভিত্তির সন্ধান লাভই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। কিন্তু সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তির সন্ধান হারাইয়া ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অনুকরণ ও ব্রিটীশ পার্লিয়ামেণ্টের ক্রম-পরিণতি লাভের ঐতিহাসিক ধারণায় পরিচালিত হইয়া ভারতবর্ষকেও একটি ইউরোপীয় জাতিরূপে সুগঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। জাতীয় জীবনের মূল উৎসের সন্ধান লাভ করিয়া সুসংহতভাবে সমগ্র ভারতের চিন্তা ও কর্ম্মজীবনে নূতন সৃজনী-শক্তির উদ্বোধন দ্বারা সনাতন জাতীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ—আমাদের ভাব ও ধারণার সুদূরপরাহত হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ইহা সুপ্রমাণিত হয় যে আমরা মৃত বা জড়ের ন্যায় অসাড় ও নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারি নাই, —বৈদেশিক অনুকরণ হইলেও শতাব্দীব্যাপী সামাজিক ও রাজনৈতিক

প্রতিক্রিয়া শক্তির চালনা দ্বারা সকলকে জাতীয়-জীবন-স্পন্দন অনুভব করাইয়া দিয়াছিলাম।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে দিন স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনার বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়া স্বদেশে শুভ-প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—সে ভারতের জাতীয় জীবন ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় গৌরবময় দিন। দেশের সম্মুখে কোনও সুস্পষ্ট, মহান্ আদর্শ ও তদনুযায়ী চিন্তা ও কর্ম্ম-জীবন সুপরিণত করিয়া তুলিবার ভাব ও প্রেরণা একেবারেই বর্ত্তমান ছিল না। দেশ তখন পাশ্চাত্য ভাবে মাতোয়ারা ;—বিদেশীয়-ভাব-ভাবিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ ভিন্ন অন্য আদর্শ ছিল না। অন্তরের প্রতিষ্ঠার বিধৃত শক্তি হইতে শান্ত ও সুঠাম ভাবে জাতীয় কর্ম্মজীবন সংগঠিত করিতে না পারিলে, জাতির কর্ম্ম-গতি-ভঙ্গীর প্রত্যেক প্রয়াস ছিন্ন মেঘের ন্যায় কোন্ সুদূরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে তাহা পাশ্চাত্য কর্ম্মাবেশ চঞ্চল ভারত-জীবনে তখন পর্য্যন্ত প্রতিভাসিত হইয়া উঠে নাই। স্বামীজী স্বীয় অতি-মানবীয় অনুভূতি দ্বারা এই পাশ্চাত্য অনুকরণ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে জাতীয় আত্মহত্যার অবিসংবাদিত কারণ রূপে জানিতে পারিয়া এই বৈদেশিক অনুকরণ জাত সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ সমূহের মূলদেশে প্রথমেই সজোরে কুঠারাঘাত করিয়া সমস্ত জাতিকে সাবধান করিয়া দিলেন।

"And, therefore, if you succeed in the attempt to throw off your religion or take up either politics or society or any other thing as your centre, as the vitality of your national life, the result will be that you will become extinct.

কিন্তু কেবল নঞ্ত্ববোধক (Negative) প্রতিবাদ ও আঘাত দেশের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। দেশ তখন নির্নিমেশ লোচনে একটী সুস্পষ্ট ও সবল প্রত্যাদেশের অপেক্ষা করিতেছিল কারণ শতাব্দীব্যাপী বৈদেশিক ভাবের আন্দোলন ত তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়া স্বধর্ম্ম-বুদ্ধি জাগরিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তদ্ভিন্ন স্বামিজীও আপন চিন্তাসমূহ ভারতবর্ষে ও সমগ্র জগতে বিতরিত করিয়া দিবার এক উৎকট দায়

ও অদম্য প্রেরণা সর্ব্বদাই স্বকীয় অধ্যাত্ম-পূত হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিতে ছিলেন। ভারতবর্ষকে তিনি কতদূর ভাল বাসিতেন, তাহা আমাদের হৃদয়সীমার অনুমান বহির্ভূত। তাঁহার মহান জীবনে এমন তিন্ চারিটি ঘটনা আছে, যেখানে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি অসামান্য মেধা ও ধীশক্তি, এবং অকৃত্রিম উদারতা ভেদ করিয়া "বিবেকানন্দ—মানুষটি" (Vivekananda as a man) আমাদের নিকট অনাচ্ছাদিত ভাবে বিকশিত হইয়া উঠে ও ধরা দেয়। ইউরোপীয় ভাব ও চিন্তার আবর্জ্জনার পশ্চাতে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মে গরিমাময় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভারতবর্ষের সন্ধান লাভ করায় তিনি স্বদেশ প্রেমকে আধ্যাত্মিক ভাবে পূত ও রূপান্তরিত (Transformed) করিয়া এক অভিনব ভাবে ও ছন্দে দেশবাসীর নিকট প্রকটিত করিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান্ জীবন, স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি, অতি-মানবীয় মেধা, প্রাচীন বর্ত্তমান ভারতের সুচারু অধ্যয়ন ও পৃথিবীর অপরাপর দেশের সহিত উহার তুলনাত্মক আলোচনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন প্রভৃতি দ্বারা তিনি ভবিষ্যৎ-ভারতের সুসংহত, ঘনীভূত মহিমাময় ছবি আপনার মানসপটে অনুভব করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের সম্মিলিত ভারতের (United India) উজ্জ্বল ছবি তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেশের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া তুলেন। বিবিধ আচার এবং নানা ধর্ম্ম ও রীতি বৈচিত্র্যের সুসম্মিলিত ও সুসংযোজিত মহিমাময় পট তৎপূর্ব্বে নীতির কোন মনীষীরই মনে প্রতিভাসিত হয় নাই। স্বামীজীই সর্ব্বপ্রথম যুগ-যুগান্তরের আশা-নিরাশা-ঘাত-প্রতিঘাত সংগঠিত অধ্যাত্মপূত ভবিষ্যৎ ভারতের মনোরথ-দৃশ্য দেশের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেশবাসীর নিকট এক সরল ও সুস্পষ্ট (Positive) আদর্শ ধরিয়া দিয়া বলিলেন—

"For the next fifty years this alone shall be our key-note —this our great motherland India. Let all other vain Gods disappear for that from our minds. This is the only God that is awake, our own race, everywhere His feet, everywhere His ears, He covers every things."

বাউল-সঙ্গীত।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু)

আজ্‌গুবী কল বানিয়েছে এক আজব্‌ কারিকর।
এ কল চলে বলে, হাসে খেলে, কারিকুরি খুব জবর!
ছিষ্টিছাড়া কলের আড়া সাড়ে তিনটী হাত,
চিম্‌নী খাড়া দম্‌কলে কল চলেছে দিনরাত,
মন-জোলাতে বুন্‌ছে তাতে ওড়ন-পাড়ন তাঁত,
তিন-রঙা তিন স্থতোয় মিলে অন্তর্নীলে বয় লহর।
এ কলে পলে পলে উঠ্‌ছে কত সাধ!
আকাশের চাঁদ ধরতে পাতে বাসনাতে ফাঁদ!
করে আশার ক্ষেতে মনমত আবাদ!
কাল-নদীর কুলে ফলে ফুলে সাজায় চোরা-বালির চর।
এ কলের ছ'টা চাকা, আঁকা-বাঁকা আছে কত নল,
মাঝখানে পথ, আশ্‌মানে রথ করে চলাচল,
কল থেকে কল পয়দা করে নকল অবিকল—
তার মাল্‌-মশালা যোগান্‌ দিতে পাঁচটা ভূতে হয় ফাঁপর।
কি কৌশলে এ কল চলে ঠাউরে ওঠা ভার,
ইঞ্জিনীয়ার কোন্‌ জনা কেউ পায় না দিশে তার,
সে কখন্‌ সাকার কখন্‌ নিরাকার—
আছে কলের ভিতর চোর-কুঠুরী সেইখানে তার আরাম-ঘর।
নাইক তার চক্ষু-কর্ণ, জাতি-বর্ণ, নামটী আত্মারাম,
কে জানে সে রাম রহিম কি শ্যাম,
সে আত্মানন্দে আপনি বিভোর—নিত্যানন্দ ধাম,
তার আনন্দের ছিট্‌ লাগ্‌লে গায়ে উথ্‌লে ওঠে প্রেম-সাগর।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(৫)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

১১ই জুলাই, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ৫৪১নং, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো ছাড়া আর কোন ঠিকানায় আমায় পত্র লিখো না। তোমার শেষ চিঠিখানা সারা দেশ ঘুরে আমার কাছে পৌঁছেছে—আর পত্রটা যে শেষে পৌঁছিল, মারা গেল না, তার কারণ এখানে আমার কথা সকলে বেশ ভালরকম জানে। সভার খান কতক প্রস্তাব ডাঃ ব্যারোজকে পাঠাবে—তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দেবে এবং উহা আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ কর্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌বে—মিশনরিরা আমার নামে এই যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে, আমি কারও প্রতিনিধি নই—ঐতেই তার উত্তম প্রতিবাদ হবে। বৎস, কায কত্তে কি করে হয় শেখো। এই ভাবে দস্তুরমত প্রণালীতে কায কর্‌তে পার্‌লে আমরা খুব বড় বড় কায কর্‌তে নিশ্চিত সমর্থ হব। গত বর্ষে আমি কেবল বীজ বপন করেছি—এই বছর আমি ফসল কাটতে চাই। ইতিমধ্যে ভারতে যতটা সম্ভব আন্দোলন চালাও। কিডি নিজের ভাবে চলুক—সে ঠিক পথে দাঁড়াবে। আমি তার ভার নিয়েছি—তার নিজের মতে সে চলুক—তাতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে। পত্রিকাখানা বার কর—আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাবো। বোষ্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, এচ, রাইটকে একখানা প্রস্তাব পাঠাবে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানা পত্র লিখে এই বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেবে যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় আমার বন্ধুরূপে দাঁড়িয়েছিলেন আর তাঁকেও ঐটী কাগজে ছাপাতে অনুরোধ কর্‌বে—তা

হলে মিশনরিদের (আমি যে কারু প্রতিনিধি হয়ে আসিনি) একথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ডিট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০ টাকা পেয়েছিলাম। অন্যান্য বক্তৃতায় একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০ টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানি আমাকে ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি। এখানে খরচও হয়ে গেছে অনেক টাকা—হাতে আছে মাত্র ৩০০০ ডলার। আস্‌ছে বছরে আবার আমায় অনেক জিনিষ ছাপাতে হবে। আমি এইবার নিয়মিতভাবে কায কোর্‌বো মনে কচ্ছি। কল্‌কেতাতে লেখ, তারা আমার ও আমার কায সম্বন্ধে কাগজে যা কিছু বেরোয়, কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে যেন পাঠায়—তোমরাও মান্দ্রাজ থেকে পাঠাতে থাক। খুব আন্দোলন চালাও। কেবল ইচ্ছাশক্তিতেই সব হবে। কাগজ ছাপান ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা কোর্‌বো। তোমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন করতে হবে—উহার নিয়মিত অধিবেশন হওয়া চাই আর আমাকে যত পার সব খবরাখবর লিখ্‌বে। আমিও যাতে নিয়মিতভাবে কায কত্তে পারি তার চেষ্টা কচ্ছি এই বছরে অর্থাৎ আগামী শীত ঋতুতে, আমি অনেক টাকা পাব—সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে তোমরা এগিয়ে চল। তোমরা পল কেরসকে একখানা পত্র লিখো আর যদিও তিনি আমার বন্ধুই আছেন, তথাপি তোমরা তাঁকে আমাদের জন্য কায করবার অনুরোধ কর। মোট কথা যতদূর পার আন্দোলন চালাও—কেবল সত্যের অপলাপ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বৎসগণ, কাযে লাগো—তোমাদের ভিতর আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। মিসেস জি, ডবলিউ হেল আমার পরম বন্ধু—আমি তাঁকে মা বলি এবং তাঁর কন্যাদের ভগিনী বলি। তাঁকেও একখানা প্রস্তাব পাঠিয়ে দিও—আর একখানা পত্র লিখে তোমাদের তরফ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দিও। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কায করবার ভাবটা আমাদের ধাতে নেই। এই ভাবটা যাতে আসে, তার চেষ্টা করতে হবে। এইটী করবার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্ব্বদাই তোমার

ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে—সর্ব্বদাই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কায হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। ইহাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কায কর্‌বার গুপ্ত রহস্য। সাহসের সহিত যুদ্ধ কর। জীবন ত ক্ষণস্থায়ী—একটা মহা কার্য্যের জন্য জীবনটা সমর্পণ কর।

তুমি নরসিমা সম্বন্ধে কিছু লেখ নাই কেন? সে একরকম অনশনে দিন কাটাচ্ছে। আমি তাকে কিছু দিয়েছিলাম, তারপর সে কোথায় চলে গেল কিছু জানি না—সে আমায় কিছু লেখে না। অ— ভাল ছেলে, আমি তাকে খুব ভালবাসি। থিওজফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ করবার আবশ্যক নাই। তাদের কাছে গিয়ে আমি যা কিছু লিখি সব বোলো না আহাম্মক! থিওজফিষ্টরা আগে এসে আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে—জান ত? জর্জ হচ্ছেন হিন্দু আর কর্ণেল অলকট বৌদ্ধ। জর্জ এখানকার একজন খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। এখন হিন্দু থিওজফিষ্টগণকে বল, যেন জর্জকে সমর্থন করে। এমন কি যদি তোমরা তাঁকে সমধর্ম্মাবলম্বী বোলে সম্বোধন করে তিনি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখতে পার, তাতে তাঁর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠ্‌বে। আমরা কোন সম্প্রদায়ে যোগ দেব না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতি * সহানুভূতি প্রকাশ কোর্ব্বো ও সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কায কোর্ব্বো।

এটা স্মরণ রেখো যে, আমি এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ৫৪১নং ডিয়রবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো হচ্ছে আমার কেন্দ্র—সর্ব্বদাই ঐ ঠিকানাতেই পত্র দেবে আর ভারতে যা কিছু হচ্ছে সব খুঁটিনাটি আমাকে জানাবে আর কাগজে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু বার হচ্ছে, তার এক একটা টুকরো পর্য্যন্ত পাঠাতে আমাদের ভুলো না। আমি জি, জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি—প্রভু এই বীর হৃদয় ও মহদাদর্শের বালকদের আশীর্ব্বাদ করুন। বালাজি, সেক্রেটারি এবং আমাদের সকল বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে। কায কর, কায

---

* ইনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

কর—সকলকে তোমার ভালবাসা দ্বারা জয় কর। আমি মহীশূরের রাজাকে একখানা পত্র লিখিছি ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছি। তোমাদের কাছে যে ফটো পাঠিয়েছি, তা নিশ্চিত এতদিন পেয়েছ। একখানা রামনাদের রাজাকে উপহার দিও—তাঁর ভিতর যতটা ভাব ঢোকাতে পার চেষ্টা কর। খেতড়ির রাজার সঙ্গে সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার রাখবে আর বিস্তারের চেষ্টা কর। মনে রেখো, জীবনে একমাত্র চিহ্ন হচ্ছে গতি ও উন্নতি। আমি তোমার পত্র আস্‌বার বিলম্ব দেখে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম—এখন দেখ্‌ছি, তোমার আহাম্মকিতেই এত দেরি হয়েছে। বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত, আমি ক্রমাগত ঘুর্‌ছি আর চিঠির-বেচারাকে আমাকে ক্রমাগত নানা স্থানে খুঁজে তবে বার কর্‌তে হয়। আরও তোমাদের এটা বিশেষ করে মনে রাখ্‌তে হবে যে, সব কার্য্য দস্তুর মত প্রণালীক্রমে কর্‌তে হবে। যে প্রস্তাবগুলি সভায় পাস হয়েছে, সেগুলি ধর্ম্ম-মহাসভার সভাপতি চিকাগোর ডাঃ জে, এচ, ব্যারোজকে পাঠাবে এবং তাঁকে অনুরোধ কর্‌বে যে, ঐ প্রস্তাব ও পত্র যেন তিনি খবরের কাগজে ছাপান।

ডাঃ ব্যারোজকে ও ডাঃ পল কেরসকে ঐগুলি ছাপাবার জন্য অনুরোধ পত্রও যেন ঐরূপ সভার প্রতিনিধি স্থানীয় কারও কাছ থেকে যায়। জাগতিক মহামেলায় (ডিট্রয়েট, মেচিগান) সভাপতি সেনেটার পামারকে পাঠাবে—তিনি আমার প্রতি বড়ই সহৃদয় ব্যবহার করে-ছিলেন। মিসেস জে, ব্যাগ্‌লিককে একখানা ডিট্রটে, ওয়াশিংটন এভিনিউ ঠিকানায় পাঠাবে আর তাঁকে অনুরোধ কর্‌বে যে, সেটা যেন কাগজে প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি। খবরের কাগজ প্রভৃতিতে দেওয়া গৌণ—দস্তুরমত ভাবে পাঠানই হচ্ছে আসল অর্থাৎ ব্যারোজ প্রভৃতি প্রতিনিধিকল্প ব্যক্তিগণের হাত দিয়ে আসা চাই, তবেই সেটা একটা নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হয়। খবরের কাগজে অমনি অমনি কিছু বেরুলে সেটা নিদর্শন স্বরূপে গণ্য হয় না। সব চেয়ে দস্তুরমত উপায় হচ্ছে ডাঃ ব্যারোজকে পাঠান ও তাঁকে কাগজে প্রকাশ করতে অনুরোধ

করা'। আমি এই সব কথা লিখ্‌ছি, তার কারণ এই যে, আমার মনে হয়, তোমরা অন্য জাতের আদব কায়দা দস্তুর জান না। যদি কল্‌কেতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে—এই রকম সব আসে, তা হলে আমেরিকানেরা যাকে বলে Boom, তাই পাব (আমার স্বপক্ষে খুব হুজ্জুক মেতে যাবে) আর যুদ্ধের অর্দ্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন 'ইয়ঙ্কিদের বিশ্বাস' হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি বটে, আর তখনই তারা তাদের গাঁট থেকে পয়সা বার করবে। স্থিরভাবে লেগে থাক—এ পর্য্যন্ত আমরা অদ্ভুত কার্য্য করেছি। হে বীরগণ, এগিয়ে যাও, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ কোর্‌বো। মান্দ্রাজ থেকে যে কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার কি হল? সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সভাসমিতি স্থাপন কর্ত্তে থাক—কাযে লেগে যাও—ইহাই একমাত্র উপায়। কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাক, তাহাতেই তার মেজাজ ঠিক থাক্‌বে। এ সময়টা বেশী বক্তৃতা করবার সুবিধা নেই, সুতরাং এখন আমাকে কলম ধরে বসে লিখ্‌তে হবে। অবশ্য সর্ব্বক্ষণই আমাকে কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে, তারপর শীতঋতু এলে লোকে যখন তাঁদের বাড়ী ফিরবে, তখন আবার বক্তৃতা দিতে সুরু করে এইবার সভাসমিতি স্থাপন কত্তে থাক্‌ব। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা। খুব খাটো। সম্পূর্ণ পবিত্র হও—উৎসাহাগ্নি আপনিই জ্বলে উঠ্‌বে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা। আমি কাকেও কখন ভুলি না। তবে নেহাত অলস বলে সকলকে আলাদা আলাদা লিখ্‌তে পারি না। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইতি

বি—

পুঃ—তোমার ট্রিপ্লিকেনের ঠিকানা অথবা যদি কোন সভাসমিতি স্থাপন করে থাক, তার ঠিকানা আমায় পাঠাবে। ইতি

বি—।

নেপোলিয়ন।

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য মিত্র বি, এ।)

"Love of country is the first virtue of civilized man"—N.

দেখিতে দেখিতে ফরাসী-বীর নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর একশতবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। এ বৎসর তাঁহার শতাব্দীক শ্রাদ্ধবাসরে (তদীয় মৃত্যুদিন—৫ই মে ১৮২১) আবার ইতিহাস-ভক্ত বীরকে উপযুক্ত সম্মান প্রদানে উৎসুক হইয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি হস্তে উপস্থিত। বর্ত্তমানের আলোকে অতীতকে নূতন করিয়া দেখিবার তাহার সকল প্রয়াস সার্থক হউক—পুরাতন কাহিনীর পুনরালোচনা আজি বিশেষভাবে সময়োপযোগী, সেই জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীজাতি অতীতযুগের অসহনীয় দারিদ্র্য অবিচার ও নির্য্যাতনের গুরুভার লাঘবের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। ঐ সময়ে প্রত্যেক শিক্ষিত ফরাসীর একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল—স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির উপায় উদ্ভাবন,—এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ না করিয়া আত্মবলিদানের জন্য মন-প্রাণ প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য ছিল তাহার শ্রেষ্ঠ সাধনা। তার লাতিন প্রকৃতিগত প্রবল ভাবপ্রবণতা, উৎসাহ-উত্তেজনা তাকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার লীলাস্থল এক নূতন রাজ্যের কল্পনায় বিভোর করিয়াছিল। সেইজন্যই সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা ও শাসন-প্রণালী—সর্ব্বক্ষেত্রেই এক নূতন বিপ্লব আনয়নই ছিল রুসো, ভলতেয়র, ডিডেরো প্রভৃতি দার্শনিক মনীষিগণের প্রাণের ইচ্ছা। ফরসী বিপ্লবের ইতিহাস কেবলমাত্র উক্ত আদর্শ বাস্তবে কতদূর পরিণত হইয়াছিল তাহারই ইতিবৃত্ত। ইউরোপের, তথা বিশ্বের ইতিহাসের উহা এক সন্ধিক্ষণ—নবযুগের সূচনাস্থল।

কিন্তু যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল উন্নত আদর্শ ও উচ্চভাব লইয়া, এবং যাহা প্রথম দুই তিন বৎসর ইউরোপীয় মহাদেশের উদার ব্যক্তি-

মাত্রেরই সহায় ও সহানুভূতি লাভে পুষ্ট হইয়াছিল,—কালের গতিতে তাহা এক ভীষণ পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় পর্য্যবসিত হইল। ভাগ্য-লক্ষ্মীর এমনই উপহাস যে, যে আন্দোলন সদ্বিচার এবং ন্যায়স্থাপনকল্পে দেশবাসীমাত্রকেই আহ্বান করিয়াছিল,—তাহাই অবশেষে অবিচার অন্যায় এবং বীভৎসতার উৎস হইয়া সকলের প্রাণে প্রবল আতঙ্ক আনিল।

ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশ যখন এইরূপ অমানিশার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই সময়ে সহসা যেন বোধ হইল, সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবেন—প্রথম কিরণ-রশ্মির আভাষ পরিলক্ষিত হইল। সমগ্র ফরাসী জাতি তখন নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল অন্ধের ন্যায় পথহারা হইয়া আপনাকে চিরকালের জন্য ভ্রষ্ট ও পতিত ভাবিয়া নৈরাশ্যে অভিভূত। যেন অবিরাম রব উঠিতে লাগিল—"দে রামা মানুষ মিলায়ে দে।" স্বার্থপর, অযোগ্য নেতার মোহে ভুলিয়া ফরাসীজাতি বহুভাবে আপনার কল্যাণপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল তাই সে বলিল—

"পথ দেখিয়ে যায় গো নিয়ে
এমন মানুষ কই ?
বাক চাতুরী কব্বে না যে
ব্যাকুল যবে হই।
নিপুণ মাঝি চাই গো আজি
কাজের কাজী চাই।"

তাহাদের সেই কাতর প্রার্থনা বিভুর কর্ণে পৌঁছিল। কর্সিকার কোন্ এক অজানা পল্লী হইতে রজোগুণের অবতার কর্ম্মবীর নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আসিয়া দেশবাসীকে 'অভীঃ'মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। মানবেতিহাসের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে ফরাসী আবার তাহার আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইল। মনে হয়, সমগ্র ফরাসীজাতির সমবেত ইচ্ছাশক্তিই নেপোলিয়নরূপ বিগ্রহ ধারণ করিয়া ফলবতী হইয়াছিল।

সেই যুগের যে সকল বিভিন্ন ভাব ও আদর্শ প্রচারিত হইতেছিল তাহার

সকল গুলিই এই অদ্ভুত নেতার মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভলতেয়রের উদার যুক্তিবাদ, রুসোর প্রকৃতি-প্রেম, দাঁতোঁর আমূল সংস্কার-বাদ এবং রোব্‌স্পিয়রের আদর্শসমাজ স্থাপনানুরাগ,—তাঁহার চরিত্রে এ সকলগুলিরই সন্ধান মিলিল। তাঁহাকে পাইয়া যেন সব বিবাদ, সব মতদ্বৈধের চরম মীমাংসা পাওয়া গেল—প্রত্যেক ফরাসীর তিনি হইলেন আপনার আপন, অন্তরের দেবতা,—তাঁহার সমন্বয়বাণী সকলকেই মুগ্ধ ও বশীভূত করিল।

নেপোলিয়ন দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষভাবে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—সেইজন্যই তাঁহার যুগধর্ম্মের প্রচার। প্রজাতন্ত্রবাদ কাল-ক্রমে অনিয়ম, অত্যাচার ও গোলমালের সৃষ্টি করিতে লাগিল—তাহাতে দেশের প্রকৃত কাজ হইতেছে না দেখিয়া নেপোলিয়ন বিবেচকের ন্যায় সর্ব্বপ্রথমে সকল ক্ষমতা, সকল অধিকার কেন্দ্রীভূত করিয়া রাজহস্তে টানিয়া লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, প্রজাদিগকে আবার উপযুক্ত শিক্ষাদানে উন্নত করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের উপর শাসনকার্য্যের ভার ন্যস্ত করিবেন, অধিক অধিকার দানে আবার তাহাদিগকে মহীয়ান করিয়া তুলিবেন। এ ইচ্ছা যে কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এলবা নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কার্য্যকলাপে পাওয়া যায়। সম্রাটের একচ্ছত্র আধিপত্য তিনি ঐ সময়ে শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। আভিজাত্য এবং যাজকতন্ত্র-নিপীড়িত ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়া তিনি সকলের পূজ্য হয়েন। তাহা ছাড়া 'Career open to talents' ইহাই ছিল সর্ব্বসময়ে তাঁহার শাসনের মূলমন্ত্র; স্বদেশপূজার সেই যোগ্য পুরোহিত সকল ভক্তকেই আপনাপন প্রতিভা-অঞ্জলি লইয়া মাতৃঅর্চ্চনা পূর্ণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন।

বাল্য হইতেই তাঁহাতে মহত্ত্বের চিহ্ন সকল দেখা গিয়াছিল। জননী লিটিজিয়ার স্তন্যদুগ্ধ পানের সহিত তাঁহার ভিতর মাতার প্রখর ধী, অসাধারণ কর্ম্মনৈপুণ্য ও শ্রমশীলতা এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রবল প্রচেষ্টা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি বিকশিত হইতে লাগিল। যৌবনে

প্রাক্কালেই নেপোলিয়ন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন,—তিনি এক বিশেষ কর্ম্মের জন্য প্রেরিত, তাঁহার জীবনের এক বিশিষ্টব্রতের অস্ফুট স্মৃতি মানসপটে সদা ভাসমান হইতে লাগিল। সাধারণ মানবের পথে চলিয়া তাঁহাকে উন্নতি করিতে হইলে একজন সেনানায়ক (captain) হইতেই তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইত। কিন্তু তাহা হইলে যে ভাগ্যবিধাতার সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়! তাঁহাতে একাধারে বহুগুণের স্ফুরণ হইয়াছিল। জগতেতিহাসের "অতিমানবের (Super-men) শ্রেণীতে তিনি আজিও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সাফল্যের কনককিরীটে সুশোভিত হইতে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল—নতুবা সিদ্ধি কাহার মিলে? 'উদ্যোগিনাম্ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী'ই যে চিরসত্য!

যে যে যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি প্রায় সমগ্র ইউরোপখণ্ডে আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ স্থাপিত করিয়া বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন তাহাদের কথা নাই বলিলাম। ইতালীয় যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া মারেঙ্গো, অষ্টারলিটজ্, জেনা, ফ্রিড্ল্যাণ্ড, ওয়াগ্রাম প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানায়করূপে যে অদ্ভুত শৌর্য্য এবং সাহসিকতায় তিনি সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সে কথা জানিতে কাহারও বাকি নাই। এ সকল যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক অসাধ্যসাধন ব্যতীত তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের যথেষ্ট পরিচয়দানে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন—দুই একটি উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আরকোলার জনৈক নিদ্রাভিভূত প্রহরী সহসা নয়ন মেলিয়া দেখিল—স্বয়ং সম্রাট ধীর শান্তবদনে তাহারই পরিত্যক্ত বন্দুক হস্তে তাহার স্থানে দণ্ডায়মান—তাহার প্রাণে ভীষণ আতঙ্ক,—কারণ সে জানিত কঠিন সামরিক নিয়ম অবহেলার ফলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দিয়া আত্মপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! কিন্তু সেই মূঢ় সৈনিক বুঝে নাই যে নেতা নেপোলিয়ন বাহিরে লৌহ বর্ম্মাচ্ছাদিত হইলেও হৃদয়হীন নহেন—তাই সেই জীবনমরণশঙ্কটাপন্ন সৈনিককে ক্ষমা করিয়া তিনি শুধু তাহাকে চমকিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন নাই—'Justice tempered with mercy'র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখাইয়া তিনি আমাদের

সকলকে চিরতরে বিমোহিত করিয়াছেন। পিতৃতুল্য রাজাধিরাজের কি সুন্দর মোহন ছবি!

আবার সিরিয়া অভিযান (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ) হইতে ফিরিবার পথে, জনৈক আহত সেনাপতিকে নিজ অশ্বে আরূঢ় করিয়া স্বয়ং পদব্রজে সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত চলিয়া আর এক ভাবে তিনি আপনার মহত্ত্ব ফুটাইয়াছেন। তাহা না হইলে কি ফরাসী সহজে তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করে? তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ নায়কের অধীনেই ফ্রান্সের অনভিজ্ঞ অল্প-বয়স্ক সৈনিকগণের পক্ষে সমগ্র ইউরোপের মিলিতশক্তির (Concert) বিরুদ্ধে সাত আটবার সংগ্রাম করা সম্ভব হইয়াছিল, নতুবা সুনিশ্চিত পরাজয়ের ফলে ফরাসীর মুখে কলঙ্ককালিমা পড়িত। তাঁহার সেই বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিমাত্রই সৈন্যগণের নববলের সঞ্চার হইত, তাহাদের লুপ্তসাহস আবার চতুর্গুণে অভিভূত হইত। ফ্রান্সের আড়াই কোটী লোকের উপর তাঁহার প্রভাব তাই স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করিয়াছিল, নতুবা সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আলেকজান্দার বা সার্লিম্যানের ন্যায় সুবৃহৎ রাজ্যস্থাপন তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইত না।

কিন্তু নেপোলিয়ন যে বিদ্যাদেবীর একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন এবং জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন সে কথা অনেকেই স্মরণ রাখিতে চান না। বাল্যে তিনি সিজার, টুরেন, ফ্রেড্রিক প্রভৃতি প্রথিতনামা সেনানায়কগণের সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর রচনা লিখিয়া ছাত্রসমাজে পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন—এই সকল প্রবন্ধের সারবত্তা এবং সৌন্দর্য্য দেখিলে বৃদ্ধদিগকেও স্তম্ভিত হইতে হয়। পরবর্ত্তী জীবনে ইজিপ্ত যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া তিনিই একহিসাবে ইউরোপে ইজিপ্তের প্রাচীন ইতিহাসানুশীলনের প্রবর্ত্তন করেন—সৈনিকের পরিচ্ছদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনুসন্ধিৎসুছাত্রের ন্যায় তিনি সভা-সমিতিতে পুরাতন ইজিপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি প্রথম শাসন

কার্য্যের ভার লন তখন প্রায় সমগ্র ফরাসীজাতি নিরক্ষর ছিল, কিন্তু তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পঞ্চবৎসরের মধ্যেই প্রায় শতকরা ছিয়ানব্বই জন শিক্ষিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, তাঁহার শিক্ষানীতি ও প্রণালীতে যথেষ্ট ত্রুটী ছিল—স্বাধীনচিন্তা প্রায় দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল বলিলেও একহিসাবে অত্যুক্তি হইবে না।

যে কারণে তাঁহার নাম আজিও বিশ্বে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—ইউরোপের বিচ্ছিন্ন আইন-কানুনগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া সুসংবদ্ধরূপ অসাধ্যসাধন। নেপোলিয়ন ছিলেন কৃষক শ্রমজীবিদের দরদী। তাহাদিগের দুঃখ এবং অত্যাচারের ভার লাঘবের জন্য তিনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। ইউরোপের শাসন ও রাজনীতি সম্পর্কীয় যে যে পরিবর্ত্তন তিনি সংসাধিত করিয়াছিলেন এবং উন্নতির যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর মেটারনিক প্রমুখ কূট রাজনীতিজ্ঞের রক্ষণ-নীতির কুহকে ভুলিয়া ইউরোপ পরিত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কালে নেপোলিয়নের শাসন সংস্কারে ইটালি জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে কি অসাধ্যসাধন হইয়াছিল তাহা সকলেই শেষে বেশ বুঝিলেন।

কেহ যেন না বুঝেন যে নেপোলিয়নের লোকোত্তর প্রতিভা ও অদ্ভুত সাধনা-সিদ্ধির যশোগান গাহিতেছি বলিয়া আমরা তাঁহার ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। খুঁজিলে তাঁহার অনেক ভ্রমের কথা ইতিহাসের মধ্যে সন্ধান করিয়া বিস্তৃত তালিকা দিতে পারা যায়, কিন্তু ভুল যে মানব-ধর্ম্ম—'To err is human'.

নেপোলিয়ন নিজের সম্বন্ধে একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন—'I am a fragment of rock launched into space'—বাস্তবিকই ইতিহাসে তাঁহার আবির্ভাব, অভ্যুদয় এবং পতন সৌদামিনীর ন্যায় বড়ই চমকপ্রদ। ইউরোপকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার সকল বাসনাই জীবনে তাঁহার অপূর্ণ রহিয়া গেল কারণ—"I asked twenty years but Destiny granted me only thirteen."

অবশেষে চির-প্রিয় ফ্রান্স হইতে বহুদূরে আটলান্টিক মহাসাগরের

সামান্য একটী দ্বীপপুঞ্জে অশেষ নির্য্যাতন সহিয়া তাঁহার প্রাণ-বায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল—কি বিচিত্র জীবন-যবনিকাপতন! বীরশ্রেষ্ঠ হানিবলের উপর প্রাচীন রোমের পৈশাচিক ব্যবহারের কলঙ্ককথা ইতিহাস আজিও ভুলে নাই,—নেপোলিয়নের উপর ব্রিটেনের ব্যবহার একান্ত ঘৃণ্য—ঐতিহাসিক মরিসের একথা আজ আর স্বীকার না করিয়া উপায় কৈ? নেপোলিয়নকে যুদ্ধে দ্বিতীয় আটিলা, রাজ্যশাসনে দ্বিতীয় বরজিয়া, নিষ্ঠুরতা এবং লাম্পট্যে দ্বিতীয় নীরো বলিয়া বর্ণনা করা ধৃষ্টতামাত্র। আবার তিনি যে সংযমে ঋষিতুল্য ছিলেন একথা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও তেমনি বৃথাপ্রয়াস।

উপসংহারে কবিকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আবেগভরে আমরা বলি—

"চলে গেছ তুমি আজ—
মহারাজ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে;
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায়—পথের ধূলি পরে। *
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোন দিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে; *
সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট তোমারে ভরিতে নাহি পারে। *
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" *

* গত ভাদ্রের 'ইতিহাস ও আলোচনায়' প্রকাশিত লেখকের একটী প্রবন্ধ অবলম্বনে তৎকর্ত্তৃক নূতন আকারে পুনরালোচিত। উঃ সঃ।

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার)

(প্রতিবাদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল প্রবন্ধের উক্তি ঃ—

(১) "হুজুগে ধার্ম্মিকদের আবার রকমারি আছে। ঠাকুর বলেছেন,—"কাম কাঞ্চন ত্যাগ"। ধার্ম্মিকেরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ফস্ করে ধরে ফেল্লেন,—"এত সোজা কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ? বে কর্ত্তে হবে না।"

(২) 'হুজুগে' ধর্ম্মের আরও লক্ষণ আছে। যেই ধর্ম্ম এসে ঘাড়ে চাপ্‌লেন; ওম্নি দেখ্‌বে, ধার্ম্মিকেরা মাথায় তেল দেওয়া বন্ধ করেছেন, খালি পা, জামা 'বা চাদর অদল বদলে গায়ে বিরাজ কচ্চে। দেশে যে দিন পড়েছে তাতে শরীর ধারণের জন্য যে খাদ্য নেহাৎ দরকার, পনর আনা লোকের ভাগ্যে তাও জুটছে না। ধার্ম্মিকেরা আবার তারই থেকে কমিয়ে কমিয়ে শাক পাতা চচ্চড়ির ব্যবস্থা কচ্চেন। ফলও ব্যবস্থা মতই হচ্চে—কঙ্কালসার দেহ কোটরাগত চক্ষু ; বিষাদময়, উৎসাহশূন্য মুখ, ঢোকগিলে কথা বলা।

(৩) হুজুগ ছেড়ে নিজ্‌কে চিন্‌বার চেষ্টা করা কি প্রত্যেক বুদ্ধিমান যুবকের কর্ত্তব্য নয় ?

(১) আজ দেশে যে দুর্দ্দিন আসিয়াছে তাহাতে কিছুদিনের জন্য বিবাহ বন্ধ করা বোধ হয় আমাদের একটা আংশিক কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ; যদি দেশের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিতে হয়, দরিদ্র-নারায়ণের সেবারূপ মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। স্নেহময়ী মার কোলে অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার শিশুর অন্তিম কাকুতিরস্বর যদি কোন সহৃদয় মহাত্মার মর্ম্মে আঘাত করিয়া থাকে, তবে তিনি বলিবেন ঃ—'এ হতভাগ্য

দেশে বিবাহোৎসব কিছুদিনের-জন্য-বন্ধ থাকুক"। স্বামিজী বলিতেন,—"ভিক্ষুক বিবাহ করিয়া দেশে আরও দশটী ভিক্ষুকের সৃষ্টি করিতেছে"। একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। 'বিবাহ কর' বলিয়া কাহাকেও জাগাইবার দরকার নাই আপনা হইতেই বিবাহের ঠেলায় অস্থির করিয়াছে। "আমরা যা করি যতখানি করি, সে অলৌকিক! ওই যে পোষ্য প্রতি-পালন ক্ষমতা একটী জন্মিবার পূর্ব্বেই আমরা পরম বৈরাগ্যের সহিত অমন চার পাঁচ ছয়টীকে পৃথিবীতে আনিয়া ফেলি, জাতির মুখ চাহিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিই এ আর কোন্ জাতির লোক পারে? ......আরও আমাদের বিরাট মন কতখানি রোমান্সে ভরা! ধাঁন্ধায় গলদঘর্ম্ম সহসা একদিন দেখিতে পাই, সারাজীবনের সুখভোগ উপার্জ্জন সঞ্চয়ের ফলে দেহ পুষ্টি স্বস্তি ও মিতাচারের অভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবস্থার উপযুক্ত ব্যবসা কোন দিনই করিয়া তুলিতে পারি নাই—সঙ্গতির মধ্যে জমিয়াছে ঋণ, আপনার দিকে না চাহিলে চলে না অথচ পশ্চাতে আপনার হাতে গড়িয়া খাড়া করিয়াছি যাহাদের তাহারা এখনও আমারি অনুজিবী"।* ধন্য আমাদের জীবন! ধন্য আমাদের স্বদেশ প্রেম!! আবার অন্নের সংস্থান না হইতেই যদি কেহ বিবাহ করিতে নারাজ হয়, তাহাকেও মা বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রক্ষণশীল মহাত্মাদিগের কশাঘাত সহ্য করিতে হয়, এ অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বনীয়?

আমরা বলি কাহারও কথা শুনিবার আবশ্যকতা নাই। এস ভাই! আমারা সমবেত চেষ্টায় কিছুদিনের জন্য পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদানাধিকারীর দল বাড়াইতে কতকগুলি অসার জীবের সৃষ্টি না করিয়া, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদেরই জীবন রক্ষা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগি। আমার গর্ভধারিণী স্নেহময়ী জননী, প্রাণের ভাই ভগিনীরা অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল সার, বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণে অসমর্থ, আমাদের আবার বিবাহের সথ কেন? আত্মঘাতী ও নরঘাতী বাড়াইতে কি? যদি কেহ ঠাকু-

* 'নারায়ণ'। সত্যবালা দেবীর 'অন্তরের পাগল' নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

রের জীবন্ত ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ 'কামকাঞ্চন' ত্যাগের কথা শুনিয়া বিবাহ করা বন্ধ করে,—তবে বুঝিতে হইবে আমাদের সুদিন আসিবার সূচনা দেখা যাইতেছে, দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা কমিবার উপক্রম হইতেছে। বক্ষে পাষাণ চাপিয়া আর আমাদিগকে মার চক্ষে অপুষ্টাঙ্গ শিশুর নিশ্চয় অকাল মৃত্যুর করুণ দৃশ্য দেখিতে হইবে না—আপন হাতে শত শত অনাহার-হত মহাপ্রাণীগুলিকে শ্মশানের জলন্ত চিতায় তুলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু হায়! জগদগুরুর আশীর্ব্বাণী কি যথেচ্ছাচারীর দেশে সফলতা লাভ করিবে? বিবাহের মর্ম্মঘাতী দৃশ্য এখনও বোধ হয় আমাদের নজরে পড়ে নাই, তাহার বিষময় কুফল বোধ হয় এখনও আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারি নাই। তা যদি পারিতাম তবে বল্লাল সেনের বিচিত্র কৌলিন্য ও বাল্য বিবাহ প্রথা এরূপ মূর্ত্তিতে দেশে থাকিয়া নিত্য নূতন বাল বিধবার সৃষ্টি করিত না এবং কন্যার মাতা পিতাকে সর্ব্বস্ব হারাইয়া 'ভিক্ষাং দেহি' রবে পথের পাশে দাঁড়াইতে হইত না। মঙ্গলময় বিধাতার আশীর্ব্বাদে যেন দেশে অন্ততঃ এইরূপ নিত্যনূতন হুজুগের ধার্ম্মিক ও ধার্ম্মিকার দলই বাড়ীতে থাকে। শুধু ছেলে নয়, মেয়েদেরও এইরূপ হুজুগে ধর্ম্মে যোগ দিয়া 'বিয়ে করিব না' বলা একান্ত দরকার হইয়াছে,—তাঁহাদেরও শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী হইয়া আত্মবলী দিবার সময় আসিয়াছে। হুজুগে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বাবুয়ানার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া অপেক্ষা ধর্ম্মে যোগ দেওয়া শত সহস্র গুণে ভাল। ঠাকুরের আশীর্ব্বাণী ভারতের প্রতিগৃহে এইরূপ জলন্ত আদর্শের সৃষ্টি করুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। ইহার উপর আমরা কোনরূপ তীব্র মন্তব্য গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নই। পিতামাতা আজ ষোড়শ বর্ষীয় বালকের এবং দশম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহের আয়োজন করিলে তাদের বলিতে শিখাইব—পিতামাতা আমাদের শত্রু।

তারপর বিয়ে করিব না এই কথাটা কাম কাঞ্চন ত্যাগের একমাত্র উপায় না হইলেও ইহার যে আংশিক সফলতা আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া কয়জন বীর অক্ষত

শরীরে থাকে তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। শাস্ত্রে আছে— "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" কিন্তু কয়জন পুত্র জন্মের পর স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করেন? স্ত্রী আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গিনী না হইয়া—অদম্য পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ও আমরণ ভোগ বাসনার সহায়রূপিণী হইয়াছে; ফলে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষত্ব হইতে পশুত্বে, এবং জীবন হইতে মরণের দিকে অগ্রসর হইতেছি। ইহাই কি বিবাহের সনাতন নীতি? হায় ভারতের শাস্ত্রকারগণ! তোমাদের শাস্ত্র আজ কি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা কি দেখিতেছ? তোমাদের জীবন-দায়িনী নীতি সমূহ আজ কিরূপ অনাবিল পঙ্কে নিমজ্জিত ও কলঙ্কিত, অন্তর্য্যামী তোমরা তাহা কি জানিতে পারিয়াছ? যদি তোমাদের পুণ্যময় স্বর্গলোকে এই নরকের পূতিগন্ধ পঁহুছিয়া থাকে, তবে তোমরা একবার কৃপাদৃষ্টি পাত কর। তোমাদের আজীবন সাধনালব্ধ জ্ঞান গরিমার বিপুল তেজে এই নরক পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দাও, তাহাই আমাদের উপযুক্ত পুরস্কার। নরক জীবনের দুঃসহ ভার বহন অপেক্ষা মৃত্যু শত সহস্রবার বরণীয়!!

(২) পাশ্চাত্য বিলাস স্রোতে ভাসমান জাতির পক্ষে একটু আধটু লোক দেখানো ব্রহ্মচর্য্যেরও আবশ্যকতা আছে বৈ কি! দেশের পনর আনা বাবুর দল সকল সময় বেশ বিন্যাস রূপ উৎকট কর্ম্মসাগরে নিমজ্জিত। আজ পর্য্যন্ত কত রঙ বেরঙের সুগন্ধি তৈল, পমেটম, আতর, এসেন্স ইত্যাদির যে সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে কত অর্থ যে অপব্যয় যাইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই বিলাস স্রোতে মজ্জমান জাতিকে আর বিলাসের দিকে প্রলুব্ধ করিবার দরকার নাই, তাহার স্বতঃ উচ্ছাসেই তাহাকে অস্থির করিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় যদি কাহারও ঘাড়ে ধর্ম্ম চাপেন এবং সে মাথায় তেল দেওয়া বা বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য বন্ধ করে, খালি পায়ে বেড়ায়, তবে বুঝিতে হইবে মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হইতেছে; গতিহীন প্রাণযন্ত্র আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজের দুর্দ্দিনের কথা, অবস্থার কথা অন্ততঃ হুজুগে পড়িয়াও আংশিক বুঝিয়াছে। লাঞ্ছিত কলঙ্ক কালিমা

লিপ্ত, দেহকে বিলাস সজ্জায় চাকচিক্যময় করিতে যাওয়ার অর্থ কালিমার উপর আরও নিবিড় কালিমা লেপন করা। অতএব বিলাস স্রোতে বাধা পড়িলে আর কিছু না হউক অন্ততঃ ঘরের পয়সা ঘরে থাকিবে।

আর আমাদের রসনা তৃপ্তির কথা বলাই বাহুল্য। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত পাক প্রণালীই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমার দীন প্রতিবেশী যখন সপরিবারে অনশনে দিন যাপন করিতেছে, আমার বাড়ী তখন পোলাও কালিয়ার গন্ধে ভরপূর। এ দৃষ্টান্তের কি অভাব আছে? এক্ষেত্রে যদি কেহ শাক পাতার চচ্চড়ির ব্যবস্থা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, এবং পাক প্রণালীর অমোঘ নীতির ছলনা হইতে পরিপাক যন্ত্রকে রক্ষা করিতে প্রয়াশ পান, তবে তাহা অতীব সুলক্ষণ। "কোটরাগত চক্ষু, বিষাদময় উৎসাহশূন্য মুখ হওয়ার কারণ শাক পাতার চচ্চড়ি অথবা ব্রহ্মচর্য্য নয়,—তাহার একমাত্র কারণ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং সুশিক্ষার অভাব স্থানে কুশিক্ষার প্রভাব। ঠাকুর বলিতেন—"বেশী খেয়োনা আর শুচিবাই ছেড়ে দাও।" স্বামিজী বলিয়াছিলেন,— "অবিরত বার বৎসর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধ পুরুষ হওয়া যায়।"(?) যদি ধর্ম্ম পথে কাহাকেও উন্নতি করিতে হয়, তবে ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করা একান্ত দরকার। অতিরিক্ত রকমারি ভোজনে আমাদের দৈহিক মানসিক শক্তি বাড়ে না, তাহাকে আরও কর্ম্মের অনুপযুক্ত করে। ধর্ম্মপথের পথিকদিগকে আহারে ও বিহারে সতত সংযমী হইতে হইবে, ইহাই সনাতন নীতির চিরন্তন সত্য। আজ আবার কেমন করিয়া বাবুগিরি চালাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়, ধার্ম্মিক ও কর্ম্মবীর হওয়া যায়। তাহা অবশ্য আমাদের শিক্ষনীয় বিষয়। এই যুগেরই আচার্য্য বিবেকানন্দের পরিব্রাজক অবস্থার কথা যদি কাহারও স্মরণ পথে থাকে তিনি বেশ বুঝিতে পারিবেন—কি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া কি দুঃসহ উৎকট শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া স্বামিজী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, পূর্ণ মানব হইয়াছিলেন। দেবতা হইয়াছিলেন !! ভগবান হইয়াছিলেন !!! আমাদের এখনকার বচন-বাগীশ বাবুর দল

তাহার সহস্রাংশের একাংশও কি কেহ কখন পালন করিয়াছেন? কই তাঁহার দেবকান্তি ত সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনে মলিন হয় নাই? তাহার পরিবর্ত্তে অনুপম তেজোগরিমায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হইয়াছিল। কায়মনো বাক্যে পবিত্রতা রক্ষা এবং আহার ও বিহারে স্পৃহাহীন ও আড়ম্বর শূন্য হওয়াই ব্রহ্মচর্য্যের একটা ভিত্তি। অতএব যদি কেহ ধর্ম্ম পথের পথিক হইতে ইচ্ছুক হন (অন্তরের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাতেই হউক অথবা হুজুগে পড়িয়াই হউক) ব্রহ্মচার্য্য পালন তাহার—একমাত্র সহায়। কষ্ট সহ্য না করিয়া মার কোলে স্নেহের আচ্ছাদনে সুখনিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া কোন সাধারণ মনুষ্য ধার্ম্মিক হইতে পারিয়াছে তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। তবে নূতন যুগে বিজ্ঞান বলে সম্ভব হইতে পারে।

(৩) নিজেকে চিনিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান যুবকের কর্ত্তব্য ইহা আমরা শতবার স্বীকার করি, কিন্তু নিজেকে চিনিবার শক্তি আমরা কোথায় পাইব? সেই সর্ব্বশক্তিমানের দেওয়া শক্তিতেই মানুষ শক্তিমান হয়। আমার সকল দৈহিক মানসিক শক্তি, সকল বিদ্যাবুদ্ধি তাঁরই দেওয়া, সুতরাং নিজেকে চিনিবারশক্তিও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি প্রার্থনা করিতেও জানি? আমরা কি কোনদিন নিজেকে চিনিবার শক্তি প্রার্থনা করি? কৈ একদিনও ত সে প্রার্থনা আমার হৃদয় হইতে বাহির হয় না? যদি ভগবানের কাছে কখন কিছু চাই তবে 'স্বার্থ' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ সংসারের আপনভোলা কুট নীতি আমার কানে কেবলই স্বার্থের মন্ত্র দিতেছে। কে আমাকে জাগাইবে? কে আমার স্বপ্নজড়িত তন্দ্রাঘোর ছুটাইবে? কে আমার দিশাহারা অকুলপাথারে কাণ্ডারী হইবে? এরই জন্য গুরুর আবশ্যক। "গুরু কর্ণধার"। জ্ঞান হউক, ভক্তি হউক, কর্ম্ম হউক সকল সাধনাতেই গুরু একমাত্র অন্ধের যষ্টি, নাবিকের ধ্রুবতারা। "ভক্তিতেই সব পওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরিয়া থাকে তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে। তাঁর দয়া থাকিলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে?......তাঁকে ভালবাসতে পারলে

আর কিছুরই অভাব থাকে না।......তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকৃতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন। তারপর বিচার—শাস্ত্র; জগৎ।"(?) কিন্তু ভালবাসিতেই বা পারি কৈ? কাঁদিতেই বা পারি কৈ?' সমস্ত জীবনটাই যে স্বার্থে ভরা! নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাস্তে পারে কয়জন? ভালবাসা একটী মহা সাধনা। যে ভালবাসায় মনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কেবল ভালবাসিয়াই—তৃপ্তি দিয়াই তৃপ্তি! কিছু পাইবার আশা মোটেই থাকে না। মানুষ যখন ভালবাসিতে শিখে তখন সে হৃদয়ারাধ্যের নাম ধরিয়া ডাকিয়াই পরম তৃপ্তিলাভ করে। "শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে, জানে না সে কি সুখে যে ডাকে মা মা বলে" ভালবাসায় যখন এইরূপ ডাকা হয় তখনই তার নিজকে চেনা হয়। তখন 'আমার' বলিতে কিছু থাকে না, সবই "তোমার" হইয়া যায়। মানুষ যে পথেই থাকুক না কেন তাহার জীবনের চরম পরিণতি এই 'আমি' হারার মধ্যে।—কথাটীত বেশ সহজে বুঝিলাম, কিন্তু 'আমি' হারাইব কিরূপে? তাহারই একমাত্র সহায় গুরু।

লেখক বলিয়াছেন—"স্বামিজীর সব বই বেরিয়েছে, ঠাকুরের কথাও ঘরে ঘরে।" এই বলিয়া তিনি একটা শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা খাঁটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। আজ স্বামিজীর বই বাহির হইয়াছে বলিয়াই, অন্ততঃ প্রাণহীন ভাবে ঠাকুরের কথা ঘরে ঘরে হইতেছে বলিয়াই দেশের বাতাস ফিরিয়াছে, দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত বিরাট কায় অজগর নড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু ভারত কেন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়াই ধর্ম্ম রাজ্যে একটা বিপুল জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। জগদগুরু বিবেকানন্দের শরীরের রক্ত জল হইয়া যে অমৃতোপম মৃত-সঞ্জীবনী বহির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতেই যে গ্রন্থ রাজী হইয়াছে আমাদের জীবনে তাহাই একমাত্র সহায় বলিয়া বিবেচনা করি। তাহা আমাদের শোক সান্ত্বনা ও বিপদে অকৃত্রিম বন্ধু স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এ বিষয়ে তীব্র মন্তব্য আমাদের অসহ্য।

স্বামিন্! অনাথবন্ধু! এদুর্দ্দিনে আজ তুমি কোথায়? অতীত ভারতের যমুনা পুলিনে, কুরুক্ষেত্রের রণপ্রান্তরে তুমিই একদিন সৃষ্টি সংহারের মধুর গভীর লীলা এবং মহিমাময় হিমাদ্রি ক্রোড়ে—'রাজপুত্র সন্ন্যাসী রূপে' ত্যাগের লীলা, আত্মবলির চরম আদর্শ দেখাইয়াছিলে। আবার একদিন এই যুগেই সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যে দিগ্বিজয়ের লীলা দেখাইয়া গিয়াছ, যে মহাসাধনার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছ তাহা কি সম্পূর্ণ হইবে না? হতভাগ্য আমরা দীন, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অনাহারে ক্লিষ্ট আমরা তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবার শক্তি কোথায় পাইব প্রভু! দয়াময়! তুমি যে তোমার ভারতের নিরাশ্রয়দিগের জন্য আপনার জ্ঞান ভক্তি মুক্তি কিছুই কামনা কর নাই? সুদূর পশ্চিমে নানা রত্নালঙ্কার পরিশোভিত ঐশ্বর্য্য গরিমা দৃপ্ত-কুবেরের পুরীতে মণিময় সিংহাসনে বসিয়াও এই হতভাগ্যদের জন্য আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া ছিলে! কিন্তু আজ তুমি কোথায়? এই নিবিড় অন্ধকারে—কে আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইবে? আমরা যে কর্ণধার বিহীন হইয়াছি প্রভু! তাহা কি তুমি দেখিতেছনা? এই অরুন্তুদ কাতর ক্রন্দন ধ্বনি কি তোমার কোমল প্রাণকে আকুল করিতেছে না? তোমার লীলা অবসানান্তে আমাদের কথা তুমি ভাবিবে ইহা ত তোমার স্বমুখের বাণী। যেদিন তুমি দিগ্বিজয়ান্তে "আমার ভারতবর্ষ" বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভারতের উপকূলে অবতরণ করিয়াছিলে সেইদিন কি আর আসিবে? দয়াময়! আজ তোমার সাধের ভারতবর্ষের, প্রাণের ভারতবাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও। তোমার সাধের ভারত বক্ষে আজ অসুরের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার হৃৎপিণ্ড নিঃসৃত রক্তস্রোতে দিগন্ত রঞ্জিত হইতেছে। তেজোগরিমাময় রুদ্র তুমি! এদৃশ্য কি দেখিতেছ না? যে একটী ভারতবাসীর নিন্দা তোমার বক্ষে শেলসম বাজিত; সেই দীন নিরাশ্রয়দিগের মাথায় অগ্নি বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে! ইচ্ছাময় তুমি! আমাদের অসার হৃদয়ে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক তবেই আমরা মানুষ হইব। আমাদের একমাত্র আশা শোকে দুঃখে বিপদে অকূল পাথারে তুমি সাথে সাথে ফিরিতেছ। তোমার অভয়বাণী

আমাদের অক্ষয় কবচ হউক, আমরা তোমার মহাব্রতের উদ্‌যাপনে কৃতকার্য্য হইব। দয়াময়! তোমার সেই স্বমুখের বাণীর প্রতিক্ষায় বসিয়া আছি। আমাদের এই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সঙ্কুলের মাঝে একমাত্র ভরসা "সম্ভবামি যুগে যুগে"। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শেষপর্য্যন্ত তাঁহার প্রণীত "আর্য্যাপঞ্চাশীতি" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—(পরমার্থসার ৭৭শ্লোক)

হয় মেধশতসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাতলক্ষানি
পরমার্থবিন্ন পুণ্যৈর্নচ পাপৈঃ স্পৃস্যতে বিমলঃ॥

[পরমার্থবিৎ যদি সহস্র সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তথাপি তাঁহাকে পুণ্যস্পর্শ করে না, আর যদি লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মহত্যা করেন তথাপি তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করেনা, (কারণ) তিনি বিমল অর্থাৎ অবিদ্যামল শূন্য হইয়াছেন।]

সেই হেতু অধিক বিচারে প্রয়োজন কি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মলিন বাসনার অবশেষ ছিলই বটে। আর বশিষ্ঠদেবও (স্বকৃত রামায়ণে যে ভগীরথ বৃত্তান্ত) বর্ণনা করিয়াছেন (তাহাতে দেখা যায়) যে ভগীরথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও রাজ্যপালন করিতে করিতে মলিনবাসনা বশতঃ চিত্তের বিশ্রান্তিলাভ করিতে না পারায় (রাজ্যাদি) পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। (১) অতএব

(১) নির্ব্বাণ প্রকরণ পূর্ব্বভাগ, ৭৫ সর্গ—জ্ঞানী অশুভ যাহা কিছুই করুন না, তদ্দারা তাঁহার কর্ম্মলোপ ঘটে না, কেননা তিনি বিমল অর্থাৎ,

কোনও মলিনবাসনা আপনাতে অবশিষ্ট রহিয়াছে দেখিলে, তাহাকে পরকীয় দোষের ন্যায় সম্যক্‌প্রকারে লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহার প্রতিকার অভ্যাস করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন :—

যথা সুনিপুণঃ সম্যক্ পরদোষেক্ষণে রতঃ।
তথা চেন্নিপুণঃ স্বেষু কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ (১)

অপরের দোষ লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লোকে যেরূপ সম্যক্ প্রকারে নিপুণতার আতিশয্য প্রকাশ করে নিজের দোষসমূহ লক্ষ্য করিতে যদি সেইরূপ নিপুণতা দেখায় তবে কে না (সংসার) বন্ধন হইতে মুক্ত হয়?

আচ্ছা প্রথমে, বিদ্যামদের প্রতীকার কি? যদি এই প্রশ্ন কর, (তবে জিজ্ঞাসা করি সেই বিদ্যামদ আছে কোথায়?) তাহা কি তোমাতেই থাকা হেতু তুমি অপর লোককে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে কর অথবা তাহা অপর লোকে থাকা হেতু সে তোমাকে নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করে? যদি প্রথমোক্ত প্রকারই হয়, তবে নিরন্তর চিন্তা করিবে তোমার এই বিদ্যামদ অবশ্যই কোনও না কোন স্থলে চূর্ণ হইবে। দেখ শ্বেতকেতু বিদ্যামদে মত্ত হইয়া রাজা প্রবাহণের সভায় গমন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি সেই বিদ্যা না জানা হেতু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। রাজা তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে ভৎর্সনা করায়, তিনি পিতার নিকটে আসিয়া

তাঁহার অবিদ্যামল তিরোহিত হইয়াছে, এই হেতু তিনি সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন অথবা লক্ষ ব্রহ্মহত্যাই করুন, তজ্জনিত পুণ্য বা পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শেষাচার্য্য প্রণীত "পরমার্থসার"ই আর্য্যাপঞ্চাশীতি নামে প্রসিদ্ধ কেননা এই গ্রন্থখানিতে আর্য্যাচ্ছন্দে বিরচিত। ৮৫টি মাত্র শ্লোক আছে। ট্রিভেণ্ড্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর দ্বাদশ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত। রাঘবানন্দ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—তত্ত্ববিৎ শুভ।

(১) এই শ্লোকটি স্মৃতি বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইলেও যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদে (৩।২৫-২৬) দেখিতে পাওয়া যায়।

আপনার দুঃখের কথা জানাইলেন। তাঁহার পিতা কিন্তু নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি সেই রাজারই অনুসরণ করিয়া, সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা লাভ করিলেন। (১) বালাকি (অসম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হেতু) গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। রাজা 'অজাতশত্রু তাঁহাকে ভৎর্সনা করাতে তিনি দর্প পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। (২) উষস্ত (৩) কহোল (৪) প্রভৃতি বিদ্যামদ বশতঃ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। যখন সেই বিদ্যামদ অপর লোকে থাকা হেতু সে তোমাকে আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবে, তখন তুমি মনে করিবে সেই অপর ব্যক্তি (বিদ্যামদে) মত্ত হইয়াছে, সে আমাকে নিন্দা করুক বা অপমান করুক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই। এই হেতু কথিত হইয়াছে—

আত্মানং যদি নিন্দন্তি স্বাত্মানং স্বয়মেব হি ॥
শরীরং যদি নিন্দন্তি সহায়াস্তে জনা মম ॥

তাহারা যদি আমার 'আত্মাকে' নিন্দা করে তবে তাহারা নিজেই আপনাদের 'আত্মাকে' নিন্দা করিতেছে (কারণ আত্মা এক বই দুই নহে)। যদি তাহারা আমার শরীরকে নিন্দা করে তবে তাহারা ত আমার অনুকূল ব্যক্তি।

নিন্দাবমানাবত্যন্তং ভূষণং যস্য যোগিনঃ।
ধীবিক্ষেপঃ কথং তস্য বাচাটৈঃ ক্রিয়তামিহ ॥ (৫)

নিন্দা এবং অপমান যে যোগীর ভূষণস্বরূপ, এই সংসারে বাচাল লোকে কি প্রকারে তাহার বুদ্ধির বিক্ষেপ ঘটাইতে পারে? (অর্থাৎ

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২য় ব্রাহ্মণ, ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫ম অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ।

(২) কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২য় অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ।

(৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

(৪) ঐ ৫ম ব্রাহ্মণ।

(৫) এই দুইটি শ্লোকের মূল অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই।

'আমি নিন্দাপমানের অতীত নিরঞ্জন আত্মা' এইরূপ সংস্কারের বিলোপ ঘটাইতে পারে ?)।

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে আছে—

সপরিবারে বর্চ্চস্কে (১) দোষতপশ্চাবধারিতে।
যদি দোষং বদেত্তস্মৈঃ কিং তত্রোচ্চতুর্ভবেৎ ॥

২য় অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

যখন নিষ্ঠা ও তদানুসঙ্গিক বস্তুসকল, দুষ্ট (এবং সেই হেতু পরিত্যজ্য) বলিয়া অবধারিত হইল, তখন যদি কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দা করে, তাহা হইলে মলত্যাগকারীর তাহাতে কি হইবে ?

[পাঠান্তরের অর্থ—যে বিষ্ঠা সম্যক্ প্রকারে পরিত্যক্ত হইয়াছে ইত্যাদি]

তদ্বৎ স্থূলে তথা সূক্ষ্মে (২) দেহে ত্যক্ত্যে বিবেকতঃ।
যদি দোষং বদেত্তাভ্যাং কিং তত্র বিদুষো ভবেৎ ॥

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক)।

সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ বিচারপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইলে, (অর্থাৎ সেই দেহদ্বয়ে অভিমান পরিত্যক্ত হইলে) যদি কেহ তাহাদিগের উদ্দেশ্যে নিন্দা করে তাহা হইলে জ্ঞানীর তাহাতে কি হইবে ?

শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্মমৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ (৩) ॥

অহঙ্কারেরই শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ মোহ স্পৃহা প্রভৃতি এবং জন্ম মৃত্যু ঘটে, তাহারা আত্মার নহে।

---

(১) মূলের পাঠ—বর্চ্চস্কে সম্পরিত্যক্তে। এই শ্লোকের অবতরনিকার ব্যাখ্যায় টীকাকার জ্ঞানোত্তম বলিতেছেন—"এইরূপে আমাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে বিভিন্ন বলিয়া জানিলে সেই জ্ঞানের দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ফল, সকল অনর্থের বীজভূত রাগদ্বেষের নিবৃত্তি হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন।"

(২) মূলের পাঠ—"তদ্বৎসূক্ষ্মে তথা স্থূলে"।

(৩) এই শ্লোকের মূল পাই নাই।

জ্ঞানাঙ্কুশ (১) নামক গ্রন্থে নিন্দা যে ভূষণস্বরূপ হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে, যথা—

মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি
লব্ধপ্রযত্নজনিতোঽয়মনুগ্রহো মে।
শ্রেয়োর্থিনো হি পুরুষাঃ পরিতুষ্টিহেতো
র্দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥

যদি কোনও ব্যক্তি আমার নিন্দা করিয়া সন্তোষলাভ করে, তাহা-হইলে, আমি যে তাহার প্রতি (তাহার সন্তোষবিধান রূপ) অনুগ্রহ করিলাম, তাহা করিতে আমাকে নিশ্চয়ই কোনও আয়াস ব্যয় করিতে হইল না। আর (দেখ) কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ, অন্যের সন্তোষবিধানের জন্য কষ্টে উপার্জ্জিত ধনও ব্যয় করিয়া থাকে।

সতত সুলভ দৈন্যে নিঃসুখে জীবলোকে,
যদি মম পরিবাদাৎ প্রীতিমাপ্নোতি কশ্চিৎ।
পরিবদতু যথেষ্টং মৎসমক্ষং তিরো বা.
জনতি হি বহুদুঃখে দুর্লভঃ প্রীতিযোগঃ॥

এই সংসারে সুখ ত দেখাই যায় না, দুঃখ কিন্তু সকল সময়েই সুলভ। এইরূপ সংসারে যদি কেহ আমার নিন্দা করিয়া প্রীতিলাভ করে, তাহা হইলে সে আমার সমক্ষেই হউক, আমার অসাক্ষাতেই হউক, যত ইচ্ছা নিন্দা করুক, কেননা দুঃখবহুল এই সংসারে আনন্দলাভ অতি দুর্ঘট।

অবমান যে ভূষণ স্বরূপ হইতে পারে তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। যথা—

তথা চরেত বৈ যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্॥ (২)

(নারদ পারিব্রাজকোপনিষৎ ৫।৩০)।

---

(১) অনুসন্ধানে জানাগেল, এই অত্যুপাদেয় প্রাচীন গ্রন্থখানি বিলুপ্ত প্রায়; ইহার একখানি অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি তঞ্জোর পুস্তকালয়ে আছে। তাহার সংখ্যা ৯৭৪৮।

(২) বৈশাখ ২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

যোগী সাধুগণের ধর্ম্ম দূষিত না করিয়া (অর্থাৎ মিথ্যাচরণাদি বর্জ্জন করিয়া) এইরূপ আচরণ করিবেন যাহাতে লোকে তাঁহার অবমাননা করে এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিতে না আইসে।

যাজ্ঞবল্ক্য, উষস্ত প্রভৃতির যে অপর সম্বন্ধে নিজ নিজ এবং নিজ নিজ সম্বন্ধে অপরের, এই দুই প্রকারের বিদ্যামদ ছিল, সেই দুই প্রকার বিদ্যামদের প্রতীকার যেরূপ বিবেক দ্বারা করিতে হয়, ধনাভিলাষ ও ক্রোধ এই দুইয়ের প্রতীকারও সেইরূপ বিবেক দ্বারা করিতে হইবে। এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

ধন সম্বন্ধে বিচার এইরূপে করিতে হইবে:—

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিপালনে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥

(মহাভারত ? পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপ ১৩৯)।

অর্থের উপার্জ্জনে ক্লেশ আছে, রক্ষণেও সেইরূপ। অর্থ বিনষ্ট হইলে দুঃখ, ব্যয়িত হইয়া যাইলেও দুঃখ। অতএব (সর্ব্বথা) ক্লেশদায়ক অর্থকে ধিক্।

ক্রোধও দুই প্রকার যথা নিজের ক্রোধ অপরের উপর এবং অপরের ক্রোধ নিজের উপর। তন্মধ্যে (অপরের উপর) নিজের ক্রোধ সম্বন্ধে এইরূপ বিচার উপদিষ্ট হইয়াছে:—

অপকারিনি কোপশ্চেৎ কোপে কোপঃ কথংনতে।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষানাং প্রসহ্য পরিপন্থিনি॥

(যজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২০)।

সমুদ্রে ডুব দিয়াও যদি রত্ন না পাও—তবে উহার দোষ দিও না—দোষ সম্পূর্ণ তোমার।—ফেরদূসী।

মহিলা শিক্ষা গোষ্ঠি

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

চাই অগাধ অপরিসীম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা দ্বারা যমকেও জয় করা যায়! এই মৃতজাতি যদি বাঁচে সে ঐ শ্রদ্ধা দ্বারাই বাঁচিবে! শ্রদ্ধার পরিণাম সম্মান। আপনাকে সম্মান করিতে পারিলে তবেই মানুষ পরকে সম্মান করিতে শিখে। এই সম্মান হইতেই কর্ত্তব্য বোধ—কর্ত্তব্য বোধ হইতেই দায়ীত্ব বুদ্ধি। দায়ীত্ব বুদ্ধি না থাকিলে মানুষ সকল কর্ম্মেই অক্ষম। নাবালকের দায়ীত্ব বুদ্ধি নাই—সে বস্তু তাহার হইয়া যাঁহাতে বর্ত্তে তিনিই তাহার অভিভাবক। অভিভাবকই নাবালকের গতি। তিনিই তাহার আশ্রয়স্থল।

মেয়েরা মনুষ্যত্বের আদালতে এখনও অস্মদ্দেশে সাবালক সাব্যস্ত হয় নাই। কিন্তু চিরদিনের জন্যও তাহাদের আবার নাবালক হইয়া থাকা চলে না। নাবালক থাকিবার একটা সময়ের সীমা প্রকৃতি বাঁধিয়া দিয়াছেন। সেই সময় অতীত হইলে তিনি স্বভাবে এমন একটা বেগ সঞ্চারিত করিতে থাকেন, যে বেগ অভিভাবকের অভিভাবকত্বের সীমা লঙ্ঘন করিবার জন্য মনকে ভিতর দিক হইতে ক্রমাগত ঠেলিতে আরম্ভ করে। চলার মধ্যে যেমন পদক্ষেপ রূপ মাপকাঠি আছে, এই বেগ বাহিত হইয়া অভিভাবকের শাসনের সীমা লঙ্ঘন করাতেও তেমনি একটা মাপকাঠি আছে। সে মাপকাঠির নাম ঔচিত্য অর্থাৎ উচিৎ অনুচিৎ বিচার। পদক্ষেপের পরিমাণ অনুসারে না থাকিয়া চলিতে গেলে যেমন চলা হয় না, গড়াগড়ি দেওয়া হয়,—মাতালে যাহা করিয়া থাকে, তেমনি উচিৎ অনুচিৎ বিচারের বাধায় স্বভাবের বেগ নিয়মিত না হইলে অভিভাবককে উত্তীর্ণ হইবার অধিকার জন্মে না। সে ভাবে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করিয়া বসার নাম সাবালক হওয়া নহে, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠা।

তা বলিয়া, থামিয়া থামিয়া চলিতে হয় বলিয়া, থামাটা যেমন সত্য নহে বরং বলা যায় থামাটা চলার সত্য, আর চলাটা পায়ের সত্য; তেমনি উচিৎ অনুচিৎ মানিয়া চলিতে হইবে বলিয়া উচিৎ অনুচিতের ধাঁধায় নির্ব্বাণ প্রাপ্তবৎ বসিয়া থাকাটাও সত্য নহে। এখানে বলিতে হইবে অভিভাবককে মানা সংসারের সত্য কিন্তু নিজে সাবালক হইয়া উঠাই জীবনের সত্য।

সংসার এবং জীবন উভয়ের সত্যকে মানুষ সেইখানে স্বীকার করিয়া চলিতেছে যেখানে নাবালকের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য অভিভাবকের অনুবর্ত্তীতা আর অভিভাবকের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নাবালককে শিক্ষা দান।

চলার চেয়ে পায়ের সত্য অনেক বড়, তেমনি সংসারের চেয়ে জীবনের সত্য অনেক বড়—স্পষ্ট এ কথা বুঝিয়াছিল বলিয়াই মানুষ শিক্ষা পদ্ধতির গঠন করিয়াছে।

শিক্ষার স্বাভাবিক ক্রমকে ভাঙ্গা চলে না। প্রথম, শ্রদ্ধা। দ্বিতীয়, আত্ম-সম্মান। তৃতীয়, পরের আত্ম-সম্মানের সহিত আপনার আত্ম-সম্মানের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া চলা, অর্থাৎ শিষ্টাচার। চতুর্থ, কর্ত্তব্য-বোধ। পঞ্চম দায়িত্ব-বুদ্ধি। মনুষ্য প্রকৃতির গঠন অনুসারেই এই ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি মনের ভিতর হইতে একটা ঠেলা দিবেই। এই ক্রম অনুসারে পথ ঠিক করিয়া রাখা থাকিলে ঠিক পথে সমাজে জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। পথ ঠিক নাই বলিয়া জীবন অপেক্ষা করিতে চাহে না,—বড় ও ছোটর মধ্যে যত দ্বন্দ্ব সমস্তই এই নিয়ম আছে বলিয়াই হয়। ফলতঃ দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ প্রভৃতি এই ক্রমের মেরামত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ক্রম ভাঙ্গিলেই তাহা আরম্ভ হয়—চলিত কথায় যাহাকে বলে গ্লানি (corruption)।

জীবনের সকল অবস্থাতেই এই ক্রম আছে সুতরাং যেমন তেমন আয়োজনেই শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। দেশের আর্থিক দারিদ্র্যকে আমি শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় বলিয়া গণনা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের শ্রদ্ধাহীনতাই শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। মন

অশ্রদ্ধায় মরিয়া আছে বলিয়াই আমরা নিজের ও নিজেদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। বাহিরের তুচ্ছ আয়োজনের প্রতীক্ষায় অকর্ম্মণ্যের মত বসিয়া আছি। আমরা চাই বাঙ্গালীর মেয়ে আপনার প্রতিহত শ্রদ্ধা ভুলিয়া যাউক। "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।" শ্রদ্ধাসম্পন্না হইয়া আপনার পানে চাহিলেই তাহারা নিজেকে চিনিতে পারিবে। সমস্ত সমাজের দ্বারে আমাদের আবেদন তোমরা চেষ্টাকর, যেন আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অপবিত্র নির্ব্বোধ জ্ঞানে ভয়ত্রস্ত ভাব মুছিয়া অন্ততঃ মুষ্টিমেয় রমণী জাগিয়া উঠে। কপর্দ্দকেরও প্রয়োজন নাই। তাহারা আত্মশক্তির সহায়ে স্বচেষ্টাবসেই ভারতের ঘরগুলিকে জাপানের আদর্শে গড়িয়া দিবে। যে অর্থ ও আয়োজনকে তোমরা বিশ্বাস করিতেছ আমি তাহাকে অনুমাত্রও বিশ্বাস করি না। যদি মেয়েদের মন এইরূপ অবসাদগ্রস্ত থাকে, যদি মেয়েদের সম্বন্ধে দেশ আপনার সংস্কার ও অভ্যাসগত হতশ্রদ্ধার ভাব পরিত্যাগ না করে, আমরা কোটী কোটী মুদ্রা হাতে পাইলেও স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের ভার হাতে লইতে সাহসী নহি। কিন্তু যেমন ভাবমণ্ডল চাহিতেছি তাহা পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ভারতের ঘরগুলি আমাদের জীবনকালের মধ্যেই গড়িয়া উঠিবে।

এ কথা এত জোরের সহিত বলিতেছি, কারণ, আমাদের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট বুঝিয়াছে জাতির মনের দিকে মেয়েদের নাবালক হইয়া থাকিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা হওয়াটাই স্বাভাবিক। উচ্চ অবস্থার অভাবে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনীয়তা বা স্বাভাবিক বিকাশকে অগ্রাহ্য করা Gross blunder, মস্ত ভুল—তা সে যত বড় হ্যাট কোট ধারী কর্ত্তাই হউন, তাঁহার বুদ্ধিকে আমি সমর্থন করিতে পারি না। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, জেলায় জেলায় বেথুন কলেজ গড়িবার মত ফণ্ডের প্রতীক্ষা করিতে গেলে এখনও একশত বৎসর। এদিকে এই একশত বৎসরের মধ্যে বাহিরের পৃথিবী আমাদের সমাজকে, জাতিকে কতগুলা যে ধাক্কাদিবে তাহার স্থিরতা নাই। এখন স্পষ্টই দেখিতেছি

পুরুষ অটল হিমাদ্রি শৃঙ্গের মত থাকিয়া ধাক্কাগুলা হজম করিতে পারে না। ঝাঁকানি মেয়েদের উপরও বিলক্ষণ আসে। শিক্ষাদ্বারা সৎপথে চালাইবার ঠিক ঠাক ব্যবস্থা না রাখিলে তাহারা বিপথে যাইবেই—যদি নির্ব্বাণ লাভ করে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করে নাই। করিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট অল্প।

পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতেই তাহাদের শিখাইয়া লইতে হইবে। কেমন করিয়া যে হইবে সে স্কিম (উপায়) Arithmetical calculation এ আমরা ছকিয়া দিতে প্রস্তুত নহি। জানি, যদি আমাদের রচিত সেই স্কিম মনে লাগিয়া যায় গতানুগতিক সংস্কার সে থানাকে ইষ্টকবৎ করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু আমরা তাহা চাহি না। আমি চাই মেয়েদের উপর অশ্রদ্ধা ভুলিয়া যাও। প্রথম ক্রম উত্তীর্ণ হও। দ্বিতীয় ক্রমের দৃশ্য চখে পড়িবে।

মেয়েরা কোনও কর্ম্মের নয় এই ধারণা যাঁহাদের হৃদয় বৃত্তি নিঃসারের উৎস—শিক্ষাগোষ্ঠিকে নূতন নূতন তাঁহাদের লইয়া ছুঁৎ মার্গ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বেশী দিন নহে। চারাগাছটিকে মুড়াইয়া খাওয়ার অবস্থাটুকু ভালয় ভালয় কাটিয়া যাইতে দেওয়া পর্য্যন্ত। ভারতের তপস্যার ভাণ্ডারে মেয়েদের আত্মশক্তির বীজ জমা করা আছে। বীজটুকু অঙ্কুরিত হইবার জন্য একটু সরস ভূমি নির্ম্মেঘ রৌদ্র—অর্থাৎ অনুকূল দেশকাল প্রয়োজন হইবে বৈ কি! তারপর, গুঁড়িটুকু মাথাচাড়া দিয়া শক্ত সমর্থ হইয়া উপরে ডালপালা মেলিয়া ধরিলে, তখন, অমন বস্তু তাহার অঙ্গে বাঁধা থাকিয়াও চরিয়া ধরণীর তৃণভোজন করিতে পারে, নারী-শক্তির বিকাশ ক্ষুণ্ণ হইবে না।

মেয়েরা ঘরকন্নায় যাহা করিতেছে সত্যই পুরুষে তাহা পারে না। বাহিরে যাহা যাহা পারে না বলিয়া বুঝিয়া আছে সে বুঝিয়া থাকাটা অনেকটা Hypnotismএরই ঘোর। বিশ্বজগতে মেয়েরা অনেক কিছু

করিতেছে,—করিতে পারেও। তোমরা পৃথিবীতে নবযুগ আনিতে মানব স্বভাবের যে আমূল পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতেছ, সে স্বভাব পুরুষের মস্তিষ্ক মধ্যে Manufactured হইবার নহে। সেখানে ঐ স্বভাবের লক্ষণ নিরূপক Ideaগুলির Academic developement and arrangement ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মানব স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন যেখানে আরম্ভ হয় সে একটা স্থান in mysterious unfathomable depth.

মস্তিষ্ক বহির্জ্জগতের সংজ্ঞাগুলিকে বুদ্ধির সাহায্যে দেশকাল অনুসারে সাজাইতেছে;—কোনটারও সহিত কোনটার মিল বা যোগ নাই, তবুও, সমস্ত এক। এই এক জিনিষটা কি? জিনিষটা যে কি তাহা আমারাও জানিতে পারি না, ধরিতে পরি না, বুঝিতে পারি না। বরং সেইটা হইতেই আমরা জানিতে ধরিতে বুঝিতে পারিতেছি। বাঁটালি কাঠ কুঁদিয়া ত্রিকোন, চতুষ্কোন, সুগোল বিবিধ আকার প্রস্তুত করে সেগুলিকে দেখিয়া বাঁটালির আকার ঠিক করা চলে না তেমনি জানা, ধরা, বুঝা প্রভৃতির হেতু বলিয়া সেই এক যে কিরূপ তাহা ঠিক করা চলে না। এক উহাদের হইতে সম্পূর্ণ অতীত।

পুরুষ যাহা করিতেছে ও করিবে সে ত Literary discussion। সে ত ঐ বুদ্ধির স্তর ঐ দেশকাল অনুসারে সাজানর কাজ যেন মনোময় কোষের পর্দ্দার উপর সংজ্ঞাগুলির বায়স্কোপ চলিতেছে! canvas screen যদি চেতন জীব হইত তাহার cameraর উপর যতখানি দখল ও প্রভাব থাকা সম্ভব জগতে বুদ্ধিরও ঐ একের উপর ততখানি হাত।

মেয়েদের বুদ্ধি কম। বুদ্ধি জিনিষটা কি যদি ঠিক জানিতে পারিলাম তবে বুদ্ধি কম কেবল এই টুকুর জন্যই তাহাদের কেমন করিয়া অভিশপ্ত করিয়া রাখিতে পারি? অন্ধের দৃষ্টি শক্তি নাই কিন্তু দৃষ্টি শক্তি যে শক্তির agency সেটা অন্ধেতে এমন তীক্ষ্ণভাবে বিকশিত যে, চোখে দেখিলেও তাহারা দেখিতে পাইবার কাজ চালাইয়া লইতে পারে। ত মেয়েরা বুদ্ধির বায়স্কোপের ঐ পর্দ্দাখানাকে অনুভব তত তীক্ষ্ণভাবে

করে না, কিন্তু, পৰ্দ্দা হইতে বিশেষ কিছুকে আরও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়া থাকে।

সময়ে সময়ে আমরা ক্ষিপ্তবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি কিংবা দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, তখন সহসা যেন যুক্তি তর্কের জাল ছিন্ন হইয়া যায়। সে সময় এমন কিছু করিয়া ফেলি যে কায ঐ সময় ভিন্ন অন্য সময়ে করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। চলিত কথায় এই অবস্থাকে বলে আঁতে ঘা লাগা। একাগ্রমনে এই অবস্থাটাকে অনুভব করিতে পার ত নিজের জীবনের কোনও ঘটনা লইয়া একবার ধ্যানে বসিয়া যাও। যেন সে সময়ে ঐ ক্রোধ কিংবা দুঃখ যাহা হউক একটী সংজ্ঞা তোমার যুক্তি তর্ক ধারণার জাল ছিন্ন করিয়া তোমার অতি গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত গিয়া পরম গোপন একটা কিসে স্পর্শ করিয়াছিল। করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তোমার সমস্তটা কেবলমাত্র ঐ সংজ্ঞাস্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল,—আর সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য, অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ কোথায় যে সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছিল তাহা তুমি জান না। কেবল এইমাত্র মনে আছে যে ঐ বস্তুটীর স্পর্শ মাত্র সেই অন্তঃপ্রবিষ্ট সংজ্ঞাটী এমন প্রভূত বলশালী হইয়াছিল যে সে বল তোমার নিত্যকার জীবনের বস্তু নহে। ঐ যে গুপ্ত মহাশক্তির আধারটী যাহা তোমার অথচ তোমার নহে,—তোমাতে আছে অথচ থাকিয়াও নাই ঐটীর সহিত মেয়েদের চরিত্র একটু কাছাকাছি বেশী থাকে। পুরুষের সংজ্ঞা যুক্তি তর্ক ধারণার জাল সহসা ছিন্ন করে না প্রতিপদে অন্তঃপ্রবিষ্টও হয় না। পৃথিবীর প্রভাব প্রতিপত্তি অবস্থা সমস্তই ঐ যুক্তি তর্ক ধারণার স্তরে প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি তর্কের হিসাব নির্ভুল বলিয়া, ধারণা নিশ্চিত বলিয়া পুরুষের অনুকূল অবস্থা ও স্থায়ী প্রভাব প্রতিপত্তি জমিয়া গিয়াছে। নারীর ক্রোধ, দুঃখ, মান, অভিমান, স্নেহ মমতা কেবলি যুক্তিতর্ক ধারণার জালকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিতেছে। পৃথিবীতে নারী মহাশক্তি বিড়ম্বনা সঞ্জাত দুর্ব্বলতার জন্যই সৃষ্টির আদি কাল হইতে আমরা আজ পর্য্যন্ত আপনার স্থান আপনি করিয়া লইতে পারি নাই।

নারী ও নরে ইহাই বস্তুগত পার্থক্য। পুরুষত্বের মাপ্‌কাঠিতে নারী দুর্ব্বলা। নারীত্বের মাপ্‌কাঠি দিয়া মাপিলে পুরুষও ঐ পরিমাণ দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইবে। এখন কে কাহাকে দাবিয়া রাখিয়াছে? নিরপেক্ষ হইয়া বলিলে এই কথা বলা ভিন্ন গতান্তর নাই যে দাবিতে গেলে উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়মে উভয়কে দাবিয়া বসিবে। আবার বাড়াইলে উভয়েই উভয়কে বাড়াইবে। জগতে এমন কোনও দেশ নাই যেখানে পুরুষ কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য দুর্দ্দশার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার বুদ্ধি বলে সে এমন উৎরিতে পারিয়াছে যে, সে দুর্দ্দশা সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও স্পর্শ করে নাই। নারীর পক্ষেও সেই কথা। মোট কথা পরস্পর অনুকূল ভাব সমাজের উন্নত অবস্থা। পরস্পরের আচার ব্যবহারে যখন নির্ম্মমতা অবিবেচনা অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠে তখন বুঝিতে হইবে সমাজের অবনতি প্রবলবেগে চলিতেছে,—এ সমাজ এমন ভাবে অধিক দিন আর থাকিবার নহে। পরস্পরের হৃদয়ের নিবিড় সংযোগ স্থলে যে মধুচক্র রচিয়া উঠে জাতির শ্রী সভ্যতা স্বজাতীয়তা তাহারি মধ্যে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ঐ মধুচক্র ভাঙ্গিয়া গেলে ব্যক্তির জীবন কেন্দ্র স্থান পরিবারের অবস্থা লক্ষ্মীছাড়া সমাজের অবস্থা অমঙ্গলের আবাস ভূমি এবং দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দ্দশার আকর হইয়া উঠে। আমাদের যদি এই অবস্থা হয় তবে এ সমাজ ব্যবস্থা কিছুতেই বজায় থাকিবার নহে। ভাঙ্গিবেই এবং আবার গড়িয়া উঠিবেই। সেই ভাঙ্গাগড়ার পরপারেই আমরা দেশের উন্নতির মুখ দেখিব।

প্রতি জনে যোগ্য কর্ম্ম প্রতি জনে যোগ্য পুরস্কার,—
ভাগ্য রহে দিতে;
যে পোষে বিশ্বের প্রাণ, বিসর্জ্জন করি' আপনার,—
মরে সে বাঁচিতে।

—সুইন্‌বার্ণ।

কাপাস চাষ।

(স্বামী কেশবানন্দ।)

(১)

গাছ কাপাস।

যে অঞ্চলে সেচন বা অন্য প্রকারে ক্ষেত্রে জল দিবার উপায় নাই সেই অঞ্চলে উচ্চ ভূমিতে অথবা ডাঙ্গায় বৈশাখের শেষ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে এই কাপাশ লাগাইলে সুবিধা হয়। বৈশাখে বৃষ্টির জলে মাটী ভিজিবার 'বাত' হইলে কোদালী দ্বারা তিন হাত অন্তর এক হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া মাটীর সহিত চূর্ণ গোবর সার মিশাইয়া গর্ত্ত গুলি পূর্ণ করতঃ—প্রত্যেক খানায় দুইটী করিয়া বীজ পুঁতিতে হয়। উর্ব্বরা মাটী হইলে বেশী গোবর সার দিতে হয় না এবং গর্ত্তও গভীর করিবার আবশ্যক নাই। (আমরা দেখিয়াছি অনেক উর্ব্বরা ডাঙ্গা পতিত অবস্থায় রহিয়াছে।) এইরূপ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে কাপাস গাছের খানার বাহিরের জায়গা খুঁড়িয়া চীনা বাদামও লাগান যাইতে পারে।

গাছ বাহির হইয়া কিছু বড় হইলেই প্রতি খানায় একটী করিয়া গাছ রাখিতে হয়। বর্ষার জল পাইয়া গাছগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, দেখিতে হইবে গাছের গোড়ায় জল না দাঁড়ায় এবং গবাদি পশুতে নষ্ট করিয়া না ফেলে। সযত্নে রক্ষিত হইলে বর্ষান্তে ফুল ও কাপাশের মুছি ধরিয়া পৌষ মাসের শেষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত কাপাস ফুটিতে থাকিবে। বৎসর বৎসর বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে খুঁড়িয়া দিলে এই কাপাস গাছেই ৪।৫ বৎসর কাপাস জন্মিয়া থাকে। বৎসরে প্রতি বিঘায় প্রায় গড়ে ৮।১০ মণ কাপাস উৎপন্ন হয়। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বর্ষ হইতে কাপাসের ফসল বৃদ্ধি হয়।

দোআঁশ মাটী কাপাস চাষের পক্ষে ভাল এজন্য স্থান ভেদে কাপাসের গাছ ভাল মন্দ এবং ফলও কম বেশী হইয়া থাকে।

(২)

ক্ষেত কাপাসের চাষ।

আশ্বিন মাসে আশু ধান্য কাটিয়া বা অন্য কিছু ফসল থাকিলে তাহা তুলিয়া লইবার পর ক্ষেতে 'বাত' থাকিলে উপর্য্যুপরি দুইবার লাঙ্গল দিয়া

মাটী বেশ করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। কেননা বর্ষার ভিজা পচামাটী বেশ শুকাইলে শস্যোৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। ক্ষেতের মাটী বেশ শুকাইয়া আসিলে রীতিমত ভাল সেচন করিয়া মাটীগুলি ভিজাইতে হয়। কয়েকদিন পরে 'বাত্' হইলে অর্থাৎ মাটী লাঙ্গল দিবার উপযুক্ত হইলে, বিঘা-প্রতি ৩০।৩২ মণ চূর্ণ গোবর সার ছড়াইয়া লাঙ্গল দ্বারা ২।৩টী উন্টাপান্টা চাষ দিতে হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিমে একবার লাঙ্গল দিয়া দ্বিতীয়বারে উত্তর দক্ষিণে লাঙ্গল দিতে হয়। তারপর ঐরূপ উন্টাপান্টা মই দিয়া ক্ষেত্রের মাটীগুলি বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া ৩।৪ দিন জমি ফেলিয়া রাখিতে হয়।

"ষোল চাষে মূলা, আট চাষে তূলা।
চারি চাষে ধান, বিনাচাষে পান॥"

আবার দুইটী চাষ ও মই দিয়া ক্ষেতের মাটিগুলি সমতল করিয়া লইতে হয়, যদি মই দ্বারা সমতল না হয় তাহা হইলে কোদালের দ্বারাও সমতল করা চলে। তারপর পুনরায় চারি অঙ্গুলি গভীর করিয়া লাঙ্গল দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বপনের পূর্ব্বে কাপাশ বীজগুলি ৮।১০ ঘণ্টা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর তুলিয়া কাঁচা গোবর সহ থাসিয়া বীজগুলি ঝরঝরে করিয়া লইতে হয়।

কাপাস বীজ বপনের পর সরিষা, মুগ কি জারাবিরি যে কোন একটী রবিশস্যের বীজ এবং কাঁকুড়, তরমুজ ও খেড়ো বীজ কিছু কিছু মিশাইয়া বপন করিতে হয়। বপন শেষ হইলে বিপরীত দিক হইতে আর একবার লাঙ্গল দিয়া উন্টাপান্টা মই দ্বারা সমতল করিয়া দিতে হয়। তৎপরে কোদালী দ্বারা পার্শ্বের মাটী সামান্য সামান্য টানিয়া লইয়া ৪ হাত অন্তর এক একটী দাঁড়া অর্থাৎ ক্ষেতের চূর্ণ মাটীর দ্বারা ছোট আলি তুলিয়া কয়েকটী পাট করিয়া দিতে হয়। তবে এই দাঁড়াগুলি যেন ক্ষেতের উচ্চদিক হইতে নীচের দিকে লম্বা হয়। ক্ষেতের ঐ উচ্চ দিকের বড় আলির নীচে একটী নালা করিয়া দিয়া নালার মাটী দ্বারা একটী শিয়র দাড়া করিয়া দিলে ক্ষেতে জল দিবার সুবিধা হয়।

প্রতি বিঘায় কাপাস বীজ পাঁচ সের মুগ বা জারাবিরি কলাই বীজ পাঁচ সের এবং বিঘা প্রতি সরিষা পাঁচ পোয়া লাগে।

কাপাস বীজের সহিত যে কোন একটা রবি শস্যের বীজ বপন করিলে কাপাস গাছের কোন অপকার হয় না। কাপাস গাছ বড় হইবার পূর্ব্বেই মাঘ মাসের মধ্যে উক্ত রবিশস্য তুলিয়া লওয়া হয়। কাঁকুড়, তরমুজাদি থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

কাপাস মুগ প্রভৃতি বপন করিবার পরে মাঘ মাস অর্থাৎ রবিশস্যটী তুলিয়া লওয়া পর্য্যন্ত ক্ষেতে জল দিতে হয় না তবে জলাভাবে শস্য গাছের ক্ষতি হইতেছে বুঝিলে সরিষা বা মুগের ফুল ধরিলে ক্ষেতে জল দেওয়া কর্ত্তব্য।

রবিশস্য তুলিয়া লইবার পর কাপাস ক্ষেতের মাটী খুঁড়িবার সুবিধা হইলে অর্থাৎ ধূলা মাটী থাকিলে আধ হাত গভীর করিয়া কোদালের দ্বারা খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। মাটী শক্ত হইয়া গেলে ক্ষেতে জল দিয়া 'বাত' হইলে আধহাত গভীর করিয়া খুঁড়িতে হয়। কাপাস চারা গুলি ১ হাত ১ হাত অন্তর থাকা চাই। চারা ঘন বাহির হইলে কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নতুবা কাপাস কম ফলিবে। "গাছ গাছালী ঘন সবে না, গাছ হতে তার ফল হবে না।"

এইরূপে মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে জল দিয়া খোঁড়া হইলে কাপাস গাছ গুলি শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিবে ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতে ফুল ধরিয়া কাপাস মুচি ধরিতে থাকিবে। চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে মুচি ফাটিয়া কাপাস বাহির হইলে তুলিয়া আনিয়া শুষ্ক মুচি হইতে কাপাস বাছিয়া লওয়া হয়।

আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ বর্ষা লাগিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কাপাস আদায় করিয়া লইয়া আশুধান্য রোপনের জন্য কাপাস তুলিয়া দেয়। কোন কোন চাষী কাপাস হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত গাছ রাখিয়া দিয়া কাপাস আদায় করে এবং উক্ত ক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠ মাসে বিট কলাই বপণ করিয়া আর একটা ফসল আদায় করিয়া লয়। প্রতি বিঘায় প্রায় ৩।৪ মণ ক্ষেত কাপাস এবং মুগ বা জারাবিরি কলাই প্রায় চারিমণ জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সেই জমিতে আশু ধান্য ৮।১০ মণ উৎপন্ন হয়।

শান্তি অন্বেষণে।

(স্বামী নির্ব্বাণানন্দ)

প্রভাত-অরুণ প্রতিফলিত শুভ্র হিমগিরি, কুলু কুলু নিনাদিনী স্রোতস্বিনী, সুদূর প্রসারিত অচল নীলাম্বুরাশি, অগণন তারকা মণ্ডিত অনন্ত আকাশ, জ্যোৎস্নার বিমল হাসি, নির্ম্মল উষার স্নিগ্ধ সমীরণ, পত্রাভ্যন্তরচারী পবনের মৃদু মর্ম্মর ধ্বনী, বিহঙ্গের সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা, সুন্দর কুসুমরাশি বিতরিত মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ এবং ধন জন যৌবন, প্রকৃতির এ সবই সুন্দর এবং সুখকর। প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্যের উপবনে সুখের আশায় সকলেই আকৃষ্ট ও বিমোহিত। সিংহাসনোবিষ্ট রাজা হইতে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী সকলেই জগতে সুখের অন্বেষণে নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। সুখসম্ভোগই মানুষের চির ঈপ্সিত এবং স্বভাবসিদ্ধ। সুখের বাসনা মানব-মনে নিরন্তরই জাগরুক। স্থূল, সূক্ষ্ম অনন্ত অনন্ত বাসনাশ্রেণী একটীর পর একটী করিয়া মানব-হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাসনার তৃপ্তি সাধনেই জগতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান। বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ জগতে কত কি করিতেছে। মনোহর পুষ্পোদ্যান, মণিরত্ন খচিত সুবৃহৎ অট্টালিকা, পণ্যবীথিকা সুসজ্জিত বিপুল নগরী, বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপটুতা এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার, এ সমস্তই মানবের বাসনাপ্রসূত।

এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাহাতে আমরা এত অসক্ত, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তিত এবং বিনাশী। উহার বর্ত্তমানতা বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় চকিত দৃষ্টিতে অন্তর্হিত। সুখের বলিয়া যাহা গ্রহণ করিলাম, শান্তির আশায় যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি কালপ্রভাবে তাহা যেন দুর্ভেদ্য তমসাবরণে বিলীন হইতেছে। আজ যাহা দেখিতেছি, পাইতেছি কাল তাহা ধ্বংসীভূত। এইরূপে সৃজন প্রলয়, জন্ম মৃত্যু অনাদি কাল হইতে জগতে পরিলক্ষিত ও অপরিহার্য্য এবং অনন্তকাল এইরূপে চলিবে ইহাও সিদ্ধান্ত। এই অনন্ত সত্যের

অপ্রতিহত নিয়মনে ভোগ্য পদার্থের অবর্ত্তমানতা বা অভাব চিরকালই লক্ষিত হইবে। একে একে সমস্ত জগৎ সম্ভোগও যদি সম্ভাবীত হয়, এ অভাব আকঙ্ক্ষা ফুরাইবে না, বাসনার তৃপ্তি হইবে না।

ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে॥

কামনার উপভোগে বাসনার তৃপ্তি হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় দিন দিন বাড়িতে থাকে। বিষয় সম্ভোগে বাসনা অতৃপ্ত এবং অভাব আকাঙ্ক্ষা থাকিবেই। যেখানে অভাব, দুঃখও সেখানে ছায়ার ন্যায় পরিলক্ষিত। জগতে ভোগও অনন্ত—দুঃখও অনন্ত। এ জগৎ দুঃখ পূর্ণ। আপাতঃ রমণীয় জাগতিক মোহে দুঃখই যেন সুখের মূর্ত্তি পরিগ্রহণে পরমাত্মীয়রূপে প্রকাশিত; সুখের মুখস পরিহিত হইয়া দুঃখই যেন জগৎ-রঙ্গমঞ্চে লীলাখেলা করিতেছে; ভ্রমবশতঃ আমরা যাহা সুখের মনে করিতেছি, বাস্তবিকপক্ষে তাহা দুঃখ পূর্ণ। জগতে দুঃখের সতত বিদ্যমানতা ধ্রুবতারার ন্যায় নিরন্তর পরিলক্ষিত। অনাদিকাল হইতে জগতে এই দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু দুঃখ যেমন তেমনই রহিয়াছে। উহা যেন সুদৃঢ় শৈলমালার ন্যায় সুখের চরম উৎকর্ষরূপ প্রবল আবর্ত্তের নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাতেও অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান। দুঃখের এই সুদৃঢ় শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করা বড়ই দুঃসাধ্য। অনুল্লঙ্ঘনীয় দুঃখের তীব্র দংশন বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও মানুষ মিথ্যা নশ্বর বিষয় গ্রহণে খাদ্যদৃষ্ট কুক্কুরের ন্যায় দ্রুত গতিতে ধাবমান। জীবনসংগ্রামে দুঃখই জয়ী এবং উহার অপ্রতিহত প্রভাব জগতে অনিবার্য্য জানিয়াও মানুষ তল্লাভে ভূয়োভূয়ঃ চেষ্টা করিতেছে এবং অশান্তি সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। কেন আমাদের এই অশান্তি? কিসে আমরা এত অসুখী? বাসনা হইতেই উহার উৎপত্তি। একটু কিছু অভাব বোধ হইতেছে, উহা পূর্ণ না হইলেই অনন্ত দুঃখ আসিবে। অভাব না থাকিলে, বাসনা না থাকিলে, দুঃখও থাকিবে না। এখানে একটা আপত্তি হইতেছে এই যে, বাসনা না থাকিলে জীবন ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে

পারে। শরীর এবং ইন্দ্রিয়গত আমাদের এই জীবন সমুদ্রগামিনী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় বিষয়মুখী। উহা নিয়ত গতিতে বিষয় অভিমুখে চলিতে থাকিবেই। বাসনা ত্যাগ বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? বিষয় সম্ভোগ পরিহার। বিষয় বিমুখ ইন্দ্রিয় দাহিকাশক্তিহীন আগুনের ন্যায় অসম্ভব কল্পনা মাত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয়গত আমাদের এই জীবনে বিষয় বাসনা থাকিবেই। এই বাসনার সংহার করিতে হইলেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যু কিম্বা আত্মহত্যা ভিন্ন সংসার ত্যাগের আর উপায় কি। এ আপত্তি ভ্রান্তি মূলক। "সংসার পরিত্যাগ করা অর্থ মৃত্যু বা আত্মহত্যা নহে। সত্যকে জানিতে হইলে অসত্যকে ত্যাগ করিতে হইবে, ভাল জানিতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে। এখানে যেমন অসত্য বা মন্দ ত্যাগ করা—সত্য কিম্বা ভাল জানা বুঝায় সেইরূপ সংসার ত্যাগ অর্থে ভগবানকে জানা বুঝায়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন পশ্চিমদিকে এগুলে পূর্ব্বদিক আপনিই পিছনে পড়ে থাকবে, ভগবানকে জানলে সংসার আপনিই ত্যাগ হয়ে যাবে।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এখন আমাদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত এবং যে ভাবে আমরা অনুমান করিতেছি 'তাহা নাট্য রঙ্গমঞ্চের ন্যায় আপাত রমণীয় এবং সর্ব্বৈব মিথ্যা। উহার কোনই অস্তিত্ব নাই। উহা আমাদিগের মরীচিকার জল সন্দর্শনে প্রধাবিত হরিণের ন্যায় ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে'। এই ভ্রম দূর কর। জগতের প্রকৃতস্বরূপ, সেই ভগবানকে অবগত হও। "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি" ঈশ্বরই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে রহিয়াছেন। মানুষেও তিনি, পশুপক্ষীতেও তিনি রহিয়াছেন। বৃক্ষ পাষাণাদি স্থাবর জঙ্গমেও তিনিই অধিষ্ঠিত। সুখে দুঃখে তিনিই বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ড ভরা ব্রহ্মতে, জগৎ ভরা জগন্নাথে, তিনিই এই জগদ্রূপে প্রকাশিত।

"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ইত্যাদি

এইরূপে জগৎ ঈশ্বরের আচ্ছাদিত এবং ভূতে ভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রতিভাত হইলে তোমার সমস্ত ভার, সমস্ত চিন্তা বদলাইয়া যাইবে; তখন দেখিতে পাইবে তোমার অভাব আকাঙ্ক্ষা ফুরাইয়াছে, বাসনা

কামনা নষ্ট হইয়াছে। বাসনা না থাকিলে কি হইবে? দেয়ালের ত বাসনা নেই। দেয়াল সুখ দুঃখও ভোগ করে না। এ কথা স্বীকার করি কিন্তু দেয়াল উন্নতিও করে না, যে দেয়াল সেই দেয়ালই থাকে। মানুষ উন্নতশীল। সুখদুঃখের সমষ্টিরূপ শিক্ষার ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ নিয়তই উন্নতির শিখর দেশে ক্রমশঃ আরোহণ করিতেছে। যে যত উন্নত তার সুখশান্তিও সেই পরিমাণে অধিক। উন্নতির চরম উৎকর্ষে চির সুখ, চির শান্তি বিরাজিত। এই আনন্দ সমুপস্থিত হইলে, ভক্তি সূর্য্যের কিরণ বিকিরণে চিদাকাশ উদ্ভাসিত হয়। তখন পত্রান্তরে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলাধারাবৎ নিরন্তর ভগবৎ স্মৃতি সমুৎপন্নে, বিষয় বাসনা, অভাব আকাঙ্ক্ষা, দুঃখকষ্ট ইত্যাদি জাগতিক, অতি ঘৃণ্য লীলাভিনয় স্মৃতির অতীত পথে গমন করে এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অনুভূত হয়।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু উক্তিগুলি "শ্রীভগবান উবাচ" বলিয়া লিখিত। কোন স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ নাই। সুতরাং গীতা পড়িবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিৎ।

শ্রীমদ্ভাগবৎ বলেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই গীতার বক্তা শ্রীভগবান। "ভগ" শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী তিনিই ভগবান। ঐশ্বর্য্য ষড়বিধ যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতি স্মৃতম্ ॥

অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ এই ছয়টি ভগশব্দ বাচ্য। যিনি একাধারে এই ছয়টির অধিকারী তিনিই শ্রীভগবান কিন্তু ঐশ্বর্য্য মাত্রই হ্রাসবৃদ্ধি যুক্ত সুতরাং বিনাশশীল। অতএব ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী ভগবান অবিনাশী নহেন। কিন্তু গীতায় ভগবান বলিতেছেন :—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ॥ ১০ অঃ ২০ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন, আমি ভূতগণের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা। আমিই ভূতসমুদয়ের আদি, মধ্য ও অন্তঃ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুই আমি। আবার এই "আত্মাকে" অবিনাশী বলিতেছেন :—

অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ গীতা ২য় ১৭।

যিনি এই সমুদয় ভূতাদি ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই সেই অব্যয় আত্মার বিনাশ করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে গীতার বক্তা শ্রীভগবান বিনাশশীল নহেন। যেহেতু তিনি অব্যয়, অবিনাশী পরমাত্মা। সুতরাং তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালীও নহেন।

এখন দেখা যাক্ আত্মা বস্তুটি কি? গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে বলিতেছেনঃ—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম জাত, অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম (অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্ত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা) সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা তিনিই শ্রীভগবান এবং শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভেদ কোথায়?

আধুনিক অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই দেখা যায় যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখিয়াছেনঃ—

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি॥"

এখানে কবিরাজ গোস্বামীর মতে ব্রহ্ম বস্তুটি গোবিন্দের অঙ্গকান্তি বা রূপমাত্র সুতরাং রূপ ও রূপাধার এক পদার্থ নহে। অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় হইলেও "অঙ্গ" ও "কান্তিতে" পার্থক্য আছে। যেহেতু "অঙ্গকান্তি" সগুণ পদার্থ এবং গোবিন্দ নিগুর্ণ। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে গোবিন্দকেও নিগুর্ণ বলা যায় না, কারণ তাঁহারও অঙ্গ আছে। অঙ্গ বা মূর্ত্তি কখনই নিগুর্ণ হইতে পারে না। নিম্নে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম উদ্ধৃত করিলাম যথাঃ—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতার্থ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দকে নমস্কার, নমস্কার। এখানে ব্রহ্মণ্যদেব ও গোবিন্দ এই দুইটি শব্দই শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম, গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ পৃথক নহেন। এখন দেখা যাক্ শ্রীকৃষ্ণ বস্তুটি প্রকৃত কি? বৈষ্ণবেরা বলেন "ব্রজেন্দ্র নন্দন, যশোদাদুলাল" শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। কিন্তু উপরে দেখাইয়াছি যে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। নতুবা "শ্রীকৃষ্ণই ভগবান" এইরূপ লেখা উচিৎ ছিল। কিন্তু তাহা হইলে ভাগবৎ বাক্য ব্যর্থ হয়। কেবল মাত্র যশোদানন্দন কৃষ্ণ কখনই ভগবান হইতে পারেন না যেহেতু তিনি একটি গোপবালক মাত্র সাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। সুতরাং এ হিসাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কিছুই থাকে না। কিন্তু তাহা নহে, ভাগবৎ বাক্য অখণ্ডনীয় অতএব শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। এ ভগবান আবার ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নহেন যেহেতু ইনি পূর্ণব্রহ্ম। সেই গুণাতিত অক্ষর পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বলোক পূজিত পরম পুরুষ। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে কৃষ্ণকে পৃথক করিলে কৃষ্ণের

শ্রীকৃষ্ণত্ব থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত যে ব্রহ্ম তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। যথাঃ—

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, তিন তাঁর রূপ॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে,
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

এই শ্লোক অনুসারে বুঝিতে হইবে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব অর্থাৎ যাবৎ জীবের ব্রহ্ম জ্ঞান না হয় তাবৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপত্ব উপলব্ধি হয় না। অতএব ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা, আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ব্রহ্মই পূর্ণ শ্রীভগবান। অতএব পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণ।

পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখন একমাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন। এই ব্রহ্ম শব্দের পূর্ব্বে আর কোন শব্দ বা উপাধি ছিল না। কৃষ্ণ শব্দ ও ব্রহ্ম শব্দের পরবর্ত্তী। ব্রহ্মকে আবার সনাতন কহে যথা ব্রহ্মসনাতন বা আদি। সুতরাং ব্রহ্মই যে সৃষ্টির আদি কারণ তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মপদার্থটি শ্রীকৃষ্ণের "অঙ্গকান্তি" মাত্র নহেন।

সৃষ্টি প্রকরণে দেখা যায় যে পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবা মাত্র "মায়ার" সৃষ্টি হইল। মায়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের আধার। এই তিন গুণে বিভিন্ন শক্তিমান তিন দেবতা আবির্ভূত হইলেন। রজোগুণে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা; সত্ত্বগুণে বিষ্ণু পালন বা রক্ষাকর্ত্তা এবং তমোগুণে শিব বা মহেশ্বর সংহার কর্ত্তা। ইহাঁদের কেহই একাধিক গুণশক্তির পরিচালনে সমর্থ নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা পালন বা লয় করিতে পারেন না, সেইরূপ বিষ্ণুরও সৃষ্টি ও ধ্বংসশক্তি নাই এবং শিবও সৃষ্টি ও পালনে অক্ষম। কিন্তু এই গুণত্রয় সমষ্টি, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর নামে অভিহিত। ঈশ্বর একাধারে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা। তাহা হইলে দেখা গেল

যে সৃষ্টির আদিকারণ 'ব্রহ্ম' হইতে 'মায়া', মায়া হইতে 'গুণত্রয়' এবং গুণত্রয় হইতে যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণের সৃষ্টি হইয়াছে।

পরব্রহ্মের প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত "সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ"। সবিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ গুণময়ি ব্যক্তাবস্থা আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ, অচিন্ত, মনোবুদ্ধির অগোচর অব্যক্তাবস্থা। "পরমেশ্বরই ব্রহ্মের স্বগুণ ও স্বপ্রকাশরূপ, ইনিই লীলচ্ছলে বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া জগতে আবির্ভূত হন। তাঁহাকেই অবতার বলে। ইনি কখন আংশিক শক্তি বিকাশে, কখন বা পূর্ণপ্রভাবে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করেন; এই পূর্ণশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বরই শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাই গীতায় বলিয়াছেন :—যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪ অঃ ৭ শ্লোক।

হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি (দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই) অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম পরমকারুণিক শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদিগকে দমন করেন।

ওঁ তৎ সৎ।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

নিম্ন ও পতিত জাতি।—শ্রীমধুসূদন কাব্যব্যাকরণ তীর্থ প্রণীত। নিম্ন ও পতিত জাতির অভিযোগ ও তাহাদের প্রতি অবিচার—লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, নিম্নত্ব ও পাতিত্যের অবৈধতা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া, তাহাদের প্রতি সামাজিক নির্য্যাতনের কঠোরতা, বর্ণগত-বৈষম্য সামাজিক সমবেত ক্রমবিকাশের অন্তরায় এবং কি প্রকারে তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে তাহা তিনি এই পুস্তকে দেখাইয়াছেন। প্রতি দেশহিতৈষীর ইহা পাঠ্য। প্রাপ্তিস্থান ১৮৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

রামকৃষ্ণ মনঃ শিক্ষা।—ভক্ত অন্নদাঠাকুর দ্বারা প্রাপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী অবলম্বনে নানা ধর্ম্মোপদেশ কবিতায় লিখিত। মূল্য এক টাকা।

তত্ত্ব সমালোচনা।—শাঙ্কর মত নূতন ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত ও তুলনা করা হইয়াছে। প্রতি দর্শন-রসাস্বাদীর ইহা অবশ্য পাঠ্য। "উপাধ্যায় তিলক" শ্রীমতিলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম, এ, প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৯২০ সালের কার্য্য বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বৎসর ৩৮টী ধর্ম্মসভা, শ্রীবুদ্ধ ও বিবেকানন্দের জন্মোপলক্ষে বিশেষ সভার অধিবেশন, খৃষ্ট, রামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবীর জন্মোপলক্ষে বিশেষ পূজা, সহরের বিভিন্ন পল্লীতে ১৩টী বিশেষ ধর্ম্মালোচনা সভা, সোসাইটী গৃহে ৩০টী সপ্তাহিক অধিবেশন, ৯৯৮টী রোগীর চিকিৎসা ও ৩১টী গরীব ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দান কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সোসাইটী গৃহে নিয়মিত ধ্যান ধারণা পাঠাদিও হইয়া থাকে। এখানকার লাইব্রেরীতে এই বর্ষে ২৩২২ খানি পুস্তক ছিল। কয়েকটী সেচ্ছাসেবক দক্ষিণ বারাসতের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাবে সেবাকার্য্য করিয়াছেন। উহার মোট সভ্য সংখ্যা ৪৭৮, পাঠাগারের গ্রাহক ৪৫ জন।

২। রেঙ্গুনের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৯২১ সালের ৩০শে জানুয়ারী হইতে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০০ রোগী ঔষধ, পথ্য, ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বেলিয়াটি গ্রামে নিম্ন ও পতিত জাতির শিক্ষার জন্য রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

৪। আমরা পূর্ব্বে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে স্বদেশে ফিরিতেছেন উদ্বোধন পাঠকদের জ্ঞাত করিয়াছি। তিনি ২৪শে সেপ্টেম্বর টাণ্ডা নামক জাহাজে সিঙ্গাপুরে অবতরণ করেন। কোয়ালা লামপুর, সিরেমবান এবং সিঙ্গাপুরের হিন্দু সমাজ হইতে তাঁহার অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি বর্ত্তমানে রেঙ্গুন পৌহুছিয়াছেন। তথায় গত ১৮ই অক্টোবর তারিখে জুবিলী হলে তাঁহাকে আবাহন করা হয়। ঐস্থলে' পরে তিনি 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম' ও 'শ্রীবুদ্ধের' বাণী নামক দুইটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পরে রেঙ্গুন হইতে এ্যাঙ্গোরা নামক জাহাজে, বৃহস্পতিবার, ১০ই নবেম্বর কলিকাতা আউট্রাম ঘাটে তিনি অবতীর্ণ হন। বেলুড়মঠ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, রামকৃষ্ণ ষ্টুডেণ্টস্ হোম, ভবানীপুর মঠ, বিবেকানন্দ সোসাইটী প্রভৃতির সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ ও রামকৃষ্ণ ভক্তগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে তিনি বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। বিবেকানন্দ সোসাইটীর তরপ হইতে শীঘ্রই তাঁহাকে এক বিশেষ অভিনন্দন দেওয়া হইবে। কলিকাতার জনসাধারণ পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্রবণে উৎসুক। আশা করি আমরা তাঁহার সুললিত বক্তৃতাবলী বহুবার শ্রবণ করিব। তাঁহার ইচ্ছা শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত দেখা করিয়া তিনি মায়াবতী গমন করিবেন।

৫। গত ফাল্গুন মাসের উদ্বোধনে মহিশূর গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এণ্ড ম্যারেজ এসিওরেন্স কোম্পানী রামকৃষ্ণ মিশনের লোকহিতকর কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপিত হয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম বিজ্ঞাপনে প্রচার করিলেও উক্ত কোম্পানী আজ পর্য্যন্ত মিশনের সহিত আদৌ ঐরূপ কোন সংস্রবে আসেন নাই। গ্রাহকমণ্ডলীর অবগতির জন্য ইহা অধুনা পত্রস্থ করিতে বাধ্য হইলাম।

অন্তিম কামনা।

(শ্রীমতী মলিনাবালা দাসী)

দিবা অবসান — আশা ম্রিয়মান
এ জীবনে দেখা — হলো না হলো না
দীরঘ দিবস — আছিনু চাহিয়া
আশা পথ পানে — বিফল বাসনা ॥

উষার আলোকে — চপলা প্রকৃতি
আকুল বিহগ — করে কল-গীতি
এনে দেয় মনে — তাঁহারি যে স্মৃতি
প্রেমভরা হৃদি — মধুর নিশানা ॥

প্রভাত-কুসুমে — সুধামাখা হাসি
ধীর সমীরণে — সুরভির রাশি
নীরবে শ্রবণে — কহে যেন আসি
সে যে গো আমার — নহেত অজানা ॥

মধ্যাহ্ন ভাস্কর — ভাস্বর কিরণে
প্রসুপ্ত নিশীথে — নীরবতা সনে
মহিমা মণ্ডিত — সুরভি মোহনে
ভেসে উঠে মনে — পাসরি আপনা ॥

ঘোর দুঃখ দৈন্যে — গভীর বেদনে
ব্যাকুলতাময় — প্রবাস জীবনে
নিরাশার মাঝে — আশার সিঞ্চনে
দিয়াছে কতই — মধুর সান্ত্বনা ॥

আজি এ শয়নে — নয়নে আমার
ভাসিছে গো যবে — তমো-পারাবার
কোথা ওহে প্রভু — করুণা-আধার
জাগ আসি হৃদে — অন্তিমে কামনা ॥

কথাপ্রসঙ্গে।

যদি আমার প্রিয় যেদিকে মুখ করে আমার দিকে আসছেন, আমিও যদি মিলনের জন্য সেই একই দিকে মুখ করে দৌড়াই, তবে মিলন সম্ভব নয়। আমাদের পরস্পরকে বিপরীত মুখী হয়ে যেতে হবে তবেই মিলন সম্ভব। তাই, শ্রীভগবান নিত্য থেকে লীলার দিকে নেবে এসেছেন বলে—ভক্তকে লীলা থেকে নিত্যের দিকে যেতে হবে; তবেই ভক্ত ভগবানে মিলন হবে—এই বিপরীত পন্থায়।

* * *

অরূপ ভগবানের লীলা বিলাস হ'ল রূপেতে, গানেতে, তাই তিনি অরূপ হয়েও এই বিশ্বের ছন্দে ও রূপে নমে এসেছেন। কিন্তু ভক্ত কখন নামরূপে তৃপ্ত হতে পারে না, কারণ, তারা এই নামরূপের যে প্রাণ—অনন্ত—তাঁকে জানে না; তাই সে নামরূপের কারাগার ভেঙে মুক্ত হতে চায়—অনন্তকে জান্‌তে চায়। এই মুক্তির পথে তাই বিপরীত পন্থায় জীবের আনন্দ, আর মুক্তেশ্বরের বন্ধন-লীলায় এত আনন্দ।

* * *

অনন্ত-শক্তি খণ্ড-শক্তিতে বিভক্ত হয়ে খেলা করেন; যশোদার বন্ধন তাঁর ছিন্ন করবার শক্তি নাই, ত্রিপাদে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আবরণকারীর সাগর-গোষ্পদ লঙ্ঘনে আকুল হতে হয় আর তাতেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু অল্প শক্তি চায় এক লাফে সাগরপারে যেতে, সূর্য্যকে কুক্ষিগত করতে, সে নিজে রথী হয়ে শ্রীভগবানকে করে তার সারথী। এই বিপরীত পন্থায় যে মিলন—সে মিলন মণি-কাঞ্চনের সংযোগ।

* * *

দুরন্ত বালিকার মত পৃথিবী পালাতে চায় ছুটে—সূর্য্য রাখে তারে ধরে, নদী ঢালে জল সমুদ্রের পদতলে—সে জল দেয় সে ফুৎকারে আকাশে তুলে, মেঘ ঢালে জল পর্ব্বতশিরে—অশ্রুর মত ঢালে সে তারে তটিনীর বক্ষে, চাতক চায় উর্দ্ধে মেঘের পানে—মেঘ ঢালে জল নিম্নে। এই বৈপরীত্যেই জগদ্বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠিত।

* * *

ভাবুকের হৃদয় ভাবে ও আনন্দে পূর্ণ হয় তখন সে আনন্দ ও ভাব উছলিয়া ওঠে কণ্ঠের মধ্য দিয়ে রাগিণীতে, অঙ্গুলির মধ্য দিয়ে বীণার তন্ত্রীর ঝঙ্কারে। কিন্তু শ্রোতা ঝঙ্কার ও রগিণীর মধ্য দিয়ে ভাব ও আনন্দের রাজ্য পায়—এই বিপরীত পন্থায়।

* * *

ভক্ত ও ভগবানের, রূপ ও অরূপের, অনন্ত ও সান্তের, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, শব্দ ও ভাবের বিপরীত পন্থা যিনি জেনেছেন তিনিই সম্যক্ বেত্তা—জগদ্রহস্যের অবগুণ্ঠন তাঁরই চখের ওপর থেকে অপসারিত হয়ে যথার্থ সত্য যা তারি প্রকাশ দিয়ে তাঁকে অতিবাদী করে—তাঁকে ভূমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

"কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি, কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।" হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে সে ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি বিচার, শাস্ত্র বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, 'ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি'?

—বিবেকানন্দ।

অভিনন্দন।*

ধন্য আজিকে হয়েছি আমরা
হৃদয়ে মোদের কি আনন্দ
দীর্ঘ দিনের প্রবাস হইতে—
ফিরেছে বঙ্গে "অভেদানন্দ"
চল নরনারী চল ত্বরা করি
লইগে শরণ চরণে তাঁর
দেবতা মোদের আসিয়াছে আজ
চল করিবারে নমস্কার।
স্বাগত হে মুক্ত পুরুষ—
জাগ্রত কর সুপ্তপ্রাণ
তব আহ্বানে নরনারী আনে
করিতে "হৃদয়-অর্ঘ্য" দান।
তব আগমনে সকলের প্রাণে
আজি এ নূতন কিসের হর্ষ ?
ধন্য তোমারে বক্ষে ধরিয়া—
জননী মোদের ভারতবর্ষ।

বেদান্তের গূঢ় রহস্য প্রচারে
সহেছিলে তুমি অশেষ ক্লেশ
ধন্য কোরেছো সকল মানবে
ধন্য কোরেছো সকল দেশ।
বাজাও শঙ্খ ওগো পুরনারী
বাজুক মৃদঙ্গ ঘনঘোর রোলে

* পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দের ভারতে শুভ পদার্পণে জনাই বৈদান্তিক সেবক-সঙ্ঘ এই কবিতাটী পাঠাইয়াছেন।

দেবতা মোদের মন্দির দ্বারে
বরণ করিয়া লহগো তুলে।
মন্দির দ্বার মুক্ত করিয়া
রেখেছি তোমারি তরে
পূজার অর্ঘ্য রয়েছে সাজান
এস হে মোদের ঘরে।
যদিও গো হীন হয়েছিনু মোরা
তবুও মোরা তোমারি ছেলে
পিতা হয়ে তুমি নিদয় হয়োনা
যেও না—আর চরণে ঠেলে।
(মোদের) হৃদয়-বীণাটী ছিল এতদিন
তন্ত্রী বিহীন পড়িয়া—
এসেছ যদি হে তব পরশনে
উঠিবে আবার বাজিয়া।
দেখগো দাঁড়ায়ে কত নরনারী
দীন নয়নে চাহিয়া
প্রাণ বলি দিতে পারে আজ তারা
প্রাণের দেবতা লাগিয়া।
কি কায করিতে হইবে মোদের
আদেশ করহ স্বামী—
তোমারি আলোকে পথ যেন দেখি
আঁধারে দিবস যামী।
(মোদের) সুপ্ত হৃদয়-তন্ত্রী যতেক
ঝঙ্কারি আজ বাজে—
(হের) রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত এখন
ফিরিতে হবেনা লাজে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,
৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র আমি বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্টে মান্দ্রাজের সভার প্রস্তাবগুলি অবলম্বন করে একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখলাম। আমার নিকট ঐ প্রস্তাবগুলির কিছু পৌছায়নি। যদি তোমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠিয়ে থাক, তবে উহা শীঘ্রই পৌছিবে। প্রিয় বৎস, এ পর্য্যন্ত তোমরা অদ্ভুত কর্ম্ম করেছ। কখন কখন একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়ে যা লিখি, তাতে কিছু মনে কোরো না। মনে করে দেখ, দেশ থেকে ১৫০০০ মাইল দূরে একলা রয়েছি—গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে চল্‌তে হয়েছে—এতে কখন কখন একটু ঘাব্‌ড়ে যেতে হয়। হে বীরহৃদয় বৎস, এইগুলি মনে রেখো এবং কায করে যাও। বোধহয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছ, জি, জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। এমন করে ঠিকানাটা লিখেছিল যে, উহা আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারিনি। তাইতে তার কাছে সাক্ষাৎভাবে জবাব দিতে পারিনি। তবে সে যা যা চেয়েছিল, আমি সব করেছি আমার ফটোগ্রাফগুলি পাঠিয়েছি ও মহীশূরের রাজাকে পত্র লিখেছি। আমি খেতড়ির রাজাকে একটা ফনোগ্রাফ পাঠিয়েছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে উহার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র এখনও পাইনি। উহার খবরটা নিয়ো ত! আমি কুক এণ্ড সন্স, র‍্যাম্‌পার্ট রো, বোম্বাই ঠিকানায় উহা পাঠিয়েছি। ঐ সম্বন্ধে সব খবর জিজ্ঞাসা করে রাজাকে একখানা পত্র লিখো। ৮ই জুন তারিখে লেখা রাজার একখানা পত্র পেয়েছি। যদি ঐ তারিখের পর কিছু লিখে থাকেন, তবে তা আমি এখনও পাইনি।

আমার সম্বন্ধে ভারতের খবরের কাগজে যা কিছু বেরোবে সেই কাগজখানাই আমায় পাঠাবে। আমি কাগজটাতেই তা পড়্‌তে চাই —বুঝ্‌লে? চারুচন্দ্র বাবু যিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখবে। তাঁকে আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু তোমাকে আমি গোপনে বল্‌ছি, দুঃখের বিষয় যে তাঁর কথা আমার কিছু স্মরণ হচ্ছে না। তুমি তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমায় জানাবে কি? থিওসফিষ্টেরা এখন আমায় পছন্দ কর্‌ছে বটে, কিন্তু এখানে তাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫০ জন মাত্র। তারপর খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিকগণ আছেন তাঁদের সকলেই আমায় পছন্দ করেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ হবে। আমি উভয় দলের সঙ্গেই কায করি বটে, কিন্তু কারও দলে যোগ দিই না আর ভগবৎকৃপায় উভয় দলকেই ঠিক পথে গড়ে তুল্‌ব—কারণ, তারা কতকগুলো আধা-সত্য কপ্‌চাচ্ছে বইত নয়।

এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আশাকরি নরসিমা টাকাকড়ি ইত্যাদি সব পাবে।

আমি 'ক্যাটের' কাছ থেকে এক পত্র পেলাম, কিন্তু তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একখানা বই লিখ্‌তে হয়, সুতরাং তোমার এই পত্রের মধ্যেই তাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি আর তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে বল্‌ছি যে, আমাদের উভয়ের মতামত বিভিন্ন হলেও তাতে কিছু এসে যাবে না—সে একটা বিষয় একভাবে দেখ্‌ছে, আমি না হয় আর এক ভাবে দেখ্‌ছি, এই এক জিনিষকে বিভিন্নভাবে দেখা স্বীকার করে নিলেই ত আমাদের উভয়ের ভাবের এক রকম সমন্বয় হোলো। সুতরাং সে বিশ্বাস যাই করুক তাতে কিছু এসে যায় না—সে কায করুক।

বালাজি, জি জি, কিডি, ডাক্তার ও আমাদের সব বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে আর যে সকল স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা তাঁদের দেশের জন্য তাঁদের মতবিভিন্নতা গ্রাহ্য না করে সাহস ও মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সকলকেও আমার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা জানাবে।

একটী ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার ও কাযটা আরম্ভ করে দেবার জন্য খুব কম করে ধরে কত খরচা পড়ে হিসেব করে আমায় জানাবে আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানাও জানাবে। আমি তা হলে তার জন্যে নিজে টাকা পাঠাব—শুধু তা নয়, আমেরিকার আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা কোর্‌বো। কল্‌কেতায়ও ঐরকম করতে বল। আমাকে ব—র ঠিকানা পাঠাবে। সে বেশ ভাল ও মহৎ লোক। সে আমাদের সঙ্গে মিশে বেশ সুন্দর কায কর্‌বে।

তোমাকে সমস্ত জিনিষটার ভার নিতে হবে—সরদার হিসাবে নয়, সেবকভাবে—বুঝ্‌লে? এতটুকু কর্ত্তাত্বির ভাব দেখালে লোকের মনে ঈর্ষার ভাব জেগে উঠবে—তাতে সব মাটি হয়ে যাবে। যে যা বলে, তাইতে সায় দিয়ে যাও—কেবল চেষ্টা কর—আমার সব বন্ধুদের একসঙ্গে জড় করে রাখ্‌তে—বুঝ্‌লে? আর আস্তে আস্তে কায করে উহার উন্নতির চেষ্টা কর। জি, জি, ও অন্যান্য যাদের এখনই রোজগার কর্‌বার প্রয়োজন নেই, তারা এখন যেমন কচ্ছে তেমনি করে যাক্ অর্থাৎ চারিদিকে ভাব ছড়াক্। জি, জি, মহীশূরে বেশ কায কচ্ছে। এই রকমই ত কর্ত্তে হবে। মহীশূর কালে আমাদের একটা বড় আড্ডা হয়ে দাঁড়াবে।

আমি এখন আমার ভাবগুলি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ কোর্‌বো ভাব্‌ছি—তার পর আগামী শীতে সারা দেশটা ঘুরে সমিতি স্থাপন কোর্‌বো। এ একটা মস্ত কার্য্যক্ষেত্র আর এখানে যত কায হতে থাক্‌বে, ততই ইংলণ্ড এই ভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে। হে বীরহৃদয় বৎস, এতদিন পর্য্যন্ত বেশ কায করেছো। প্রভু তোমাদের ভিতর সব শক্তি দেবেন।

আমার হাতে এখন ৯০০০৲ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কার্য্যটা আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব আর এখানে অনেক লোককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক, ষান্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল ও কাগজটা বার করে দাও ও আর আর আনুসঙ্গিক যা আবশ্যক তার তোড়জোড়

কর। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের ভিতর গোপন রেখো—সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মান্দ্রাজে একটা মন্দির করবার জন্য মহীশূর ও অন্যান্য স্থান থেকে টাকা তোলবার চেষ্টা কর—তাতে একটা পুস্তকালয় থাক্‌বে—আফিষ ও ধর্ম্মপ্রচারকদের অর্থাৎ যে কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগী এসে পড়ে, তাদের জন্য কয়েকটা ঘর থাক্‌বে। এইরূপে আমরা ধীরে ধীরে কাযে অগ্রসর হব।

সদা স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

পুঃ—তুমি ত জান টাকা রাখা—এমন কি, টাকা ছোঁয়া পর্য্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুস্কিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাযের ভাগের টাকা-কড়ির ব্যাপারটার বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্য তোমাদিগকে সংঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন কর্‌তেই হবে। এখানে আমার যে সব বন্ধু আছে—তারাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে থাকে—বুঝলে? এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফছেড়ে বাঁচ্‌ব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পার এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পত্রাদি ব্যবহার কর্‌তে পার, ততই তোমাদের ও আমার উভয় পক্ষের মঙ্গল। এইটে শীগ্‌গির করে ফেলে আমাকে লেখ। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে—'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট কর্‌বে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতেই ('প্র = সঙ্গে + বুদ্ধ) বোঝাতে পারে 'বুদ্ধের' অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে—ভারত জুড়্‌লে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে। যাই হক্, আমাদের সকল বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ কোরো—তাঁরা যা ভাল বিবেচনা করেন।

আমার মঠের গুরুভাইদেরও এইরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কায কর্ম্ম কর্ত্তে বল্‌বে, তবে টাকাকড়ির কায সব তোমাকেই কর্ত্তে হবে। তারা সন্ন্যাসী,

তারা টাকাকড়ি ঘাঁটা পছন্দ করবে না। আলাসিঙ্গা, জেনে রেখো তোমায় ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় কায করতে হবে। অথবা তুমি যদি ভাল বোঝ, কতকগুলি বড়লোককে ধরে তাদের রাজি করে সমিতির কর্ম্মচারিরূপে তাদের নাম প্রকাশ করবে—আসল কায কিন্তু কর্ত্তে হবে তোমাকে—তাদের নামে অনেক কায হবে। তোমার যদি সাংসারিক কাযকর্ম্ম খুব বেশী থাকে এবং তার দরুণ যদি এসব করবার তোমার সময় না থাকে, তবে জি, জি, সমিতির এই বৈষয়িক ভাগটার ভার নিক—আর আমি আশা করি, পেট চালাবার জন্যে যাতে কলেজের কাযের উপর তোমায় নির্ভর না কর্ত্তে হয়, তা করবার চেষ্টা কোর্ব্বো। তা হলে তুমি নিজে উপোষ না করে আর পরিবারদের উপোষ না করিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে এই কাযে নিযুক্ত হতে পারবে। কাযে লাগো, বৎস, কাযে লাগো। কাযের কঠিন ভাগটা অনেকটা সিধে হয়ে এসেছে। এখন প্রতি বৎসর কায গড়িয়ে গড়িয়ে হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি কেবল উত্তমরূপে দাগা বুলিয়ে যেতে পার, তা হলে আমি ভারতে ফিরলে কাযের খুব দ্রুত উন্নতি হতে থাকবে। তোমরা যে এতদূর করেছ, এই ভেবে খুব আনন্দ কর। যখন মনে নিরাশ ভাব আসবে, তখন ভেবে দেখো, গত বর্ষের ভিতর কতদূর কায হয়েছে। আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশাপূর্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিষ আশা করছে। নির্ব্বোধ মিশনরিগণ, ম—এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পার্ব্বে না। তোমার কি মন মুখ এক হয়েছে ? তুমি কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পার ? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত ? যদি এইগুলি তোমার থাকে তবে তোমার কোন কিছুকে, এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করবার দরকার নাই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ, সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উহা উৎসুক নয়নে ঐ জ্ঞানালোক পাবার জন্য আমাদের দিকে আশা করে রয়েছে। কেবল ভারতের কাছে সেই জ্ঞানালোক আছে—সে জ্ঞানালোকের অলৌকিক কার্য্যকারিশক্তি, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি বা বুজরুগিতে

নাই—আছে—সত্য' ধর্ম্মের মর্ম্মভাগের—উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের অশেষ মহিমার উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী কর্‌বার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখদুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়াও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন উহা দেবার সময় এসেছে। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কায কর্ব্বার জন্য জন্মেছো। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে উঠ—উঠ কায কর।

তোমাদের

বিবেকানন্দ।

ভারতীয় সমস্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

বিদ্যার্থী—মনোরঞ্জন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জাতীয়তার উদ্বোধন ধ্বনি প্রথমতঃ স্বামীজীর নিকট হইতেই বহির্গত হইল। যে উদ্দেশ্য লইয়া ভারত-জীবন আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—যে আধ্যাত্মিক সাধনা-ধারার সুশীতল প্লাবন ভারতীয় জীবনকে এতকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা স্বামীজীই সর্ব্বপ্রথম দেশের সম্মুখে বিবৃত করিলেন। কেবল আদর্শ লইয়াই তিনি নিরস্ত থাকেন নাই, দেশের মুক্তির একটি মহাতী প্রণালীও আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রবল কর্ম্ম তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া দেশ যাহাতে আপন চিন্ময়সত্ত্বাকে বিধ্বস্ত করিয়া না ফেলে সেইজন্য তিনি বারম্বার সাবধান করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় জীবনের কোন বিভাগকেই তিনি পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ দেখিতে

চাহেন নাই। পরন্তু নিজের ভিত্তি-ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রয়োজন মত নানাদেশের অভিজ্ঞতায় অধিকতর প্রজ্ঞালাভ করিয়া নূতনভাবে কর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত আমাদিগকে নানাদেশ হইতে বিজ্ঞানাদি অনেক জিনিষই আয়ত্ত করিয়া লইতে (assimilate) হইবে কিন্তু অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে গিয়া যেন অপরের কবলিত না হইয়া যাই তন্নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"Stand on your own feet and assimilate what you can; but learn from every nation, take what is of use to you but remember as Hindus every thing else must be subordinated to your own national ideal".

ভারতবর্ষের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালীকে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ভারতব্যাপী এক মহান্ নেশন্ (জাতি) গঠন করিয়া তোলাই বর্ত্তমানের অভিনব প্রয়াস। কিন্তু অন্যান্য দেশের শত শত বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে বিজ্ঞতম হইয়া উঠিবার নিমিত্ত তৎপূর্ব্বে সমগ্র জগতের চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালীর বিশেষভাবে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সমস্যার সহিত সমস্ত জগতের সমস্যা এমনই জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে সংগঠনমূলক কোন প্রচেষ্টা করিতে গেলেই আমরা পাশ্চাত্যের দিকে না তাকাইয়া পারি না। শত শত বৎসর ব্যাপী অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সমাবেশ এবং সাম্য ও বৈষম্যের ঘাত প্রতিঘাতে ইউরোপ খণ্ডে এক একটি নেশন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যে যে ষ্টেট্-কেন্দ্রিভূত-রাজনীতি (State centred politics) অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে নেশনের প্রতি ব্যষ্টিই আপন বিশেষত্ব ও স্বাধীন বর্দ্ধনকে নিষ্পেষিত করিয়া অল্প কয়েকজন লোকের অঙ্গুলি সঙ্কেতে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীসের চিন্তা ও রোম সাম্রাজ্যের সুপরিণত আইনকানুন ও সঙ্ঘবদ্ধতা সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপীয়া টিউটন স্বায়ত্তশাসনের সহিত সম্মিলিত হইয়া feuda-

lismএর পরবর্ত্তী অভিব্যক্তিরূপে এক একটি ষ্টেট্ সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে। নানাজাতি ও শাসনপ্রণালীর ভৌগলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক ক্রম্ পরিণতি ও পাত্রগত বৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে,—Parliamentary বা Non-parliamentary যে প্রণালীই হউক না কেন, মূল আদর্শ ও ভিত্তির দিক্ হইতে সমগ্র ইউরোপই একই ভাবের ভাবুক ও একই প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধ। সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেকটি নেশন পার্থিব উন্নতিকে চরম উদ্দেশ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক জাতীয় জীবনের প্রতি সাধনায় লক্ষৈকনির্দ্দেশ করিতেছে। নেশনের উদ্দেশ্য—ভোগ, উপায় ভোগ প্রসূতি জড়বিজ্ঞান, ভোগাধিকার সংরক্ষণের যন্ত্র ষ্টেট্, ভোগ মন্ত্রের প্রচারক—প্রতিহিংসা ও লালসা দীপ্ত পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ অবাধ বাণিজ্যনীতি। ডেমক্রেসীই ইউরোপীয় রাজনীতির শেষ কথা; কিন্তু স্বাধীনতা ও সাম্যের ধ্বজা উড়াইলেও মৈত্রীর অভাবে আজ ডেমক্রেসীর ভিত্তি-ভূমি টলটলায়মান। আধ্যাত্মিকতায় মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। ইউরোপের অনুর্ব্বর জড়প্রান্তরে আধ্যাত্মিকতার স্থান নাই। টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষীর সাধু জীবন ও বাণী বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করিয়াছে এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। সমাজনৈতিক চিন্তায় ম্যাক্স (Marx), এঙ্গেলস্ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে Communistic আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহাই ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে বলিয়া সকলের আশা।

ভারতবর্ষের জাতীয় চিন্তা ও সাধনা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও তদনুযায়ী কর্ম্মজীবন পরিচালিত করিবার ভাব আমাদের অন্তরে সুচারুরূপে প্রতিভাসিত হইয়া উঠা দরকার, কারণ এতদিন যে বৈদেশিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ লইয়া ধাবিত হইয়াছিলাম তাহা ত চক্ষের সম্মুখে তত্তৎদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকই পরিত্যক্ত ও গ্লানিপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ যে চরম আদর্শকে

শেষ-সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহা কিংবদন্তীর ঘনান্ধকার মিশ্রিত কোন্ সুদূর প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগ হইতে শত শত বাধাবিঘ্নের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতীয় জীবনকে অভিব্যক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইয়া আসিতেছে। জাতীয় জীবনাদর্শ বৈদিক যুগেই আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী যুগে এক মহান্ সাধনা-ধারা ধীরে ধীরে সুবৃহৎ ভারতখণ্ডে বিস্তারিত হইয়া মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্রের সহিত আদর্শ স্থাপনার ইতিহাস হইয়া গিয়াছিল এবং বৌদ্ধযুগে ভারতীয়-সাধনা কর্ম্মকাণ্ডের বহুলতা এবং নানা জাতিগত ও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া সমূহকে সমন্বিত করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক বৈদিক মত স্থাপনের পর, চৈতন্যদেব, গুরু নানক, কবীর প্রভৃতি মুসলমান-ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কারক কর্ত্তৃক উহা বহুলাংশে উদারভাব সম্পন্ন হইয়া ও বিজাতীয় সমস্যার কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসের আর এক অভিনব অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে। দেশ যখন এই মহান্ ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পাশ্চাত্য মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া ধাবিত হইতে ছিল তখন স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বপ্রথম এই জাতীয় বিশেষত্বের সন্দেশ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য্য করছে ও সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন এ জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটি জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।"

বর্ত্তমান কালে চিন্তাশীল সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরেই ভারতীয় জাতীয়-জীবন গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই "আধ্যাত্মিক ভিত্তি" কথার ভাবটি আমাদের নিকট অধিকতর

সরল ও সহজবোধ্য হইয়া উঠা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ ধারণা করিয়া বসি যে আধ্যাত্মিকতা বুঝি দেশের ভৌতিক উন্নতি-লাভের একটি উপায় মাত্র। উহাই যে চরম সাধ্য (End in itself) এই কথাটি ভালরূপে ধারণা না করিয়া সাধারণ-বুদ্ধি এই ভাব পোষন করিয়া থাকে যে উহাকে মনে মনে ভাবিতে পারিলেই বুঝি উহার কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা নহে; আমাদের যাবতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ততক্ষণ পর্য্যন্তই ভারতীয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা বিভিন্ন চরিত্রের মানুষকে বিভিন্ন প্রকার ভোগের মধ্য দিয়া একই চরম আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রেরণ করে। ভারতীয় কর্ম্মজীবনের উদ্ভব ও সংবর্দ্ধণ কোন যান্ত্রিক উপায়ে সম্পাদিত হয় নাই এবং ইতিহাসও তাহার প্রমাণ দেয় না। দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কর্ম্মজীবন ধীরে ধীরে ও স্বাভাবিক ভাবে উত্তম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও সাধনার নূতন সৃষ্টির অভিনয় করিয়া আসিয়াছে। যুগে যুগে যখনই বিরাট আধ্যাত্মিক তরঙ্গসমূহ দেশকে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই যথার্থ জীবনীশক্তির সবলতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুন্দর ও সুঠাম ভাবে এক অভিনব কর্ম্মময় জীবনের পত্তন করিয়া দিয়াছে। স্বর্ণকার স্বর্ণের উপর শিল্পচাতুর্য্য প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে স্বর্ণকে তাতাইয়া লয়। ঠিক সেইরূপ কর্ম্মজীবনকে নানা বিভাগে পরিচালিত করিবার পূর্ব্বে সমগ্র সমাজ শরীরকে আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ দ্বারা তাতাইয়া লওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন,—

"Before flooding India with political and socialistic ideas first deluge the land with spiritual ideas......So that these truths may run like fire all over the country from North to South and East to West."

কোন জাতির সমস্যা বলিতে সামাজিক সমস্যাই বুঝায় এবং প্রত্যেক সমাজ বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয় প্রণালীর দ্বারাই সমাজ-শরীরকে সমাহিত করিয়া রাখে। সমাজ আপনার অন্তর্গত ব্যষ্টিসমূহ ও তাহাদের বিসদৃশ,

অধিকার তৃষ্ণাকে সমন্বিত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। ইউরোপের ও আমেরিকার সমাজের পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় স্বাধিকার-প্রমত্ততার উপরই তাহাদের সমাজ স্থাপিত এবং ভোগাধিকারের (Rights) সমন্বয় বা ভাগবাটোয়ারার উপর তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে। বিশেষতঃ জীবনের আদর্শ ভোগাধিকারে পর্য্যবেশিত বলিয়া অন্য কিছুর সমন্বয়ের প্রতি তাহাদের মাথা খাটাইতে হয় না।' ভারতবর্ষের আদর্শ ভিন্ন ও সমন্বয়ের ধারাও পৃথক। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের আদর্শ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মজীবন যাপনে প্রতি ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ভারতবর্ষ ধর্ম্মরাজ্যে খুব উন্নত হইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে—কারণ—"Freedom is the first condition of grouth" ভারত-ইতিহাসের প্রতি যুগেই প্রধান শক্তি ধর্ম্ম সমন্বয়েই নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের অবাধ স্বাধীনতা হেতু বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের এমত প্রকার বৈসাদৃশ্য ঘটিয়া উঠে যে, সমস্ত জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া যাবতীয় আধ্যাত্মিকতাকে কোনও মহান্ সার্ব্বভৌমিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত করিবার নিমিত্ত, তখন বিভিন্ন ধর্ম্মমতের এমন একটি সমন্বয় সূত্র বাহির করিতে হয় যাহা আপাতদৃষ্ট বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একই সম্মোহন সূত্রে বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একীভূত করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র দেশের শক্তিকে এক কেন্দ্রাভিগত করিতে হইলে এই ধর্ম্মসমন্বয়ই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং স্বামীজী বলিয়াছেন—"This is the first step."

ভারতবর্ষ যেন এই সার্ব্বভৌকি মহাসমন্বয় সাধন নিমিত্তই পাশ্চাত্যকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মমত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা সমূহ এই ভারতের উদার বক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতব্যাপী—সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যাতায়াতের ও চিন্তাসমাগমের যে প্রকার সুযোগ ঘটিয়াছে তাহা যেন ভারতের মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায় রূপেই বর্ত্তমান। এই সমন্বয়ের উপর একদিকে সমস্ত পৃথিবীর ও অপর দিকে ভারতবর্ষের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে উদার ভাবে সুসংহত করিয়া তোলা

এক মহা সমস্যা। সাময়িক কোন প্রকারের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য বা বাহিরের আঘাতের তাড়নায় যে একত্ব আপাততঃ সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার স্থিতিস্থাপকতা আদৌ নাই সুতরাং তাহা বস্তুতন্ত্র হীন। কারণ কোন উন্নত ও উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্ত্তে উহা সাময়িক লাভ ও ভোগাধিকারের চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা ভোগাধিকারের চুক্তির উপর কোন মহান চিরস্থায়ী একতার আশা করিতে পারি না কারণ ভোগ-চুক্তির অকর্ম্মণ্যতা ও শেষ পরিণাম ইউরোপে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। শাসনপ্রণালীর উপর শাসন-প্রণালীর ভার চাপাইয়া কত সংস্কার চলিতেছে কিন্তু শান্তি স্থাপিত হইয়াছে কি? আমরা চিরদিনের জন্য যাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছি যাহার সুশীতল ছায়া সমগ্র উৎকণ্ঠিত ও ত্রস্ত জগতকে শান্তির স্নিগ্ধ-মধুর আহ্বানে আপ্যায়িত করিবার আশা করে তাহার ভিত্তি এত সংকীর্ণতার উপর স্থাপিত হইলে চলিবে কেন? সমগ্র দেশের নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভারত-ভারতী এক সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইবে—বুদ্ধি প্রসূত চুক্তি বা সমীকরণের দ্বারা নহে—উদার সমন্বয়ের দ্বারা। হিন্দুকে হিন্দুত্ব হারাইতে হইবে না, মুসলমানকে মুসলমানত্ব বর্জ্জন করিতে হইবে না এবং খ্রীষ্টানকেও খ্রীষ্টানত্বের বিরুদ্ধ-বাদী হইতে হইবে না; পরন্তু হিন্দুকে সত্য হিন্দু, মুসলমানকে সত্য মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে যথার্থ খ্রীষ্টান হইতে হইবে। বিশেষতঃ সহস্র বৎসর একত্র বাসের ফলস্বরূপ হিন্দু মুসলমান একই ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মত অনেকাংশে হিন্দুর বেদান্তেরই অনুরূপ। তন্নিমিত্ত স্বামীজী মুসলমানগণকে হিন্দু হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই—ভারতবাসী বলিয়াই দেখিয়াছেন। ভগবান্ যীশুর উপদেশে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়েরই উল্লেখ আছে যেমন তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"আমি ও আমার পিতা এক।" স্বামীজী সর্ব্বধর্ম্মের সারতথ্য ও শেষ কথা বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতিকে গ্রহণ নিমিত্ত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সম্মুখে ধরিয়াছেন। জগততত্ত্বের চরম মীমাংসায়, কর্ত্তব্যের (Ethics) ভিত্তি স্থাপনে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক

গবেষণার অনুকূলে এবং সার্ব্বভৌমিক যথার্থ একত্ব স্থাপনে একমাত্র বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতিই সমর্থ উহা স্বামীজী স্বকীয় মহান্ জীবন ও লেখনী দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। এই দীর্ঘ শত শত শতাব্দীর নিষ্পেষণ ও সংকীর্ণতার মধ্যে থাকিয়া যে মহান আধ্যাত্মিক সত্য ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছে—তাহা এই যে, মানুষ যে কোন অবস্থায় যে কোন স্থানে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার নিকট আধ্যাত্মিক চরম সত্য লাভের পথ উন্মুক্ত, নিষ্কণ্টক ও উদ্‌ঘাটিত; সমাজের যে কোনও স্তরে, যে কোনও স্থানে বাস করিলেও সে ইচ্ছা করিলে আধ্যাত্মিক চরম সত্য লাভে সমর্থ। স্বামীজী বেদান্তের এই সত্য সমূহকে কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ না রাখিয়া আপামর সাধারণের গ্রহণের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন—

Therefore, these conceptions of the Vedanta must come out, must remain not only in the forest, not only in the cave, but they must come to work out at the Bar and the Bench, in the pulpit and in the cottage of the poor man, with the fisher man that are catching fish and the students that are studying. They call to everyone, woman and child whatever be their occupation wherever they may be."

সাধারণ চক্ষে উহা আমাদের মনেই স্থান প্রাপ্ত হয় না যে হিন্দু হিন্দু থাকিয়া, মুসলমান মুসলমান থাকিয়া এবং খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান থাকিয়াও এক মহান্ সমন্বয় সম্ভবপর হইতে পারে। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সমন্বয় অনেকটা সম্ভবপর মনে হয় কারণ বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত সকল সম্প্রদায়ই বেদ স্বীকার করেন। কিন্তু আমাদের আর সন্দিগ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই কারণ এক মহান্ দেব-জীবনে এই মহাসমন্বয় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় এই মহা সমন্বয় চরিতার্থ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে কেবলমাত্র হিন্দুগণের যুগযুগান্তরের মহান্ অনুভূতি সমূহ একটি জীবনে সুপরিণত করিয়াছিলেন তাহা নহে, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মানুসারেও যথাবিধি সাধনা করিয়া একই শেষ ফলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন—তাহাই স্বামীজি নিজ জীবনে পরিণত করিয়া দেশের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষের আদর্শই প্রতি যুগে ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া আসিয়াছে এবং এই আদর্শরূপ চিন্ময়সত্তাই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বামীজী ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের সম্মুখে তাঁহার পূত-জীবন ধরিয়া বলিয়াছেন—

"সতত বিবদমান, আপাত দৃষ্টে বহুধা বিভক্ত, সর্ব্বথা বিপরিত আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ের সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশ কালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" "হে মানব, মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না,—গত রাত্রি পুনর্ব্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্ব্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্তাবস্থার পুনরুদ্ধার হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।"

সংসার পথ শঙ্কট অতি কণ্টক ভরা তায় রে।
পথ দেখে চল মুখে হরিবল ফুটিবে না কাঁটা পায় রে॥
(তার) দেখা যদি পাবে আশা পাও আর নাহি পাও।
বিশ্বাস রাখিয়া হৃদে সোজা পথে চলে যাও॥

—উমাপদ।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"।

(শ্রীশস্ত্রপাণি শর্ম্মা)

কথাটি বহুলোকের মুখে শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি একজন ব্যায়াম শিক্ষক এই বাক্যটি তাঁহার প্রধান মন্ত্রস্বরূপ গণ্য করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল 'শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা ধর্ম্মজীবন গঠনের একমাত্র উপায় না হইলেও যে তাহা প্রধানতম ও অপরিহার্য্য, এই তথ্য নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিয়া অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

প্রথমতঃ অনেকগুলি ছাত্র তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য আগ্রহ সহকারে আকৃষ্ট হয় ও তাহার মধ্যে কেহ কেহ অল্প সময়ের মধ্যেই শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা লাভ করে। অতঃপর শিক্ষক মহাশয় কলিকাতায় কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। অন্য কোনও স্থানে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না। ব্যর্থতার কারণ অবশ্য আমি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহি, তবে যে কয়টি ছাত্র তাঁহার শিক্ষার গুণে আশু শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের সহিত আলাপে বুঝিয়াছি যে শিক্ষক মহাশয়ের আদিষ্ট প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া, আহার বিহারের সংযম শাসন ও অন্যান্য অল্পবিস্তর কষ্টসাধ্য নিয়মানুষ্ঠান ঠিক ঠিক পালন করিয়া তাহারা দেহ সম্বন্ধে যথাযথ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা ঠিক ঠিক পারে নাই, তাহারা সেরূপ ফল পায় নাই ও বেশীভাগ ব্যাপার কঠিন মনে করিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল। ইদানীং যে সকল ছাত্র তাহার শিক্ষায় শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহারাও পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ শিক্ষায় তাহাদের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহা হউক বা না হউক, আশাকরি একটা বিষয়ে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইয়াছে যে শারীরিক দুর্ব্বলতা বা সাধারণ অসুস্থতার কষ্ট অপেক্ষা সংযম প্রাণায়ামাদি অভ্যাস রাখিয়া সুস্থ শরীর বহন করা অধিকতর ক্লেশকর।

দেহটাকে সুস্থ ও সবল করিতে হইবে—অর্থাৎ (বয়স, সামর্থ্য ও রুচি

অনুযায়ী) প্রচলিত ব্যায়ামাদি, খেলাধূলা, ভ্রমণ ও আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত যথাসম্ভব নিয়ম পালন ব্যতীত অনন্য সাধারণ উপায়ে দেহটাকে সুস্থ ও সবল করিতে হইবে—কেন ?

যদি বল, উত্তম ভোগের জন্য—সে জন্য ১০০০ রের মধ্যে সংসারের ৯৯৯ জন খাটিতেছে, মরিতেছে, চুরি করিতেছে, এবং আত্মীয় স্বজনের মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে, নশ্বর সুখভোগের জন্য; অথবা যদি বল সাধারণ ব্যক্তি যে সকল উপায়ে ঐহিক সুখভোগের চেষ্টা করে, এই অসাধারণ উপায় অবলম্বনে তাহা ত সহজসাধ্য হইবেই, অধিকন্তু উচ্চতর সুখভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে; তাহাতে বাচনিক আপত্তি করিবার কিছু না থাকিলেও কার্য্যতঃ উপরোক্ত "সকল" ছাত্রদিগের দৃষ্টান্ত শিক্ষক মহাশয়ের অবধারিত উপায়ের উপর আমাদিগকে একান্ত আস্থাহীন করে। দৈহিক ভোগ সুখাদির জন্য উপরোক্ত উপায়ে শিক্ষা দিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন এরূপ শিক্ষক কোথায় পাওয়া যায় জানি না। তরবারি দ্বারা নখ কাটিবার প্রয়াস যেরূপ হাস্যকর, ঐহিক এবং দৈহিক ভোগের জন্য প্রাণায়ামাদির অভ্যাস তেমনি হাস্যোদ্দীপক ; কেবল তাহাই নহে, সদ্‌গুরু ব্যতীত প্রাণায়ামাদি শিক্ষা বিশেষ ক্ষতি-জনক একথা সর্ব্বজন বিদিত।

আর যদি বল ধর্ম্মজীবন গঠনের সাহায্যের জন্য উক্ত শিক্ষা প্রয়োজন, তবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা করিবার অনেক কথা আছে।

প্রথমতঃ ধর্ম্মজীবন কাহাকে বলে? ত্যাগই ধর্ম্মজীবনের আদর্শ—সন্ন্যাসীর ত কথাই নাই, গৃহস্থের পক্ষেও তাই। ত্যাগ অর্থে এক মহা-কঠোর ও সাধারণের পক্ষে অসম্ভব বিধিনিষেধাদির পালন নহে। নিম্ন ও দুঃখজনক প্রবৃত্তি সকলকে উচ্চ হইতে উচ্চতর ও আনন্দময় সোপানে উত্তোলন। "চিটে গুড়ের আস্বাদন ছাড়িয়া পরমান্নের আস্বাদ গ্রহণ।" ঈশ্বরের প্রেমে বা জ্ঞানে যে যতটা অগ্রসর হইয়াছে সে ততখানি ত্যাগী, তাহার ধর্ম্মজীবনও সেই পরিমাণে উন্নত।

দ্বিতীয়তঃ কিঞ্চিন্মাত্র হইলেও শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা ধর্ম্মজীবনের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য সহায়ক। "দেহটা মোহরের বাক্স"। মোহরের

তুলনায় বাক্সটির মূল্য যৎসামান্য সত্য, কিন্তু না হইলেও নয় ; আর মোহরগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য বাক্সটি ও তাহার কলকব্জা বেশ শক্ত হওয়া চাই। নিতান্ত বাতুল ব্যতীত কেহই মোহরের হিসাব ভুলিয়া কেবল বাক্সের চাকচিক্য লইয়ায়ই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে শারীরিক স্বাস্থ্য অপেক্ষা মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন আরও অনেক বেশী। "স্বশুদ্ধমনে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে ইহপরকালের কোনই উৎকর্ষ সাধন যে অসম্ভব, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বোধগম্য। সেইজন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনবরত শরীরের দিকে মুখ্যদৃষ্টি রাখিয়া অত্যল্প সময়ের জন্য বা গৌণভাবে ইষ্ট-চিন্তাদিতে লিপ্ত থাকিয়া হঠযোগী সাধুদের একরকম উচ্চদরের গুণ্ডা করিয়া তুলিয়াছে নয় কি? আবার নব অনুরাগী বা হঠাৎ অনুরাগী যুবক উচ্চভাবের উদ্দীপনীতে স্বীয় ক্ষমতার অতীত কঠোরতা করিতে গিয়া 'জড়' দেহটার কাছে এমন ধাক্কা খান যে তার টাল সাম্‌লাইতে জীবনটাই কাটিয়া যায়। 'হঠযোগ প্রভৃতি প্রণায়ামাদি অন্যান্য সাধারণ উপায়ে আগে দেহটাকে দৃঢ় করা যাক, সাধন ভজনাদি পরে হইবে'—এরূপ নীতি ছাড়িয়া সাধন ভজনাদিতে যথাসাধ্য লিপ্ত থাকিয়াও দেহটাকে যে সুস্থ রাখিবার অবসর পাওয়া যায় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন।

সুস্থদেহ কিরূপে অসুস্থ হয় সেটা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া দেখা যাক। মাতা অসুস্থ বা সুস্থ যে অবস্থাতেই থাকেন সন্তানের অসুখে রাত্রি জাগরণ ও অনিয়মাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হন না, এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কোন শাসনেও তাহা নিবারিত হইতে পারে না। এইরূপ আসক্তি সৎই হউক আর অসৎই হউক ক্রমাগত মনুষ্য দেহকে বিভিন্ন ছাঁচে গড়িয়া তোলে। পশু ও পশুতুল্য মানব যেমন সুস্থ ও সবলদেহী হয়, উন্নত মানব সেরূপ হইতে পারে না। মনটাকে বহুকালের অভ্যস্থ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া উচ্চতর পথে চালাইতে হইলে কত অভ্যাস ও আয়াসের প্রয়োজন তাহা সকলেই জানেন। সেই প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া যায়, তাহার খবর রাখিবার

সাবকাশ থাকে না। কিন্তু বহুদিন পরে কালরূপী রোগ দেখা দিলে তখন ঔষধাদি প্রয়োগের প্রয়োজনে ডাক্তারেরা মাথা ঘামাইতে থাকেন, রোগটী এই নামের—কি ঐ নামের।

ঈশ্বরানুরাগী কোন সিদ্ধ সাধুকে দেহ বা দেহরক্ষার চিন্তায় বিব্রত হইতে হয় না। সুস্থ বা অসুস্থ উভয় অবস্থায়ই তাঁহারা তাঁহাদের কায করিয়া থাকেন। বহু প্রাচীন কাল হইতে স্বীয় ইষ্ট ও জগতের কল্যাণ-কামী সাধুরা হঠযোগের সাহায্যে দৃঢ় শরীরে দীর্ঘকাল দেহ ধারণ করিয়া থাকিতেন। আধুনিক সময়ে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু হঠযোগের কোনও সাহায্য না লইয়াও ভগবান লাভ করিয়া বহু মহাত্মা দীর্ঘকাল সুস্থশরীরে ধর্ম্মপ্রচারাদি লোককল্যাণ-কর কার্য্যে জীবন ব্যয় করিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে দেহের ক্ষীণতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য ঈশ্বরলাভে ও ভ্রান্ত জীবের উদ্ধারের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় না। হয়ত অসুস্থ হওয়াটাও তাহাদের একটা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ মানুষের মত এমন কি তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ কষ্ট না ভুগিলে বোধহয় তাহাদের অন্তরে শান্তি-দান-করা শিক্ষা হয় না। অথবা হয়ত সাধারণ লোকের সহিত সহানুভূতিতে তাহাদের দুঃখ কষ্টই নিজ পবিত্র দেহে টানিয়া লন। তাঁহারা যোগবলে আধিব্যাধি নাশ করিতে পারেন কি না, অথবা পারিয়াও নশ্বর দেহের উপর ঈশ্বরার্পিত মনকে টানিয়া আনিতে তাঁহাদের কোনরূপ কুণ্ঠা হয় কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ সাধারণ ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধান ভিন্ন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে শরীরের স্থিতি ও 'সোয়াস্তির প্রয়োজন, ইহাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ও পরিবর্ত্তিত হয়, অতএব প্রথম হইতেই প্রত্যেক লোককে তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্যের বিধান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি আজীবন ৩০৲ টাকা

মাহিয়ানাতে জীবন কাটাইতে প্রস্তুত, পোষ্যদিগকে রক্ষা করিয়া কোনও মতে দিনগত পাপক্ষয় করাই যাহার উদ্দেশ্য তাহার স্বাস্থ্য ও সাংসারিক বন্ধনশূন্য পরার্থে ও মোক্ষার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন যুবকের স্বাস্থ্য এক উপাদানে রক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। আবার অক্লান্ত পরিশ্রমী উদ্যমশীল ব্যক্তি ও ভাবপ্রবণ, কাব্যামোদী ব্যক্তি একই উপায়ে শরীর সুস্থ রাখিয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে পারেন না। এজন্য বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন অর্থসমর্থ ও বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে বিভিন্ন উপায়ালম্বনে স্বাস্থ্যের সজীবতা রক্ষা করিতে হয়। এই সকল বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণীভুক্ত করিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আখ্যা প্রদান করাই সমীচীন। মানুষের অবয়বে যদি এমন কোনও সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকিত যাহাদ্বারা সত্ত্বপ্রধান, কি রজঃ প্রধান, কি তমঃ প্রধান প্রকৃতি সহজে বুঝা যাইত তবে কোন গোল ছিল না। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে আপন আপন পন্থা বুঝিয়া চলিলেই চলিত। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে অপরের ত দূরের কথা নিজের প্রকৃতি নিজেই বুঝিতে পারা যায় না যে কতটা সত্ত্ব বা রজঃ বা তমঃ নিজেতে বর্ত্তমান। কার্য্যক্ষেত্রে সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি যে কেবল সাত্ত্বিক কার্য্যকলাপ লইয়াই জীবনযাপন করেন তাহা সচরাচর দেখা যায় না। বরং কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ মানব বিচিত্রতার মধ্যেই আপন আপন পথে অগ্রসর হয়। যে যেমন অবস্থায় পড়ে তাহা জয় না করিয়া উচ্চতর অবস্থায় উঠিবার সম্ভাবনা বিরল। তবে ঘোর তামসিক যখন সাত্ত্বিক বা উন্নত রাজসীক কার্য্য অবলম্বন করে, তাহার বিষময় ফল জগতে একটি দুর্দ্দৈব বলিয়াই ঘোষিত হয়। এরূপ দুর্দ্দৈব না ঘটিলে স্বাস্থ্যরক্ষা সমস্যার আলোচনার প্রয়োজন হইত না। কিছুকাল পূর্ব্বে বংশপরম্পরায় বাঙ্গালীজীবনে প্রাতে স্নানাহারাদি নিত্যকার্য্য, মধ্যাহ্নে ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও তৎপূর্ব্বে ও পরে সাংসারিক কার্য্যকর্ম্মাদি করিবার প্রথা ছিল। ক্রমে অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে তাহাকে ৯টা ১০টার মধ্যে আহারাদি যথাসম্ভব সম্পন্ন করিয়া ৫টা পর্য্যন্ত জামাজোড়ায় আবৃত হইয়া কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। রাজপুরুষেরা তাহাতে কোনও ক্ষতি বুঝিতে পারেন না, কেননা তাঁহারা ঐ নিয়মেই অভ্যস্ত।

এখন আমাদের উপায় কি? হয় ঐ বিধি উল্টাইয়া আমাদের উপযোগী নিয়মাদির পুনর্গঠন অথবা রাজপুরুষদের অনুকরণে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় দ্বারা চালিত হওয়া, নচেৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ, অকালমৃত্যু ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বহুমূত্র রোগটিকে উল্লেখ করিলেই হইবে। এ দেশস্থ পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ঐ রোগ খুব অল্পই দেখা যায়; কিন্তু পদস্থ ও উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহার ঐ রোগ নাই, তিনি ভাগ্যবান। কিন্তু ঐরূপ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যিনি নিরামিযাশী, দুধ ঘৃত ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণ অথবা বিশুদ্ধ না পান এবং পাইলেও হজম করিবার সাবকাশ নাই, আবার এই প্রাণান্ত পরিশ্রমের উপর যাঁহাকে একটি বিরাট সংসারের নানা দুশ্চিন্তায় নিয়ত বিব্রত থাকিতে হয় তিনি যে অসুস্থ হইবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি?

সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যেই লিপ্ত থাকুন না কেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া স্বীয় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবেন, এরূপ আশাকরা যায় না। রাজসিক বা তামসিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে তাঁহাকে স্থূল দেহের সৌকার্য্যার্থে অন্ততঃ কতকটা রাজসিক আহারাদি করা উচিত। কারণ উহা রুচিসঙ্গত না হইলেও সুচারুরূপে বহুদিন হইতে অনুষ্ঠিত কর্ত্তব্যব্রতের জন্য ত্যাগস্বরূপ গণ্য হইবে। এতদ্ব্যতীত এই নির্দ্দিষ্ট সাংসারিক কাজ সমাপনান্তে স্বীয় উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অবসর কি তাঁহার মিলিবে না? এই স্থানে সাত্ত্বিক বৃত্তি পরীক্ষার উপায়ের অভাব নাই। বুদ্ধি ও সৎপ্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্তে শতগুণে বৃদ্ধি পায়। স্থূল সূক্ষ্ম আহার যোগাইবার জন্য ধ্যান, ভজন, সৎচর্চ্চা, পূজা ইত্যাদি অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। সাত্ত্বিক ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম আহারে পুষ্ট হইয়া রাজসিক ও তামসিক রাজ্য অনায়াসেই জয় করিতে পারেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে সত্ত্বপ্রধান হিন্দুসন্তান রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যদিগের সহিত যে যে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তথায় তাঁহাদের প্রাধান্য বিকাশের বিলম্ব হয় নাই। তবে যে যে স্থলে তাঁহারা পাশ্চাত্যদের তুলনায় দীর্ঘজীবী, সুস্থ ও সবলদেহী হইয়া বাঁচিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহাদের

সত্ত্বসুলভ "হীনতার" জন্য নহে। সাত্ত্বিক বা সূক্ষ্ম আহারের অভাবই তাহার কারণ বুঝিতে হইবে। "সোণার ঘটী মাজিবার দরকার হয় না"। কিন্তু "সোণার ঘটী না হইলে, না মাজিলে কলঙ্ক পড়িবেই"। নিজের আদর্শ হইতে স্খলিত হইলেই দেহে ও মনে তাহার ছাপ পড়া অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মের ব্যপদেশে যদি একদিন হোটেলে খানা খাইতেই হয়, তা বলিয়া কি আমার নিত্য অনুষ্ঠিত জপ ধ্যানাদি ছাড়িয়া দিতে হইবে? বরং আরও বেশী মনকে উন্নত করিবার জন্য ভাবিতে হইবে আমি ঐ নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসিয়াছি, হীন ভোগেচ্ছায় নয়, বা কেবলমাত্র দেহরক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে নয়, আমার চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির সোপান মাত্র বলিয়া—বলবান অশ্ব যেরূপ আরোহীকে শীঘ্র গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, সেইরূপ এই রজঃ ও তমের মধ্য দিয়া তীব্রবেগে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবে এইরূপ দৃঢ়জ্ঞানে। আসল দিকে নজর না থাকিলে সামান্য বাধা বিঘ্নাদির আন্দোলনেই কাটিয়া যায়। আমিষ খাইব কি নিরামিষ খাইব, তাহাতে কিরূপ মশলা দিব, কয় ঘণ্টা বেড়াইব, কতবার ডাম্বল ভাঁজিব এরূপ সূক্ষ্ম বিচারে কেহ কখন দেহ ও মন উভয়কে উন্নত করিতে পারে না। দারিদ্র্য দুঃখাদিক্লিষ্ট সাধারণ মানব ত এ সকল ভাবিবার সময়ই পায় না। অথচ তাহাদের মধ্যেই বলিষ্ঠ লোক বেশী দেখা যায়।

তথাপি দারিদ্র্যই আমাদের দেশের স্বাস্থ্যহীতার সর্ব্বপ্রধান কারণ। আবার দারিদ্র্য কেবল এই দেশেই হীনতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হয় না। আমি অর্থহীন হইতে পারি, কিন্তু দীননাথের কৃপায় সাগর শুষ্ক নহে। অর্থের প্রাচুর্য্যে অজ্ঞান দূর হয় না। মানসিক বলহীনতা, অর্থহীনতা অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্দ্দৈব। এই সহরেই অনেক গরিব গৃহস্থের সংসার যাত্রা দেখিলে অনেক ধনী নিজ নিজ অসুস্থতার কারণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমরা এইরূপ একটী দরিদ্র গৃহস্থের গৃহচিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি। প্রত্যুষে ভগবানের নাম লইয়া গাত্রোত্থান করিয়া গৃহিণী ও প্রৌঢ়ারা এবং কখন কখন যুবতীগণ পর্য্যন্ত প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলেন। ঐরূপ স্নানে দেহ মন উভয়ই পবিত্র হয়, এই ধারণা যুগযুগান্তর

ব্যাপী অতএব দেহ ও মনের উপর ইহার প্রভাব বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কর্ত্তা নিজে ইতিমধ্যে বাজার হইতে তরিতরকারি কিনিয়া আনিলেন। বলা বাহুল্য নিজে দেখিয়া কিনিলে যেমন ভাল ও সস্তা হয় চাকর দ্বারা আনাইলে সেরূপ কথনই হয় না। ইতিমধ্যে দাসী ঘর দোর ধোয়া বাসনমাজা ইত্যাদি সারিতেছে। বালক-বালিকাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বাজার হইতে সগুভাজা মুড়ী কিনিয়া কনিষ্ঠদের সঙ্গে জলযোগ করিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিল। গৃহিণীরা স্নান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গৃহ-কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। অতঃপর রন্ধন শেষ হইলে কর্ত্তারা আহার শেষ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠারা উঁহাদের ভুক্তাবশেষ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিলেন। গৃহিণী ও প্রৌঢ়ারা তখন পূজায় নিয়তা। যুবতীরা দেখে শেখে ও উপযুক্ত হইলেই তাহাতে অধিকার পায়। অতঃপর মধ্যাহ্নে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ সেলাই ইত্যাদিতে অপরাহ্ন আসিল। তখন আবার বৈকালিক গৃহ কর্ম্মের সময়। ক্রমে সন্ধ্যা ও রাত্রে আপনাপন কর্ত্তব্যপালনপূর্ব্বক সকলে সুখে নিদ্রিত হইল। এই পরিবার মধ্যে কাহাকেও স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। এই বাহ্যিক ছবি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক অন্বেষণ ভিন্ন ইহার ভিতরের সঠিক চিত্র কেহ দেখিতে পাইবেন না।

আলস্য ও আরাম প্রিয়তা একটু ত্যাগ করিতে পারিলে যে কতটা সুখ ও স্বাস্থ্য লাভ করা যায় উক্ত পরিবার তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্বেষণে জানিবেন ঐ পরিবারের উন্নতির গোড়ায় এক বৃদ্ধা আছেন। তিনি আলস্য ও ময়লা বরদাস্ত করিতে পারেন না। কর্ত্তা হইতে শিশুদের পিছন পর্য্যন্ত অনবরত লাগিয়া থাকিয়া তাহাদের খাওয়া, শোয়া, নাওয়া ইত্যাদি সুনিয়ন্ত্রিত করেন ও মেয়েদের সকল বিষয়ে আপনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা দেন। এই আলস্যহীন বৃদ্ধা বহু দিন পর্য্যন্ত সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ইঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে

চলিতে থাকে। তিনি যেরূপ শাসন করিতে সুদক্ষা, ততোধিক সংসারের সকলকে ভাল রাখিতেও সমর্থা। অন্বেষণ করিলে আরও দেখা যায় ত্যাগই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। আর একটি কথা তিনি শত সহস্র কার্য্যের মধ্যেও জপ পূজা কখনও ভুলেন না।

রজঃপ্রধান মানুষ জনসাধারণের মধ্যে অনেক আছে, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের শক্তি সামর্থ্য একটা দিকে নিযুক্ত হইলে অপর বিষয়ে আর ততটা হুঁস থাকে না। ফলে অর্থোপার্জ্জন হয় ত শরীর হয় না; ফিটফাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সন্তানাদিতে অযত্ন ও শাসনে অক্ষমতার ফলে ভবিষ্যৎ উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিণাম। ব্যায়াম, কুস্তি ইত্যাদিতে শরীর দৃঢ় হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ পালোয়ান ও কুস্তিগির চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে পারে না, অথবা "নাহঙ্কারাৎ পরোরিপু" ও দম্ভের মূর্ত্তিমান স্তম্ভস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা প্রথমে বেশ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, কিন্তু আগাছাগুলি এত বেড়ে ওঠে যে আসল শস্যকে চেপে ফেলে।" এই রজঃশক্তি তমোমুখী, ইহাকে সত্ত্বমুখী করিতে হইবে একটু ত্যাগের মালমসলা দিয়া। তাহার জন্য তাহাকে স্বাদু আহার ও উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ ত্যাগ করিতে হয় না, বরং উত্তম উত্তম অসন বসনাদি প্রভূত যত্নে সংগ্রহ করিয়া সকলে মিলিয়া ভোগ করিতে হয়। এই পাঁচ জনের সঙ্গে ভোগে যে উচ্চতর আমোদ, ইহাই স্বার্থত্যাগের প্রথম সোপান। লোভবশতঃ আত্মসাৎ প্রিয় কেহই দেহ মন সুস্থ রাখিতে পারে না, কিন্তু উত্তম আহারে ও পরিচর্য্যায় সুস্থ সবলদেহে অধিকতর সৎকার্য্যক্ষম হইব এইরূপ ভাবে ভাবিত ব্যক্তি ভোগের মধ্যেও তমোমুখী হয় না। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"।

"আমি ত্যাগী হ'ব ভাবিলেই কেহ ত্যাগী হয় না। জ্ঞান বুদ্ধি বা প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দৃঢ় সংকল্পে অগ্রসর হইলেই ত্যাগী হওয়া তাহার পরিণাম। অসার বস্তুর জ্ঞান ও ভালবাসায় আকৃষ্ট হইলে রজঃশক্তি তমোমুখী হয় এবং সৎবস্তুতে হইলে সত্ত্বমুখী হয়।

স্বাস্থ্যনাশের একটি প্রধান কারণ পরিচর্য্যার অভাব। যে সমস্ত দিন খাটিয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে সে যদি একটু মানসিক ও দৈহিক শ্রান্তি না পায়, কোনরূপ ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া তাহার দেহ বলিষ্ঠ করিতে পারা যায় না। এই বিষয়টি অবশ্য স্ত্রীলোকদিগের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে, কিন্তু পুরুষরাই নিজে তাহার অবহেলা করিয়া নিজেরাই ক্ষতি গ্রস্থ হয়। যেখানে উপযুক্ত অভিভাবক নাই সেস্থলে যুবক নিজ স্ত্রীকে এই বিষয়ে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষিতা করা উচিত। নচেৎ সামান্য অবহেলাতে রুষ্ট ও ক্ষুণ্ণ হইয়া দিনের পর দিন যাপন করিয়া, ভগ্ন স্বাস্থ্য, অসুখী ও অকাল বৃদ্ধ হইতে হইবে। গৃহিণীর সামান্য ত্রুটীতে যে কতদূর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে তাহা উদ্‌ঘাটন করিলে অনেকে স্তম্ভিত হইবেন। ছেলে আফিষ থেকে আসিয়া শূন্য ঘরে লক্ষ্মীটির মত রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না—এ বোধ অনেক বৃদ্ধা গৃহিণীর নাই। বউটি যদি ভাল করিয়া সাজগোজ করে ত তাহার জন্য তাহার টিট্‌কারির অবধি থাকে না। ময়লা, কয়লার গন্ধযুক্ত কাপড়ে ও ম্লানমুখে বউ আসিয়া কোন মতে অর্দ্ধ রাত্রিতে বিছানার কোলে পড়িয়া নিদ্রিতা হইল—এ সব খবর কে রাখে? কিন্তু তাহাতে যে কত মনোমালিন্যের, অসন্তোষ, স্বাস্থ্যভগ্ন ও অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহার ইয়ত্বা নাই। তমঃপ্রধান মানুষের মধ্যে ঐ বিষয় অন্যরূপ অযথা ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ও তজ্জন্য যে স্বাস্থ্যহানী হয় তাহার উপায় ব্রহ্মচর্য্যের গুণবর্ণনাতে হয় না। তাহাকে রজঃশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; উত্তম ভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহার হীনতা দূরীভূত হইয়া অধিকতর কার্য্যতৎপরতা আসে। ঐরূপ লোকের পক্ষে যাহার যেটি অভাব বোধ আছে, সেইদিকেই তাহাকে উৎসাহিত করা উচিত। কেননা অভাব বোধ না থাকিলে, তাহা পূরণের চেষ্টা হয় না। একজন মেধাবী গরিব লোককে যদি বলা যায় যে "তুমি যে অর্থকরী কার্য্যে লিপ্ত আছ উহা অসার, তুমি উহাতে অধিক মন না

দিয়া, যতদূর পার ধ্যানধারণাতে সময় ব্যয় করিবে"। তাহাতে ফল হইবে এই যে সে ব্যক্তি অর্থাভাব অশান্তির মধ্যে, হাবুডুবু খাইতে থাকিবে, অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যটুকু হারাইবে। আর যদি তাহাকে বলা যায় যে "পৃথিবীর একপ্রান্ত অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত খুড়ে যেমন করে পার অর্থ সংগ্রহ করে আন ও বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব, অতিথি ও আতুর সেবায় যদি জীবন সার্থক করিতে পার তবেই তুমি মানুষ নামের যোগ্য, নচেৎ পশুতুল্য জীবন তোমার থাকুক বা যাক্, তাতে কিছু আসে যায় না"; সম্ভবতঃ এই উত্তেজনার বশে সে উপদেশের দশাংশের একাংশ করিলেও সফলতা লাভ করিবে এবং কালক্রমে তাঁহার উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে।

যাহার অর্থ আছে অথচ দেহের ও মনের বল নাই, তাহাকে সুস্থ সবল, গরীব ও সামাজিক সমবস্থাপন্ন লোকের সুখ ও শান্তির আদর্শে আকৃষ্ট করিয়া ধনগর্ব্বের অসারতা না বুঝাইলে কোন উপদেশই খাটিবে না। গাড়ী ছাড়িয়া হাঁটা যে প্রয়োজন, ডাল ভাত খাইয়াও যে শরীরর ভাল থাকে ও চাকর বাকর যে আলস্যের প্রশ্রয় দেয় এ শিক্ষা না পাইলে তার ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কিছুই হইতে পারে না।

"হে প্রভু! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয়স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এস প্রভু, এস হে আচার্য্য চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভু, এস হে পার্থ-সারথি! অর্জ্জুনকে তুমি এক সময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যেন প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণের সহিত আমরাও দৃঢ়তা ও নির্ভরের সহিত বলিতে পারি—ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

—বিবেকানন্দ।

অচেনা বন্ধু।

(শ্রীসাহাজি)

হে অজ্ঞানা, আজ্‌কে শেষের দিনে,
তোমার কথাই জাগছে ফিরে ঘুরে।
বন্ধু আমার, তুচ্ছ জানার মোহে,
ভুলেই ছিনু অচেনা বন্ধুরে।
এই যে চেনা, এই যে আমার জানা,
সবি হোত অন্ধকারে ফাঁকি,
পিছন হতে, অচিন রতন আমার,
তুমিই যদি না রহিতে জাগি।
জগৎ জুড়ে এই যে সুখের দানা,
হেথা সেথা পড়ে এক এক কণা,
বন্ধু তুমি, সিন্ধু সকল কণার,
তোমার মত আত্মীয় কোন্ জনা?
এসেছিনু যেই অজানা হতে,
যাচ্ছি আবার, সেই অজানায় ফিরে,
ঘরের ছেলে, ফিরছি আপন ঘরে,
খুসির কথা এর চেয়ে আর কি রে?
হে অচেনা, সকল চেনার চেনা!
বন্ধু আমার, * * *!
আসা যাওয়ায় দুবার শুধুই দেখা,
দুই দেখাতেই হৃদয় রহ জুড়ি।
পেটের ছেলে পেটেই মরে আহা!
সবাই বলে, জন্ম তাহার মিছে;
লীলার মাঝে, তোমার স্বরূপ দেখা,—
মিট্‌ল যদি, ব্যর্থ সে কও কিসে?
অরূপ রতন, স্বরূপ তোমার কিবা,
কইতে নারে দার্শনিকের খাতা,
অবুঝ বুঝে তোমার স্বরূপ কিছু,
ভক্তিতে যার, নুইয়ে পড়ে মাথা।

স্বরাজ পথিক।

(শ্রীননীগোপাল ব্রহ্মচারী)

(১)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়।

বাহিরের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দাদি বিষয় জানিবার জন্য অদ্বিতীয় শিল্পী বিধাতা আমাদের দেহ-ঘরে জানালার মত চক্ষু ও রসনেন্দ্রিয় প্রভৃতি পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বা বহির্মুখ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। আর তাহার ফলে আমরা রূপাদি বিষয়-গুলির প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু বাহিরের রূপরস প্রভৃতি বিষয়গুলির মত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তবে উহাদের (জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের) অস্তিত্বটা অনুমান সিদ্ধ—পরোক্ষ প্রমাণ, অনুমানের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। সেই অনুমানটা এইরূপ—

আমাদের মনবস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের কুটীরে কুটীরে ভ্রমণ করিয়া কল্পনার সুকোমল নিপুণ তুলিকায় বাহিরের দৃশ্যাবলীর ছবিগুলি আমাদের উপর অঙ্কিত করে, তাহার ফলে রূপাদি বিষয়বুদ্ধিগুলি জন্মিয়া থাকে। আর যাহা জন্মিয়া থাকে বা উৎপত্তিশীল, তাহা কার্য্য, এবং প্রত্যেক কার্য্যই যখন সাধন সাপেক্ষ, তখন বুঝিতে হইবে যে, রূপাদি বিষয়ের বুদ্ধিগুলির যখন জন্ম আছে, তখন উহারাও কার্য্য বিশেষ ও কিছু না কিছু সাধন দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে বাধ্য। কারণ, কোনও একটি কার্য্য করিতে গেলে তাহার সাধনও কর্ত্তাকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ হিসাব অনুসারে যদিও মনবস্তু রূপাদি বিষয় বুদ্ধিগুলির সাধন হয়, তথাপি যে সকল বস্তুকে ছাড়িয়া মন রূপাদি বিষয়ের বুদ্ধিগুলি জন্মাইতে পারে না ও যাহাদের সাহায্য পাইলেই ওই বুদ্ধিগুলি জন্মাইতে পারে, তাহারাও রূপরস প্রভৃতি বিষয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপ কার্য্যগুলির সাধনভূত বস্তু বিশেষ।

সেই বস্তু পাঁচটী, যথা—চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক্ ও শ্রোত্র। ইহারা রূপাদি বিষয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞান উৎপত্তির সাধনভূত ইন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় আখ্যায় অভিহিত হয়॥

এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী যোগ্যতানুসারে রূপরসাদি বিষয় জ্ঞানের সাধন বটে কিন্তু বৃক্ষাদি ছেদন করিবার সাধন বিশেষ কুঠারাদির মত উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, যেহেতু উহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য বা অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্দ্রিয়, নতুবা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য পরোক্ষ প্রমাণ অনুমানের অবতারণা করিবার প্রয়োজন ছিল না॥

আমাদের প্রত্যক্ষিভূত এই স্থূল শরীরের সহিত অপ্রত্যক্ষ আকাশ বস্তুর সংযোগটা, যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ দুইটা হস্তের সংযোগের মত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। আলোকাদির সাহায্যে প্রত্যক্ষিভূত রূপাদি বিষয়ের সহিত অপ্রত্যক্ষ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সংযোগও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করিবার অযোগ্য বা অতীন্দ্রিয়। তবে উহা (বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ) অনুমানসিদ্ধ অনুমানরূপ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে ও সেই অনুমান প্রমাণের আকার এইরূপ—

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, চক্ষু ইন্দ্রিয় আলোকের সাহায্যে সম্মুখবর্ত্তী একখানি চিত্রিত ছবির রূপের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাইতে পারে। আর ঐ ছবিটাই যদি আবার নিজের পৃষ্ঠদেশে বা পশ্চাদ্ভাগে আনিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে চক্ষু পশ্চাদ্বর্ত্তী ঐ চিত্রিত ছবির রূপের গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। কেন পারে না? এইরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছবির রূপের সহিত চক্ষুর সংযোগ নামে প্রসিদ্ধ একটা সম্বন্ধ বিশেষ হয় নাই বা জন্মে নাই, সেইজন্য চক্ষু পশ্চাদ্বর্ত্তী ছবির রূপের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও জন্মাইতে পারে নাই। এবং ইতিপূর্ব্বে সম্মুখবর্ত্তী ছবির রূপের সহিত চক্ষু সংযোগ নামক সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল বলিয়াই চক্ষু চিত্রিত ছবির নীলাদি রূপের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও জন্মাইয়াছিল—

যদি বল, রূপের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐরূপের উপর মনের সঙ্কল্প ও আত্মার বা আমার অনুভূতি-প্রবাহ বহিতে পারে, তাহা হইলে বলিব যে, যখন তোমার পৃষ্ঠদেশে একখানি নূতন ও মনোহর চিত্রিত ছবি রহিয়াছে, তখন তোমার চক্ষু ইন্দ্রিয়ে উক্ত ছবিররূপের সম্বন্ধ না থাকিলেও ওইরূপের উপরি তোমার মনের ভাল মন্দরূপে অথবা কোনও বিশেষরূপে সঙ্কল্প ও তোমার আত্মার অনুভূতি-প্রবাহ বহিয়া যাউক? কারণ, তোমার মতে নীলাদিরূপের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকিলেও যেহেতু রূপের সম্বন্ধে মানসিক সঙ্কল্প ও আত্মার বা জ্ঞাতা আমার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হওয়া সম্ভবে।

কিন্তু তাহা (উক্ত প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান) সম্ভবে না। অতএব বাধ্য হইয়া ইহা বলিতেই হইবে যে, রূপের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ নামক একটা সম্বন্ধ বিশেষ জন্মিয়া থাকে ও তাহার ফলে আমরা চক্ষু দ্বারা নীল লাল সবুজ প্রভৃতি রূপেরও প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ও ঐ সংযোগের (রূপের সহিত চক্ষু সংযোগের) অভাবে কোনও প্রকার রূপেরই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। উল্লিখিত প্রকারে রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের দ্বারা নীলাদিরূপের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগটার অস্তিত্ব যেমন বুঝিতে পারা যায়, শব্দাদি বিষয়ের সহিত শ্রোত্রাদি অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগ নিরূপণ সম্বন্ধেও এইরূপ॥

পক্ষান্তরে, উক্ত সংযোগ সম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়া মনের রূপ রস প্রভৃতি বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য বা যোগ্যতা থাকিলে অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তির মত বিকলেন্দ্রিয় অন্ধাদি ব্যক্তির ও চাক্ষুষাদি জ্ঞানও তজ্জাতস্মৃতি জ্ঞানও সম্ভবপর হইয়া যায়। কাজেই বাধ্য হইয়া ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে যে, অন্ধাদি লোক সকল যেহেতু রূপাদির দর্শনাদি করিতে পারে না, সুতরাং উহাদের (অন্ধাদি লোক সকলের পক্ষে রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান ও তজ্জাতস্মৃতি জ্ঞান ও উৎপন্ন হইতে পারে না। আর তাহাই যদি স্বীকার করিতে হইল, তবে ইহাও অবশ্যরূপে একটা স্বীকার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে যে, রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সংযোগ নামক সম্বন্ধের সাহায্যেই জড়জগৎ বা বহির্জ্জগৎ আমাদের মনেরও পরিচিত হইয়া থাকে।

পাঠক মহোদয়গণ! একবার প্রণিধানসহকারে ভাবিয়া দেখুন যে, আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক ও জিহ্বার সামনে এই জড় জগৎটার সহিত আমাদের মনের পরিচয় যে কিছু অসম্ভব, তাহা নহে। তবে যদি উহা অসম্ভব হইত তাহা হইলে এই প্রতীয়মান জগৎ বা বহির্জগৎ কোনও কালে আমাদের অনুভূতির কেন্দ্রে স্থান পাইতে পারিত না। কারণ, মনে করা যাউক, চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা কোনও অভিনবরূপ ও শব্দ আলোচিত বা সংগৃহীত হইলেই ঐরূপ ও শব্দের উপরি আমাদের মনের সঙ্কল্প স্রোতঃ বহিতে পারে। কিন্তু ঐ রূপ ও শব্দ চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা আলোচিত না হইলে অভিনব রূপও শব্দের উপরি মনের কোনও প্রকার সঙ্কল্পের স্রোতটাই যেমন বহিতে পারে না। মনের অগোচর বা মানসিক সঙ্কল্পের অগোচর বস্তুর উপরি ও তদ্রূপ অনুভবকর্ত্তা আত্মার বা আমার অনুভূতিগুলির সম্বন্ধধারা বহিতে পারে না, অর্থাৎ মনের অপরিচিত বা অসঙ্কল্পিত বস্তুসমূহ আমাদের অনুভূতির বিষয়রূপে উল্লেখ-যোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু এই বহির্জগৎটা যেহেতু আমাদের অনুভূতিগুলির বিষয়রূপে প্রতীয়মান হয়, সুতরাং পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বহির্জগৎ ও মনের পরিচিত বা সঙ্কল্পিত বিষয় বিশেষ, ও বহির্জগতের সহিত আমাদের মনের পরিচয় হওয়া সম্ভবে।

পক্ষান্তরে, রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের স্বভাব-সিদ্ধ চিরন্তন প্রণয় বা উল্লিখিত সংযোগ রূপ সম্বন্ধ বিশেষের স্থাপনা বশতঃ রূপাদিমৎ বহির্জগৎ ও পরম্পরায় আমাদের মনের পরিচিত বা সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে। মনে করা যাউক, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেন রথ বিশেষ, আর ঐ রথের পরিচালক বা সারথি হইতেছে আমাদের মন বা অন্তঃকরণ। কারণ, মন যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় রথে আরূঢ় বা সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সময় বিশেষে রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেমন চক্ষুর সন্নিকৃষ্ট রূপাদি জ্ঞান হয় না*। মনও তদ্রূপ আত্মা বা অনুভভ কর্ত্তা আমি রূপ সারথি বিশেষকে অপেক্ষা

* যখন তুমি কোনও গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাক, তখন চক্ষু চাহিয়া থাকিলেও চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট প্রিয় বন্ধুরও রূপ ও আকৃতি জ্ঞান হয় না।

না করিয়া স্বয়ং কথনও অনুভব রূপকাদিগুলি জন্মাইতে পারে না, তজ্জন্য ঐ মনই আত্মার রথ বিশেষ। আর মনোরথে আত্মা আরূঢ় বা সংযুক্ত হইয়া মানসিক সকল প্রকার প্রবৃত্তিই অনুভব করেন। অর্থাৎ কাম'ও ক্রোধাদিরূপ দোষের দ্বারা * মন প্রেরিত হইয়া চক্ষু ও কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তাহার ফলে আত্মা বাহিরের বিষয় রূপ ও শব্দাদির অনুভব করিয়া থাকেন। আত্মাও আবার ঐ রূপাদি বিষয় বিশেষে আসক্ত অথবা দ্বেষযুক্ত হইয়া রূপাদিমৎ বস্তুর গ্রহণ ও পরিহারে উপদেশ ও অনুমতি দিবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে মনের সহিত মিলিয়া থাকেন। তজ্জন্য মন ও মনের বিষয়গুলি আত্মার বা আমার নিকটে অপরিচিত বা অননুভূত থাকিতে পারে না। অর্থাৎ মন যখন আত্মার পরিচিত বা সাক্ষাদনুভবগম্য বিষয় বিশেষ, তখন মনরূপ সোপানে আরূঢ় রূপাদি বিষয়গুলিও সুতরাং আত্মার পরম্পরায় পরিচিত মধ্যে গণ্য হইতে পারে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বহির্জগতের সহিত আমার চিরন্তন পরিচয়টা যখন আমি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারি, ও বহির্জগতের সহিত আমার ঘাত-প্রতিঘাত রূপ কার্য্যটা যখন অনবরতই চলিতেছে, তখন এই দৃশ্যমান জগৎটাও আমার মনেরও পরিচিত বা সঙ্কলিত বিষয় হইতে বাধ্য, কারণ, মনের দ্বারা যাহা কিছু পরিচিত হয়, সে সমস্তই আত্মার যেহেতু অনুভব করিতে পারেন। তাহা হইলে উপস্থিত ইহা সিদ্ধ হইল যে, এই বহির্জগতের সহিত আমাদের মনের পরিচয় আছে। আমরা সচরাচর মনকে অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত করিব, তজ্জন্য মনের অন্তঃকরণ সংজ্ঞার যুক্তার্থতা প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে বায়ু পিত্ত ও কফ যেমন অবস্থিতি করে, স্থূল শরীরের ভিতরে মন নামেও ঐরূপ একটা বস্তু বিশেষ আছে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ ও জিহ্বা রূপ জানালার সাহায্যে ওই মন শরীরের ভিতরে থাকিয়াই বাহিরের বিষয়গুলির গ্রহণ করে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া মন স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রভাবে বাহিরের রূপাদি বিষয়গুলির গ্রহণ করিতে পারে

* কাম ও ক্রোধাদি চিত্তের মলিনতাদি দোষ আনয়ন করে বলিয়া ইহারা শাস্ত্রে দোষ নামে অভিহিত হয়।

না। এই কারণে (শরীরের অভ্যন্তরে বা ভিতরে থাকিয়াই বাহিরের বিষয় গ্রহণ করে বলিয়া) মনকে অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

অথবা, অন্তর্জগতের বিষয় সুখ ও দুঃখাদি মনের সাক্ষাৎ বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সাহায্য না লইয়াই মনবস্তু সুখাদি বিষয়ের গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য (অন্তর্জগতের বিষয়গুলির গ্রহণ করে বলিয়া) মন অন্তঃকরণ আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

কিম্বা সূক্ষ্ম দেহের বা অন্তর্দেহের কারণ বা ইন্দ্রিয় বলিয়াও মনকে অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত করিতে পারা যায়॥

'স্বীকার করিলাম, বহির্জগতের সহিত আমাদের মনের পরিচয় হওয়া সম্ভবে, ও উল্লিখিত কারণ বশতঃ মনকে অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত করিতে পারা যায়, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, মন ও মনের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ?—না অনুমান? যদি বল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা মন ও মনের অস্তিত্বটা প্রতিপন্ন হয়, ইহা কিন্তু সম্ভবাতীত। কারণ, বাহিরের স্থূল ঘটাদিবস্তুর মত মনকে আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণিত করিতে পারি*. অর্থাৎ মন যদি চাক্ষুষ রাসন শ্রাবণ ত্বাচ ও ঘ্রাণ প্রত্যক্ষের বিষয় হইত, তাহা হইলে আমরা রূপাদির মত ঐ মনেরও চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। যেহেতু তাহা পারি না, সুতরাং

---

* অন্ধকারপূর্ণ গৃহে প্রদীপ রাখিয়া দিলে ঐ প্রদীপ স্বীয় রশ্মিজালের দ্বারা গৃহস্থিত বস্তুগুলির প্রকাশ করিয়া ঐ গৃহে অবর্ত্তমান বস্তুগুলির অসত্তা বা অভাবটাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ গৃহে অবর্ত্তমান বস্তুগুলি যদি বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে প্রজ্বলিত প্রদীপ গৃহে বিদ্যমান নব বস্তুগুলির মত অবিদ্যমান বস্তুগুলিকেও আমাদের অনুভূতির সামনে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইত, এইরূপে, প্রদীপ যেমন গৃহে বিদ্যমান বস্তুগুলির প্রকাশ করিয়া অবিদ্যমান বস্তুগুলিকেও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলিও ঐরূপ রূপাদি ও রূপাদির অস্তিত্বটা প্রমাণিত বা প্রকাশিত করিয়া মন ও মনের অস্তিত্ব বিষয়ে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অসত্ত্বা বা অভাবটাও বুঝাইয়া দেয়।

মনকেও কখন চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে প্রমাণিত করা যায় না ও মনের অস্তিত্বে চাক্ষুষাদি পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রয়োজনটাও অপেক্ষিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

তপস্বিনী রাবেয়া।

(ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য)

মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন,—"বাহ্য আকৃতি বাস্তবিক কিছুই নহে, ধর্ম্মনিষ্ঠাই সার। মনুষ্য মানসিক ভালমন্দ অবস্থানুসারে শুভাশুভ ফল লাভ করিবে। ধর্ম্মজগতে স্ত্রী-পুরুষে ভেদাভেদ নাই।"

পূর্ব্বে তুরস্ক দেশের অন্তর্গত বাসোরা নগরে কোন দরিদ্রের গৃহে রাবেয়া নামে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার জনক-জননী উভয়েই লোকান্তর গমন করেন। পিতামাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাসোরা নগরে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাবেয়া আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এক দুর্বৃত্ত তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় দেখিতে পাইয়া কয়েকটী তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে একজন ধনবানের হস্তে সমর্পণ করে। সেই ধনীব্যক্তির প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ছিল, রাবেয়াকে সাধ্যাতীত পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিত; তিনি কোনরূপে তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষম নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। পরম বিশ্বাসিনী ঈশ্বরানুরক্তা রমণী রাবেয়া এইরূপ নিগ্রহ সহ্য করিয়াও দিবাভাগে গৃহস্বামীর পরিচর্য্যায় ও রজনীকাল ধর্ম্মপুস্তক পাঠে ও উপাসনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইভাবে গত হইলে একদিন রাত্রিতে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া—রাবেয়া যেন কাতরকণ্ঠে কি বলিতেছেন শুনিতে পাইল। রাবেয়া

নিভৃত কুটীরে প্রণতঃ হইয়া ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতেছিলেন, 'প্রভো! দয়াময়, আমার মনের যা অভিলাষ তা সব একমাত্র তুমিই জান। তোমার মন্দিরে তোমার সেবাতেই যদি আমি অহর্নিশি নিযুক্ত থাকিতে পারিতাম তাহা হইলে কতই না আনন্দ হইত। তুমি আমাকে পরাধীনা দাসী করিয়াছ; দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর তাই রাত্রির এই নিভৃত কোলে তোমায় ডাকি, কিন্তু ইহাতে আমার মনের সাধ মিটে না। প্রভো! এমন দিন কি হইবে, যখন দিবানিশি তোমার শ্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকিতে পারিব।' নিস্তব্ধ নিশীথে রাবেয়া দীনভাবে ঈশ্বরচরণে এই প্রার্থনা করিতেছেন। গৃহস্বামী ইহা শুনিয়া শয্যা পরিত্যাগ করতঃ রাবেয়ার এই ব্যাপার দেখিয়া কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সে দেখিতে পাইল, কি এক স্বর্গীয় আলোক রাবেয়ার মস্তকোপরে প্রজ্বলিত হইতেছে, যাহার ছটায় সমুদয় গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে গৃহস্বামীর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল এবং একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল; পরে সে স্থির করিল যে এতাদৃশী পূজনীয়া রমণীকে নিজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া রাখিবে না। তাঁহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। পরদিন গৃহস্বামী রাবেয়াকে বহু শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া বলিল, আপনি আজ হইতে দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করুন। যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমার গৃহেই থাকিতে পারেন, আমি দাস হইয়া আপনার সেবা করিব।' রাবেয়া প্রভুর অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ও কঠোর তপস্যাতে আপনার জীবনকে নিয়োজিত করিলেন।

ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা, উপাসনা ও সাধনাতে রাবেয়ার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে তিনি এক নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মক্কায় আগমন করেন ও তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল মক্কাতেই অতিবাহিত হয়। চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

রাবেয়া সাধনবলে এরূপ উন্নত ধর্ম্মজীবন ও স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নামে সকলে মস্তক অবনত করিত। তাঁহারা দর্শন ও উপদেশবাক্য শ্রবণের জন্য তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইত। সকলেই তাঁহার জীবনের প্রভাব দেখিয়া ও তাঁহার মুখবিনির্গত তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইত। একদা এক সাধুপুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনার কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,—'আপনি শরীরের বিবাহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমার শরীর কোথায়? এ শরীর যে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিয়াছি, শরীর তাঁহার আজ্ঞাধীন, তাঁহার কার্য্যে রত।'

একদা বসন্ত ঋতুতে তপস্বিনী রাবেয়া একটি কুটীরে স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "আর্য্যে, একবার বাহিরে আসিয়া প্রকৃতির মনমোহিনী সজ্জা দর্শন করুন"। রাবেয়া উত্তর করিলেন, 'তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা সন্দর্শন কর।' কেহ একবার রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি যে ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহাকে কি দেখিয়া থাকেন? তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে কখনই পূজা করিতাম না।'

একবার কোন ব্যক্তি মস্তকে পটি বাঁধিয়া রাবেয়ার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। রাবেয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ইহা কেন মাথায় বাঁধিয়াছ?' সে বলিল, শিরঃপীড়া হইয়াছে এইজন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বয়স কত?' সে বলিল ত্রিশ বৎসর। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতকাল তুমি সুস্থ না অসুস্থ ছিলে?' সে উত্তর করিল সর্ব্বদা সুস্থশরীরে ছিলাম। রাবেয়া বলিলেন, 'এতাধিককাল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে না, একদিন যেই অসুস্থ হইয়াছ, অমনি গ্লানির চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছ!'

একজন যোগী একবার রাবেয়ার নিকটে সংসারের গ্লানি সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন। রাবেয়া বলিলেন, তুমি অত্যন্ত সংসারপ্রেমিক, যদি তাহা না হইতে, তবে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া সংসারের প্রসঙ্গ করিতে না। সংসার-বিরাগী সংসারের ভালমন্দ লইয়া আলোচনা করে না, সংসারকে স্মরণ

করে না। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার প্রসঙ্গ অধিক করিয়া থাকে।”

রাবেয়া অনুক্ষণ আর্ত্তনাদ করিতেন। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিত, আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছে, এরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছেন কেন? তিনি উত্তর করিতেন, ‘হাঁ আমার পীড়া হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের অভ্যন্তরের পীড়া। সংসারের কোন চিকিৎসক সে পীড়ার ঔষধ জানে না। আমার রোগের ঔষধ কেবল একমাত্র তাঁহার দর্শন।’

রাবেয়া তাঁহার পীড়ার ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জীবনের শেষভাগ দিবারাত্রি ঈশ্বরানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। কি কুটীরবাসী, কি প্রাসাদবাসী সকলেই তাঁহার মত ঈশ্বরপরায়ণার সঙ্গলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মজীবনের পবিত্র স্মৃতি এখনও মুসলমান ধর্ম্মাত্মাগণের হৃদয়ের শ্রদ্ধামন্দিরে আনন্দদায়িনী রূপে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীশ্রীসারদা-মন্দির প্রতিষ্ঠা ও জন্মতিথি পূজা।

পরমশুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু—

আগামী ৬ই পৌষ ইং ২১শে ডিসেম্বর, বুধবার, পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর একোনসপ্ততিতম জন্মতিথি। বেলুড়মঠে এবং কলিকাতার বাগবাজার পল্লীস্থ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে (১নং মুখার্জ্জি লেন) তদুপলক্ষে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে। ভক্তগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ভূমিতে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্যও ঐ দিবস সম্পাদিত হইবে। পুরুষ ভক্তগণ বেলুড়মঠে এবং স্ত্রী ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক ঐ দিবস ৺দেবীর পুণ্য দর্শন ও প্রসাদলাভে ধন্য হইবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীব্রহ্মানন্দ।

বেদান্ত চর্চ্চা।

(শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী।)

(প্রতিবাদ)

গত আশ্বিন মাসের উদ্বোধনে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, মহাশয় লিখিত "বেদান্ত চর্চ্চা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে লেখকের অল্পমাত্রও মনোগত ভাব বুঝিতে না পারায় এই প্রতিবাদরূপ "বাদ" অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা জিজ্ঞাসু; সুতরাং কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি অস্মদাদির পক্ষে স্বাভাবিক।

তিনি লিখিয়াছেন—"যিনি যাহাই বলুন না কেন অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করাই যে মানব জীবনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না।" অবশ্য লেখক যদি সুখ লাভকে মানব জীবনের "মুখ্যতম" উদ্দেশ্য এবং উহাকে "ধীরভাবে বিবেচনার ফল" না বলিতেন, তাহা হইলে আমাদের কোনই আপত্তি ছিল না; কিন্তু ঐরূপ বলায় আমাদের বিশেষ আপত্তি এই যে, সুখ লাভই যদি মানব জীবনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হইবে, তাহা হইলে শ্রুতি ঐ মুখ্যতম উদ্দেশ্যকে "নেতি নেতি" বলিয়া বুঝাইয়াছেন কেন? যাহা "বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যদ্" যেখানে শ্রুতি "কেন কং বিজানীয়াৎ" বলিয়াছেন, সেখানে সুখের উপলব্ধি হইবে কি প্রকারে? উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান থাকিতে যে কেবল সুখেরই উপলব্ধি হইবে—দুঃখের নহে—এ কথাই বা কি করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? মুক্তিকামী পুরুষ মুক্তির কামনায় মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে বলিয়া কি মোক্ষকে কামনারহিত বলা হইবে না? আর লেখকও যখন উক্ত প্রবন্ধে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের "নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে যাইয়া নিজেকেই হারাইয়া ফেলিল, সমুদ্রের খবর আর দিবে কে" বাক্য প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া

তদবস্থায় উপলব্ধির অভাব স্বীকার করিয়াছেন, তখন কি প্রকারেই বা ঐ সুখ তাঁহার উপলব্ধ হইল এবং উহাকে "ধীরভাবে বিবেচনার ফল" বলিয়া স্থির করিলেন? মিষ্টান্ন প্রিয় পীড়িত অবোধ শিশুকে সুস্থ করিবার জন্য পিতা মাতা যেমন ঔষধ খাওয়াইতে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন, শ্রুতিও কি তদ্রূপ সুখের দাস অজ্ঞান জীবকে মাত্র তাহার স্বরূপের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্যই ঐ সুখের প্রলোভন দেখান নাই—যাহা পরমার্থতঃ সুখস্বরূপ নহে? এখন উহাকেই যদি সুখ বলিয়া মনে করা হয়, তবে তাহা কি "ধীরভাবে বিবেচনার ফল"—না মনোরথ মাত্র? মরু মরীচিকায় সলিল বোধ হইলে কি তদ্দ্বারা যথার্থ সলিলের কাজ হয়—না তাহা যথার্থ সলিল? *

তিনি লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান যে পদ্ধতিতে বেদান্ত আলোচিত হইতেছে তাহা প্রকৃতই ভয়াবহ।" তবে কি অমৃত পানে অনধিকারী বলিয়া বিষ পান করিতে দিলেই ভয় দূর হইবে? প্রকৃত রহস্য ঠিক বুঝিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া কি নিজেকে অনাধিকারী জ্ঞানে উহা হইতে বিরত হইলেই অভয়ত্ব লাভ হইবে? লেখকেরই উক্ত প্রবন্ধ মধ্যে লিখিত "ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী গল্প দেখিতে পাই—কয়েকজন শ্রোত্রিয় গৃহস্থ ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া একস্থানে মিলিত হন। কিন্তু বহু আলোচনায়ও প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহারা এক ব্রহ্মজ্ঞের শরণাপন্ন হন এবং ঐ তথ্য উপলব্ধি করিবার জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেন। অবশেষে এক ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজার কৃপায় তাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন" এই শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্য হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ শ্রোত্রিয় গৃহস্থদের বহু আলোচনা কি ভয়াবহ হইয়াছিল—যাহার ফলে

* সাধারণ মানবের আদর্শ যাহাই হউক কিন্তু তাহার প্রতি প্রাণস্পন্দের উদ্দেশ্য সুখ লাভ, কারণ দুঃখকামী হইয়া কেহই কখন কোনও কর্ম্ম করে না। বেদান্ত চর্চ্চার লেখক 'সুখ' অর্থে ইন্দ্রিয়জ সুখ বুঝেন নাই। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য"—শ্রুতির এই অর্থে তিনি 'সুখ' শব্দের অর্থ বুঝিয়াছেন। অতএব তাঁহার ঐরূপ লেখায় দোষ হয় না।—উঃ, সঃ।

তাহারা প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া অবশেষে প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন? এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই কি ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যাঁহারা অনধিকারী অবস্থায় শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে উপযুক্ত গুরুর নিকটে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতকৃত্য হইতেছেন? সুতরাং লেখক উহাকে যতটুকু ভয়াবহ মনে করেন, উহা কি বাস্তবিকই ততটুক্ ভয়াবহ? লেখক ঐ স্থানে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের "সুরসাল আম্রকাননের শাখা পত্র গণনা করিতেই আমাদের শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষিত হইবে, আম্ররসাস্বাদন কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না" বাক্যটী প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া লেখকের যুক্তি তাঁহাতে যতটুকু ভয়ের আরোপ করিয়াছেন তিনি কি উহাতে ততটুকু ভীত হইয়াছিলেন—যিনি তাঁহার শিষ্য মুখে "আপনি নোরু নোরু (বিবেকানন্দ) করে অস্থির হন, দেখুনগে—নোরু আজ আবার ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একটা মহা হৈ চৈ কচ্ছে", শুনে "করবে বৈ কি! যতদিন ভ্রমরাটা ফুলের মধুর আস্বাদ না পায় ততদিনই সে বোঁ বোঁ করে ছুটে ছুটে বেড়ায়; কিন্তু যেই সে মধুর আস্বাদ পায় অমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে পড়ে" এই উত্তর দিয়াছিলেন। আর লেখকও তাঁহার "বর্ত্তমানে বেদান্ত আলোচনার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে" এবং "প্রবন্ধে বক্তৃতায় ঐ একই ধারা" বাক্যে যতটুকু ভয়ের কারণ দেখাইয়াছেন, তাঁহার উক্ত প্রবন্ধেই লিখিত "বস্তুতঃ বিচার লব্ধ জ্ঞান যদি একটা নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ প্রদান করিতে সমর্থ না হয় তবে উহা যতই যুক্তি তর্ক সম্মত হউক না, প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে পারে না। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি সূর্য্যোদয় বা আপ্ত বাক্য দ্বারা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেও যেমন তাহার একটা মানসিক অশান্তি থাকিয়াই যায় উহাও তদ্রূপ" এই অংশের মধ্যে "প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে পারে না" এবং "স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেও" বাক্য দুটী দেখিয়া তাঁহার লেখার ভাবে যতটুকু ভয়ের কারণ অনুদিত হয়, ততটুকু ভয়ের কারণ কি তাঁহার মনোমধ্যে

স্থান পাইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে? লেখক উহাকে "প্রকৃত কার্য্যকরী" বলিয়া না বুঝুন "কার্য্যকরী" বলিয়া কি বুঝেন নাই? আবার লেখক "সাধন সম্পন্ন না হইলে তিনি কিছুতেই বেদান্তের সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না! তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারেন কিন্তু তত্ত্বদর্শী হইতে পারিবেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর একটা লক্ষণ এই যে তিনি বিষয়টী অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, পক্ষান্তরে তত্ত্বদর্শী বাগ্‌বিন্যাসে পটু নহেন" ইহা অপরিহার্য্য বলিয়া বুঝা সত্ত্বেও, সেই অপরিহার্য্যার্থে এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? অতত্ত্বজ্ঞ অপেক্ষা কি তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ নহেন? তত্ত্বজ্ঞানী কি শেষে পূর্ব্বকথিত শ্রোত্রিয় গৃহস্থদের ন্যায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিলেও তত্ত্বদর্শী হইতে পারিবেন না? "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" কথাটী কি ঠিক নয়? নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে শেষে ব্রহ্মসংস্থ না হইলেও, শাস্ত্র উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীকে মাত্র বিদ্যা শিক্ষার্থ কেন দ্বাদশ বৎসর গুরু গৃহে বেদাধ্যায়ন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন?

তিনি লিখিয়াছেন—"আজকাল এমন অনেক বেদান্ত বিশারদ দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে একান্ত অপরিচিত, এবং উপনিষদের নাম মাত্র হয়ত শ্রবণ করিয়াছেন, অথচ বর্ত্তমান যুগের তাঁহারাই বেদান্তের আচার্য্য। জীবনে যাঁহারা বেদান্তের একটী তথ্যও উপলব্ধি করেন নাই তাঁহারাই আজ খট্টারূঢ় হইয়া বাহ্বাস্ফোট করিতেছেন।" যদি সংস্কৃত ভাষা ও উপনিষদের সহিত সুপরিচিত হইতে পারিলেই বেদান্তের তথ্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে, তাহা হইলে শ্রুতি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া" বলিয়াছেন কেন? সংস্কৃত ভাষার সহিত যাঁহার মাতৃভাষার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, সেই সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ভগবান্ যিশু কি করিয়া বেদান্তের চরম সত্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" উপলব্ধি করিয়া "I and my father are one" বলিয়াছিলেন?—কোন্ উপনিষদের চরম সত্য উপলব্ধির ফলে তিনি "for if ye belive not that I am he, ye shall die in your sins" বলিয়াছিলেন? কি করিয়া নিরক্ষর ভগবান্

রামকৃষ্ণদেব বেদান্তের মহোচ্চ সত্যগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং আচার্য্যরূপে স্বীয় সঞ্চারিত শক্তি দ্বারা বিবেকানন্দের মত 'বেদান্ত' কেশরীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ব্যাকরণাদি সংস্কৃত ভাষা ও উপনিষদাদি যাবতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে বিশারদ হইয়াও নারদ কেন বেদান্ত সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শেষে ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন? কেন সত্যকাম ও উপকোশল উপনিষদাদি শাস্ত্রের সহিত একান্ত অপরিচিত থাকিয়াও স্বয়ংই তত্ত্বদর্শন করিয়াছিলেন? আর উপনিষদাদি শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান থাকিলেও যে তত্ত্বদর্শন করিতে পারা যায় না, তাহা কি লেখক তাঁহার "একটী সমস্যা' উপস্থিত হইলে এ বিষয়ে অমুক ভাষ্যকার কি বলেন, অমুক টীকাকার কি বলেন, অমুক বৃত্তিকার কি বলেন ইত্যাদি নিরূপণ করিতে পারিলেই যেন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল" এই বাক্য স্বীকার করেন নাই? আবার শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও যে দরকার, লেখকের "নারদ পঞ্চরাত্র নামক পুরাণে কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার একটী অতি সুন্দর উপায় বর্ণিত আছে। সন্দিগ্ধ বিষয়টী গুরুর অনুমোদিত, স্বীয় অনুভবের গোচরীভূত এবং শাস্ত্র বাক্য সম্মত হইলে উহা সত্য, অন্যথা নহে" এই বাক্য কি তাহার প্রমাণ নহে? তবে কি শাস্ত্রের ঐ বহু আলোচনাকে দোষাবহ মনে করা যাইতে পারে?

লেখক কি তাঁহার "বেদান্ত চর্চ্চা" শীর্ষক প্রবন্ধে বেদান্ত চর্চ্চার ফল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলিয়া স্থির করিয়াছেন? তা যদি হয়, তবে শ্রুতি গুরুর বিশেষণে "শ্রোত্রিয়ম" ও "ব্রহ্মনিষ্ঠম্" এই দুইটী শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন কেন? লেখক সাধন সম্পন্ন হইবার জন্য যে শঙ্করের দোহাই দিয়াছেন, সেই শঙ্করই বা কেন তাঁহার বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে "এতয়োর্ম্মন্দতা যত্র বিরক্তত্ব মুমুক্ষয়োঃ। মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভাণ মাত্রতা" বলিয়াছেন? যদি প্রকৃতির নিকট ক্রমাগত প্রতারিত হওয়ার ফলে "ন জাতুঃ কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" বুঝিতে পারায় স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হয়, তবে উক্ত বৈরাগ্যের প্রাবল্যে

অর্থাৎ "পরবৈরাগ্য" কালে ঐহিক ও পারলৌকিক সমুদয় বিষয়েই সম্পূর্ণ রূপে নিঃস্পৃহ হওয়ায় কি স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না? শ্রুতিও কি সেই জন্যই "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ" বলেন নাই? আর লেখকও কি সাধন চতুষ্টয় বুঝাইতে যাইয়া "নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক" হইতে আরম্ভ করিয়া "মুমুক্ষা"র শেষ পর্য্যন্ত উক্ত সাধন গুলিকে স্বতঃই লাভ হওয়ার কথা বলেন নাই? এখন স্বতঃপ্রাপ্ত বৈরাগ্যের পরাবস্থায় যদি স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় এবং শত বেদান্তাধ্যয়নেও তাহা না হয়, তবে বেদান্ত চর্চ্চার ফল কি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার? অথবা বেদান্ত চর্চ্চা করিতে করিতে ক্রমে সংসারের অনিত্যতা অনুভূত হইয়া আসিলে বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে বলিয়া বেদান্ত চর্চ্চার ফল—বৈরাগ্য লাভ?

লেখক "বর্ত্তমান প্রবন্ধে, বক্তৃতায় সর্ব্বত্রই বেদান্তের ধারা" দেখিয়া "বেদান্ত একটা নেহাৎ ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়াইবে" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন! বেদান্ত যদি ছেলেদের ছেলেখেলা হইতে অতি বৃদ্ধের শেষ জীবনের চিন্তায় কার্য্যকরী না হইয়া জন কতক অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর জীবনেই কার্য্যকরী হয়, তবে সেই প্রাচীন যুগে রাজ্ঞী মদালসা তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুকে "ত্বমসি নিরঞ্জনম্" বলিয়া দোল দিতেন কেন? কার্য্যবহুল রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কেন শ্রীরামচন্দ্রকে ঐ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন? কোলাহল পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে ঐ তত্ত্ব জানাইয়াছিলেন কেন? রাজ কার্য্যের শত ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও কেন রাজর্ষি জনকের রাজ প্রাসাদে মধ্যে মধ্যে ঐ তত্ত্বের আলোচনা হইত? কেন সেই অতীতের যুগে জীবনের চরম দশায় উহা সকলেরই আলোচ্য বিষয় ছিল? বেদান্ত যদি জন কতকের নির্জ্জন অরণ্যবাসেরই ফল হয়, তবে উহাকে কি সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে?

এখন লেখকের এই সব ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধ বাক্য সমূহ হইতে তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া লওয়া কি অস্মদাদির ন্যায় জিজ্ঞাসুর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নহে। সুতরাং এই প্রতিবাদরূপ "বাদ" অবলম্বন কি স্বাভাবিক নয়?

জীবন্মুক্তি-বিবেক

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অপকারীর উপরেই যদি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় তবে (স্বয়ং) ক্রোধের উপরেই তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না কেন? ক্রোধ ত (তোমার) "ধর্ম্ম, অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধন বিষয়ে প্রধান বিঘ্ন ঘটাইয়া (তোমার অপকার করে।)

ফলান্বিতো ধর্ম্ম যশোঽর্থনাশনঃ।
সচেদপার্থঃ স্বশরীর তাপনঃ॥
ন চেহ নামুত্র হিতায় যঃ সতাং
মনাংসি কোপঃ সমুপাশ্রয়েৎ কথম্॥

ক্রোধ সফল হইলেও, (অর্থাৎ অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিলেও) ক্রুদ্ধব্যক্তির, ধর্ম্ম যশ এবং অর্থের বিনাশ করিয়া থাকে। ক্রোধ নিস্ফল হইলে, (অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে না পারিলে) কেবল ক্রুদ্ধব্যক্তির শরীরকেই সন্তাপ দিয়া থাকে। যে ক্রোধ ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্থানেই হিতকর নহে, সেই ক্রোধ কেন সাধুদিগের মনকে আশ্রয় করিতে পায়?

নিজের প্রতি অপরের ক্রোধ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

ন মেপরাধঃ কিমকারণে নৃণাং, মদভ্যসূয়েত্যপি নৈব চিন্তয়েৎ।
ন যৎ কৃতা প্রাগ্ভব বন্ধ নিঃসৃতি, স্ততোঽপরাধঃ পরমো নু চিন্ত্যতাম্॥

"আমি ত কোনও অপরাধ করি নাই, অকারণে লোকের আমার প্রতি অসূয়া (অপরের গুণে দোষাবিষ্করণ এস্থলে ক্রোধ) কেন হয়?" এইরূপ চিন্তাকেও কখন মনে স্থান দিতে নাই। তুমি যে পূর্ব্বে জন্ম-মৃত্যুর "বন্ধন হইতে আপনার, উদ্ধারসাধন কর নাই, এই হেতুই তোমার বিষম অপরাধ হইয়াছে" ইহাই চিন্তা কর। *

---

* শরীর ধারণ করিলেই কাহারও না কাহারও কোপে পড়া অনিবার্য্য।

নমোঽস্তু কোপদেবায় স্বাশ্রয়জ্বালিনে ভৃশম্
কোপ্যস্ত মম বৈরাগ্যদায়িনে দোষবোধিনে॥

ইতি—যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২১

যে কোপদেব নিজের আশ্রয়দাতাকে প্রবলভাবে দগ্ধ করেন এবং আমি কাহারও কোপার্হ (কোপের পাত্র) হইলে, আমাকে (স্বকীয়) দোষ বুঝাইয়া দিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করেন, সেই কোপদেবতাকে প্রণাম।

ধনাভিলাষ ও ক্রোধকে যেরূপ বিবেক দ্বারা অপনীত করিতে হয় স্ত্রীপুত্রাভিলাষকেও সেইরূপ বিবেক দ্বারা বিদূরিত করিতে হয়; তন্মধ্যে বশিষ্ঠ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বিচার এইরূপে দেখাইয়াছেন :—(বৈরাগ্যপ্রকরণ ২১ অঃ)

মাংসপাঞ্চালি কায়াস্তু যন্ত্রলোহঙ্গপঞ্জরে
স্নায়স্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্॥১।

শিরাকঙ্কাল গ্রন্থিশালিনী মাংসপুত্তলী রমণীর (শকটাদি) যন্ত্রবৎ চঞ্চল অঙ্গসমষ্টিরূপ শরীরে প্রকৃতপক্ষে শোভার বস্তু কি আছে?

ত্বঙ্মাংস রক্ত বাষ্পাম্বু পৃথক্‌কৃত্বা বিলোচনে
সমালোকয় রম্যঞ্চেৎ কিং মুধা পারিমুহ্যসি।২॥

রমণীর লোচনদ্বয় ত্বক্, মাংস, রক্ত, ও অশ্রুজল বিশ্লেষ করিয়া দেখ, তাহা মনোরম কি না। তবে কেন বৃথা মুগ্ধ হও।

মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসি গঙ্গাজল রয়োপমা
দৃষ্টা যস্মিন্‌স্তনে মুক্তাহার সোল্লাসশালিতা।৫।
শ্মশানেষু দিগন্তেষু স এব ললনা স্তনঃ
শ্বভিবাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ড ইবান্ধসঃ॥৬।

যে রমণী পয়োধরে সুমেরু-শিখরভূমি সঞ্চারিণী মন্দাকিনী জলধারার ন্যায় মুক্তাহারের অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হইয়া থাকে, কালে সারমেয়গণ তাহাই (পল্লীসমূহের) প্রান্তভাগে অবস্থিত শ্মশানে, ক্ষুদ্র অন্নপিণ্ডের ন্যায় রুচিপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া থাকে।

কেশকজ্জল ধারিণ্যো দুঃস্পর্শা লোচন প্রিয়াঃ
দুষ্কৃতাগ্নিশিখা নার্য্যো দহন্তি তৃণবন্নরান্।১১।

নারীগণ দুষ্কৃতিরূপ বহ্নির শিখা স্বরূপ। বহ্নি যেমন শিরোদেশে কজ্জল ধারণ করে ইহারাও সেইরূপ শিরোদেশে কেশ ধারণ করে। ইহারাও বহ্নির ন্যায় দুঃস্পর্শা ও লোচনপ্রিয়া, আর দেখ বহ্নি যেমন তৃণকে, ইহারাও তদ্রূপ পুরুষদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

জ্বলতামতিদূরেঽপি সরসা অপি নীরসাঃ
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনং চারু দারুণম্ ॥১২॥

দূরে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির ইন্ধনভূত দীর্ঘ কাষ্ঠ যেরূপ নিকটপ্রান্তে (অগ্নিসংসক্তি প্রান্তে) রসক্ষরণ হেতু সরস দেখায়, কিন্তু দূর প্রান্তে (অগ্নিসংসক্ত প্রান্তে) একেবারে নীরস, দূরবর্ত্তী নরকাগ্নির ইন্ধনরূপিনী নারীও সেইরূপ সম্মুখে (আপাততঃ) মনোরম এবং অন্তে (পরিণামে) দারুণ (অর্থাৎ সংসার দুর্দ্দশার কারণ)। *

কামনাম্না কিরাতেন বিকীর্ণা মুগ্ধচেতসাম্
নার্য্যো নরবিহঙ্গানামঙ্গ বন্ধন বাগুরাঃ ।১৮॥

মদন নামক কিরাত রমণীদিগকে মূঢ়বুদ্ধি পুরুষ-বিহঙ্গের অঙ্গবন্ধন বাগুরা[illegible] বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

জন্মপল্বল মৎস্যানাং চিত্তকর্দ্দমচারিণাম্।
পুংসাং দুর্ব্বাসনারজ্জুর্নারী বড়িশ পিণ্ডিকা ।২০॥

পুরুষগণ সংসারপল্বলের মৎস্য, চিত্তরূপ কর্দ্দম তাহাদের বিহারক্ষেত্র, দুষ্ট বাসনা সেই মৎস্য ধরিবার বড়িশ সূত্র, এবং রমণীগণ সেই বড়িশলগ্ন পিণ্ড (মাংস বা অন্নের টোপ)।

সর্ব্বেষাং দোষরত্নানাং সুসমুদ্গিকয়ানয়া
দুঃখশৃঙ্খলয়া নিত্যমলমস্তু মম স্ত্রিয়া ।২৩।

রমণী সর্ব্ববিধ দোষরত্ননিচয়ের উৎকৃষ্ট সমুদ্গিকা (কৌটা) এবং দুঃখপালের বন্ধন শৃঙ্খল। এ হেন রমণীতে আমার প্রয়োজন নাই।

* রামায়ণের টীকাকার ইন্ধনে সরসতার সম্ভাবনা কোনও প্রকারে ঘটাইতে না পারিয়া, বলিয়াছেন "লোচনপ্রিয়" অগ্নিরূপ কার্য্য দেখিয়া ইন্ধনকে সরস এবং দহনরূপ কারণের (ফলের বা পরিণামের) নীরসতা দেখিয়া তাহাকে নীরস বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়।

ইতোমাংসমিতোরক্তমিতোঽস্থীনিতি বাসরৈঃ
ব্রহ্মন্ কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রী বিশরারুতাম্ ॥ ২৫ । *

হে ব্রাহ্মন্ (বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া রামের উক্তি) কামিনী কতিপয় দিবসের মধ্যেই এখানে মাংস, ঐখানে রক্ত, স্থানান্তরে অস্থি এইরূপ বিশীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক ভোগভূঃ
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগত্ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।৩৫।

যাহার স্ত্রী আছে, তাহারই ভোগ কামনা আছে, স্ত্রীবিহীন ব্যক্তির ভোগের স্থান কোথায়? রমণী পরিত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়, এবং জগৎ পরিত্যাগ করিলেই সুখী হওয়া যায়।

পুত্র সম্বন্ধে বিচার, ব্রহ্মানন্দ † গ্রন্থে (পঞ্চদশী ১২।৬৫) এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে:—

অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্।
লব্ধোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥৬৫

পিতামাতা পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইবার পর যদি দীর্ঘকাল পর্যন্ত, পুত্র না জন্মিলেন তবে তিনি (না জন্মিয়াই) পিতামাতাকে ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। আর যদি গর্ভে তাঁহাকে পাওয়া গেল, তবে গর্ভপাত ঘটাইয়া অথবা প্রসববেদনা দিয়া তিনি পীড়া দেন।

জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মূর্খতা,
উপনীতেপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে ॥ ৬৬

যদি জন্মিলেন তবে শৈশবে পেঁচোয় পাওয়া প্রভৃতি রোগের ভয়, কৌমারে বুদ্ধিহীন হইবার ভয়, উপনয়ন হইবার পর গুরুগৃহে অবস্থানকালে বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী হইবার ভয়, বিদ্যালাভ হইবার পর পণ্ডিত হইলে (উপযুক্ত) পত্নী না যুটিবার ভয়।

* এস্থলে মূলের "বিশরারুতাং" (বিশীর্ণতাম্) এই পাঠানুসারেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ২য় সংস্করণের "বিষচারুতাম্" পাঠ দুষ্ট।

† পঞ্চদশী গ্রন্থের শেষ ৫ অধ্যায় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল এবং ব্রহ্মানন্দ বলিয়া বিরচিত ছিল। উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

যুনশ্চ পরদারাদিঃ দারিদ্র্যং চ কুটুম্বিনঃ।
পিত্রোর্দুঃখস্যান্তো ধনী চেন্ম্রিয়তে তদা॥

যৌবনে পরদারাসক্ত হইবার ভয়, এবং স্ত্রীপুত্রাদিপরিবার বেষ্টিত হইলে দারিদ্র্য অর্থাৎ তাহাদিগকে পালনে অসমর্থ হইবার ভয়; আবার যদি ধনী হইলেন তবে মরিয়া যাইবার ভয়, অতএব পিতামাতার দুঃখের অন্ত নাই।

বিদ্যা, ধন, ক্রোধ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি বিষয়ক মলিন বাসনার যেরূপ বিবেক (বিচার) দ্বারা প্রতীকার করিতে হয়, সেইরূপ অন্যান্য মলিন বাসনারও, যথোপযুক্ত শাস্ত্রের সাহায্যে ও নিজের শক্তি দ্বারা তাহাদের দোষ বিচার করিয়া, প্রতীকার করিতে হইবে। এইরূপ প্রতীকার করিলেই জীবন্মুক্তিরূপ পরমপদ লাভ করা যায়। বশিষ্ঠদেব সেই কথাই বলিয়াছেন যথা:—

বাসনা সম্পরিত্যাগে যদি যত্নং করোষ্যলম্।
তান্তে শিথিলতাং যান্তি সর্ব্বাধিব্যাধয়ঃক্ষণাৎ॥

(উপশম প্রকরণ ৯২।৯)

বাসনাসমূহকে সম্যকপ্রকারে পরিত্যাগ করিতে যদি তুমি যথোপযুক্ত যত্ন কর, তাহা হইলে, তোমার শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার ক্লেশই মুহূর্ত্তমধ্যে শিথিল হইয়া যায়।

পৌরুষেণ প্রযত্নেন বলাৎ সন্ত্যজ্য বাসনাঃ
স্থিতিং বধ্নাসি চেত্তর্হি পদমাসাদয়স্যলম্॥

(উপশম প্রকরণ ৯২।৩-৪) †

পুরুষকার নামক প্রযত্নের দ্বারা বলপূর্ব্বক বাসনাসমূহ পরিত্যাগ

* মূলের পাঠ ২য় চরণে "করোষি"; ৩য় চরণে "তত্তে"। রামায়ণের টীকাকার বলেন উক্ত টীকার দ্বারা এবং 'মনোনাশে' এবং 'তৎ' শব্দ দ্বারা "তাহা হইলে" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

† এই শ্লোকটি উক্ত অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের শেষ দুই চরণ ও ৪র্থ শ্লোকের প্রথম ও চতুর্থ চরণ লইয়া গঠিত হইয়াছে। তবে মূলের পাঠ "বাসনাঃ" স্থলে 'বাসনাম্', "চেত্তর্হি" স্থলে "তত্ত্বজ্ঞ"॥

করিয়া যদি স্থৈর্য্যলাভ করিতে পার, * তবেই তুমি সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলে।

এস্থলে 'পুরুষকার নামক প্রযত্ন' এই শব্দগুলির দ্বারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত বিষয় দোষ বিচারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এই প্রযত্নের প্রয়োগ করিলেও, ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহের প্রবল বেগ দ্বারা ইহা অভিভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন :—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥—(গীতা ২।৬০)

হে কৌন্তেয়, যেহেতু, বিবেকশীল পুরুষ প্রযত্ন করিতে থাকিলেও (অর্থাৎ তত্ত্বের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিচারপ্রবণ মনে অবস্থান করিলেও) বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয় সমূহ তাঁহার মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু ইত্যাদি (৬১ শ্লোক)।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতিপ্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি॥—(গীতা ২।৬৭)।

[অযোগযুক্ত ব্যক্তির কেন জ্ঞান হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যে মন, স্ববিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তাহা সেই অযোগ-যুক্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করিয়া থাকে; বায়ু যেরূপ জলমধ্যস্থিত নৌকাকে গন্তব্য পথ হইতে বিতাড়িত করিয়া অন্য পথে প্রবর্ত্তিত করে সেইরূপ। তাহা হইলে এই কারণে বিবেক উৎপন্ন হইবার পর তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সমূহের নিরোধ করিতে হইবে; তাহাই তৎপরবর্ত্তী দুই শ্লোক দ্বারা বুঝাইতেছেন :—

তানি সর্ব্বানি সংযম্যযুক্ত আসীতমৎপরঃ
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।—(গীতা ২।৬।৬১)

(সেই হেতু) সেই ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া সাধক সমাহিত হইয়া অবস্থান করিবেন এবং আমি বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি এইরূপ

* মূলের পাঠানুসারে টীকাকারের ব্যাখ্যা—'তৎপদার্থের শোধন দ্বারা তাহার চরমাবস্থায় যে অখণ্ডৈকরস অবশিষ্ট থাকে তাহার সহিত শোধিত "ত্বম্" পদার্থের একতা সম্পাদন পূর্ব্বক চিত্তের নিশ্চলতা ঘটাইতে পার।

ধ্যান করিতে থাকিবেন। এইরূপে অভ্যাস দ্বারা যে যতির ইন্দ্রিয় সমূহ বশে আসিয়াছে, তাঁহারই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮।

সেইহেতু হে মহাবাহো! যিনি শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিতে পারিয়াছেন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—[ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞত্ববিষয়ক সাধনের উপসংহার]।

অন্য স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো যতিঃ।

ন চ বাকচপলশ্চৈবমিতি শিষ্টস্য লক্ষণম্॥

যাহার হস্তপদ চঞ্চল তিনি যতি নহেন, যাহার দৃষ্টি চঞ্চল তিনিও যতি নহেন, যিনি বাক্যপ্রয়োগে অসংযত তিনিও যতি নহেন। এইরূপে (অর্থাৎ হস্তপদাদির স্থৈর্য্য এবং বাকসংযম দেখিয়া) শিষ্ট ব্যক্তিকে চিনিতে হয়।

এই কথাই স্থানান্তরে * স্বল্পকথায় বিবরণ সহ স্পষ্ট করিয়া বুঝান হইয়াছে,—

অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।

মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড়্‌ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ॥

যে ভিক্ষু জিহ্বাশূন্য, পুরুষত্ববিহীন, পঙ্গু, অন্ধ, বধির এবং বুদ্ধিহীন, তিনিই এই ছয়টি গুণের দ্বারাই মুক্ত হয়েন; তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতে

হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে॥

---

* এই কয়েকটি শ্লোক গ্রন্থকার মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত পরাশর সংহিতার আচার কাণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ে (বোম্বাই সংস্করণের ১৮৫ পৃষ্ঠায়) মেধাতিথি বিরচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই মেধাতিথি মনুসংহিতার টীকাকার কি না তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উক্ত টীকাকারের কোনও পদ্যময় গ্রন্থের উল্লেখ এযাবৎ কোথাও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু এই শ্লোকগুলি নারদ পরিব্রাজকোপনিষদে (৩।৬২-৬৮) দৃষ্ট হয়।

যিনি ভোজন করিয়াও—'এই বস্তু আমার অভিলষিত, ইহা আমার অভিলষিত নহে' এইরূপে কোনও ভোজ্য বস্তুতে আসক্ত (বা তাহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত) হয়েন না, এবং যিনি হিতবাদী, সত্যবাদী ও মিতভাষী তাঁহাকেই জিহ্বাশূন্য কহে।

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ).

ভগবানে দৃঢ় ভক্তি চাই! সংসারে ত সুখ-দুঃখ আছেই—ঐ দিক না ভুললেই সব দিক মঙ্গল।

কলিতে অন্নগত প্রাণ—খাওয়া পরা চাই। মন কিন্তু ভগবানের দিকে দেবে—এ কথা পরমহংস দেব বলতেন।

বিবেকানন্দ-ভাইকে নিয়ে এত কাণ্ড ও উন্নতি, তিনি বলেছিলেন—'ঠাকুরছাড়া উপায় নাই—তাঁর জীবন দেখে এত উন্নতি।'

শরীর নিয়ে সকলের সাথে সম্বন্ধ! শরীর সুস্থ থাকলে সব ভাল লাগে।

সংসারে একটা-না-একটা বখেড়া লেগেই আছে; ভগবানের কৃপায় ভালয় ভালয় মিটে গেলেই ভাল।

গুরু-স্তোত্র রোজ পাঠ করা খুব ভাল।

ভগবান ভিন্ন কোন উপায় নাই। তাঁর শরণাগত হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে?

সংসার করলে নানা ঝঞ্ঝাট বইতে হয়॥

রামলীলা বুঝা বড়ই কঠিন! ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্ত-শুদ্ধ না হ'লে বুঝা যায় না।

উদ্ধব-সংবাদ খুব ভাল। শ্রীভাগবতে যেখানে বৈরাগ্যের কথা আছে, সেই সব যারা পড়বে, তাদের কল্যাণ হবে।

সকল সময় ত ধ্যান, জপ করা যায় না—ঐ সব সৎ পুস্তক পড়া খুব ভাল।

যখন জন্ম হ'য়েছে, তখন সুখ-দুঃখ আছেই। তবে ওরই মধ্যে যতটা হয়:—ভগবানের নাম নেওয়া ভাল।

সংসারের কায-কর্ম্ম দেখা আর পড়া-শুনা—এক সঙ্গে হয় না।

লাল কাপড় পরা, একটা ঢেউ উঠেছে; কিন্তু কর্ম্ম নাই। *

কাশীতে লাল কাপড় পড়া কত—(কিন্তু) কর্ম্ম নাই।

কলিতে এরূপ ব্যায়ারাম (রোগ) হবে—পুরাণে আছে। +

বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলেই তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) হুকুম মান্‌লেন,—আর বল্‌লেন, 'এই দেখেও যদি বিশ্বাস না হয়, তার নাম কর্ম্মফল।'

দেহ-মনের সুখ দুঃখ ত আছেই—তবুও জীব তাঁকে দুঃখ জানায় না।

জীব ভগবানকে শুধু ভালবাসা বশতঃই ডাক্‌বে—এরূপ খুবই বিরল—সন্দেহ নাই।

দুঃখ জানাতে শুনেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর ধন জনের কিছুরই অভাব ছিল না, বাকী কি যে অভাব বোধ কর্‌তেন—তা আমরা কি বুঝ্‌ব!

তাঁর আদেশ পালন করেছিলেন—শ্রীকেশব সেন। বিজয় গোস্বামী, আর উপস্থিত কর্‌ছেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

তাঁকে দুঃখ জানাবে বৈ কি! সংসারত তিনিই লাগিয়েছেন। তাঁর সংসারের জন্য খাট্‌ছ—এইরূপ মনে কর্‌বে। তাঁকে দুঃখ জানাতে দোষ কি!

সংসারে ত অভাব ঘুচ্‌বে না—বেড়েই যাবে; ওর জন্য ভেবে লাভ কি!

"শ্রীশ্রীরামচন্দ্র বলি দেন নাই। তাঁর হুকুম শুন্‌লে কল্যাণ হবেই হবে। * * * পূজার সময় হাত জোড় ক'রে শ্রীরামচন্দ্র প্রভুকে, মা দুর্গাকে দুঃখ জানাবে; মা'ত সব জানেন। বলির কথা নিষেধ

* সাধন ভজন, ত্যাগ-তপস্যাদি আধ্যাত্মিক কর্ম্ম—নাই।

\+ ব্যায়ারাম (রোগ) শব্দটি অদ্ভুতানন্দজী ব্যবহার করিতেন

করবে; শুনে ভাল, না শুনে তুমি কি করবে। আপনার দুঃখ আপনি আনবে—তোমার কি! বলির সময় ওখানে না থাকলেই হ'ল—বলিতে কষ্ট হবার কথা। তিনি বুঝিয়ে দেন ত আনন্দের সহিত আপনিই বন্ধ ক'রে দেবে। মা দুর্গার কাছে জানাবে—'মা, আমিত নিষেধ করলাম, না-শুনলে আমি কি করব।' *

বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীতে এসে বুঝে গেছ ত—সংসারে কোন সুখ নাই, কেবল অশান্তি। খবরদার, বিশ্বনাথকে ভুল না; বাবা বিশ্বনাথ দুঃখ বোঝেন। *

ধর্ম্ম-টর্ম্ম আর ত কিছু নয়। হিংসে যাবার জন্য! হিংসার জন্য ভগবান কি জিনিষ বুঝতে পারে না! অর্জ্জুন অত বড় ভক্তবীর শ্রীকৃষ্ণের কাছে থেকেও তাঁর উপর সংশয় ছিল, তা জীবের কা কথা. শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম করাইয়া সংশয় দূর করেছিলেন, দুর্য্যোধনের কর্ম্ম করে সংশয় হয়েছিল।

ভগবান যাকে বাঁচান সেই বাঁচে।

বড় হইলেই কি বড় হওয়া যায়! নিজে বড় হলে কি হয়। ভগবান যাকে বড় করেন সেই বড় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছেন আমি যা করবো তাই হবে, আমি ভগবান, আমার হুকুম তামিল হবেই। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম আর অর্জ্জুনের কর্ম্ম এক হতে পারে! অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের হুকুম প্রতিপালন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।

যার দ্বারা খেতে পাচ্ছো, তাকেই অগ্রাহ্য করে, ঘৃণা করে—সে ভগবানের কোথায় হুকুম মানিল—তার কাছে ধর্ম্ম কোথা। সে ভগবানের কাছে দোষী। এই জন্য অবতারেরা শরীর ধারণ করে জীব-শিক্ষার জন্য বাপ্ মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে দেখিয়ে গেছেন, হে জীব! আমরা যথন বাপ্ মাকে ভক্তি করি, তোমরাও কর তা হলে তোমাদের কল্যাণ হইবে। তিনি বলতেন সাধু যতদিন থাকে ততদিনই জগতের কল্যাণ। সাধুর মহিমা ভগবান বুঝেন।—

* ইহা দুর্গাপূজার সময় জনৈক ভক্তকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

কুস মন্ত্রে কি হবে! একটা মন্ত্র বৈত নয়। সেই মন্ত্রের উপর বিশ্বাস না হলে ভগবানকে কোনকালে দেখা যায় নাই, তার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়া একি কম কথা! বাপ্ মাকে দেখেই ভক্তি হয় না।

দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একজন হয়, আর শিক্ষাগুরু অনেক হয়। এমন দীক্ষা-গুরু আছেন যে তাঁর কৃপায় ভগবানের উপর ভালবাসা, বৈরাগ্য হয়।

যে ধর্ম্মপথে—ভগবানের পথে বাধা দেয়, তার মত শত্রু নেই। মায়া এমনি জিনিষ যে সত্যকে মিথ্যা বলে বোধ হয়, আর মিথ্যাকে সত্য বলে বোধ হয়। সব মায়ার খেলা। সকলেই যদি রাজা হবে তবে প্রজা হবে কে। সকলেই যদি সাধু হবে গৃহস্থ হবে কে! কেবল লাল কাপড় পরলেই হলো! ঠিক ঠিক বৈরাগ্য চাই। আদর্শ গৃহী এবং খাটি সাধু এক। যাহারা ঠিক ঠিক ভগবানকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন তাদের ইহজন্মেই ভগবৎদর্শন বা আত্মদর্শন হবে।

সর্ব্বদা গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে সংশয় রূপ অসুর ধ্বংশ হয়ে যায়।

অদ্বৈতভাব এলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না। আমার গুরু বড়, তোমার গুরু ছোট বলে ঝগড়া বিবাদ থাকে না। যত গোলমাল অদ্বৈতভাব না থাকা পর্য্যন্ত। অদ্বৈতভাব এলে দেখা যায় যে তোমার গুরু আমার গুরু তফাৎ নয়।

ধর্ম্ম এক শরীরে হয় না, এ শরীরে কিছু হলো পরে কিছু হলো।

সকলেই কি ভগবানকে জানতে পারে! ভগবান যাকে জানান সেই জানে।

তেজী লোকের দোষ ধর' না শুক ভগবান বলেছেন—তেজী লোকের দোষ ধরা অন্যায় কারণ সে কি ভাবে কোন কোন কাজ কচ্ছে তা কে বলবে। তাই তেজীলোকের দোষ ধরতে নাই।

যার দ্বারা কল্যাণ হয় তাকেই মানা উচিৎ। সেই হলো সর্ব্বস্ব। তা সে বড় লোকই হউক আর গরীব লোকই হউক না কেন? উপকারই হলো প্রধান।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

কর্ম্ম-কল্পতরু—১ম ও ২য় ভাগ—শ্রীতমোনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। হিন্দুসমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের সহিত যাহারা সাধারণ ভাবে এবং সহজ ভাষায় পরিচিত হইতে চান তাঁহাদের এই পুস্তক অবশ্য পাঠ্য। ১ম ভাগের মূল্য আট আনা এবং দ্বিতীয় ভাগের মূল্য বার আনা। বজ্রযোগিনী সারস্বত সমিতি হইতে প্রকাশিত।

বিদ্যাসাগর—ইংরাজী পুস্তক শ্রীঅনন্তকুমার রায় প্রণীত। ইহাতে সরল ইংরাজী ভাষায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাল্যজীবন, পাঠ্যাবস্থা, এবং তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হইতে পারে। মূল্য এক টাকা, আট আনা। প্রাপ্তিস্থান ৩৮নং পঞ্চানন ঘোষের লেন, কলিকাতা।

রাজনীতি—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত। হিন্দুর রাজনীতি সম্বন্ধে এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে আর বাহির হয় নাই। হিন্দুরা কি উচ্চ আদর্শ ও মনুষ্যত্ব লইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালন করিতেন এবং বর্ত্তমান স্বার্থলোলুপতায় পূর্ণ পাশ্চাত্য সমাজ ও রাষ্ট্র নীতি উহার তুলনায় কত নিম্নস্থান অধিকার করে তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে মন্ত্রী, সভাসদ্, রাষ্ট্রীয় শাসনের আদর্শ, রাজগুণ ও রাজ্যাধিকারী সম্বন্ধীয় ভারতীয় মতাদর্শের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীনকালের, হবস, স্পিনোজা, লক প্রভৃতি মধ্য যুগের এবং হেগেল, কোম্‌ট, স্পেনসার প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় নীতিবাদীদের মত আলোচনা করা হইয়াছে। পরে তৃতীয় অধ্যায়ে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম, রাজার ব্যক্তিগত নিয়ম, যুদ্ধ ঘোষণার কাল, যুদ্ধযাত্রার বন্দোবস্ত, যুদ্ধকালে সাধারণ কর্ত্তব্য, মিত্র ও উদাসীনের গুণ, শত্রু, আভ্যন্তরীন্ শৃঙ্খলা, জমির অধিকারী,

রাজার অধিকার, শাসনতন্ত্র, কর্ম্মচারী, ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগ, কর্ম্মচারীর বেতন, চর নিয়োগ, জনহিতকর কার্য্য, লোকের প্রতি ব্যবহার—দণ্ড বা শাস্তি প্রদান, শিক্ষা প্রভৃতির ভারতীয় মতানুশাসনে বিশেষত্ব দেখান হইয়াছে।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাং চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥" মনু ৭।১৭।

অর্থাৎ "রাজদণ্ডই রাজা, পুরুষ, নেতা এবং শাসক; সেই রাজদণ্ডই চতুর্ব্বর্ণের, আশ্রমের এবং ধর্ম্মের প্রতিভূ।" কিন্তু,—

অধর্ম্মদর্শী যো রাজা বলাদেব প্রবর্ত্ততে।
ক্ষিপ্রমেবাপসাতোঽস্মাদুভৌ প্রথমা মধ্যমৌ॥ ৮
অসৎ পাপিষ্ঠ সচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা।
সহৈব পরিচারেণ ক্ষিপ্রমেবাবসীদতি॥ ৯

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম পর্ব্ব—বামদেব গীতা—৯২ অধ্যায়।

অর্থাৎ "যে রাজার মন্ত্রী অসৎ ও পাপিষ্ঠ, যে রাজা ধর্ম্মনাশকারী, সে রাজা বধ্য।" ভারতীয় ঐতিহাসিক যুগারম্ভেও যে এই মত প্রবর্ত্তিত ছিল তাহা আমরা পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ চন্দ্রকীর্ত্তি বাক্যে দেখিতে পাই, "গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্ভাগেন ভৃত্যস্য কঃ।" আপনি গণদাস। আপনি দেশের লোকের ভৃত্য, ছয় ভাগের এক ভাগ আপনার মাহিয়ানা; আপনার এত গর্ব্ব কেন?" মেধাতিথি তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "দণ্ডেনৈব নিহন্যতে প্রকৃতি কোপেনাদৃষ্টেন বা দোষেণ" অর্থাৎ দণ্ড দ্বারাই নিহত হন—প্রজার পাপে অথবা অদৃষ্টদোষে। বৃদ্ধ মনু দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেণ, পিজবন পুত্র সুদা, সুমুখ ও নিমি রাজা নীতি ভঙ্গ দোষে নষ্ট হন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য,—

রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠা।
ভৃত্যাঃ ভবন্তি প্রায়েন তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥
যে কায়িকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্॥ মনু ৭।১২৩।১২৫।

"রাজভৃত্য, কর্ম্মচারিবর্গ প্রায়ই পরস্ব গ্রহণশীল এবং বঞ্চক হয়। তাহাদের অত্যাচার হইতে সর্ব্বদাই প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। যাহারা বাদি-প্রতিবাদিগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে তাহাদের সর্ব্বস্ব রাজসরকারে 'বাজেয়াপ্ত' করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে।" শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"সাধূন্ সম্মানয়েদ্ রাজা বিপরীতাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
উৎকোচজীবিনোহীনদ্রব্যান্ কৃত্বা বিবাসয়েৎ॥"

অর্থাৎ "রাজা সাধুর সম্মান এবং তদ্বিপরীতের নাশ এবং উৎকোচ-গ্রাহীর সর্ব্বস্ব 'বাজেয়াপ্ত' করিয়া বিতাড়িত করিবেন।"

"অধর্ম্ম-দণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তি নাশনম্।
অস্বর্গ্যং চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মনু। ৮।১২৭

"অধর্ম্ম পূর্ব্বক—অন্যায় পূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তিনাশ হয় এবং পরোলোকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিবে।"

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্য দণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চৈবগচ্ছতি॥"

"অদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে ও প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ড না দিলে অযশ ও নরক প্রাপ্তি ঘটে। 'অধর্ম্ম দণ্ডনং' এই বাক্যের অর্থ,— ধর্ম্ম-শাস্ত্র না মানিয়া কেবল রাজার ইচ্ছায় অথবা রাজদ্বেষ বশে শাস্তি প্রদান করা।"

রাজার অতি যত্নের সহিত প্রজা পালন করা কেন কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"অরক্ষ্যমানাঃ কুর্ব্বন্তি যৎ কিঞ্চিত কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাত্তু নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্ গৃহ্ণাত্যসৌ করান্॥"

"প্রজা অরক্ষিত হইয়া যে পাপ অনুষ্ঠান করে, নৃপতি সেই পাপের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হন। কারণ নৃপতি প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন।"

যে রাজ্যের অধিনায়ক এই মূল সূত্রগুলি না মানিয়া চলেন হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী তাহা রাজ-তন্ত্র বা প্রজা-তন্ত্র কিছুই বলা যাইতে পারে না— উহাকে দস্যুতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ রাজা কখন প্রজার উপর কোনও প্রকারের জুলুম করিতে পারেন না। এ বিষয়ে শ্রীকাত্যায়ন বিধান দিতেছেন,—

ভূস্বামী তু স্মৃতো রাজা নান্য দ্রব্যস্য সর্ব্বদা।
তৎ ফলস্য হি ষড়্ভাগঃ প্রাপ্নুয়ান্নান্যথৈব তু॥
ভূতানাং তন্নিবাসিত্বাৎ স্বমিত্বং তেন কীর্ত্তিতম্।
তৎ ক্রিয়া বলিষড়্ভাগঃ শুভাশুভ নিমিত্তজম্॥

"রাজা ভূস্বামী, কিন্তু অন্য দ্রব্যের স্বামী নহেন অর্থাৎ ভূমি জাত বস্তু সকলের মালীক নহেন। উৎপন্ন দ্রব্যের ষড়্ভাগ রাজার প্রাপ্য; অন্য কিছুই নহে। প্রাণীগণই (প্রজাগণই) ভূমির নিবাসী ও ভূমিজাত তাহাদেরই অধিকার। তাহাদের রক্ষক বলিয়াই রাজা স্বামী ও উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশভাগী।" মেধাতিথি ঋষি মনুর ভাষ্যে বলিতেছেন,— [illegible] কেবলং রাজানোরক্ষানির্দ্দেশমাত্রভাজ ইত্যভি প্রায়ঃ" "ভূমি প্রজার! ভূমি সর্ব্বজনোপ্রভোগ্য। রাজা কেবল রক্ষক।"

পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তি স্থান—সরস্বতী পুস্তকালয়,
৯নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ কার্য্য।

খুলনার বস্ত্রাভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্নাভাবও ভীষণতর হইতেছে। অন্নাভাবে লোকে নানাপ্রকার কদর্য্য শাক সবজি ও নদীর ছোট ছোট কাঁকড়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়ায় উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত পরিবার কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, এখন তাহারা খাদ্যাভাবে কর্ম্মাভাবে নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছে। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র

নাই, তাহার উপর শীতের প্রকোপ, ইহাতে যে খুলনার নর নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বস্ত্রাভাব এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, অনেক স্ত্রীলোক পরিধানে কোনরূপ বস্ত্র না থাকায় বাটীর বাহিরে আসিয়া চাউল লইতে পারিতেছে না। যে সমস্ত বিপন্ন নর-নারী সাহায্য কেন্দ্র হইতে চাউল লইতে আসিতেছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শতগ্রন্থি বস্ত্র পরিয়া আসে। ইহাদের সাহায্যার্থে আমরা বহু নূতন ও পুরাতন বস্ত্র পাঠাইয়াছি ও বর্ত্তমানে ১২ই অক্টোবর হইতে শ্যামনগর থানার অন্তর্গত ৭৬ খানি গ্রামে ২৭৪৯ জনের মধ্যে ১৩৭ মণ ১৮ সের চাউল বিতরণ করিতেছি। পূর্ব্বে আমাদের প্রতি সপ্তাহে ৬০০ শত টাকা খরচ হইতেছিল, এখন গ্রামসংখ্যা ও লোক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রতি সপ্তাহে ৮০০ শত টাকা ব্যয়িত হইবে। আশা করি যে সহৃদয় জনসাধারণ এই দুঃস্থ নর-নারীবর্গের সাহায্যকল্পে নূতন বা পুরাতন বস্ত্র ও অর্থ প্রেরণ করিতে কুণ্ঠীত হইবেন না।

নিম্ন লিখিত ঠিকানায় সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে।

১। উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া।

স্বাঃ—সারদানন্দ, সেক্রেটারী।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত সহৃদয় ব্যক্তিগণ খুলনা দুর্ভিক্ষকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। জুন ১৯২১ সাল।

	টা	আ	পা
শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, রাঙামাটি,	২০	০	০
,, ,, শরৎচন্দ্র বসু, কলিকাতা	২০	০	০
,, ,, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	৬	০	০
,, ,, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নৈহাটি	৫	০	০
সেক্রেটারী, পুওর ব্রাদার্স ক্লাব, বাগবাজার	২২	০	০
,, ফ্রেণ্ডস্, ,, ,, শিয়ালদহ	১১	৪	০
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ ব্যানার্জি, কলিকাতা	৫	০	০

সেক্রেটারী, বেঙ্গল পুওর রিলিফ্ ফণ্ড, বর্ম্মা	২৩	০	০
শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, রাঙ্গামাটি	১০	০	০
" " পতিতপাবন পাল, কলিকাতা	৭৫	০	০
" ত্রৈলোক্য নাথ দে, ময়মনসিংহ	৩	০	০
বগুড়া পাবলিক্	৩০	০	০
	মোট—[illegible]	৬	০

জুলাই ১৯২১ সাল

	টা	আ	পা
জনৈক ভৃত্য	১	০	৬
এম্, এল গোসাই, পেগু	৫	০	০
বগুড়া পাবলিক,	৫	০	০
তারকনাথ বসু, ডায়মণ্ড হারবার	৫	০	০
কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী, কলিকাতা	৫	০	০
বগুরা পাবলিক্	[illegible]	০	০
ডি, আঢ্য, আলিপুর	১০	০	০
বগুরা পাবলিক্	১৫	০	০
মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, রাঙ্গামাটী	১০	০	০
টি, দাস, রামপুর	১০	০	০
ডি, পাল, কলিকাতা	৫	০	০
বিহারীলাল বসু, কলিকাতা	০	১২	০
সুরবালাদেবী, রাজসাহী	৫	০	০
স্বরাজ সহায় সমিতি, কলিকাতা	৬	০	০
এ, সি, দত্ত, কৃষ্ণনগর	৩০	০	০
ধর্ম্ম দাস, সাকার	৫০	০	০
কৃষ্ণপদ দত্ত, বার্ম্মা কোং, হাওড়া	৩৪	০	০
নগেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত	১৫	০	০
কে, মুখার্জ্জি, পোর্টব্লেয়ার	১০	০	০
দীনেশ গাঙ্গুলী, ঢাকা	১	০	০

এন্, কে, সেনগুপ্ত	৫০	০	০
বগুড়া, পাবলিক্	১০	০	০
সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মানভূম	১৪	০	০
ভুবনমোহন বসু, বর্দ্ধমান	৩০	০	০
বগুড়া পাবলিক্	১০	০	০
ইউ, কে, মিত্র, কলিকাতা	[illegible]	০	০
শিবনন্দন লাহাড়ী, সাহাবাদ	১	০	০
বগুড়া পাবলিক	১০	০	০
পি, এন, রায়, মুর্শিদাবাদ	[illegible]	০	০
পঙ্কজকুমার আইচ	২	০	০
বগুড়া পাবলিক্	৭	০	০
মোট—	[illegible]	[illegible]	৬

আগষ্ট ১৯২১ সাল।

	টা	আ	পা
শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস মল্লিক, কলিকাতা	[illegible]	০	০
,, ,, এন্, এল গোসাই, পেগু	১০	০	০
,, ,, শিবনন্দন লাহেড়ী, সাহাবাদ	[illegible]	০	০
জনৈকা দাসী	[illegible]	০	০
,, ,, দুর্গাপদ বানার্জি, বহুবাজার	[illegible]	০	০
,, ,, মনোরঞ্জন ঠাকুর, ময়মনসিংহ	১	০	০
,, ,, সঞ্জীবেন্দ্রভূষণ মুখার্জ্জি, কলিকাতা	৫	০	০
,, ,, চণ্ডীদাস মুখার্জি, কলিকাতা	৪	০	০
,, ,, আশুতোষ ঘোষ, বগুরা	৬০	০	০
,, ,, এ, সি লাহিড়ী, কাইক্লাট	৮৫	০	০
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ	৫	০	০
,, ,, হৃষীকেশ ঘোষ, শ্যামবাজার	২০	০	০
,, ,, হেমন্তকুমার মজুমদার	২০	০	০
মোট—	২৫০	০	০